ইতিহাসে বিজ্ঞান

নবপত্র প্রকাশন / কলিকাতা-৭০০০৭৩

সূচীপত্র

চতুর্থ অধ্যায়: লৌহযুগ: ধ্রুপদী জীবনধারা

ধর্মানুশাসনের যুগে বিজ্ঞান

পঞ্চম অধ্যায়: সামন্ততন্ত্রে উত্তরণের যুগে বিজ্ঞান

ষষ্ঠ অধ্যায়: মধ্যযুগের বিজ্ঞান ও প্রকৌশল

আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব

সপ্তম অধ্যায়: বৈজ্ঞানিক বিপ্লব

বিজ্ঞান ও উৎপাদন-শিল্প

অষ্টম অধ্যায় : শিল্পবিপ্লব: পটভূমি ও পরিণতি

নবম অধ্যায়: আঠারো ও উনিশ শতকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিকাশ

ইতিহাসে বিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ

ভূমিকা

বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে মানব-ইতিহাসের অন্যান্য দিকগুলির বিকাশের সম্বন্ধটি কী তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করার লক্ষ্য নিয়ে এই বইটি রচিত। সমাজের ওপর বিজ্ঞানের অভিঘাতে যেসব প্রধান প্রধান প্রশ্নের উদয় হয়েছে সে সম্পর্কে একটা ধারণা গঠন করা এর উদ্দেশ্য। আজ আমরা সভ্যতা বলতে যা বুঝি, বিজ্ঞানকে বাদ দিলে বস্তুগত অর্থে তার কোনো অস্তিত্বই থাকে না। মননগত ও নৈতিক দিক থেকেও সভ্যতার সঙ্গে বিজ্ঞান একইভাবে সম্পৃক্ত। মানবচিন্তার সামগ্রিক ধরনটিকে নির্দেশিত করার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার প্রসার এক চরম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে আজকের যুগের বিভিন্ন সংঘাত ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা খুবই লক্ষণীয়। মানুষ একদিকে যেমন পরমাণু-বোমার কিংবা জীববৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রকোপে ধ্বংস হবার আতঙ্কে সিঁটিয়ে রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষিতে আর চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিজ্ঞানের ফলিত প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে উন্নততর জীবনযাপন করার আশায় আশান্বিতও হয়ে রয়েছে।

ঘটনার গতি আমাদের সামনে অত্যন্ত জরুরি আকারে বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তুলে ধরছে। যথা, সমাজে বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার, সমরায়োজনে বিজ্ঞানের ব্যবহার, বিভিন্ন দেশের সরকারের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক, বৈজ্ঞানিক গোপনীয়তা, বিজ্ঞানের স্বাধীনতা, শিক্ষায় ও সর্বজনীন সংস্কৃতিতে বিজ্ঞানের স্থান। কোন পথে এসব সমস্যার সমাধান মিলবে? চিরস্বীকৃত কোনো নীতি কিংবা স্বয়ংসিদ্ধ বলে পরিগণিত সত্যের নিরিখে এসব সমস্যার সমাধান মেলেনি, বরং সমস্যা আরো ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের নিজস্ব ঐতিহ্যের কাছে, মানবসমাজের কাছে কিংবা রাষ্ট্রের কাছে বিজ্ঞানীর জবাবদিহি করার দায় কতটুকু?—এ প্রশ্নের স্পষ্ট কোনো উত্তর ঐ নিরিখে পাওয়া যাবে না। দুনিয়া অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আজকের পরিবর্তমান পৃথিবীতে চির-নিশ্চিহ্ন অতীত সমাজের ধ্যানধারণাকে হুবহু প্রয়োগ করলে কোনো সুফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয়না। তার অর্থ কি এই যে এইসব সমস্যা আসলে অসমাধেয় এবং সেইহেতু অক্ষম নৈরাশ্যবাদ আর যুক্তিবিমুখতার গহ্বরে নিপতিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই? আদৌ তা নয়; এসব সমস্যার সমাধান অবশ্যই করতে হবে; মানবসমাজের পক্ষে সবচেয়ে কল্যাণকররূপে, সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে কী করে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা ও বিকশিত করা যায়, সে পথটি আমাদের কার্যক্ষেত্রে খুঁজে বার করতেই হবে। সেই অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেই পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর মিলবে। যেসব দেশে বিজ্ঞানকে সচেতনভাবে মঙ্গলকর্মে ও গঠনকার্যে নিয়োজিত করা হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা এ প্রসঙ্গে শিক্ষাপ্রদ। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধকালে এবং সমরায়োজনে বিজ্ঞানকে যেভাবে কাজে লাগানো হয়েছে তার অভিজ্ঞতা থেকেও বিজ্ঞানীরা শান্তিকালে কী করা সম্ভব সে সম্পর্কে অনেক কিছু বুঝতে পেরেছেন।

কিন্তু বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে তো কাজ হবে না। বস্তুত অভিজ্ঞতা কখনোই নিরঙ্কুশরূপে কাজ করে না। জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে মানবসংস্কৃতির সর্বজনীন ভাণ্ডার থেকে আহরিত তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হতে তা বাধ্য। এই প্রভাব যদি অজ্ঞাতসারে পড়ে তাহলে ঐতিহ্যের ওপর অন্ধ নির্ভরতা গড়ে ওঠে; তখন অতীতে সমস্যার সমাধানে যেসব প্রয়াস চলেছিল তারই হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। অথচ ইতিমধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেসব সমাধান হয়তো অকেজো হয়ে উঠেছে। পক্ষান্তরে, সে প্রভাব যদি জ্ঞাতসারে অর্থাৎ সচেতনভাবে গ্রহণ করতে

হয় তাহলে সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের আনুপূর্বিক সম্পর্কটিকে গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। তার জন্য সবার আগে প্রয়োজন বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে ও সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ। বর্তমানকে অনুধাবন করা ও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য অতীতকে খুঁটিয়ে বিচার কবার কাজটা মানুষের অন্য যেকোনো কর্মকাণ্ডের তুলনায় বিজ্ঞানেই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।

কিছুকাল আগেও অবশ্য সক্রিয় বিজ্ঞানীরা এ কথাটাকে বিশেষ আমল দিতেন না। প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞানে, বিশেষত ভৌত বিজ্ঞানে, এই ধারণাটা খুবই প্রবল যে বর্তমানে লব্ধ জ্ঞান অতীতে আহরিত যাবতীয় জ্ঞানের স্থান নেয় এবং তাকে ছাপিয়ে যায়। ভবিষ্যতে যে-জ্ঞান আহরিত হবে তাও যে বর্তমানের জ্ঞানকে অকেজো করে তুলবে, সেটা অবশ্যই স্বীকার করা হয়, কিন্তু আপাতত বর্তমানে লব্ধ জ্ঞানটুকুই সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হয়। অতীতের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞানই বর্তমান জ্ঞানভাণ্ডারের অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়; সুতরাং তার বাইরে যেটুকু পড়ে থাকে তা নিশ্চয়ই অতীতের অজ্ঞাতপ্রসূত ভুলভ্রান্তি—এটাই হলো এঁদের বক্তব্য। সংক্ষেপে, হেনরি ফর্ডের কথায়, 'ইতিহাস হচ্ছে গাঁজাগুলি'।

সৌভাগ্যবশত এ যুগের বিজ্ঞানীরা ক্রমশই বেশি করে বুঝতে পারছেন যে ইতিহাসকে অবহেলা করার এই মনোভাবের পরিণাম কী হতে পারে। শুধু তাই নয়, সমাজে বিজ্ঞানের স্থানটি কোথায় তা বুদ্ধিসহকারে অনুধাবন না করতে পারার অনিবার্য ফল কী হতে পারে তাও তাঁরা বুঝতে পারছেন। বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার আর অপব্যবহার নিয়ে আজকের পৃথিবীতে এক তুমুল নাটক জমে উঠেছে। বিজ্ঞানীদের যত খাতিরই থাক, তাঁরা যদি এ নাটকে নেহাৎ অন্ধ অসহায় পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হতে না চান, তাহলে উক্ত জ্ঞানলাভ তাঁদের করতেই হবে। একদা এরকম বিশ্বাসের মধ্যে স্বস্তি পাওয়া যেত যে বিজ্ঞানের প্রয়োগে মানবমঙ্গল আপনা থেকেই অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলবে। বিজ্ঞানী আর জনসাধারণ, উভয় তরফেই সে বিশ্বাস ছিল প্রবল। এ ধারণাটি খুব পুরোনো নয়। রজার বেকনের যুগে এটি ছিল এক বিপজ্জনক দুবকল্পনা; তাঁর তিনশো বছর পরে ফ্রান্সিস বেকন প্রথম প্রত্যয়ভরে এই ধারণা ঘোষণা করেন। অতঃপর শিল্পবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানে আর ম্যানুফ্যাকচারে যে সুবিপুল প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটে তারই দরুন প্রগতির ধারণাটি এক সুনিশ্চিত এবং স্থায়ী সত্য হিসেবে স্বীকৃত হয়। তারপর ভিক্টোরিয় যুগে তা অতি-উচ্চারিত হতে হতে প্রায় অর্থহীন এক ফাঁকা বুলিতে রূপান্তরিত হয়। আজকের এই উদ্বেগ-আকুল 'দারুণ দুর্দিনে' অবশ্য প্রগতি ব্যাপারটাকে আদৌ অবশ্যম্ভাবী বলে গণ্য করা হয় না। আজ এটা স্পষ্ট যে বিজ্ঞানের অমিত শক্তি এই গ্রহ থেকে সভ্যতাকে, এমনকি জীবনকেই, অচিরে মুছে ফেলার কাজে যতটা সক্ষম, শান্তিকালে আচরণীয় ক্রিয়াকর্মে অব্যাহত প্রগতিকে সুনিশ্চিত করতে ততখানি সক্ষম নয়। এমনকি খণ্ডিত প্রগতি ঘটানোও কতদূর সম্ভব তা নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। যেমন, নব্য-ম্যাল্‌থসবাদীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে এই অতিজনাকীর্ণ গ্রহটিতে মানুষের রোগ নিরাময়ের পরিণতিও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

মঙ্গলার্থেই হোক আর অমঙ্গলার্থেই হোক, বিজ্ঞানের গুরুত্ব আজ প্রশ্নাতীত। আর গুরুত্বপূর্ণ বলেই বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের গোটা সভ্যতাটা যে-উপকরণের সাহায্যে রূপান্তর লাভ করছে তা হলো বিজ্ঞান। এবং বিজ্ঞান স্বয়ং বিকশিত হয়ে চলেছে। আগে সে বিকাশ ঘটত শান্ত গতিতে, অগোচরে। আজ সে বিকাশ ঘটছে অতি দ্রুত, বড়ো বড়ো পদক্ষেপে, সর্বসমক্ষে। আমাদের জীবৎকালের মধ্যেই আমাদের সভ্যতার মূল কাঠামো বিপুলভাবে বদলে গেছে, এবং বছরে বছরে অতি দ্রুত বদলে চলেছে। কী করে এই

পরিবর্তন ঘটছে তা জানতে হলে কেবল বিজ্ঞানেব বর্তমান কর্মকাণ্ডকে জানাই যথেষ্ট নয়। কী করে বিজ্ঞান তার বর্তমান রূপে এসে উপনীত হলো, অতীতে একের পর এক বিভিন্ন সমাজকাঠামোর সঙ্গে তার কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটেছে, এবং কীভাবে বিজ্ঞান সেইসব সমাজকাঠামোকে নবনব রূপ দান করেছে, এসব ব্যাপারেও অবহিত থাকাটা নিতান্ত আবশ্যিক।

অনেকে ধরেই নেন যে বিজ্ঞান যেহেতু আমাদের জীবনকে উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায় প্রভাবিত করছে, সুতরাং বিজ্ঞানীরাই হচ্ছেন সভ্যতা-প্রক্রিয়ার প্রকৃত নিয়ন্তা, এবং সেই কারণে একালের নানাবিধ অমঙ্গল এবং বিপর্যয়ের জন্য মূলত বিজ্ঞানীরাই সাক্ষাৎভাবে দায়ী। বিজ্ঞানের অঙ্গনে যাঁরা কর্মরত তাঁদের অধিকাংশই খুব ভালো করে জানেন, এ ধারণার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক কত ক্ষীণ। বিজ্ঞানীদের শ্রমের ফসলকে যে-কাজে লাগানো হয়, তার ওপর বিজ্ঞানীদের প্রায় কোনোই হাত থাকেনা। সুতরাং ফলাফল সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যেটুকু দায়িত্ব তা সম্পূর্ণতই নৈতিক। কিন্তু সচরাচর সেইটুকু দায়িত্বকেও এড়িয়ে যাওয়ার এক ধারা তৈরি হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে নির্লিপ্ত সত্যানুসন্ধানের গুণগান গাওয়া হয়; বলা হয়, গবেষণার পরিণামের কথা না ভেবেই বিশুদ্ধ গবেষণা চালাতে হবে। যতদিন, মূলত বিজ্ঞানেরই কল্যাণে, নিরবচ্ছিন্নভাবে সমাজের প্রগতি ঘটে চলেছিল ততদিন এইভাবে দায়িত্ব এড়ানোর চমৎকার কৌশলটি খুবই কাজ দিয়েছিল। কেননা সেসময় সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে বিজ্ঞানী মোটের ওপর সহজেই নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারতেন; ফলে তাঁর স্বনির্বাচিত ক্ষেত্রটি নিয়ে চর্চা করার পথে বিঘ্ন থাকত না। কিন্তু বর্ধমান অভাব, দুঃখদুর্দশা আর আতঙ্কের চাপে পৃথিবীর চেহারাটা ক্রমশ বদলে যেতে থাকে; বিজ্ঞান স্বয়ং ক্রমশ সমরায়োজনের অপ্রীতিকর দিকগুলোর সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে পড়তে থাকে। এমতাবস্থায় ঐ আত্মতুষ্ট মনোভাবে ভাঙন ধরে। তাই আজকের দুনিয়াতে বিজ্ঞানীদের পক্ষে নৈতিক দায়িত্ব এড়ানো খুবই শক্ত।

নিছক নৈতিক দায়িত্বের বিকল্প দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নয়, বরং আরো সচেতন ও সক্রিয় সামাজিক দায়িত্বশীলতা। একদিকে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষভাবেই উৎপাদনশিল্প, কৃষি আর চিকিৎসা-ক্ষেত্রের পরিকল্পনার কাজে নিয়োজিত হবে, এবং সেসব পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে বিজ্ঞানীদের মনোমতো। অপরদিকে বিজ্ঞানের এমন প্রসারণ ও রূপান্তর ঘটাতে হবে যাতে তা সকলের জীবন ও কর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।

সামাজিক দায়িত্বহীন বিজ্ঞান থেকে সামাজিক দায়িত্বশীল বিজ্ঞানে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি সবে শুরু হয়েছে। তার চরিত্র এবং দিশা এখনো পরিণত রূপ ধারণ করেনি। ব্যক্তিগত অর্জনলিপ্সার তাড়নায় পরিচালিত অর্থনীতি থেকে সর্বজনীন মঙ্গলসাধনের লক্ষ্যে নির্দেশিত অর্থনীতিতে সামাজিক রূপান্তর লাভের প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানের এই চরিত্রবদল একটি দিক মাত্র--তবে অন্যতম প্রধান দিক। মানুষের সমগ্র ইতিহাসেই এই পরিবর্তন এক যুগান্তকারী ঘটনা হয়ে থাকবে। সেই কারণেই আগে থেকে এই পরিবর্তন নিয়ে তলিয়ে আলোচনা করা দরকার, তাকে ভালো করে বোঝা দরকার। কারণ এর মঙ্গল-সম্ভাবনা যেমন অমিত, তেমনি বিপদের সম্ভাবনাও সমধিক। সে রূপান্তর যাতে সবচেয়ে সুষ্ঠু উপায়ে ঘটে, যাতে তার প্রতিটি ধাপে বিজ্ঞানকে বুদ্ধিপূর্বক কাজে লাগানো সম্ভব হয়, তারই জন্য অতীতে বিজ্ঞান আর সমাজের সম্পর্ক কেমন ছিল তা সর্বাগ্রে বোঝা দরকার। কেননা সেটি না বুঝতে পারলে ঐ রূপান্তরকেও বোঝা সম্ভব হবেনা।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক

এই অনুসন্ধানের কাজ শুরু করার আগে বিজ্ঞান বলতে কী বোঝায় এবং বিজ্ঞানক্ষেত্রের চৌহদ্দি কতটা সে সম্বন্ধে দুকথা বলা দরকার। বিজ্ঞানের একটি সংজ্ঞা দিয়ে এ কাজ শুরু করাই

সবচেয়ে সংগত বলে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। আমার *The Social Function of Science* বইটির যে সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন প্রোফেসর ডিংগ্‌ল, তাতে তিনিও সেই দাবি রাখেন। তাঁর মতে, লেখককে প্রথমে 'বিজ্ঞান নামক ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করে চিহ্নিত করতে হবে। বিজ্ঞানের নিজস্ব চেহারাটা কেমন ছিল তার একটা যতদূর সম্ভব স্পষ্ট রূপরেখা আঁকতে হবে। বিজ্ঞানের কাজ কী, কিংবা মানুষের অন্যান্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক কী, সে সব বিষয় থেকে স্বতন্ত্ররূপে বিজ্ঞানের এই একান্ত রূপটিকে জানতে হবে। এটি জানার পর তবেই লেখক সমাজজীবনে বিজ্ঞানের কী ভূমিকা ছিল বা থাকবে, তা নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হতে পারেন।'

কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এই কথাই বলে যে ঐ পথ অনুসরণ করা অর্থহীন, নিষ্ফল। কেননা বিজ্ঞান এত প্রাচীন একটা ব্যাপার, ইতিহাসে তার রূপ এতবার বদলেছে, অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তা এত বিভিন্নভাবে জড়িত যে একটা কোনো সংজ্ঞার মধ্যে তাকে বাঁধতে গেলে—সে চেষ্টা বহুবার হয়েছে—তা কেবল বিজ্ঞানের বিকাশধারার একটা কোনো পর্বের একটা কোনো দিককেই, হয়তো কোনো অপ্রধান দিককে, খণ্ডিতরূপে প্রকাশ করবে মাত্র। আইনস্টাইন এ ব্যাপারটাকে তাঁর নিজস্ব ধরনে ব্যক্ত করেছেন : 'বিজ্ঞান জিনিসটা মানুষের কাছে এক অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ বাস্তব রূপে বিদ্যমান, একথা ঠিক। কিন্তু বিকাশমান বিজ্ঞান, যে-বিজ্ঞান একটা সুনির্দিষ্ট চর্চার বিষয়, তা মানবিক অন্য যেকোনো কর্মপ্রয়াসের মতোই আত্মগত এবং মানসিক শর্তাধীন। তাই, "বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কী, অর্থ কী?"—এ প্রশ্নের উত্তরে নানা মুনি নানা কালে নানা মত ব্যক্ত করবেন।' সমাজবিবর্তনের অনন্য এবং চির-অপুনরাবৃত্ত ধারাটির সঙ্গে মানুষের এই বিশেষ কর্মপ্রয়াসটি এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে সঠিক অর্থে এর কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায়না।

বিজ্ঞানের চরিত্রই এমন যে মানুষের অন্যান্য যেকোনো কর্মের তুলনায় তা অনেক পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞান মানবসমাজের সাম্প্রতিকতম কীর্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম; তাই বিজ্ঞানে পরিবর্তন ঘটছে অত্যন্ত দ্রুতলয়ে। বিজ্ঞানের স্বয়ংস্বতন্ত্র অস্তিত্বলাভও খুব বেশিদিনের ব্যাপার নয়। সভ্যতার ঊষাকালে বিজ্ঞান ছিল জাদুকর, পাচক বা কর্মকারের নানা কাজের একটি অঙ্গ মাত্র। বিজ্ঞান নিজস্ব মর্যাদা লাভ করেছে কেবল সতেরো শতকে এসে। ঐ সময় থেকে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বলাভের প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। তবে এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পর্বও হয়তো এক সাময়িক ব্যাপার। ভবিষ্যতে এমন হতেই পারে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতি সার্বিকভাবে সমাজজীবনে চারিয়ে যাওয়ার ফলে বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বলে আর কিছু থাকবে না--যেমন আগে ছিলনা। কাজেই বিজ্ঞানের কোনো সংজ্ঞা নিরূপণ স্বভাবতই অসম্ভব। সুতরাং এই বইতে আমরা বিজ্ঞান বলতে কী বোঝাতে চাইছি, কী নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, তা এক বিস্তৃত এবং ক্রমশ-প্রকাশ্য বিবরণের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করা ছাড়া উপায় নেই। আগামী অধ্যায়গুলোতে আমরা সেই কাজই করব। তবে তার আগে, আধুনিক জগতে বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান যেসব দিক প্রতিভাত হয় সেগুলিকে অল্পকথায় বিশ্লেষণ করার একটা চেষ্টা করব। আগামী বিস্তারিত আলোচনার এক সংক্ষিপ্ত সূত্ররূপে কাজ করবে এ বিশ্লেষণ।

বিজ্ঞানকে বিভিন্ন রূপে দেখা যেতে পারে, যথা : (1) প্রতিষ্ঠানরূপে; (2) পদ্ধতিরূপে; (3) ক্রমসঞ্চিত জ্ঞানের ঐতিহ্যরূপে; (4) উৎপাদনকর্ম চালানোর এবং তার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান কারক উপাদানরূপে এবং (5) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং মানুষ সম্পর্কে ধ্যানধারণা গঠন করার অন্যতম মহাশক্তিশালী উপাদানরূপে। পরপর এই পাঁচটি বিভাগে উপরিউক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার পর ষষ্ঠ অধ্যায়ে (6) আমি বিজ্ঞান আর সমাজের সম্পর্কটি

নিয়ে আলোচনা করেছি। বিজ্ঞানের এইসব বিভিন্ন দিকের তালিকা রচনা করে আমি কিন্তু একথা বলতে চাইছি না যে বিজ্ঞানের ঐ-ঐ স্বতন্ত্র 'শাখা' রয়েছে। 'বিজ্ঞান' নামক ধারণাটির ব্যাপ্তি অতি বিশাল। বহুকাল ধরে, অজস্রবিধ অনুষঙ্গের মধ্যে দিয়ে, নানা বর্গে বিভক্ত হয়ে তা গড়ে উঠেছে। সুতরাং কাল, অনুষঙ্গ এবং বর্গ—এই তিনদিক থেকেই যে ধারণার ব্যাপ্তি এমন বিপুল তার যে নানারকম দিক থাকবে, নানান অর্থে যে তার প্রয়োগ ঘটবে, সেটা তো নিতান্ত স্বাভাবিক। 'বিজ্ঞান' বা 'বৈজ্ঞানিক' শব্দটির অর্থ একেক প্রসঙ্গে একেকরকম। আমার পূর্বোক্ত বইটি থেকে অধ্যাপক ডিংগ্‌ল সযত্নে ঐরকম দশটি অর্থের এক তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। তার মধ্যে একটি অর্থে বিজ্ঞানকে প্রয়োগকর্ম বা এনজিনিয়ারিঙের থেকে স্বতন্ত্র করে দেখানো হয়েছে—অর্থাৎ ফলিত প্রয়োগ কী মাত্রায় ঘটছে তাকেই নিরিখ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য একটিতে আবার, সত্য যাচাই করার এক উপায় হিসেবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে আলাদা করা হয়েছে— আবিষ্কারকে চিহ্নিত করার নিছক স্বজ্ঞাজাত (intuitive) পদ্ধতির বিপরীতে। 'বিজ্ঞান' শব্দের এই প্রত্যেকটি ব্যবহারই অর্থবহ। কিন্তু শব্দটির এইসব বিভিন্ন প্রয়োগের পূর্ণ অর্থ তখনই পরিস্ফুট হয় যখন বিজ্ঞানের বিকাশধারার একটি সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে তাদের দেখা হয়। যেমন উপরিউক্ত বিভাগগুলোর মধ্যে প্রতিষ্ঠানরূপে এবং উৎপাদনের কারক উপাদানরূপে বিজ্ঞান প্রায় পুরোপুরিই আধুনিক যুগের সীমাভুক্ত। আবার একটি পদ্ধতিরূপে এবং ধ্যানধারণার ওপর এক প্রভাবরূপে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রাচীন গ্রীক যুগ থেকেই, হয়তো বা আরো আগে থেকেই বিদ্যমান। আর, এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে কিংবা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় জ্ঞানের যে ঐতিহ্য সঞ্চারিত হয়ে এসেছে তা তো বিজ্ঞানের একেবারে মূলে অধিষ্ঠিত। মানবসমাজের একেবারে আদিলগ্ন থেকেই, অর্থাৎ বিজ্ঞান একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান রূপে উদিত হবার বহু আগে থেকেই, নিছক কাণ্ডজ্ঞান আর লোকবিশ্বাস থেকে স্বতন্ত্র এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভব ঘটার অনেক আগেই, ঐ প্রক্রিয়া সক্রিয় ছিল।

1. প্রতিষ্ঠানরূপে বিজ্ঞান

বিজ্ঞান আজ এক প্রতিষ্ঠান। লক্ষ লক্ষ নরনারী আজ এই প্রতিষ্ঠানে আপন আপন বৃত্তি খুঁজে পেয়েছেন। বিজ্ঞানের এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপটি কিন্তু খুবই সাম্প্রতিক। গুরুত্বের দিক থেকে চার্চ, আইন প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতি প্রাচীন বৃত্তিগুলির সঙ্গে বিজ্ঞান তুলনীয় হয়ে উঠেছে সবে এই বিংশ শতাব্দীতে এসে। আজ চিকিৎসাশাস্ত্র আর এনজিনিয়ারিঙের সঙ্গে যুক্ত হলেও তা থেকে স্বতন্ত্র এক বিষয় বলেই বিজ্ঞানকে গণ্য করা হচ্ছে; আবার একই সঙ্গে ঐ দুটি শাখাও চিরাচরিত ঐতিহ্যের নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানে সিঞ্চিত হয়ে উঠেছে। এইভাবে ক্রমশই বিশেষীভূত বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ার দরুন বিজ্ঞানকে সমাজের আর পাঁচটা প্রচলিত বৃত্তির থেকে আলাদা একটা কিছু বলে গণ্য করার বিশেষ প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কী করে বিজ্ঞান এইভাবে আলাদা হয়ে গেল এবং এর মূলে বিজ্ঞানের অর্থনৈতিক ভূমিকার অবদান কতটা তা নিয়ে আমরা পরে অনেক কিছুই আলোচনা করব। এখানে শুধু এই ব্যাপারটার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ক্ষান্ত হব যে এই বিচ্ছেদ বিশেষভাবে প্রকট পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলোতে। বিজ্ঞানচর্চায় যাঁরা নিযুক্ত নন তাঁদের অনেকের কাছে বিজ্ঞান বলতে বোঝায় এমন একটা কাজ যা বিশেষ এক ধরনের লোক করে থাকে—তাদের বলে 'বিজ্ঞানী'। 'Scientist' বা বিজ্ঞানী শব্দটার বয়সও খুব বেশি নয়। 1840 সালে *Philosophy of the Inductive Sciences* (আরোহী বিজ্ঞানসমূহের দর্শন) গ্রন্থে হোয়েওএল্ প্রথম 'Scientist' কথাটা প্রয়োগ করেন : 'বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের একটা সর্বজনীন নামকরণ হওয়া প্রয়োজন। আমার প্রস্তাব, তাঁদের বলা হোক 'scientist'.' এই 'বিশেষ জ্ঞানে'র চর্চা যাঁরা করেন তাঁদের ভিন্ন এক জগতের বাসিন্দা বলে মনে করা হয় : ধরাছোঁয়ার বাইরে লেবরেটরির গহনে বসে অদ্ভুত সব কলকব্জা নিয়ে কাজ করেন এঁদের কেউ কেউ; অনেকে আবার বিচিত্র জটিল নানারকম হিসেবনিকেশ আর যুক্তিতর্ক নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকেন; আর এঁদের সকলেই এমন এক ভাষা ব্যবহার করেন যা এঁরা নিজেরা ছাড়া আর কেউ বোঝে না। বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে এই যে ধারণা গড়ে উঠেছে, এর পিছনে কিছুটা যুক্তি আছে বইকি। এটা তো ঘটনা যে বিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে ক্রমশ বেশি করে স্পর্শ করছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তা সহজবোধ্য হয়ে উঠছে না মোটেই। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা ক্রমে ক্রমে এমন এক জগতে সরে এসেছেন যেখানে তাঁদের আবিষ্কৃত নতুন নতুন জিনিস আর সম্পর্কসূত্রকে ব্যক্ত করবার জন্য বিশেষ ধরনের ভাষা না গড়ে নিলে উপায় নেই। এই সমস্ত আবিষ্কারের মধ্যে যেসব অংশ সাধারণের কাছেও রীতিমতো কৌতূহলজনক, সেগুলোকেও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় অনুবাদ করে দেবার কষ্টটুকু তাঁরা স্বীকার করতে চান না। আত্মমগ্ন, বহির্বিচ্ছিন্ন এক বৃত্তির যাবতীয় লক্ষণ বিজ্ঞানের মধ্যে সুপরিস্ফুট। তার মধ্যে প্রধান লক্ষণটি হলো : সুদীর্ঘ প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষানবিশী। কাজেই সাধারণ লোকের কাছে 'বিজ্ঞান কী' সে প্রশ্ন অপেক্ষা 'বিজ্ঞানী কাকে বলে' তার উত্তর দেওয়া অনেক সহজ। বস্তুত, বিজ্ঞানের একটা সহজ সংজ্ঞা হলো : *বিজ্ঞানীরা যে কাজ করেন।*

যৌথ এবং সংগঠিত এক সম্প্রদায়রূপে বিজ্ঞানের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ আছে। সে রূপটি নতুন হতে পারে, কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অর্থনৈতিক লক্ষণটি বিগত যুগেই পরিস্ফুট হয়েছিল—যে যুগে বিজ্ঞান একেকজন ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব প্রয়াসেই বিকাশ লাভ

করত। অন্য যেকোনো তথাকথিত স্বাধীন বৃত্তির সঙ্গে বিজ্ঞানের পার্থক্য এই যে বিজ্ঞানের অনুশীলনের বিশেষ কোনো তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক মূল্য নেই। একজন আইনজীবী একটা কেস নিয়ে ওকালতি করতে বা রায় দিতে পারেন; একজন ডাক্তার রোগ সারাতে পারেন; একজন পুরোহিত বিয়ের বা শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ করতে পারেন; একজন এনজিনিয়ার একটা সেতু কিংবা কাপড়কাচা কলের নকশা বানাতে পারেন;—এ সবেরই দাম লোকে হাতে হাতে চুকিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। অর্থাৎ, বাজার থেকে যা উশুল করা যায়, তা দাবি করার অধিকার এইসব বৃত্তিতে রয়েছে, এবং সেই পরিমাণে এরা স্বাধীন। কিন্তু বিজ্ঞানের নিজস্ব ফসলসমূহ বিক্রয়যোগ্য নয়; অবশ্য যেগুলির তাৎক্ষণিক ফলিত প্রয়োগ ঘটে তাদের কথা আলাদা। অথচ সব মিলিয়ে দেখা গেছে বিজ্ঞানের নিজস্ব ফসলসমূহ প্রকৌশল আর শিল্পোৎপাদনের অঙ্গীভূত হয়ে উঠে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ নতুন সম্পদ সৃষ্টি করে, তার মূল্য বাকি যাবতীয় বৃত্তির সম্মিলিত অবদানের চেয়েও বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের নিজস্ব ফসলসমূহ তৎক্ষণাৎ বিক্রয়যোগ্য না হওয়ার দরুন খেয়েপরে বাঁচার সমস্যাটা চিরকাল বিজ্ঞানীর কাছে এক প্রধান সমস্যা হয়ে থেকেছে। অতীতে এই সমস্যাই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল। এমনকি, অনেক কম মাত্রায় হলেও, আজও খানিকটা তাই।

আগেকার দিনে যাদের হাতে টাকাপয়সা এবং অবসর ছিল তাঁরা, কিংবা প্রাচীনতর অন্য বৃত্তিতে নিযুক্ত সংগতিপন্ন লোকেরাই মূলত অবসর-সময়ের কাজ কিংবা অপ্রধান বৃত্তিরূপে বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। যেমন, যিনি রাজজ্যোতিষী তিনিই বহু ক্ষেত্রে রাজবৈদ্য হতেন। এর ফলে কার্যত বিজ্ঞান উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর একচ্ছত্র অধিকারে চলে যায়। বিজ্ঞানের করণীয় কার্য এবং তার পুরস্কার—দুটোই শেষ বিচারে নির্ধারিত হয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান আর সামাজিক ঐতিহ্যের দ্বারা। ক্রমশ বিজ্ঞান স্বয়ং এক সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। এর ফলে যে সর্বদাই বিজ্ঞানের অবনতি ঘটে তা নয়। একেবারে সম্প্রতিকালে বিজ্ঞানকে সমরমুখী করে তোলার আগে পর্যন্ত, বিজ্ঞানের ওপর সমাজের চাপটা ছিল খুবই নির্বিশেষ ধরনের এবং খুব একটা জোরালো নয়। এই ধরনের সামাজিক চাপ বরং কল্পনাশক্তিসম্পন্ন মনকে সংহত করতে সাহায্যই করে। কেননা ঐ চাপের দরুন বিজ্ঞানীর মনোযোগ ছড়িয়ে না প'ড়ে অধিগম্য অভিজ্ঞতার কয়েকটি বিশেষ দিকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়। যেমন, সতেরো বা আঠেরো শতকে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের সামাজিক তাগিদ পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুফল ফলিয়েছিল। যেমন বিশ শতকে অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান সুফল ফলিয়েছে।

বিজ্ঞানের সত্যিকারের অধঃপতন তখনই ঘটে যখন সমাজে ব্যক্তিগত মুনাফা বাড়ানোর স্বার্থে বা ধ্বংসসাধনের উপায়রূপে বিজ্ঞানের কদর বাড়ে। তখন বিজ্ঞানের হতাশ্বাস এবং বিকৃত রূপটি পরিস্ফুট হয়। অনেক বিজ্ঞানীর অবশ্য ধারণা, ঐসব উদ্দেশ্য না থাকলে সমাজ বিজ্ঞানের পেছনে আদৌ পয়সা ঢালত না। সুতরাং যাঁরা অন্য কোনো ধরনের সমাজব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে পারেন না, তাঁরা স্বভাবতই এই আন্তরিক ও নিশ্চিত ধারণায় উপনীত হন যে সমাজের পক্ষে বিজ্ঞানকে যেকোনো ভাবে চালনা করতে চাওয়ার ফলই অশুভ হতে বাধ্য। তাঁরা তথাকথিত এক আদর্শ অবস্থাকে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবেন, যে অবস্থায় নাকি নিছক বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞানের চর্চা করা হতো। বাস্তবে সেই আদর্শ অবস্থা কিন্তু কোনোদিনই ছিল না। জি· এইচ· হার্ডি বিশুদ্ধ গণিতের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এইভাবে : 'এই বিষয়টি কোনো ব্যবহারিক কর্মে লাগে না : অর্থাৎ এর সাহায্যে মানুষের প্রাণ সরাসরি বিনষ্ট করা যায় না কিংবা বন্টিত সম্পদের বর্তমান অসাম্যকে আরো বাড়িয়ে তোলা যায় না।' ঘটনার প্রবাহ কিন্তু হার্ডির

এই বক্তব্যকে ভুল বলে প্রমাণ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং অতঃপর বিশুদ্ধ গণিতের সহায়তায় হার্ডি-কথিত ঐ দুটি ব্যাপারই বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে। আসলে, ব্যক্তি-বিজ্ঞানীকে চিরকালই অন্য তিন দল লোকের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে কাজ করতে হয়েছে : পৃষ্ঠপোষক, সহকর্মী এবং জনসাধারণ।

বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষণা করেন হয় কোনো ধনী ব্যক্তি না হয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, নতুবা কোনো নিগম বা রাষ্ট্রের কোনো বিভাগ। যেকোনো পৃষ্ঠপোষকেরই কাজ হলো বিজ্ঞানীকে তাঁর জীবনধারণের এবং কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো অর্থ যোগানো। বিনিময়ে, পৃষ্ঠপোষক দাবি করেন বিজ্ঞানীর কাজ নিয়ে কথা বলবার অধিকার, বিশেষ করে পৃষ্ঠপোষকের চূড়ান্ত লক্ষ্য যদি হয় বাণিজ্যিক সুবিধালাভ বা সামরিক সাফল্য। পৃষ্ঠপোষক যদি বিশুদ্ধ মানবহিতৈষণা বা সম্মানলাভ বা বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে চালিত হন, তাহলে অবশ্য বিজ্ঞানীর কাজের মধ্যে তিনি খুব বেশি নাক গলাবেন না; সেক্ষেত্রে তিনি কেবল এইটুকু চাইবেন যে বিজ্ঞানীর কাজ যেন যথোচিত মাত্রায় চমকপ্রদ হয়, অথচ চিন্তাক্ষেত্রে তুমুল কোনো আলোড়ন যেন না জাগায়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষণার ভার তুলে নেয় জনসমর্থনপুষ্ট সরকারের বিভিন্ন বিভাগ। কারখানা বা খামারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেবরেটরি থেকে শুরু করে একেবারে অ্যাকাডেমি-পরিষদ পর্যন্ত সর্বত্রই এই প্রক্রিয়া চালু থাকে। এর ফলে পৃষ্ঠপোষণার চরিত্রে এক আমূল পরিবর্তন আসে। ঐ সরকার বিজ্ঞান সম্পর্কে এক দূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। বস্তুত সে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করাটা তার পক্ষে একেবারে আবশ্যিক। কাজেই বিজ্ঞানীদের কর্ম স্বতই মূল্যবান বলে স্বীকৃতি লাভ করে। স্বভাবতই বিজ্ঞানীদের ভরণপোষণ ও তাঁদের কর্মে সহায়তাদানের কাজটা জাতীয় ও স্থানীয় রাজস্বভাণ্ডারের প্রধান দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হয়। এর বিনিময়ে দাবি করা হয় যে বিজ্ঞানীরা তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হোন, অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর সমাজনির্মাণের পরিকল্পনায় তাঁরা সামিল হোন, এমনভাবে তাঁদের কর্মকে নির্দেশিত করুন যাতে তা দীর্ঘমেয়াদী এবং আশু, উভয় দিক থেকেই শ্রেষ্ঠ ফল দেয়।

সাধারণত একজন বিজ্ঞানীকে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের কাছে তাঁর প্রস্তাবিত প্রকল্পটিকে বাস্তবসাধ্য বলে প্রমাণ করে পৃষ্ঠপোষণা আদায় করতে হয়। কিন্তু কয়েকজন সহকর্মীর কাছ থেকে অন্ততপক্ষে অনুক্ত সমর্থনের আশ্বাস না পেলে তাঁর পক্ষে এ কাজ করা শক্ত। এইসব সহকর্মীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংঘের সদস্য। এগুলির কাজ হলো বিজ্ঞানের মননগত মান বজায় রাখা। কিন্তু বিজ্ঞানের কোন কোন ক্ষেত্রে কতটুকু কাজ করা দরকার সেটা নির্ধারণ করার ব্যাপারে এগুলোর তেমন কোনো উদ্যোগ থাকে না; সে ক্ষমতাও তাদের থাকে না। একমাত্র যেখানে বিজ্ঞানচর্চা পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হয়, সেখানেই এর ব্যতিক্রম ঘটে।

শেষ বিচারে জনগণই বিজ্ঞানের তাৎপর্য ও মূল্যের চরম নিয়ন্তা। যেখানেই বিজ্ঞানকে বিশেষভাবে মনোনীত দুচারজন লোকের অধীন একটি রহস্যরূপে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেখানেই তা অবধারিতরূপে শাসকশ্রেণীসমূহের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। যার ফলে, জনগণের চাহিদা এবং ক্ষমতার মধ্যে থেকে যে উপলব্ধি, যে প্রেরণা উঠে আসে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বিজ্ঞান। *রয়্যাল সোসাইটির ইতিহাস* (1667) গ্রন্থে বিশপ স্প্র্যাট নিজেকে প্রশ্ন করেছেন : 'এবম্বিধ ভাগ্য পরিবর্তনের ফলস্বরূপ মানুষের হস্ত-কৃত কৌশলাদি অপেক্ষা মানুষের মস্তিষ্কক্রিয়াজাত বিজ্ঞানাদির ক্ষতি এত অধিক হইল কেন?' উত্তরে তিনি বলছেন, কারণ ঐসব মননক্রিয়াকে 'দর্শনবেত্তাগণ স্বয়ং এই বাস্তব বিশ্ব হইতে নির্বাসন দিয়েছিলেন। অথচ তাহা না করিয়া যদি তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়প্রতীতির অধীন করিয়া রাখা হইত, যদি মনুষ্যজীবনের যাবতীয় ব্যাপারে তাহাদিগের স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ ঘটানো হইত, তাহা হইলে সর্বাধিক

কর্মচঞ্চল এবং সর্বাধিক অজ্ঞতা-লাঞ্ছিত যুগেও তাহাদিগকে সযত্নে রক্ষণ করিবার প্রয়োজন যে অনুভূত হইত, ইহাতে কোনোই সন্দেহ নাই। তাহা হইলে বর্বর মনুষ্যদিগের ধ্বংসের তাণ্ডব হইতে এই সকল বিদ্যা নিশ্চিত রক্ষা পাইত। তাহার প্রমাণ এই যে কৃষিকার্য, উদ্যানচর্চা, রন্ধনকার্য, লৌহ ও ইস্পাত নির্মাণের প্রক্রিয়া, মৎস্যশিকার, নৌচালন এবং ইত্যাকার নানাপ্রকার প্রয়োজনসাধক হস্তকর্ম বর্বরদিগের ধ্বংসক্রিয়া হইতে রক্ষা পাইয়াছে।'

এছাড়া পুঁজিতন্ত্রের বিকাশপর্বের শেষদিকে বিজ্ঞানকে যেভাবে মানুষের শ্রমের বোঝা বাড়ানোর কাজে লাগানো হয়েছে, যেভাবে বেকারত্ব সৃষ্টির ও যুদ্ধের কাজে লাগানো হয়েছে, তাতে খুব স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকদের মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ ও প্রতিকূলতা জেগে উঠেছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যে-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তার পরিসীমা নিতান্ত খণ্ডিত। সত্যিকারের এক জনসম্পৃক্ত আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারলে, তার মূল্য বুঝতে পারলে, তখন বিজ্ঞানের সম্ভাবনা হয়ে ওঠে অমিত। পূর্ণায়ত বিজ্ঞানের সেই অমিত সম্ভাবনার সঙ্গে তুলনায় বর্তমানের এই সীমাবদ্ধ বিজ্ঞানকে এমনকি আধা-বিজ্ঞানও বলা যায় কিনা সন্দেহ।

বিজ্ঞান নামক প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে পূর্ণ উপলব্ধিতে পৌঁছতে হলে প্রাচীনতর বিভিন্ন সামাজিক কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে তার উদ্ভবের প্রণালীটি আগে অনুধাবন করা চাই। অতঃপর বিজ্ঞানে কী কী পরিবর্তন এসেছে, বিশেষত সাম্প্রতিক কালে, তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। এছাড়া বিজ্ঞান নামক প্রতিষ্ঠানটি অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এবং সমাজের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কীভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায় তা নিয়েও আলোচনা করতে হবে।

2. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ

বিজ্ঞান নামক প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব সমাজের এক বাস্তব ঘটনা। এই প্রতিষ্ঠানে একদল মানুষ সমাজের কতকগুলি দায়িত্বভার পালন করবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে কাজ করেন। এঁরা বিশেষ কতকগুলো সাংগঠনিক সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞানে অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ এইসব বাস্তব ঘটনা থেকে চিন্তার মাধ্যমে আহরিত হয়েছে। তাই বিজ্ঞানে অনুসৃত পদ্ধতিসমূহকে প্লেটোর দর্শন-অনুসারী এক ধরনের নিছক ভাবগত রূপ বলে ভুল করার বিপদ আছে। অর্থাৎ এরকম একটা ভুল ধারণা করাব সম্ভাবনা আছে যে প্রকৃতি বা মানুষ বিষয়ে সত্যে উপনীত হবার সঠিক পথ বুঝি একটাই, আর বিজ্ঞানীদের একমাত্র কাজ বুঝি সেই একমেবাদ্বিতীয়ম চিরপথটিকে খুঁজে বার করে তাকেই আঁকড়ে থাকা। এই পরম, অন্যনিরপেক্ষ পথের ধারণাটি যে কত ভুল তা বারংবার বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা বিজ্ঞানে ক্রমাগতই নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। বিজ্ঞানের পদ্ধতি কোনো অপরিবর্তনীয় জিনিস নয়, তা এক বর্ধমান প্রক্রিয়া। এবং বিজ্ঞানের সামাজিক চরিত্র, বিশেষ করে শ্রেণীচরিত্রের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তাকে না বুঝলে সে পদ্ধতিকেও বোঝা যায় না। কাজেই বিজ্ঞানের যেমন কোনো সংজ্ঞা হয় না, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরও তেমনি কোনো সংজ্ঞা হয় না। কতকগুলি মানসিক এবং কতকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সংগঠিত হয়। প্রত্যেকটি পদ্ধতিই নিজ নিজ পর্বে যথেষ্ট কাজ দিয়েছে। কোনো একটা পর্বে যেসব প্রশ্ন নিয়ে অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরি, সেগুলিকে সূত্রবদ্ধরূপে উপস্থাপিত করা এবং অতঃপর তার উত্তর খুঁজে পাওয়া, সে উত্তরের সত্যতা

যাচাই করা এবং কার্যক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করা—এরই মধ্যে দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপযোগিতা প্রমাণিত হয়। অতীতে কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞান আর পদার্থবিদ্যার মতো প্রধানত গণিত-নির্ভর বিজ্ঞানক্ষেত্রে উদ্ভূত প্রশ্নগুলোরই যুক্তিশাসিত উত্তর দেওয়া সম্ভব হতো। অন্যান্য ক্ষেত্রে নিছক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত একেকটি স্বতন্ত্র ফল প্রকৌশলগত দিক থেকে কতটা কার্যকর তাই দিয়েই তার সত্যতার নিশ্চিতি মিলত। পরে রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটল এবং তা সংপরিবর্তিত (modified) হলো। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহযোগে কী করে সমাজের সমস্যা সমাধান করা যায় তা শিক্ষা করছি আমরা।

বিজ্ঞানের বিকাশ নিয়ে আলোচনা যে হারে হয়েছে, বিজ্ঞানের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা সে তুলনায় অনেক কম হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আগে একটা কিছু আবিষ্কার করেন, তারপর ভাবতে আরম্ভ করেন কী করে সে আবিষ্কার ঘটল। বহু ক্ষেত্রেই সে ভাবনা রীতিমতো অপটু। দুর্ভাগ্যবশত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিষয়ে যেসব বই লেখা হয়েছে তার অধিকাংশেরই লেখক হচ্ছেন এমন সব বিজ্ঞানী যাঁদের দার্শনিক বা গাণিতিক সিদ্ধি খুবই উচ্চাঙ্গের হলেও যাঁরা পরীক্ষাকর্মে সিদ্ধহস্ত নন। সত্যি কথা বলতে, খুব খুঁটিয়ে বিচার করলে বলা যায়, আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁরা অজ্ঞ।

পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা

বাস্তব জীবনে, বিশেষত শ্রমনির্ভর পেশাকর্মগুলোতে, নানান পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটে। তাদের থেকে স্বতন্ত্র করে নেওয়ার মধ্যে দিয়েই সক্রিয় বিজ্ঞানীদের অনুসৃত পদ্ধতিসমূহের উদ্ভব ঘটেছে। যে কাজটা করতে হবে আগে সেটা ভালো করে ঠাহর করে দেখে তারপর সেটা সম্পন্ন করার একটা কোনো উপায় বার করা হয়; অতঃপর সে চেষ্টা সফল হলো কিনা তা দেখা হয়। আমরা *পর্যবেক্ষণ* দিয়ে শুরু করি, তারপর *পরীক্ষা* করি। এখন, পর্যবেক্ষণ তো সবাই করে, কী বিজ্ঞানী আর কী অবিজ্ঞানী। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হলো, কী পর্যবেক্ষণ করতে হবে আর কী ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ঠিক এই জায়গাটাতেই বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণের সঙ্গে শিল্পীর পর্যবেক্ষণের তফাৎ। শিল্পী চোখ মেলে যা দেখেন, তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মাধ্যমে তার রূপান্তর ঘটান, তাকে নতুন এক *ভাবসঞ্চারী সৃজনকর্মে* পরিণত করেন। আর বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণের লক্ষ্য হলো তাঁর নিজস্ব আবেগ-অনুভূতি থেকে যতদূর সম্ভব বিযুক্ত করে বিভিন্ন বস্তু এবং সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান করা। তার অর্থ এ নয় যে বিজ্ঞানীর সামনে কোনো সচেতন লক্ষ্য থাকতে পারে না। আদৌ তা নয়। বরং বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে নতুন কিছু আবিষ্কারের জন্য সামনে একটা বাস্তবসম্মত এমনকি ব্যবহারিক লক্ষ্য থাকাটা খুবই প্রয়োজন। সুতরাং আমরা যা বলতে চাইছি তার অর্থ কেবল এই : মানবেতর জগৎ আবেগ-অনুভূতির প্রতি বধির; সেই জগতে কোনো লক্ষ্যসাধন করতে গেলে মানুষের অভিষ্টকে বাস্তব তথ্য আর নিয়মের অধীন করে নিতে হয়।

বর্গীকরণ ও পরিমাপন

সরল পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়া থেকে কালে দুটি কৌশলের উদ্ভব হয় : *বর্গীকরণ* ও *পরিমাপন*। সচেতন বিজ্ঞানের উদ্ভবের আগেই এদের উদ্ভব, বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই দুই কৌশলকে আজ রীতিমতো বিশেষ উপায়ে প্রয়োগ করা হয়। বর্গীকরণ ব্যাপারটাই আজ এমন হয়ে উঠেছে যে তার মধ্যে দিয়েই নতুন নতুন ঘটনাকে অনুধাবন করার প্রথম ধাপটা নিষ্পন্ন হয়ে যায়। কেননা

ঘটনাবলীকে ঠিকভাবে সাজিয়ে নিতে না পারলে তাদের নিয়ে এক পাও এগোনো যাবে না। এই ঠিকভাবে সাজিয়ে নেওয়ার পথে পরবর্তী ধাপ হলো পরিমাপন। গণনকার্য হচ্ছে একটি সমাহারের সাপেক্ষে অন্য একটি সমাহারকে সাজিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া—শেষ বিচারে হাতের আঙুলের সাপেক্ষে। একটি প্রমাণ সমাহারের (standard collection) যতগুলো একককে জড়ো করলে কোনো কিছুর ওজন বা মাপের সমান হয় তার সংখ্যা গণনার নামই হচ্ছে পরিমাপন। এই পরিমাপন ব্যাপারটির সূত্রেই বিজ্ঞান একদিকে গণিতের সঙ্গে, অন্যদিকে বাণিজ্যিক ও যান্ত্রিক প্রয়োগকর্মের সঙ্গে যুক্ত। এই সূত্র ধরেই সংখ্যা এবং আকার বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ করে। একটা নির্দিষ্ট অবস্থাকে পুনরায় সংঘটিত করতে হলে এবং কোনো ঈপ্সিত ফল পেতে হলে কী করতে হবে তাও এই পরিমাপের দৌলতেই নিখুঁতভাবে নির্দেশ করা সম্ভব হয়।

এই ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের ক্রিয়াপর দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই দিকটিকেই বলা হয় 'পরীক্ষা'। পরীক্ষা শব্দটার মানে হচ্ছে যাচাইকরণ বা সত্যাসত্য নিরূপণ। গোড়ার দিকে পরীক্ষা ব্যাপারটা ছিল সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য যথামাত্রায় পরিচালিত প্রক্রিয়া। কিন্তু পরিমাপনের প্রবর্তন ঘটার পর সেইসব প্রক্রিয়াকে নিখুঁতভাবে বারবার ঘটিয়ে তোলা তো সম্ভব হলোই, উপরন্তু সেই সব প্রক্রিয়াকে ছোটো মাত্রায় সংঘটিত করা সম্ভব হলো। এই পদক্ষেপটি ছিল রীতিমতো সাহসিক। ছোটো মাত্রায় সংঘটিত এই পরীক্ষা ব্যাপারটিই আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। ছোটো মাত্রায় পরীক্ষা চালানোর সুবিধে হচ্ছে, একই সময়ে অনেকগুলো পরীক্ষা চালানো সম্ভব হয়, এবং তার খরচও অনেক কম পড়ে। বৃহদাকার একটি বা দুটি যথামাত্রায় পরিচালিত পরীক্ষার তুলনায় অনেক বেশি মূল্যবান ফল পাওয়া যায় এইসব ছোটো মাত্রার পরীক্ষা থেকে—গণিতের সহায়তায়। যাবতীয় পরীক্ষাই শেষ বিচারে দুটি অতি সরল ক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয় : আলাদা করে ফেলা এবং ফের জোড়া লাগানো। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এদেরই নাম *বিশ্লেষণ* আর *সংশ্লেষণ*। কোনো একটা জিনিসকে বা প্রক্রিয়াকে যদি টুকরো টুকরো করে না ফেলা যায়, তাহলে তাকে একটা অখণ্ড আস্ত ব্যাপার হিসেবে কেবল পর্যবেক্ষণ করে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার থাকে না। আবার টুকরোগুলোকে জোড়া লাগিয়ে আস্ত ব্যাপারটাকে পুনরায় চালু করতে না পারলে কিছুতেই বোঝবার উপায় নেই বিশ্লেষণের ফলে নতুন কিছু তার মধ্যে ঢুকে গেছে কিনা, বা কোনো কিছু বাদ পড়ে গেছে কিনা।

পরীক্ষার যন্ত্রপাতি

এইসব ক্রিয়া সংঘটনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা শত শত বছর ধরে নানারকম যন্ত্রপাতির এক পূর্ণাঙ্গ সমাহার গড়ে তুলেছেন। এসবের মধ্যে কিন্তু রহস্যময় কিছু নেই। দৈনন্দিন জীবনে যেসব যন্ত্রপাতি বা জিনিসপত্র আমরা ব্যবহার করে থাকি সেগুলোকেই বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বিজ্ঞানে। যেমন মুচি (crucible) জিনিসটা হচ্ছে একটা সরা; ফরসেপ্‌স জিনিসটা আমাদের চিরপরিচিত সন্না বা চিমটে। অপরদিকে, অনেক সময় নিতান্তই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় যন্ত্র বা জিনিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ক্যাথোড রশ্মিনল একটা নিখাদ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, যার সাহায্যে ইলেকট্রনের ভর মাপা হয়। অথচ এই যন্ত্রটিই আজ আধুনিক টেলিভিশন রূপে আমাদের ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিম্নলিখিত দুটি প্রধান ক্রিয়ার মধ্যে অন্তত একটি ক্রিয়া সম্পাদন করে : দূরবীক্ষণ বা ধ্বনিগ্রাহকের মতো যন্ত্রের কাজ হলো বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ইন্দ্রিয়গৃহীত অবধারণাকে প্রসারিত করা বা তাকে

আরো নিখুঁত করে তোলা; আর অতিক্ষুদ্র পদার্থকে নিয়ন্ত্রণ করার নানাবিধ যন্ত্র কিংবা পাতনযন্ত্র বা জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি ঘটানোর যন্ত্রের (incubator) মতো বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারের কাজ হলো আমাদের পরিপার্শ্বে যেসব জিনিস রয়েছে তাদের ওপর আরো সুনির্দিষ্ট ও সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

নিয়ম, তত্ত্বপ্রকল্প, তত্ত্ব

পরীক্ষালব্ধ ফলাফলই যাবতীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎস। কিংবা বলা যাক, যেসব ক্রিয়া এবং পর্যবেক্ষণের সম্মিলনে পরীক্ষাকার্য সংঘটিত হয়, তার মাধ্যমেই যাবতীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সংগৃহীত হয়। তাই বলে সে জ্ঞান কিন্তু পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের একটি তালিকা মাত্র নয়। তা যদি হতো তাহলে যে-প্রকৃতি থেকে বিজ্ঞানের সূত্রপাত, সেই প্রকৃতিরই মতো বিজ্ঞানকেও বাগে আনা বা বোঝা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। ঐসব ফলাফলকে কাজে লাগাতে হলে তাদের সাজিয়ে নিতে হয়, আলাদা আলাদা দলে ভাগ করে নিতে হয়, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত করে নিতে হয়। এটাই হলো বিজ্ঞানের যুক্তিগত দিকের কাজ। অনেক সময় পরীক্ষা থেকে ফলাফল লাভ করার আগেই এই যুক্তিগত দিকটির প্রয়োগ ঘটানো প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানের যুক্তিধারা, গাণিতিক প্রতীক ও সূত্রের ব্যবহার (অতীতে শুধুই নামকরণ)—এই সমস্ত কিছু মিলে বৈজ্ঞানিক *নিয়ম*, *নীতি*, *তত্ত্বপ্রকল্প* (hypothesis) এবং *তত্ত্বের* এক মোটামুটি সুসংবদ্ধ কাঠামো নিরন্তর রচিত হয়ে চলে। এখানেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায় না, বরং এখান থেকেই ক্রমাগত নতুন পথের সূত্রপাত ঘটতে থাকে। কেননা ঐসব তত্ত্বপ্রকল্প এবং তত্ত্বের সূত্র ধরে বিজ্ঞানের *ফলিত প্রয়োগ* ঘটে। সে প্রয়োগের ফল যদি আশানুরূপ হয় তাহলে—এবং আশানুরূপ না হলে তো আরো বেশি করে—তা থেকে নতুন নতুন পরীক্ষা, নতুন নতুন পর্যবেক্ষণ এবং নবনব তত্ত্ব জন্ম নেয়। পরীক্ষা, ব্যাখ্যান আর প্রয়োগ একসঙ্গে এগিয়ে চলে। এর মধ্যে দিয়েই রূপ ধারণ করে বিজ্ঞানের কার্যকর, সজীব এবং সামাজিক অবয়ব।

বিজ্ঞানের ভাষা

পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যানের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের *ভাষা*—কিংবা বলা যাক ভাষানিচয়। বস্তুগঠিত যন্ত্রপাতিরই মতো এই ভাষাও ক্রমে বিজ্ঞানের এক অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এবং ঐ যন্ত্রপাতিরই মতো, বিজ্ঞানের এই ভাষা যে স্বভাবতই অদ্ভুত তা নয়। সাধারণ ভাষা থেকেই তা আহরিত। অনেক সময় সাধারণ ভাষার ভাণ্ডারে তা ফিরেও আসে। ইংরেজি cycle কথাটা গ্রীক *kuklos* থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ চাকা। পুনরাবৃত্ত ঘটনাচক্রের বিমূর্ত অর্থবহ শব্দ রূপে বহুকাল বিরাজ করার পর এই cycle শব্দটি অবশেষে ধরাধামে ফিরে আসে সাইকেল বা 'বাইসিক্‌ল' রূপে। প্রাচীন গ্রীস বা রোমের অধুনাবিস্মৃত ভাষায় যেসব শব্দ অতিপ্রচলিত ছিল তাদের আজ বৈজ্ঞানিক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করার একটা মস্ত সুবিধে এই যে এর ফলে শব্দের সাধারণ অর্থের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অর্থকে গুলিয়ে ফেলার বিপদ এড়ানো যায়। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের জন্য স্বতন্ত্র শব্দ না থাকায় সেকালের গ্রীক বিজ্ঞানীদের খুব অসুবিধে হতো। সাদা ভাষায় অনেক ঘুরপথে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করতে হতো; 'হনু-নিম্নবর্তী গ্রন্থি'র (sub-maxillary gland) বদলে বলতে হতো 'চোয়ালের নিচের ওকফল-আকৃতির ডেলা'। তবে বিশেষ ভাষা ব্যবহারের যেমন সুবিধে আছে তেমনি অসুবিধেও আছে। এর ফলে দ্ব্যর্থহীনভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা সম্ভব হয় ঠিকই, কিন্তু বিশেষ পরিভাষা-মালা গড়ে ওঠার দরুন সাধারণ অবিশেষজ্ঞ মানুষ বিজ্ঞান

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক সময় ইচ্ছে করেই এই বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা হয়। এইভাবে বেড়া তোলাটা মোটেই আবশ্যিক নয়। বৈজ্ঞানিক ভাষা অতীব কার্যকর, তাকে বর্জন করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কলকব্জার মতো বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাও যখন দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ অঙ্গ হয়ে উঠবে, তখন বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও সাধারণ ভাষার অঙ্গ হয়ে উঠবে। ওঠেও।

বিজ্ঞানের পরিকল্পনা

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়ে ইতিপূর্বে যে আলোচনা করেছি তা কেবল বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির *কর্মকৌশলের* মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নানাবিধ সমস্যার সমাধান করা, এবং সেসব সমাধান যাতে কার্যকর হয় তা মোটামুটি সুনিশ্চিত করাই হচ্ছে সে পদ্ধতির মূল কথা। কিন্তু বিজ্ঞান সুদীর্ঘ একেকটি কালপর্ব জুড়ে সামগ্রিকভাবে কীভাবে এগিয়ে চলে, তাব ব্যাখ্যা কেবল এর সাহায্যে দেওয়া যায়না, বলাই বাহুল্য। সুতরাং ব্যাখ্যার পূর্ণতা আনবার জন্য বিজ্ঞানের সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা নিয়ে দুকথা বলা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটানোর জন্য সচেতন একটা কর্মপরিকল্পনা যে একেবারে আবশ্যিক তা নয়। বস্তুত অতীতে কোনো সচেতন দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেছিল, তা বলা যায় না। কিন্তু আমরা দেখাব যে তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের অগ্রগতি মোটেই কোনো নিয়মহারা যদৃচ্ছ পথে ঘটেনি। সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনার মতো একটা কিছু সর্বদাই বিজ্ঞানের অগ্রগতির পেছনে সদা সক্রিয় ছিল, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অচেতনভাবে, কিন্তু কখনো কখনো সচেতনভাবেই।

কোন কোন সমস্যার সমাধান করতে হবে তার পরম্পরা বা ক্রমটি বেছে নেওয়াই হলো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনার মূল অঙ্গ। কোন সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন সেটা বুঝতে পারার কাজটা সমস্যার সমাধান বার করার চেয়েও অনেক কঠিন। কেননা সমাধান বার করার জন্য প্রয়োজন উদ্ভাবনীশক্তি; আর সমস্যা নির্বাচন করার জন্য চাই কল্পনাপ্রতিভা। এই অর্থেই কোসাম্বি (1907-66) বলেছিলেন, বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হলো : *আবশ্যিকতার জ্ঞান*। কার্যক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সামগ্রিক অগ্রগতির মূলে যে ঘটনাটার গুরুত্ব সর্বাধিক তা হলো: বাস্তব অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দ্বারা নির্ধারিত সমস্যাবলীর সমাধানের প্রয়াস। পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিক ভাবধারা থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলীর চর্চাও বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার ভূমিকা আপেক্ষিক বিচারে গৌণ। একেকটি বিশেষ কালপর্বে সাধারণত একেক গুচ্ছ সমস্যা মানুষকে বিশেষভাবে প্রণোদিত করে। প্রাচীন গ্রীসের ডেল্‌ফি-তে ঘনাকৃতি বেদির আয়তন দ্বিগুণ করার সমস্যার সমাধানকল্পে ঘনমূল (cube root) নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়। দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করার সমস্যার সমাধানের প্রয়াসের মধ্যে দিয়েই নিউটনের সূত্রাবলীর আবিষ্কার ঘটে। ফ্রান্সে রেশমগুটির অসুখ সারাতে গিয়ে পাস্তুর রোগের জীবাণুতত্ত্বের ধারণায় উপনীত হন। মুশকিল হচ্ছে এই যে বিজ্ঞানে ঐরকম স্বীকৃত মূল্যবান সমস্যা খুব বেশি পাওয়া যায়না। তাই একের পর এক প্রজন্ম ধরে বিজ্ঞানীরা একই সমস্যার সমাধানেই নিয়োজিত থাকেন, সেগুলোর সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করে চলেন।

এই প্রবণতাই ইতিহাসের একেকটি সুদীর্ঘ অধ্যায় জুড়ে বিজ্ঞানকে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখে। সেই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরের জীবন থেকে নতুন নতুন সমস্যা খুঁজে নিয়ে তবে বিজ্ঞান নবনব ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে। নিউটন, ফ্যারাডে বা ডারউইনের মতো দিকপাল বিজ্ঞানীরা অতীতে নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে সমস্যা খুঁজে নিয়ে তার সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন ফ্যারাডে তাঁর বিজ্ঞানীজীবনের প্রথম দিকে অলোক, তাপ, বিদ্যুৎ ও

চুম্বকক্রিয়া প্রমুখ স্বতন্ত্র ভৌত প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কসূত্র নির্ণয়ের সামগ্রিক সমস্যাটিকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি এইসব শক্তিসমূহকে জোড়ায় জোড়ায় বিচার করে তাঁর লক্ষ্যসাধনে প্রায় সফলও হয়েছিলেন।

আজকে আমরা বুঝতে পারছি যে ঐসব দিকপাল বিজ্ঞানীরা তাঁদের ব্যক্তিগত সচেতন প্রয়াসে ছোটো আকারে হলেও যে পথে এগিয়েছিলেন সেটা আসলে বিজ্ঞানের সামগ্রিক বিকাশেরই এক অপরিহার্য অঙ্গ। তাই আমরা আজকে নিছক ব্যক্তিগত প্রয়াসের বদলে যৌথভাবে বিজ্ঞানের পরিকল্পনা রচনা করতে পারছি। তা করতে গিয়ে আবার বৃহত্তর একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। একদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা, অন্যদিকে বিজ্ঞানের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বিকাশধারা—এ দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা চাই, এ দুটিকে মেলানো চাই। কিন্তু এ কাজ করতে গেলে, এবং একাজ করতে পারলে যে কত সুবিধে তা বুঝতে গেলে, দেশের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর অনেক বেশি সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তবে এর সুবিধে এতই বেশি যে অবশেষে প্রতিটি দেশই উপলব্ধি করবে যে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে চলতে হলে বিজ্ঞানের সদর্থক এবং সুপরিকল্পিত চর্চা ছাড়া গতি নেই। সুতরাং ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং সমাজজীবনে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ অনেক বেশি যুক্তিশাসিত পথে ঘটবে বলেই মনে হয়, অতীতের মতো নিয়মহারা পথে নয়।

বিবর্তনের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বলা যায়, বিজ্ঞান মানুষের শরীরের সংবেদন-অঙ্গ এবং চলন-অঙ্গগুলির মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটায় সচেতনভাবে। শিক্ষাগ্রহণের অচেতন যেসব প্রক্রিয়া যাবতীয় উন্নততর প্রাণীর মধ্যে সক্রিয়, তাকে বিজ্ঞান চেতনা-সহযোগে সামাজিকভাবে প্রসারিত করে। পশুরাও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করে; কিন্তু বিজ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করবার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়েই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। একইভাবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেও মস্তিষ্কপ্রক্রিয়ার বাহ্যিক প্রসারণ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উন্নত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মস্তিষ্ক বিবর্তিত হতে হতে এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছয় যে তা অতীব জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলায় সক্ষম হয়—যথা শিকার-ঘটিত পরিস্থিতি। সেই মস্তিষ্কপ্রক্রিয়া মানুষের মধ্যে আরো প্রসারিত রূপ লাভ করেছে। তারই বাহ্যিক রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজ্ঞানের তুলনাকরণ, বর্গীকরণ, সামান্যীকরণ (generalization), তত্ত্বপ্রকল্প এবং তত্ত্ব প্রমুখ সূত্রবদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্যে। তবে, পশুদের কার্যকলাপের সঙ্গে মানুষের বৈজ্ঞানিক কৃতির মূল পার্থক্যটা এই যে মানুষের বৈজ্ঞানিক কৃতি নিছক ব্যক্তিগত সিদ্ধির নিদর্শন নয়, তা এক সামাজিক সিদ্ধির নিদর্শন। কর্মরূপ সমবায়িক প্রয়াসের ফলে তার উদ্ভব, এবং তাকে সমন্বিত করে *ভাষা*।

বিজ্ঞান ও চারুশিল্প

পশুদের ক্ষেত্রে দেহজ ক্ষমতার এই প্রসারণ ঘটে এসেছে নিরবচ্ছিন্ন, প্রায়-স্বয়ংক্রিয় এক প্রাকৃতিক বিবর্তন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কিন্তু বিজ্ঞানের মারফত মানুষের ক্ষমতার প্রসারণ আর ঐ ভাবে ঘটেনা। মানুষের ক্ষেত্রে সে প্রসারণ অবশ্যই নানাবিধ সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে একের পর এক সামাজিক শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম ও সংঘাতের মধ্যে দিয়ে বিকাশ লাভ করে বিজ্ঞান। কিন্তু, বিজ্ঞান সমাজ থেকে *অবিচ্ছেদ্য*—এই কথাটাকে এক মুহূর্তের জন্যে ভুলে না গিয়েও আমরা বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডের (যথা চারুশিল্প বা ধর্মের) পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আরেকটু বিমূর্তভাবে আলোচনা করতে পারি। সে আলোচনা হয়তো ফলপ্রদ হতে পারে। বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড মানুষের অন্যান্য

সামাজিক কর্মকাণ্ডের চেয়ে মূলত স্বতন্ত্র এই কারণে যে বিজ্ঞান প্রধানত *কীভাবে* কোনো কাজ করতে হবে তা নিয়ে ব্যাপৃত; কর্ম সম্বন্ধে ক্রমসঞ্চীয়মান জ্ঞানের ভাণ্ডারের সঙ্গে তা সম্পর্কিত। সর্বোপরি, উৎপাদনের উপকরণকে, অর্থাৎ মানুষের বিবিধ চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রকৌশলকে আয়ত্ত করা, নিয়ন্ত্রণ করা এবং রূপান্তরিত করার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান গড়ে ওঠে।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রথমটিকে আমরা এই ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি যে বিজ্ঞানের মার্গটি হচ্ছে *নির্দেশাত্মক;* কেননা যে কাজটা করতে চাই তা কীভাবে করতে হবে সেটা নির্দেশ করে বা দেখিয়ে দেয় বিজ্ঞান। কিন্তু, এই কাজটা করতে চাই না, ঐটা করতে চাই—মনের এই ইচ্ছেটাকে জাগিয়ে তোলা তার কর্ম নয়। প্রকৃত অর্থে সেই ইচ্ছে জাগিয়ে তোলার কাজটা করে *শৈল্পিক মার্গ,* যা বৈজ্ঞানিক মার্গের মতোই সমাজ-সম্ভূত। মনের মধ্যে আগে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা, তারপর সুনির্দিষ্ট ক্রিয়ার প্রণোদনা জাগানো—এই হলো তার অন্যতম কাজ। এ দুটি মার্গ অবশ্য পরস্পরের পরিপূরক। কী বিজ্ঞানে আর কী শিল্পে, এ দুটি মার্গ সর্বদাই একে অপরের মধ্যে মিশে থাকে। একজন ব্যক্তির কাছে বিজ্ঞান বা চারুশিল্পের গুরুত্ব কেবল এই দুই মার্গের পরিসীমার মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায় না। কেননা, কথা, ধ্বনি কিংবা বর্ণের নবনব সমন্বিত রূপের ধ্যানের মধ্যে, বিশেষত সেইসব সমন্বয়কে গড়ে তোলার মধ্যে, কিংবা প্রকৃতিতে বিদ্যমান নানাবিধ রূপের সমন্বয়কে আবিষ্কার করার মধ্যে একটা নিজস্ব তৃপ্তি পাওয়া যায়। সে তৃপ্তি দুই প্রণালীর গণ্ডিকে ছাপিয়ে যায়। বস্তুত সে তৃপ্তি যাবতীয় মানবিক কৃতির মধ্যেই অভিন্নরূপে বর্তমান। এই তৃপ্তির অনুভব প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিরই, কিন্তু তা কখনোই নিছক ব্যক্তিগত আবেগ নয়। যেহেতু ব্যক্তির মূল আগ্রহের উৎস হলো সমাজ, তাই ধ্যানাত্মক ক্রিয়াও যে আসলে সামাজিক ক্রিয়া, তাতে আর সন্দেহ কী। তার প্রমাণ এই যে বিজ্ঞানীই হোন আর শিল্পীই হোন, উভয়েই নিজ নিজ রচনা প্রকাশ করার তীব্র আকৃতি অনুভব করেন।*

প্রত্যেকটি বিজ্ঞানকর্মের একটি উদ্দেশ্য থাকে এবং সেই উদ্দেশ্য আবার অপর একটি উদ্দেশ্যের জনক। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটিকেই উক্ত বিজ্ঞানকর্মের সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা যায় না। এমনকি বিজ্ঞানকর্মের মধ্যে যে সুষমা থাকে, তা যে-তৃপ্তির বোধ জাগিয়ে তোলে, তাকেও তার সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা চলে না। বিজ্ঞানকর্মের যে বৈশিষ্ট্যটি তার নিখাদ বৈজ্ঞানিক চরিত্রের পরিচায়ক সেটি হলো এই যে তা এক কার্যপদ্ধতির বিবরণ—অর্থাৎ বিশেষ কোনো কাজ করতে চাইলে সেটা কীভাবে করতে হবে তা বলে দেয় বিজ্ঞানকর্ম। অপরদিকে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে শিল্পকর্ম হচ্ছে এমন একটা কিছু যা নিছক নড়েচড়ে বেড়ায় বা আনন্দ দেয়। প্রতিটি শিল্পকর্মের মধ্যেই জগৎ সম্বন্ধে এবং

* অধ্যাপক হলডেনের প্রস্তাবিত সূত্রের অনুসরণে এবং পশুদের বার্তাবিনিময় সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে এই দুই মার্গের পার্থক্যটিকে অনেক পিছনে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। চারুশিল্পের মার্গটি সবচেয়ে আদিম, প্রাক্-মানবীয়, প্রায় প্রাক্-সামাজিক বলে মনে হয়। পাখিরা ভাষাকে জাদুসদৃশ এবং ক্রিয়া-প্রণোদক পদ্ধতিতে ব্যবহার করে। এর জন্য তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ আবেগের স্তর কিংবা ক্রিয়া-প্রস্তুতি নির্দেশ করে। বহির্জগতের ঘটনাবলীর অভিঘাতেই তারা এই আচরণ করে। কিন্তু তারা সে ঘটনাবলীর কোনো বিবরণ দেয়না। হলডেনের মতে ঐ বিবরণটিই হলো খাঁটি মানবীয় ভাষার নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য। মানবীয় ভাষায় কর্মের জাদুসদৃশ আহ্বানের সঙ্গে যুক্ত হয় বিবরণের ঐ বৈজ্ঞানিক উপাদান। ধীরে ধীরে এই দুই মার্গ পরস্পরের মধ্যে মিশে যায়। 'চলো, মাছ ধরতে যাই'—এই বাক্যটির মধ্যে জাদুমন্ত্রসুলভ এবং শৈল্পিক মার্গের পরিচয় আছে। কিন্তু 'ঐ পুকুরটায় গত বছর মাছ ছিল'—এই বাক্যটি, যা হয়তো পূর্বোক্ত বাক্যটির পরেই উচ্চারিত হবে, তা নির্দেশাত্মক বা বৈজ্ঞানিক মার্গের। এই সমস্ত ভাবনা অবশ্য খুবই নির্বিশেষ চরিত্রের। ইতিহাসের গতিপথে উভয় মার্গেরই স্বয়ংস্বতন্ত্র বিকাশ ঘটেছে। একটা উপন্যাসের সঙ্গে একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রের যতটা মিল, আদিম আচারবিধি-নৃত্যের সঙ্গে ততটা নয়।—জে· ডি· বি

সে জগতে বাস করার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অমূল্য সব তথ্য থাকে—বিশেষ করে উপন্যাসের মতো শিল্পকর্মে, যা সমাজসমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত।

বিজ্ঞানের এইসব বিমূর্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করার বিপদ হচ্ছে, বিমূর্ত বৈশিষ্ট্যকেই বিজ্ঞানের আদর্শ বৈশিষ্ট্য বলে ভুল করার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ এমন মনে হতে পারে যে সামাজিক নৈতিকতা বা কার্যকারিতার মতো 'পরিহার্য' ব্যাপারগুলোকে ছেঁটে ফেলতে পারলেই বুঝি বিজ্ঞান এক আদর্শ রূপ ধারণ করবে। বস্তুত, 'বিশুদ্ধ' বিজ্ঞানের, অর্থাৎ সত্যের জন্যেই সত্য অনুসন্ধানের আদর্শটি একটা বিশেষ সামাজিক মনোভঙ্গির খুব সচেতনভাবে ব্যক্ত রূপ। এই আদর্শটি বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে প্রভূত ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। এই আদর্শই বিজ্ঞানকে আচ্ছন্নতাবাদীদের হাতে, প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেছে। একথাটা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞান একমাত্র তখনই পূর্ণতা অর্জন করে যখন তা লক্ষণ অনুসরণ করে এগোয়। বিজ্ঞান শুধুই বিশুদ্ধ চিন্তার ব্যাপার নয়; চিন্তাকে ক্রমাগত অনুশীলনে পরিণত করা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রমাগত সঞ্জীবিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান এগিয়ে চলে। সেই কারণেই প্রকৌশলকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের চর্চা অসম্ভব। বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা বারংবার দেখতে পাই প্রয়োগের মধ্যে থেকে বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিকের উদ্ভব ঘটেছে, আবার বিজ্ঞানের নবনব বিকাশ প্রয়োগের নতুন নতুন পথ খুলে দিয়েছে। যেমন আধুনিক এনজিনিয়ারিং ব্যাপারটা প্রধানত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলেই উদ্ভূত হয়েছে। 'বৈদ্যুতিক' এনজিনিয়ারিং,'রসায়নিক' এনজিনিয়ারিং, 'রেডিও' এনজিনিয়ারিং প্রভৃতি নাম থেকেই বোঝা যায়, এরা একদা বিজ্ঞানেরই শাখা ছিল, কিন্তু বর্তমানে প্রয়োগকর্মের একেকটি স্বতন্ত্র শাখায় রূপ লাভ করেছে।

বিজ্ঞানী ও এনজিনিয়ার

এনজিনিয়াররা বিজ্ঞানীদের মধ্যে থেকেই সম্ভূত, এবং উভয়ের মধ্যে যোগ উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হয়ে চলেছে, একথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে দুটি কর্মক্ষেত্র একাকার হয়ে যায়নি। বিজ্ঞানী আর এনজিনিয়ারের ক্রিয়াগত দিক দুটি পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কী করে একটা কাজ করা যাবে তার পথ খুঁজে বলে দেওয়াটাই হচ্ছে বিজ্ঞানীর পরম দায়িত্ব; আর কার্যক্ষেত্রে সে কাজটা নিষ্পন্ন করার ভার এনজিনিয়ারের। প্রয়োগগত দিক থেকে এনজিনিয়ারের দায়িত্ব বিজ্ঞানীর চেয়ে অনেক বেশি। বিমূর্ত তত্ত্বের ওপর অত বেশি নির্ভর করলে এনজিনিয়ারের চলেনা; অতীত অভিজ্ঞতার যুগসঞ্চিত ধারণাসম্ভারের ভিত্তিতে যেমন তাঁকে নির্মাণকার্য চালাতে হয়, তেমনি তারই পাশাপাশি নতুন নতুন ধারণা পরখও করতে হয়। এনজিনিয়ারিঙের কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ভূমিকা এখনো প্রাক-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার তুলনায় গৌণ। যেমন, আধুনিক জাহাজের এনজিনে এবং নানারকম নিয়ন্ত্রণ-কৌশলে আধুনিক বিজ্ঞানের যতই প্রয়োগ ঘটুক, জাহাজ নির্মাণ যাঁরা করেন তাঁরা আজও আগেকার দিনের জাহাজ তৈরির অভিজ্ঞতাকেই পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি, সেই প্রাচীন কালের গাছের গুঁড়ি খোঁদল-করে বানানো ক্যানু নৌকো থেকে আরম্ভ করে আজকের এই মহাকায় যাত্রী-জাহাজ নির্মাণের যুগ পর্যন্ত একটা অবিচ্ছিন্ন প্রকৌশল-ঐতিহ্যের ধারা সক্রিয় রয়েছে। প্রচলিত প্রকৌশল-ঐতিহ্যের সুবিধে এই যে তা কখনো খুব একটা ব্যর্থ হতে পারেনা; অতীতে যদি তা কাজ দিয়ে থাকে, তবে বর্তমানেও তা কার্যকর হওয়ারই সম্ভাবনা। আবার অসুবিধে এই যে সে ঐতিহ্য বাঁধা পথ ছাড়তে পারে না। আপন শক্তিতে এনজিনিয়ারিং ধীরস্থিরভাবে প্রকৌশলের একের পর এক উন্নতি ঘটাতে নিশ্চয়ই সক্ষম; কিন্তু বড়োরকমের কোনো রূপান্তর ঘটাতে হলে বিজ্ঞানের সাহায্য তার অবশ্যই চাই। জে· জে· টমসনের কথায়: 'ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণা

সংস্কার ঘটায়; আর তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের গবেষণা আনে বিপ্লব।' উল্টোদিকে এনজিনিয়ারিঙের সাফল্য, বিশেষ করে এনজিনিয়ারিঙের নানাবিধ সমস্যাদি, বিজ্ঞানের সামনে ক্রমাগত নতুন নতুন সম্ভাবনার ও সমস্যার ক্ষেত্র উন্মোচন করে চলে। বিজ্ঞান আর এনজিনিয়ারিঙের ভূমিকা পরস্পরের পরিপূরক। অর্থাৎ এদের যে কোনোটির সামাজিক অভিঘাত সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা অর্জন করতে গেলে দুটিকেই অনুধাবন করা প্রয়োজন।

3. বিজ্ঞানের ক্রমসঞ্চিত ঐতিহ্য

সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে বিজ্ঞান ও তার চরিত্র নিয়ে এতক্ষণ যে আলোচনা করেছি, তাতে বিজ্ঞানের একটা দিক নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলিনি। সেটা হলো: বিজ্ঞানের ক্রমসঞ্চিত রূপ। এই বৈশিষ্ট্যটিই মানুষের অন্য যাবতীয় সামাজিক কীর্তির সাপেক্ষে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত অগ্রগতিকে এক স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছে। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার এক বিপুল সঞ্চয় যদি বিজ্ঞানীর হাতে আগে থেকেই মজুত না থাকে তাহলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে কিছুই লাভ হবে না। সে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার কোনোটাই পুরোপুরি অভ্রান্ত নয়; কিন্তু অন্তত এতদূর অভ্রান্ত যে তার ওপর দাঁড়িয়ে সক্রিয় বিজ্ঞানীর পক্ষে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য কাজ করা সম্ভব। বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডারটি নিয়তবর্ধমান। মনীষী এবং কর্মীদের ভাবনাচিন্তা আর ভাবধাবার, বিশেষত অভিজ্ঞতা আর ক্রিয়াশীলতার পরম্পরাবাহিত বিপুল স্রোত সে ভাণ্ডারকে পুষ্ট করে তোলে। যা জানা হয়ে গেছে শুধু সেটুকু জানাই যথেষ্ট নয়; নিজেকে যিনি বিজ্ঞানী নামে অভিহিত করতে চান, তাঁকে সেই সর্বজনীন জ্ঞানের ভাণ্ডারে নিজস্ব কিছু অবদান যোগ করতে হবে। যেকোনো বিশেষ সময়পর্বের বিজ্ঞান বলতে বোঝায় সেই কাল পর্যন্ত বিজ্ঞানে যা কিছু ঘটেছে তার যোগফল। কিন্তু সে যোগফল স্থাণু নয়। বিজ্ঞান কেবল জ্ঞাত তথ্য, নিয়ম আর তত্ত্বের এক সরল সমাহার নয়। বিজ্ঞানের তথ্য, নিয়ম আর তত্ত্ব সমালোচনার মধ্যে দিয়ে যেমন অনেক কিছু গড়ে তেমনি ভাঙেও। তবু বিজ্ঞানের সৌধটির সামগ্রিক বিকাশ কখনো রুদ্ধ হয়না। বলা যেতে পারে, সে সৌধটির সংস্কারের কাজ কখনো থামেনা; অথচ সেকাজের জন্য তার ব্যবহার এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ রাখতে হয়না।

বিজ্ঞানের এই ক্রমসঞ্চিত রূপটিই বিজ্ঞানকে ধর্ম, আইন, দর্শন বা শিল্পকলার মতো অন্যান্য বৃহৎ মানবিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তুলনায় এক স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠানেরও নিজস্ব ইতিহাস আর ঐতিহ্য রয়েছে, এবং তা বিজ্ঞানের চেয়ে ঢের পুরোনো; সেসবের প্রতি বিজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়, তার খাতিরও অনেক বেশি। তবু এইসব প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস আর ঐতিহ্যকে মূলগত বিচারে ক্রমসঞ্চীয়মান বলা চলেনা। ধর্ম এক 'চিরায়ত' বা 'শাশ্বত' সত্যের সংবক্ষণে ব্যাপৃত; আর শিল্পকর্মে ব্যক্তিগত কৃতিটাই ঘরানাকে ছাপিয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানী সর্বদাই সচেতনভাবে স্বীকৃত সত্যকে বদলে নিতে প্রয়াসী। বিজ্ঞানের সর্বজনীন ভাণ্ডার বিজ্ঞানীর নিজস্ব কাজকে অচিরেই আত্মসাৎ করে, তার উন্নতি ঘটায়। ফলে বিজ্ঞানীর কাজের ব্যক্তিগত চরিত্র আর বজায় থাকে না। অতীতের মহৎ শিল্পকর্ম, সাহিত্য বা সংগীতকে মূলে অথবা অনুবাদে অথবা অবিকল প্রতিরূপের মধ্যে দিয়ে উপভোগ করেন কেবল কবিরা বা শিল্পীরা নন, গোটা দেশের মানুষ। এসবের মানবিক আবেদন প্রত্যক্ষ, তাই এরা সতত সজীব। কিন্তু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহৎ বৈজ্ঞানিক রচনা পাঠ করেন কারা? মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞানী আর বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদ ছাড়া আর প্রায় কেউ না। এইসব মহৎ রচনার বৈজ্ঞানিক ফলাফল সবই বিজ্ঞানের বর্তমান জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে, কিন্তু মূল রচনাগুলি

বিস্মৃতিগহ্বরে সমাধিস্থ হয়ে যায়। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কসূত্রাদি, তথ্যাবলী, নিয়মাবলী এবং তত্ত্বসমূহ—এগুলোকে জানাই অধিকাংশ কার্য সমাধা করার পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু কীভাবে তাদের আবিষ্কার ঘটেছিল, কীভাবে তারা লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তা জানার প্রয়োজন হয় না।

এছাড়া ধর্মের ও শিল্পসাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের, বিশেষত প্রকৃতিবিষয়ক বিজ্ঞানের, আরেকটা বড়ো পার্থক্য আছে। ধর্ম ও শিল্পসাহিত্যের ঐতিহ্যকে এক অর্থে নিয়মহীন বলা যেতে পারে। কারণ এইসব ক্ষেত্রের চূড়ান্ত বিচার হয় অন্তরে লব্ধ প্রত্যাদেশের নিরিখে কিংবা মৌখিক বা লিখিত পরম্পরাবাহিত ধারণার নিরিখে। এদের যদি কোনো যুক্তিশাসিত ন্যায্যতার দাবি থাকে তো তার ভিত্তি হলো ভাববাদী যুক্তি। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের সত্যতাকে, এবং যে করণকৌশল থেকে বিজ্ঞানের উদ্ভব তার ঐতিহ্যের সত্যতাকে, সরাসরি পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে বাজিয়ে নেওয়া যায়। সেসব পর্যবেক্ষণ এই বস্তুগঠিত জগতেই যাচাইযোগ্য এবং তাদের পুনরাবৃত্তি ঘটানো সম্ভব। বিজ্ঞানের যে কোনো অবদান, তা সে যত পুরোনো বা যত নতুনই হোক, তাকে যে কোনো সময়ে সুনির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি সহযোগে সুনির্দিষ্ট পদার্থসমূহের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে যাচাই করে নেওয়া সম্ভব। বেকন বহু আগেই বলেছিলেন যে বিজ্ঞানের সত্য নিহিত থাকে তার প্রয়োগের মধ্যে: বস্তুগঠিত সিস্টেমের মধ্যে তার প্রয়োগ ঘটে (সে সিস্টেম জড় পদার্থে গঠিত হলে তার প্রয়োগ ঘটে ভৌতবিজ্ঞানে, আর সপ্রাণ জীবদ্বারা গঠিত হলে জীববিজ্ঞানে); অথবা ঘটে মনুষ্যগঠিত সমাজে, অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানে। এই শেষোক্ত বিজ্ঞানক্ষেত্রটিতে পরীক্ষা ঘটে নামমাত্র; সেইজন্যেই তা এখনো খাঁটি বিজ্ঞানের মর্যাদা অর্জন করেনি। এই অর্থে 'বিজ্ঞান' কথাটা ব্যবহার ক'রে আমরা মানুষের জ্ঞানের সেই অংশটিকেই চিহ্নিত করতে চাইছি যা বাস্তব প্রয়োগকে সরাসরি উন্নত করে তোলার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জন করেছে, এবং যা নিছক প্রত্যক্ষ ঘটনার সুশৃঙ্খল বিবরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রাচীন গ্রীকদের যেমন গণিত আর জ্যোতির্বিজ্ঞান ছিল, তেমনি ছিল জীববিজ্ঞান, এমনকি একধরনের সমাজতত্ত্ব। তফাৎ এই যে প্রথম দুটির প্রয়োগে তারা নগর-পরিকল্পনা কিংবা মহাকাশের ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত; কিন্তু শেষোক্ত দুটির সাহায্যে তারা সুশৃঙ্খল পণ্ডিতি ভাষায় জ্ঞানদান করত এমন সব জিনিস সম্পর্কে যা সেসময়ের প্রত্যেকটি চাষী, ধীবর কিংবা রাজনীতিবিদের জানা ছিল। বিজ্ঞানসম্মত জীববিজ্ঞান, যা চিকিৎসাকার্যে সত্যিই সহায়ক, তার উদ্ভব কার্যত উনিশ শতকের আগে ঘটেনি। আর বিজ্ঞানসম্মত সমাজতত্ত্বের উন্মেষ তো ঘটছে সবে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং প্রকৌশল যে-যে ধাপের মধ্যে দিয়ে আহরিত হয়েছে তা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত হবে, যদিও তার সবিস্তার আলোচনা আমরা করব না। সঠিক অর্থে সে আলোচনা করাটাই বিজ্ঞানের ইতিহাসের অন্যতম কাজ। তবু এই বইয়ের সেরকম কোনো দাবি নেই। বিজ্ঞানের ঐরকম কোনো বিশ্লেষণাত্মক ইতিহাস আজও লেখা হয় নি। সে ইতিহাস নিছক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিবরণ হবে না, তা বিবরণকে অতিক্রম করে গিয়ে আবিষ্কারের কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হবে। আপাতত আমরা বিজ্ঞানসৌধ নির্মাণের পেছনে যেসব মূল নীতি সক্রিয় থাকে সেগুলির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেই ক্ষান্ত হব।

বিজ্ঞানে ও প্রকৌশলে অগ্রগতির ধারা

সবার আগে এই কথাটা বলা দরকার যে মানুষের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ক্ষেত্র যে-ক্রমে একে একে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার একটা সুনির্দিষ্ট পূর্বাপরতা আছে। সেই ক্রমটা মোটামুটি এইরকম : গণিত—জ্যোতির্বিজ্ঞান— পদার্থবিদ্যা— রসায়ন— জীববিজ্ঞান— সমাজতত্ত্ব। অথচ প্রকৌশলের ইতিহাসে প্রায় এর উল্টো একটা ক্রম চোখে পড়ে : সমাজ-সংগঠন—

শিকার—পশুর গৃহপালন—কৃষিকাজ— মৃৎকর্ম—রন্ধন— বস্ত্রনির্মাণ —ধাতুকর্ম—যানবাহন ও নৌচালন— স্থাপত্য— যন্ত্রনির্মাণ— এনজিন নির্মাণ। এই বৈপরীত্যের কারণ বুঝতে কষ্ট হয় না। মানুষ তার জৈব পরিবেশ নিয়েই সবার আগে ব্যাপৃত থাকে, তাই তারই মধ্যে থেকে তার প্রকৌশলের প্রথম উদ্ভাবন ঘটে। জড়শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের প্রকৌশল গড়ে ওঠে পরে, ধীরে ধীরে। কাজেই প্রকৌশলের বিকাশের এই ক্রমটাকে ব্যাখ্যা করা সহজ। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার বিষয়গুলো ঠিক ঐ উল্লিখিত ক্রমে বিকাশ লাভ করেছে কেন, তার ব্যাখ্যা দেওয়া অত সহজ নয়। ঐ বিশেষ ক্রমে সে বিকাশ ঘটার পেছনে বিষয়গুলোর নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সমস্যার ভূমিকা নিশ্চয়ই আছে, তবে তা আংশিক মাত্র। ইতিহাস থেকে দেখা যায়, বিজ্ঞানের যেসব শাখা প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত জটিল ক্ষেত্র নিয়ে ব্যাপৃত (যথা জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র), তারা বিকাশ লাভ করেছে বিষয়বস্তু নিয়ে সরাসরি চর্চার মধ্যে দিয়ে। প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত কম জটিল ক্ষেত্র নিয়ে চর্চারত শাখাগুলো (যেমন বলবিজ্ঞান আর পদার্থবিদ্যা) সে বিকাশে কমই সাহায্য করেছে, এমনকি অনেক সময় বাধাই দিয়েছে। বিজ্ঞানচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিকাশের ঐ কালক্রমটি বরং বিভিন্ন যুগের শাসকশ্রেণীর বা উদীয়মান শ্রেণীর স্বার্থানুকূল ব্যবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, পঞ্জিকার নিয়মিতকরণ ছিল পুরোহিতদের কাজ; তা থেকেই উদয় হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের। যেমন, আঠেরো শতকের উঠতি ম্যানুফ্যাকচারারদের প্রয়োজনে নবীন বস্ত্রশিল্পের চাহিদা মেটাতে গিয়ে আধুনিক রসায়নের উদ্ভব ঘটে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির এই সাধারণ গতিপথ ছেড়ে যদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের সুবিস্তৃত ক্রমটির দিকে তাকাই তাহলে কতকগুলো সাধারণ ছাঁদ দেখতে পাব। বিজ্ঞানে একেকটি ক্ষেত্রে একটার পর একটা আবিষ্কারের সুদীর্ঘ পরম্পরা দেখতে পাই। যেমন আঠেরো শতকে বিদ্যুৎবিজ্ঞানে বা বিশ শতকে পারমাণবিক পদার্থবিদ্যায়। সাধারণত এইসব পরম্পরার আদিতে ও অন্তে থাকে এমন একটা কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার যা বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। বেশির ভাগ সময় এইসব আবিষ্কার ঘটে তখনই, যখন আগে স্বতন্ত্র বলে পরিগণিত কয়েকটি ক্ষেত্রের মিলন ঘটে। যেমন, চুম্বকের ওপর বিদ্যুতের ক্রিয়া সম্বন্ধে অয়রস্টিদ্-এর আকস্মিক আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে চুম্বকবিদ্যা এবং তড়িৎবিদ্যার সম্মিলন ঘটে; কিংবা সপ্রাণ জীব কর্তৃক উৎপাদিত অণুর অপ্রতিসম চরিত্র বিষয়ে পাস্তুরের আকস্মিক আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে রসায়ন আর জীবাণুবিদ্যার মেলবন্ধন ঘটে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার এই যে একেকটি মেলবন্ধন, কিংবা এই যে একেকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার, এর ফলে সচরাচর দুটি বা তিনটি নতুন শাখার উদ্ভব ঘটে, এবং নবোদ্ভূত সেইসব শাখার প্রত্যেকটিতে অতঃপর নতুন নতুন আবিষ্কারের ধারা এগিয়ে চলে। সুতরাং সব মিলিয়ে একটা অতীব জটিল চিত্র বেরিয়ে আসে। সে চিত্রে অনুসন্ধান আর আবিষ্কারের ধারার যে বহুবেণী-সংগম লক্ষ্য করা যায় তার সঙ্গে প্রাচীন পেরুবাসীদের 'কিপু'-সংকেতের তুলনা দেওয়া যায়। সুতোর ওপর একটার পর একটা গেরোর ক্রম অনুযায়ী তাতে বার্তা নির্দেশিত হতো, এবং সেই সুতোগুলোও আবার একাধিক সুতোর জটিল প্যাঁচে পাকানো থাকত!

দিকপালদের ভূমিকা

একদিকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকার্যের দীর্ঘবাহিত ধারা, অন্যদিকে যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে নতুন পথের প্রবর্তন—এ দুটিরই গুরুত্ব বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সমধিক। প্রথমটি মূলত নিষ্ঠাবান কিন্তু সাধারণ মনীষার অধিকারী কিছু মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। আর দ্বিতীয়টিকে সাধারণত দিকপাল বিজ্ঞানীদের অবদানের সঙ্গে যুক্ত করেই ভাবা হয়।

এর ফলে এমন একটা ধারণার জন্ম হয়েছে যে বিজ্ঞানের বিকাশের মূলে আছে কেবল কতিপয় দিকপাল মানুষের প্রতিভা এবং তা বুঝি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত নয়। সামাজিক ইতিহাসে বা রাজনৈতিক ইতিহাসে 'মহাপুরুষ'দের ভূমিকাকে যত বড়ো করে দেখানো হয়, তার থেকে অনেক বড়ো করে দেখানো হয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে। সত্যি কথা বলতে, বিজ্ঞানের বহু ইতিহাসই হচ্ছে নিছক বড়ো বড়ো আবিষ্কারকদের কাহিনী। তা পড়লে মনে হয় বুঝি অগণিত রহস্যের যুগান্তকারী সমাধানগুলো ঈশ্বরের আদেশে এক-এক ক'রে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে দিকপাল বিজ্ঞানীদের ভূমিকা চরম, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের কীর্তিকে তাঁদের সমাজ-পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। বস্তুত এইভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয় বলেই প্রায়শ 'অন্তরেব প্রেরণা' বা 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা' বা 'প্রতিভা'র মতো 'ব্যাখ্যাতীত' শব্দের আশ্রয় নিয়ে তাঁদের আবিষ্কারগুলোকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। আসলে, যাঁদের মন অলস, সীমাবদ্ধ, তাঁরা এইসব মহৎ আবিষ্কারের চরিত্র বুঝতে পারেন না। তাঁরা বোঝেন না যে ঐসব কথা বলে তাঁরা কার্যত দিকপাল বিজ্ঞানীদের খাটো করেন, তাঁদের গৌরবের হানি ঘটান। বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীরাও নিজনিজ যুগের সন্তান। আর পাঁচজন মানুষের ওপর সামাজিক বাধ্যবাধকতা যেভাবে ক্রিয়া করে তাঁরাও তার অধীন। একই সামাজিক প্রভাব তাঁদেরও মনকে গড়ে। এতে তাঁদের গুরুত্ব কমেনা, বরং বাড়ে। কারণ যে মানুষ যত বড়ো মাপের, তিনি তাঁর যুগেব বাতাবরণে তত বেশি সিঞ্চিত। সেই কারণেই তিনি আপন যুগের গতিপ্রকৃতিকে এমন ব্যাপকভাবে আয়ত্ত করতে সক্ষম হন যে জ্ঞান এবং কর্মের ছাঁদটাকে বহুল পরিমাণে বদলে দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে তাঁর পক্ষে।

এবং একথাও ঠিক যে সংস্কৃতির কোনো ক্ষেত্রেই দিকপাল মানুষেরা স্বয়ম্ভর নন, বিজ্ঞানে তো ননই। কেননা বিজ্ঞানে যেকোনো কার্যকর আবিষ্কারের পেছনে থাকে অপেক্ষাকৃত গৌণ ও কল্পনা-দীন শতশত বিজ্ঞানীর প্রস্তুতিমূলক কাজ। এইসব বিজ্ঞানীরা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সঞ্চয় ক'রে চলেন, বেশিরভাগ সময়েই না বুঝে। সঞ্চিত সেই তথ্য-ভাণ্ডার নিয়েই দিকপাল বিজ্ঞানী তাঁর কর্ম সমাধা করেন।

মানুষের মনের গঠন যে কতরকমের হয় তার ইয়ত্তা নেই। বিজ্ঞানে মৌলিক অবদান রাখবার সম্ভাবনা অল্প কয়েকজনের মধ্যেই থাকে (যদিও অতীতের তুলনায় আজ অনেক বেশি মানুষ সে সুযোগ পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে আরো বেশি লোক তা পাবেন)। যাঁরা বিজ্ঞানের কাজ করবার জন্য নির্বাচিত হন বা নিজেদের নির্বাচিত করেন তাঁদের মধ্যেও বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ছাড়া আর সব ব্যাপারে পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। এর ফলে বিজ্ঞানে যেমন বিপুল বৈচিত্র্যের সঞ্চার ঘটে তেমনি সমাজ-আরোপিত নিয়ন্ত্রণের মারফত প্রয়োজনীয় একটি ঐক্যও সাধিত হয়। সে নিয়ন্ত্রণ সচেতনভাবে অথবা অসচেতনভাবে আরোপিত হতে পারে। সমাজ-আরোপিত এই ঐক্যের সুবাদেই বিজ্ঞান মানুষের পরিবেশকে অনুধাবন ক'রে তাকে বদলানোর এক সমবায়িক যৌথ প্রয়াস রূপে প্রতিভাত হয়।

4. উৎপাদনের উপকরণ ও বিজ্ঞান

এতক্ষণ অব্দি বিজ্ঞানের যেসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলাম, তার সাহায্যে বিজ্ঞানের একটা বর্ণনা দেওয়া যায়—সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে বিজ্ঞান, পদ্ধতিরূপে বিজ্ঞান, বিবিধ অভিজ্ঞতার এক ক্রমবর্ধমান এবং উত্তরোত্তর সুসংগঠিত ভাণ্ডাররূপে বিজ্ঞান। কিন্তু আজকের দিনে

বিজ্ঞানের প্রধান কাজটা কী, কিংবা কেন বিজ্ঞান আদিতে এক বিশেষীভূত সামাজিক কর্মকাণ্ড রূপে উদ্ভূত হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা কেবল এইসব বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে মেলেনা। সে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে যেকোনো ধরনের উৎপাদনকার্যে বিজ্ঞান অতীতে যে ভূমিকা পালন করেছে এবং বর্তমানে যে ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে। আপন অজৈব এবং জৈব পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিকে মানুষ ক্রমাগত বিস্তৃত রূপ দান করেছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখাব যে সেই বিস্তৃত রূপদানের ইতিহাস থেকে এ ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সে-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় ধাপে ধাপে। একেকটি ধাপ একেকটি নতুন বস্তুগত প্রকৌশলের প্রবর্তন দ্বারা চিহ্নিত। পুরাতাত্ত্বিক পরিভাষায় এখনো আমরা অতীতের বিভিন্ন যুগকে বস্তুনাম দিয়ে চিহ্নিত করি—যথা প্রস্তরযুগ, ব্রন্জ-যুগ, লৌহযুগ (অবশ্য 'স্বর্ণযুগ' আমরা হারিয়ে ফেলেছি)। প্রসঙ্গত জানাই, 1836 সালে টম্‌সেন প্রথম ঐ ধরনের পরিভাষা ব্যবহার করেন, যদিও অতি প্রাচীন কাল থেকে হেসিঅড্ এবং লুক্রেশিয়াস মারফত সঞ্চারিত ঐতিহ্যই তার ভিত্তি ছিল। এই ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে; বাষ্পযুগ, বৈদ্যুতিক যুগ, পরমাণুযুগ, মহাকাশযুগ প্রভৃতি নাম তার প্রমাণ।

কিন্তু বস্তু-উৎপাদন এমনিতে মানুষের কোনো কাজে লাগেনা; তাকে প্রয়োজনীয় রূপ দিতে শিখতে হয়। ইংরেজি 'material' শব্দটির মূলে আছে দুটি প্রাচীন শব্দ—*madera* আর *hyle;* এদের অর্থ হলো কাঠ। মুগুর কিংবা বর্শা বানাবার জন্য এই বস্তু-উপাদানকে, 'material'কে, গাছ থেকে ছিঁড়ে নিতে হতো। এইভাবে মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনসমূহ মেটানোর উদ্দেশ্যে বস্তু-উপাদান সংগ্রহ করার এবং তাকে প্রয়োজনীয় রূপদান করার নানান প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেই প্রথমে প্রকৌশলের এবং পরে বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। কোনো কর্ম সম্পাদনের ব্যক্তি-আহরিত কিন্তু সমাজ-উদ্দীপিত পদ্ধতিকে বলে প্রকৌশল; আর সেই কাজটাকে আরো ভালো ক'রে করবার পথটিকে উপলব্ধি করার প্রক্রিয়ার নাম হলো বিজ্ঞান। পরে যখন আমরা বিজ্ঞানের একেকটি সুনির্দিষ্ট শাখার সূত্রপাত নিয়ে এবং তাদের বিকাশের বিভিন্ন পর্ব নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করব, তখন দেখতে পাব, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা গড়ে ও বেড়ে ওঠে সেইসব পর্বেই যখন উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

বিজ্ঞানের ইতিহাসটি রীতিমতো পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর। উত্তাল কর্মতৎপরতার একটি পর্বের পরেই আসে সুদীর্ঘ নিষ্ফলা যুগ; তারপর আবার একটা বিস্ফোরণ ঘটে, প্রায়শই অন্যত্র, অন্য কোনো দেশে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের স্থান ও কাল নিছক আকস্মিকভাবে নির্বাচিত হয় না। যেসব পর্বে অর্থনৈতিক ও প্রয়োগগত কর্মকাণ্ডের জোয়ার আসে, দেখা গেছে বিজ্ঞানও ঠিক সেইসব পর্বেই উচ্ছ্বসিতভাবে বিকাশ লাভ করে। যে ভৌগোলিক পথরেখা ধরে বিজ্ঞান বিকশিত হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই পথেই বাণিজ্য ও উৎপাদন-শিল্পও বিকাশ লাভ করেছে। সেই ভৌগোলিক পথরেখাটি এইরকম: মিশর ও মেসোপটেমিয়া থেকে গ্রীস, ইসলামি স্পেন থেকে রেনেসাঁস-যুগের ইতালি, সেখান থেকে 'লো কান্ট্রিজ'(বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ ও হল্যান্ড হয়ে ফ্রান্স, অতঃপর শিল্পবিপ্লব যুগের স্কটল্যান্ড ও ইংলন্ড। অতীতে বিজ্ঞান উৎপাদন-শিল্পের পিছনে পিছনে চলত; আজ বিজ্ঞান উৎপাদন-শিল্পকে ধরে ফেলতে চাইছে, তাকে পথ দেখাতে চাইছে। আজ উৎপাদনকার্যে বিজ্ঞানের স্থান সম্বন্ধে ধারণা ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। একদা চক্র আর পাত্র থেকে শিক্ষা লাভ করে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছিল; অতঃপর বিজ্ঞানই গড়ে তোলে বাষ্পীয় এনজিন আর ডাইনামো।

বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের প্রবল জোয়ারের মাঝে মাঝে আসে ভাঁটার প্রশান্ত পর্ব, কখনো বা অধঃপতনের পর্ব। মিশরী রাজশাসনের শেষ অধ্যায়, ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান যুগের শেষ দিক, কিংবা আঠেরো শতকের গোড়ার দিক যার সাক্ষী। আমরা দেখাব যে যেসব পর্যায়ে বিজ্ঞানের

এই অধঃপতন ঘটেছে, সেই পর্বগুলো হচ্ছে সমাজ-সংগঠনের অচলাবস্থাব বা ক্ষয়িষ্ণুতাব পর্যায়। উৎপাদনের প্রক্রিয়া সেসব অধ্যায়ে চিরাচরিত পথেই চলে এবং সে প্রক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামানোটা বিদ্বান মানুষের পক্ষে অবমাননাকর বলে গণ্য হয়।

কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রকৌশলগত পরিবর্তনের সম্পর্ক খুবই নিবিড়— কেবল এই পর্যবেক্ষণটুকুর সাহায্যে বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশের ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের জানা দরকার কোন কোন সামাজিক ঘটনা ঐসব প্রকৌশলগত পরিবর্তন ঘটানোর মূলে সক্রিয় থাকে। পক্ষান্তরে সমাজের ওপর প্রকৌশলগত ঘটনার প্রভাবটা খুবই স্পষ্ট। কোনো একটা বিশেষ কালপর্বের উৎপাদনকার্যের প্রকৌশলগত মান সেই পর্বের সম্ভাব্য সমাজ-সংগঠনের রূপ কী হতে পারে তার একটা সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেয়। প্রস্তরযুগে উৎপাদনের প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ ছিল খাদ্য-সংগ্রহ আর শিকারের মধ্যে; তখনকার কার্যকর সামাজিক ইউনিট সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র কয়েকশো মানুষের মধ্যে, যারা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বাস করত। সুতরাং সেই যুগে সুপ্রসারিত জাতিরাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ছিল না। আবার, যতদিন না উন্নত কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের সুবাদে জনসংখ্যার অধিকাংশকে জমি থেকে দূরে রেখেও খাদ্য সংস্থান করা সম্ভব হয়ে ওঠে, ততদিন আধুনিক নাগরিক সভ্যতার উদ্ভব হওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু প্রকৌশল যত সরলভাবে সমাজ-সংগঠনের রূপ নির্ধারণ করে দেয়, সমাজ-সংগঠন অত সরলভাবে প্রকৌশলের পরিবর্তনকে নির্ধারণ করে না। অতীতে মানবসমাজ মোটেই একটা সুবদ্ধ মনন-ইউনিট হিসেবে কাজ করত না। বিদ্যমান উপকরণের সাহায্যে সকল মানুষের 'প্রভূততম সুখসাধন' মোটেই তার লক্ষ্য ছিল না। প্রকৃতির ওপর মানুষের ক্ষমতাকে প্রসারিত করার সর্বোত্তম উপায় সন্ধানে তা মোটেই সর্বদা নিয়োজিত ছিল না। বরং ইতিহাসের অধিকাংশ পর্ব জুড়েই দেখা গেছে, প্রকৌশলের উন্নতিসাধনের মূলে প্রধান তাড়না ছিল কতিপয় ব্যক্তি বা শ্রেণীর তাৎক্ষণিক সুবিধালাভ। প্রায়শই অন্যাদের ক্ষতি সাধনের মধ্যে দিয়েই সে সুবিধা অর্জিত হতো। কখনো কখনো অন্যদের কেবল ক্ষতি নয়, একেবারে ধ্বংস ক'রে তবে সে সুবিধা অর্জন করতে হতো। যুদ্ধে এই ব্যাপারটাই ঘটত। এবং যুদ্ধ বরাবরই নতুন উদ্ভাবনকে মদত দিয়ে আসছে। শেষ বিচারে, সমাজের রূপটি কেমন হবে তা নির্ভর করে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদনে ও বন্টনে নিয়োজিত লোকেদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপব। এইসব সম্পর্ক প্রায় সর্বদাই ধনীদেব অনুকূলে এবং গরিবদের প্রতিকূলে অন্যায়ভাবে একঝোঁকা হয়ে থাকে। কখনো কখনো সে-সম্পর্ক সরাসরি জুলুমের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে—যেমন দাসত্ব প্রথায়।

এইসব উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তি হলো উৎপাদনের প্রকৌশলগত *উপকরণ।* পরে আমরা দেখাব যে ঐ সব উপকরণের উন্নতিসাধনের জন্য তাগিদ আসে ঐ সব সম্পর্কের ভিতর থেকেই, আর সেই তাগিদে উদ্ভব ঘটে বিজ্ঞানের। নতুন কোনো উদীয়মান শ্রেণী যখন ক্ষমতা দখল করতে এগিয়ে চলে তখন উৎপাদন-সম্পর্ক অতিদ্রুত বদলাতে থাকে। সেই নতুন শ্রেণী তখন উৎপাদনের উন্নতিসাধনের ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়, কেননা সেই উন্নতিই তার সম্পদ আর ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে। এহেন পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানচর্চার কদর খুব বেড়ে যায়। কিন্তু সেই শ্রেণী একবার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, এবং অন্য কোনো প্রতিপক্ষশ্রেণীর অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করবার মতো ক্ষমতা অর্জন করে ফেললে, তখন গতানুগতিকতাকে প্রশ্রয় দিলেই তার লাভ। সে অবস্থায় প্রকৌশল হয়ে পড়ে প্রথাবদ্ধ, এবং বিজ্ঞানচর্চার মূল্য কমে আসে। বলা বাহুল্য, নিছক এই সরলীকৃত ব্যাখ্যার সাহায্যে বিজ্ঞানের উদ্ভবের প্রশ্নটির সবিস্তার উত্তর পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের একটা বিশেষ শাখা একটা বিশেষ স্থানে বা কালে বিকাশ লাভ

করল কেন তার উত্তর পেতে হলে অনেক বিস্তারিত অনুসন্ধান প্রয়োজন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে নিতান্ত রূপরেখার আকারে হলেও তার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যাবে। এছাড়া, বিজ্ঞানের উত্থান ও পতনকে, এবং উৎপাদনের ওপর তার প্রভাবকে ব্যাখ্যা করবার জন্য আরো কতকগুলো কারক উপাদানের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে আলোচনা করা দরকার। এগুলি হলো: বস্তুগত উপাদান—অর্থাৎ কাঠ বা কয়লার মতো সামগ্রীর লভ্যতা; প্রকৌশলগত উপাদান—অর্থাৎ কর্মকুশলতার মান ও ব্যাপ্তি; এবং অর্থনৈতিক উপাদান—অর্থাৎ বিভিন্ন সামগ্রী এবং শ্রমের চাহিদা ও যোগান।

আদি বিজ্ঞানের শ্রেণীচরিত্র

বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল প্রকৌশলের সামগ্রিক ধারার মধ্যে থেকে; আজও বিজ্ঞান প্রকৌশলের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু বিজ্ঞানের নিজস্ব চরিত্রের সঙ্গে প্রকৌশলের একটি মূল পার্থক্য এই যে প্রথমাবধি বিজ্ঞান লেখাপড়া জানা লোকেদের বৃত্তি। চিরাচরিত কর্মকৌশল হাতে হাতে শিখে নিতে হয়; কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞান বইতে বা পত্রপত্রিকায় লিপিবদ্ধ থাকে এবং তাদের মারফত সে জ্ঞান সঞ্চারিত হয়। এই কারণে বিজ্ঞানচর্চা গোড়া থেকেই সীমাবদ্ধ ছিল সমাজের উচ্চতর শ্রেণীগুলির মধ্যে, অথবা অনুগত সেবার বিনিময়ে শাসকশ্রেণীর স্বীকৃতিলাভে সমর্থ দুচারজন গুণী লোকের মধ্যে। বিজ্ঞানের চরিত্রের ওপর এই সীমাবদ্ধতার নানাবিধ প্রভাব পড়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত সহজাত গুণসম্পন্ন অধিকাংশ মানুষ এর ফলে বিজ্ঞানের অঙ্গনের বাইরে থেকে গেছেন। সুযোগ পেলে এঁরা হয়তো বিজ্ঞানে অবদান রাখতে পারতেন। এর দরুন বিজ্ঞানের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। শুধু তাই নয়; এরই ফলে, বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা ভাবনাচিন্তা করতেন, এমনকি যাঁরা পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন, ব্যবহারিক ক্রিয়াকৌশল সম্পর্কে তাঁদের প্রায় কিছুই ধারণা থাকত না। তার দরুন, প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁরা নিজেরা যেসব কথা বলতেন তা নিয়ে তাঁদের নিজেদের ধারণা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট। এই অবস্থাটা শিল্পবিপ্লবের যুগ পর্যন্ত বজায় ছিল। এছাড়া সামগ্রিক জীবনযাত্রার ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলো সম্বন্ধে তাঁরা অজ্ঞ থাকতেন, কারণ তাঁরা নিজেরা সেগুলো অনুভব করতেন না। কাজেই বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে সেসব প্রয়োজন মেটানোর কোনো তাগিদও তাঁরা অনুভব করতেন না।

সমাজের পরিচালক এবং শোষক শ্রেণীসমূহের সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চা এইভাবে জড়িয়ে যাওয়ার ফলে সমাজে শ্রেণীবিভাজনের একেবারে আদিপর্ব থেকেই কৃষকদের মনে এবং কিছু পরিমাণে অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে—বস্তুত সাধারণভাবে পুঁথিগত বিদ্যা সম্বন্ধেই—এক গভীর সন্দেহের ভাব জেগে ওঠে। পাঁচ হাজার বছর আগে যখন মানবসমাজে প্রথম নগরপত্তন হয় তখন থেকেই এই প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। মানবহিতৈষী দার্শনিকেরা পূর্ণ সদিচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে যেসব পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়াসে অবতীর্ণ হয়েছেন তা কৃষকদের মনে কেবল এই ভীতিই জাগিয়ে তুলেছে যে কার্যক্ষেত্রে ঐসব পরিবর্তন তাদের মন্দ বই ভালো করবে না; শ্রমিকদের মনে হয়েছে, ঐসব পরিবর্তন হয় তাদের আরো বেশি করে শৃঙ্খলিত করবে, নতুবা কর্মচ্যুত করবে। একেবারে আদিতে বিজ্ঞানীদের জাদুকর বলে গণ্য করা হতো; লোকে মনে করত এঁদের ক্ষতি করার ক্ষমতা অপরিসীম। প্রাচীন গ্রীক-রোমান ধ্রুপদী যুগের শেষ দিক অব্দি এই ধারণা জাগরূক ছিল। সে সময়ে সাধারণ মানুষ ধর্মের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কখনো মুখ বুঁজে কখনো সহিংসভাবে দার্শনিকদের বিরুদ্ধাচরণ করত। ঘৃণিত রোম সাম্রাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে দার্শনিকদের স্বার্থ অভিন্ন বলে মনে করা হতো; সে ধারণা যে একেবারে মিথ্যে ছিল তাও নয়। মধ্যযুগে তো বিজ্ঞান বহু কষ্টে মুখ বুঁজে কোনোরকমে আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে

রাখতে পেরেছিল। অতঃপর বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম ঘটার পরও জনরোষ যে কীভাবে তার বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় শিল্পবিপ্লবের যুগে মেশিন-ভাঙা দলের কার্যকলাপের মধ্যে। আজও আমরা এর কিছুটা পরিচয় পাই বিজ্ঞানের 'মহতী কীর্তি' পরমাণু-বোমার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। একদিকে শিক্ষিতদের ঘৃণামিশ্রিত ধিক্কার আর অজ্ঞতা, অন্যদিকে নিম্নতর বর্গের সন্দেহ আর বিরূপতা—এর সম্মিলিত পরিণামে সভ্যতার অবাধ অগ্রগতির পথে বড়ো রকমের প্রতিবন্ধক দেখা দিয়েছে বরাবর। ফলিত আর তত্ত্বীয় জ্ঞানের অবাধ সক্রিয় লেনদেনই প্রকৌশল ও বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে প্রচণ্ডভাবে ত্বরান্বিত করে; অথচ উপরোক্ত দুঃখজনক পরিস্থিতির পরিণামে সেই লেনদেনের বদলে সমাজে এ দুয়ের মধ্যে নেহাৎ অনিচ্ছুক ও দায়সারা এক সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে এই ভর্ৎসনা কেবল তত্ত্ব আর প্রয়োগের বিচ্ছেদের শ্রেণীচরিত্রটি সম্পর্কেই প্রযোজ্য। বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে বিদ্যাচর্চার যে মস্ত ভূমিকা, তার প্রতি এ ভর্ৎসনা কোনো অবস্থাতেই প্রযোজ্য নয়। যাঁরা লিখতে পারেন, হিসেব রাখতে পারেন, নির্দিষ্ট প্রণালীতে যুক্তিপ্রয়োগ করতে পারেন, তাঁদেরই হেফাজতে ছিল বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের অগ্রগতির পেছনে এই ঘটনাটার অবদান অপরিসীম। সামগ্রিকভাবে প্রকৃতির যে নগ্ন জটিল রূপ সে সম্পর্কে নিছক বাক্যবিন্যাস করে যুক্তি প্রয়োগ করার যেকোনো উদ্দেশ্যনিষ্ঠ প্রয়াস চালানো খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। আদিতে যে সব আচার-আচরণের ফল মানুষের কাছে উপযোগী বলে প্রমাণিত হতো, সেগুলোকে যুক্তিযুক্ত বলে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই কল্পকথা আর আচারবিধির উৎপত্তি হয়েছিল। অ-শিক্ষিত আলোচনার সীমা ঐ পর্যন্তই ব্যাপ্ত ছিল। এমনকি গোড়ার দিকে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞানও যুক্তিমার্জিত পুরাণকথার চেয়ে সামান্যই উন্নত স্তরের জিনিস ছিল; গ্রীকদের আদি আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞান তার নিদর্শন। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতার অন্তত কতকগুলো দিক নিয়ে বিধিসম্মত এবং পরিমাণাত্মক তর্কবিতর্ক করা সেযুগেই সম্ভব ছিল। যথা, বস্তুর সরল চলন এবং বলসমূহ। আর্কিমিডিস লিভার সংক্রান্ত সূত্র আবিষ্কার করার বহু শতাব্দী আগে থেকেই নাবিকরা জানতেন কী করে দাঁড় বাইতে হয়, কারবারীরা জানতেন কী করে তুলাদণ্ড ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু আর্কিমিডিসের সূত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে যে সব নতুন নতুন যান্ত্রিক উদ্ভাবন ঘটানো সম্ভব হয় তা নিছক ব্যবহারিক জগতে কর্মরত লোকেদের মাথায় কোনোদিনই আসত না। শুধু তাই নয়, পরে গ্যালিলিও আর নিউটনের যুগে বলবিজ্ঞান আর পদার্থবিদ্যায় যেসব নতুন সামান্যীকরণ ঘটে তার মূলেও আর্কিমিডিসের ঐ আবিষ্কারটির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এইভাবে যুক্তিশাসিত যেসব পদ্ধতির উদ্ভব ঘটল, তা আর নিছক পণ্ডিতি ভাষায় মুখরক্ষা করার মতো কয়েকটি বিবরণ হয়ে রইল না; ক্রমে ক্রমে তা প্রকৃতির নিয়মগুলোকে সূত্রবদ্ধ করার এবং প্রকৃতির ওপব নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর উপায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। সে নিয়ন্ত্রণ প্রথমে রসায়নিক ও জৈব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বর্তমানে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

তবে, আমরা পরে দেখাব যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসে সেইসব পর্বই সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়েছিল যখন শ্রেণী-ব্যবধান অন্তত খানিকটা কমে এসেছিল, যখন হাতেকলমে কর্মরত লোকেদের সঙ্গে বিদ্বান ব্যক্তিদের অবাধ মেলামেশা সম্ভব হয়ে উঠেছিল। রেনেসাঁস যুগের গোড়ার দিকের ইতালি, বিপ্লবের যুগের ফ্রান্স, উনিশ শতকের শেষদিকের আমেরিকা, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলোর গোড়ার দিক—সবই এর নিদর্শন।

বিজ্ঞানের এই শ্রেণীচরিত্রটি এমনই ব্যাপক ও সর্বজনীন যে এ ব্যাপারটাকে একেবারে স্বতঃসিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। যার ফলে বিজ্ঞানী মহলে এর কোনো উল্লেখ করলেই সকলে

মর্মাহত বিস্ময় বোধ করেন। তাঁদের ধারণা, বিজ্ঞানের ঐতিহ্যটি নিতান্তই স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ম্ভূ; তার সঙ্গে অর্থনীতি বা রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। এই ধারণার আসল তাৎপর্য এই যে বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের সামাজিক—বিশেষত শ্রেণীগত—অভিযোজনের প্রক্রিয়াটি ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়ে চলে, তা উপরিতলে খুব একটা প্রকট হয় না। শ্রেণীচরিত্রের ভিত্তিতে বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে অল্পদিন। সে বিশ্লেষণের অনেকটাই নিতান্ত মোটা দাগের এবং পথভ্রান্ত, তাতে সন্দেহ নেই। কোনটা বিজ্ঞানের সত্যিকারের কর্মসিদ্ধি, আর কোনটা সে সিদ্ধির অন্তর্গত সাধারণ তত্ত্ব, তার তফাৎ বুঝতে পারে না ঐ স্থূল বিশ্লেষণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ বিশ্লেষণ চালিয়ে যাওয়া দরকার, তাকে মার্জিত করে নেওয়া দরকার। কারণ ঐ বিশ্লেষণই শেষ পর্যন্ত আমাদের বিজ্ঞান আর সমাজ সম্বন্ধে এক সুগভীর উপলব্ধিতে পৌঁছে দেবে।

5. প্রকৃতিবিষয়ক বিজ্ঞান : ভাবধারার উৎস

ব্যবহারিক উপযোগিতাই বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করে, সে কথা ঠিক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বলতে কেবল প্রকৌশলের নিরন্তর উন্নতিসাধনই বোঝায় না; তার অতিরিক্ত আরো কিছু বোঝায়। যে তাত্ত্বিক কাঠামোটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন ব্যবহারিক কর্মসিদ্ধির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে, যা তাদের মধ্যে এক নিয়ত-বর্ধমান মননগত সুবদ্ধতা গড়ে তোলে, সেই কাঠামোটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে বিজ্ঞানের ইতিহাস এমনভাবে লেখা হতো—আজও হয়—যেন বিজ্ঞান সত্যের এক ভাবসৌধ মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞানের সামাজিক এবং বস্তুগঠিত উপাদানসমূহকে বাদ দিয়ে এইভাবে বিজ্ঞানের ইতিহাস লিখলে কার্যত তা উচ্চাঙ্গের আবোলতাবোলে পর্যবসিত হয়। এই বইতে আমরা এরকম বহু নিদর্শন তুলে ধরব।

অপরদিকে বিজ্ঞানের ভাবগত দিকটাকে অগ্রাহ্য করতে চাওয়ার অর্থ হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা। কারণ বিজ্ঞানে তত্ত্বের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, এবং সে ভূমিকা উত্তরোত্তর সদর্থক হয়ে উঠছে। বস্তুত, বিজ্ঞানের বহু পর্ব জুড়েই দেখা গেছে, বিজ্ঞানকর্মের প্রধান ধারাটি কোনো একটা তত্ত্বকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার লক্ষ্যে চালিত হয়েছে; যেমন, উনিশ শতকের শেষ অধ্যায়ে ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্বকে প্রমাণ করা, কিংবা সতেরো শতকের বলবিজ্ঞানে অ্যারিস্টটলীয় পদার্থবিদ্যাকে অপ্রমাণ করা। কিন্তু এইরকম স্বয়ংস্বতন্ত্র এবং গণ্ডিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক কর্মোদ্যোগের বিকাশের মধ্যে স্বতই একটা বিপদ নিহিত থাকে। প্রয়োগের মধ্যে থেকেই এইসব প্রয়াসের উদ্ভব ঘটে ঠিকই, কিন্তু উত্তরোত্তর প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তাদের মধ্যে। এইসব প্রয়াসের ব্যবহারিক উপযোগিতা যত কমে আসে ততই তারা দিশা হারিয়ে ফেলে। অতীতে দেখা গেছে এর পরিণতি দু রকম হয়। হয় তারা উচ্চমার্গের পণ্ডিতি কচকচিতে পর্যবসিত হয়; নতুবা প্রয়োগক্ষেত্রের সঙ্গে নতুন করে সংযোগ লাভের মধ্যে দিয়ে 'নূতন প্রাণ' লাভ করে। উনিশ শতকে নিউটনীয় বলবিজ্ঞানের পরিণতি এর প্রথমটির উদাহরণ; এবং আঠেরো শতকের শেষদিকে বৈদ্যুতিক ব্যাটারির আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-বিজ্ঞানের নবরূপ লাভ দ্বিতীয়টির উদাহরণ।

বিজ্ঞানকে সচরাচর যেভাবে দেখানো হয়ে থাকে তাতে বলা হয়, বিজ্ঞানের নিয়ম এবং তত্ত্বগুলো সম্পূর্ণত পরীক্ষাসিদ্ধ বাস্তব তথ্য থেকে আহরিত ন্যায্য, এমনকি যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। কিন্তু সত্যিই এই শর্ত যদি কঠোরভাবে আরোপ করা হতো তাহলে বিজ্ঞানের অস্তিত্বই থাকত কিনা সন্দেহ। কেননা বস্তুসংগত যেসব তথ্যকে ব্যাখ্যা করবার মানসে বিজ্ঞানের নিয়ম, তত্ত্ব ও

তত্ত্বপ্রকল্প প্রণীত হয়, সেসব তথ্যকে তারা অনেক দূরে ছাপিয়ে যায়। এর অধিকাংশের মধ্যেই ঐ নির্দিষ্ট যুগপর্বের বিজ্ঞান-বহির্ভূত মনন-পরিমণ্ডলের প্রতিফলন ঘটে। ব্যক্তিবিজ্ঞানী অবধারিতরূপেই সেই পরিমণ্ডলের দ্বারা প্রভাবিত হন। যে কারণে প্রকৃতির এবং শ্রমকর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারকে সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়। আমরা পরে দেখাব যে নিউটনের জাড্য-তত্ত্বের (inertia) মধ্যে সমকালীন যুক্তিশাসিত ধর্মব্যাখ্যার প্রভাব পড়েছিল: ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার স্বাভাবিক ন্যায্যতার সমসাময়িক ধারণা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কখনো কখনো এইসব যুগপ্রচলিত চিন্তাভাবনা প্রকৃত, অর্থাৎ হাতেকলমে প্রমাণযোগ্য, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম হয়। আবার অনেক সময়, বিশেষত যখন সে সব ভাবনা ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে, তারা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সঠিক পর্যবেক্ষণ নয়, সঠিক পর্যবেক্ষণকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য চিরাচরিত ধারণার শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারাটাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটানোর পথে সবচেয়ে দুরূহ কাজ। কোপার্নিকাস যে সময় পৃথিবীর চলনের ঘটনাটাকে প্রমাণ করেন, হার্ভে যে সময় রক্তের সংবহনের ঘটনাটাকে প্রমাণ করেন, সেই কাল থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে এযুগে আইনস্টাইনের হাতে ঈথরের অবলুপ্তি ঘটার কাল কিংবা প্লাংক কর্তৃক স্বতন্ত্র কোয়ান্টম-ক্রিয়ার ধারণার প্রবর্তনের কাল পর্যন্ত বিজ্ঞানে আসল যে লড়াই চালাতে হয়েছে তা যতটা না প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করার জন্য, তার চেয়ে বেশি করে প্রতিষ্ঠিত পুরোনো ধারণাকে উৎখাত করার জন্য। অথচ ঐসব প্রতিষ্ঠিত ধারণার প্রত্যেকটিই কিন্তু নিজনিজ কালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে অবশ্যই সহায়ক ছিল। এ কথা অবশ্য ঠিক যে এতদসত্ত্বেও বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা ঐতিহ্যাগত চিত্র বা কার্যকর এক মডেল আবশ্যক। সে মডেলের কিছুটা যাচাইযোগ্য, কিছুটা অবার কল্পনাগঠিত। যে অংশটুকু কল্পিত তার যাচাইকরণ দুঃসাধ্য বা একেবারেই অসাধ্য। ঐতিহ্যাগত এই চিত্রটি যুগপৎ বিজ্ঞান এবং সমাজ থেকে আহরিত উপাদানের সাহায্যে গঠিত হয়, এবং বরাবরই তাই হবে। সুতরাং বস্তুজগৎ এবং সমাজজগতের নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় ধাক্কায় সে চিত্রটি মাঝে মাঝেই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে এবং তাকে নতুন করে গড়ে নিতে হবে। এটাই সংগত।*

বর্তমানে আমরা ঐরকম এক নবনির্মাণপর্বের মধ্যে দিয়ে চলেছি। শিল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিতে বিজ্ঞান আজ অনেক বড়ো ভূমিকা পালন করছে; এরই পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এবং ধারণার ব্যাপ্তি ও গভীরতা বিপুলভাবে বেড়েছে। তার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো পরমাণুর গঠন এবং সপ্রাণ জীবের রসায়নিক জীবনপ্রক্রিয়ার আবিষ্কার। এই সন্নিপাত কিন্তু নিছক কাকতালীয় নয়। এর দরুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন জেগে ওঠে, যার ফলে একের পর এক আমূল নতুন তত্ত্বেরও উদ্ভব ঘটে, যথা আপেক্ষিকতা এবং কোয়ান্টম বলবিজ্ঞান।

একই সঙ্গে, প্রধানত একই কারণবশত, পৃথিবীর বহু দেশে দ্রুত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। সোভিয়েট ইউনিয়নে এর সূত্রপাত ঘটে এবং পরে তা অন্যান্য দেশে ছড়ায়।

* বিশিষ্ট বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদ টমাস· এস· কুন্-ও এই মত পোষণ করেন বলে মনে হয়। তাঁর *The Structure of Scientific Revolutions* বইতে তিনি একটা বিশেষ 'ছাঁদে'র ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে একেকটি পর্বে সুসমঞ্জস মতামতসমূহের একেকটি সমষ্টি প্রাধান্য বিস্তার করে, তারপর তার পতন ঘটিয়ে অন্য একটি ছাঁদ প্রধান হয়ে ওঠে। যেমন অ্যারিস্টটল বা গ্যালিলিও-র মতামত।—জে·ডি·বি·

এইসব দেশে কার্যক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কটিকে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হতে থাকে। স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপরেও এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রভাব পড়ে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বিশ্লেষণাত্মক মার্ক্সীয় দর্শনের আলোকে বিচার করা হতে থাকে। এ নিয়ে পরে আমরা কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব। আপাতত এইটুকু বলব যে বিজ্ঞানের ভেতরের এবং বাইরের নানান প্রভাবের সম্মিলিত অভিঘাতে এযুগে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে যে সব তুমুল প্রশ্ন জেগে উঠেছে তা ইতিপূর্বে কোনো যুগে কখনো এত তীব্র হয়ে ওঠে নি।

বস্তুবাদ ও ভাববাদ

তবে বিজ্ঞানের অভ্যন্তরীণ যে বিতর্ক তার চরিত্র মোটের ওপর নতুন কিছু নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখা যাবে, ঊষাকাল থেকেই বিজ্ঞানে দুটি প্রধান পরস্পরবিরোধী প্রবণতার মধ্যে কখনো সক্রিয় কখনো প্রচ্ছন্ন সংগ্রাম চলে আসছে : তার একটি আকারবাদী (formal) এবং ভাববাদী; অন্যটি ব্যবহারিক এবং বস্তুবাদী। গ্রীক দর্শনে এই দুটি ধারার সংঘাতই ছিল মুখ্য; তবে এর উৎপত্তি নিশ্চয়ই আরো আগে হয়ে থাকবে। শ্রেণীসমাজ গঠনের একেবারে আদিপর্বেই এ সংঘাতের সূচনা হয়ে থাকবে, কেননা এই বিবাদে যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে কার সামাজিক আসক্তি কোন দিকে সেটা খুবই স্পষ্ট ছিল।

যাঁরা আকারবাদী (formal) দর্শনের পক্ষ নিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী, অভিজাততন্ত্রের এবং প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সমর্থক। এই দলের সবচেয়ে জোরালো প্রবক্তা ছিলেন প্লেটো। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে যা কিছু যেমন আছে তার কারণ অনুসন্ধান করা; এ কথা প্রমাণ করা যে আমূল কোনো পরিবর্তন ঘটাতে চাওয়া শুধু অসম্ভব নয়, অন্যায়ও। প্লেটো মনে করতেন গণতন্ত্র ইত্যাদি ছোটোখাটো উৎপাতকে দূর করতে পারলেই উপযুক্ত অভিভাবকদের—'সোনা'র মানুষদের—শাসনপ্রচ্ছায়ে প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব চিরকালের মতো নিরাপদ হয়ে উঠবে। কিন্তু এহেন এক পরিস্থিতি যে কত অনিন্দ্য সেটা নিচুতলার লোকেদের চট করে বোঝানো মুশকিল; তাই তাদের কাছে প্রমাণ করা দরকার যে এই বস্তুগঠিত বিশ্বটা আসলে মায়া, সুতরাং এর যেসব অশুভ দিক সেগুলোও আসলে অবাস্তব, অলীক। এই কল্পজগতে পরিবর্তনই হলো অশুভ; যা আদর্শ, যা সত্য, যা সুন্দর, তা চিরন্তন, প্রশ্নাতীত। যেহেতু মর্ত্যলোকে এইসবের বিশেষ চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না, তাই এসবের সন্ধান করতে হবে এক আদর্শ স্বর্গলোকে। বিজ্ঞানের বিকাশের ওপর, বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার বিকাশের ওপর, এই দৃষ্টিভঙ্গির সুগভীর প্রভাব পড়েছে। এবং আজকে অনেক সুবিস্তারিত ও পরিশীলিত রূপে বিজ্ঞানে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন ঘটানোর প্রয়াস আবার জোরালো হয়ে উঠেছে।

এর বিপরীত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি শত শত বছর ধরে শিক্ষিত মহলে বিশেষ সমর্থন পায়নি। স্বীকৃত দর্শনের অঙ্গ হিসেবে তা প্রায় কখনোই স্থান পায়নি বলা যেতে পারে। কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্যবহারিক, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, তা ছিল বিপ্লবগন্ধী। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্তত একটি অভিব্যক্তি বিধৃত হয়ে রয়েছে লুক্রেশিয়াসের *De Rerum Natura* (বস্তুচরিত্র প্রসঙ্গে) শীর্ষক এপিকিউরাস-পন্থী কাব্যরচনায়। সেখানে দেখা যায় এর শক্তি কত, এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার পক্ষে তা কত বিপজ্জনক। সে দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল বস্তু ও তার চলন। প্রকৃতি ও সমাজকে ওপর থেকে নয়, তলা থেকে ব্যাখ্যা করার কাজে তা নিয়োজিত ছিল। চির-চলমান বস্তুগঠিত বিশ্বের অনিঃশেষ স্থিতিশীলতার ওপর তা জোর দিত, এই কথা

বলত যে সে-বিশ্বের নিয়মকানুন রপ্ত করে নিতে পারলে মানুষ তাকে বদলানোর ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। প্রাচীন ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান যুগের বস্তুবাদী দার্শনিকরা এর বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। কারণ কায়িক কর্মের সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল না। পরবর্তীকালে যিনি বস্তুবাদকে নবরূপে ঢেলে সাজান, সেই মহান ফ্রান্সিস বেকন-ও এর বেশি এগোতে পারেননি। তারপর যখন শিল্পবিপ্লব ঘটল তখন বিজ্ঞান কার্যক্ষেত্রে বস্তুবাদী হয়ে উঠল, যদিও রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে তা মুখে ভাববাদী দর্শনেরই সেবা করে চলল। মধ্য-উনিশ শতকেও বস্তুবাদ দার্শনিক বিচারে অপরিণত ছিল, কারণ সমাজ ও সামাজিক রূপান্তরের ব্যাপারটি নিয়ে তা ব্যাপৃত ছিল না। কাজেই রাজনীতি ও ধর্মের কোনো ব্যাখ্যা তা দিতে পারত না। বস্তুবাদকে যথোচিত পরিমাণে প্রসারিত ও পরিবর্তিত করে নিয়ে সেই কাজটিই করেন মার্ক্স ও তাঁর অনুগামীরা। নব্য দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রথমে কেবল রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেই সক্রিয় ছিল; কিছুকাল হলো তা প্রকৃতিবিষয়ক বিজ্ঞানের অঙ্গনেও প্রবেশ লাভ করেছে।

ইতিহাসের একেবারে আদিযুগ থেকেই বিজ্ঞানে ভাববাদী আর বস্তুবাদী প্রবণতার এই সংঘাত একটানা চলে আসছে। প্লেটোর ভাববাদ এক অর্থে পরমাণু-কণাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা ডিমক্রিটাস-এর বস্তুবাদের পাল্টা উত্তর। মধ্যযুগে রজার বেকন তখনকার প্রচলিত প্লেটো-অ্যারিস্টলবাদী দর্শনের পাল্টা এক বিজ্ঞানের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন; সে বিজ্ঞান ছিল ব্যবহারিক উপযোগমুখী। রেনেসাঁস যুগে আধুনিক পরীক্ষাভিত্তিক বিজ্ঞান পত্তনের লক্ষ্যে যে তুমুল সংগ্রাম চলে তাতে প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল চার্চের মদতপুষ্ট আকারবাদী অ্যারিস্টটল-পন্থা। উনিশ শতকে ডারউইনবাদী বিবর্তনকে নিয়ে বিজ্ঞান আর ধর্মের মধ্যে যে লড়াই চলে তার মধ্যেও এই একই জিনিস লক্ষণীয়। বস্তুবাদী বিজ্ঞান বারংবার এই যুদ্ধে জয়লাভ করা সত্ত্বেও এই সংগ্রাম যে এতদিন ধরে একটানা চলে আসছে, তা থেকে বোঝা যায় এ সংগ্রাম আসলে দর্শন বা বিজ্ঞানের সংগ্রাম নয়। বিজ্ঞানের বকলমে আসলে রাজনৈতিক সংগ্রামই প্রতিফলিত হচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে। প্রত্যেকটি পর্বে ভাববাদী দর্শনের দোহাই দিয়ে বিদ্যমান অসন্তোষগুলোকে মায়া বলে প্রমাণ ক'রে বিদ্যমান অবস্থাটাকেই আদর্শ বলে প্রচার করার চেষ্টা চলেছে। আর প্রত্যেকটি পর্বে বস্তুবাদী দর্শন বাস্তবতার ব্যবহারিক নিরিখটিকেই সত্য বলে মেনেছে, পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতার ওপর নির্ভর করেছে।

6. বিজ্ঞান ও সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

এতক্ষণ আমরা সাধারণভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে, একটি পদ্ধতিরূপে এবং এক ক্রমসঞ্চীয়মান ঐতিহ্যরূপে বিজ্ঞানের স্বরূপটি দেখলাম। উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে এবং সামগ্রিক মতাদর্শের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক কী, তাও বর্ণনা করলাম। আমার মনে হয়, বিজ্ঞানের কোনো সংজ্ঞার্থ নির্দেশ না করলেও এই বইতে বিজ্ঞান বলতে আমরা কী বোঝাতে চাইছি তা এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত। তাই বলে এমন আশা করা আদৌ সংগত হবে না যে আরো সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যতিরেকেই পাঠক এই অধ্যায়ে ব্যক্ত ও অব্যক্ত সিদ্ধান্তগুলিকে মেনে নেবেন। বস্তুত, এই বইয়ের বাকি অংশের কাজ হলো সেইসব সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করা। কেননা বিজ্ঞান বলতে কী বোঝায় এবং কী তার ভবিষ্যৎ তা জানার পথে একেবারে প্রাথমিক পদক্ষেপটি গ্রহণ করতে হলেও গোটা ইতিহাস জুড়ে বিজ্ঞান আর সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে সবিস্তার আলোচনা অবশ্যকর্তব্য।

বস্তুত বিজ্ঞান আর সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটেছে বহুবিধ উপায়ে। তার মধ্যে কেউ একটি, কেউ অন্যটির ওপর জোর দিয়েছেন। স্বভাবতই বিজ্ঞান আর সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কটি কী তা নিয়ে নানান মতভেদ দেখা দিয়েছে। সচরাচর সমাজের ওপর বিজ্ঞানের প্রভাব নিয়েই আলোচনা শুরু হয়ে থাকে। তাতে দেখানো হয়, আগে তাত্ত্বিকভাবে কোনো একটা যুগান্তকারী আবিষ্কারের (যেমন তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ) ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, তারপর গবেষণাগারে তাকে শণাক্ত করা হয়, অতঃপর বড়ো মাত্রায় এনজিনিয়ারিঙের মধ্যে তার প্রয়োগ ঘটানো হয় এবং সবশেষে তা দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য সামগ্রী (যেমন রেডিও) হয়ে ওঠে। কিন্তু বিজ্ঞান যে কেবল এই পথেই, এমনকি প্রধানত এই পথেই, বিকাশ লাভ করে এবং সমাজকে প্রভাবিত করে, তা সত্যি নয়। ওর চেয়েও বেশি করে যে ঘটনাটা ঘটে তা এইরকম : কোনো একটা ব্যবহারিক কর্মকৌশলের বা যন্ত্রের কাজ বা ত্রুটি লক্ষ্য করেন একজন বিজ্ঞানী। কখনো কখনো নিস্পৃহভাবে হলেও সাধারণত তার উন্নতি ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সমস্যাটার গভীরে দৃকপাত করেন। এর পরিণতিতে তিনি ঐ কর্মকৌশলটাকে কী করে চালু করতে হবে কেবল সেটুকুই আবিষ্কার করেন তা নয়, অনেকসময়েই তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলেন। হয়তো এর মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের একটা নতুন শাখাই তিনি সৃষ্টি করে ফেলেন। যেমন বাষ্পীয় এঞ্জিনকে অনুধাবন করতে গিয়ে তাপগতিবিদ্যার (thermodynamics) উদ্ভব হয়েছিল। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে সর্বজনীন ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা যেন এক চুম্বক রূপে বৈজ্ঞানিক আগ্রহকে আকর্ষণ করে; বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও প্রকৌশলগত আগ্রহের সেই ক্রমপরিবর্তনশীল ক্ষেত্রের আলোকে দেখা যেতে পারে।

এই বই বিজ্ঞানের ইতিহাস নয়; মূলত বিজ্ঞান আর সমাজের উপরিউক্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই এর আলোচ্য বিষয়। এর যদি কোনো পক্ষপাত থাকে তো সে ইতিহাসের ওপর বিজ্ঞানের প্রভাবেব দিকে—বিজ্ঞানেব ওপর ইতিহাসের প্রভাবের দিকে নয়। বিজ্ঞানের ওপর ইতিহাসের প্রভাব নিয়ে অনেক লেখালিখি হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসের ওপর বিজ্ঞানের প্রভাবটাকে অতীতে রীতিমতো উপেক্ষা করা হয়েছে। তা নিয়ে যেটুকু বা আলোচনা হয়েছে, তা নিতান্ত দায়সারা এবং বিভ্রান্তিকর। তার কারণ, ইতিহাসবিশারদদের অধিকাংশেরই যোগ্যতা বিজ্ঞানের অবদান ও প্রভাবকে বিচার কবার, এমনকি লক্ষ্য কবার, পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। অপরদিকে, বিজ্ঞানের ইতিহাসরচয়িতারা প্রকৃতিবিষয়ক জ্ঞানের ব্যাপক বিকাশ ঘটার বৃহত্তর ঐতিহাসিক ফলাফল নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। স্বীকৃত ইতিহাসগুলোতে একেকটি পর্বের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির স্তরটিকে, শিল্পসাহিত্যের মতোই, সেই পর্বের রাজনৈতিক—আজকাল কিছুটা অর্থনৈতিক—বিবরণের এক সাংস্কৃতিক পরিশিষ্ট বলে গণ্য করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এটা ঠিক নয়। যা দরকার তা হলো প্রকৌশলের ওপর এবং চিন্তার ওপর বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে আলোচনা। সে আলোচনাকে ইতিহাসের মূল বিবরণের অবয়বের মধ্যেই গ্রথিত হতে হবে। এইটা যদি না করা হয় তাহলে ইতিহাসের বিবরণের মধ্যে থেকে মূল *ঐতিহাসিক* বৈশিষ্ট্যটিই অনুপস্থিত থেকে যাবে (ইতিহাসের অগ্রসরমান ও অ-পুনরাবৃত্ত উপাদানটিকেই আমরা মূল *ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করছি।*) অথচ সে বৈশিষ্ট্য না থাকলে ইতিহাস কেবল সমাজের কতকগুলো ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত সম্পর্কের বিবরণে পর্যবসিত হয়। কেন সেইসব সম্পর্কই অনন্তকাল ধরে ঈষৎ পরিবর্তন-সহযোগে পুনরাবৃত্ত হয়ে চলবে না, তার কোনো ব্যাখ্যাসূত্র থাকে না সে বিবরণের মধ্যে। অথচ ইতিহাস যে অগ্রসর হয়ে চলেছে তা তো অনস্বীকার্য। কাজেই অ-বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিদের সামনে দুটো পথ খোলা থাকে : হয় তিনি খোলাখুলিভাবেই সে অগ্রগতির কোনো ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকার করবেন; নয় কোনো একটা

রহস্যবাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করবেন। রহস্যবাদী ব্যাখ্যা দুরকম হতে পারে : এক, সবই ঐশ্বরিক নিয়তির খেলা বলা যেতে পারে; দুই, স্পেংলার বা টইন্‌বির ধরনে কোনো একটা তথাকথিত নিয়ম অনুসারে সভ্যতার বিকাশ ও বিলয়ের ধারণা উপস্থাপিত করা যেতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের যেসব পদক্ষেপ অপুনরাবৃত্ত, যা নতুনত্ব জাগিয়ে তোলে, সেইগুলোই সঠিক অর্থে *ঐতিহাসিক* পদক্ষেপ। সেইসব পদক্ষেপকে অনুধাবনের কাজ শুরু করতে হলে বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বিজ্ঞান সমাজকে প্রভাবিত করে দুটি প্রধান উপায়ে : এক, উৎপাদন-পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে; দুই, যুগের মতাদর্শের ওপর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও ধ্যানধারণার অভিঘাতে। এই দ্বিতীয় উপায়টি অনেক বেশি প্রত্যক্ষ কিন্তু কম জোরালো। প্রথম উপায়টির কল্যাণে বিজ্ঞান একদিকে প্রকৌশল, অন্যদিকে ধর্মের মধ্যে থেকে স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে। যুক্তিশাসিত সুসংবদ্ধ চিন্তার সাহায্যে এবং পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নিয়ে খুব ছোটো আকারেও যদি উন্নতিসাধনের কোনো একটা পথ একবার খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ উৎপাদনপদ্ধতির ওপর বিজ্ঞানের বিপুল প্রভাব পড়ার রাস্তা খুলে যায়। এগুলো আবার উৎপাদন-সম্পর্ককেও প্রভাবিত করে, ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপর এর বিপুল প্রভাব পড়ে।

বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা মারফত সমাজের ওপর বিজ্ঞানের যে প্রভাব পড়ে, তাও বহু পুরোনো। বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণাদি একবার সূত্রাকারে গ্রথিত হবার পর মানবচিন্তার সর্বজনীন ভাণ্ডারে ফিরে যায়। মহাবিশ্ব সম্পর্কে, মহাবিশ্বে মানুষের স্থান ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধিতে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে রেনেসাঁসের যুগ বেয়ে আধুনিক যুগ পর্যন্ত যেসব মহাবিপ্লব ঘটেছে, সেগুলো বহুলাংশে বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি। গ্যালিলিও আর নিউটন সরল প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা শাসিত এক নতুন যুগের পত্তন করেন। সেই নতুন যুগের নিয়ম যেন ধর্মক্ষেত্রে সরল যুক্তিসঞ্জাত ঈশ্বরবাদকে (deism)*, অর্থনীতিতে অবাধ বাণিজ্যনীতিকে এবং রাজনীতিক্ষেত্রে উদারনীতিবাদকে একই সঙ্গে যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করল। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব এই উদারনৈতিক মতাদর্শ থেকেই জন্ম নিয়েছিল। আবার সেই তত্ত্বকেই 'যোগ্যতমের উদ্বর্তনে'র কথা বলে কাজে লাগানো হলো নির্মম শোষণের ও নরগোষ্ঠী-আধিপত্যের যৌক্তিকতা হিসেবে। বিবর্তনবাদকে যাঁরা আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন তাঁরা কিন্তু জোর দিলেন এমন এক পদ্ধতির ওপর যার সাহায্যে সমাজের মাধ্যমে মানুষ তার প্রাণীগত বিবর্তনের জৈবিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে গিয়ে সুদূরপ্রসারী এবং সচেতন-নির্দেশিত এক সামাজিক বিবর্তনকে আয়ত্ত করতে পারবে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ক্রমশই বেশি করে চিন্তা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির গোটা ছকটাকে প্রভাবিত করে চলেছে। তবে তার প্রক্রিয়াটা সব সময় চোখে পড়ে না। বিজ্ঞান মানুষের এক বিরাট সামাজিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে চলেছে। আগেকার যাবতীয় মানবিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড় হলেও, বিজ্ঞান সেসবের চেয়ে স্বতন্ত্র। কেননা বিজ্ঞান এখনো বয়সে নবীন, তাই এখনো তা বহুদিন ধরে সক্রিয়ভাবে বিকাশ লাভ করতেই থাকবে। সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্কটা এখনো একটা সাম্যাবস্থায় এসে পৌঁছায়নি। তাই মানবিক

---

* *deism*—এই মত অনুযায়ী একেবারে আদিতে ঈশ্বর কর্তৃক সৃজিত হওয়ার পর বিশ্ব তার নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ীই চলে। সপ্তদশ শতকের ব্রিটিশ দার্শনিক হার্বার্ট অব চেরবারি এর উদ্গাতা। ভলতেয়ার, রুশো, লক, নিউটন প্রমুখ ব্যক্তি এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন।—অনু

কর্মকাণ্ডে বিজ্ঞানের পূর্ণ অভিঘাত পড়তে এখনো অনেক বাকি।

সর্বকালেই মনুষ্যজাতির কোনো না কোনো একটা 'মহান ঐতিহ্য' থাকে, তারই ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠে 'খাঁটি' বিশ্বাস আর 'সঠিক' কর্মপন্থা সংক্রান্ত ধারণা। অস্পষ্ট প্রাগৈতিহাসিক অতীত পার হয়ে যখন থেকে এই ঐতিহ্যের একটা অবয়ব আমাদের চোখে পড়ে, তখন থেকেই দেখি সেই ঐতিহ্যটা দেশে দেশে মূলত অভিন্ন—যদিও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোতে, ভারতবর্ষে ও চীনে এর কিছুটা স্বতন্ত্র ধারার অস্তিত্বও চোখে পড়ে। এই মহান ঐতিহ্যের বিকাশ এবং পরিবর্তনকে বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া বোঝা যায় না। তবে তার থেকেও বড়ো কথা এই যে যতক্ষণ না বিজ্ঞানীকে সেই সর্বজনীন ঐতিহ্যের এক স্বাভাবিক অঙ্গ হিসেবে দেখা হচ্ছে, ততক্ষণ বিজ্ঞানকেও বোঝা যায় না।

বিভিন্ন যুগ ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে আলোচনা করে মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সাধারণভাবে বিজ্ঞানের স্থানটি কোথায় তা দেখানোই এই বইয়ের অভীষ্ট। প্রথম আবির্ভাবের উষালগ্ন থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিকাশের ধারাটি নিয়ে সবিস্তারে এবং বড়ো পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে। সে বিবরণের মধ্যে দিয়ে বর্তমান অধ্যায়ে অতি সংহত এবং বিমূর্ত আকারে বর্ণিত সম্পর্কসূত্রগুলির চেহারা স্পষ্টতর এবং সহজবোধ্য হয়ে উঠবে বলে মনে হয়। কী করে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মানুষের ইতিহাসের অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকেই সেইসব সম্পর্কসূত্রের উদ্ভব ঘটেছে, তা-ও বোঝা যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন কালে বিজ্ঞান

ভূমিকা

আজকে বিজ্ঞান এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তার নিজস্ব এক ঐতিহ্য তৈরি হয়ে গেছে, তার রয়েছে নিজস্ব এক কর্মপদ্ধতি। আজকের এই বিজ্ঞানকে সম্যকভাবে বুঝতে গেলে সবার আগে প্রয়োজন তার উদ্ভবের বৃত্তান্তটি জানা। কিন্তু বিজ্ঞানের উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই দুটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তার মধ্যে একটি সমস্যা অবশ্য যে কোনো কিছুর উদ্ভব বিষয়ক আলোচনাতেই উঠে পড়ে। সেটি হলো, পিছন ফিরে দেখতে দেখতে আমরা যখন অবশেষে ক্রান্তিক পর্বগুলিতে গিয়ে পৌঁছই (যে পর্বে মূল উদ্ভাবনগুলি ঘটেছিল), তখন বাস্তবে সত্যি সত্যিই কী ঘটেছিল তা নির্ণয় করা ক্রমশই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এছাড়াও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বাড়তি সমস্যা উঠে পড়ে। বিজ্ঞান গোড়াতে কোনো স্পষ্টচিহ্নিত রূপ নিয়ে গড়ে ওঠেনি; সুতরাং যুগের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে থেকে বিজ্ঞানকে একটু একটু করে আলাদা করে চিহ্নিত করে নিতে হয়। অন্যান্য মানবিক কর্মকৃতির এবং প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের মধ্যে থেকে বিজ্ঞানের নিগূঢ় উৎসগুলিকে খুঁজে বার করার প্রয়োজন হয়।

প্রকৃতিবিষয়ক বিজ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো জড়পদার্থের কার্যকর ব্যবহার ও রূপান্তরসাধন। তাই বিজ্ঞানের মূল স্রোতটি আদি মানবের নানারকম প্রকৌশলের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছে। এইসব প্রকৌশলকে বই পড়ে মুখস্থ করে রপ্ত করা যায় না; হাতেকলমে নকল করে রপ্ত করতে হয়। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের রূপটি প্রথমে ছিল মৌখিক বা বাচিক, পরে লিখিত। কাজেই বিজ্ঞানের যাবতীয় ধ্যানধারণা এবং তত্ত্ব সামাজিক জীবন থেকেই আহরিত হয়। জাদুবিদ্যা, ধর্ম এবং দর্শন সেইসব ধ্যানধারণার উৎস।

প্রাচীন কালের সংস্কৃতি এক ধারাবাহিক ঐতিহ্যের পরম্পরা মারফত আমাদের আজকের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। ঐতিহ্যের সেই পরম্পরার কেবল শেষাংশটিরই একটা লিখিত রূপ আছে। আমাদের এই যে সুবিস্তৃত যন্ত্রনির্ভর এবং বৈজ্ঞানিক সভ্যতা, এর সমস্তটাই গড়ে উঠেছে সুদূর অতীতকালের বস্তুগত প্রকৌশল এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে থেকে—অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষদের পেশাকর্ম এবং সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে থেকে। ইতিহাসবিদ এবং তাঁর সহযোগীদের, অর্থাৎ পুরাতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ এবং ভাষাতত্ত্ববিদের কাজ হলো সেইসব পেশাকর্ম আর সামাজিক রীতিনীতিগুলোকে খুঁজে বার করা। অতীতের যেসব বস্তুময় এবং লিপিবদ্ধ নথি রয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে, এবং এখনো আদিম স্তরে বাসরত মানুষের ও সভ্য মানুষের বর্তমান রীতিনীতি ও ভাষা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে তাঁদের।

আলোচ্য আদিম পর্বগুলোর সম্পর্কে তথ্য বড়োই অবিন্যস্ত, সে সম্পর্কে জ্ঞানও নিতান্ত খণ্ডিত। সে সব তথ্যকে সুসংবদ্ধ রূপ দেওয়া শক্ত। বেশির ভাগ তথ্য কেবল এককেটি বিশেষীভূত ক্ষেত্রের বিশারদেরই জানা। এবং এইসব বিশারদরা বিজ্ঞানের উদ্ভব ও প্রভাব নির্ণয় করার সমস্যা নিয়ে খুব কমই মাথা ঘামিয়েছেন। বিভিন্ন সংস্কৃতির যথাযথ ক্রম এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করার কাজেই তাঁরা সচরাচর লিপ্ত। আমি ইতিহাসবিদ নই, বিশারদও নই, আমি একজন সক্রিয় বিজ্ঞানী। কাজেই অতীতের ছবি নতুন করে আঁকার ব্যাপারে আমার এই প্রয়াসের ফলাফল নিশ্চয়ই চূড়ান্ত বা চিরপ্রযোজ্য হবে না; তা নিয়ে অবশ্যই সমালোচনা উঠবে। কিন্তু একটা সুসংহত এবং যুক্তিগ্রাহ্য চিত্র গড়ে তোলার পথে সেই সমালোচনা এবং সেই সমালোচনা-জাত গবেষণা খুবই উপযোগী হবে বলে মনে করি।

একেবারে আদি পর্বটি নিয়ে এই আলোচনা একেবারে বাদও দেওয়া যেত। বস্তুত সে

আলোচনা ব্যতিরেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের, হয়তো মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানেরও, এক সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য বিবরণ রচনা করা সম্ভব। কিন্তু তা করলে সেটা হতো ছলনার সামিল। কেননা তা করতে গেলেই অনেক কিছুকে স্বতঃসিদ্ধ বা নিয়মহারা বলে মেনে নিতে হতো। অথচ আসলে সেসব ব্যাপার অতীতে ক্রিয়ারত সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক উপাদানেরই পরিণত রূপ। যেমন, জ্যোতিষ্কদের আবর্তন নিয়ে যে মহাবিতর্ক আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের সঙ্গে জড়িত, তাকে বুঝতে গেলে জ্যোর্তিগোলকের উদ্ভব সংক্রান্ত পৌরাণিক ও মহাজাগতিক ধারণাগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। সেসব ধারণার উৎসকে অন্ততপক্ষে মেসোপটেমিয় সংস্কৃতির আদি পর্যায় পর্যন্ত তো অনুসরণ করা যায়ই।

মানুষের সমাজবিকাশের আদি পর্বের পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে বিজ্ঞানের উদয় হলো এবং প্রথম কীভাবে তা স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করতে লাগল, বর্তমান অধ্যায়ে তার একটি রূপরেখা আঁকবার চেষ্টা করব। ইতিহাসের যে পর্যায়টি এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত তা দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। কৃষিকার্যের ক্রান্তিকারী উদ্ভাবনটি এই পর্যায়কে সেই দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। প্রথম ভাগে রয়েছে নিম্নতর এবং উচ্চতর পুরাপ্রস্তরযুগ—যেদুটি যুগে জীবনযাত্রার ভিত্তি ছিল খাদ্য-সংগ্রহ ও শিকার। দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে পড়ছে: (নব্যপ্রস্তরযুগের) গ্রাম-ভিত্তিক কৃষিকার্যের আদিপর্ব; (ব্রন্‌জ যুগের) মিশর, মেসোপটেমিয়া, ভারতবর্ষ আর চীনের আদি নগর-ভিত্তিক এবং নদী-মাতৃক সংস্কৃতির পর্ব; এবং সবশেষে (লৌহযুগে) বাণিজ্য-ভিত্তিক স্বাধীন নগরের পর্ব—গ্রীস ও রোমের ধ্রুপদী সভ্যতা যার অঙ্গ। আলোচনার সুবিধের জন্য এই শেষ পর্বটিকে আমরা আলাদা করে নেব। কারণ, প্রথমত, লিখিত দলিল থাকার দরুন এই পর্বটি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক বেশি; দ্বিতীয়ত, এই পর্বের সঞ্চিত ঐতিহ্যই সরাসরি আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। সুতরাং আলোচনাটা আমরা এই তিনটে ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি : (1) পুরাপ্রস্তরযুগ; (2) নব্য প্রস্তরযুগ ও ব্রন্‌জ যুগ; (3) লৌহযুগ ও ধ্রুপদী যুগ।

উক্ত প্রত্যেকটি যুগেই মানুষ প্রকৌশলে আর ভাবধারায় এমন সব অবদান রেখেছে যা বিজ্ঞানের অপরিহার্য ভিত্তি। পুরাপ্রস্তরযুগেই মানুষ বস্তু-ব্যবহারের ও তাকে প্রয়োজনীয় রূপদানের যাবতীয় প্রধান প্রধান উপায় জেনে ফেলে। ঐ যুগেই আমরা আগুনের ব্যবহার শিখি; বন্য প্রকৃতিতে কোথায় কোন পশু বা গাছপালা জন্মায়, তাদের আচরণ কেমন, এ সব বিষয়ে কার্যকর জ্ঞানও ঐ পর্বেই সঞ্চিত হয়। এ ছাড়া আত্মীয়তা, ভাষা, আচারবিধি, সংগীত এবং চিত্রকলা প্রমুখ মৌলিক সামাজিক উদ্ভাবনগুলি সবই ঐ যুগের অবদান। এর পর নব্য প্রস্তরযুগের গ্রাম-সংস্কৃতি থেকে কৃষিকার্য ছাড়াও আমরা পাই বয়ন আর মৃৎশিল্প। এছাড়া পাই চিত্র-প্রতীকরচনার এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মতো সামাজিক উদ্ভাবন। আরো পরে ব্রন্‌জ-যুগে এসে আমরা পাই নানাবিধ ধাতুর ব্যবহার, স্থাপত্য, টাকা এবং আরো কিছু যান্ত্রিক কৌশল। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা, এই যুগেই এক চরম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উদ্ভাবন ঘটে—অর্থাৎ নগরের পত্তন হয়। সভ্যতা বা *civilization* শব্দটির মূলে আছে লাতিন *civis* (নাগরিক), আর রাজনীতি বা *politics* শব্দটির মূলে আছে গ্রীক *polis* (নগর)। নগরের পত্তন হওয়ার ফলেই প্রকৌশলের উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়ে ওঠে। আর প্রকৌশলের অগ্রগতির পরিণতিতে বহুবিধ মননগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্ভাবনের এক বিপুল সমাহার গড়ে ওঠে। সংখ্যা, লিখন, বাণিজ্য—এসবই ঐ যুগের অবদান। এই সমস্ত উদ্ভাবনই ঘটে নবোদ্ভিন্ন শ্রেণীব্যবস্থার ও সংগঠিত সরকারের কাঠামোর মধ্যে। সচেতন চর্চার এক বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানের উদ্ভব এই সময় থেকেই চোখে পড়ে। স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান. চিকিৎসাশাস্ত্র এবং রসায়নের ঐতিহ্যগঠনের সূত্রপাতও ঐ সময়েই ঘটে।

লৌহযুগে বস্তুগত প্রকৌশলে তেমন বিরাট কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, যদিও এই যুগেই কাচের এবং নানাবিধ উন্নত যান্ত্রিক হাতিয়ার ও যন্ত্রের প্রবর্তন ঘটে। এযুগের সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো সভ্যতাকে দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া। নতুন আবিষ্কৃত শস্তা ধাতুটি—অর্থাৎ লোহা—এ কাজে সহায়ক হয়। এবং এরই পাশাপাশি বর্ণমালা, টাকা, রাজনীতি এবং দর্শন প্রমুখ সামাজিক উদ্ভাবনগুলি প্রকৌশল ও বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশ ও ব্যাপ্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। এই পর্বেই গ্রীকরা প্রাচীনতর সাম্রাজ্যগুলির প্রকৌশল-অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটিয়ে প্রথম এক সম্পূর্ণ যুক্তিশাসিত বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটায়। সেই গ্রীক ট্র্যাডিশন আজও 'সমানে চলেছে'। আবার এই প্রাচীন গ্রীক যুগেই যুদ্ধবিগ্রহ ও সামাজিক সংঘাত চলে, দাসত্ব প্রথা আর উৎপীড়ন চলে। এর চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে। পৌর কর্ম আর আইনের অঙ্গনে সে সাম্রাজ্যের অনেক অবদান ছিল; কিন্তু বিজ্ঞানে তার অবদান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। নিজস্ব অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের চাপেই ধীরে ধীরে তার রাজনৈতিক ও মননগত অবক্ষয় ঘটে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে ধ্রুপদী প্রাচীন বিজ্ঞানও রাহুগ্রস্ত হয়, যদিও পারস্যে, ভারতবর্ষে এবং চীনে তার সমান্তরাল ধারা বিকশিত হয়েই চলে। এইসব সমান্তরাল ধারাই পরবর্তী নতুন অগ্রগতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকে।

আদি মানবসমাজ : পুরাপ্রস্তরযুগ

1. সমাজের উদ্ভব

বিজ্ঞানের আদিতম উৎসের সন্ধান করতে গেলে আমাদের সেই প্রাচীন যুগে ফিরে যেতে হবে যখন মানবসংস্কৃতির প্রকৌশলগত দিক আর মতাদর্শগত দিকের মধ্যে কোনো কার্যকর বিচ্ছেদ ঘটেনি। অর্থাৎ আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে একেবারে মানুষেরই উৎস নিয়ে। মানুষের সঙ্গে পশুর প্রথম এবং সবচেয়ে মৌলিক পার্থক্যটি এই যে মানুষ সমাজ গঠন করে; সে সমাজ অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় এগিয়ে চলে; সে সমাজের বস্তুনির্ভর সংস্কৃতি মানুষের দেহের ক্ষমতার পাল্লাকে বাড়িয়ে চলে।

এই সমাজ জিনিসটা পশুদের যূথ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। একেকজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির পক্ষে একলা খাদ্য সংগ্রহ করা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার কাজ যতটা সহজসাধ্য, সমাজের মারফৎ তার চেয়ে ভালো উপায় নিশ্চয়ই পাওয়া গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সেই উন্নততর পদ্ধতিকে একটা অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের সূত্রে গেঁথে সংরক্ষণ ও সঞ্চার করার উপায়ও নিশ্চয়ই বেরিয়েছিল। তার আগেই বনমানুষ-সদৃশ প্রাণী থেকে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষ জিনিসপত্র *দেখার*, *আঁকড়ে ধরার* এবং *নাড়াচাড়া করার* উপযোগী মূল দৈহিক ও মানসিক সরঞ্জামের অধিকারী হয়েছিল। তাছাড়া. অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীবের তুলনায় মানুষের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা নিশ্চয়ই গোড়া থেকেই অনেক বেশি ছিল। কারণ অন্যান্য বৃহৎ স্তন্যপায়ী জীবের দেহ ও আচরণ তাদের জীবনধারণের বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী নিরতিশয় বিশেষীভূত। কিন্তু মানুষের জীবনধারণের প্রক্রিয়া অত বিশেষীভূত নয়, তা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। সেইজন্যেই মানুষের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা এত উন্নত। একদিকে হাত আর চোখের সমন্বয়, অন্যদিকে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা—এই দুইয়ে মিলে হাতিয়ারের ব্যবহারকে সম্ভব করে তোলে। প্রথমে হয়তো নেহাৎ ঘটনাচক্রে একজন মানুষ একটা পাথর বা গাছের একটা ডাল হাতে তুলে নিয়েছিল। অতঃপর কোনো একটা বিশেষ কাজ করবার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে একটা পাথর বা ডাল বেছে নিয়ে মানুষ তাকে প্রয়োজনীয় আকার দিতে শেখে। কিন্তু এই ধরনের উন্নতি যতক্ষণ একজন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ সে প্রক্রিয়াটিকে পূর্ণ অর্থে মানবিক বলা চলে না, তা সেই ব্যক্তি যত বড়ো গুণীই হোন না কেন। আর, কোনো হাতিয়ারকে যদি সকলের পক্ষে সুলভ করে তুলতে হয়, যদি তার উন্নতিসাধনের কাজ চালিয়ে যেতে হয়, তাহলে তার নির্মাণ ও ব্যবহারের পদ্ধতি *শেখাতে* ও *শিখতে* হয়; ঐতিহ্যের সাহায্য নিয়ে তাকে *প্রমিত* (standardize) করতে হয়। আর তা করতে গেলেই প্রয়োজন সামাজিক ধারাবাহিকতা।

মানুষের সমাজের এই নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে আরো এই কারণে যে মানবশিশু বড়ো হয়ে উঠতে অন্য যে কোনো পশুর তুলনায় অনেক বেশি সময় নেয়। এর ফলে বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের, বিশেষত মেয়েদের, ঘনিষ্ঠ সহযোগের মধ্যে দিয়ে কার্যত এক স্থায়ী পারিবারিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। দিদিমা, মা ও মেয়ের মধ্যে দিয়ে এক অবিচ্ছিন্ন মানবিক ঐতিহ্যের ধারা সুনিশ্চিতভাবে প্রবাহিত হয়ে চলে। মূলত এই কারণেই আদিম সমাজে কোমের (tribe) ভরণপোষণের ভার মেয়েদের ওপরেই বর্তাত। আত্মীয়তা যেহেতু মায়েদের সূত্রেই গড়ে উঠত, তাই এই সমাজকে বলা যেতে পারে *মাতৃধারানুসারী*

(matrilinear)। প্রতিটি সমাজের ইতিহাসেই এক মাতৃধারানুসারী পর্ব ছিল বলে মনে হয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের সমাজেও। এমনও হতে পারে যে একেবারে গোড়ার দিকে মেয়েরা গোষ্ঠী পরিচালনাও করতেন; অর্থাৎ সে সমাজ *মাতৃশাসিতও* (matriarchal) ছিল।

যেসব পদ্ধতির প্রয়োগ মানুষের সমাজের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী হয়েছিল সেগুলোর মূলে ছিল খাবার ধরা, খাবার সংগ্রহ করা, খাবার পরিবহন করা এবং খাবার তৈরি করার উদ্দেশ্যে বস্তুগঠিত প্রয়োগযন্ত্রের ব্যবহার। তাছাড়া এইসব কর্মসাধনের জন্য যে সহযোগিতা প্রয়োজন তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য দ্রুত বার্তাবিনিময়ের কোনো একটা উপায়ের উপরেও তা নির্ভরশীল ছিল। সেই উপায়েরই নাম *ভাষা।* দাঁত আর শিঙের অস্ত্রে যতই সুসজ্জিত হোক, কোনো পশুর পক্ষে কখনো পরিবেশের ওপর মানুষের মতো ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কেননা মানুষ সে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে প্রয়োগযন্ত্রের মাধ্যমে; আর অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের মারফত ভাষা সেই প্রয়োগযন্ত্রের ব্যবহারকে অত্যন্ত সুসাধ্য করে তোলে। শুধু তাই নয়, সমাজকে সুসংবদ্ধ রূপদান করার এবং সমাজের সঞ্চিত সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে পরবর্তী প্রজন্মসমূহের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজটিকেও সুনিশ্চিত করে এই ভাষা।

2. আদিম জীবনযাত্রার বস্তুগত ভিত্তি

নির্মাণযন্ত্র ও হাতিয়ার

হাতিয়ার জিনিসটা মূলত মানুষের অঙ্গেরই পরিবর্ধিত রূপ। যেমন, পাথর হচ্ছে মুষ্টি আর দাঁতের পরিবর্ধিত রূপ; লাঠি হচ্ছে হাতের পরিবর্ধিত রূপ; থলে বা ঝুড়ি হচ্ছে হাত বা মুখের পরিবর্ধিত রূপ। সম্পূর্ণ নতুন আরেক ধরনের পরিবর্ধন ঘটে যখন কোনো বস্তুকে মানুষের দেহ থেকে অভিক্ষেপ করা বা ছোঁড়া হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তাগ-করে ছোঁড়া পাথর এর নিদর্শন। এইসব হাতিয়ারের নির্বাচন ও ব্যবহারের জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। তারপর যখন কাঁচা মাল থেকে সচেতন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ঐসব হাতিয়ার গড়ে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন সে নিয়ন্ত্রণ আরো ব্যাপক হয়ে উঠল। কাজেই প্রত্যেক ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার, আকার ও নির্মাণকৌশল সামাজিকভাবে নির্ধারিত হতে থাকে।

আদিমানব হাতে করে যেসব জিনিস বানাত, তার মধ্যে আদিম জীবনযাত্রার ঐতিহ্যের এক ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়। প্রাচীনতম পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ থেকে সেই ধারাবাহিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমসাময়িক বন্য সমাজে ঐসব জিনিস ঠিক কোন কাজে লাগত তা যদি আমরা না-ও জানতাম, তবু ওগুলোর মধ্যে থেকে তাদের সামাজিক উৎপত্তির সাক্ষ্য চিনে নিতে আমাদের অসুবিধে হতো না। দেখা গেছে, কোনো একটি নির্দিষ্ট জীবনধারায় কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একেকটি বিশেষ হাতিয়ারের একটির সঙ্গে অন্যটির কার্যত কোনো তফাৎ নেই। দীর্ঘকাল ধরে, সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এইসব হাতিয়ারের অপরিবর্তিত রূপ চোখে পড়ে।এখন, সরলতম পাথুরে হাত-কুঠার গড়তে হলেও কিন্তু খোদাইয়ের (chipping) এক জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। বস্তুত সে কায়দা রপ্ত করতে হলে সভ্য মানুষেরও রীতিমতো সময় লেগে যাবে। তাই পাথুরে হাত-কুঠারের ঐ নির্দিষ্ট গড়নটি যে অতকাল ধরে অটুট ছিল, তার থেকে বোঝা যায় প্রকৌশলের ঐতিহ্যের স্থায়িত্ব কতখানি। অর্থাৎ পাথুরে হাতিয়ার গড়ার বাস্তব প্রক্রিয়াটা ছিল এক প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক কর্ম। তাকে অতি যত্নে শিখতে ও প্রয়োগ করতে হতো। তা নাহলে তাদের একটির সঙ্গে অন্যটির গড়নের মধ্যে এতখানি সাদৃশ্য থাকত না।

তবে এই সাদৃশ্য চির-অপরিবর্তনীয় নয়। অবধারিতরূপেই ঘটে পরিবর্তন। নানারকমের উন্নতিসাধন, নানারকমের আহরণ, নানারকমের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে বিবর্তিত

হয়েই তো প্রকৌশল বর্তমান স্তরে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যাপারটা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে সামাজিক অভিযোজনের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রতেকটি ধাপেই এমন একেক প্রস্থ হাতিয়ার গড়ে নিতে পেরেছে যার অবিকল পুনরুৎপাদন ঘটানো সম্ভব, এবং যার গড়ন কার্যত প্রমিত (standard)। যে কৌম গোষ্ঠী যেভাবে তার জীবন নির্বাহ করে তার সঙ্গে সংগতি রেখে নির্দিষ্ট একেক প্রস্থ হাতিয়ার গড়ে ওঠে। সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সেসব হাতিয়ারের অনেকগুলোরই গড়ন হয় অভিন্ন। আদিম মানবসমাজের একেবারে প্রাথমিক পর্ব থেকেই প্রমাণ গড়নের একেক প্রস্থ হাতিয়ার তৈরির এই অভ্যাসটি লক্ষণীয়। প্রকৌশলগত সংস্কৃতি যে সেই আদিযুগ থেকে আরম্ভ করে একেবারে বর্তমান যুগ পর্যন্ত একটানা সংরক্ষিত হয়ে এসেছে, তার মূলে উক্ত অভ্যাসের ভূমিকা বিরাট।

প্রমাণ গড়নের হাতিয়ার থাকার আরেকটি তাৎপর্য আছে। সেটা এই যে, একটা হাতিয়ার গড়তে বসার আগে কারিগরের মাথায় সেই হাতিয়ারের একটা ছবি বা ভাবরূপ থাকে। শুধু ভাবরূপ নয়, এমন কিছু কিছু আধা-সম্পূর্ণ পাথুরে হাতিয়ার পাওয়া গেছে যার গায়ে নির্মীয়মান হাতিয়ারটির ছক আগে থেকে পরিষ্কার করে খোদা রয়েছে। সচেতন দূরদৃষ্টির এই অভিজ্ঞতাই পরে *নকশা* এবং *পরিকল্পনার* রূপ নেয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানের যা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সেই *পরীক্ষানির্ভর* পদ্ধতির সূত্রপাত এইখানেই। আসল জিনিসটাকে একেবারে পূর্ণমাত্রায় তৈরি করতে যাওয়ার আগে তার মডেল বা রেখাচিত্র এঁকে নিয়ে সেই জিনিসটাকে তৈরি করার নানা রকম সম্ভাব্য উপায় হাতেকলমে খতিয়ে দেখার প্রয়াস থেকেই এর উদ্ভব।

পাথুরে হাতিয়ার তুলে নিয়ে নিক্ষেপ করাব মধ্যে দিয়ে মানুষের যে-প্রকৌশলগত অগ্রগতির সূচনা হয়, তার সম্ভাবনা *নির্মাণযন্ত্র* (tool) তৈরির মধ্যে দিয়ে হয়ে ওঠে অসীম। নির্মাণযন্ত্র হাতে এসে গেলে তখন বিভিন্ন ধরনের অনেক হাতিয়ার তৈরির সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন আর প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে হাতিয়ার নিছক বেছে বা ছিনিয়ে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় না। নির্মাণযন্ত্র প্রথমে তৈরি হতো পাথর কুঁদে, তারপর ঘষে, সবশেষে ধাতু পেটাই ও ঢালাই করে। বস্তুগঠিত পদার্থকে ভৌত প্রক্রিয়ার অধীন করার যেসব আধুনিক প্রকৌশল আমাদের হাতে রয়েছে, তা ঐসব আদি প্রক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত। হাতে করে ব্যবহার করবার জন্য প্রথম যে নির্মাণযন্ত্রগুলো তৈরি হয় তার কাজ ছিল একটাই : আঘাত করে চূর্ণ করা। পরে চেরা, কাটা, চাঁছা এবং ফোঁড়ার নির্মাণযন্ত্র তৈরি হয়। এইসব নির্মাণযন্ত্র তৈরি ও ব্যবহার করতে করতে মানুষ বহু প্রাকৃতিক পদার্থের যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ জানতে পারে; এইভাবেই ভৌত বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়। নির্মাণযন্ত্রের ব্যবহারের দরুন মানুষের শিকারপটুতা তো বহুগুণে বেড়ে গেলই, উপরন্তু সে অপেক্ষাকৃত নরম পদার্থকে—যথা কাঠ, হাড় এবং চামড়াকে—প্রয়োজনানুগ রূপ দিতে বা গড়ে নিতে পারল। এরই পাশাপাশি মানুষ—সম্ভবত মেয়েমানুষ—বিভিন্ন জিনিস জোড়া লাগাতে শিখছিল; অর্থাৎ গাঁথা, সেলাই করা, বাঁধা, মোচড়ানো, প্যাঁচানো এবং বোনা শিখছিল। এইভাবে খাদ্য, জল এবং বহনযোগ্য পদার্থের আধার তৈরি হয়।

পোশাক

বিভিন্ন জিনিস—প্রথম দিকে কেবল খাবার আর হাতিয়ার—বহন করে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে নানারকম বস্তুকে শরীরের সঙ্গে শক্ত করে সংলগ্ন করে নেওয়ার রীতির উদ্ভব হয়। শরীরের যে-যে অংশ একাজে সহায়ক তা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে থাকে—যথা চুল, গলা ও ঘাড়, কোমর, কব্জি এবং গোড়ালি। পরে এইসব বন্ধনগুলো স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত এবং আলংকারিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠতে থাকে। অতঃপর তার সঙ্গে পালক, হাড় ও চামড়ারও ব্যবহার শুরু

হয়। তারই পরে ঘটে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। মানুষ দেখতে পায়, লোমশ চামড়ার আচ্ছাদন গায়ে থাকলে শীতের রাতে ঠাণ্ডা লাগে না, শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচা যায়। এ থেকেই পোশাকের উৎপত্তি। প্রথমে আলখাল্লা আর ঘাগরা, পরে সেলাই করা এবং গায়ের মাপে প্রস্তুত পরিধান তৈরি হয়। একেকটি পরিধান একেকজনের সমগ্র দেহকে পুরোপুরি আচ্ছাদিত করত—যে ধরনের পোশাক আজকে এস্কিমোরা পরেন। এর সঙ্গে যখন চামড়ার তৈরি পদাবরণ যুক্ত হলো, তখন আদিম মানুষের গতিবিধির পরিধি বিপুলভাবে বেড়ে গেল, সে সব ঋতুতেই সচল থাকতে পারল। আরো একটা জিনিস আদিম মানুষের বসবাসকে সহজ করে তুলল: সেটা হলো বায়ুত্রাণ—গাছের ডাল আর পাতা দিয়ে তৈরি আশ্রয়। এটা অবশ্য কৃষিযুগের আগে বিশেষ দেখা যায়নি। এ থেকেই পরে কুটির ও গৃহের উদ্ভব হয়।

আগুন ও রন্ধনক্রিয়া

আদিম মানুষ যেসব যান্ত্রিক উদ্ভাবন ঘটিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছিল, তার প্রায় প্রত্যেকটি ক্রিয়াই কোনো না কোনো পশু, পাখি, এমনকি পতঙ্গের কাজকর্মের মধ্যে আগে থেকেই লক্ষ্য করা যেত। এমনকি বয়ন ও পোশাকনির্মাণও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু আগুনের ব্যবহার মানুষের এমনই এক উদ্ভাবন যা পশুর নাগালের বাইরে। অথচ মানুষ পূর্বোক্ত কৌশলগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি আগুনের ব্যবহার রপ্ত করার আগেই উদ্ভাবন করেছিল। মানুষ কী করে আগুনের সংস্পর্শে এল, কেন সে সাহসভরে আগুনকে বশে আনতে উদ্যোগী হলো, তা আজও অজানা। দাবানল জিনিসটা হয় বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে (যেমন আগ্নেয়গিরির বা প্রাকৃতিক গ্যাস-উৎসমুখের কাছাকাছি), নাহয় তা জঙ্গলে মাঝে মাঝে দেখা দেয়। আগুনকে সংরক্ষণ করা এবং তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ গোড়াতে নিশ্চয়ই খুব ভীতিপ্রদ, বিপদসংকুল এবং কঠিন বলে প্রমাণিত হয়েছিল। আগুন নিয়ে সবদেশেই যেসব কল্পকথা আর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সেগুলো তার সাক্ষী। সবার আগে নিশ্চয়ই আগুনের ব্যবহার ঘটেছিল শীতল রাতে শরীর গরম রাখবার জন্যে এবং জন্তুজানোয়ারদের ভয় দেখানোর জন্যে (অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা শীতে শরীর গরম রাখবার জন্যে জামাকাপড় পরবার বদলে আজও মশাল জ্বেলে হাতে হাতে ঘোরায়)। নিয়মিত শিবিরাগ্নি (camp fire) জ্বালার রেওয়াজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তার পরে নিশ্চয়ই রন্ধন-প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে।

নির্মাণযন্ত্রের এবং আগুনের ব্যবহারপটু এই প্রাণীটি ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানমুখী মানবসমাজে রূপ নেওয়ার পথে বেশ কিছুদূর এগিয়ে এসেছিল। কারণ, নির্মাণযন্ত্র যেমন ভৌত এবং যান্ত্রিক বিজ্ঞানের ভিত্তি, তেমনি আগুন হচ্ছে রসায়নিক বিজ্ঞানের ভিত্তি। এর ফলে সবার আগে উদ্ভব হলো রন্ধনপ্রক্রিয়ার—যা অতি সরল এবং মূলত রসায়নিক ক্রিয়ানির্ভর। আগুনের এই আপাতদৃষ্টিতে প্রায়-আকস্মিক প্রয়োগের সূত্র ধরেই প্রথমে মৃৎকর্মে এবং অতঃপর ধাতু-কর্মে আগুনের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার চালু হয়ে যায়। সেই বৈজ্ঞানিক ব্যবহার অনেক সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণসাধ্য। শিকে গেঁথে মাংস ঝলসানো, এমনকি ছাইয়ের তাতে গাছের শেকড় সেঁকে নেওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু জল ফোটানো ছিল একটা সত্যিকারের সমস্যা। সে সমস্যার সমাধানের সূত্রেই পরে অনেক বড়ো বড়ো অগ্রগতির সূচনা হয়। জল ফোটানোর জন্য প্রথমে চামড়ার বালতিতে কিংবা জলনিরোধী ঝুড়িতে জলের মধ্যে গরম পাথর ফেলে দেওয়ার চমকপ্রদ ধারণাটির প্রয়োগ ঘটে। এইভাবে প্রথমে তপ্ত এবং পরে শীতলীকৃত হওয়ার দরুন চিড়-খাওয়া বহু পাথরের টুকরো প্রাগৈতিহাসিক মানবশিবিরের আশেপাশে পাওয়া গেছে। এইসবের মধ্যে থেকে একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটে। মানুষ দেখে, ঝুড়ির গায়ে মাটির

পুরু প্রলেপ মাখিয়ে নিলে সেটাকে আগুনে চড়ানো যায় এবং তা অনেক শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে। পরে, সম্ভবত পুরাপ্রস্তর যুগের শেষ দিকে, মানুষ এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করে যে ঝুড়িটাকে বাদ দিয়ে শুধু মাটির পাত্র বানালে সে পাত্রে জল রাখা সম্ভব হয় এবং তা তাপসহ হয়। তারপরেও অবশ্য ফোটানোর ব্যাপারটা একটা বিলাসিতা হিসেবেই থেকে যায়; কেননা পাত্রগুলো হতো ভারি, শিকারের সময় তাদের বহন করে নিয়ে যাওয়া ছিল কষ্টসাধ্য। ফোটানো বা সেদ্ধ করা ব্যাপারটা যে কতবড়ো বিলাসিতা ছিল তার প্রমাণ হচ্ছে, উত্তর আমেরিকার সমতলভূমির রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে 'ফোটানো (বা সেদ্ধ) মাংস' কথাটার অর্থই হলো ভূরিভোজ।

এরপর এমন সব পাত্রের ব্যবহার চালু হলো যাতে দীর্ঘদিন ধরে তরল রেখে দেওয়া যায়। দীর্ঘদিন থাকার ফলে তরলের মধ্যে সন্ধানপ্রক্রিয়া (fermentation) চলে। তার দরুন ধীরে ধীরে যেসব রসায়নিক পরিবর্তন ঘটে সেগুলো মানুষ লক্ষ্য করে এবং তাদের কাজে লাগায়। এইসব জ্ঞানলাভের ফলে অবশেষে বিভিন্ন উপাদানকে বিকারকের (reagent) মধ্যে চুবিয়ে বা নিমজ্জিত করে রেখে তাদের রূপান্তর ঘটানোর সাধারণ ধারণাটির উদ্ভব ঘটে। এই ধারণার প্রয়োগের প্রথম বিজয়স্তম্ভরূপে চামড়া পাকা করার কৌশল এবং রঞ্জনবিদ্যার (dyeing) আবির্ভাব হয়। কাজেই, পুরাপ্রস্তরযুগেই মানুষ এমন একপ্রস্থ ব্যবহারিক নির্মাণকৌশল রপ্ত করে ফেলেছিল যা থেকে পরে যুক্তিশাসিত রসায়নের জন্ম হয়।

পশুবিষয়ক লোককথা

তবে এই যে ক্রিয়াপর জ্ঞান; নির্মাণযন্ত্র এবং আগুনের এই যে ব্যবহার; এ মানুষের সঞ্চিত ও সঞ্চারিত অভিজ্ঞতার প্রয়োগের নিছক একটি অংশ মাত্র। এবং সেটি গোড়াতে খুব সম্ভব নিতান্ত ক্ষুদ্র এক অংশ রূপেই বিরাজ করত। সে তুলনায় প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে সঞ্চিত জ্ঞানই মানুষের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেহেতু তা সাক্ষাৎ প্রয়োজন সাধন করত অনেক বেশি। সে জ্ঞান কিছুকাল আগে থেকেই সঞ্চয় করতে শুরু করেছিল মানুষ। এখানে 'প্রকৃতি' শব্দটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি না। এখানে 'প্রকৃতি' বলতে কেবল সেইটুকুই বোঝাচ্ছি যা মানুষের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর সঙ্গে যুক্ত, বিশেষ করে তার খাদ্যের প্রয়োজন মেটানোর সঙ্গে। এইভাবে মানুষ পশুপক্ষীর আচরণ এবং গাছপালার ধর্ম নিয়ে যে জ্ঞান আহরণ করে, পরে তারই ভিত্তিতে আমাদের আধুনিক *জীববিজ্ঞান* গড়ে ওঠে। আদিম মানবের কৌতূহল ও আগ্রহের একটা খুব বড়ো অংশ নিশ্চয়ই গাছপালা ও পশুপক্ষী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা ও তা ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে নিয়োজিত থাকত। তার মধ্যে পশুপক্ষী নিয়ে আগ্রহই ছিল সবচেয়ে প্রবল। তার একটা কারণ হলো, পশুপক্ষীর চলাফেরা; আর একটা কারণ হলো, পশু শিকারের উত্তেজনা এবং বিপদসংকুলতা।

আদিম চিত্রকলা

এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে পারি যে আজকের দিনেও যেসব কোম (tribe) শিকারভিত্তিক সমাজের স্তরেই রয়ে গেছে, তাদের আচার-অনুষ্ঠানে পশুনৃত্যের ভূমিকা বিরাট। এইসব কোম প্রকৃতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী। অতীতেও অবস্থাটা যে এইরকমই ছিল তার প্রমাণস্বরূপ পৃথিবীর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আকীর্ণ গুহাচিত্র, রেখাচিত্র এবং ভাস্কর্যের উল্লেখ করতে পারি। এগুলো প্রায় সবই পশুদের। এইসব চিত্র ও ভাস্কর্য কেবল পশুদেহের বহিরবয়বকে ফুটিয়ে তুলেই ক্ষান্ত হয়নি; অনেকসময় হাড়, হৃৎপিণ্ড এবং

নাড়িভুঁড়ির চেহারাও দেখানো হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, শিকার-করা পশু কাটতে গিয়েই *শারীরস্থানবিদ্যার* (anatomy) উৎপত্তি হয়। বস্তুত, আদিম জীবনযাত্রার এই জৈব দিকটির কল্যাণেই আমরা চিত্রের মাধ্যমে কোনো কিছু উপস্থাপনার বিভিন্ন প্রকৌশল লাভ করেছি। তা কেবল দৃশ্য (visual) শিল্পেরই নয়, চিত্রপ্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপনার, গণিতের এবং লিখনেরও উৎসস্থল। এবং এগুলির উদ্ভব না হলে যুক্তিশাসিত বিজ্ঞানেরও উদ্ভব হতো না।

3. আদিম জীবনযাত্রার সামাজিক ভিত্তি

ভাষা

উপরোক্ত প্রসারণ ঘটার বহু আগে থেকেই মানবসমাজে ভাষার উদ্ভব ঘটতে শুরু করেছিল। এই ভাষাই মানবসমাজের সংহতি সাধন ও বিকাশের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। ভাষা ব্যাপারটাই আসলে উৎপাদনের এক উপকরণ; সম্ভবত ভাষাই মানুষের প্রথম উৎপাদন-উপকরণ। খালি হাতে কিংবা নির্দিষ্ট আকারহীন লাঠি বা পাথর নিয়ে শিকার তাড়া করতে হলে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে যে সহযোগিতা প্রয়োজন, তা *অঙ্গভঙ্গি* বা *কথার* প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়। এমন হওয়াটা খুবই সম্ভব যে বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট আকারের উপকরণ গড়ে নেওয়ার বহু আগে থেকেই এ প্রয়োগ ঘটে আসছে। প্রাথমিক পর্বে ভাষা নিশ্চয়ই প্রধানত খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপার নিয়েই ব্যাপৃত ছিল। মানুষের চলাফেরা, হাতিয়ার তৈরি ও ব্যবহার—এসবও নিশ্চয়ই তার অন্তর্গত ছিল।*

ভাষা আয়ত্ত করার ঘটনাটা যে বহুকাল আগে ঘটেছিল তার প্রমাণ এই যে মানবমস্তিষ্কের বংশানুক্রমিক গঠনকে তা ইতিমধ্যেই বিপুল মাত্রায় প্রভাবিত করেছে। মানবমস্তিষ্কের অর্ধেকের বেশি জায়গা চোখ আর হাতের সমন্বয়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে; কিন্তু এই গঠন বনমানুষ-পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আহরিত গঠনেরই এক প্রসারণ মাত্র। পক্ষান্তরে, মানবমস্তিষ্কে কান আর জিভের সমন্বয়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে অংশটি নির্দিষ্ট রয়েছে তার পরিসর অতটা বড়ো না হলেও তা কার্যত এক নতুন সংযোজন। এই নতুন সংযোজনটি নিঃসন্দেহেই মানুষের সমাজের উদ্ভব ঘটার পরে ঘটেছে এবং মানুষের বংশগতির মধ্যে অম্বিত হয়েছে।

সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীই সামাজিক বার্তা ব্যক্ত করার পন্থা রূপে কণ্ঠস্বরকে অল্পবিস্তর ব্যবহার করে। কিন্তু সে বার্তা মূলত আবেগঘটিত—যৌনকামনা, ক্রোধ বা ভয় সংক্রান্ত। কণ্ঠনিঃসৃত সেইসব আওয়াজ আবার অন্যদের মধ্যে যথাযথ আবেগঘটিত প্রতিক্রিয়া বা সাড়া জাগিয়ে তোলে। আবেগ ও ক্রিয়াঘটিত এই বার্তার সঙ্গে বস্তু ও স্থানবিষয়ক তথ্যসংক্রান্ত বার্তা যুক্ত হয় অনেক পরে। এই উত্তরণের প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত। কবিতা, গান ও সুরের মধ্যে ভাষার এই

* নির্মাণযন্ত্র ও বাচনের বিকাশের একেবারে আদি পর্বটিই স্পষ্টত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; যদিও ঐ দুই পর্বের সন্ধান করাটাই সবচেয়ে দুরূহ। বাচনের প্রাক্-মানবিক উৎপত্তির ধারণা বিষয়ে অধ্যাপক হলডেনের মত আগে উল্লেখ করেছি।তিনি আরো মনে করেন, কোনো কোনো পুরাপ্রস্তরযুগীয় প্রকৌশলের উৎপত্তির মূলে ছিল সহজাত প্রবৃত্তি (যেমন করে পাখিরা বাসা বানায়)। বিকাশের গতি যতদিন অপেক্ষাকৃত মন্থর ছিল, ততদিন এরকমটা ঘটা অসম্ভব নয়। পাখিদের মধ্যে অভিজ্ঞতার বংশানুক্রমিক সঞ্চারের এই প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত মন্থর। আমার মনে হয় একটা ক্রান্তিক স্তর পেরিয়ে যাওয়ার পর প্রকৌশলের জ্ঞান নিশ্চয়ই সামাজিক প্রক্রিয়াতেই সঞ্চারিত হতে থাকে। আর সেটাই প্রকৃত মানবতার উদ্ভবলগ্ন।

—জে· ডি· বি

অন্তঃসলিলা আবেগগত দিকটি প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু নিছক কথ্য ভাষার মধ্যেও আবেগ কখনো পুরোপুরি অনুপস্থিত থাকে না। থাকেনা বলেই ভাষার মধ্যে মনকে নাড়া দেওয়ার উপাদান থাকে। সে উপাদানের প্রভাব কখনো কখনো অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ভাষার *জাদুশক্তিতে* (মন্ত্রশক্তিতে) বিশ্বাস সেই কারণেই গড়ে উঠেছিল। তবু একথা অনস্বীকার্য যে ভাষার প্রয়োজনসাধক দিকটি সর্বদাই ছিল মুখ্য এবং তার মন্ত্র বা জাদুঘটিত দিকটি ছিল গৌণ।

গোড়া থেকেই ভাষা জিনিসটা প্রায় পুরোপুরিই যদৃচ্ছ এবং প্রথাবদ্ধ পথে গড়ে উঠেছিল। একেকটি স্বতন্ত্র জনসমাজে বিভিন্ন ধ্বনির অর্থ সর্বস্বীকৃত হয়ে উঠতে থাকে। অতঃপর সেই জনসমাজের নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার সূত্রে তা একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষায় পরিণত হয়। বস্তুময় এবং সামাজিক জীবনের সমগ্র পরিসরটি সেই ভাষার আওতায় চলে আসে। সেই কারণেই, সব মানুষেরই যেমন ভাষা আছে, তেমনি আবার ভাষার বৈচিত্র্যও এমন বিপুল।

যেসব বস্তু ও পরিস্থিতি ভাষার আধাবে ব্যক্ত হয় তারা ভাষার ধ্বনিরূপের তুলনায় বহুগুণে জটিল। সুতরাং কোনো ভাষার অন্তর্গত কথানিচয় অবশ্যই *বিমূর্ত* এবং *সামান্যীভূত* (generalized) *প্রতীক* রূপে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কোনো একটা পরিস্থিতিতে যে রীতিসিদ্ধ কাজটি করা প্রয়োজন, কেবল সেইটুকুর ইঙ্গিত দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়। নিজস্ব ভাষা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই মানুষের একেকটি সমাজ সামান্যীকরণ ঘটাতে বাধ্য হয়; একটিমাত্র কথা বা শব্দ অনেকগুলি জিনিসকে ব্যক্ত করে। গঠিত হয় বাচিক প্রতীকরূপ বা সাঁটরূপ। মস্তিষ্কের মধ্যে এইসব প্রতীকরূপকে প্রত্যক্ষ *দৃশ্যকল্প গঠনের* (imagination) সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়েই *চিন্তার* উদ্ভব হয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন *সূত্র* এবং *তত্ত্ব* ভাষা গড়ে তোলার এই প্রক্রিয়ারই এক স্বাভাবিক এবং সতর্ক প্রসাবণ মাত্র। (আমরা পরে দেখাব যে বাচিক প্রতীকরূপ যেমন জ্ঞানের আধার হতে পারে তেমনি ভ্রান্তিরও আধার হতে পারে) কথার দমনাতীত বা আবেগগত দিকটির ওপর জোর পড়লে তা হয়ে ওঠে জাদুঘটিত আবেগ বা *ঘোর;* আর প্রতীকটাকেই যদি বস্তুগঠিত পদার্থ বা বাস্তব ক্রিয়ার স্থলাভিষিক্ত করা হয়, তাহলে তা হয়ে ওঠে ভাববাদী *যুক্তিবিদ্যার* ছকের একেকটি ঘুঁটি।

আদিম সামাজিক জীবনযাত্রা

ভাষা যতই বৈচিত্র্যময় ও পরিবর্তনশীল হোক, প্রকৌশলের তুলনায় ভাষার স্থায়িত্ব বহুগুণে বেশি। প্রস্তরযুগের অবসান ঘটেছে কতকাল আগে, তবু আজও আমরা যেসব ভাষায় কথা বলি তা মূলত ঐ যুগেরই বিভিন্ন কোমের মুখের ভাষা। কাজেই ভাষা জিনিসটা হচ্ছে এক সজীব পুরাবশেষ (relic)। মানুষের বস্তুগঠিত সংস্কৃতির টিকে-থাকা পুরাবশেষ নিয়ে যে গবেষণা চলে, তার পরিপূরক হিসেবেই ভাষা নিয়ে গবেষণা চালানো উচিত। এই দুই গবেষণার সঙ্গে এখনো-আদিম স্তরে বিদ্যমান মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্যকে যদি মেলানো যায়, তাহলে আদিমযুগের মানুষের জীবনযাত্রার একটা মোটামুটি ছবি আঁকা যেতে পারে। সে ছবি আঁকার স্থান এটা নয়, সে ছবি আঁকবার যোগ্যতাও আমার নেই। এখানে কেবল বিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং প্রভাবশীলতার সঙ্গে ঐ চিত্রের যেসব অংশের যোগ রয়েছে সেগুলোর প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেই ক্ষান্ত হব।

একটা সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিশ্চয়ই সেই গোষ্ঠীর প্রতিটি নরনারীর কাজকর্ম ও অনুভূতিকে গভীরভাবে সংপরিবর্তিত করেছিল একেবারে গোড়া

থেকেই। খাদ্যের সন্ধান, খাবার বানানো, খাদ্যের বণ্টন, এমনকি আহারের প্রক্রিয়া ও আয়োজন (যা অনেক সময়েই আনুষ্ঠানিক)—এসবই ছিল সামাজিক কর্ম। এইসব কর্মের সুনির্দিষ্ট মানবিক বৈশিষ্ট্যটি এই যে খাদ্যের প্রতি পশুদের সহজাত বা শর্তহীন (unconditioned) প্রতিক্রিয়া থেকে তা বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। খিদে পেলেই পশু খাবার খায় এবং তখন অন্য পশুদের সে খাবার থেকে দূরে রাখে। কিন্তু এ ব্যাপারে মানুষের প্রতিক্রিয়া সামাজিক গোষ্ঠীর সংহতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত ঐতিহ্যসম্মত রীতিনীতির দ্বারা গভীরভাবে শর্তায়িত (conditioned)। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, *মানুষই একমাত্র প্রাণী যা পূর্ণমাত্রায় স্ব-শিক্ষণশীল*। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী সহজাত প্রকৃতিবশত জন্মের পরের কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ শাবকদের প্রশিক্ষণ দেয়। কিন্তু মানবশিশুকে এক সুদীর্ঘ শিক্ষণপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সে প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় তার জন্মকালে, এবং তা চলে বহু বছর ধরে। সামাজিক অভ্যস্তকরণের বা *শিক্ষার* এই প্রক্রিয়াটি একান্তই ঐতিহ্যানুসারী। এবং সমাজের উদ্ভব ঘটার আদিলগ্ন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে, তার পরিবর্তন ঘটেছে খুবই ধীর গতিতে।

খাদ্য-সংগ্রহ ও শিকার: শ্রমবিভাজন

মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিবেশগত চরিত্রটি কেমন হবে, সেটা তার খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতির ওপরে নির্ভর করত—প্রথম দিকে তো পুরোপুরিই নির্ভর করত, পরেও অনেক পরিমাণে। একেবারে গোড়ার দিকে মানুষ নিশ্চয়ই ভক্ষণযোগ্য যেকোনো জিনিসই সংগ্রহ করত—নানারকম বীজ, বাদাম, শেকড়বাকড, মধু, কীটপতঙ্গ, খালি-হাতে ধরা যায় এমন যেকোনো ছোটো প্রাণী। মানুষের এই পর্বের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনা, কেবল যুক্তিভিত্তিক অনুমান করতে পারি। কেননা আদিমস্তরে বিদ্যমান যেসব মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব আজও রয়েছে তারাও একেবারে প্রাথমিক স্তরের পরবর্তী পর্বে প্রবেশ করেছে—যে পর্বে খাদ্য-সংগ্রহের পরিপূরক হিসেবে বৃহৎ পশু-শিকার চালু হয়ে গেছে। তবে যে সমস্ত পুরাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে তা থেকে, কীভাবে উত্তরোত্তর জটিলতর প্রকৌশলের সাহায্যে সবরকম বৃহদাকার পশু শিকার করা হতো—এমনকি ম্যামথ্‌ও—তার ইতিহাস অনুধাবন করা সম্ভব।

জীবনযাত্রার পশুসদৃশ স্তরের জের হিসেবে এমন একটা সামাজিক ভেদের উৎপত্তি হয়েছিল যা কোনোভাবেই ঘোচবার নয়। সেটা হলো স্ত্রী-পুরুষ ভেদ। আদি প্রস্তরযুগে সামাজিক গোষ্ঠীগুলো ছিল অতি ক্ষুদ্র। সেইসব গোষ্ঠীর ধারাবাহিকতা বজায় থাকত মেয়েদের মারফত। গোষ্ঠীর যুবাপুরুষরা প্রধানত আপন গোষ্ঠীর বাইরে অন্য গোষ্ঠীর যুবতীদের সঙ্গে মিলিত হতো এবং সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। এই ব্যাপারটা উভয়ের অর্থনৈতিক ভূমিকার ভিন্নতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল। মেয়েরা তখন ফলমূল, বাদামজাতীয় জিনিস ও দানাশস্য সংগ্রহ করত, মাটি খুঁড়ে শেকড়বাকড় আর কীটপতঙ্গ তুলে আনত। আর ছেলেরা ছোটোখাটো জন্তুজানোয়ার ও মাছ ধরে আনত। সেই স্তরে খাদ্য-সংগ্রাহক হিসেবে ছেলেদের আর মেয়েদের ভূমিকার মধ্যে ইতরবিশেষ ছিল না।

কিন্তু এর পরে যখন বড়ো পশু শিকার আরম্ভ হলো—যা পুরুষদেরই করণীয় কাজ—তখন পুরুষই হয়ে উঠল প্রধান খাদ্য-সংগ্রাহক, তার গুরুত্ব বেড়ে গেল। তাছাড়া বড়ো পশু শিকারের জন্য প্রয়োজন ছিল বাড়তি শক্তি, সাহস এবং নৈপুণ্য। সম্ভবত এইসবেরই সম্মিলিত পরিণতিতে প্রস্তরযুগের শেষ দিকে নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় (অস্ট্রেলিয়ার

শিকারী আদিবাসীদের মধ্যে এর নিদর্শন দেখা যায়)। এই স্তরে পরিবার *পিতৃধারানুসারী* (patrilinear) এবং কৌম রীতিনীতি *পিতৃতান্ত্রিক* হয়ে উঠার প্রবণতা দেখা দিল। এরপর যখন কোদাল দিয়ে কৃষিকার্য চালু হলো, তখন সম্ভবত প্রবণতাটা আবার ঘুরে যায়; তখন মেয়েদের গুরুত্ব আবার বাড়ে।

টোটেমপ্রথা ও জাদু

গোষ্ঠীর সমগ্র অস্তিত্বই নির্ভর করত দৈনিক খাদ্য-সংগ্রহের ওপর। এই খাদ্য-সংগ্রহের ব্যাপারটা আবার নির্ভর করত কয়েক মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ এলাকায় জন্তুজানোয়ার আর উদ্ভিদের যোগান কতটা এবং পুরুষ ও নারীরা সেগুলো ধরবার বা সংগ্রহ করবার কাজে কতটা পটু তার ওপর। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে পশু ধরা বা উদ্ভিদ ইত্যাদি সংগ্রহ করার ব্যাপারটাই কেবল প্রকৌশলের মুখাপেক্ষী, যা অবশ্যই অতি ধীরগতিতে পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু পশুপক্ষী আর গাছপালার সংখ্যা তো অপরিবর্তিত থাকে না, মাঝে মাঝেই তা প্রচণ্ডভাবে বদলায়। এমতাবস্থায় মানুষ নিয়ন্ত্রণাতীত প্রকৃতির ওপর নিছক পরজীবী হয়ে দিন কাটাত। প্রকৌশল সহযোগে সেই পরজীবী অস্তিত্বের পরিসরটাকে খানিকটা গভীর ও ব্যাপক করা ছাড়া আর কিছু তার সাধ্যাতীত ছিল। যতদিন না কৃষিকার্যের আবিষ্কার হলো, ততদিন এ থেকে তার কোনো পরিত্রাণ ছিল না। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। তার আগে মানুষ ভাবল যেসব পদ্ধতি তার সহযোগী কোমবাসী ও শিকারের পশুর ওপর কার্যকর হয়েছে সেগুলোরই সাহায্য নিয়ে প্রকৃতিকেও বুঝি বশে আনা বা বোকা বানানো সম্ভব হবে। এইভাবে, প্রকৌশলের সীমাবদ্ধতা যে শূন্যস্থান রেখে দিয়েছিল তা পূরণ করার জন্য উদ্ভাবিত হলো *জাদু।* আদিম কোমবাসী মানুষ *একেকটি* প্রয়োজনীয় পশু বা গাছকে তার গোষ্ঠীর বা গোষ্ঠীর একাংশের প্রতীক বা *টোটেম* করে তুলল; বিগ্রহ, প্রতীকচিহ্ন, অনুকার-নৃত্য ইত্যাদির সাহায্যে সে ভাবল ঐ পশু বা গাছের উর্বরতা বাড়িয়ে তোলা যাবে। এর মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন টোটেম-কেন্দ্রিক গোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য বিনিময়ও শুরু হলো। এইভাবে আত্মীয়তা-বন্ধনের এবং খাদ্য ও অলংকার ভাগাভাগির সুবিস্তৃত সামাজিক নিয়মকানুন গড়ে ওঠে এবং সেইসব নিয়মকানুন একটা জটিল কিন্তু সুবদ্ধ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। *টোটেমের নিয়মকানুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চললেই কোমের বংশরক্ষা* ও খাদ্যের পুনরুৎপাদন সুনিশ্চিত হবে বলে মনে করা হতো। এই টোটেম-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে কোনো কোনো ব্যক্তি, পশু বা বস্তুকে বিশেষ ক্ষমতার ধারক বলে গণ্য করা হতো। এরা ছিল *অলঙ্ঘনীয়, পবিত্র।* এদের সংস্পর্শে আসতে হলে কতকগুলো বিধিনিয়ম কঠোরভাবে পালন করতে হতো; সেসব বিধিনিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তি ছিল ভয়ংকর। বস্তুর অভ্যন্তরে সুপ্ত *মানা** অর্থাৎ শক্তি বা গুণের এই ধারণাটি বিজ্ঞানের বিকাশকেও প্রভাবিত করেছে—কখনো কখনো সে প্রভাব ফলপ্রসূও হয়েছে। যেমন, চুম্বকের লোহা আকর্ষণ করবার ধর্মটি চুম্বক সম্বন্ধে যে মুগ্ধতা জাগিয়ে তোলে তারই পরিণতিতে *চুম্বকবিজ্ঞানের* উৎপত্তি হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বস্তুর এইসব ধর্ম ছিল নিতান্তই কল্পিত; ফলে এই বস্তুপূজা স্বচ্ছ চিন্তাকে প্রতিহত করে। তার সব থেকে বড়ো দৃষ্টান্ত হলো *স্বর্ণ* নামক একটি অপ্রয়োজনীয় ধাতু নিয়ে মাতামাতি।

এই টোটেম-প্রথা আজও বহু আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত। যাবতীয় সভ্যতার মধ্যেই এই প্রথার কিছু না কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়, বিশেষ করে ধর্ম বা ভাষা প্রমুখ সবচেয়ে রক্ষণশীল ক্ষেত্রে। *Studies in Ancient Greek Society* গ্রন্থে জর্জ টমসন দেখিয়েছেন,

---

* *Mana*—মাওরি উপজাতীয় ভাষায় 'মানা' শব্দটির অর্থ হলো অলৌকিক বা জাদুশক্তি।—অনু

আত্মীয়-সম্পর্ক বোঝাবার জন্য আমরা যেসব শব্দ ব্যবহার করি, যথা বাবা, বোন, কাকা—সেসবই টোটেম-প্রথানুসারী শব্দ। শুধু তাই নয়, প্রতীকরূপে ব্যবহৃত সিংহমূর্তি বা শিংওয়ালা ঘোড়ার (ইউনিকর্ন) মূর্তির মধ্যে আজও আমরা সেই টোটেম পশু-প্রতীকের পুরাবশেষ বহন করে চলেছি। কুলচিহ্নের মধ্যে দিয়ে বংশপরম্পরায় তা পরিবাহিত হয়ে আসছে।

আচারবিধি ও পুরাণকথা

বিজ্ঞানের দিক থেকে এর চেয়েও যা বেশি প্রাসঙ্গিক তা হলো, টোটেম-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কৃত্য বা *আচারবিধি*—বিশেষত জন্ম, দীক্ষা ও সমাধি সংক্রান্ত আচারবিধি।* পুরাপ্রস্তর যুগে দীক্ষাচারের প্রচলন যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। নরম কাদামাটির ওপর খাঁজ কাটার আচার পালনের মাধ্যমে দীক্ষা লাভ করত সে যুগের মানুষ। গুহার মধ্যে ঐরকম খাঁজ-কাটা মৃৎখণ্ড পাওয়া গেছে, কাটা হাতের ছাপও পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটি সদস্যকে এইসব আচার পালন করতে হতো। আচারপালনের অনুষ্ঠানে স্তোত্র পাঠ হতো। সেসব স্তোত্রের মধ্যে টোটেম-পরিভাষায় বিশ্বের উৎপত্তি ও বিকাশের ব্যাখ্যা বা *পুরাণকথা* উপস্থিত করা হতো। এটাই ছিল প্রথম আনুষ্ঠানিক *শিক্ষা।* এই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মনে একগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসের উদ্বোধন ঘটানো হতো। এইভাবে বিশ্ব সম্পর্কে, এবং কী করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কতকগুলি বিশ্বাস জন্মিয়ে দেওয়া হতো। শিকার, রন্ধন প্রভৃতির ব্যবহারিক প্রকৌশল-শিক্ষার নবিশি এর মধ্যে দিয়ে সমাপ্তি লাভ করত (তাই বলে এইসব বিশ্বাস কিন্তু কখনোই প্রকৌশলের স্থান নিত না)। *নামকরণ* ছিল এই দীক্ষানুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ। নাম জিনিসটা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র বলে গণ্য হতো। কারণ, দীক্ষাব্রতীর সঙ্গে টোটেম-পূর্বপুরুষদের—ফলত গোটা বিশ্বেরই—সম্পর্ক নিহিত থাকত ঐ নামের মধ্যে। ইংরেজি name কথাটি লাতিন *nomen* (সংস্কৃত 'নাম') শব্দ থেকে আহরিত। আবার গ্রীক *gnosco* কথাটিও এর সঙ্গে সম্পর্কিত, যার অর্থ 'আমি জানি'। ইংরেজি knowledge (=সংস্কৃত 'জ্ঞান') কথাটি এর থেকেই আহরিত। এই ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় নাম-সম্পর্কিত জ্ঞানকেই প্রথম সুস্পষ্ট জ্ঞান বলে গণ্য করা হতো।

যাবতীয় পুরাণকথার আদি রূপের মধ্যে সেই কালপর্বের ব্যবহারিক প্রকৌশলমান এবং সামাজিক সংগঠনের স্তরের প্রতিফলন ঘটে। কোমের—শুধু কোমের কেন, গোটা ব্রহ্মাণ্ডের—অস্তিত্ব কতকগুলি আচারপালনের ওপর নির্ভর করে বলে মনে করা হতো, এবং পুরাণকথা সেইসব আচারপালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ত। তার ফলে এইসব পুরাণকথা অত্যন্ত দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। পরিস্থিতির পরিবর্তন যে হারে ঘটে, পুরাণকথার পরিবর্তন সে তুলনায় ঘটে অনেক ধীরে। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুরাণকথা অনেকসময়েই দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে; তাকে আধুনিক ভাষায় নতুন করে ব্যাখ্যা করলে তবেই তার অর্থ সুবোধ্য হয়। যেমন ধরা যাক বাইবেলের ইডেন উদ্যান সংক্রান্ত পুরাণকথাটি। আদিতে শিকার-ভিত্তিক সমাজ থেকে কৃষি-ভিত্তিক সমাজে উত্তরণের ঘটনাটি এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু পরে নিষেধরীতি,

* আচারবিধির মানবীয় উৎস সম্বন্ধে অধ্যাপক হলডেনের সংশয় আছে। আমরা যাকে আচারবিধি বলি তা হয়তো প্রাক্-মানবীয় যুগের—অন্ততপক্ষে প্রাক্-ভাষা যুগের—ক্রিয়াশীলতারই বাচিক রূপ মাত্র, যে-ক্রিয়া নৃত্যরূপ রচনা করে বা নৃত্যের প্ররোচনা যোগায়। প্রকৃত ভাষার উদ্ভব যদি পরে হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় আদিতে ভাষার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজ অনেকটাই সমাধা করত আচারবিধি।—জে· ডি· বি·

যৌনতা, জ্ঞানপাপ, ঈশ্বরের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং আদিপাপের ধারণা—এসব কিছুকেই এর অন্তর্গত করে তোলা হয়েছে। নানারকম পুরাণকথা, এমনকি বিভিন্ন কোমের পুরাণকথা, সহজেই পরস্পরের মধ্যে মিশ খেয়ে যায়; ফলে এক অসংহত কিন্তু সর্বজনীন *পুরাণ* (mythlogy) গড়ে *ওঠে*। কেবল বিভিন্ন *ধর্মমতই* নয়, বৈজ্ঞানিক *তত্ত্বও* এইসব টোটেমীয় পুরাণকথার সূত্র ধরেই আমাদের কাছে পরিবাহিত হয়ে এসেছে। সেই পরিবহনের বাঁকে বাঁকে টোটেমীয় পুরাণকথাগুলির বহু পরিবর্তন ঘটে ঠিকই, তবু ঐতিহ্যের ধারাটি অবিচ্ছিন্নভাবেই প্রবাহিত হয়ে চলে।

4. যুক্তিশাসিত বিজ্ঞানের উদ্ভব

হাতিয়ার আর নির্মাণযন্ত্র; আগুন, জন্তুজানোয়ার আর গাছপালা;—এই সব উৎস থেকে আদিম মানব বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান আহরণ করেছিল। কিন্তু আহরণের সেই প্রথম লগ্নে এসব জ্ঞান একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র ছিল না। যেখানেই মানুষ এসব জ্ঞান আহরণ করেছিল সেখানেই তা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে এক সর্বজনীন *সংস্কৃতির* রূপ ধারণ করেছিল। সেই সর্বজনীন সংস্কৃতির মধ্যে থেকে বিজ্ঞানের উৎপত্তি কীভাবে হলো তা বুঝতে গেলে কেবল আদিম যুগের মানুষের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই তার বর্ণনা দিলে চলবে না, আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকেও তার বিচার প্রয়োজন। সেই যুগের কোনো একটা পর্বে অভিজ্ঞতার কোনো একটা ক্ষেত্রে যা জানা সম্ভব ছিল তার আপেক্ষিক জটিলতার নিরিখে বিচার করে দেখতে হবে মানুষ বাস্তবে কতটুকু জানতে পেরেছিল। সম্পূর্ণ *যুক্তিশাসিত* এবং ব্যবহারযোগ্য বিজ্ঞান গড়ে *ওঠে* তখনই যখন পরিবেশের একাংশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে অন্তত সেইটুকু জ্ঞান লাভ করার আশা থাকে যার বলে মানুষ ইচ্ছেমতো তাকে কাজে লাগাতে পারে। এখন, বাস্তবে জড়জগৎ সপ্রাণ জগতের তুলনায় সরল, এবং সামাজিক জগতের তুলনায় সরলতর। কাজেই পরিবেশের যুক্তিশাসিত—এবং পরিশেষে বৈজ্ঞানিক—নিয়ন্ত্রণ যে প্রথমে জড়জগতে, তারপর সপ্রাণ জগতে এবং সবশেষে সমাজে প্রযুক্ত হয় তার যথেষ্ট অভ্যন্তরীণ কারণ ছিল।

হাতিয়ার তৈরি ও ব্যবহার করে মানুষ সচেতন ইচ্ছা দ্বারা চালিত হয়ে প্রকৃতিকে বদলে নিচ্ছিল। যুক্তিশাসিত *বলবিজ্ঞানের* এই ছিল ভিত্তি। ফাঁদ পাতা, তীর ছোঁড়া, বুমেরাং ছোঁড়া, গোলক-পাশ বা 'বোলাস'* ছোঁড়া প্রভৃতি ব্যবহারিক কাজকর্মের মধ্যে বস্তুর চলনের নিয়মাবলী বাস্তব রূপ ধারণ করত। এছাড়া, প্রকৃতির বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ঐরকম কোনো ধারণা না থাকলেও পরিবেশের যেখানেই কোনো নিয়মানুগতার পরিচয় পাওয়া যেত, সেখানেই মানুষ সেই নিয়মানুগতাকে কাজে লাগাত। এর জন্যে কেবল প্রয়োজন ছিল কী প্রত্যাশিত তা জানা। নিজে হাতে কিছু সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিলনা, কেবল প্রকৃতির দান গ্রহণ করবার জন্য যথাকালে যথাস্থানে হাজির থাকাই ছিল যথেষ্ট। *পর্যবেক্ষণাত্মক* এবং *বর্ণনাত্মক* বিজ্ঞানের উদ্ভব এইভাবেই ঘটে। শিকারের কৌশল এবং উপযুক্ত ঋতুতে ফলমূল সংগ্রহের ভিত্তি ছিল এই। এইভাবে সরাসরি মানবীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এবং প্রকৃতির কাছ থেকে প্রত্যাশিত দান গ্রহণের মাধ্যমে যেটুকু নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল, তার বাইরেও মানুষ আপন ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটাতে চাইত—কিন্তু ভিন্ন পথে। এই উদ্দেশ্যে সে প্রথমে জাদুমন্ত্র, পরে ধর্মের আশ্রয় নেয়।

* *bolas*—শক্ত দড়িতে গাঁথা বহুসংখ্যক গোলকের এই পাশ নিক্ষেপ করে দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা শিকারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জড়িয়ে ফেলত।—অনু·

তবে আদিম মানবের আগ্রহের ক্ষেত্রটি ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ ও ব্যবহারিক। জীবনধারণের উপকরণ (যথা খাদ্য, জন্তুজানোয়ার এবং গাছপালা) এবং নির্মাণযন্ত্র ও সরঞ্জাম তৈরির মালমশলার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। সেইসঙ্গে সে এমন অন্য কিছু ব্যাপার সম্পর্কেও আগ্রহী ছিল যা তার ধারণায় ঐসব উপকরণ ও মালমশলার প্রাচুর্যকে প্রভাবিত করে, যথা আকাশের জ্যোতিষ্ক কিংবা জমির বৈশিষ্ট্য। যা যুক্তিশাসিত এবং যা প্রত্যাশিত তার পরিসরটি ছিল ক্ষুদ্র। তবু তা আদিম মানবের প্রকৃত আগ্রহের ক্ষেত্রের এক মস্ত অংশ জুড়ে ছিল। সমাজবিকাশের ধারায় কার্যকর বিজ্ঞানের পাল্লা যেমন প্রচণ্ডভাবে প্রসারিত হয়েছে, তেমনি মানুষের আগ্রহের পরিসরটিও একই তালে, এমনকি দ্রুততর তালে, প্রসারিত হয়েছে। এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে আমাদের জগতে আমরা যতটা সুরক্ষিত বোধ করি, আদিম মানুষ তার জগতে সে তুলনায় নিজেকে কিছু কম সুরক্ষিত মনে করত। বস্তুত, আমাদের তুলনায় তার বিপন্ন বোধ করার কারণ যে অনেক কম ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বলবিজ্ঞান

শতশত কোটি বছর ধরে প্রাণীদেহে সংবেদন ও চলন-সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটেছে। এই উদ্ভব এমনভাবে ঘটেছে যে বিকাশের প্রত্যেকটি পর্বে তা এই ভৌত বিশ্বের *গঠনকে* সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছে। *যুক্তিশাসিত* বিচাববিবেচনাব সূত্রপাত ভৌত বিশ্বের *গঠন* এবং প্রাণীদেহের সংবেদন ও চলন-সংক্রান্ত *ঐ প্রক্রিয়ার* সঙ্গে ওতপ্রোত। প্রথমত তা সরাসরি উদ্ভূত হয় খোদ মানবদেহের দর্শন-সংক্রান্ত এবং শ্রম-সংক্রান্ত অঙ্গের মধ্যে থেকে। উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষ চোখ আর হাতের যেসব সমন্বয়-প্রক্রিয়া লাভ করে তার সুবাদে সে অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের চেয়ে উন্নত স্তরে উপনীত হয়—বিশেষ করে যখন মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণীতে পরিণত হয়। অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি, মানুষের যুক্তিশাসিত চিন্তাপ্রক্রিয়া গড়ে ওঠার সূত্রপাত ঘটে *ভৌত* পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে। যেমন ধরা যাক, লিভারের মতো একটা অতি সরল যন্ত্রকৌশল প্রয়োগ করলে আগে থেকে বলে দেওয়া সম্ভব যে তার একদিকে চাপ দিলে অন্যদিকে কী ঘটবে। চোখ আর হাতের এই সমন্বয়ের ভিত্তিতেই সর্বপ্রথম যুক্তিশাসিত বলবিজ্ঞান গড়ে ওঠে। এই ক্ষেত্রে—এবং গোড়ার দিকে কেবল এই ক্ষেত্রেই—বস্তুর ক্রিয়াপদ্ধতি *দেখা* এবং অন্তর দিয়ে *অনুভব করা* সম্ভব ছিল। আদিযুগে আহৃবিত নানাবিধ প্রকৌশলের জ্ঞান এ ব্যাপারটাকে প্রচণ্ডভাবে এগিয়ে দেয়। হাতিয়ারকে নির্দিষ্ট রূপ দান, হাতিয়ার গড়া আর হাতিয়ার প্রয়োগ করার মধ্যেই স্থিতিবিজ্ঞান (statics) আর গতিবিজ্ঞানের মূল নিহিত। এইভাবেই, বিজ্ঞানের অন্য কোনো শাখা যখন গড়ে ওঠেনি তখনই মানুষ সুনির্দিষ্ট এবং স্বতন্ত্র বস্তুসমূহকে ভৌতভাবে ব্যবহার করার এক অভ্যন্তরীণ এবং মূলত গাণিতিক যুক্তিধারা আয়ত্ত করে ফেলেছিল। বিজ্ঞান যত অগ্রসর হয়ে চলে, ততই এই ভৌত দিকটির যুক্তিসংগত রূপ বিজ্ঞানের অন্যান্য দিকের তুলনায় অনেক এগিয়ে যেতে থাকে।

আদিম বিজ্ঞানে বর্গীকরণ

বহু দিন—বহু হাজার বছর—পরে মানবীয় অভিজ্ঞতার অন্যান্য দিককে আয়ত্ত করার প্রয়াসে মানুষ ঐসব ভৌত পদ্ধতি প্রয়োগ করে। ঐসব পদ্ধতির প্রয়োগে সে রসায়নিক ও জৈব ব্যাপারকেও একইভাবে যুক্তিগ্রাহ্য ও নিয়ন্ত্রণসাধ্য করে তুলতে প্রয়াসী হয়। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে জীববিজ্ঞান এবং সমাজবিষয়ক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বীজ সেই প্রাচীন কালে উপ্ত হয়নি। তার অর্থ এই যে ঐসব শাখা স্বভাবতই অনেক জটিল হওয়ার দরুন তাদের বিকাশ

অবধারিতভাবেই ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছিল। রাঁধবার সময় বা সুরাকরণের সময় একটা বিশেষ কোনো প্রক্রিয়ার পরিণাম কী হবে তা তো ঐ একইরকম যুক্তিশাসিত উপায়ে *চোখে দেখা* সম্ভব নয়। কিন্তু কী ঘটতে পারে তা *জানা* অবশ্যই সম্ভব—প্রথমে পরখ করে দেখে, অতঃপর তা মনে রেখে দিয়ে বা শিখে নিয়ে। এইক্ষেত্রে—পশু-আচরণ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে তো আরো বেশি করে—জ্ঞান ছিল মূলত ঐতিহ্যবাহিত। এবং সে জ্ঞান তখনো যুক্তিশাসিত ছিল না। কারণ তখনকার জ্ঞানের যা স্তর তার সাহায্যে কোনো ঘটনা *কেন* ঘটে তা বোঝা বা তার কারণ অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সে জ্ঞান যে যুক্তিশাসিত নয় তা *মনে হতো* না সে যুগের মানুষের, কারণ অভিজ্ঞতাগুলি তাদের এত বেশি পরিচিত ছিল যে তার জন্যে আলাদা করে ব্যাখ্যা খোঁজার প্রয়োজনই তারা বোধ করত না। তাছাড়া কোনো না কোনো পৌরাণিক ব্যাখ্যা সর্বদাই সহজলভ্য ছিল। সে ব্যাখ্যা অনেক সময়েই বিমূর্ত কিন্তু ব্যক্তিভূত (personified) কারকশক্তি রূপে উপস্থাপিত হতো—যথা কোনো টোটেম পূর্বপুরুষ বা আত্মার ক্রিয়ারূপে। সুতরাং যুক্তিশাসিত আর বর্ণনাত্মক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে ভেদরেখাটি কখনোই খুব সুস্পষ্ট ছিল না।

তাছাড়া, বহুবিধ জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল প্রকট, ফলে নানারকম জিনিসের মধ্যে তুলনা চলত। ঘটনাবলীর একটি বর্গের সঙ্গে অন্য একটি বর্গের মোটামুটি মিল পাওয়া যেত। তাই এইক্ষেত্রেই বর্গীকরণের পদ্ধতির সূত্রপাত ঘটে, যা থেকে পরে জীববিজ্ঞান-সংক্রান্ত, এমনকি কিছু পরিমাণে রসায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন শাখারও উদ্ভব ঘটে। এইসব আদি বর্গসমূহ অবধারিতরূপেই ভাষার আধারে ব্যক্ত হতো। সে ভাষার মধ্যে অনুক্ত আকারে একটা তত্ত্ব নিহিত থাকত যে কতকগুলো সত্তা বা বস্তু (বিশেষ্য) কতকগুলো কর্ম সম্পাদনে বা আবেগ ধারণে সক্ষম (ক্রিয়াপদ)। এরই মধ্যে দিয়ে এক ধরনের সাদৃশ্যভিত্তিক বর্ণনাত্মক যুক্তিধারারও সূত্রপাত ঘটে। সে যুক্তিধারা প্রধানত জাদুবিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। গোড়ার দিকে তা ভ্রান্ত হলেও পরে বাস্তব অভিজ্ঞতা যখন বাড়তে থাকে এবং যখন তাদের ছেঁকে নেওয়া সম্ভব হয় তখন তা ক্রমশ নিশ্চিত হয়ে উঠতে থাকে। বর্তমানে বন্য স্তরে বাসরত জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে পাওয়া সাক্ষ্য অনুযায়ী মনে হয়, আদিম যুগের মানুষ মোটের ওপর স্পষ্ট করেই জানত অভিজ্ঞতার কোন কোন ক্ষেত্রের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বেশ ভালো, কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটনার পরিণতি সম্বন্ধে তাদের একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা আছে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে আচারবিধি আর জাদুর ওপর নির্ভর করা ছাড়া গতি নেই। এই তিনটি দিকের পরস্পর-সম্মিলনের মধ্যে দিয়ে যে বিভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তারা খুবই সুস্থিত ছিল।*

---

* আদিম বিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় কেবল এই কারণে যে সেসব বিষয় এমন পরিভাষায় ব্যক্ত হয়েছে যা আমরা আর ব্যবহার করি না। বিভিন্ন ক্রিয়ার বর্ণনা ও বিধি পুরাণকথার পরিভাষায় ব্যক্ত হয়, এবং একেকটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে রাখলে তারা অনায়াসেই বোধ্য হয়ে ওঠে। যেমন জি· ডি-স্যান্টিলানা তাঁর *The Origin of Scientific Thought· From Anaximander to Proclus* (1962) গ্রন্থে দেখিয়েছেন, পলিনেশীয় নৌশাস্ত্র গ্রহতারকা-বিষয়ক পুরাণকথার পরিভাষায় ব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিখুঁতভাবে যাত্রাপথ নির্ণয় করতে পারত। একইভাবে, এমন হতে পারে যে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের আপাত-দুর্বোধ্য 'চিরুংগা' রেখাচিত্রের মধ্যে পবিত্র নৃত্যের যেসব ছাপ আঁকা রয়েছে তার মধ্যে দিয়ে হয়তো গণিতের অনেক কিছুই ব্যক্ত হয়েছিল। আদি প্রস্তরযুগের মানুষের সংখ্যা-নৈপুণ্য যে কতটা ছিল তার একটা চমকপ্রদ নিদর্শন পাওয়া গেছে একটা হাড়ের মধ্যে। তাতে এমন সব চিহ্ন খোদাই করা রয়েছে যা দেখলে বোঝা যায় সে যুগের মানুষ নামতা জানত, এমনকি মৌলিক সংখ্যার অস্তিত্বও তাদের অজানা ছিল না। বহু লেখকই আদিম মানুষের গাণিতিক অপটুতার বিবরণ দিয়েছেন, সেইসব বিবরণের মধ্যে আদিম মানুষের অজ্ঞতা অপেক্ষা লেখকদের নিজেদের অজ্ঞতাই বেশি প্রকট হয়েছে।—জে· ডি বি

ঐতিহ্যের অনুমোদন

পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহ থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, পরিবর্তন ঘটেছিল অতিশয় ধীরগতিতে। আদিম যুগের মানুষ যে সর্বক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে কত নিবিড়ভাবে আঁকড়ে থাকত, এই ঘটনা তার প্রমাণ। তার কারণ সম্ভবত এই যে আদিম মানুষ তার সংস্কৃতির সামগ্রিক ঐক্যটি মনে মনে উপলব্ধি করতে পারত, সে মনে করত কোনো ক্ষেত্রে সে-ঐতিহ্যের সামান্যতম ব্যত্যয় ঘটালেও বিপদ ঘটতে পারে। বাঁধাধরা আচারবিধি ঠিকভাবে পালন না করলে, জাদুমন্ত্র উচ্চারণ না করলে যদি সমগ্র প্রকৃতির শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে, যদি খাদ্যের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, যদি নেমে আসে রোগের অভিশাপ?—এই ছিল তার ভয়। তাই যতক্ষণ না পরিস্থিতির চাপে পুরোনো ঐতিহ্য আঁকড়ে থাকা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ছে ততক্ষণ সে সবকিছুকে অপরিবর্তিত রেখে নিজেকে নিরাপদ ভাবত।

5. পরিবেশের রূপান্তরসাধন

এতক্ষণ আমরা আদিম সমাজে বিজ্ঞানের উৎপত্তি কীভাবে ঘটেছিল তা নিয়ে খুবই নির্বিশেষভাবে আলোচনা করলাম। আমরা দেখলাম, প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ প্রতিক্রিয়া গঠনের মধ্যে দিয়ে মানুষ আদিম সমাজের সঙ্গে নিজের অভিযোজন ঘটাতে থাকে। সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পরিবেশ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বাড়তে থাকে এবং সুষ্ঠুতর হয়ে উঠতে থাকে। সে পরিবেশ একাধারে বস্তুগঠিত, জৈব এবং মানবীয়। এই অভিযোজন-প্রক্রিয়াটার উপরেই এতক্ষণ জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটা সমগ্র চিত্রের এক অংশ মাত্র। এর অন্য দিকটি হলো, আদি মানব কর্তৃক প্রকৌশলের বিকাশসাধন ও ব্যবহার। যে পরিবেশ সম্বন্ধে মানুষ জ্ঞান আহরণে রত ছিল, সেই পরিবেশটাকেই বদলে দিচ্ছিল মানুষের প্রকৌশল, এবং তার ফলে তার জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটছিল। সে পরিবর্তন ঘটছিল দুভাবে।

প্রথমত, প্রত্যেকটি নতুন প্রকৌশল মানুষের ব্যবহারযোগ্য ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য পরিবেশের পরিধিটাকে বাড়িয়ে তুলছিল। যেমন, 'বোলাস' বা গোলক-পাশের মতো নতুন অস্ত্র, যা পুরাপ্রস্তরযুগেই পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করেছিল, তার সাহায্যে মুক্ত প্রান্তরে ক্ষিপ্রপদ পশু শিকার সম্ভব হয়ে ওঠে। নবোদ্ভূত কোনো সরঞ্জামের প্রবর্তনের ফলে এছাড়াও আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা হয়তো ঘটত। যেমন সলোম চামড়ার পোশাক, কুটির আর আগুনের সাহায্যে বলীয়ান হয়ে আদিম মানুষ উত্তরাঞ্চলে শীত কাটাতে সমর্থ হয়। প্রকৌশলের এইসব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের পক্ষে নতুন নতুন এলাকায় গিয়ে বসবাস করা সম্ভব হয় এবং পুরোনো এলাকাতেও আরো বেশি সংখ্যায় বাস করা সম্ভব হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, নতুন কোনো প্রকৌশলের (যথা পুড়িয়ে জঙ্গল সাফ করা) সার্থক প্রয়োগের ফলে পরিবেশের বাহ্য রূপ অবশেষে এমনভাবে বদলে যায় যে তার ফলে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। সেইসব নতুন সমস্যার মোকাবিলা করতে না পারলে ধ্বংস সুনিশ্চিত। এবং তার জন্য আবার দরকার হয় প্রকৌশলগত পরিবর্তন। এছাড়া মূলত আবহাওয়ার নানারকম পরিবর্তনের দরুন ভৌত পরিবেশে নিয়ন্ত্রণাতীত যেসব রূপান্তর ঘটে তা থেকেও বিবিধ সংকটের সৃষ্টি হয়। আদিম মানুষ অবশ্য প্রায়শই এইসব সংকটকেও তারই কর্মফল বলে ভুল করত। এইসব সংকটের মোকাবিলার জন্য হয় পুরোনো জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার দরকার হতো, নাহয় নতুন

পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য নতুন প্রকৌশল গড়ে তুলতে হতো। আদিম জীবনধারার অভ্যন্তরীণ চাপেই হোক আর বাইরের পরিবর্তনের চাপেই হোক, প্রকৌশলে পরিবর্তন ঘটত অবধারিতভাবেই। আর, পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য এই কথাই বলে যে সেসব পরিবর্তন ছিল মূলত প্রগতিশীল; পরিবেশের ব্যাপকতর অংশের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতো তার ফলে।

পুরাপ্রস্তরযুগের অন্তে ব্যবহৃত সরঞ্জাম

পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে আমরা দেখতে পাই, পুরা প্রস্তরযুগের শেষদিকেই মানুষের প্রকৌশল-ভাণ্ডারটি বিবিধ সরঞ্জামে রীতিমতো সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কুটির, সেলাই-করা সলোম পোশাক, থলি ও ঝুড়ি, ক্যানু নৌকো, আঁকশি আর হার্পুন সে ভাণ্ডারের অন্তর্গত ছিল। এ সিদ্ধান্তে সহজেই আসা যায় এই কারণে যে এখনো-আদিম স্তরে বাসরত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে এর সবগুলো না হোক অধিকাংশ সরঞ্জামই বহুল-প্রচলিত—বিশেষ করে এস্কিমোদের মধ্যে এবং কিছু পরিমাণে দক্ষিণ আমেরিকার 'বুশম্যান' ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে। এদের প্রকৌশল খাদ্য-সংগ্রহ আর শিকারের প্রয়োজন মেটানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন জীবন প্রধানত জন্তুজানোয়ারের পিছু ধাওয়া করার লক্ষ্যেই চালিত হতো। শুধু তাই নয়, শিকারীদের সাজসরঞ্জামও প্রধানত নিহত পশুদের দেহাবশেষ দিয়ে বানানো হতো। এহেন এক শিকার-কেন্দ্রিক অর্থনীতির ভিত্তিতেই নানাবিধ মালমশলার নির্দিষ্ট রূপদান ও সংযোজন সংক্রান্ত অধিকাংশ যান্ত্রিক ও প্রকৌশলগত সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করা হয়েছিল।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে সেযুগে ব্যবহৃত মালমশলা আজ আর ব্যবহৃত না হলেও সে যুগে যে ধরনের সমাধান বার করা হয়েছিল তার অধিকাংশই আজও প্রচলিত। এমনকি অনেকসময়ে সেইসব সমাধানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে আধুনিক প্রকৌশল। যেমন, সভ্যতার আদিযুগে মানুষের এক প্রধান সমস্যা ছিল তরল সংরক্ষণ ও বহনের উপায় খুঁজে বার করা। প্রথমে যেসব বালতি বা বোতল তৈরি হয় সেগুলো ছিল চামড়ার। আজকে ঐ উদ্দেশ্যে চামড়ার আর ব্যবহার হয়না ঠিকই, কিন্তু নির্মাণপ্রক্রিয়াটিতে কেবল সেইটুকুই পরিবর্তন এসেছে যাতে চামড়ার বদলে ধাতুপাত দিয়ে বালতি আর পাত্র বানানো যায়। এমনকি যখন চামড়ার বদলে কাচ আর প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয় তখনো সেই পুরোনো আকারগুলো মূলত একই থেকে যায়। ঝুড়ি বোনার কৌশল পুরাপ্রস্তরযুগের মানুষ নিশ্চিতভাবেই জানত। সেই কৌশল থেকেই আহরিত মোটা দাগের বয়নকৌশলও তার জানা ছিল। এছাড়া সে মাটির নমনীয় গুণ সম্বন্ধে অবহিত ছিল। সে যুগে বস্ত্রনির্মাণ ও মৃৎশিল্প যে আর এগোতে পারেনি তার কারণ এ নয় যে মানুষের প্রকৌশল-সামর্থ্যের অভাব ছিল। আসলে তখনকার শিকারনির্ভর যাযাবর জীবনযাত্রার দরুন মেয়েরা খুব বেশি কাল একটা নির্দিষ্ট স্থানে থাকবার সুযোগ পেতনা; ফলে সুতো পাকানো, বোনা, গিলে বা ভাঁজ করা এবং রং করার মতো জটিল কাজ করবার জন্য যে সময় প্রয়োজন তা তারা পেতনা। যাযাবর জীবনযাত্রায় মাটির পাত্রের মতো ভারি ও দুর্বহ জিনিসের চাহিদাও খুবই কম ছিল।

ক্ষেপণাস্ত্র ও যন্ত্র

বিজ্ঞানের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে শিকার-প্রক্রিয়ার যান্ত্রিক দিকগুলোর বিকাশের ব্যাপারটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বল্লম বা ভল্ল, নিক্ষেপদণ্ড, সুকৌশলে নির্মিত বুমেরাং, গুলতি বা বাঁটুল, গোলক-পাশ বা 'বোলাস'—এ সবই লাঠি আর পাথর ছুঁড়ে মারার সরল কৌশল থেকে ধাপে ধাপে বিকশিত হয়। ঐসব অস্ত্রের ক্রিয়া আকাশে (বা শূন্যে) বিভিন্ন সিস্টেমের রীতিমতো জটিল

গতি-বৈজ্ঞানিক বা বায়ু-গতিবৈজ্ঞানিক (aerodynamic) সূত্র-সম্মত চলনের ওপর নির্ভরশীল। ধনুকের উদ্ভাবনটি ছিল আরো অনেক জটিল। ভবিষ্যৎ বিকাশের নিরিখে এই উদ্ভাবনটির গুরুত্ব ছিল সমধিক। ধনুক জিনিসটা পুরাপ্রস্তরযুগের উত্তরার্ধে উদ্ভাবিত হয় বলেই মনে হয়। যান্ত্রিক উপায়ে সঞ্চিত শক্তির প্রথম সদ্ব্যবহারের নিদর্শন এই ধনুক। ছিলা টেনে ধরার ফলে ধনুক আস্তে আস্তে বেঁকে যায় এবং তার ফলে যে শক্তি সঞ্চিত হয় তা ছিলা আলগা করে তীর ছোঁড়ার মধ্যে দিয়ে একচোটে ব্যবহৃত হয়। মানুষ সর্বপ্রথম যেসব যন্ত্র ব্যবহার করে, ধনুক নিশ্চয়ই তার অন্যতম। স্প্রিং-ক্রিয়াযুক্ত পশু-ফাঁদও অবশ্য ঐ একই সূত্রের প্রয়োগে নির্মিত হতো; এমন হতে পারে যে ধনুকের আগেই এর উদ্ভাবন হয়েছিল। ধনুক ব্যবহারের ফলে শিকার অনেক সহজসাধ্য হয়ে ওঠে এবং অতি দ্রুত এর ব্যবহার সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে বলে মনে হয়।

বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিক থেকে এর গুরুত্ব ত্রিবিধ। তীর কীভাবে উড়ে যায় তা অনুধাবন করতে গিয়ে *গতিবিজ্ঞানের* চর্চায় প্রণোদনা জাগে। নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণ্যগতি সৃষ্টি করার প্রক্রিয়ার এক আদি নিদর্শন হলো ধনুকের ছিলায় ছিদ্রকারক দণ্ড বেঁধে তাকে ঘুরিয়ে কোনো কিছু ছ্যাঁদা করার তুরপুন বা বেধযন্ত্র (bowdrill)। তার আগে আগুন-কাঠিকে বা ছিদ্রকারক দণ্ডকে পাক খাওয়ানোর কাজটা দুহাতে করে করতে হতো। কিন্তু এই ধনুর্বেধযন্ত্রের উদ্ভাবন ঘটার পর সে কাজের জন্য একটা হাত লাগানোই যথেষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ধনুকের ছিলার টংকার থেকেই সম্ভবত তারের বাজনার উদ্ভব ঘটে এবং *সংগীতের বিজ্ঞান* ও শিল্প গড়ে ওঠে। অবশ্য বায়ুবাদিত যন্ত্র থেকে সুর বার করার প্রক্রিয়াটি সম্ভবত আরো আগে চালু হয়ে গিয়েছিল। শিঙা আর বাঁশির উদ্ভব পুরাপ্রস্তরযুগেই হয়ে থাকবে। বায়ু এবং বাতাস যে বস্তুগঠিত, সে সত্যটি আদিম মানুষ তার অভিজ্ঞতা থেকে ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিল। সে দেখেছিল ফাঁপা হাড় বা শরকাঠির মধ্যে ফুৎকার দিয়ে বা হাওয়া টেনে নিয়ে নিঃশ্বাসবায়ুকে নির্দিষ্ট পথে চালানো সম্ভব; বায়ুপূর্ণ থলি আঁকড়ে ধরে জলে ভাসা সম্ভব; হাপর থেকে চাপ দিয়ে হাওয়া বার করে আগুনকে উসকে তোলা সম্ভব; বায়ুর ঘাতশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নলের মধ্যে ফুঁ দিলে ফুৎ-ক্ষেপণাস্ত্রের (blowgun) সাহায্যে পশু শিকার করা সম্ভব, আবার বাঁশের তৈরি বায়ু-পাম্পের সাহায্যে আগুন জ্বালানো সম্ভব। চোঙের মধ্যে অবাধে কিংবা নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় পিস্টনের চলন লক্ষ্য করেই তো পরে কামান ও বাষ্পীয় এনজিনের উদ্ভব ঘটানো হয়।

6. সমাজ-সংগঠন ও ভাবধারা

আদিম মানুষের প্রকৌশলগত কৃতির চিহ্ন যেহেতু বস্তুগঠিত জিনিসপত্রের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে, তাই সে ব্যাপারে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি। সে তুলনায় তার ভাবজগতের খবর আমরা বিশেষ রাখিনা। তবে সে জগতের যেটুকু আভাস আমরা পাই তার সঙ্গে এখনো-আদিম স্তরে বাসরত বিভিন্ন নরগোষ্ঠী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে যদি মেলাই তাহলে দেখতে পাব তার ভাবজগতের কৃতিও আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। প্রথম কথা এই যে শিকার-ভিত্তিক সমাজে তাকে যেসব জটিল যান্ত্রিক ও সাংগঠনিক কাজ করতে হতো তা পারস্পরিক যোগাযোগের এবং সামাজিক সংগঠনের ভালোরকম বিকাশ ছাড়া সম্ভবই নয়। কেননা শিকার হতো ব্যাপক মাত্রায়, ম্যামথ বা বুনো ঘোড়ার মতো জন্তু মারতে হতো। তার জন্য কয়েকশো মানুষের সুনিপুণ ব্যূহরচনার প্রয়োজন হতো।

তাছাড়া, পুরাপ্রস্তরযুগের বিভিন্ন বসতিক্ষেত্র, বিশেষত সমাধিক্ষেত্র থেকে সে যুগের মানুষের পুরাণকথা ও আচারবিধির নানা প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য মেলে। পুরাপ্রস্তরযুগের প্রায় শুরু

থেকেই যে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার প্রথা চালু হয়ে গিয়েছিল, তার থেকে মানুষের মরণোত্তর গতি সম্বন্ধে একটা মনোভাব প্রকাশ পায়। সে মনোভাব মোটের ওপর সরল ছিল বলেই মনে হয়। সমাধির মধ্যে হাতিয়ার আর খাবার রাখার প্রথা থেকে বোঝা যায় যে পরলোক সম্বন্ধে আদিম মানুষের বিশ্বাস আজকের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে খুব একটা আলাদা ছিলনা। কিন্তু কতকগুলো প্রথার মধ্যে প্রবল জাদুবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়—যেমন শোণিতকল্প লাল মাটি দিয়ে মৃতদেহ আবৃত করার প্রথা। নিম্নতর পুরাপ্রস্তরযুগের মানুষ গুহা ও পাথর-শিবিরের গায়ে যেসব উল্লেখযোগ্য ছবি এঁকে গেছে, তা থেকেও এর সমর্থন মেলে। এইসব ছবি মূলত জাদুবিশ্বাস-প্রণোদিত। এদের প্রধান লক্ষ্য ছিল আরো ভালো শিকার করা এবং আরো বেশি শিকারের কামনা করা।

এখনো-আদিম স্তরে বাসরত কোমগুলির সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে আমবা এমন অনুমান সংগতভাবেই করতে পারি যে এইসব নিদর্শন এক সুবিস্তারিত আচারবিধি-সমষ্টির পরিচায়ক। সেসব আচারবিধির প্রধান অঙ্গ ছিল নাচ আর গান। মুখোশ-পরা নর্তক পশু সাজত এবং নাচগানের মধ্যে দিয়ে শিকারের সাফল্য পুনরভিনীত হতো। এইসব অনুষ্ঠান থেকেই একদিকে নাট্যকলা, অন্যদিকে ধর্মীয় আচারবিধির উদ্ভব ঘটে থাকবে। পশুদের অনুকরণের উদ্দেশ্য ছিল পশুদের *ধোঁকা দেওয়া*, বলাই বাহুল্য। কিন্তু পশুদের ধোঁকা দিয়ে যে সাফল্য অর্জিত হতো তা অচিরেই মানুষের প্রতিও প্রযুক্ত হতে আরম্ভ করে। ধোঁকা দেওয়ার পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটে যুদ্ধে। আর কাব্যকল্পনার পক্ষে অধঃপতিত হয়ে নিছক মিথ্যে কথায় পর্যবসিত হওয়াটা ছিল খুবই সহজ ব্যাপার।

গুনিন

প্রথম দিকে সকলেই নিশ্চয়ই এইসব আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিত। কিন্তু পুরাপ্রস্তরযুগের শেষ দিককার কিছু সাক্ষ্য থেকে বিশেষীভবনের (specialization) সূত্রপাতের লক্ষণ ধরা পড়ে। সুদূর দুরধিগম্য গুহাগুলোতে যাঁরা ছবি এঁকেছিলেন তাঁরা নিশ্চিতভাবেই বিশেষ তালিম-প্রাপ্ত চিত্রকর ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা নিশ্চয়ই পশুদের ধাওয়া করার অভিযানে যথেষ্ট নিবিড়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন; তা না হলে সক্রিয় পশু-মডেলের সন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হতো না। এইসব গুহাচিত্রে মাঝে মাঝে পশু-বেশে সজ্জিত একেকটি মনুষ্যমূর্তির দেখা মেলে যারা খানিকটা বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী বলে মনে হয়। এখনো-আদিম স্তরে বাসরত অধিকাংশ কোমের মধ্যেই *গুনিনদের* (shaman) অস্তিত্ব আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বা পরিবেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেসব শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন, তাদের সঙ্গে এদের বিশেষ নিগূঢ় যোগসূত্র আছে বলে ভাবা হয়। প্রধানত খাদ্য এবং গৌণত স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত ভাগ্য এর আওতায় পড়ে। গোষ্ঠীর আর সকলে সর্বক্ষণই খাদ্য ও হাতিয়ার উৎপাদনে নিয়োজিত থাকলেও, এইসব ব্যক্তিকে অন্তত কিছু পরিমাণে সে কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা সর্বজনীন মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁদের জাদুকৌশল প্রয়োগ করতে পারেন। সচেতনভাবে ঐতিহ্যবাহিত বিদ্যার সংরক্ষণের এবং বিকাশমান সমাজের প্রয়োজন অনুসারে সে বিদ্যার প্রসার ঘটানোর ভারও এঁদের ওপরেই ন্যস্ত ছিল। সুতরাং এই গুনিনদেরই সুপ্রাচীন

পূর্বসুরীগণ হচ্ছেন আমাদের পূত পবিত্র নৃপতি, পুরোহিত, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের সাংস্কৃতিক পূর্বপুরুষ।*

জাদুতত্ত্ব: প্রেতযোনি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়া সম্পর্কে মূলত অনুকরণাত্মক ও অনুষঙ্গভিত্তিক (sympathetic) একধরনের তত্ত্বের ভিত্তিতে জাদুকরেরা জাদুর কাজ চালাত। প্রথম দিকে সে তত্ত্বের প্রয়োগ ছিল অসচেতন; কিন্তু পরে তারা সচেতনভাবেই সে তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটাত। সমাধিক্ষেত্র আর গুহাচিত্রের সাক্ষ্য থেকে এই কথাই মনে হয় যে পুরাপ্রস্তরযুগেই সে তত্ত্ব বেশ বিস্তারিত রূপ ধারণ করেছিল। মূল জিনিসটির এক সাদৃশ্যভিত্তিক ছবি, অতঃপর তার সরলীকৃত দৃশ্যকল্প বা বা *প্রতীক* গড়ে তোলা হতো। এইসব ছবি, দৃশ্যকল্প বা প্রতীক এমনভাবে মূল জিনিসটির সঙ্গে একীভূত হয়ে যেত যে সেগুলো নিয়ে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকর্ম বিভিন্ন অনুষঙ্গের মাধ্যমে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে উঠত। আধুনিক বিজ্ঞানে আমরা যেসব দৃশ্যকল্প বা প্রতীক খুবই সার্থকভাবে ব্যবহার করি সেগুলো ঐসব প্রাচীন দৃশ্যকল্প ও প্রতীক থেকেই অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাক্রমে আহরিত হয়েছে। তবে প্রতীকের জাদুঘটিত তাৎপর্য থেকে তার নিছক প্রথাসিদ্ধ উপযোগিতাকে আলাদা করবার জন্য বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা আর তীব্র সংগ্রামের প্রয়োজন হয়েছে।

আদিম মানুষের ভাবনাচিন্তার আরেকটি দিক ইতিহাসের কোনো এক পর্বে অনুকরণাত্মক বা প্রতীকনির্ভর জাদুবিশ্বাস থেকে আলাদা হয়ে যায়। সেটি হলো বাস্তব জগতের ওপর *প্রেতযোনির* প্রভাবের ধারণা। স্বভাবতই সেইসব প্রেতযোনিকে বশে আনা বা সন্তুষ্ট রাখার প্রয়োজনও দেখা দেয়। ধারণা হিসেবে এই প্রেতযোনি ব্যাপারটা ছিল রীতিমতো পরিশীলিত ভাবনার নিদর্শন। সম্ভবত মৃত্যুকে বাস্তব ঘটনা হিসেবে স্বীকার করতে না পারার দরুন এই ধারণার উদ্ভব ঘটে। মৃতের সমাধিপার্শ্বে যেসব জিনিসপত্র রাখা হতো তা থেকে বোঝা যায়, সেই আদিকালে প্রেতেদের রীতিমতো দেহধারী বলেই মনে করা হতো। জীবৎকালে তারা যেহেতু কোমের সদস্য ছিল, তাই মরণোত্তর কালেও কোমের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকবে বলে ধরে নেওয়া হতো। প্রত্যক্ষ ক্রিয়া বা জাদুসহযোগে জীবিত মানুষ প্রকৃতির ওপর যেভাবে কাজ করে, প্রেতেরাও সেইভাবেই ক্রিয়া করবে বলে ভাবা হতো। প্রথমদিকে প্রেতেদের এর চেয়ে বেশি ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হতো না। পরবর্তীকালে এই কল্পনার উদ্ভব হয় যে মৃত্যুকালে মানুষের দেহ ছেড়ে যা বেরিয়ে যায় (প্রাণবায়ু, প্রাণসত্তা, আত্মা, চিত্ত) তা দেহ থেকে স্বতন্ত্র—দেহাতিরিক্ত; এই দেহাতিরিক্ত সত্তার এক অদৃশ্য নিজস্ব জীবন আছে, এবং সে জীবন মানুষকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

প্রেতযোনি-বিষয়ক এই ধারণা অবশেষে দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হয়। প্রথমটি এইরকম: শক্তিশালী কোনো পুরুষের আত্মা *বীরপুরুষের* কিংবদন্তীর রূপ নিয়ে অবশেষে *ঈশ্বরে* পরিণত হয়, এবং সেই ঈশ্বর *ধর্মের* কেন্দ্রীয় সত্তা হয়ে *ওঠে*। দ্বিতীয়টি এইরকম : প্রেতযোনিকে মানবীয় উৎস থেকে স্বতন্ত্র-উৎসজাত এক অদৃশ্য প্রাকৃতিক সত্তা বলে কল্পনা

* বিজ্ঞানের দিক থেকে এইসব গুনিনদের (shaman) গুরুত্ব কতটা তা এখনো পুরোপুরি নির্ণয় করা হয়নি। একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়, বিশ শতকের আগে যেসব কার্যকর ওষুধ জানা ছিল তার বেশির ভাগেরই আবিষ্কার না হোক অন্তত সংরক্ষণের জন্য আমরা এদের কাছে ঋণী। এছাড়া অন্যান্য জাদুভিত্তিক কৌশলের, বিশেষত ভবিষ্যৎ-দর্শনের কৌশলের ভিত্তিতে জ্যোতিষশাস্ত্র প্রমুখ মেকি-বিজ্ঞান গড়ে *ওঠে*, এবং পরে তারই সূত্র ধরে আধুনিক বাস্তবসংগত বিজ্ঞান গড়ে *ওঠে*।—জে·ডি·বি·

করা হয়, যথা বায়ু, কিংবা রসায়নিক ও জীবন-সংক্রান্ত নানাবিধ পরিবর্তনের কারকশক্তি বলে অনুমিত এক সত্তা। এই দ্বিতীয় ধারণাটি পরিশেষে আধ্যাত্মিক খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে বিজ্ঞানে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। ঘনীভূত হয়ে এইসব সূক্ষ্মসত্তাই শুঁড়িখানার সুরায় ('spirit'*) পরিণত হয়। অথবা তারা 'দুর্দান্ত, দুর্দমনীয় সূক্ষ্মসত্তা' রূপেই—ভান হেল্‌মন্ট-কথিত 'chaos' বা 'gas' রূপে—বিরাজ করতে থাকে, যতদিন না গ্যাসোমিটার যন্ত্রের মধ্যে তাদের বন্দী করে ফেলা সম্ভব হলো।

7. আদিম মানবের কর্মকৃতিত্ব

আদিম মানবের প্রকৌশল ও ভাবধারা নিয়ে এতক্ষণ অতি সংক্ষেপে যে আলোচনা করলাম তা থেকে অন্তত এটুকু পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে মানবীয় বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে বস্তুগঠিত হাতিয়ার সহযোগে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজে মানুষ পুরাপ্রস্তরযুগেই অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, অর্জিত সেই অগ্রগতি যাতে সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকে, ঐতিহ্য ও আচারবিধি মারফত সে ব্যবস্থাও মানুষ করে ফেলেছিল। হাতিয়ার নির্মাণ ও ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে *বলবিজ্ঞান* আর *পদার্থবিদ্যার* ভিত্তি, আগুনের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে *রসায়নের* ভিত্তি এবং পশুপাখি ও গাছপালা সম্বন্ধে ব্যবহারিক ও সঞ্চারণীয় জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে *জীববিজ্ঞানেব* ভিত্তি রচিত হয়েছিল। ভাষা ও কারুকলার মধ্যে লীন ছিল সামাজিক জ্ঞান। টোটেম-প্রথায় দীক্ষানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার যে সূত্রপাত ঘটে তারই মধ্যে সে জ্ঞান সুশৃঙ্খল রূপ ধারণ করে।

শিকার ও খাদ্য-আহরণের মুখাপেক্ষী সেই সমাজের চরিত্র ছিল মূলত জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক; বিশেষীভবন ও শ্রেণী-বিভাজনের লক্ষণ তখনো পরিস্ফুট হয়নি।

শিকারভিত্তিক অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা

পুরাপ্রস্তরযুগের মানুষের প্রকৌশলগত এবং সামাজিক কৃতিত্ব অতি উচ্চাঙ্গের। তাই মাঝে মাঝে একথা ভেবে অবাক হতে হয় যে কেন তারা ঐ স্তরেই আরো দীর্ঘদিন রয়ে গেল না। কোনো কোনো জনগোষ্ঠী অবশ্য এখনো ঐ স্তরে রয়ে গেছেও; কিন্তু সে কেবল একেবারে প্রান্তিক ভৌগোলিক অঞ্চলে—যথা সুমেরুপ্রদেশ, মধ্য অস্ট্রেলিয়া বা উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যে। তবে এইসব জনগোষ্ঠী সত্যিই পুরাপ্রস্তরযুগের টিকে-থাকা অবশেষ কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। এমনও হতে পারে যে এরা আসলে নব্য-প্রস্তরযুগেরই জনগোষ্ঠী, কিন্তু অকরুণ বাহ্য পরিস্থিতির চাপে পুরাপ্রস্তরযুগ-সদৃশ শিকারভিত্তিক খাদ্য-আহরণমূলক জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। সে যাই হোক, অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা বোধহয় এই ছিল যে পুরাপ্রস্তরযুগের প্রকৌশল মূলত বিশেষ কয়েক ধরনের বসতিতে, প্রধানত উন্মুক্ত প্রান্তরে, অল্প কয়েক ধরনের পশু শিকারের একান্ত উপযোগী ছিল। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বা অতিমাত্রায় শিকার করার দরুন পরিস্থিতি যদি বদলে যায়, তখন পশুপক্ষীর সংখ্যা কমে আসে, পশুদলগুলো আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে অবস্থায় কোমগুলো হয় অন্য কোনো অনুকূল অঞ্চলে গিয়ে বাস করে, নাহয় মৃত্যু বরণ করে। বস্তুত বহু কোমই ঐভাবে শেষ হয়ে গেছে, আজও যাচ্ছে। এর অন্য

* ইংরেজি spirit শব্দটি ফরাসি মারফত লাতিন **spiritus** শব্দ থেকে আহরিত, যার অর্থ নিঃশ্বাস বা নিঃশ্বাসবায়ু। —অনু·

বিকল্পটা হলো শিকারভিত্তিক জীবনযাত্রার বদলে নতুন কোনো জীবনধারায় উত্তরণ। সেটা খুবই কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই।

শিকারভিত্তিক সমাজের মূল দুর্বলতাটা ছিল এই যে শিকারের পশুদের ওপর তার নির্ভরতা ছিল একান্তই পরজীবীসুলভ। যেসব পশু হাতের সামনে রয়েছে তাদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার কাজে সে-সমাজ খুবই দক্ষ ছিল, কিন্তু সেসব পশুদের তা কোনো গঠনমূলক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতনা। অর্থাৎ মেরে মেরে পশুদের শেষ করে দেওয়ার ব্যাপারে তা খুবই পটু, কিন্তু পশুদের খাদ্য যোগানো বা পরিকল্পিত উপায়ে তাদের প্রজনন ঘটানোর ক্ষমতা তার ছিল না। বস্তুত, পুরাপ্রস্তরযুগের উত্তরার্ধের প্রকৌশল অত নিপুণ ছিল বলেই বোধহয় বড়ো বড়ো পশুরা আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যায়— অন্তত সেইসব জায়গা থেকে যেখানে তাদের শিকার করা সহজসাধ্য ছিল। আরেকটা কারণ ছিল আবহাওয়ার পরিবর্তন, যার ফলে স্বচ্ছন্দে শিকার করার উপযোগী উন্মুক্ত প্রান্তর কোথাও জঙ্গলে ঢেকে যায় (যেমন ঘটেছিল পশ্চিম ইউরোপে), আবার কোথাও মরুভূমি তাকে গ্রাস করে নেয় (যেমন আফ্রিকাতে)। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তুষারযুগের শেষ দিক নাগাদ, শিকার মানুষের জীবনযাত্রার সবচেয়ে অগ্রসর রূপ হিসেবে আর বিরাজ করছিল না। তার নানাবিধ কৌশল এবং সামাজিক সংগঠনপ্রণালী সংরক্ষিত রইল ঠিকই, কিন্তু তা অনেক বেশি সমৃদ্ধ এবং অনেক অগ্রসর এক নতুন জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে উঠল। সেই নতুন জীবনযাত্রার উদ্ভব ঘটে কৃষিকাজের উদ্ভাবনেব মধ্যে দিয়ে।

এছাড়াও পুরাপ্রস্তরযুগের সামাজিক গঠনের গভীরেই হয়তো এমন সব কারণ নিহিত ছিল যার ফলে সে সমাজ তার পরিবেশের উপযুক্ত মোকাবিলা করতে পারেনি। কিন্তু সেসব অভ্যন্তরীণ কারণকে বিশ্লেষণ করা আজ দুঃসাধ্য। কারণ, বস্তুগত সংস্কৃতির ঐ স্তরে বিদ্যমান আদিম সমাজ আজ বিরল। আর, সেই প্রাচীন সমাজরূপের গভীরে নিহিত নিতান্ত অভ্যন্তরীণ বিপত্তিগুলোর পরিচয় পরবর্তীকালের উন্নততর সংস্কৃতির, বিশেষ করে আমাদের আজকের সংস্কৃতির ধ্বংসাত্মক প্রভাবে চাপা পড়ে গেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষিকাজ ও সভ্যতা

1. উৎপাদনশীল অর্থনীতি অভিমুখে

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা নবোপলীয় বা নব্যপ্রস্তরযুগ নামে অভিহিত পর্বটি নিয়ে এবং ব্রনজ় যুগ নিয়ে আলোচনা করব। মিশর, মেসোপটেমিয়া, ভারতবর্ষ এবং চীনের আদি নদীমাতৃক সভ্যতাগুলি আমাদের আলোচ্য। এই সব সভ্যতার ইতিহাস আমরা অনুসন্ধান করব না, কেবল বিজ্ঞানের উদ্ভবের ব্যাপাবে তাদের ভূমিকাটি বোঝবার চেষ্টা করব।

প্রায় দশ হাজার বছর আগে খাদ্য-উৎপাদনে এক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে। সে বিপ্লব মানুষের বস্তুগত ও সামাজিক অস্তিত্বের সমগ্র ছাঁদটাকেই বদলে দেয়। গত অধ্যায়ের শেষ দিকে আমরা শিকারভিত্তিক অর্থনীতির যে সংকট নিয়ে আলোচনা করেছি, প্রধানত—হয়তো সম্পূর্ণত—তারই পরিণামে এ বিপ্লব ঘটে। সেই সংকটকালে মানুষ যে-বিপত্তির সম্মুখীন হয় তার মোকাবিলা করতে গিয়ে সে প্রবল উদ্যমে নতুন নতুন খাদ্যের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শুধু নতুন কেন, পুরোনো এবং ঘৃণ্য বলে পরিগণিত খাবারেরও তখন খোঁজ পড়ে, যথা নানারকম শেকড়বাকড় ও বুনো ঘাসের বীজ। এই সন্ধানেরই পরিণামে *কৃষিকাজের* প্রকৌশলটি উদ্ভাবিত হয়। *আগুন* এবং *শক্তির* ব্যবহারের মতোই যুগান্তকারী এই উদ্ভাবন। *কৃষি, আগুনের* ব্যবহার আর *শক্তির* ব্যবহার—এই তিনটি হলো মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো উদ্ভাবন। অন্যান্য সব যুগান্তকারী পরিবর্তনেরই মতো কৃষির প্রবর্তনও একচোটে ঘটেনি, ঘটেছে ধাপে ধাপে, পরস্পর-সম্পর্কিত অনেকগুলি উদ্ভাবনের সম্মিলিত পরিণতিতে। সেইসব অন্তর্বর্তী উদ্ভাবনগুলির প্রত্যেকটাই একটা মূল উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নিয়োজিত ছিল—সে হলো, বীজ-প্রদায়ী তৃণচাষ। মূলগত বিচারে বলা চলে, এই রূপান্তরণ ছিল সপ্রাণ পরিবেশকে নিছক সদ্ব্যবহারের স্তর থেকে সে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার স্তরে মানুষের উত্তরণ। পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার পথে এই ছিল মানুষের প্রথম পদক্ষেপ।

কৃষির উৎপত্তি

ঠিক কীভাবে কৃষির সূত্রপাত ঘটে তা নিয়ে আমাদের জ্ঞান আজও অনুমাননির্ভর—সম্ভবত আরো অনেককাল তাই থাকবে। কৃষিকাজে যেসব উদ্ভিদ ও পশুর ব্যবহার হয় তারা কয়েকটি নিকট-সম্পর্কিত গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল—একদিকে ভোজ্য বীজ-ঘাস, অন্যদিকে শিংওয়ালা গবাদি পশু। এ থেকে মনে হয় কৃষির উদ্ভব এক বিশেষ পর্বে এক সীমিত এলাকার মধ্যে ঘটেছিল—সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্যে। শস্যচাষের সঙ্গে পশুর গৃহপালন প্রথম থেকেই জড়িত ছিল কিনা; নাকি নিখাদ কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রার সঙ্গে নিখাদ চারণভিত্তিক (pastoral) জীবনযাত্রার সমন্বয়ের ফলে পরে তাদের মধ্যে সংযোগ ঘটে; এসব কিছুই সুনিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করলে প্রথমটির সম্ভাবনাই বেশি বলে মনে হয়। এমন হতে পারে যে গোড়ার দিকে শস্যচাষীদের রেখে-দেওয়া বাড়তি জাব পশুদের প্রলুব্ধ করে এবং তখন তাদের পোষ মানানো হয়। তবে পশুর গৃহপালন যে এর আগে একেবারে হয়নি তা নয়; পুরাপ্রস্তরযুগেই মানুষ কুকুরকে পোষ মানিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটা ক্ষুদ্র সূত্র আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শস্য কাটার যে *কাস্তে* প্রায় সর্বত্রই ব্যবহার করা হয় তা খুব স্পষ্টতই ভেড়া বা অন্যান্য রোমন্থক প্রাণীর চোয়ালের এক বিকল্প (এসব প্রাণীর চোয়াল ঘাস কাটার কাজে খুবই পটু)। কাস্তের আকার, এবং গোড়ার দিকে তাতে যেসব দাঁত বসানো থাকত, তা দেখলে এই

সিদ্ধান্তেই আসতে হয়।* কিন্তু ভেড়ার সংখ্যা যদি মোটামুটি প্রচুর না হতো, এবং যদি কৃষিযুগের একেবারে প্রথম স্তরেই তাদের সহজে পোষ মানানো সম্ভব না হতো, তাহলে নিশ্চয়ই তার চোয়াল এভাবে ঘাস-কাটার কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হতো না। তবে উদ্ভাবন হিসেবে পশুর গৃহপালন অপেক্ষা শস্যচাষের গুরুত্ব অনেক সুদূরপ্রসারী। কেননা জাব ঠিকমতো যোগাতে না পারলে একটা সীমিত এলাকার মধ্যে যথোপযুক্ত সংখ্যায় পশু পালন করা সচরাচর সম্ভব হয় না। তাছাড়া সুবিস্তীর্ণ চারণভিত্তিক অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য যা একান্ত আবশ্যক তা হলো মাংস, চামড়া আর লোমের (পশম) একটা বাজার—যা গড়ে উঠতে পারে কেবল শহরবাসীদের চাহিদার ভিত্তিতে। অথচ শহর তখনো গড়ে ওঠেনি। খোলা প্রান্তরে মেষপালন বা গোপালন করবার জন্য একটা যাযাবর উপজাতির যে বিস্তীর্ণ এলাকা প্রয়োজন তা ঐসব প্রাণীকে শিকার করতে হলে যে পরিমাণ জায়গা লাগত তার সঙ্গেই তুলনীয়। তার ওপর, অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার এবং বাড়তি খাবার সংগ্রহ করার জন্য যে বাজার দরকার তারও কোনো অস্তিত্ব তখন ছিল না। কাজেই পশু শিকারের উত্তেজনা ছেড়ে পশুকে যূথবদ্ধভাবে পালন করবার দিকে সে উপজাতি ঝুঁকবে কেন?

তবে এমন হতে পারে যে জীবনধারার কোনো আমূল পরিবর্তন ব্যতিরেকেই হয়তো শস্যচাষের প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। শস্যসমৃদ্ধ কোনো অঞ্চলে বুনো শস্যের ভাণ্ডার হয়তো এতই পুষ্ট ছিল যে মেয়েরা অনায়াসেই সে শস্য সংগ্রহ করে এনে আপন স্থায়ী আবাসে ঝুড়িতে ভরে রেখে দিতে পারত। এতে করে নিশ্চয়ই বেশ কিছু শস্যবীজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। ঝরে-পড়া সেইসব বীজ থেকে প্রচুর শস্য ফলত, যা অতঃপর কেটে আবার ঘরে তোলা হতো। এইভাবে অল্প পরিমাণ বীজ বপন করে প্রচুর পরিমাণ শস্য পাওয়ার আকস্মিক প্রক্রিয়াটিকে ভালো করে অনুধাবন করতে গিয়েই সম্ভবত কৃষিকার্যের *আবিষ্কার* ঘটে। কেননা বীজ বপন করার অর্থ হচ্ছে সুখাদ্যকে *স্বেচ্ছায়* বিসর্জন দেওয়া। মানুষ এই প্রথাটিকে যুক্তিযুক্ত মনে করল তখনই যখন যে বুঝল, এখন ঐ-কটি বীজ বিসর্জন দিয়ে পরের মরশুমে সে অনেক বেশি পরিমাণ শস্য ঘরে তুলতে পারবে। কিন্তু এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে এর প্রাক-শর্ত হিসেবে মোটামুটি নির্দিষ্ট বসতি-এলাকার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। বসতি-এলাকার চৌহদ্দি অবশ্য জঙ্গলের মধ্যে খোলা জমির বা মরুভূমিতে জল-সেবিত এলাকার পরিসরের মধ্যে স্বতই সীমাবদ্ধ ছিল। কৃষিকার্যের সূত্রপাত যে মরুভূমির প্রত্যন্তবর্তী সমতলক্ষেত্রে পাহাড়ী স্রোতস্বিনীর ছড়ানো পাখা-আকৃতির পাললিক অবক্ষেপের ওপর ঘটেছিল, তার কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। সমতলভূমি জল-রিক্ত হয়ে ওঠার দরুণ মৃগয়ার পশু এবং মানুষ উভয়েই যে সরতে সরতে অবশেষে ঐ অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেবে, এটা তো নিতান্ত স্বাভাবিক। শস্য সঞ্চয় করাটা যেহেতু মেয়েদের কাজ ছিল, তাই কৃষিকার্যও সম্ভবত মেয়েরাই *আবিষ্কার* করেছিল। তবে আবিষ্কার করে থাকুক আর না-ই থাকুক, চাষের কাজটা তখন নিশ্চিতভাবে মেয়েরাই করত। তারা চাষ করত *কোদাল* (hoe) দিয়ে, যা কিনা প্রাচীন প্রস্তরযুগের খন্তার উত্তরসূরী। ঐ খন্তা দিয়েই মেয়েরা শেকড়বাকড় খুঁড়ে আনত। বলদে-টানা কোদাল বা লাঙলের উদ্ভব হওয়ার আগে অব্দি একাজে নিশ্চিতভাবেই মেয়েদের প্রাধান্য ছিল। এর ফলে কৃষি-প্রধান অঞ্চলে মেয়েদের মর্যাদা বেড়ে যায়। আগে শিকার ছিল খাদ্য সংগ্রহের প্রধান উপায় এবং সে কাজে পুরুষদের প্রাধান্য ছিল। তাই শিকার-ভিত্তিক জীবনযাত্রায় বংশধারা মেয়েদের বদলে পুরুষদের নামেই নিরূপিত

* এ ব্যাপারে একটি ক্ষুদ্র সহায়ক সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে পারস্যের সিয়ালক্ জনবসতির একটি সমাধিতে, যা কিনা প্রাচীনতম জনবসতিগুলোর মধ্যে অন্যতম। সেই সমাধিতে সমাধি-সামগ্রী হিসেবে কেবল দুটি ভেড়ার চোয়াল এবং একটি পাথর-কুঠার পাওয়া গিয়েছে—জে· ডি· বি

হতো। কিন্তু কৃষিকার্যের উদ্ভব ঘটার পর সেই *পিতৃধারার* বদলে *মাতৃধারা* আবার প্রাধান্য বিস্তার করতে আরম্ভ করে। তবে যেসব জায়গায় পশু-প্রজননই জীবনযাত্রাব প্রধান অবলম্বন রূপে টিকে রইল, সেইসব জায়গায় পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। কৃষি-বসতি এলাকার প্রান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে এই ঘটনা ঘটে। যার পরিচয় আমরা পাই বাইবেলে।

উদ্ভব যে ভাবেই ঘটে থাকুক, কৃষিকার্য মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের ইতিহাসে মূলত এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। আগে মানুষ ছিল পরজীবী, সে ছিল পশু আর উদ্ভিদদের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এখন সে ছোটো এলাকার মধ্যেই তার প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজে ফলাতে সক্ষম হলো। আগে ঐ পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ বা শিকার করার জন্য তাকে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ঘুরতে হতো। কৃষিকার্যের অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে মানুষ সপ্রাণ প্রকৃতিকে *নিয়ন্ত্রণ* করতে পারল। এর জন্য তাকে প্রাণের প্রজননের সূত্রাবলী জানতে হলো। এর ফলে বাহ্য পরিস্থিতির সাপেক্ষে মানুষ এক নতুন ধরনের এবং বৃহত্তর স্বাধীনতা অর্জন করল। একেবারে প্রথমে হয়তো নিছক খানিকটা মাটি আঁচড়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল মানুষের কৃষিকার্য; তাকে চাষ না বলে উদ্যানপালন বলাই সংগত। হয়তো সাময়িকভাবে-পরিষ্কৃত এবং অতঃপর পরিত্যক্ত ছোটো ছোটো জমিখণ্ডে এ ধরনের 'চাষ' শুরু হয়। আজও অনেক উপজাতির মধ্যে এ ধরনের 'যাযাবর কৃষিকার্যের প্রথা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এমনকি এই অতি নিম্নস্তরের কৃষিকাজও মানুষের বস্তুগঠিত এবং সামাজিক সংস্কৃতির ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। পুরাপ্রস্তরযুগে যেসব পরিবর্তন ঘটেছিল, তার যে-কোনোটির তুলনায় কৃষিকার্যের প্রবর্তন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন মার্গের অগ্রগতির সূচনা করে। এর ফলে এক নতুন ধরনের সমাজ গঠিত হলো, যে-সমাজ *গুণগতভাবে* ভিন্ন। কেননা এর ফলে সমপরিসর জমিতে যত মানুষের খাদ্যের সংস্থান করা সম্ভব হলো তার *পরিমাণ* আগের তুলনায় বহুবহু গুণে বেশি। শিকারের কাজ মোটামুটিভাবে সারা বছরই করতে হতো; কিন্তু কৃষির কাজ বিশেষ ঋতুর ওপর নির্ভরশীল। কাজেই কৃষিসমাজে জনসমষ্টির অধিকাংশই বছরের কিছুটা সময় জুড়ে অন্যান্য কাজ করবার অবসর পেল। এইভাবে কৃষিকার্যের প্রবর্তনের ফলে নবনব সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেল। সেইসঙ্গে নতুন নতুন সমস্যারও উদ্ভব হলো।

কারুকৌশল : ক্ষেতে ও গৃহে

শস্য ফলানো এবং ফলিত শস্য থেকে খাবার প্রস্তুত করবার জন্য একপ্রস্থ নতুন প্রকৌশলেব প্রয়োজন হলো কৃষিকার্যের প্রবর্তনের ফলে—যথা বীজবপন, কোদাল দিয়ে নিড়ানো, ফসল কাটা, ঝাড়াই, গোলাজাত করা, চূর্ণ করা, সেঁকা এবং সুরাকরণ। এইগুলো করতে গিয়ে আনুষঙ্গিক অন্য এক প্রস্থ প্রকৌশলেরও উদ্ভব হলো। পশম আর শণের প্রচুর যোগান পাওয়ায় বয়ন-কৌশল রপ্ত করা সম্ভব হলো। স্থায়ী আবাসনের প্রয়োজনে মৃৎকৌশল এবং কুটিরনির্মাণ-কৌশল গড়ে উঠল। পুরাপ্রস্তরযুগেও কোথাও কোথাও কুটিরনির্মাণের কৌশল জানা ছিল ঠিকই, কিন্তু তা কেবল সেইসব অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল যেখানে প্রচুর শিকারযোগ্য প্রাণী থাকায় স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। কৃষিভিত্তিক জনসমাজে কিন্তু কুটিরনির্মাণ হয়ে উঠল সর্বজনীন। এই সমস্ত ঘটনার সম্মিলিত ঘাতপ্রতিঘাতে সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটতে লাগল অতি দ্রুত লয়ে। সে বিকাশের তাগিদ আর বাস্তব উপকরণ, কোনোটারই অভাব ছিল না। নতুন পরিস্থিতির চাপে পুরোনো সামাজিক রীতিনীতি বদলে যেতে লাগল। একটা নতুন কারক উপাদানের উদ্ভব ঘটল—স্থাবর সম্পত্তি। প্রথমে অবশ্য সে সম্পত্তি ছিল *জনগোষ্ঠীভিত্তিক*, তা *ব্যক্তিগত* ছিল না। শিকারভিত্তিক জনসমাজ যা কিছু উৎপাদন করত তার

প্রায় সমস্তটাই তৎক্ষণাৎ ভোগ করত। সে সমাজে স্থায়ী সামগ্রী বলতে ছিল শিকারের সরঞ্জাম, রান্নার বাসনপত্র আর জামাকাপড়। এসবই ক্রমাগত ব্যবহার করা হতো এবং সে ব্যবহার ছিল প্রধানত ব্যক্তিগত। পক্ষান্তরে কৃষিভিত্তিক জনসমাজে জমি, গবাদি পশু, কুটির এবং শস্যগোলা এসবই মোটের ওপর স্থায়ী *সামগ্রী* হিসেবেই সর্বদা বিরাজ করত। সেসবের ওপর অধিকার ছিল মূলত গোষ্ঠীগত। মানুষকে ঐসব সামগ্রী নিরাপদে রাখবার উপায় এবং তাদের বণ্টনের পথ খুঁজে বার করতে হতো। গোড়ার দিকে এই উদ্দেশ্যে টোটেম-গোষ্ঠীর সংগঠনকে বিস্তৃততব ও জটিলতর রূপ দেওয়া হয়েছিল। তখন নিয়ম ছিল প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্যে সমপরিমাণে সামগ্রী ভাগ করে দিতে হবে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও আচারবিধি অনুসারে পারস্পরিক আদানপ্রদান ঘটত, যার প্রতিটি খুঁটিনাটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক প্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর এইসব আদানপ্রদান ঘটত বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে। কিন্তু কৃষির উদ্ভবের মধ্যে দিয়ে উৎপাদনের নতুন যে পদ্ধতি চালু হলো, পরিশেষে তার চাপে বণ্টনের এই পুরোনো ব্যবস্থা আর টিকল না। আচারবিধি-নিয়ন্ত্রিত আদানপ্রদানের বদলে বস্তুবিনিময় প্রথার (barter) উদ্ভব হতে থাকে। তখন একেকজন ব্যক্তি তার নিজস্ব উৎপাদনের ওপর বিশেষ দাবি জানাতে আরম্ভ করে। ফলে *ব্যক্তিগত সম্পত্তির* উদ্ভব হয়। এবং তারই অবধারিত পরিণতিস্বরূপ দেখা দেয় *সম্পদের বৈষম্য*। তবে এর যে পরবর্তী ধাপ, অর্থাৎ *সামাজিক শ্রেণীর* আবির্ভাব, তা ঐ সময়ে ঘটেছে বলে মনে হয় না। সমাজে শ্রেণীর আবির্ভাব নগবপত্তনের পরের ঘটনা।

কর্ম

কৃষিকার্যের প্রচলনের ফলে সমাজজীবনে এক নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটল: *কর্ম।* শিকারনির্ভর জীবনধারায় কর্ম ব্যাপারটাকে জীবনের আর পাঁচটা দিক থেকে আলাদা করে দেখা হতো না। তখন প্রতিটি কার্য তার তাৎক্ষণিক পরিণামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল: শিকার করলে কী হয়?—না, খাদ্য পাওয়া যায়, যে-খাদ্য একজন ব্যক্তি ও তার পরিজন অচিরেই ভক্ষণ করে। কিন্তু কৃষিপ্রথার প্রচলনের পর একটা কোনো কার্য আর তার ফললাভের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান থাকল। শুধু তাই নয়, কৃষিকার্যের অনেকগুলো প্রক্রিয়াই ক্লান্তিকর এবং একঘেয়ে; শিকারের উত্তেজনা তার মধ্যে থাকে না। একথা ঠিক যে কৃষিপ্রথার উদ্ভবের ফলে খাদ্যের সরবরাহ অনেক সুনিশ্চিত হয়ে উঠল; কিন্তু সেই সঙ্গে মনোমুগ্ধকর শিকার এবং তাকে ঘিরে মস্ত ভোজের উত্তেজক সম্ভাবনাও নষ্ট হলো। বস্তুত, শিকারকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা থেকে কৃষিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় এই উত্তরণকেই 'মানুষের পতন' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা নিয়ে গড়ে উঠেছে নানান কিংবদন্তী। 'ইডেন উদ্যান' বা 'নন্দনকানন' আসলে মানুষের সরল মৃগয়াভূমি, তার আদি সুখের লীলাভূমি। সেই লীলাক্ষেত্র ছেড়ে সে কর্মের কঠিন জগতে অবতীর্ণ হলো, যেখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাদ্যের সংস্থান করতে হয়, যেখানে আবাদ করলে তবেই সোনা ফলে।

বিজ্ঞান ও নব্য কারুকৌশল

কৃষিপ্রথার প্রচলনের দরুন কর্ম এবং কর্মফলের মধ্যে এক অতিশয় পরোক্ষ সম্পর্ক বিষয়ে মানুষ সচেতন হয়ে উঠল। এর ফলে কার্য-কারণ সম্পর্ক নিয়ে তার ধারণার প্রসার ঘটল। ঐ ধারণাই পরে যুক্তিশসিত এবং সচেতন বিজ্ঞানের বনেদ হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পশুপক্ষী এবং গাছপালার সমগ্র জীবন-ইতিহাস এখন মানুষের কৌতূহলী পর্যবেক্ষণের আওতায় চলে এল। কীভাবে তাদের প্রজনন হয়, কীভাবে তারা বেড়ে ওঠে, এসব জানা এখন জরুরি হয়ে

উঠল। আগে কিন্তু কীভাবে জন্তু বা পাখি মারতে হয়, বা কীভাবে ফলমূল সংগ্রহ করতে হয় সেটুকু জানাই ছিল যথেষ্ট। অনুরূপভাবে, কৃষিকার্য পরিচালনার জন্য যেসব নতুন প্রকৌশলের প্রবর্তন ঘটল, তার পরিণতিতে নতুন নতুন গাণিতিক ও বলবৈজ্ঞানিক ধারণার জন্ম হলো। *বয়ন* ব্যাপারটার উদ্ভব ঘটে স্পষ্টতই ঝুড়ি-বোনার কৌশলকে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্ধিত করে নিয়ে। বয়ন আর ঝুড়ি-বোনা, উভয়ের মধ্যেই সুনিয়মিত ছাঁদের অস্তিত্ব আছে। সেসব ছাঁদ আগে হাতেকলমে রচনা ক'রে দেখে তারপর তা নিয়ে চিন্তাভাবনা জাগে। *জ্যামিতি* এবং *পাটীগণিতের* মূলে আছে এইসব সুনিয়মিত ছাঁদ। বুনে যেসব *নকশা* তৈরি করা হয় এবং তার জন্যে যতগুলো করে সুতো প্রয়োজন হয় তার *সংখ্যা*—এর মধ্যে একটা জ্যামিতিক সম্পর্ক লক্ষ্য করে মানুষ। এর ফলে *আকার* আর *সংখ্যার* পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে তার গভীরতর উপলব্ধি জন্মায়। অপরদিকে, তকলি দিয়ে সুতো কাটার প্রক্রিয়ার মধ্যে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে *ঘূর্ণাগতির* প্রথম প্রয়োগ ঘটে (এর সম্ভাব্য পূর্বসূরী হয়তো ধনুর্বেধযন্ত্র বা bow-drill)। খুব সম্ভব এরই পরিণতিতে চাকার ব্যবহার চালু হয়, যে-চাকা বলবিজ্ঞানে, উৎপাদনে এবং পরিবহনে চক্রবৃদ্ধিহারে বিপ্লব এনে দেয়। আগুনের পরোক্ষ প্রয়োগের প্রথম নিদর্শন হলো *মৃৎপাত্রনির্মাণ।* আলো জ্বালা, গরম করা বা রান্না করার তুলনায় মৃৎপাত্র-নির্মাণের জন্য আগুনকে অনেক সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এই মৃৎপাত্র ব্যবহারের সূত্র ধরেই রন্ধন-প্রক্রিয়ার পাল্লা অনেকদূর প্রসারিত হয় এবং তারই সুবাদে ধাতু-বিগলন (smelting) ও প্রাথমিক পর্যায়ের রসায়নিক প্রক্রিয়াদি চালানো সম্ভব হয়ে ওঠে।

নব্য প্রস্তরযুগ

কৃষিকার্যের আদি উদ্ভাবন আর নগরপত্তনের মধ্যবর্তী পর্বটিকেই সচরাচর নবোপলীয় যুগ বা নব্য প্রস্তরযুগ বলা হয়। এই নামকরণের যুক্তি এই যে পুরাপ্রস্তরযুগে যেখানে পাথর-খোদা যন্ত্রোপকরণ ব্যবহার করা হতো, সেখানে নব্য প্রস্তরযুগে ঘষা বা পালিশ-করা পাথরের নির্মাণযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হয়। অগ্রসব প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে এই যুগ মোটামুটি 4000 থেকে 3000 খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। তবে ঘষা পাথরের নির্মাণযন্ত্র যে ধরনের জীবনযাত্রার পরিচায়ক তার আয়ু আরো অনেক দীর্ঘ। বস্তুত আজও পৃথিবীতে এমন অনেক জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রয়েছে যারা ঐ নবোপলীয় জীবনযাত্রার স্তরেই আবদ্ধ রয়ে গেছে। আজও-বিদ্যমান এইসব নবোপলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্ভবত দুটি পদ্ধতিতে উদ্ভূত হয়েছে। কোনো কোনো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে হয়তো মধ্যপ্রাচ্যের আদি নবোপলীয় জীবনধারার কেন্দ্রগুলোর অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সম্পর্ক রয়েছে; কেননা ঐ আদি কেন্দ্রগুলো থেকেই নবোপলীয় জীবনধারা বহুদূরে বিস্তার লাভ করেছিল। অন্যেরা হয়তো পরবর্তী কালের ব্রনজ্ -যুগের জনগোষ্ঠী থেকেই উদ্ভূত। এমন হতে পারে যে ব্রনজ যুগের এইসব জনগোষ্ঠী ঘটনাচক্রে এমন সব অঞ্চলে গিয়ে আটকে পড়ে যেখানে তাদের নিজস্ব নাগরিক ঘাঁটিতে উৎপন্ন যাবতীয় সামগ্রী থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তারা একেবারে আদি নবোপলীয় জীবনধারাতেই আবার অভ্যস্ত হয়ে পড়ে; কেবল সূর্য-আরাধনার মতো দু-একটি ভাবধারার মধ্যে তাদের ব্রনজ্ -যুগীয় পরিচয় লীন হয়ে থাকে। বৃহৎ-প্রস্তরযুগের দু-চাকার দীর্ঘ ঠেলাগাড়ি চালানো যে জনগোষ্ঠী চারহাজার বছর আগে ব্রিটেনে প্রবেশ করেছিল, তারা সম্ভবত ঐরকমই কোনো গোষ্ঠী। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মধ্যযুগে যে পলিনেশীয়রা ছড়িয়ে পড়ছিল, তারাও সম্ভবত তাই।

নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষের জীবনধারা এক বিশাল এলাকা জুড়ে যেভাবে একটানা পরিব্যপ্ত

হয়েছিল তা থেকে বোঝা যায় ঐ জীবনধারার মধ্যে মানুষ এক নতুন স্থিতিশীলতা খুঁজে পেয়েছিল। ইতিপূর্বে প্রকৃতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত পশুপাখি আর গাছপালার মাধ্যমে মানুষ সেই স্থিতিশীলতা অর্জন করেছিল। এখন মৃত্তিকা আর জলবায়ু সহযোগে উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে দিয়ে সে এক নতুন ধরনের স্থিতিশীলতা অর্জন করল।

ধর্মের নির্দিষ্ট রূপধারণ

কৃষিকার্যের উদ্ভাবনের ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বস্তুগত বনেদটা বদলে গেল। মানসিক স্তরেও এই পরিবর্তনের গভীর প্রভাব যে পড়বে তা ছিল অবধারিত। সে প্রভাব নবনব আচারবিধি ও পুরাণকথার মধ্যে অভিব্যক্ত হলো। নব্যপ্রস্তরযুগের জনসমাজ প্রধানত শস্য উৎপাদন নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ফলে উদ্ভিদের ফলনবৃদ্ধি ও প্রজনন-সংক্রান্ত টোটেমীয় আচারবিধিসমূহের যেসব অঙ্গে মেয়েদের ভূমিকা প্রধান ছিল সেগুলির ওপর এবার বিশেষ গুরুত্ব পড়ল, সেগুলিকে বিস্তৃততর রূপ দেওয়া হলো। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো *উর্বরতা* কামনায় ব্রতপালনের আচারঅনুষ্ঠান। এইসব আচারঅনুষ্ঠানে মানুষের যৌন মিলনকে অধিক শস্য ফলনের প্রণোদনা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এর আগে, শিকার-কেন্দ্রিক জীবনধারার দিনগুলিতেই মানুষ গাছপালার ওপর বৃষ্টির প্রভাব লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু তখন মানুষ কেবল প্রাণীজীবনের ওপর তার পরোক্ষ ক্রিয়া মারফত ঘুরপথে সে প্রভাব লক্ষ্য করেছিল। এখন এটা হয়ে দাঁড়াল তার জীবনমরণের প্রশ্ন। সুতরাং অনুকরণাত্মক জাদুক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বৃষ্টি নামানোর প্রয়াস এখন আচারবিধির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল।

প্রধান লক্ষ্যগুলি এইভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন আচারবিধি এবং জাদুক্রিয়া অনেক সুসংবদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। আর এরই মধ্যে দিয়ে *শাসনতন্ত্রে* এবং *ধর্মে* রূপান্তরণের প্রক্রিয়াটিও সক্রিয় হয়ে উঠল। বসন্ত উৎসব এবং নবান্ন উৎসব খুব নিয়মিতভাবে পালিত হতে থাকে। এসব উৎসবে শস্য-রাজ বা শস্য-রানী এবং বৃষ্টি-স্রষ্টাকে বেছে নিয়ে তাদের বিশেষ গুরুত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হয়; কারণ জনসমাজের জীবনধারণের পক্ষে তাদের অপরিহার্য বলে গণ্য করা হতো। নতুন ফলনের আগে শস্যকে মাটিতে সমাধিস্থ করার বা 'হত্যা' করার প্রয়োজন হয়;—এ থেকেই উৎসর্গ বা *বলিদানের*, এমনকি নরবলির, ধারণার উৎপত্তি। সমগ্র জনসমাজের কল্যাণে স্বয়ং রাজাকে অথবা তাঁর প্রতিনিধিকে মৃত্যু বরণ করার জন্য আহ্বান জানানো হতো।

গ্রামীণ জীবনধারা

নব্য প্রস্তরযুগের অর্থনীতি ও জীবনধারার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত ইউনিটটি ছিল *গ্রাম।* একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে এক ব্যবহারিক স্বয়ংভরতা হলো গ্রামের বৈশিষ্ট্য। প্রকৌশলগত এবং অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে যে জটিল পারস্পরিকতার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে তা-ই গ্রামের এই স্বয়ংভরতাকে সুনিশ্চিত করে। এই স্বয়ংভরতা গড়ে উঠতে যে বহু শতাব্দী সময় লেগেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গ্রামীণ অর্থনীতির পরিসর খুব সীমিত, এবং তা পরিবর্তন-নিরোধী। এমনকি যেসব ক্ষেত্রে হাজার হাজার মানুষ সে অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত সেখানেও প্রায় সকলকেই অধিকাংশ সময়টা ব্যয় করতে হয় কৃষি-সংক্রান্ত কাজকর্মে অথবা নানাবিধ সামগ্রীর উৎপাদনে—যা ঐ অঞ্চলেই উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকার কিছু কিছু গ্রামে আজও এই জিনিস লক্ষ্য করা যায়। নব্যপ্রস্তরযুগের গ্রামের এই স্বনির্ভরতাই ছিল তার বিস্তৃতির কারণ; আবার ঐ কারণেই তার পরবর্তী বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

2. সভ্যতা

নদীমাতৃক জীবনধারা

অতঃপর মানুষ তার কর্মকাণ্ডের পরিধি বাড়িয়ে তোলার পথে প্রথম পদক্ষেপটি নেয়। সে পদক্ষেপটি হলো, বড়ো বড়ো নদীর প্রশস্ত পলিসমৃদ্ধ উপত্যকায় চাষ করার প্রয়াস। অবশ্য সব বড়ো নদী নয়, কেবল যেসব নদীপথে দুর্ভেদ্য অরণ্যের বাধা অপেক্ষাকৃত কম, অর্থাৎ যেসব নদীর নিম্নবর্তী স্রোতোপথ শুখা ভূমির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত, কেবল সেইসব নদীই এর জন্যে ব্যবহৃত হয়। কৃষিসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের এই প্রসারণের সূত্রপাত হয়তো ঘটে নাবাল নদীতীরে ভিজে কাদামাটির ওপরে বীজ বপন করার মধ্যে দিয়ে। নীলনদের অপেক্ষাকৃত উচ্চ অববাহিকায় বসবাসকারী উপজাতিসমূহ আজও এই পদ্ধতি অনুসরণ করে। ঐভাবে বীজ বপন করার পর হয়তো ধীরে ধীরে জলাজমি পরিষ্কার ক'রে নদীর খাল কাটা আরম্ভ হয়। অথবা এমন হতে পারে যে প্রথমে উচ্চভূমিতে অবস্থিত ছোটো ছোটো উপত্যকায় কৃষিকাজ শুরু হয়; তারপর ধাপে ধাপে নদীপথের নিচের দিকে বড়ো বড়ো উপত্যকায় নেমে এসে চাষের কাজ প্রসারিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই খাল কাটা ও জাঙাল বা উঁচু আল বাঁধার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এমনি করেই এক নতুন ধরনের কৃষিপ্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। প্রথমে প্রাকৃতিক, পরে কৃত্রিম সেচব্যবস্থা সেই নতুন প্রক্রিয়ার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। এহেন অবস্থায় গ্রাম আর একেকটি অঞ্চলের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ইউনিট রইল না। কেননা বন্যা আর খরার দাপট তো আর গ্রামের সীমানাকে খাতির করে না। তাই উঁচু উঁচু বাঁধ যদি তুলতে হয়, সুদীর্ঘ খাল যদি কাটতে হয়, তাহলে অনেক গ্রামকে একসঙ্গে কাজ করতেই হবে, এবং সেচের জলকে ন্যায্যভাবে বন্টন করে দিতে হবে। দেখা গেল, মাত্র গুটি ছয়েক গ্রামের মধ্যেও এই সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা বা আরোপ করতে পারলেই তাদের প্রতিটির ফলন অনেক বেড়ে যায়। খাদ্য উৎপাদনে এটি ছিল পরিমাণগত দিক থেকে আরেক ধাপ অগ্রগতি। কারণ এর ফলে নির্দিষ্ট পরিসরের ভূমিখণ্ড থেকে আরো অনেক বেশি মানুষের খাদ্যের সংস্থান করা সম্ভব হলো। এই পরিমাণাত্মক পরিবর্তনের পরিণতিতে আবার এক গুণাত্মক পরিবর্তন এল সামাজিক সংগঠনে।

সামাজিক সহযোগিতার প্রসারণ

বস্তুত, নদী-উপত্যকা-ভিত্তিক চাষবাসের পুরো ফায়দাটি তুলতে হলে সরল গ্রামভিত্তিক এলাকার তুলনায় অনেক বড়ো এলাকা জুড়ে সামাজিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা না করে উপায় ছিল না। এবং একবার সে সহযোগিতা গড়ে তুলতে পারলে তার সাফল্যই তাকে আরো মজবুত করে তুলত। কোনো একটা প্রক্রিয়াকে নিছক বড়ো মাত্রায় প্রয়োগ করার মধ্যে দিয়েই অনেকসময় অভাবিতপূর্ণ সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যেত। এর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। নীলনদ অববাহিকায় বসবাসকারী উপজাতিসমূহ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে কিংবা বিজিত হয়ে একটি অখণ্ড অর্থনৈতিক ইউনিটে পরিণত হয়, তখন অচিরেই তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ-উৎপাদনের পরিমাণ এত বেড়ে যায় যে মাত্র দু-তিন শতাব্দীর মধ্যেই তারা প্রথম মিশরী সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডের বিপুল ভার বহনে সক্ষম হয়ে ওঠে।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের আরেকটি উদাহরণ থেকেও বোঝা যায়, প্রকৌশলগত বিশেষ কোনো পরিবর্তন ছাড়াই নিছক সংঘবদ্ধতা কত গুরুত্বপূর্ণ ফল অর্জন করতে পারে। পেরুর ইন্‌কা সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল অনেকগুলি স্বাধীন উপজাতির একত্র সম্মিলনে। আগে এইসব স্বাধীন উপজাতি নিজনিজ উপত্যকাখণ্ডে যে যার মতো চাষ করত; তাদের স্বতন্ত্র ছোটো ছোটো

সেচব্যবস্থা ছিল; নিজেদের উৎপাদনেই তাদের জীবনধারণ চলত। এদের মধ্যে ইন্‌কা উপজাতিটি ছিল উদ্যমশীল এবং প্রভুত্বকামী। পরে এরা এক ধরনের পবিত্র অভিজাততন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। খানিকটা গায়ের জোরে, আর খানিকটা রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির প্রয়োগে এরা ঐ উপজাতিগুলিকে সম্মিলিত করে। এর দরুন একেকটা আস্ত উপত্যকাকে একেকটা অখণ্ড অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে গণ্য করা সম্ভব হলো; ফলে সুদীর্ঘ সব খাল কাটা, পর্বতগাত্রকে সুনির্দিষ্ট সোপানের আকারে খোদা এবং খাদ্যের যথাযথ বন্টন ও ভোগের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলো। এর ফলে ইন্‌কা সাম্রাজ্য যে কয় শতাব্দী টিকেছিল ততদিন পেরুতে কাউকে অনশনে থাকতে হয়নি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বন্দোবস্তে কোনোরকম নতুন প্রকৌশলের প্রয়োগ না ঘটা সত্ত্বেও প্রভূত পরিমাণ উদ্বৃত্ত সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল। সূর্যসন্তান বলে কথিত ইন্‌কা শাসকসম্প্রদায় তারই দৌলতে বিপুল বৈভবের মধ্যে জীবন যাপন করত। শুধু তাই নয়, এরই দৌলতে মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তারা এক রীতিমতো উচ্চাঙ্গের মননশীল সংস্কৃতি এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য এক স্থাপত্যশিল্প গড়ে তুলতে পেরেছিল।

যথেষ্ট পরিমাণে জলসেবিত নদী-উপত্যকাতেই নিশ্চয় সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হয় এবং সেখানেই তা প্রথম দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। ঐসব অঞ্চলে চাষের জন্য স্বাভাবিক প্রাকৃতিক জলপ্রবাহকে সেচ-খালের মাধ্যমে ব্যবহার করা হতো। অতঃপর সভ্যতা স্থানীয় এলাকার মধ্যে প্রসার লাভ করে। সেই প্রক্রিয়ায় অনেক উচ্চে নির্মিত প্রণালীর জন্য জল তোলা, কূপ খোঁড়া, পর্বতগাত্রে সোপান খোদা প্রভৃতি কাজের জন্য ভারি এনজিনিয়ারিং কৌশলের প্রয়োজন হয়। এতদসত্ত্বেও লৌহযুগের অভ্যুদয়ের আগে সভ্যতা পলিগঠিত সমতলভূমি ছাড়িয়ে খুব বেশিদূর এগোতে পারেনি। যে কারণে আদিযুগের সভ্যতাগুলি বিশেষ কয়েকটি অনুকূল অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর মধ্যে প্রধান যে-কটি সভ্যতার খবর আমরা রাখি সেগুলো হলো: মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা, মিশরী সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা এবং কয়েক শতাব্দী পরের আমুদরিয়া ও সির্‌দরিয়ার সভ্যতা, পীতনদী ও ইয়াংসি সভ্যতা।

নগরপত্তন

*সভ্যতা—civilization—*ব্যাপারটাকে আমরা মূলত এক *নাগরিক* ঘটনা বলেই গণ্য করে থাকি। লাতিন *civitas* কথাটির অর্থ হলো 'নগর', তা থেকেই ইংরেজি *civilization* কথাটির উদ্ভব। কিন্তু আসলে নগর সভ্যতার জনক নয়, বরং সভ্যতাই নগরের জনক। নগরের সঙ্গে গ্রামের পার্থক্যটা এই যে নগরের অধিকাংশ অধিবাসী জমিতে খাদ্য উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকে না; তারা প্রশাসক, কারুকর্মী, বণিক এবং শ্রমিক। নগরপত্তনের আগে যা দরকার তা হলো কৃষি-প্রকৌশলের উন্নতিসাধন, যাতে করে উন্নত কৃষিজাত উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সাহায্যে নগরের অনুৎপাদক জনসমষ্টির জীবনধারণ সম্ভব হয়ে ওঠে। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, কৃষিপ্রকৌশলের সেই উন্নতি ঘটাতে হলে প্রথমেই চাই কোনো এক ধরনের কেন্দ্রীয় সংগঠন। তার জন্য আবার প্রয়োজন একদল প্রশাসক। সেই প্রশাসকমণ্ডলীর অধীনে থাকবে বেশ কয়েকটি গ্রাম। তার মধ্যে যে গ্রামটিতে প্রধান টোটেম-দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠিত, স্বভাবতই সেই গ্রামটিই হয়ে ওঠে নগর—যেখানে বাকি গ্রামগুলির শস্য সংগৃহীত ও গোলাজাত হয়। একেবারে আদি নগরগুলির পত্তন ঠিক কোথায় কোথায় হয়েছিল তা আমরা আজও জানি না বলেই গ্রাম থেকে শহরে এই উত্তরণটা আমাদের কাছে এতটা আচম্বিত বলে প্রতিভাত হয়। খুব সম্ভব আসলে তা অত আচম্বিতে ঘটেনি। বিদ্যমান যাবতীয় নগরের মধ্যে জেরিকো-ই (Jericho) বোধহয় প্রাচীনতম। কারণ সেখানে দেওয়ালে যে পাথরের গাঁথনি

রয়েছে তা এতই প্রাচীন যে বোঝা যায় তখনো মানুষ মৃৎকর্ম শেখেনি। নিম্ন মেসোপটেমিয়াতে একই ভূখণ্ডের পরিসরে গ্রাম থেকে ছোটো শহরে উত্তরণের কিছু চিহ্ন দেখা যায়। নগর বলতে কী বোঝায় সেই ধারণা বা নগর জিনিসটা কেমন তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই যে পরবর্তীকালের নগরের পত্তন ঘটে তা সুনিশ্চিত। কিছু কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এই কথা মনে হয় যে বেশ কয়েকটি গ্রামের অধিকাংশ বা যাবতীয় লোককে একত্রিত করে নগর গড়ে তোলা হয়েছিল। নগর গড়ার ক্ষেত্র হিসেবে হয়তো সুরক্ষিত কোনো ছোটো পাহাড়কে বেছে নেওয়া হতো। গোড়াতে তা হয়তো বন্যার সময়ে আশ্রয় হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরে এটিই হয়তো মন্দিরমঞ্চ রূপে পবিত্র মর্যাদা লাভ করে এবং সেই মঞ্চপীঠের ওপরে মন্দিরটি পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকটা টাওয়ার অব বেবেল্-এর মতো।

একেবারে গোড়াতে হয়তো একটি অঞ্চলের প্রধান জল-জাদুকরের গ্রাম থেকেই নগর গড়ে উঠত। তারই নির্দেশে সেচব্যবস্থা সংগঠিত হতো। এর জন্য যে সর্বদাই মস্ত কোনো উদ্ভাবনের বা বিজ্ঞানের তেমন কোনো সচেতন প্রয়োগ হতো তা নয়। খাল কাটা আর জল-কপাট (sluice) তৈরির জন্য বিদ্যমান জলপথকে বাধামুক্ত করা বা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় গঠিত বাঁধের মধ্যে গর্ত করাই যথেষ্ট ছিল। আমরা জানি অনেক পরবর্তী কালে হল্যান্ডের সুবিস্তৃত বাঁধ-ব্যবস্থা ঐভাবেই বালুগহ্বর আর কাদামাটির জাঙাল থেকে গড়ে উঠেছিল। আর সব কিছুর মতো এক্ষেত্রেও উন্মেষপর্বে *কৌশল (techne) প্রকৃতিকেই (physe)* অনুসরণ করে। থিওফ্রাস্টুসের ভাষায়: 'কৌশল যে প্রকৃতির অনুকরণেই উদ্ভূত হয়, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এইরূপে উদ্ভূত কৌশল কখনো কখনো অতীব আশ্চর্যজনক ফল উৎপাদন করে।' তবে ঐ সেচব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল কর্তৃত্বময় পরিচালনা। ধর্মীয় অনুমোদন সহযোগে সে কর্তৃত্বভার হয় আরোপিত নাহয় গৃহীত হয়।

নগরের পত্তন একবার হওয়ার পরে কিন্তু এক নতুন বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠল: গ্রাম আর শহরের প্রভেদ। এটা যে রাতারাতি ঘটল তা নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অধিকাংশ নগরবাসী নগরপ্রাকারের বাইরে অবস্থিত জমির মালিকানা বজায় রাখত এবং সে জমি চাষ করাত। নবার্জিত কৃষিনৈপুণ্যের কল্যাণে যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন হতো তা চলে যেত শহরে; গ্রামবাসীদের ভোগের জন্য বিশেষ কিছু পড়ে থাকত না। আমরা জানি, মিশরের প্রথম রাজবংশীয় শাসনের কালে মিশরী চাষীর কাজের স্বাধীনতা ও পরিস্থিতি তার নব্য প্রস্তরযুগীয় পূর্বপুরুষের তুলনায় সম্ভবত বেশ খারাপই ছিল; যদিও তার খাদ্যের সরবরাহ ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং সুনিয়মিত। পরে অবশ্য তার উত্তরপুরুষদের হাল সবদিক থেকেই আরো খারাপ হয়ে পড়েছিল।

গৃহের উদ্ভব

প্রথম প্রথম গ্রামের সঙ্গে শহরের তেমন কোনো পার্থক্য থাকত না। তখন শহর ছিল নিছক কতকগুলো কুটিরের সমাহার। সেসব কুটিরের প্রত্যেকটিতেই থাকত পশুদের থাকবার একটি উঠোন; একটি পরিবারের থাকবার মতো আবাসস্থল এবং ভৃত্য ও ক্রীতদাসদের থাকবার জায়গা। সাধারণত একটি পরিবারের আবাসস্থল তার বেশ কয়েক পুরুষের ভিটে রূপে বিরাজ করত। তারপর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুটির-সংলগ্ন অঙ্গনে আরো কুটির বানানো হতো। এইসব বাড়তি কুটির অনেকসময়ে দেওয়ালের গা থেকেই তোলা হতো। এইভাবে প্রথম সত্যিকারের গৃহ গড়ে ওঠে। বাঁশজাতীয় জিনিসের তৈরি কুটিরে আগুন লাগার ও ছড়িয়ে পড়ার বিপদ সমধিক; তাই শেষ পর্যন্ত কাদামাটির ইঁট দিয়ে বাড়ি বানানো শুরু হয়। গৃহের জীবনযাত্রা

অঙ্গনটিকে ঘিরে আবর্তিত হতো। বাইরের দিকের দেওয়ালগুলোতে কোনো জানলা থাকত না। গরমকালে গোটা পরিবার ছাদে শামিয়ানা টাঙিয়ে তার নিচে শুতো। তারপর ক্রমশ জানলা-বসানো দোতলা-তিনতলার আবির্ভাব হলো। বাড়িগুলোর মধ্যবর্তী পরিসর সরু হতে হতে অবশেষে রাস্তার রূপ নেয়। কিছু কিছু খোলা জায়গা অবশ্য অক্ষত রেখে দেওয়া হতো বাজার ও বাগান করবার জন্য। ক্রমে যখন সম্পত্তির পরিমাণ এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কা বাড়ল, তখন এই সমস্তকিছুকে ঘিরে একটা প্রাকার বানানো হলো। তার ফলে নগর আরো সংকীর্ণ ও ঘিঞ্জি হয়ে উঠল। তারপর যখন নাগরিক অশান্তি মাথা চাড়া দিল তখন নগরের অভ্যন্তরে গড় বা কেল্লা বানানো হলো। সশস্ত্র লোকেরা সে গড় থেকে শহর শাসন করত এবং প্রয়োজনে তার ভেতরেই আশ্রয় নিত।

মন্দির, ঈশ্বর, পুরোহিত

নগরের কেন্দ্রে থাকত একটি *মন্দির* বা প্রশস্ত ভবন। সে মন্দিরে অধিষ্ঠিত একজন দেবতা তার পুরোহিতদের মারফত স্থানীয় গ্রামীণ টোটেম পূর্বপুরুষদের একটি ক্ষুদ্র মন্ডলীর ওপরওলা বা শাসক রূপে বিরাজ করত।

দেবতা নামক এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি একান্তভাবেই নাগরিক জীবন থেকে উদ্ভূত। পূর্বতন জ্ঞাতিসমাজের পূজ্য সরল আত্মা বা অধিসত্তাগুলিকে নবলব্ধ নাগরিক সম্পদের মাধ্যমে বন্দনা ক'রে এই দেবতাদের গড়া হয়। সেই কারণেই দেখা যায়, অনেক সময়ে পশুপাখিই দেবতা হিসেবে পূজিত হয় (যেমন মিশরে), অথবা কোনো পশু বা পাখি দেবতার জুড়ি হিসেবে থাকে (যেমন জিয়ুস ও তাঁর ঈগল)। একেবারে আদি দেবতাদের সন্ধান পাওয়া যায় সুমেরীয় কিংবদন্তীতে, 5000 বছর আগে। তারা কিন্তু নিতান্তই মানবসদৃশ। গ্রামের মাতব্বরদের মতোই তারা নিজস্ব সভা, দ্বন্দ্ববিবাদ আর তর্কবিতর্ক নিয়ে ব্যস্ত থাকত। সাধারণত একেকটি শহরে একেকটি দেবতা ও তার সহচরীই ক্রমে প্রাধান্য বিস্তার করত। তাই বলে অন্যদের যে দূর করে দেওয়া হতো তা নয়; তবে তাদের গৌণ ভূমিকা দেওয়া হতো। শহরগুলোর শ্রীবৃদ্ধি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেত, দেবতার সঙ্গে তার কৌম (tribal) ও গ্রামীণ সম্পর্ক উত্তরোত্তর ক্ষীণ হয়ে পড়ছে; তার বদলে প্রতিটি দেবতা তার নাগরিক ভবনের সঙ্গে শারীরিকভাবেই ওতপ্রোত হয়ে উঠছে; দেবত্র জমিজমা ও সম্পত্তির প্রশাসনভার সেই দেবতার নিজস্ব পুরোহিতবর্গের ওপরেই ন্যস্ত হয়ে পড়ছে। প্রথম থেকেই এই পুরোহিতরা শহর শাসন করত এবং যাবতীয় সুযোগসুবিধার অধিকাংশ ভোগ করত। এরা পুরাপ্রস্তরযুগের গুনিন আর কৃষিভিত্তিক আদি জনসমাজের জাদু-রাজার উত্তরাধিকারী। মিশরে অবশ্য জাদু-রাজাই 'ফারাও' রূপে অর্থাৎ একাধারে শাসনকর্তা ও মুখ্য পুরোহিত রূপে বিরাজ করত। এই *পুরোহিতরাই হচ্ছে* সমাজের প্রথম প্রশাসক শ্রেণী। তাদের খুব সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। বস্তুত সে ভূমিকা ছিল অপরিহার্য: জল আর বীজের বন্টনের বন্দোবস্ত; বীজবপন ও ফসল তোলার সময়-নির্ধারণ; ফসল গোলাজাত করা; গবাদি ও অন্যান্য পশু এবং সেইসব পশুজাত উৎপাদন সংগ্রহ ও বন্টন করা—এসবের দায়িত্ব ছিল তাদেরই ওপর।

মন্দির-ভৃত্য ও কারিগর

তবে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাকে বজায় রাখবার জন্যে যে কায়িক পরিশ্রম প্রয়োজন, তা পুরোহিতরা করত না; করলেও, সেটা ছিল প্রতীকী কর্ম। এই প্রতীকী কর্মের উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন সুমেরীয় নগরসমূহের পুরোহিত-রাজাদের ছবির উল্লেখ করা যায়। সেসব ছবিতে দেখা

যায়, খাল কাটার সময় মাটির প্রথম ঝুড়িটা বহন করেন ঐ পুরোহিত-রাজা। মিশরী ফারাওদের ছবিতেও দেখা যায়, তারা কোদাল চালাচ্ছে। আজকের দিনের কর্মকর্তাদের 'ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে'র অনুষ্ঠান এসবেরই উত্তরসূরী। কার্যক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত উৎপাদনকে সংগ্রহ করা, তাকে গোলাজাত করা এবং তার সুরক্ষার জন্য একদল মন্দির-ভৃত্যের প্রয়োজন হতো। মন্দিরগৃহের নির্মাণ ও পরিচর্যার জন্য, তার ক্রমবর্ধমান সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠান ও পরব পরিচালনার জন্য মন্দির ব্যাপারটাই রীতিমতো এক প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। দেবতার ভোগের ব্যবস্থা অতি উত্তম রূপেই করতে হতো। আরাধ্য দেবতা সে ভোগের আধ্যাত্মিক নির্যাসটুকু গ্রহণ করতেন; আর বেচারা পুরোহিতদের কেবল তার বাহ্য আধিভৌতিক অবশেষটুকু গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হতো। এইসব যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের জন্য কর্মী প্রয়োজন হতো। ক্রমে এই কর্মীরা ঐসব কাজে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে লাগল। পরিশেষে তারা কৃষিকর্ম থেকে একেবারেই বিযুক্ত হয়ে পড়ল। মন্দিরকে ঘিরে গৃহনির্মাতা আর সূত্রধর, মৃৎশিল্পী আর তন্তুবায়, কসাই, পূপকার (baker) ও সুরাকারদের মন্ডলী গড়ে উঠল। মন্দিরের আয়ের বেশি না হলেও অল্প কিছু ভাগ এরাও পেত। জমি থেকে বিযুক্ত হয়ে এইসব কারিগররা যখন নিজনিজ কাজের সঙ্গে একেবারে ওতপ্রোত হয়ে গেল, তখনই দেখা দিল প্রথম সুসম্পূর্ণ *শ্রমবিভাজন*।

দেবতার চাহিদার কোনো অন্ত নেই। তাই এই কারিগরেরাও অতি দ্রুত তাদের প্রকৌশলের উন্নতি ঘটাতে লাগল। তার জন্য যে মালমশলা প্রয়োজন, কৃষিজাত উদ্বৃত্তের কল্যাণে তার যোগান ছিল সুনিশ্চিত। পুরোনো যেসব কারুকর্ম প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে ক্রমে যোগ হলো মণিকারের মণিকর্ম, ধাতুবিদের ধাতুকর্ম। সম্পত্তির আবির্ভাব ঘটায় শহরে গ্রামসমাজের পুরোনো জ্ঞাতিভিত্তিক সংগঠন ইতিমধ্যেই নড়বড়ে হয়ে উঠেছিল। এবার তা হয় এক নিছক আনুষ্ঠানিক রূপে পর্যবসিত হলো, নাহয় তার অস্তিত্ব টিকে রইল এককেটি কারুসংঘের একান্ত নিজস্ব গোপন এক রহস্যরূপে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ

গ্রাম থেকে নাগরিক অর্থনীতিতে উত্তরণের আদি প্রক্রিয়াটি নিয়ে বিশেষ কিছু লেখা হয়নি আজও। হাতে সাক্ষ্যপ্রমাণ হয়তো আছে অনেক, কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করা হয়নি। জর্জ টমসন গ্রীসের লৌহযুগীয় নগর নিয়ে যে ধরনের কাজ করেছেন, ব্রনজ্‌ যুগের প্রকৃত অর্থে আদিম নগরগুলো নিয়ে সেই ধরনের আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ একান্ত আবশ্যক। পুরাতত্ত্ববিদরা আদিমতম ব্রনজ্‌যুগীয় কোনো নগরের অস্তিত্ব যখনই আবিষ্কার করেন তখনই আমরা দেখতে পাই যে তা *শ্রেণীবিভক্ত সমাজ* গঠনের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আদিম নগরের আইনকানুনের মধ্যে তার স্পষ্ট লক্ষণ মেলে। যেমন আনুমানিক 1800 খ্রিস্টপূর্বাব্দের হামুরাবি অনুশাসনে প্রতিশোধমূলক সাজার একটি তালিকা রয়েছে। তাতে লেখা আছে: 'কোনো মনুষ্য অন্য মনুষ্যের চক্ষু বিনষ্ট করিলে সেই অন্য মনুষ্যও তাহার চক্ষু বিনষ্ট করিবে। কোনো মনুষ্য অন্য মনুষ্যের অস্থি ভঙ্গ করিলে সেই অন্য মনুষ্যও তাহার অস্থি ভঙ্গ করিবে। যে নাগরিক দাস নহে তাহার চক্ষু বিনষ্ট করিলে অথবা অস্থি ভঙ্গ করিলে এক 'মানা' রৌপ্য দিতে হইবে।

কোনো মনুষ্যের ক্রীতদাসের চক্ষু কেহ বিনষ্ট করিলে অথবা অস্থি ভঙ্গ করিলে তাহাকে সেই ক্রীতদাসের অর্ধেক মূল্য প্রদান করিতে হইবে।' এখানে স্পষ্টতই তিনটি সামাজিক বর্গের খবর পাওয়া যাচ্ছে। অধিকাংশ আদিম নগরেই নাগরিকদের সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন বর্গে ভাগ করা হতো। পুরোহিত, ব্যাপারী এবং স্বাধীন কারিগরেরাও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

গৃহভৃত্যদের একটি সামাজিক বর্গ ছিল। আর শহরের বাইরে ছিল কৃষকবর্গ—যারা কার্যত মন্দিরের ভূমিদাস হিসেবে কাজ করত।

এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আদি বিভাজন-প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আমরা বড়ো জোর কিছু অনুমান করতে পারি। অনেক পরবর্তীকালের গ্রীসের সুলভ সাক্ষ্যপ্রমাণাদির নিরিখে সে অনুমান করা সম্ভব। শ্রেণীগঠনের আদি প্রক্রিয়াটি সম্ভবত এইরকম। পুরোহিতদের তত্ত্বাবধানে গ্রামসমাজের মোট উৎপাদন *ভাগাভাগির* পদ্ধতিতে উত্তরোত্তর পরিবর্তন আসে. সেই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় পুরোহিতরা দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে ক্রমশই মোট উৎপাদনের অধিক থেকে অধিকতর অংশ অধিকার করতে থাকে। অন্যদিকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বেশ কিছু মানুষকে ও বহিরাগতদের নগরের অধিবাসী হিসেবে রাখা হয়; মোট উৎপাদনের কোনো অংশের ওপরেই এদের কোনো অধিকাব থাকত না।

বাণিজ্য এবং বণিক

এর ফলে দেখা দেয় অসাম্য। সে অসাম্যকে আরো বাড়িয়ে তোলে, বস্তুত স্থায়ী রূপ দেয়, *বাণিজ্য।* আচারবিধি-নিয়ন্ত্রিত পারস্পরিক আদানপ্রদানের মধ্যে থেকে বাণিজ্যের উদ্ভব। পরে তা এক আবশ্যিক 'ব্যাপার' হয়ে ওঠে। প্রথমে বাণিজ্য চলত সরল বস্তুবিনিময়-প্রথার মাধ্যমে। তারপর বিনিময়ের একক হিসেবে গবাদি পশুর ব্যবহার চালু হলো। অথবা কড়ি, সোনা বা রুপো প্রমুখ যেসব দামী জিনিস সহজে পরিবহনযোগ্য তাদের একক হিসেবে কাজে লাগানো হলো। পরিশেষে, ধারে বাণিজ্য চালানো শুরু হয়। বিদেশী জিনিসপত্রের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভ্রমণ, এমনকি সশস্ত্র অভিযান চালানো জরুরি হয়ে পড়ে। সেই তাগিদেই একদল লোক বিশেষভাবে বণিকবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়। এইসব *বণিকরা* গোড়াতে ছিল নগরের বা রাজার কর্মকর্তা। পরে এরা আপন বৃত্তিতে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে, বাণিজ্যই হয়ে ওঠে এদের প্রধান জীবনোপায়। প্রথম দিকে রাজার মন্দির ছিল প্রধান গোলাঘর ও ব্যাঙ্ক। তাকে কেন্দ্র করেই অর্থনৈতিক জীবন আবর্তিত হতো। সেখানেই সংগৃহীত হতো কর (যা সামগ্রীর এককে প্রদেয় ছিল)। সেখান থেকেই খাদ্য ও কাঁচামালের বন্টনের ব্যবস্থা করা হতো। অধিকাংশ কারিগর ছিল কার্যত দাস। পুরোহিত কিংবা অভিজাত-বংশীয় প্রভুর কাছ থেকে তারা কাঁচা মাল আর খাদ্য পেত। সেই কাঁচা মাল থেকে তৈরি সামগ্রীগুলি তারা তুলে দিত প্রভুরই হাতে। তবে সেই প্রাচীন কালেই কয়েকজন কারিগর স্বাধীনভাবে কর্ম করতে আরম্ভ করে। তারা কাঁচামাল কিনে নিত এবং তৈরি মাল নিজেরা বিক্রি করত। যাদের কোনোই সম্পত্তি ছিল না তারা বিক্রি করত শ্রম। যারা অভাবী, তারা ধার করত; যারা সম্পন্ন তারা চড়া সুদে ধার দিত; যারা ধার শুধতে পারত না তাদের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হতো।

আইন ও রাষ্ট্র

যেসব লেনদেনের পরিণামে মন্দিরের লোকসান হতো কিংবা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটত, সেসব ঠেকাবার জন্য *আইন* প্রণয়ন করার প্রয়োজন দেখা দিল। এইসব আইনই হচ্ছে প্রাচীনতম লিখিত দলিল। এইসব দলিলের কোনো কোনোটিতে জিনিসপত্রের দাম, মজুরি, এমনকি ডাক্তারের দক্ষিণার কথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লেখা থাকত। যেমন হামুরাবি অনুশাসনে লেখা রয়েছে, কোনো ব্যক্তির ভাঙা হাড় ঠিক করবার কিংবা পেটের অসুখ সারাবার দক্ষিণা পাঁচ 'শেকেল'; সে ব্যক্তি যদি অ-ক্রীতদাস নাগরিক (freeman) হয় তাহলে দক্ষিণা তিন 'শেকেল'; আর সে যদি ক্রীতদাস হয় তাহলে দক্ষিণা দুই 'শেকেল'। ক্রীতদাসের চিকিৎসার দক্ষিণা তার মালিকের দেয়।

শিকারভিত্তিক জনসমাজে, এমনকি গ্রামসমাজেও, কোন কাজটা অনুমোদনযোগ্য আর কোনটা নিষিদ্ধ তার বিচার করা হতো নির্দিষ্ট ঐতিহ্যবাহিত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে। জ্ঞাতিসমাজের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের ক্রিয়াকলাপের দায়িত্ব গোটা জ্ঞাতিসমাজের ওপরেই বর্তাত—কোনো সমস্যা দেখা দিলে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে তার ফয়সালা হতো, কিংবা আনুষ্ঠানিকভাবে মূল্য ধরে দিয়ে তার মীমাংসা হতো। কিন্তু এই ঐতিহ্যবাহিত পদ্ধতি নাগরিক সমাজে আর খাটল না। নগরে যেহেতু সামাজিক অসাম্য দেখা দিল, সেহেতু বলপ্রয়োগের একটা কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন হলো।

মেসোপটেমিয়ার নগরগুলোর আদি নাগরিক সংঘগুলো অভ্যন্তরীণ কিংবা বাইরের অশান্তির আশঙ্কায় পরিশেষে একক ব্যক্তিশাসনকে স্বীকার করে নিল। সেই ব্যক্তিশাসনের রূপ ছিল দুরকম: এক, *এনসি* বা মুখ্য মন্দির-প্রশাসক; দুই, *লুগাল্* বা মহারণাধ্যক্ষ (ইনি আবার একই সঙ্গে দেবতার পূজারীও বটেন)। মিশরে দেবতা-নির্দিষ্ট পুরোহিত-রাজা 'ফারাও' প্রথম থেকেই বংশপরম্পরায় রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিরাজ করতে থাকেন। পুলিশী ক্ষমতাযুক্ত একদল মন্দির-কর্মীর ওপর আইনের প্রয়োগ এবং কর সংগ্রহের ভার ন্যস্ত হয়। জরিমানা, কারাগারে নিক্ষেপ, প্রহার বা হত্যা করা ইত্যাদি *শাস্তিদানের* অধিকারও রাজা নিজের ওপর অর্পণ করেন। তবে রাষ্ট্রক্ষমতা নামত একজন ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত থাকলেও কার্যত তা পুরোহিত ও বণিকদের দ্বারা গঠিত উচ্চশ্রেণীর পূর্ণ সমর্থনের ওপরে নির্ভরশীল ছিল। একমাত্র গণবিদ্রোহের আশঙ্কাই সেই রাষ্ট্রক্ষমতাকে কিছুটা প্রশমিত করে রাখত।

বিগত পাঁচ হাজার বছর ধরে *শ্রেণীসমাজের* উত্থান ও পতনের, তার বিকাশ ও বহুধাবিস্তৃতির ইতিহাস আমরা পর্যালোচনা করব। আমরা দেখব কীভাবে তা মানবপ্রগতির পথকে কখনো সুগম, কখনো অবরুদ্ধ, কখনো বা বিনষ্ট করেছে। তবে শ্রেণীসমাজের উন্মেষপর্বে তা যে প্রধানত প্রগতিশীল ভূমিকাই পালন করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রকৌশলের উন্নতিসাধনকে তা বিপুলভাবে প্রণোদিত করে। শুধু তাই নয়, শ্রেণীসমাজেরই প্রণোদনায় উন্নত প্রকৌশলকে যুক্তিশাসিত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার সূত্রপাত ঘটে। সেই যুক্তিশাসিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই পরে বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়।

3. সভ্যতার প্রকৌশলসমূহ

ধাতুর আবিষ্কার

আদি নগরগুলির উদ্ভবের মূলে নদী-সংলগ্ন সমতলভূমিতে কৃষি-সংগঠনের ব্যাপারটির অর্থনৈতিক ভূমিকা ছিল চরম। তারই পাশাপাশি যে মুখ্য প্রকৌশলগত অগ্রগতিটি ঘটে সেটি হলো *ধাতুর*—বিশেষত *তামা* ও তার সংকর ব্রনজের—আবিষ্কার ও ব্যবহার। সভ্যতার আদিযুগটি তো এই ব্রনজ ধাতু-সংকরের নামেই চিহ্নিত। পরে প্রকৌশলে ও বিজ্ঞানে ধাতুর গুরুত্ব হয়ে ওঠে অসীম। কিন্তু একেবারে শুরুতে ধাতুর ভূমিকা এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ইংরেজি metal শব্দটি যে গ্রীক মূল শব্দ থেকে আহরিত তার অর্থ হচ্ছে 'অন্বেষণ করা'। বোঝা যায়, প্রথম দিকে ধাতু বেশ দুর্লভ ছিল। বস্তুত তখন তা এতই দুর্লভ ছিল যে তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল কেবল বিলাসসামগ্রী নির্মাণে। শহরের কৃষিকার্য এবং অধিকাংশ কারুকার্য প্রস্তর-প্রকৌশলের সাহায্যেই সংঘটিত হতো। ধাতুকে এমনকি আদি সভ্যতার জন্য একান্ত অপরিহার্যও বলা চলে না; কারণ মায়া সভ্যতার বা অ্যাজটেক সভ্যতার যুগের বড়ো বড়ো

শহরগুলোর কোনোটাতেই একমাত্র গয়না ছাড়া আর কিছুতে ধাতুর ব্যবহার হয়নি; যাবতীয় নির্মাণযন্ত্রই ছিল পাথরের তৈরি।

সোনা এবং কিছু পরিমাণে তামা ছাড়া কোনো ধাতুকেই কাঁচা অবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না; তাদের নিষ্কাশন করে, প্রস্তুত করে নিতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, এমনকি হয়তো সচেতন পরীক্ষানিরীক্ষা। সেই পুরাপ্রস্তরযুগেও আদিম মানুষ যেকোনো বিদঘুটে আকৃতির বা অদ্ভুত রঙের জিনিসের প্রতি কৌতূহল বোধ করত। ধাতু আবিষ্কার ও ব্যবহারের আদি প্রেরণার মূল হয়তো ঐ কৌতূহলের মধ্যেই নিহিত। ধাতব আকরিকের খণ্ড যে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, এটা ছিল অবধারিত। বস্তুত গলার হার ও অন্যান্য গয়নাগাঁটিতে যে ধাতব আকরিকের টুকরো ব্যবহৃত হতো তার প্রমাণ আছে। মিশরে রাজবংশীয় শাসন চালু হবার আগের পর্বে নয়নরঞ্জনী হিসেবে 'ম্যালাকাইট' নামক তাম্র-আকরিকের বাণিজ্য ও ব্যবহার খুবই ব্যাপক ছিল। ঘটনাটা নিছক কাকতালীয় না-ও হতে পারে (ম্যালাকাইট আকরিক থেকেই সবচেয়ে সহজে তামা নিষ্কাশন করা যায়)। ধাতু দিয়ে নির্মাণযন্ত্র বানানোর ব্যাপারটা তখনো নিশ্চয়ই গৌণ ছিল।

প্রথম যে ধাতুটি আবিষ্কৃত হয় সেটি হলো সোনা। তার কারণ কাঁচা অবস্থায় সোনাই সবচেয়ে সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর দেখা গেল, সোনার পিণ্ড পাথরের টুকরোর মতো শক্ত আর ভঙ্গুর নয়, তা নমনীয়, তাকে পিটিয়ে পাতে পরিণত করা যায়। এইভাবে, আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন শুরু হবার বহু আগেই এক ধাতু-প্রকৌশল গড়ে ওঠে। কাঁচা অবস্থায় প্রাপ্ত তামার পিণ্ড অবশ্য অতটা নজর কাড়ত না, আভরণ হিসেবে তার কদরও তেমন নয়। তবু তাকেও পিটিয়ে পিটিয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করে নেওয়া সম্ভব ছিল, এবং সেসব টুকরোর দৃঢ়তা নির্মাণযন্ত্র বানানোর পক্ষে যথেষ্ট। দেখা গেল, হাতুড়ি পেটানোর আগে যদি ধাতুখণ্ডটাকে গরম করে বা পান খাইয়ে (anneal) নেওয়া যায় তাহলে কাজটা সহজ হয়। ধাতুর সঙ্গে অগ্নি-প্রকৌশলের এই সম্পর্কটি জানবার পরেই সম্ভবত পরবর্তী পদক্ষেপগুলো গৃহীত হয়—যথা কার্বনেট কপারের বিজারণ (reduction) বা বিগলন (smelting) এবং উৎপন্ন ধাতুকে গলানো ও ঢালাই করা। আধুনিক গবেষণা থেকে মনে হয়, উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলি একে একে ঠিক ঐ উল্লিখিত ক্রমেই সংঘটিত হয়। কিন্তু এইসব প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যে উচ্চতর তাপমাত্রা প্রয়োজন তা সাধারণ চুল্লিতে উৎপাদন করা অসম্ভব। সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যায়, পালিশ-করা পাত্রকে বাতাসের যথেষ্ট ঝাপটের ব্যবস্থাযুক্ত মাটির চুল্লিতে বসিয়ে ঐ কার্য সমাধা করা হতো। ধাতুবিদ্যার উৎপত্তির প্রশ্নে একটি গুরুতর সমস্যা আছে। সমস্যাটি এই : কাঁচা তামা বা ভূমিতলে প্রাপ্ত জারিত তামার আকরিক সাধারণত পাহাড়ের ওপরেই পাওয়া যায়; তার ক্ষেত্র কৃষিকেন্দ্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। তাহলে ধাতুবিদ্যা কি প্রথমে আকর-সংলগ্ন এলাকাতেই গড়ে উঠেছিল এবং সেখান থেকেই কি ধাতব সামগ্রীগুলো অচিরে শহরে গিয়ে পৌঁছেছিল? নাকি আকরিক আর ধাতু উভয়েই প্রথমে শহরে সঞ্চিত হয় এবং প্রকৌশলে অগ্রগতি ঘটে সেখানেই? এ প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয়নি। কিন্তু যদি শহরই ধাতুবিদ্যার আদি উৎপত্তিস্থল হয়ে থাকে, তবু ধাতুযুগের একেবারে গোড়ার দিকে পরিবহনের অসুবিধার কথা মাথায় রাখলে বলা যায় ধাতু-বিগলনের জন্য মানুষের শহর ছেড়ে আকরের কাছে না গিয়ে উপায় ছিল না।

ধাতু ব্যবহারের ফলাফল

ধাতুর তৈরি প্রয়োগযন্ত্র ও বাসনপত্র তৈরি করার প্রকৌশল রপ্ত করার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের পথে গুণগতভাবে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। পাথরের তুলনায় ধাতুর

তৈরি নির্মাণযন্ত্র মূল্যবান এবং টেকসই। পশুই হোক আর মানুষই হোক, উভয় শত্রুর মোকাবিলায় ধাতুর তৈরি অস্ত্রশস্ত্র পাথুরে হাতিয়ারের তুলনায় অনেক ফলপ্রদ। তাছাড়া ধাতুপাত্র অনেক বেশি তাপসহ, তা আগুনে ফেটে যায় না।

তবে বহু শতাব্দী ধরে ধাতুর দাম ছিল অত্যধিক। তামার আকরিক বহু দূর দূর এবং দুর্গম স্থানে অল্প অল্প পরিমাণে লভ্য ছিল; টিনও তাই। এবং *ব্রন্‌জ* তৈরির জন্য উভয় ধাতুই প্রয়োজন ছিল। ব্রন্‌জ অল্প তাপে গলে, যার ফলে তাকে *ঢালাই করা* সহজ হয়। ব্রন্‌জ তামার তুলনায় অনেক কঠিনও বটে। ব্রন্‌জ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যাবতীয় নির্মাণযন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কাজে ধাতুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ধাতু এবং তার আকরিকের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে দূরদূরান্তে বাণিজ্যের প্রসার। কাজেই, সেকালের আদিম পরিবহন খুবই ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় শহরে ধাতুর দাম যে অত্যন্ত চড়া হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই প্রথম দিকে ধাতুর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল কেবল মন্দিরসজ্জায়, রাজকীয় বাসনপত্র নির্মাণে, শহরের কারিগরদের নির্মাণযন্ত্র নির্মাণে, এবং পরে যুদ্ধবিগ্রহ যখন সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠল, তখন অস্ত্রনির্মাণে।

ধাতুকর্মকারের কারুকৌশল

ধাতু তৈরি করার কৌশলসমূহ এবং ধাতুর তৈরি নির্মাণযন্ত্রের ব্যবহার—এ দুটি ব্যাপারের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ অন্যান্য বহু প্রকৌশলের বিকাশকে তা ত্বরান্বিত করে এবং বস্তুর ভৌত ও রসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে কারিগরদের জ্ঞানকে প্রসারিত করে। ধাতুপাত তৈরি হয় পিটিয়ে, ধাতুর তার তৈরি হয় টেনে। এরপর ঢালাই, ধাতুযোজন (welding), ঝাল দেওয়া এবং রিভেট করার কৌশল অচিরেই বিকশিত হয়। এইসব প্রকৌশলের সহায়তায় উন্নত এবং জটিল গড়নের গয়নাগাঁটি, পাত্র ও মূর্তি গড়া সম্ভব হয়। মৃৎকর্ম এবং বয়নের প্রকৌশল অনেক প্রাচীন; সে তুলনায় ব্রন্‌জ, রুপো আর সোনার ধাতুকর্মের প্রকৌশল অনেক পরে বিকশিত হয়। ফলে প্রথম থেকেই এইসব ধাতুকর্মের কাজ ছিল বিশেষীভূত (specialized)। মনে হয়, *ধাতুকর্মীদের* কারুসংঘের মধ্যেই এসব কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। এইসব কারুসংঘ বৃত্তিভিত্তিক জাতিসমাজরূপে গড়ে উঠেছিল। পরে ভারতবর্ষে জাতি-প্রথার যে আনুষঙ্গিক রূপটির উদ্ভব ঘটে তারই এক আদি নিদর্শন এই জাতিসমাজ। ধাতুকর্মীদের এইসব কারুসংঘ নিশ্চয়ই মন্ত্রগুপ্তি পালন করত; যে কারণে তাদের আচরিত নানাবিধ প্রক্রিয়া এই সেদিন পর্যন্ত সাধারণ্যে অজ্ঞাত ছিল। একই কারণে বহু বিশেষ প্রক্রিয়ার জ্ঞান চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে, যেহেতু সেসবের কোনো লিখিত বিবরণ রাখা হয়নি।

একেবারে প্রথমে আকরখনন ও বিগলনের কাজে যুক্ত ধাতুকর্মী ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় ধাতুকর্মী ধাতুপিণ্ড কিংবা ধাতুখণ্ড থেকে ধাতু নিষ্কাশনের কাজে নিয়োজিত ছিল। তারা বেশির ভাগই ছিল শহরবাসী। কিন্তু তাদের রেখে-যাওয়া বিপুল পরিমাণ ধাতুর টুকরোটাকরা এবং আধা-তৈরি নির্মাণযন্ত্রের সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায়, তারা সারা দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়াত—অনেকটা উচ্চাঙ্গের ভ্রাম্যমান বাসন-সারাইকারীদের মতো।

ধাতুর তৈরি নির্মাণযন্ত্র বা অস্ত্রশস্ত্রের গুণ কেবল এই নয় যে তারা অনেক টেকসই। পাথরের তুলনায় ধাতুর নির্মাণযন্ত্রকে অনেক পাতলা করে বানানো সম্ভব; এবং তার ফলে ধাতুর নির্মাণযন্ত্র দিয়ে অনেক নিখুঁত করে কাটা সম্ভব। অথচ পাথুরে নির্মাণযন্ত্র দিয়ে খোদা বা ভাঙা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব নয়। এইভাবে ধাতুর তৈরি নির্মাণযন্ত্রের, বিশেষ করে *ছুরি, বাটালি* আর *করাতের* ব্যবহার চালু হওয়ায় কাঠের কাজে বিরাট পরিবর্তন এল। কাঠ জোড়া লাগিয়ে *দারুকর্ম* বা সূত্রধরের কাজ কিংবা একটানা দীর্ঘ অনুভূমিক দেওয়াল গাঁথার *রাজমিস্ত্রীর কাজ*

বাস্তবে ব্যাপক আকারে চালানো সুসাধ্য হয়ে উঠল। প্রথম যেসব মেশিন তৈরি হয়, বিশেষত চাকা-লাগানো ঠেলাগাড়ি বা জলচক্র, তাও ধাতুর কল্যাণেই সম্ভব হয়। এমনকি কৃষিকর্মের মৌলিক কৌশলেও পরিবর্তন আনে ধাতু। বলদে-টানা কোদাল বা লাঙলের মাটিভাঙা *ফাল* যখন কাঠের বদলে ধাতু দিয়ে তৈরি হলো, তখনই তা পূর্ণমাত্রায় ফলপ্রদ হয়ে উঠল।

পরিবহন

সভ্যতার সেই আদিযুগে যেসব যান্ত্রিক উদ্ভাবন ঘটে তার যুগপৎ তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী ফল ফলেছিল। প্রথম দিককার শহরগুলোর অস্তিত্ব নির্ভর করত বিপুল পরিমাণ জিনিসপত্র সুষ্ঠুভাবে পরিবহন করতে পারার ওপর। হাজার হাজার শহরবাসীর জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে খাদ্য আনতে হতো; অন্যান্য শহরের সঙ্গে লেনদেন করতে হতো; দূরদূরান্তের জঙ্গল আর পাহাড় থেকে ধাতু, কাঠ এমনকি পাথর নিয়ে আসতে হতো। এর ফলে পরিবহন-পদ্ধতিতে প্রভূত উন্নতি হয়। নানাবিধ উদ্ভাবনের ফলে পরিবহনে আমূল পরিবর্তন আসে। সভ্যতার বিকাশে, বিশেষত বিজ্ঞানের বিকাশে এসব উদ্ভাবনের গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

জাহাজ

আদিযুগের সভ্যতাগুলো সবই বড়ো বড়ো নদী-উপত্যকা বা তৎসংলগ্ন বদ্বীপ ও জলাশয়কে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। স্বভাবতই, প্রথমাবধি জল-পরিবহনই ছিল মানুষের প্রধান অবলম্বন। সেই তাগিদে আদিম মানুষ একে একে বানায় নানারকম জলযান : গাছের গুঁড়ি খুদে বানায় আদিম ক্যানু নৌকো; জলজ গাছের ডাঁটা জড়ো করে বেঁধে বানায় ভেলা; তৈরি করে বাঁশের ভেলা। ক্রমাগত ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে এসবের পরীক্ষা চলে; ক্রমাগত অসংখ্য ছোটোখাটো সংযোজন ঘটে। এইসব পরীক্ষানিরীক্ষা ও সংযোজনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে প্রয়োজনসাধক *জাহাজ*, যা বিপুল পরিমাণ মালপত্র বহনে সক্ষম। বস্তুত ঐ প্রক্রিয়ায় নীলনদের জলপথকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল বলেই আদি মিশরী সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক একীভবন সম্ভব হয়। আবার ঐ রাজনৈতিক একীভবন না ঘটলে নীলনদের জলপথকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হতো না, এ কথাও ঠিক। একেবারে আদিযুগে নৌকো আর জাহাজগুলো চালানো হতো হয় প্যাডেল করে, না হয় দাঁড় টেনে। বহু শতাব্দী ধরে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। অতঃপর সভ্যতার উন্মেষপর্বের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে আরেকটি মহা গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন ঘটে। *সেটি হলো · পাল।* এর ফলে জাহাজ-পরিবহনের পাল্লা বিপুলভাবে প্রসারিত হয়ে যায়। কিন্তু এর সবচেয়ে বড়ো তাৎপর্যটি এই যে মানুষ সেই প্রথম কোনো অপ্রাণী-সূত্র থেকে আহরিত *শক্তিকে* তার নিজের কাজে লাগাল। পরবর্তী কালের বায়ু-ও-জল-যন্ত্র, বাষ্পীয় এনজিন বা বিমানের আদিরূপ এই পাল।

নদী আর জলাশয়গুলো ছিল মানুষের সমুদ্র-অভিযানের প্রশিক্ষণক্ষেত্র; এক্ষেত্রে ধীবরেরা হয়তো বণিকদের আগেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সমুদ্রভ্রমণের দরুন জাহাজ-নির্মাণ নিয়ে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিল। নদীতে চলবার উপযোগী জলযানের চেয়ে সমুদ্রপোতের কাঠামো অনেক মজবুত হওয়া চাই। এছাড়া, ডাঙা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর সাগরের বুকে সঠিক দিক নির্ণয় করার প্রয়োজনটিও তীব্র হয়ে ওঠে। পরে বিজ্ঞানের বিকাশের মূলে এই তাগিদটির গুরুত্ব ছিল সমধিক। সাগরের বুকে দিকনির্ণয়ের আদিমতম পদ্ধতিটি ছিল ডাঙা-মুখী পাখিকে অনুসরণ করা। নোয়ার জাহাজ সংক্রান্ত কিংবদন্তীতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আকাশের তারার নিরিখে ডাঙার অভিমুখ নির্ণয় করতে হলে মানচিত্র ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকা

প্রয়োজন। একমাত্র ক্যালেন্ডার রচনার তাগিদকে বাদ দিলে সূর্যতারার নিরিখে *নৌচালনের* এই তাগিদটিই ব্যবহারিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকাশকে সবচেয়ে বেশি করে প্রণোদিত করেছে।

চাকা

প্রকৌশল ও বিজ্ঞানের পরবর্তী অগ্রগতির মূলে আরো একটি ঘটনার ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হলো স্থল-পরিবহনের বিকাশ। দুটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার সমন্বয়ে এই বিকাশ ঘটে : *প্রাণী-শক্তির* এবং *চাকার* ব্যবহার। পশুকে আগেই পোষ মানানো হয়েছিল, পশু-প্রজননের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল শিকারী মানুষের খাদ্যের চাহিদা আরো সুষ্ঠুভাবে মেটানো। এবার কিন্তু পোষ-মানা পশুকে দিয়ে অন্য ধরনের কাজ করানো হলো : তারা চাকাওয়ালা *গাড়ি* টানতে লাগল; মেয়েদের বদলে তারাই এবার চাষের কোদাল টানতে লাগল—যার ফলে কোদাল পরিণত হলো লাঙলে।

পশুর পিঠে মাল বহনের উপযোগী জিনের প্রবর্তনের মধ্যে দিয়েই সম্ভবত পশুদের পরিবহনের কাজে জোতার সূত্রপাত ঘটে। আদিম মানুষ সম্ভবত গাধার পিঠেও চড়তে চাইত না; তা না হলে সেরকম ছবি নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। মাল বহনের উপযোগী জিনের পরে হয়তো *ত্রাভোয়া* (travois) নামক জিনিসটির প্রবর্তন ঘটে। এই পদ্ধতিতে দুটো সমান্তরাল খুঁটিকে যুক্ত করে তার ওপর মাল চাপিয়ে ঘোড়া বা অন্য কোনো পশুকে দিয়ে মাটির ওপর দিয়ে ঘষটে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। এখনো সাইবেরিয়ার কোনো কোনো উপজাতি এই ত্রাভোয়া ব্যবহার করে। তবে এ থেকেই যে চাকাগাড়ির উদ্ভব হয়েছিল তা মনে হয় না। কারণ চাকাগাড়ির যে আদিতম রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত তাতে লাঙলের জোয়াল আর দণ্ডের ব্যবহারই চোখে পড়ে. ত্রাভোয়াতে ব্যবহৃত অক্ষদণ্ডের প্রয়োগ সেখানে চোখে পড়ে না। থাম বানাবার জন্য গাছের গুঁড়ি কিংবা বড়ো বড়ো বাড়ি বানাবার জন্য মস্ত প্রস্তরখণ্ডের মতো যেসব জিনিসকে ছোটো ছোটো বোঝায় ভেঙে নেওয়া সম্ভব নয়, সেগুলোকে পরিবহনের প্রয়োজন দেখা দেয় পরে, যখন শহরের অভ্যুদয় হলো। এ সমস্যার সমাধানকল্পে প্রথম যে ব্যবস্থাটি নেওয়া হয় তাহলো *স্লেজগাড়ির* প্রবর্তন। বনের মধ্যে শিকারের জন্য ইতিমধ্যেই ছোটো আকারের হালকা যে স্লেজ প্রচলিত ছিল, এটি সম্ভবত তারই পরিবর্ধিত সংস্করণ। ভারি স্লেজগাড়িকে অনায়াসেই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে গড়িয়ে দেওয়া যেত। আর সমতলক্ষেত্রে গাছের গুঁড়িব ওপর স্লেজটাকে চাপিয়ে গড়িয়ে নিয়ে যেতে হতো।

গাছের গুঁড়ির ওপর চাপানো স্লেজগাড়ি থেকে *চাকাগাড়ির* যে উত্তরণ ঘটে সেটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত সে উত্তরণ ঘটার পেছনে শহরের প্রণোদনা সক্রিয় ছিল। তবে একবার চালু হয়ে যাওয়ার পর চাকাগাড়ি গ্রামাঞ্চলেও অতিদ্রুত প্রসার লাভ করে। চাকাগাড়ির আসল কেরামতিটা এই যে গাড়ির গায়েই একটা নিরেট রোলার এমনভাবে লাগানো থাকে, যাতে রোলারটা পাক খেলেও খুলে বেরিয়ে আসে না। আদি মেসোপটেমিয় চাকাগাড়িতে, এমনকি আধুনিক ভারতবর্ষে এখনো-প্রচলিত গরুর গাড়িতে দেখা যায়, গাড়ির অক্ষদণ্ডটা চাকার সঙ্গেই ঘোরে এবং একটা চামড়ার পটি সেই দণ্ডটাকে ঠিকমতো ধরে রাখে। এই ছিল প্রথম সত্যিকারের *বেয়ারিং।* তবে প্রায়-সমসাময়িক *দরজা* জিনিসটাকেও এক ধরনের বেয়ারিং বলা যেতে পারে; কেননা তাতেও একটা খুঁটি একটা *কোটরের* (socket) মধ্যে বসানো থাকত। এর পরবর্তী ধাপ হলো অক্ষদণ্ডের প্রান্তগুলোর পরিবর্ধন। এর জন্যে প্রথমে তার গায়ে কাঠের ডান্ডা বসিয়ে *চাকা* বানানো হয়। তারপর চামড়ার (পরে ধাতুপাতের) পটিকে টায়ার হিসেবে কাজে লাগিয়ে সেই চাকাগুলোকে শক্ত করে ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হতো। চাকাগাড়ির প্রথম উদ্ভব

বোধহয় সুমেরীয়দের হাতে ঘটে—খুব সম্ভব তাদের মেসোপটেমিয়া আগমনের আগে। মিশরীয়দের শহরগুলো সবই নীলনদের দু চার মাইলের মধ্যেই অবস্থিত হওয়ায় তারা প্রধানত জলপরিবহনই ব্যবহার করত। সেখানে চক্রযানের প্রবর্তন ঘটে অনেক পরে। যুদ্ধরথে ব্যবহৃত হালকা অর-বা স্পোক-লাগানো চাকা, যা অনেক স্বচ্ছন্দে পাক খায়, তার উদ্ভব হয় আরো অনেক পরে, ব্রন্‌জ যুগের শেষ দিক নাগাদ। কারণ ঐ ধরনের চাকা তৈরি করতে হলে চাকার সন্ধিগুলোকে অতি নিখুঁতভাবে মেলাতে হয়। আর তার জন্য বিশেষ পটু *চাকা-নির্মাতা* প্রয়োজন।

বস্তুগত এবং বৈজ্ঞানিক, উভয় দিক থেকেই এইসব উদ্ভাবনের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। চাকাগাড়ি আর লাঙল—এ দুয়ের দৌলতে কৃষিকার্য উন্মুক্ত সমতলভূমির সর্বত্রই প্রসার লাভ করে। প্রাচীনতর সভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে তা ব্যাপ্ত হয় বহুদূরে। আদি ব্রন্‌জ যুগে যে দুচাকার গরুর গাড়ি উদ্ভাবিত হয়েছিল তারই পরিবর্ধিত সংস্করণ হলো চার হাজার বছর পরের আচ্ছাদিত ওয়াগন-গাড়ি, যার কল্যাণে আমেরিকা মহাদেশের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি মানুষের আয়ত্তে আসে। সমতল অঞ্চলে যেখানেই লাঙল আর চাকাগাড়ি ব্যবহার করা সম্ভব হলো, সেখানেই কৃষি-উৎপাদনে উদ্বৃত্তের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেল। শুধু তাই নয়, ব্যাপক মাত্রায় বিদেশী জিনিস আমদানি করাও সম্ভব হলো। বড়ো বড়ো মন্দির ও পিরামিড নির্মাণে লিভার ও আনত তলের প্রচলন অনেক আগেই হয়েছিল। *বলবিজ্ঞানের* ভিত্তি স্থাপন করেছিল এই দুটি কৌশলের ব্যবহার। সেই ভিত্তির ওপর চাকার ব্যবহারের সুবাদে গড়ে ওঠে এক নতুন তত্ত্বসৌধ। এই পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়ে সুদূর আকাশে চংক্রমণরত জ্যোতিষ্কলোক পর্যন্ত তা প্রসারিত হতে চাইল। সৌর পূতচক্রের বারোটি অর (স্পোক) বারোটি মাসকে চিহ্নিত করল। পরে চলমান ঐ চক্রই আবার রূপ নেয় স্বস্তিকা চিহ্নে—যা আদিতে নির্দোষ থাকলেও পরে অতি ভয়াবহ তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়। এই চাকার ব্যবহার থেকেই আবার পরে জলচক্র আর কপিকলের উদ্ভব হয়। তারই পাশাপাশি, চাকাগাড়ির, বিশেষ করে জাহাজের সুবাদে পরিবহন দ্রুততর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেড়ে যায়; তাছাড়া মূল্যবান পদার্থসমূহের প্রাপ্তিস্থান জানবার প্রয়োজনও বাড়ে। এইসবের সম্মিলিত পরিণতিস্বরূপ সচেতন অন্বেষণ চলতে থাকে এবং তার ফলে *ভূগোলবিদ্যার* সূত্রপাত ঘটে।

এইসব নবনব প্রকৌশলের উদ্ভাবন ও পরবর্তী বিকাশের ফলে মানুষের সামনে বৈজ্ঞানিক ধারণা গঠনের এক বিশাল ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়। হয় ঠিক সেই সময়ে যখন নবজাত সভ্যতার সাংগঠনিক চাহিদা মেটানোর তাগিদে এক মনন-প্রক্রিয়া জন্ম লাভ করছিল—এমন এক মনন-প্রক্রিয়া যা ঐ বৈজ্ঞানিক ধারণাকে ব্যক্ত করার ও প্রচার করার উপযোগী।

4. পরিমাণাত্মক বিজ্ঞানের উৎপত্তি

গোনা, লেখা, বিজ্ঞান

শহরের মন্দির চালানোর জন্য নানারকম প্রক্রিয়া সাধন করতে হতো। সেসব প্রক্রিয়া সাধনের জন্য বিপুল পরিমাণ বস্তুর প্রয়োজন হতো, নানারকম ক্রিয়াকর্ম তার সঙ্গে জড়িত থাকত। এর পরিণতিতে আসে এক গুণাত্মক পরিবর্তন, যার ফলে সচেতন বিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটে। প্রথমত, পুরোহিতরা যখন দেখল সবকিছু স্মৃতিতে ধরে থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না তখন তারা গৃহীত ও বণ্টিত মালপত্রের *পরিমাণের* হিসেব রাখার একটা উপায় বার করতে বাধ্য হলো। এটা করতে গিয়ে পরিমাপের উদ্ভাবন ঘটল। প্রথমে নিছক কাজ চালানোর উপযোগী পরিমাপের ব্যবহার

হলো, যেমন শস্যের ঝুড়ি, সুরার পাত্র, কাপড়ের টুকরো। কিন্তু তার পর *এইসব* পরিমাপকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনীয় করে তোলার তাগিদে প্রমিতকরণ (standardization) জরুরি হয়ে পড়ল। তখন মন্দির-পরিচালকদের বা রাজার দ্বারা অনুমোদিত কতকগুলো সুনির্দিষ্ট পরিমাপ প্রচলিত হলো। অতঃপর, বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বার্থে বিভিন্ন শহরে প্রচলিত এইসব সুনির্দিষ্ট পরিমাপের মধ্যে খানিকটা সাযুজ্য ঘটানো হলো। *বাটখারার* ব্যবহার সম্ভবত আরো কিছুটা পরে চালু হয় (যদিও সেটাও খুবই প্রাচীন ঘটনা)। বাটখারার ব্যবহার চালু হওয়ার অর্থ হচ্ছে দাঁড়িপাল্লা বা *তুলাদণ্ডের* প্রবর্তন, বিজ্ঞানেব বিকাশে যার অবদান অপরিসীম। তুলাদণ্ড জিনিসটা অবশ্যই শহরে তৈরি হয়েছিল। কেননা, গ্রামীণ অর্থনীতিতে এমন কিছুই ছিল না যাকে গুণে বা মেপে নেওয়া যায় না—যেমন পাঁঠার মাংসের 'একটা' *ঠ্যাং*, 'এক' আঁটি *কাঠ* ইত্যাদি। সবার আগে দাঁড়িপাল্লার প্রয়োজন হয় দামী ধাতুর জন্য। দামী ধাতুকে তো আর যেমনতেমন করে পরিমাপ করা যায় না, কারণ এক 'টুকরো' ধাতু বলতে নির্দিষ্ট কিছুই বোঝায় না। সুতরাং ধাতুর পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য বাটখারার প্রয়োজন হলো। এই দাঁড়িপাল্লাই তখন দুটি জিনিসের ওজন তুলনা করার একমাত্র পন্থা। একটি *বৈজ্ঞানিক* উদ্ভাবন বলতে যা বোঝায়, দাঁড়িপাল্লা জিনিসটির মধ্যে তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ভারীরা কাঁধে বাঁক চাপিয়ে দুই প্রান্তে ঝুড়িভর্তি মাল নিয়ে যেভাবে *ভারসাম্য* বজায় রেখে মাল বহন করত, তা থেকেই হয়তো তুলাদণ্ডের ধারণার উৎপত্তি। তবে দামী ধাতু ওজন করার উপযোগী করে তোলার জন্য দাঁড়িপাল্লাকে আকারে অনেক ছোটো করে নিতে হয়েছিল।

সংখ্যা ও চিত্রলিপি

তবে পরিমাপকে প্রমিত করে নেওয়ার আগেই যেটা করা জরুরি ছিল তা হলো সংগৃহীত বা বণ্টিত বস্তুর *সংখ্যার* হিসেব রাখা—অতগুলো গরু, অত ঝুড়ি শস্য ইত্যাদি। গোড়াতে লাঠিতে খাঁজ কেটেই এ কাজটা সারা হতো। তারপর প্রস্তরখণ্ড বা মাটির ঢেলার ওপর একেকটি আঁচড় কেটে হিসেব রাখার রেওয়াজ চালু হয়। অতঃপর বড়ো বড়ো সংখ্যাকে চিহ্নিত করার জটিলতর পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। হিসেব রাখতে গিয়ে অনেকসময় এমন মনে হতো যে *ঠিক* কোন জিনিসটার হিসেব রাখা হচ্ছে তা-ই হয়তো ভুলে যাবার সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে সংখ্যাসূচক প্রতীকটির পাশে ঐ বস্তুটির একটি ছবি বা সংকেতচিহ্ন এঁকে দেওয়া হতো, যাতে তা ঐ বস্তুটির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ক্রমশ ঐসব প্রতীকচিত্রের অর্থ বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। তা কেবল বস্তু নয়, নানাবিধ ক্রিয়ারও প্রতীক হয়ে *ওঠে*। অবশেষে তা হয়ে *ওঠে* শব্দের (word) প্রতীক। কোথাও সে চিত্র কেবল অর্থকেই ব্যঞ্জিত করে (যেমন চীনা লিপিতে), কোথাও বা তা ধ্বনি আর অর্থের সংমিশ্রণ হয়ে *ওঠে* (যেমন মেসোপটেমীয় কীলকাকার বা 'কিউনিফর্ম' লিপিতে, কিংবা সম্ভবত তাবই দ্বারা প্রভাবিত মিশরী চিত্রলিপিতে)। এ থেকেই অবশেষে নির্ভেজাল বর্ণমালার উদ্ভব ঘটে। বর্ণগুলি কেবলমাত্র ধ্বনিরই প্রতীক, শব্দের (word) নয়। তবে এই সরলীকরণ ঘটে অনেক পরে, লৌহযুগে। এইভাবে হিসাবরক্ষণের প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে *লিখনের* উদ্ভব হয়। মানুষের হাত আর বুদ্ধির সমন্বয়ে যে-কটি উদ্ভাবন ঘটেছে, এটি তার মধ্যে মহত্তম। ই· এ· স্পেইজারের ভাষায়, 'লিখন ব্যাপারটা যে মানুষের সচেতন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উদ্ভাবন তা নয়, তা হচ্ছে তীব্র ব্যক্তিগত সম্পত্তিচেতনার এক আনুষঙ্গিক উপজাতক।' প্রথমে প্রচারধর্মী সরকারি বিবৃতি, রাজস্তুতি, দেবস্তোত্র এবং সবশেষে বিজ্ঞান ও সাহিত্য লিপিবদ্ধ রূপে প্রকাশিত হয়।

গণিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি

তবে লিখনেরও আগে গণিতের, অন্ততপক্ষে *পাটীগণিতের,* উদ্ভব ঘটেছিল। বস্তুর প্রতীক হিসেবে যেসব সরল সংকেতচিহ্নের প্রয়োগ প্রচলিত হয়েছিল, সেগুলোকে নানাভাবে ব্যবহার করত মানুষ। তার অর্থ এই যে প্রকৃত বস্তুনিচয়কে কার্যক্ষেত্রে গণনা না করেই সে যোগ বা বিয়োগের মতো সরল ক্রিয়া সম্পাদনে সক্ষম হয়ে উঠেছিল। এর জন্য একটি বস্তুসমষ্টিকে অন্য একটির সাপেক্ষে বিচার করতে হতো। এইরকম প্রমাণ (standard) বস্তুসমষ্টির মধ্যে প্রথমটি ছিল হাতের দশ আঙুল। পাটীগণিতে এক থেকে দশ অব্দি *সংখ্যার** উৎপত্তি এইভাবেই হয় এবং এ থেকেই *দশমিক* ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। একটি পিরামিড থেকে প্রাপ্ত লিপিতে দেখা যায়, এক অপদেবতা এক মিশরী ফারাওয়ের আত্মাকে দশ আঙুল গুণে দেখিয়ে ক্ষমতার প্রমাণ দিতে আদেশ দেয়; রাজাত্মা সসম্মানে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। জটিলতর গণনাকার্যের জন্য, যোগ আর বিয়োগের জন্য নুড়িপাথর (লাতিন *calculi*) শব্দটি থেকেই ইংরেজি calculation শব্দটির উদ্ভব, যার অর্থ গণনা বা হিসেব।† পরে নুড়িপাথরের বদলে পুঁতির ব্যবহার প্রচলিত হয়। দশটি করে পুঁতি এককেটি তারের মধ্যে গলিয়ে নেওয়া হতো। এইভাবেই তৈরি হয় *অ্যাবাকাস,* যা কিনা পৃথিবীর প্রথম গণকযন্ত্র, এবং যা এখনো রীতিমতো প্রচলিত। অতঃপর পরিমাপ ব্যাপারটা চালু হওয়ায় যোগ আর বিয়োগের প্রক্রিয়াকে পরিমাণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়। তবে গুণ আর ভাগের মতো অপেক্ষাকৃত জটিল প্রক্রিয়া দুটির প্রচলন তখনই হলো যখন বিভিন্ন রাশি বা পরিমাণকে ভাগ করার প্রশ্ন উঠল। প্রধানত খাল খনন, পিরামিড নির্মাণ প্রমুখ পূর্তকার্য সম্পাদনের জন্য উক্ত প্রশ্নের সমাধান জরুরি হয়ে ওঠে।

গৃহনির্মাণের প্রণালী থেকেই জমি জরিপ করার পদ্ধতি চালু হয়; তবে তারও আগে সম্ভবত *জ্যামিতির* ভিত্তি রচিত হয়েছিল। প্রথম দিকে শহরের বাড়ির সঙ্গে গ্রামের কুটিরের কেবল এইটুকু তফাৎ ছিল যে শহরের বাড়িগুলো কাঠ বা বাঁশ দিয়ে তৈরি হতো। কিন্তু শহরে একে জায়গা কম, তার ওপর আগুনের ভয়। তাই ক্রমে শক্ত জমাট কাদামাটির ব্যবহার চালু হয়। এটা নিঃসন্দেহে এক বিরাট অগ্রগতির পরিচায়ক। এর পরের পদক্ষেপটি পরে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। সেটি হলো: প্রমাণ মাপের ছাঁচে-ঢালা শুকনো কাদামাটির খণ্ড বা ইঁটের উদ্ভাবন। ইঁট জিনিসটা হয়তো একেবারে আনকোরা নতুন কোনো উদ্ভাবন ছিল না। পাহাড়ী এলাকায় শুষ্ক প্রাকার নির্মাণের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত প্রস্তরফলকের ব্যবহার আগে থেকেই চালু ছিল। সেই পাহাড়ী প্রস্তরফলককেই উপত্যকা অঞ্চলে প্রাপ্ত কাঁচা মালের উপযোগী করে নিয়ে ইঁটের উদ্ভাবন ঘটে। এখন, ইঁট যদি আয়তাকার না হয় তা হলে একটি অপরটির পাশে ঠিকমতো বসবে না। সুতরাং ইঁট ব্যবহার করতে গিয়ে *সমকোণের* ধারণার উদয় এবং *সরলরেখার* প্রয়োগ ঘটল। এর আগে সরলরেখার প্রয়োগ ঘটেছিল রজ্জু-নির্মাতা বা তাঁতিদের ব্যবহৃত টান-টান সুতোর মধ্যে।

ইঁট দিয়ে বাড়ি, বিশেষত বড়ো বড়ো শিখরাকার ধর্মীয় ভবন, বানাতে গিয়ে কেবল যে জ্যামিতিরই উদ্ভব ঘটল তা নয়, কোনো ক্ষেত্রের *ক্ষেত্রফল* বা কোনো কঠিন পদার্থের *আয়তন* যে তাদের পার্শ্বরেখার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে বার করা যায়, সে ধারণাও জন্মাল। প্রথম প্রথম

* সংখ্যার ইংরেজি digit. এই ইংরেজি শব্দটির আরেকটি অর্থ হলো হাতের বা পায়ের আঙুল। 'Digit' শব্দটি লাতিন *digitus* থেকে আহরিত।—অনু.

† সংস্কৃত 'কলন' শব্দটির অর্থও 'গণন'। এই 'কলন' আর লাতিন *calculus* বা *calculi* শব্দের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা আছে কিনা ভাষাতাত্ত্বিকরা বলতে পারবেন।—অনু.

কেবল আয়তাকার চাঁইয়ের আয়তনই নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছিল। অতঃপর দেওয়ালকে ক্রমশ সরু করে তোলার বা দেওয়ালকে পেটানোর কাঠামোগত প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে জটিলতর আকারের উদ্ভব হলো—যেমন পিরামিড। এই পিরামিডের আয়তন-নির্ণয় মিশরীদের গণিতসিদ্ধির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। বহু পরবর্তী কালে উদ্ভাবিত ইন্টিগ্র্যাল ক্যাল্‌কুলাসের পূর্বাভাস মেলে এর মধ্যে।

নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে পরিকল্পিত ছক রচনার(plan to scale) পদ্ধতিটিও গৃহনির্মাণ-কর্ম থেকেই উদ্ভূত হয়। আনুমানিক 2250 খ্রিস্টপূর্বাব্দে নির্মিত লাগাশ-এর গুডিয়া-মূর্তিতে ঐরকম একটি নগর-পরিকল্পনার ছক অঙ্কিত রয়েছে। তাতে স্থপতির মাপদণ্ডটিও দেখতে পাওয়া যায়। এইসব গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে একজন প্রশাসক ইটের বা পাথরের বাড়ি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় গোটা কর্মপরিকল্পনাটিকে পূর্বাহ্ণেই ছকে নিতে পারতেন। কতজন শ্রমিক লাগবে, কতটা মালমশলা লাগবে, কী পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে, কতটা সময় লাগবে—এসবই তিনি আগে থেকে নিখুঁতভাবে হিসেব করে নিতে পারতেন। এইসব প্রকৌশল অনায়াসেই শহরের সীমা ছাড়িয়ে গ্রামে বিস্তার লাভ করে। ক্ষেতের আকারবিন্যাসে, তাদের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে, এমনকি ক্ষেতের ফলন থেকে কত রাজস্ব পাওয়া যাবে তার হিসেব নির্ধারণের কাজে এসবের প্রয়োগ ঘটল। *মানচিত্রাঙ্কন* এবং *জরিপকর্মের* সূত্রপাত এইভাবেই ঘটে। এই ব্যবহারিক প্রয়োগের দরুনই জ্যামিতি নামটির উদ্ভব হয় (geo, জ্যা=পৃথিবী; metry, মিতি=পরিমাণ), যার অর্থ হলো ভূ-পরিমাপ। বস্তুত, নগরজীবনের পক্ষে যে উৎপাদন-পদ্ধতি অপরিহার্য তারই এক সহায়ক অঙ্গ রূপে *গণিতের* প্রথম আবির্ভাব ঘটে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ক্যালেন্ডার

মন্দির-প্রশাসনের ব্যবহারিক চাহিদা মেটানোর তাগিদে গোনার এবং হিসেব করার ক্ষমতা অর্জন করে মানুষ। সেই ক্ষমতা অচিরেই আরো একটা ক্ষেত্রে কাজে লাগল: পঞ্জিকা রচনা ও তারই সূত্র ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকাশ। আদিম কালের মানুষ নিশ্চয়ই সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রদের প্রতি কিছুটা মনোযোগ দিয়েছিল। কিন্তু তখন স্বভাবতই আকাশের বজ্রবিদ্যুৎ প্রমুখ তীব্র আলোড়নকারী ঘটনাগুলোই তার মনোযোগ কাড়ত বেশি; দিন ও রাত্রির মতো সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য এবং নিয়মিত ঘটনার প্রতি তার আগ্রহ কম ছিল। পঞ্জিকার যে সামান্য প্রয়োজন তার ছিল, সেটুকু চন্দ্রের মারফত মিটে যেত; তার জন্য গোড়ার দিকে গণিত বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন হতো না। চন্দ্রকে ঘিরে তাই অনেক আচারবিধি আর কল্পকথা গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু কৃষিসভ্যতার উদয় হওয়ার পর মাস অপেক্ষা বর্ষই মানুষের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। কেননা বড়ো আকারে কৃষিকর্মের পরিকল্পনা করতে গেলে তার প্রস্তুতি নেবার সঠিক সময়টি ভালো করে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। একথা ঠিকই যে প্রকৃতিদেবী স্বয়ং সে ব্যাপারে অনেক সময়েই বেশ কিছু ইঙ্গিত দেন। তার মধ্যে প্রথম ইঙ্গিতটি হলো, পাখিদের আচরণের সঙ্গে ঋতুর সম্পর্ক। এই নিতান্ত ব্যবহারিক ব্যাপারটিই পরে কুসংস্কারে পর্যবসিত হয়ে শুভাশুভ লক্ষণ বিচার করে ভবিষ্যদ্বাণী করার 'বিদ্যা' বা *শাকুনবিদ্যায়* (augury) রূপ নেয়। যেমন, কোকিলের ডাক বসন্তের আগমন সূচনা করে; তাই অনেকে হয়তো তাকে বসন্তের ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বলে ভেবে নেয়। বস্তুত প্রকৃতিকে খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দিন না গুণেই মোটামুটি নির্ভরযোগ্য ক্যালেন্ডার বানানো সম্ভব ছিল।

তবে অন্তত একটি জায়গায়—নীল নদের উপত্যকায়—প্লাবন ছিল একটি নিয়মিত বার্ষিক ঘটনা। এবং তার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হতেই হতো। একটি বছরে থাকে 365.2422... দিন। এই হিসেবটি ঠিকমতো করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তার জন্য সূর্য আর তারকাদের অনেক দিন ধরে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। মিশরের পুরোহিতরা সেই সযত্ন পর্যবেক্ষণ চালিয়ে আনুমানিক 2700 খ্রিস্টপূর্বাব্দেই সৌর ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা রচনা করে ফেলেছিলেন। পরবর্তী কয়েক হাজার বছর ধরে সে পঞ্জিকা চালু ছিল।

কিন্তু সুমেরীয়রা—এবং পরে মেসোপটেমিয়ায় তাদের উত্তরসূরিরা—চাঁদের প্রতি এতই অনুরক্ত ছিল যে ঐ সরল সমাধান তাদের মনঃপূত হয়নি। তার বদলে তারা অনেক কঠিন একটি কাজে হাত দিল: চান্দ্র আর সৌর ক্যালেন্ডারের মধ্যে তারা সাযুজ্য আনতে চাইল।* তার জন্য প্রয়োজন হলো বহু প্রজন্ম ধরে পরিচালিত পর্যবেক্ষণের নথিবদ্ধ হিসেব এবং সূক্ষ্ম ও নির্ভুল গণনাকৌশলের বিকাশ। এইভাবে ষষ্টিক (sexagesimal) গণনাপ্রণালীর উদ্ভব ঘটে। একটি বৃত্তকে 360 ডিগ্রিতে ভাগ করা হয় (লক্ষণীয়, এক বছরে প্রায় অতগুলিই দিন থাকে)। একটি ঘণ্টায় থাকে 60 মিনিট; আবার একটি মিনিটে থাকে 60টি দ্বিতীয় বা 'second' মিনিট। আজও কোণ আর সময় মাপবার জন্য আমরা এইসব একক ব্যবহার করি। সুবিস্তৃত গাণিতিক সারণীর সাহায্যে এইসব পঞ্জিকা-সংক্রান্ত গণনা সম্পন্ন হয়। ব্যবসায়িক হিসেব রাখবার জন্য যেসব সারণী ব্যবহৃত হতো তারই বিস্তৃততর রূপ এইসব গাণিতিক সারণী। *বীজগণিত* আর *পাটীগণিতের* অনেকটাই এর মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয়। এমনকি স্থানিক অঙ্কপাতনের মতো চরম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিটিরও উদ্ভব হয় এইখান থেকেই। বহু শতাব্দী পরে আরবী (ব্যাবিলোনীয়, পারসিক, হিন্দু) সংখ্যামালা রূপে এই স্থানিক অঙ্কপাতন-পদ্ধতি পুনরায় প্রচলিত হয়, এবং আজও সেই পদ্ধতিই প্রচলিত।

জ্যোতিষশাস্ত্র

আমেরিকা মহাদেশ সমেত প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতায় মন্দির থেকে আকাশ-পর্যবেক্ষণের প্রথা চালু ছিল। শুধুই পঞ্জিকারচনার প্রয়োজনে যে এই পর্যবেক্ষণ চালানো হতো তা নয়। বর্ষ-নিয়ামক সূর্যই যেহেতু মানুষের অন্নদাতা, তাই মন্দিরে সূর্যকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হতো। পূর্বতন শিকারভিত্তিক সমাজে চন্দ্র ছিল সর্বেসর্বা; কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় তার গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পেল। তবু সে-ও একেবারে হেয় হয়ে রইল না। এছাড়া, আকাশের অনিয়মিত কিন্তু উজ্জ্বল কিছু তারকা ও গ্রহও পর্যবেক্ষণের আওতায় আসে; এগুলিও গৌণ ঐশ্বরিক মহিমা অর্জন করে।

কৃষিকার্যে, এমনকি নৌচালনে দক্ষতা অর্জনের জন্য এত কিছু জানার প্রয়োজন না থাকা

* তুলনীয়: 'প্রথম দিকে বৈদিক হিন্দুরা 30 দিনে মাস বা 360 দিনে বৎসর ধরিয়া পঞ্জিকা প্রণয়ন করিত। আবার 13 মাসে বৎসব ধরিবারও অনেক নজির আছে। এই ত্রয়োদশ মাসটি মলমাস; চান্দ্রবৎসরের সহিত সৌরবৎসরের সংগতি বিধানের কৌশলমাত্র। চান্দ্র ও সৌর উভয়বিধ মাসের নামই আমরা বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত দেখিতে পাই; যেমন—

চান্দ্রমাস:	ফাল্গুন	চৈত্র	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র
সৌরমাস:	তপস্	তপস্য	মধু	মাধব	শুক্র	শুচি	নভস
চান্দ্রমাস:	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ				
সৌরমাস:	নভস্য	ইষ	ঊর্জ				

সাধারণত চান্দ্রমাসই ব্যবহৃত হইত।'—পৃ· 99, *বিজ্ঞানের ইতিহাস*, সমরেন্দ্রনাথ সেন (1962)। — অনু·

সত্ত্বেও এসবের চর্চা হয়। আসলে ততদিনে পঞ্জিকা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা ধর্মীয় তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। ধর্মীয় পবিত্র দিবসগুলি নির্ধারণ করার উত্তরোত্তর জটিল প্রক্রিয়াটি সমাধা করবার জন্য পঞ্জিকা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ঐসব ধর্মীয় পুণ্য দিবস সযত্নে পালন করাটাকে প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষে আবশ্যিক বলে মনে করা হতো। খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যে যেমন সঠিকভাবে *রবিবার* উদ্‌যাপন করার ওপর জোর দেওয়া হয়।

এছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞান আরো অনেক কাজে লাগছিল। গোড়া থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। দ্যুলোক নিয়ে ছিল তার কারবার, যা নাকি আত্মাদের, বিশেষত পবিত্র রাজাদের আত্মার, মরণোত্তর নিবাস। প্রথম দিকে এই দ্যুলোকের যে চিত্র আঁকা হতো তা প্রায় নিচের এই ভূ-লোকেরই মতো। মিশরীদের কল্পনায় সেই দ্যুলোকটা ছিল একটা চ্যাপ্টা আচ্ছাদন, যাকে ধরে রেখেছে পাহাড়পর্বত। আর সেই পাহাড়পর্বতের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে জ্যোতির্ময় নীলনদ, অর্থাৎ ছায়াপথ।* ব্যাবিলোনীয় কল্পনায় প্রথম দিকে এই দ্যুলোক ছিল একটা বিশাল চারকোণা তাঁবুর অভ্যন্তর ভাগের মতো, আর সেই তাঁবু থেকে প্রদীপের মতো ঝুলে থাকত তারাগুলো। আকাশ যেভাবে একটা অক্ষের চারদিকে পাক খায়, সে ব্যাপারটাকে হুবহু অনুকরণ করা সম্ভব হলো চাকা উদ্ভাবনের পরে। কেননা চাকাও একটা দণ্ডকে ঘিরে প্যাক খায়। এই ঘূর্ণ্যগতির ধারণাটির প্রথম উদ্গাতা সম্ভবত চৈনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সেদেশে অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত 'পাই' নামক একটি চক্র-সদৃশ বস্তু থেকে। এই 'পাই' হচ্ছে দ্যুলোকের প্রতীক। এবং এর সাহায্যে কার্যক্ষেত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারাকে চিহ্নিত করা সম্ভব। চৈনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে ক্রান্তিবৃত্তীয় (ecliptic) তারা অপেক্ষা অনস্তগ (circumpolar) তারাদের প্রাধান্য বহু শতাব্দী ধরে স্বীকৃত ছিল।

জ্যোতির্লোকের নিয়মিত আবর্তনের ধারণাটি প্রচলিত হওয়ার ফলে জ্যোতিষ্কদের চলনের ওপর বিশেষ জোর পড়ল। বলা হলো, জ্যোতির্লোকের এইসব নিয়মিত পুনরাবৃত্তির ঘটনাগুলি যদি প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে এবং ঋতুর পরিবর্তন ঘটায়, তাহলে তারা মানুষের অবস্থাকেও নিশ্চয়ই সমানভাবে প্রভাবিত করবে। প্রথম দিকে কেবল দেবনির্ধারিত রাজার সঙ্গেই জ্যোতির্লোকের সম্পর্ক ছিল; অবশেষে ইতরজনেও সে অধিকার লাভ করে। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যেকোনো লোকই গ্রহনক্ষত্রের সহায়তায় আপন আচরণের পরিবর্তন ঘটানোর অধিকার অর্জন করে। সাতটি গ্রহকে পুরোপুরি গৃহপালিত করে নেওয়া হয়। আজও তারাই সপ্তাহের বারগুলিকে চিহ্নিত করে। এমনকি তাদের বিশেষ ক্রমটিও আদিতে জ্যোতিষশাস্ত্রই নির্ধারণ করে দিয়েছিল—রবি, সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র।† জ্যোতিষশাস্ত্র বরাবরই জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোত ছিল। মূলগতভাবেই ভ্রান্তিপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও, প্রধানত তারই আকর্ষণে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ আকাশের গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেছে।

---

* লক্ষণীয়, আমরাও এ-কে আকাশ*গঙ্গা* নামে অভিহিত করি।—অনু·

† 'গ্রহ ও গ্রহদের অধিপতি ব্যাবিলোনীয় দেবতাদের নাম হইল:

গ্রহ—	শনি	বৃহস্পতি	মঙ্গল	রবি	শুক্র	বুধ	চন্দ্র
দেবতা—	নিনিব	মার্দুক	নের্গাল	শামাশ	ইশ্‌তার	নাবু	সিন
	(মড়ক)	(রাজা)	(যুদ্ধ)	(ন্যায়)	(প্রেম)	(লেখন)	(কৃষি)

পৃথিবী হইতে গ্রহদেব আপাত-দূরত্ব হিসাবে উল্টা দিক হইতে গ্রহগুলিকে সাজানো হইয়াছে।'—পৃ· 95. সমরেন্দ্র নাথ সেন, *বিজ্ঞানের ইতিহাস* (1962)।—অনু

জ্যোতিষশাস্ত্রে মানুষের বিশ্বাস না থাকলে ঐসব গ্রহনক্ষত্রকে নিতান্তই দূরবর্তী এবং অকেজো বলে ধারণা জন্মাত।

চিকিৎসাশাস্ত্র

অপর যে পেশাটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতোই সম্ভ্রান্ত বলে গণ্য হয়েছিল, সেটি হলো চিকিৎসাশাস্ত্র। তবে মর্যাদার দিক থেকে সমান হলেও প্রকৃত সাফল্যের দিক থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র অনেক পিছিয়ে ছিল। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। কারণ জীবিত সিস্টেমের জটিলতা মূলগতভাবেই অনেক বেশি। ঘা, অস্থিচ্যুতি, অস্থিভঙ্গ ইত্যাদির পরিচর্যা করা, কিংবা রুগী যাতে আত্মহত্যা না করে তা দেখা, অথবা ভুল চিকিৎসা বা পথ্যের ব্যবস্থা করে রুগীর আত্মীয়স্বজন যাতে তাকে মেরে না ফেলে সেদিকে নজর রাখা—এ ছাড়া সেযুগে একজন ডাক্তারের বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না। তবে যেক্ষেত্রে ডাক্তাররা সত্যিই সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা হলো রোগনির্ণয়। একটা শহরে প্রচুর রোগ হয়; ফলে বিভিন্ন রোগের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব ছিল। এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালানোর ফলে সেগুলি ক্রমশ পরম্পরাবাহিত সূত্রে পরিণত হয়। এইসব তুলনাত্মক বিচার বিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটানোর সহায়ক হয়েছিল। লিখনের উদ্ভব ঘটার বহু আগে থেকেই বৈদ্যরা মৌখিক পরম্পরাক্রমে তাঁদের বিদ্যার সঞ্চার ঘটাতেন। প্রথমে সে বিদ্যা সীমাবদ্ধ ছিল বৈদ্যদের সুবদ্ধ জ্ঞাতিসমাজের মধ্যে; পরে জ্ঞাতিসমাজের বাইরে থেকে শিষ্য গ্রহণ করে তাদের বৈদ্যসমাজের সদস্য করে নেওয়া হতো। এইভাবে তাঁদের বিদ্যার প্রসার ঘটে। রোগ পর্যবেক্ষণের, এমনকি সে পর্যবেক্ষণকে লিপিবদ্ধ করে রাখার (কয়েকটি আদি মিশরীয় প্যাপাইরাস থেকে এর অতীব কৌতূহলোদ্দীপক নিদর্শন পাওয়া গেছে) এই প্রক্রিয়া থেকেই পরে *শারীরস্থানবিদ্যা* ও *শারীরতত্ত্বের* উদ্ভব ঘটে।

রোগের গতিপ্রকৃতি (prognosis), অর্থাৎ একটা রোগের সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে তার জ্ঞান, সেই প্রাচীন কালে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ সেকালের আইন—বিশেষত ব্যাবিলোনীয় আইন—অনুযায়ী, কোনো চিকিৎসক রুগী সারাতে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতো; শুধু তাই নয়, কোনো চিকিৎসক ভুলক্রমে রুগীর চোখ নষ্ট করে ফেললে তাঁর চোখ উপড়ে ফেলা হতো। কাজেই একটি মিশরীয় প্যাপাইরাসে যখন দেখি বহু ক্ষেত্রেই রোগের বিবরণ দিয়ে পরিশেষে 'ইহা চিকিৎসার অযোগ্য' বলে মন্তব্য করা হয়েছে, তখন অবাক হই না।

স্বীকৃত ভেষজশাস্ত্রে গাছগাছড়া (জড়িবুটি) এবং খনিজ পদার্থের সূত্রবদ্ধ তালিকা রচনা করা হতো। আদিম জীবনচর্যায় ওঝা ও বিচক্ষণ নারীরা এ বিষয়ে যে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন তা-ই পরম্পরাক্রমে এই ভেষজতালিকার অঙ্গীভূত হয়। এর মধ্যে কোনো কোনোটির ক্রিয়া ছিল নিতান্তই প্রত্যক্ষ, যেমন জোলাপ বা বমনোদ্রেককারী পদার্থ। কতকগুলি আবার অজ্ঞাত উপায়ে কোনো বিশেষ রোগে কাজ দিত; যেমন দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা ম্যালেরিয়া সারাবার জন্যে কুইনিন ব্যবহার করত। কিন্তু বেশির ভাগ 'ওষুধ'ই ছিল বিশুদ্ধ জাদুভিত্তিক, যেমন ম্যানড্রেক। এই বিষাক্ত গাছটির শিকড়ের সঙ্গে মানবদেহের আকৃতির মিল লক্ষ্য করে এর জাদু-গুণ কল্পনা করে নেওয়া হয়েছিল। শহরের বৈদ্যদের একটা সুবিধে ছিল এই যে তাঁরা বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে ওষধি সংগ্রহ করতে পারতেন। সেসবের উৎপাদনের বন্দোবস্তও করতেন তাঁরা। *উদ্ভিদবিদ্যার* উদ্ভব এইভাবেই ঘটে, কৃষিপ্রক্রিয়া থেকে নয়। প্রথম উদ্ভিদবিজ্ঞান-সম্মত উদ্যান ও ভেষজগুল্মের উদ্যানও এইভাবেই গড়ে ওঠে।

রসায়নের সূত্রপাত

ব্রনজ্ যুগে, এমনকি লৌহযুগেরও শেষ পর্বের আগে, রসায়ন স্বীকৃত বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করেনি। তবে ধাতুকর্মী, মণিকার এবং মৃৎকর্মীদের বহুবিধ পর্যবেক্ষণ ও প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে রসায়নের দৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়ে চলেছিল। আকরিকের বিগলন, ধাতুর বিশোধন, ধাতুকে রঙিন করা, এনামেল যোগ করা— জটিল রসায়নিক বিক্রিয়া ছাড়া এসব কাজ করা সম্ভব ছিল না। বারবার পরীক্ষা করে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়ে, তবে এসব কাজ রপ্ত করতে হয়েছিল। যেসব প্রক্রিয়ার ভালো ফল হয়েছিল সেগুলোর ক্রিয়াপ্রণালীকে সুনির্দিষ্ট রূপ দান করে অতি সযত্নে পরম্পরাক্রমে সে জ্ঞানের সঞ্চার করা হয়। তার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হতো। আদি যুগের এইসব রসায়নকর্মী ঠিক কী কী সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার পূর্ণ বিবরণ আমরা জানিনা; কিন্তু যেটুকু জানি তা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য।

তাঁরা অন্তত ন-টি রসায়নিক মৌলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন—সোনা, রুপো, তামা, টিন, সীসে, পারদ, লোহা, গন্ধক ও কার্বন। এছাড়া দস্তা, অ্যান্টিমনি ও আর্সেনিকের নানান যৌগ নিয়ে তাঁরা কাজ করতেন এবং সেগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে পারতেন। শুষ্ক ও তরল নানারকম বিকারকের (reagents) সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় ছিল; পটাশ ও অ্যামোনিয়া (প্রস্রাব থেকে সঞ্চিত) প্রমুখ ক্ষার এবং (বীয়র বা সুরা রূপে) অ্যালকোহলের খবরও তাঁরা রাখতেন। তাঁদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি মৃৎপাত্র এবং ধাতুপাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পাতনযন্ত্র না থাকায় তাঁরা উদ্বায়ী তরল ও গ্যাস নিয়ে কাজ করতে পারতেন না।

যেসব পদার্থ নিয়ে তাঁরা কাজ করতেন তা ছিল বিরল ও মূল্যবান। এই ঘটনাটা তাঁদের কর্মপদ্ধতিকে যুক্তিশাসিত ও *পরিমাণাত্মক* বিজ্ঞানে পরিণত করে তোলার পথে প্রবল প্রণোদনা যোগায়। গোড়া থেকেই দামীদামী ধাতুকে ওজন করে হিসেব রাখতে হতো। বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত সংকরে কোন ধাতু কী অনুপাতে লাগছে তা লিখে রাখতে হতো এবং সেই হিসেব অনুযায়ী কাজ করতে হতো। সংকর ধাতু, কিংবা আকরিক-মিশ্রণের মধ্যে থেকে বিশুদ্ধ ধাতুকে স্বতন্ত্র করে নিষ্কাশন করবার জন্য *রসায়নিক বিশ্লেষণ* বা যাচাইকরণের প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়। কারণ সবচেয়ে মূল্যবান ধাতুগুলোকে সংগ্রহ করা, কিংবা তাতে ভেজাল দেওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াটা ছিল অত্যন্ত জরুরি। রসায়নিক বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার এই প্রবর্তন রসায়নের ইতিহাসে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ঠিক কবে এর প্রবর্তন ঘটে তার সন-তারিখ আমরা বলতে পারব না, কিন্তু মোটামুটি সময়টা বলতে পারি। একদা প্রকৃতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত 'ইলেকট্রাম' নামক সোনা আর রুপোর সংকর দিয়ে নানারকম সামগ্রী বানানো হতো; কিন্তু পরে এক সময়ে তার বদলে বিশোধিত খাঁটি স্বর্ণের ব্যবহার লক্ষিত হয়। রসায়নিক বিশ্লেষণের পদ্ধতির প্রবর্তন যে সেই সময়েই ঘটেছিল, সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালের বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা এই সব প্রক্রিয়ার কোনো কোনোটা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেছি। যেমন আমরা জানি, অ্যান্টিমনির সহায়তায় সোনা থেকে রুপো আলাদা করা হতো, কিংবা রুপো থেকে সীসে আলাদা করবার জন্য খর্পরণ (cupellation)* পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হতো। এইসব প্রক্রিয়াগুলির সাফল্য ছিল আশ্চর্যজনক। এবং এগুলি সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত থাকে। এর একটা চমকপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে অস্থিভস্মকে

* *cupellation*—সোনা বা রুপোর সীসেঘটিত সংকরকে গলিয়ে মূল্যবান ধাতুটিকে বিশুদ্ধ রূপে সংগ্রহ করার একটি প্রক্রিয়ার নাম। বায়ুব অক্সিজেন সীসেকে জারিত করে, কিন্তু সোনা বা রুপোকে করে না; ফলে বিশুদ্ধ সোনা বা রুপোকে স্বতন্ত্র করে নেওয়া সম্ভব হয়। —অনু

বীয়র দিয়ে ভিজিয়ে খর্পর (cupel) তৈরির যে নির্মাণনির্দেশ একটি প্রাচীন মিশরী প্যাপাইরাসে পাওয়া যায়, সেইটিই এখনো খর্পর তৈরির স্বীকৃত পদ্ধতি। নিষ্প্রভ, নিষ্প্রাণ চেহারার লেড অক্সাইডের পিণ্ড থেকে অকস্মাৎ প্রাণবন্ত চেহারার রৌপ্যের অবাক-করা উজ্জ্বল আবির্ভাব মানুষের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অপরসায়নিক আগ্রহ জাগ্রত হয়ে ওঠে। এর ফলে আত্মিক অগ্নিশুদ্ধির এবং জ্যোতির্ময় দেহের পুনরুজ্জীবনের ধারণা জন্ম নেয়। বস্তুত, মৃতদেহ দাহ করার প্রথার মূলে খুব সম্ভব এই ধারণাই ক্রিয়াশীল ছিল।

প্রাচীন রসায়নিক তত্ত্ব নিয়ে কোনো বইয়ের সন্ধান মেলেনি বলেই সে তত্ত্ব ছিল না মনে করা সংগত নয়। তাত্ত্বিক রূপে ব্যক্ত না করলেও প্রাচীনকালে রসায়নবিদগণ যে জারণ ও বিজারণের মূল নীতিগুলি জানতেন এবং গন্ধক বা ক্লোরিন প্রমুখ অ-ধাতুকে যোগ বা দূর করার প্রক্রিয়াও জানতেন, তাব প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের তৈরি জিনিসগুলি থেকে।

তাঁদের প্রধান কাজ ছিল গয়না তৈরি করা। কাজেই কী করে রঙের বাহার আনতে হয় সে ব্যাপাবটা তাঁরা খুবই ভালো করে বুঝতেন। আর এক্ষেত্রে বাহ্য রূপটাই যেহেতু বিচার্য, তাই তাঁরা আপন কাজের ফলাফল বিচার করতেন উৎপন্ন জিনিসটার চেহারার সঙ্গে কীসের মিল আছে তা দেখে। তাম্রকে স্বর্ণের মতো চেহারা দেওয়ার প্রয়াসে তাঁরা *পেতল* তৈরি করেন। নীল রঙের টার্কোইস [যা স্বভাবত সবুজাভ ও আকাশী নীল—অনু·] বা লাজার্বদ (lapis) বানাতে গিয়ে তাঁরা এক বিশেষ ধরনের চকচকে নীল পদার্থ বা 'glaze' তৈরি করেন। এ থেকেই কাচ তৈরি হয়। নানারকম চমকপ্রদ রূপান্তর ঘটানোর কাজে তাঁরা এতই দক্ষ হয়ে ওঠেন যে তাঁদের ধারণা জন্মায় যে কোনোকিছুই তাঁদের অসাধ্য নয়। প্রথম দিককার এই সুস্থ বৈজ্ঞানিক আশাবাদই অধঃপতিত হয়ে পরে *অপরসায়নের* (alchemy)অতীন্দ্রিয়বাদী কুসংস্কারে পর্যবসিত হয়।

আদিযুগের এই রসায়নবিদরা নিজেদের রসায়নকর্মী মনে করতেন না; তাঁরা কেউ ছিলেন ধাতুকর্মী, কেউ স্বর্ণকাব, কেউ বা মণিকার। প্রকৌশলী হিসেবে তাঁদের গুরুত্ব খুবই বেশি ছিল। যাজকবর্গ এবং রাজসভার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা ছিলেন অতি নোংরা বলে বিবেচিত একেকটি পেশাকর্মের সঙ্গে যুক্ত কারিগব মাত্র। তাই তাঁদের অর্জিত জ্ঞানকে জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র কিংবা চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে একাসনে বসানো হতো না। তাকে 'বিদ্যা' হিসেবে গণ্য করা হতো ঠিকই, কিন্তু সে হলো ডাকিনীবিদ্যা—যার জাদুঘটিত সম্ভাবনা সুপ্রচুর বলে মনে করা হতো।

5. আদিযুগের বিজ্ঞানের শ্রেণী-উৎস

আদিযুগের বিভিন্ন সভ্যতার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের এই অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি থেকেও স্পষ্টই বোঝা যায়, নগরপত্তনের অবধারিত পরিণতিস্বরূপ এই বিপুল অগ্রগতি ঘটে। এ ব্যাপারটাও সম্ভবত স্পষ্ট যে বৈজ্ঞানিক (প্রকৌশলগত নয়) অগ্রগতি কেবল সেইসব ক্ষেত্রেই ঘটেছিল যেখানে বৃহদাকার প্রশাসনজনিত সমস্যার মোকাবিলার প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি পুরোহিতরাই সাধন করেন, এবং সে অগ্রগতি তাঁদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ, নথিবদ্ধ করার ও গণনা করার উপকরণসমূহ কেবল তাঁদেরই অধিগম্য ছিল। মিশরী চিত্রলিপি বা হীয়েরোগ্লিফিক্স শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো 'পুরোহিতদের লিখন।' এই নাম থেকেই উক্ত সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে ওঠে। সদ্য-উদ্ভূত সেই শ্রেণীসমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে শিক্ষায় ও বিজ্ঞানে একটি বিশেষ শ্রেণীরই অধিকার স্বীকৃত ছিল। কিছু কিছু

তাৎপর্যময় ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে শ্রেণীসমাজের এই বৈশিষ্ট্যটি যুগযুগ ধরে বজায় থেকেছে এবং আজও তা 'সমানে চলেছে'। বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান আর চিকিৎসাশাস্ত্রকে 'মহৎ বিজ্ঞান' বলে সম্মান করা হতো। এই ব্যাপারটা গ্রীকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। গ্রীকদের মারফত আবার মধ্যযুগে সে প্রভাব ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়ায়। ফলে ঐ তিনটি শাস্ত্রই—পরে সংগীতশাস্ত্রকেও অবশ্য একটি গৌণ স্থান দেওয়া হয়—উচ্চশিক্ষার স্তম্ভ বলে বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে রসায়ন, জীববিজ্ঞান প্রমুখ 'নিকৃষ্ট বিদ্যা'কে সাংস্কৃতিক মর্যাদা আদায় করার জন্য রীতিমতো লড়াই করতে হয়। আরো একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। আঠেরো শতকের আগে অব্দি বিজ্ঞানের প্রধান কাজ ছিল জ্যোতিষ্কলোকের চলাচলের রহস্য উপলব্ধি করা এবং তার সঙ্গে মর্ত্যলোকে জীবনের উত্থানপতনের সম্পর্কটি কী তা উপলব্ধি করা। এই মূল কর্মসূচীটির একটি রূপরেখা প্রাচীন সভ্যতার একেবারে ঊষালগ্নেই মোটামুটি স্থির হয়ে গিয়েছিল।

আদিযুগের নগররাষ্ট্রগুলোর প্রকৌশল ও জীবনচর্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এব অস্বাভাবিক দ্রুত বিকাশ। এমনকি আজকের নিরিখেও সে বিকাশ অস্বাভাবিকবকমের দ্রুত। কায়রো শহরের পশ্চিমে অবস্থিত গিজার বিপুলায়তন পিরামিডগুলোর জ্যামিতিক ও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গণনা একেবারে নির্ভুল, পাথরের গাঁথনিও ছিল অনিন্দ্যনীয়। অথচ পাথর-খোদা সাদাসিধে সমাধিস্তম্ভ থেকে শুরু করে এই বিশাল পিরামিড রচনার কৌশল আযত্ত করতে মিশরীদেব সময় লেগেছিল মাত্র শ তিনেক বছর—আনুমানিক 3000 থেকে আনুমানিক 2700 খ্রিস্টপূর্বাব্দ। সুদক্ষ, ব্যবহারিক কর্মনিপুণ লোক না থাকলে এই হারে উন্নতি করা সম্ভব নয়, এই ধরনের কাজও করা সম্ভব নয়। বোঝা যায়, এঁরা অজস্রবিধ কাজের ক্ষেত্রে নতুন নতুন কর্মপ্রণালী উদ্ভাবন ক'রে সেগুলো হাতেকলমে যাচাই করে নিতে সদা-আগ্রহী ছিলেন। মনে হয় প্রথম দিকে নবনব পদ্ধতির উদ্‌ভাবকরা নিজেরাই ছিলেন প্রকৌশলবিদ। ইমহোটেপ, টুবাল্-কেইন এবং দীদেলাস্-এর* মতো সাংস্কৃতিক মহানায়কদের কিংবদন্তী থেকে আমরা দেখতে পাই তাঁরা নিজেরাই একাধারে নবনব আশ্চর্য কৌশল উদ্ভাবন এবং আশ্চর্য সামগ্রী নির্মাণ করতেন।

লিপিকর ও শ্রমিক

কিন্তু নগরপত্তনের অল্পকাল পরেই বৃহদাকার সংগঠনের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে সংগঠনকর্তারা নিজেরা হাতেকলমে প্রযুক্ত প্রকৌশল-প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মিশরের প্রথম রাজবংশীয় শাসনকাল কিংবা মেসোপটেমিয়ার আদি

* *Daedalus*—এথেন্সের এই যন্ত্র-উদ্ভাবক ও স্থপতি এথেন্স থেকে পালিয়ে ক্রীট দ্বীপে আশ্রয় নেন। পবে সপুত্র দেশে ফেরবার জন্য উতলা হয়ে তিনি মোম আর পালক দিয়ে ডানা পড়েন। কিন্তু তাঁর নির্দেশ অমান্য করে পুত্র ইকারুস সূর্যের খুব কাছ দিয়ে উড়তে চেষ্টা করায় মোম গলে যায় এবং ইকারুস সমুদ্রে পড়ে যান। তাঁরই নামে সে সমুদ্রের নামকরণ হয় 'ইকারিয়ান সী'।

Tubal-cain—বাইবেলের 'জেনেসিস' কাণ্ডে এঁর উল্লেখ আছে। লামেখ্-এর পুত্র টুবাল-কেন্‌ই প্রথম পেতল ও লোহা নিয়ে কাজ করেন বলে কথিত।

Imhotep—খ্রিস্টপূর্ব সপ্তবিংশ শতাব্দীতে মিশরের মেমফিসে ইনি সক্রিয় ছিলেন। পরে মিশরে ও গ্রীসে ইনি বৈদ্যদেবতা রূপে পূজিত হন। ইমহোটেপ একজন অসামান্য স্থপতিও ছিলেন। মেমফিসের সমাধিক্ষেত্রে অবস্থিত পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম পাথরে-খোদা স্মরণস্তম্ভ হিসেবে জ্ঞাত পিরামিডটির স্থপতি তিনিই। 200 ফুট উঁচু এই পিরামিডটিতে ছ'টি ধাপ রয়েছে। এছাড়া এড্‌ফু মন্দিরের স্থাপত্যকর্মও তাঁরই কীর্তি।—অনু

রাজত্বকালেই এ ঘটনাটা চোখে পড়ে। সংগঠনকর্তাদের বা প্রশাসকদের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, সমাজে তাঁরা যত অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হন, ততই তাঁরা কারিগরদের থেকে স্বতন্ত্র এক বিশেষ বর্গে—'বর্ণে'—পরিণত হন। নিজেদের তাঁরা অন্যদের চেয়ে উন্নত মার্গের মানুষ বলে মনে করতেন। অনিশ্চিত কিন্তু সুপ্রাচীন কালে রচিত একটি মিশরী প্যাপাইরাসের একটি অংশে এই নবোদ্ভূত দৃষ্টিভঙ্গির একটি অতীব কৌতূহলজনক নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই অংশটিতে দেখি এক পিতা তাঁর পুত্রকে 'লিপিকর প্রশিক্ষণ কলেজে' পাঠাবার প্রাক্কালে এই উপদেশ দিচ্ছেন : 'প্রবল কায়িক শ্রমের কথা আমি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। আমার মত, তুমি সরস্বতীর চর্চাতেই হৃদয় সমর্পণ করো। কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হইতে যে মানুষ মুক্ত, তাহার কথাও আমি ভাবিয়াছি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে লেখাপড়া অপেক্ষা অধিক মূল্যবান আর কিছুই নাই। ডুবুরি যেরূপ জলে ডুব দেয়, সেইরূপ তুমিও মিশরী সাহিত্যের অতল গভীরে নিমজ্জিত হও।...কর্মকারদিগকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেখিয়াছি, তাহারা কামারশালার কর্মীদের নির্দেশ দিতেছে। জ্বলন্ত চুল্লির সম্মুখে শ্রমরত ধাতু-কর্মীকে আমি দেখিয়াছি। তাহার অঙ্গুলিনিচয় কুম্ভীরচর্মের আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার গাত্রের দুর্গন্ধ মীনডিম্ব অপেক্ষাও দুঃসহ। যে সূত্রধর কর্ম করে, বাটালি চালনা করে, সে কি একজন চাষী অপেক্ষা অধিক বিশ্রাম উপভোগ করে বলিয়া ভাবো? জানিয়া রাখো, কাষ্ঠখণ্ডই তাহার কর্ষণক্ষেত্র, তাম্রযন্ত্রই তাহার হল। রাত্রিকালে যখন সে কর্ম হইতে বিরত থাকে, তখনো সে দিবাকালে তাহার হস্তদ্বয় যে কর্ম করিয়াছে তদপেক্ষা অধিক শ্রম করে। রাত্রিকালে সে বাতি প্রজ্বলিত করে...

বদ্ধ কুটিরে উপবেশনরত তন্তুবায়ের দশা স্ত্রীলোক অপেক্ষাও মন্দ। তাহার উরুদ্বয় বক্ষোদেশের নিকট জড়ো করিয়া রাখিতে হয়, ফলে সে সহজভাবে নিঃশ্বাস লইতে পারে না। একদিনও যদি সে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করিতে অপরাগ হয় তাহা হইলে সরোবরস্থ লিলি পুষ্পের ন্যায় তাহাকে পীড়ন করা হয়। সূর্যালোকে চক্ষু মেলিতে হইলে দ্বারবানকে রুটি-খণ্ড উৎকোচ প্রদান করা ব্যতীত তাহার অপর কোনো পন্থা নাই।... আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ করো : ধীবরের বৃত্তি হইল যাবতীয় বৃত্তির মধ্যে নিকৃষ্টতম। সে যে জলমধ্যে তাহার কর্মের মাধ্যমে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখে, একথা আদৌ সত্য নহে। জলমধ্যস্থ কুম্ভীরদের সহিত সে একত্রে বাস করে। প্যাপাইরাসগুচ্ছ যদি কম পড়িয়া যায় তাহা হইলে সে সাহায্যের জন্য আর্তরব করে। কুম্ভীর কোন্ স্থানে লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা বলিয়া না দিলে আতঙ্কে তাহার দৃষ্টি বদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রকৃতই, লিপিকরের বৃত্তি হইল সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৃত্তির অস্তিত্ব নাই।

উক্ত কারণবশতই, যে ব্যক্তি লিপিকরের বিদ্যায় পটু, সে অপর ব্যক্তিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অপর যে সকল বৃত্তির কথা তোমাকে বলিলাম, তাহার কোনোটি সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য নহে। বস্তুতপক্ষে, প্রতিটি শ্রমিক তাহার সহকর্মীকে অপবাদ দেয়। কিন্তু একজন লিপিকরকে কেহই বলিবে না : 'যাও, উক্ত ব্যক্তির জন্য ভূমি কর্ষণ করিয়া আইস।' শিক্ষাকক্ষে এক দিবস অতিবাহিত করার মূল্য কক্ষ-বহির্ভূত অনন্তকাল অপেক্ষাও অধিক। শিক্ষাকক্ষে কৃত কর্ম গিরিপর্বতের ন্যায় চিরস্থায়ী।... দেবী রেনিত্ ঈশ্বর-পথের পথিক। লিপিকরের জন্মকালে তিনি তাঁহার স্কন্ধপার্শ্বে বিরাজ করেন। কেবল তাহাই নহে, সাবালক দশা প্রাপ্ত হইয়া সে যখন পরিষৎ কক্ষে প্রবেশ করে, তখনও তিনি তাহার স্কন্ধপার্শ্বে বিরাজমানা থাকেন। বস্তুত এমন কোনো লিপিকর নাই যে রাজভোগ ভক্ষণ করে না।(সে দীর্ঘায়ু হউক, সবল হউক, স্বাস্থ্যবান হউক)।'

এ থেকে বোঝা যায়, কলম-পেষা কাজ ইতিমধ্যেই শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচিত

হচ্ছিল—নৈতিক এবং ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই। এমনকি, সভ্যতার সেই আদিযুগের অকল্পনীয় রকমের জটিল লিখন ও হিসাবপদ্ধতি রপ্ত করার জন্য যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হতো, তা কলম-পেষা কাজের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হতো। বস্তুগঠিত পদার্থ নিয়ে পুরোহিত-প্রশাসকরা আর বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। ফলে তাঁদের নিজস্ব প্রতীক-আশ্রিত পদ্ধতিসমূহকে আরো বিস্তারিত ও জটিল রূপ দেবার প্রবণতা দেখা দেয় তাঁদের মধ্যে। শুধু তাই নয়, এইসব পদ্ধতির ওপর তাঁরা বস্তু-নিরপেক্ষ এক স্বয়ংস্বতন্ত্র অস্তিত্ব আরোপ করতে চাইলেন। একদিক থেকে এর ফল অবশ্য শুভ হয়েছিল। কেননা, এরই ফলে অন্তত কিছু মানুষ চিন্তা করার অবসর লাভ করেন; এবং এইসব প্রতীকের মধ্যে থেকেই তাঁরা গণিতের বিমূর্ত সূত্রাদি গড়ে তুলতে সমর্থ হন। মিশর ও ব্যাবিলনের গণনাকারীরা এ ব্যাপারে যে অসামান্য সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, তারই ভিত্তিতে পরে গ্রীকদের আরো অনেক বিমূর্ত গণিত গড়ে ওঠে। অপরদিকে একথাও অনস্বীকার্য যে প্রতীক নিয়ে এত বেশি চর্চা করার ফলে বেশ কিছু আদিম ধ্যানধারণার বোঝা থেকেই যায়, যেমন অতীতের শিকারভিত্তিক সমাজ থেকে আগত অনুষঙ্গভিত্তিক জাদুবিশ্বাস। এছাড়া বিভিন্ন রকমের প্রেতাত্মা বা অধিসত্তার ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস আরো বেড়ে যায় এরই ফলে।

জাদুবিদ্যা ও বিজ্ঞান

বস্তুত, প্রকৌশলগত উন্নতির প্রথম জোয়ারটি সরে যাবার পর জাদুবিদ্যার গুরুত্ব যেন আগের চেয়ে আরো বেড়ে উঠল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কীভাবে চলে সে ব্যাপারে জাদুবিদ্যা আগে ভুল হলেও এক ধরনের প্রগতিবাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করত। এবাব কিন্তু ফলপ্রদ চিন্তাভাবনার পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়াল। জাদুবিদ্যার চর্চা এইসময় সীমাবদ্ধ ছিল পুরোহিতদের মধ্যে। তাঁরা উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে উত্তরোত্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন। ফলে তাঁরা বাস্তব সমস্যার এমন সব জাদু-সমাধান উপস্থিত করতে লাগলেন যা আপাতদৃষ্টিতে অত্যধিক সহজ। তাঁরা বললেন, জীবনে সুস্থতা কিংবা সাফল্যের চাবিকাঠি নিহিত থাকে বিভিন্ন আত্মা বা অধিসত্তার কাছে। এর ফলে ফলপ্রদ কর্মের মধ্যে দিয়ে সেই সুস্থতা কিংবা সাফল্য অর্জন করার তাগিদ বাধাপ্রাপ্ত হলো। শুধু তাই নয়, শিথিল কতকগুলো আপাত-সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ঘটনাকে বিভিন্ন আধিদৈবিক সত্তার ক্রিয়া বলে 'ব্যাখ্যা' করার পদ্ধতিও চালু হলো। বিশ্বজগৎ মানবজগতেরই এক পরিবর্ধিত রূপ বলে বিবেচিত হলো। বাস্তবিক, মানুষের প্রকৌশলের উন্নতির প্রত্যেকটি ধাপই ছিল সফল মানবীয় কর্মের নিরিখে বিশ্বকে বুঝে নিতে প্রয়াসী হবার একেকটি আহ্বান। সৃজনবিষয়ক প্রধান প্রধান যেসব পুরাণকথা প্রচলিত আছে, সেসবের মধ্যে সেই ধরনের ব্যাখ্যাই লভ্য। সেখানে দেখি, বিশ্বনির্মাণকে এক সর্বোত্তম সেচকর্তা কর্তৃক জল থেকে স্থলকে আলাদা করার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, মানুষের সৃষ্টিকে তুলনা করা হয়েছে মহাগুণী এক মৃৎশিল্পী কর্তৃক কাদার তাল থেকে দেহ গড়ার সঙ্গে। এইসব পুরাণকথা যতটা না *মানবকেন্দ্রিক*, তার চেয়ে বেশি *প্রকৌশলকেন্দ্রিক*।

বৈজ্ঞানিক ভাষা গড়ে ওঠার আগেই সাধারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রণয়ন করা যে কত কঠিন সে কথাটা যদি মাথায় রাখি, তাহলে বহু পুরাণকথার মধ্যে আমরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আদিরূপ দেখতে পাব। সেসব পুরাণকথায় দেখি, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। তবে সম্ভবত এসব পুরাণকথার যাজকীয় লেখকরা এই ব্যক্তিরূপ দানের ব্যাপারটিকে নিছক কথার কথা বলেই বিবেচনা করতেন। কেননা, এসব পুরাণকথার মধ্যে যে তত্ত্বটুকু নিহিত থাকত তা আঁচ করে নিতে পরে আয়োনীয় গ্রীকদের অসুবিধে হয়নি। তারা ঠাকুরদেবতার ভূমিকাটুকু ব্যতিরেকেই সেসব কাহিনীকে নতুন রূপ দিয়েছিল।

তবে পরিবেশের যে অংশটুকু মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় সে অংশটিকে সরাসরি যুক্তিশাসিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা যতদিন বিজ্ঞানের অনায়ত্ত ছিল ততদিন প্রকৃতির ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পূর্বোক্ত প্রেতযোনিতত্ত্বের ব্যর্থতা নিয়ে মানুষের বিশেষ কিছু করাব ছিল না। আর উক্ত নিয়ন্ত্রণক্ষমতা তো বিজ্ঞান অর্জন করেছে মাত্র অল্প কাল আগে। তার আগে অব্দি প্রেতযোনিতত্ত্বকে আর পাঁচটা তত্ত্বের চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট বলে মনে হতো না। এবং বিশ্বাস আর সম্ভাব্যতার এক বিচক্ষণ সমন্বয় ঘটিয়ে সে তত্ত্বকে এমনকি চমৎকার এবং ফলপ্রদ বলেও ভেবে নেওয়া যেত। কেননা, যেভাবেই হোক, অধিকাংশ রোগ সাধারণত সেরে যায়, ফসলও নিয়ম মেনেই ফলে, আর সূর্য যে প্রতিদিন সকালে উঠবে এটা তো অবধাবিত!

কিন্তু প্রাকৃতিক ব্যাপারকে মানুষ যতদিন এই প্রেতযোনিতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে ততদিন বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রচণ্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কেননা প্রথমত, এ তত্ত্বে যুক্তিশাসিত পথে কোনো ধারণায় উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টাকে গোড়া থেকেই নিরর্থক বলে ধরে নেওয়া হতো। দ্বিতীয়ত, সে প্রচেষ্টার ফল এমনকি হানিকবও হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হতো, পাছে একান্ত নিজস্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুন প্রেতেরা রুষ্ট হয়ে ওঠেন। অন্য কথায় বলা যায়, যুক্তিশাসিত ধারণা গঠনের প্রয়াস পুরোহিতসম্প্রদায়ের জীবিকা অর্জনের পবিপন্থী ছিল। ব্রহ্মাণ্ডের প্রেতযোনিভিত্তিক এবং জাদুভিত্তিক ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁদেব স্বার্থ কায়েমীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল; বিশেষত যেহেতু মন্দির-কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো অবক্ষয়িত হওয়ার পর ভক্তদের দেওয়া নৈবেদ্যের ওপরেই তাঁরা উত্তরোত্তর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন।

প্রমিথিউসকে নিয়ে যে পুরাণকাহিনী প্রচলিত, তার আসল অর্থ হলো প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াসে অভিজাত দেবসম্প্রদায়ের নিরঙ্কুশ অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। প্রথম থেকেই অগ্নি ছিল স্বর্গের অধিকারে; মানুষের নিজের প্রয়োজনে অগ্নি ব্যবহারের কোনো অধিকার ছিল না। পুরোহিতরা দাবি করতেন অচলা *ভক্তি*— দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আচারপালনে কোথাও যেন এতটুকু নড়চড় না হয়, প্রতিটি নিষিদ্ধ আচরণ থেকে যেন যথোপযুক্তভাবে বিরত থাকা হয়, দেবতাদের ইচ্ছার কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ যেন সম্পূর্ণ হয়। যতদিন এইসব ধ্যানধারণার পিছনে সমাজকর্তাদের অনুমোদন ছিল, ততদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্মপ্রক্রিয়া নিয়ে তন্নিষ্ঠ অনুসন্ধান ছিল বিধর্মিতারই সামিল। কেননা উক্ত অনুসন্ধান অবশ্যই স্বর্গের দেবতাদের কষ্ট করবে এবং সে রোষ বর্ষিত হবে কেবল অনুসন্ধানকারীর ওপরেই নয়, গোটা সমাজের ওপরে। ধর্মসংশ্লিষ্ট মহল প্রথম থেকেই শ্রেণীশাসন বজায় রাখার প্রয়াসের সঙ্গে জড়িত ছিল। আদি নগরপত্তনের কয়েক শতাব্দী পরে শাসকশ্রেণীসমূহ যখন বস্তুগত এবং প্রকৌশলগত প্রগতিকে আর মদত দিল না তখন ধর্ম অবধারিতভাবেই মননগত অগ্রগতিকে ব্যাহত করল।

6. আদি সভ্যতাগুলির সাফল্য ও ব্যর্থতা

সামগ্রিক বিচারে একথা অনস্বীকার্য যে আদি সভ্যতাগুলি প্রকৌশল ও ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে একটানা সুবিপুল অগ্রগতি ঘটিয়েছিল। তাদের প্রকৌশল-সিদ্ধি যে কত উচ্চাঙ্গের ছিল তার একটা প্রমাণ এই যে আজও পর্যন্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় আমরা যেসব জিনিসপত্র ব্যবহার করি তার বেশির ভাগই সেই আদিযুগে প্রবর্তিত হয়েছিল, এবং পরবর্তী 5()()() বছরে সেসবের অতি সামান্যই পরিবর্তন ঘটেছে। এ ঘটনাটার সঙ্গে আমরা এত বেশি পরিচিত হয়ে গেছি যে এর তাৎপর্য অনেকসময় আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। সেই সুদূর অতীতে মিশরী

ছুতোরেরা কাঠ জোড়া লাগানোর কঠিন সমস্যাগুলোর সমাধান বার করার পর থেকে আমাদের চেয়ার আর টেবিলের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। হাতল-বসানো, থাবা-আকৃতির পায়া-লাগানো বেতের চেয়ার আনুমানিক 2500 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আজও আমরা পাথর আর ইটের তৈরি প্লাস্টার-করা দেওয়াল ও সিলিং-যুক্ত ঘরে থাকি, আজও আমরা একই ধরনের থালায় খাই; আজও আমরা সেই একই ধরনের কাপড় থেকে পোশাক বানাই।

এমনকি আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও যে আমূল পরিবর্তন এসেছে তা নয়। অন্তত এটুকু তো নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে আদিম জনসমাজ থেকে আদি নগরগুলো গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর চরিত্রে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছিল, পরবর্তীকালে পরিবর্তন ঘটেছে সে'তুলনায় অনেক কম। আদি নগর-সমাজেরই মতো আমাদের সমাজে রয়েছে বণিক, রয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট, রয়েছে সৈনিক। আমরা যে সমস্ত রাজনৈতিক অশান্তির মোকাবিলা করি, সেকালেও সেগুলোর অস্তিত্ব ছিল। অর্থাৎ আদি নগরপত্তনের কালে যে শ্রেণীসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আজও আমরা মোটের ওপর সেই ধরনের সমাজেই বাস করি।

প্রকৌশলে বদ্ধদশা

মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারতবর্ষ আর চীনের বড়ো বড়ো নদী-উপত্যকায় নগরজীবনের সূত্রপাত ঘটার পরে প্রকৌশলে উদ্ভাবনশীলতার বান ডেকেছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক শতকের মধ্যেই তা অস্তমিত হয়। মোটামুটি 3200 থেকে 2700 খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রকৌশল-পটুতার এই পর্ব স্থায়ী হয়েছিল। এর পরে আসে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বদ্ধদশার এক পর্ব, যা আগের পর্বটির তুলনায় অনেক দীর্ঘ। এ পর্বেও নগরের পতন-অভ্যুদয় বন্ধ থাকেনি; এ পর্বেও একের পর এক পুরোহিত-রাজার [রাজর্ষি?] বংশ সিংহাসনে আরোহন করে; মাঝে মাঝে বর্বরজাতির আক্রমণ ঘটে, এমনকি বর্বর রাজবংশেরও প্রতিষ্ঠা হয়;—সবই ঠিক, কিন্তু উৎপাদনের ছকটিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। সেচভিত্তিক কৃষি এবং তার সহযোগী বহির্বাণিজ্যের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। শহরবাসীরা যে সম্পদ সঞ্চয় ও ভোগ করত তার সমস্তটাই আসত নগর-মুখী কৃষির উদ্বৃত্ত উৎপাদন থেকে। সে উদ্বৃত্তের পরিমাণটা খুব বিপুল ছিল না, তাই জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশই তা ভোগ করত। এই অংশটির মধ্যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যায়। প্রথম দিকে কৃষি-প্রকৌশলের উন্নতি ঘটানোর জন্য আদি প্রশাসকরা নিজেরা পরিশ্রম করতেন; তাঁদের উত্তরসূরিরা কিন্তু উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে উত্তরোত্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। উৎপন্ন ফসলের কত বেশি পরিমাণ নিজেদের অধিকারে রাখা যায়, সেটাই তাঁদের ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল। আগে তাঁরা ছিলেন সম্পদের জনয়িতা; এখন তাঁরা হয়ে উঠলেন শোষক। নিজস্ব ভোগবিলাসের জন্য এবং অতি অপরূপ সব মন্দির ও সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ ও পরিচর্যার জন্য তাঁরা ক্রমাগতই অধিক থেকে অধিকতর সম্পদ দাবি করে চললেন। এর পরিণামে কৃষকসম্প্রদায় ও শহরের কারিগরেরা দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হলেন, কার্যত দাসে পরিণত হলেন। ফলে অবধারিতভাবেই দেখা দিল সংঘর্ষ, যা নগর-রাষ্ট্রগুলোকে দুর্বল করে তুলল। পরিশেষে তাদের মননগত ও প্রকৌশলগত অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেল।

এই ধরনের একটি ঘটনার মোটামুটি সুসম্পূর্ণ বিবরণ আমরা পেয়েছি। খ্রিস্টপূর্ব 2400 সালে লাগাশ্ নামক সুমেরীয় শহরটি ছিল দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার সবচেয়ে বড়ো শহর। সেই শহরে ঐ সময় একটি ঘটনা ঘটে যাকে সমাজবিপ্লব বললে অত্যুক্তি হয় না। জনৈক উরুকাগিনা অন্য এক রাজবংশের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং একের পর এক সামাজিক সংস্কার চালু

করেন। এইসব সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল আমলাতন্ত্র, যাজকবর্গ এবং ধনীদের উৎপীড়নের মাত্রাকে কিছুটা প্রশমিত করা। যেসব নথি আমরা পেয়েছি তাতে পুরোনো আর নতুন ব্যবস্থার প্রভেদগুলির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন, উৎকোচ গ্রহণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কেউ উৎকোচ গ্রহণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হলে তাকে বরখাস্ত করা। এছাড়া রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা ও পরিদর্শকদের যে বিশাল বাহিনী ছিল তা বহুলাংশে ছেঁটে ফেলা হয়। পুরোহিতদের সুযোগসুবিধাও অনেক পরিমাণে খর্ব করা হয়; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, এবং ভাগ্যগণনা উপলক্ষ্যে তাঁরা যে দক্ষিণা নিতেন তার হারও কমিয়ে এক-তৃতীয়াংশ বা আরো কম করা হয়।

এসব সংস্কার অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এই নয়া বন্দোবস্ত শাসকশ্রেণীকে ধ্বংস করেনি, তাদের অধিকার খানিকটা খর্ব করেছিল মাত্র। প্রথম সুযোগেই তারা প্রতিদ্বন্দ্বী শহর উম্মা-র শাসকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লাগাশ্ শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সে যুদ্ধে লাগাশ্ লুঠতরাজ ও ধ্বংসের তাণ্ডবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। লাগাশ্ শহরের একজন অনুগত পুরোহিত দুঃখ করে একটি ফলকে লিখেছেন : 'গির্সু-র রাজা উরুকাগিনা কোনো পাপকর্ম করেন নাই। কিন্তু উম্মা শহরের লুগাল্ জাগিসি পাটেসি যত পাপ করিয়াছেন তাহার যাবতীয় বোঝা দেবী নিডাবা যেন আপন শিরে বহন করেন।' তবে বিজয়ী রাজার এই সাফল্যও অল্পস্থায়ী হয়েছিল। অল্পকাল পরেই আক্কাড্-এর প্রথম রাজা সারাগন তাঁকে পরাজিত করেন। এই আক্কাড্-ই ছিলেন প্রথম বিশ্ব-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মোজেস-এর মতো তিনিও নাকি এক কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে; বাগানের এক মালী নাকি তাঁকে কুড়িয়ে পায়।

যুদ্ধ

উপরে বর্ণিত কাহিনীর শেষাংশ থেকে আদিযুগের নগর অর্থনীতির অস্থিরতার আরেকটি প্রধান উৎস সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়—সেটি হলো, যুদ্ধের সংগঠিত হিংসাশ্রয়িতা। স্থানীয় কৃষিকার্যে নিযুক্ত জনসমষ্টিকে বর্ধিত হারে শোষণের জন্য শহরের সীমানা প্রসারিত করে তোলা হতো। খানিকদূর অব্দি এই প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবেই চলত। কিন্তু একটা সীমাবদ্ধ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি শহর যদি একই সঙ্গে এই নীতি অনুসরণ করতে থাকে, তাহলে পরিশেষে সংঘাত অনিবার্য। ফলে যুদ্ধ নামক একটি নতুন প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে। সামগ্রিক অর্থে যুদ্ধ জিনিসটা সভ্যতারই অবদান। এর আগে শিকারভিত্তিক, এমনকি চারণভিত্তিক সমাজে বারংবার যে লড়াই বাধত তার চরিত্রের সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ-অভিযান অপেক্ষা ফুটবল ম্যাচেরই মিল বেশি। নিষ্ঠুরতার কোনো কমতি অবশ্য থাকত না এসব লড়াইয়ে; কিন্তু সামগ্রিক জীবনধারার ওপর এর বিশেষ প্রভাব পড়ত না। তাছাড়া শিকারভিত্তিক বা চারণভিত্তিক সমাজের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে একটানা কয়েকদিনের বেশি বিপুল সংখ্যায় যোদ্ধা মোতায়েন রাখা এবং তাদের আহার যোগানো অসম্ভব ছিল। কিন্তু নগরপত্তনের পরে এই পরিস্থিতিটা একেবারে বদলে গেল। সৈন্যবাহিনীকে যথোচিত পরিমাণ সরঞ্জাম যোগানো এবং উদ্বৃত্ত খাদ্যভাণ্ডার থেকে রসদ যোগানো তখন সুসাধ্য হয়ে উঠল। নগর-সরকারের নিয়ন্তা উচ্চশ্রেণী তো যুদ্ধ চাইত অর্থনৈতিক লাভের আশায়। কতটা জায়গা তারা কাজে লাগাতে পারছে তারই ওপর তাদের বৈভব নির্ভর করত। কোনো একটা শহর দখল করতে পারলে সেই শহরের আবাদী জমি এবং সেই জমির কৃষকদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতো। সেই সঙ্গে নানারকম বস্তুসামগ্রী, বহু পশুসম্পদ এবং মানুষও লুঠ করাব আশা থাকত।

সৈন্য নিয়োগ এবং সেনাবাহিনীর পরিচালনা যুদ্ধের একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ। এর ফলে সরকার এবং রাষ্ট্রের চরিত্র বদলে গেল। এতদিন রাষ্ট্রপ্রধানের মুখ্য কর্ম ছিল কৃষি ও পূর্তকার্য

পরিচালনা। এখন যুদ্ধ পরিচালনাই তাঁর মুখ্য কর্ম হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ এতদিন পুরোহিতরাই হতেন রাষ্ট্রপ্রধান; এবার রাজা হলেন রাষ্ট্রপ্রধান। আরেকটা লক্ষণীয় পরিবর্তন এই ঘটল যে সমাজে মেয়েদের স্থান আবার নেমে গেল। পূর্বতন গ্রামীণ জীবনধারায় মেয়েদের স্থান ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। সভ্যতার প্রথম পর্বেও তাঁদের সে মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তারপর যুদ্ধবিগ্রহ ব্যাপারটা যখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, তখন তার প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করে পুরুষরা। কাজেই মেয়েদের স্থান ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়ে, যদিও তাঁরা তখনই গার্হস্থ্য দাসীর স্তরে অধঃপতিত হন নি। সে ঘটনাটা ঘটে আরো পরে, লৌহ যুগে।

সমরায়োজন ও প্রকৌশল : প্রযুক্তিবিদ

যুদ্ধবিগ্রহ ক্রমশ নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামের সঙ্গে শহরের প্রভেদ শহরের আরক্ষা-*প্রাকার* ও সুরক্ষিত *গড়ের* মধ্যে মূর্ত রূপ লাভ করে। এর ফলে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন মেটানোই প্রকৌশলের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। সদ্য জায়মান বিজ্ঞানকেও সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকৌশলের উন্নতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেলেও অস্ত্রনির্মাণের অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ থাকে। ভাল্‌ক্যান বা ওয়েল্যান্ড দ স্মিথ*-এর মতো কিংবদন্তী-চরিত্রের সুমহৎ মর্যাদার কথা ভাবলেই স্পষ্ট বুঝতে পারি, একজন যোদ্ধার কাছে একজন অস্ত্রনির্মাতার গুরুত্ব কত বেশি ছিল। শিলাক্ষেপণাস্ত্র (catapult), কিংবা চলমান স্তম্ভের মতো সামরিক যন্ত্র-উদ্ভাবনের দীর্ঘমেয়াদী গুরুত্ব ছিল আরো বেশি। কেননা বলবিজ্ঞানের সূত্রগুলি না বুঝলে এসব যন্ত্র বানানো যায় না। এইসব যন্ত্রের নির্মাণ ও পরিচর্যা করবার জন্য এবং মৃৎ-প্রাকার নির্মাণ ও আকরখননের জন্য *এনজিনিয়ারিং* নামক এক বৃত্তির উদ্ভব হয়। এনজিনিয়ারিং ছিল মূলত এক সামরিক বৃত্তি, যদিও গোড়াতে বেসামরিক কর্মক্ষেত্র থেকেই তা প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য আহরণ করেছিল।

যুদ্ধের অন্যান্য পরোক্ষ দিকও বিজ্ঞানকে প্রণোদিত করেছিল। নানাবিধ সমস্যা, যেমন পথনির্মাণ ও খালখনন এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল। প্রতিরক্ষাব্যূহের নকশা আঁকার কাজও এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নকশাই ছিল নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে আঁকা ছকের আদি নির্দশনসমূহের অন্যতম। প্লেটোর মতে তো জ্যামিতির একমাত্র ব্যবহারিক উপযোগিতা হলো সেনাবাহিনীর ব্যূহরচনা। যুদ্ধ না থাকলে, কিংবা যে সমাজব্যবস্থা যুদ্ধের জনক তা না থাকলে, শান্তিতে থাকার নানাবিধ কৌশল অনেক দ্রুতগতিতে উদ্ভাবিত হতো, একথা ঠিকই। কিন্তু যুদ্ধের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিষয়ে এটুকু অন্তত না বললে অন্যায় হবে যে যে-সময়ে সংস্কৃতির অন্যান্য দিকে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, সেই সময়ে যুদ্ধের কল্যাণেই বিজ্ঞানচর্চা সজীব থাকতে পেরেছিল।

বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য

খানিকটা যুদ্ধের মাধ্যমে, আর খানিকটা বাণিজ্যভিত্তিক মৈত্রীর এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রগুলো ক্রমশ এককেটি বৃহত্তর ইউনিটের অঙ্গীভূত হয়ে উঠতে থাকে। দুভাবে এই একীভবন ঘটে। এক, কোনো একটি মহানগরের নিরবচ্ছিন্ন বিপুল প্রাধান্যের কাছে অন্যান্য নগরগুলো নতি স্বীকার করে, যেমন ঘটেছিল মিশরের মেম্‌ফিস নগর-রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। মেম্‌ফিস

Wayland Smith—ইংরেজ লোককথায় উল্লেখিত সুনিপুণ কর্মকার এবং বিখ্যাত অস্ত্রনির্মাতা। বার্কশায়ারের কাছে এঁর কামারশাল ছিল। সার ওঅলটার স্কটের 'কেনিলওয়ার্থ' উপন্যাসে ওয়েল্যান্ড একটি চরিত্র।

Vulcan—রোমক অগ্নিদেবতা। —অনু

শহরের নিজস্ব গুরুত্ব যে খুব বেশি ছিল তা নয়, কিন্তু ঈশ্বর-রাজার পীঠস্থান হিসেবে তা খুবই গুরুত্বের অধিকারী ছিল। একীভবনের দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি ছিল এইরকম: একাধিক নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে যেটি যখন ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে, তখন অন্যান্যগুলি তার অধীনতা স্বীকার করে—যেমন মেসোপটেমিয়ায় একের পর এক উর, লার্সা, আইসিন এবং ব্যাবিলনের *সাম্রাজ্যের* অভ্যুত্থান হয়। মিশরে ঈশ্বর-রাজা অর্থাৎ 'ফারাও' এবং তার অধীন যাজকতন্ত্রের হাতেই যাবতীয় শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকত (ফারাও শব্দের যা মূল সেই *পের-আ* কথাটির অর্থ হলো মহাভবন, অর্থাৎ শাসনপীঠ)। সেই কারণেই পিরামিড নির্মাণের মতো প্রকাণ্ড এবং অর্থনৈতিক বিচারে নিষ্ফলা কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। মেসোপটেমিয়াতে একটিমাত্র শহরের অধিকার এতটা একচ্ছত্র এবং নিরঙ্কুশ ছিল না। তবে সব মিলিয়ে হিসেব করলে দেখা যাবে, সেখানেও হয়তো সমাজের উচ্চশ্রেণীর ব্যয়ের বহর মিশরের মতোই বিপুল এবং অপচয়ী ছিল, কিন্তু মিশরের মতো তা অত কেন্দ্রীভূত ছিল না। আর্য অধিকারের আগে ভারতবর্ষেও মেসোপটেমিয়ার মতোই গড়, মন্দির ও স্নানাগার-সমন্বিত বড়ো বড়ো নগর-রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু তাদের লিপির পাঠ এখনো উদ্ধার করা যায় নি; কাজেই তাদের সামাজিক কাঠামো কেমন ছিল তা জানার পক্ষে তথ্য বড়োই অপ্রতুল। প্রাচীন চীনে সম্রাটকে স্বর্গের সন্তান বলে সম্মান করা হতো। মিশরের ফারাওয়ের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। অথচ চীন বহু যুগ ধরে পরস্পর-বিবদমান একাধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে বিরাজ করেছিল।

সাম্রাজ্য এবং পরমেশ্বর

সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার একটা ফল এই হলো যে প্রধান শাসক-নগরীর অধিষ্ঠাতা দেবতা অন্যান্য বিজিত বা অধিকৃত শহরের দেবতাদের ওপরে স্থান পেল। থেবেস্-এর মন্দির-শাসিত এলাকার আদি টোটেম ছিল 'আমন' অর্থাৎ মদ্দা ভেড়া। কিন্তু থেবীয় সাম্রাজ্য যখন গড়ে উঠল তখন বাজপাখি-টোটেম 'রা' (=সূর্যদেব)-এর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে এই 'আমন' হয়ে উঠল 'আমন-রা'—দেবরাজ। অনুরূপভাবে ব্যাবিলনেও স্থানীয় দেবতা 'মার্ডুক' গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যের পতন-অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের ক্ষমতারও পতন ও উত্থান ঘটতে থাকে। কিন্তু সব মিলিয়ে জগৎব্যাপারের শাসনকর্তা একজন পরম ঈশ্বরের ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। সৌরচক্রের পূজা প্রবর্তন করে আখেনাটন মিশরে এই ধারণাটিকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি। তখনকার অবজ্ঞাত ইহুদি উপজাতিরা পরে সে কাজে সফল হয় এবং আধুনিক একেশ্বরবাদের প্রবর্তন করে।

7. সভ্যতার প্রসার

সভ্যতার কেন্দ্রগুলোতে বদ্ধদশা দেখা দিলেও সভ্যতার প্রভাব কিন্তু ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। নদী-উপত্যকায় সভ্যতার সূত্রপাত ঘটার সময় থেকেই যে সমস্যাটি মাথা চাড়া দিয়েছিল, সাম্রাজ্যের উদ্ভবের পরে তা তীব্র হয়ে ওঠে। সেটি হলো : খোলা প্রান্তর এবং পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক। লাঙল, চাকা, ধাতুর কাস্তে—এসব উন্নত প্রকৌশল সভ্যতারই অবদান। যে অঞ্চলে এসবের উদ্ভব ঘটেছিল তার বাইরের জমিতেও কৃষিকাজে এগুলো সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। কাজেই এইসব প্রকৌশল বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তার মধ্যে একটা সহজ প্রক্রিয়া হলো প্রব্র ন (trekking)। শহর এলাকায় বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার স্থান সংকুলান যখন আর সম্ভব হলো না, তখন গ্রামবাসীরা তাঁদের পালিত পশু সঙ্গে নিয়ে চাকা-গাড়িতে করে বনে জঙ্গলে ছড়িয়ে

পড়তে লাগলেন। সেসব জায়গা বসবাসের পক্ষে অনুপযোগী হলেও যথেষ্ট সুপরিসর ছিল। এইভাবেই গ্রামীণ জনসমাজ ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং সম্ভবত আমেরিকারও সর্বত্র কর্ষণযোগ্য (আবাদী) জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াতে সভ্যতার অপেক্ষাকৃত জটিল বহু অবদান হারিয়ে যায় অথবা সরলীভূত রূপ ধারণ করে। কাজে কাজেই, কারা আসলে বহিরাগত সভ্য জাতির লোক কিন্তু স্থানীয় জীবনযাত্রায় মিশে গেছে, আর কারা স্থানীয় সরল জীবনযাত্রার অভ্যস্ত হয়েও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সভ্যতার নানান প্রকৌশল রপ্ত করে নিয়েছে, তা নির্ণয় করা দুরূহ।

সভ্যতার প্রসারে আরেকটি পন্থা ছিল বাণিজ্য, বিশেষত আকরখনন। শহরের কিছু কিছু দুঃসাহসী লোক দূর সীমান্ত এলাকায় বন্য অঞ্চলে যেতেন বসবাস করবার জন্যে নয়—স্থানীয় মূল্যবান জিনিসপত্র, বিশেষ করে বহুমূল্য রত্ন, আকরিক আর সোনা নিয়ে আসবার জন্যে। স্থানীয় জিনিসপত্রের বিনিময়ে এই বণিকরা দিতেন শহরে উৎপন্ন নানান সামগ্রী। এর মধ্যে দিয়ে সভ্য জীবনের নানারকম প্রয়োজনের বোধ তাঁরা সঞ্চার করে দিতেন স্থানীয় মানুষদের মধ্যে। সেই সঙ্গে, কখনো কখনো সভ্য সমাজে অনুসৃত উৎপাদন-পদ্ধতির জ্ঞানও সঞ্চারিত হতো। আবার, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে অবধারিতভাবেই সংঘর্ষে লিপ্ত হতেন তাঁরা। তখন বিপদ থেকে বাঁচবার জন্য 'স্বদেশে'র সরকারের সাহায্য চাইতে হতো তাঁদের। এর ফলে সভ্যতার প্রসারের তৃতীয় পন্থাটির উদ্ভব হলো—রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপের পথ। সেই পন্থাটিকে আমরা আজও *সাম্রাজ্যবাদের* একটি বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করি। প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ার শাসকদের যেসব নথিপত্র রয়েছে তা স্বর্ণগিরি, হস্তিদন্তপুর বা মুক্তাদ্বীপে অভিযানের বহু বিবরণে পূর্ণ। সেসব অভিযান কখনো শাস্তি দেবার, কখনো বা হানা দেবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল। তবে হস্তক্ষেপ মানেই যে সামরিক হস্তক্ষেপ তা কিন্তু নয়। অনেক সময়েই বিভিন্ন উপজাতির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, কিংবা কোনো উপজাতির অন্তর্গত পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলগুলোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে খুঁজে বার করে তার সাহায্যে কাজ হাসিল করা হতো। বোঝা যায়, *কূটনীতি* নামক ক্ষেত্রটি ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান সভ্যতার অভ্যুদয়ের বহু আগে থেকেই সক্রিয় ছিল।

আদি বর্বর সম্প্রদায়

এইসব অভিযানের ফলে কখনো কখনো মূল নগরকেন্দ্রের অধীনস্থ বসতি এলাকার প্রসারণ ঘটত। যেমন ঘটেছিল দুর-গুড়গুড়ি নামক স্থানের ব্যাবিলোনীয় খনিবসতিগুলিতে। তবে এ ধরনের *উপনিবেশ* স্থাপনের ঘটনা পরবর্তীকালে লৌহযুগে অনেক বেশি করে ঘটে। এর প্রধান ফল এই হলো যে নগর-সাম্রাজ্যের প্রতি বিরোধিতা জেগে উঠল, এবং তা উত্তরোত্তর সক্রিয় রূপ ধারণ করতে থাকে। কালে সভ্যতাকেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বের শত শত মাইল এলাকা জুড়ে বহু মানুষের সামাজিক রীতিনীতি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বদলে যায়। এইসব এলাকাই হলো সভ্যতার *বর্বর*-অধ্যুষিত প্রত্যন্তদেশ। বর্বরেরা নগর-সভ্যতার জীবনযাত্রার অঙ্গ হিসেবে প্রচলিত নানান বস্তুসামগ্রীর ব্যবহার আয়ত্ত করে নিত, বিশেষ করে সেইসব জিনিস যা সহজে পরিবহনযোগ্য এবং যা গ্রহণ করলে তাদের অভ্যস্ত আচরণের পরিবর্তন ঘটবে সবচেয়ে কম। প্রধানত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারই তারা রপ্ত করত। এসব অস্ত্রশস্ত্র দামী ঠিকই, কিন্তু সমৃদ্ধতর কেন্দ্রে হানা দিলে ঐ অস্ত্রশস্ত্রের দৌলতে যা আদায় করা যেত তাতে তার দাম উশুল হয়ে যেত।

বর্বরদের কৌম সামাজিক রীতিনীতিও সভ্যতার সংস্রবে বদলে যায়; ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রচলন ঘটে, যোদ্ধার ভূমিকার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়, দলপতিদের কর্তৃত্ব বেড়ে যায়।

সভ্যতার সঙ্গে এই সংস্পর্শের প্রভাব সবচেয়ে বেশি করে পড়ে চারণভিত্তিক জনগোষ্ঠীগুলির জীবনধারার ওপর। এরা ছিল খুবই চরণশীল (mobile). এবং সভ্যতার মধ্যে এদের পূর্ণ অঙ্গীকরণ ছিল অসম্ভব। অথচ নানারকম প্রয়োজনীয় জিনিস, যথা নির্মাণযন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র এবং অলংকারের জন্য এরা সভ্যতার ওপরে নির্ভরশীল ছিল; কেননা এসব জিনিস তৈরি করবার মতো পটুতা তাদের ছিল না। এই বর্বরদের সঙ্গে নগর-রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিল বিচিত্র এবং জটিল। শক্তিশালী নগর-সাম্রাজ্যগুলো একটি বর্বর কোমকে অন্য একটির বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলত, তারপর হানা দিয়ে তাদের পদানত করত। আবার, বর্বর ক্রীতদাস ও সৈন্য আমদানি করে দুর্বল নগর-রাষ্ট্রগুলো নিজেদের দুর্বলতর করে তুলত। অনেক সময় বর্বর শাসকবংশ নগররাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা পুরোপুরি দখল করে নিত। এইরকম ক্ষেত্রে বর্বরেরা সাধারণত নাগরিক জীবনধারা দ্রুত আয়ত্ত করে নিত।

দাসপ্রথা

নগর-রাষ্ট্র আর বর্বর সম্প্রদায়ের মধ্যেকার এই সম্পর্কের একটি ফল হলো এই যে দাসপ্রথার গুরুত্ব ক্রমশ বেড়ে গেল। দাসপ্রথা, যার কুফল নিয়ে মানবসমাজ আজও পীড়িত, তার প্রথম প্রচলন ঘটে নদীমাতৃক জীবনধারার আদিপর্বে। শিকারভিত্তিক জীবনধারায়, এমনকি কৃষিভিত্তিক জীবনধারার আদিপর্বেও উদ্বৃত্ত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল নগণ্য। একজন শ্রমশীল মানুষ নিছক নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনটুকু মেটানোর বাইরে আর বিশেষ কিছুই অর্জন করতে পারত না। উপজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষে ধৃত বন্দীদের সাধারণত বলি দেওয়া হতো; যারা নিষ্কৃতি পেয়ে যেত, তাদের সাধারণত বিজয়ী কোমের অঙ্গ হিসেবেই গ্রহণ করা হতো, কেননা দাস হিসেবে তাদেব রাখার কোনো অর্থ ছিল না।

পক্ষান্তরে, একটি সভ্য দেশে একজন কৃষিশ্রমিকের গ্রাসাচ্ছাদনের খরচের তুলনায় তার উৎপাদনের মূল্য ছিল বহুগুণে বেশি। ফলে ক্রীতদাস হিসেবে ধরে নিয়ে আসা এবং ক্রীতদাসকে ব্যবহার করা লাভজনক হয়ে দাঁড়াল। দাস ধরে নিয়ে আসবার জন্য অন্য শহরে হানা দেওয়া অচিরেই এক সাধারণ রীতি হয়ে উঠল। এই উদ্দেশ্যে বর্বরদের রাজ্যে হানা দেওয়াটা ছিল আরো সহজ এবং লাভজনক।

দাস-নির্ভব কৃষিব্যবস্থাব পূর্ণ বিকাশ লৌহযুগের আগে ঘটে নি। কিন্তু ব্রনজ যুগের শুরু থেকেই সভ্যতার ওপর এর কুপ্রভাব পড়তে থাকে। দাস হিসেবে ব্যবহৃত হবার জন্য ধৃত হাত-পা-বাঁধা বন্দীদের ছবি প্রায় 3000 খ্রিস্টপূর্বাব্দের প্রাচীনতম সুমেরীয় খোদাইচিত্রে দেখতে পাওয়া যায়। সম্পত্তিহীন এবং অধিকারহীন ক্রীতদাসেদেয় অস্তিত্ব নিশ্চয়ই স্বাধীন শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদার ওপরেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ক্রীতদাসরা যেহেতু শ্রম করে, তাই স্বাধীন শ্রমিকদের শ্রমও নীচ এবং দাসত্বসূচক বলে গণ্য হলো। প্রকৌশলের উন্নতিসাধনের প্রেরণা বা সুযোগ স্বাধীন শ্রমিকদের ছিল না বললেই চলে; ক্রীতদাসেদের তো একেবারেই ছিল না। তার ওপর উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা তাদের ঘৃণা করত। সুতরাং সব মিলিয়ে ঘটনাটা দাঁড়াল এইরকম যে যে-বৈজ্ঞানিক মনোভাব গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের মতো অভিজাত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অমন সুফল ফলিয়েছিল, তার সঙ্গে হাতেকলমে নিযুক্ত পেশাকর্মীদের সমস্যাদি এবং সংগৃহীত তথ্যবলীর বিচ্ছেদ ঘটল। ডাকিনীবিদ্যা বলে পরিগণিত রসায়নে কিংবা চাষাড়ে ছোটোলোকের কাজ বলে পরিগণিত কৃষিকার্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সঞ্চার ঘটল না। এই অবস্থাটা বহুকাল স্থায়ী হয়।

দাসপ্রথার রাজনৈতিক কুফল অবশ্য অনেক সময় হাতেনাতেই মিলত। সে কুফল

ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করত। একটা শহর যত বেশি করে ক্রীতদাসেদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ত, ততই তারা আত্মরক্ষার ব্যাপারে কম নজর দিত। ফলে পলাতক ক্রীতদাস (পরে ভাড়াটে সৈন্য) হিসেবে বর্বররা শহরের যুদ্ধপ্রক্রিয়ার কৌশল শিখে নিয়ে সেই কৌশলেই শহরের শাসনকর্তাদের উৎখাত করত।

অবক্ষয়

মোটামুটি 1600 খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকেই, অর্থাৎ চূড়ান্ত পতনের কয়েক শতক আগে থেকেই পাশ্চাত্যের (চীনের নয়) প্রাচীন সভ্যতাগুলো সমস্তরকম প্রগতিসূচক পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বলে মনে হয়। তারা উত্তরোত্তর অবক্ষয়ী হয়ে ওঠে। সভ্য জীবনযাত্রার কাঠামোটা বজায় রইল ঠিকই, কিন্তু শিল্পসাহিত্য হয়ে উঠল প্রথাবদ্ধ, ধর্ম পর্যবসিত হলো 'তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি'তে, যাকে অনায়াসেই কুসংস্কার বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানের অনেক সম্পদই হারিয়ে গেল। কিছু কিছু আবার টিকেও গেল, এমনকি তার উন্নতিও ঘটল, যেমন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ। কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক চর্চা আবার অধঃপতিত হয়ে কুসংস্কারে পর্যবসিত হলো, যেমন পশুদের যকৃৎ সযত্নে পরীক্ষা করে ভবিষ্যদ্বানী করার 'বিদ্যা'। দুর্বোধ্য ব্যাপারকে সুশৃঙ্খলভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার সাহায্যে ভাগ্য গণনা করার প্রয়াসের এ কেবল একটি উদাহরণ মাত্র। হস্তরেখা গণনা, স্বপ্নবিচার ইত্যাদি রূপে এইসব বিদ্যার প্রচলন আজও রয়েছে আমাদের মধ্যে—কখনো সেই আদি ও অকৃত্রিম রূপে, কখনো বা তাস, পাশা বা দাবার মতো সম্ভাব্যতা-ভিত্তিক দ্যূতক্রীড়া রূপে, যা ঐসব চর্চা থেকেই উদ্ভূত। পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতাকে শাণিত করা এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে নেওয়ার পদ্ধতিকে উন্নততর করে তোলার ব্যাপারে এইসব চর্চা কিছুটা সহায়ক হয়েছিল। পরীক্ষাভিত্তিক বিজ্ঞানে এদের স্থান ঐটুকুই। যেমন, একমুঠো মাটি বোর্ডের ওপর ছড়িয়ে দিলে তা কোন আকার ধারণ করে তা দেখে ভবিষ্যৎ বিচার করার একটি পদ্ধতি (geomancy) চালু ছিল; সেই বিদ্যার একজন চৈনিক চর্চাকারীই সম্ভবত চৌম্বক কম্পাস আবিষ্কার করেন, যা আবিষ্কাব হিসেবে অমূল্য।

8. আদি সভ্যতাগুলির উত্তরাধিকার

একথা অনস্বীকার্য যে উত্তরসূরিদের জন্য তাঁরা যে জ্ঞানসম্ভার রেখে গিয়েছিলেন তা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য এবং মূল্যবান। পুরাতাত্ত্বিকদের খননকার্য কোনোদিনই তার পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে পারবে বলে মনে হয় না। একথা অবশ্য ঠিক যে একটা কোনো ঘটনা ঘটাব মাত্র কয়েক শো বছর পরে যাঁরা জীবন কাটিয়েছেন তাঁদের তুলনায় একজন পুরাতাত্ত্বিক সে জ্ঞানের ব্যাপারে আরো অনেক কিছুই জানতে পারেন। আহরিত জ্ঞানের আদি উৎসটি বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেলেও তার নানান ব্যবহারযোগ্য অংশ সম্মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করতে পারে। কোনো একটা জ্ঞান ও তার অনুশীলন যদি সজীব থাকে তাহলে সেই অনুশীলনকারীদের মারফৎ মুখে মুখেও তা শিখে নেওয়া সম্ভব। আদি সভ্যতাগুলি যে জ্ঞান আহরণ করেছিল, তার কেবল একটা অংশই পরবর্তীকালের নতুন নতুন জীবনধারা ও ভিন্নতর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর অঙ্গ হয়ে উঠতে পেরেছিল। সে যুগের ইতিহাস, কাব্য এবং সাহিত্যের সুবিপুল সম্ভারের অনেক কিছুই হারিয়ে যায়, কেননা যে চিত্রলিপি ও কীলকাকাব (cuneiform) লিপিতে সেসব রচিত হয়েছিল তা কী করে পড়তে হয় সে কথা পরবর্তী যুগের মানুষ ভুলে যায়। যৎসামান্য যেটুকু অংশ টিকে যায় তার কিছুটা পরিচয় বাইবেলে লভ্য। এবং

তা থেকেই তার অতি উচ্চ মানের পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি, পুরোহিতরা যে-বিজ্ঞানের চর্চা করেছিলেন তারও অনেক কিছু নিশ্চয়ই হারিয়ে গেছে। সেদিক থেকে প্রকৌশলের অবস্থাটা অপেক্ষাকৃত ভালো। যেসব সরঞ্জাম সভ্য জীবনযাত্রার অঙ্গ ছিল, এবং যেসব নির্মাণযন্ত্রের সাহায্যে তা বানানো হতো, তার অধিকাংশই টিকে গেছে এবং আজও প্রচলিত।

পরবর্তীকালে লৌহযুগের, এমনকি গ্রীকদেরও, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বহুলাংশে এই প্রাচীন যুগ থেকেই আহরিত, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ঋণের কোনো স্বীকৃতি মেলে না। বাস্তবিক, প্রকৌশলের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটাই যে ঘটেছিল সে কথা আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি; কেননা প্রকৌশল এমনই একটা ব্যাপার যা বস্তুগঠিত এবং যা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সামগ্রীর মধ্যে মূর্ত রূপ ধারণ করে। অনেক সময়েই একটা কোনো ভাবনা বা আবিষ্কারের জনক হিসেবে একজন গ্রীক দার্শনিকের নাম কবা হয় কেবল এইজন্যে যে সর্বপ্রথম তাঁরই কাছ থেকে আমরা ঐ ধারণা বা আবিষ্কারের কথা শুনেছি, অথবা এ কথা শুনেছি যে তিনিই ওগুলির আদি উদ্‌গাতা। কিন্তু গভীরতর গবেষণা করলে প্রায়ই দেখা যায় যে আরো আগে মিশরে বা মেসোপটেমিয়ায় হয়তো তাদের উদ্ভব ঘটেছিল। তাছাড়া পুরাতাত্ত্বিকদের আজকের অভিমতটাই যে চূড়ান্ত, এমন ধরে নেবারও কোনো কারণ নেই।

প্রাচীন সভ্যতার যাঁরা সাক্ষাৎ উত্তরসূরি, সেই লৌহযুগের মানুষদের কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো ভুল ধারণা ছিল না। যেসব সাম্রাজ্যের ধ্বংসক্রিয়ায় তাঁরা নিজেরা সহায়ক হয়েছিলেন তাদের মহত্ত্ব এবং চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে তাঁরা পূর্ণমাত্রায় অবহিত ছিলেন। নগর-লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তির কাহিনী নিয়ে রচিত 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্যে সেই প্রাচীন জীবনযাত্রার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কবিরা নিজ যুগের কঠিন জীবনযাত্রার সঙ্গে, হীন সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচীন নগরসমূহের শক্তি, বৈভব, সৌন্দর্য এবং সর্বোপরি শান্তিময় জীবনযাত্রার তুলনা করতেন। প্রাচীন যুগের মানুষদের প্রজ্ঞাকে তাঁরা শ্রদ্ধা করতেন; সখেদে ফিরে চাইতেন হারানো সেই স্বর্ণযুগের দিকে।

চতুর্থ অধ্যায়

লৌহযুগ ঃ ধ্রুপদী যুগের জীবনধারা

ভূমিকা

এই অধ্যায়ে আমরা যে পর্বটি নিয়ে আলোচনা করব, মানবজাতির সামগ্রিক ইতিহাসে তো বটেই, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার গুরুত্ব চরম। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রকৌশলগত, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নানান কারণে বিশ্বে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। তার পরিণতিতে পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি নদী-অববাহিকার সংলগ্ন অঞ্চলের গন্ডি ছাড়িয়ে সভ্যতা বিপুল ব্যাপ্তি লাভ করে। এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান কর্ষণযোগ্য অঞ্চলে তার বিস্তার ঘটে। পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় লৌহযুগের সভ্যতা অপেক্ষাকৃত কম সুশৃঙ্খল ও শান্তিময় হলেও এযুগের সভ্যতা ছিল অধিকতর নমনীয় ও যুক্তিপ্রবণ। ব্রন্জ যুগের সূচনায় যেমন প্রকৌশলে অগ্রগতির বান ডেকেছিল, লৌহযুগে তেমনটি হয়নি। তবে শস্তা ও সহজলভ্য লোহাকে কাজে লাগিয়ে এযুগে যে অগ্রগতি সাধিত হয় তার প্রসার ঘটেছিল অনেক বেশি—কেবল ভৌগোলিক অর্থেই নয়, সামাজিক শ্রেণীগত অর্থেও।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা মূলত ভূমধ্যসাগর-সন্নিহিত অঞ্চলের লৌহযুগীয় সভ্যতা নিয়ে, অর্থাৎ গ্রীক ও রোমানদের ধ্রুপদী সভ্যতা নিয়ে, আলোচনা করব। এর একটা কারণ এই যে ভারতবর্ষ বা চীনের সমসাময়িক জীবনধারার তুলনায় গ্রীক-রোমান সভ্যতা বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অনেক বেশি। তবে এই বইয়ের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে তার থেকেও বড়ো কারণ এই যে ঐ ভূমধ্যসাগর অঞ্চলেই বিমূর্ত ও যুক্তিশাসিত বিজ্ঞানের প্রথম আবির্ভাব ঘটে, একালের সর্বজনীন বিজ্ঞান যার সাক্ষাৎ উত্তরসূরী। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখব, সেযুগের সর্বজনীন সংস্কৃতি-ভাণ্ডারে, বিশেষ করে গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে এবং তাদের ফলিত প্রয়োগে (যার পরিচয় পাওয়া যায় চৌম্বক কম্পাস, বারুদ ও মুদ্রণক্রিয়ার উদ্ভাবনে) ভারতবর্ষ ও চীনের অবদান বিপুল। কিন্তু সেসব অবদান বিজ্ঞান ও করণকৌশলের প্রধান ঐতিহ্যধারার অঙ্গ হয়ে ওঠবার আগেই সে-ঐতিহ্যের রূপরেখাটি গ্রীক সভ্যতার প্রভাবে এক সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে।

1. লৌহযুগীয় জীবনধারার উৎপত্তি

পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন ব্রনজ-যুগীয় জীবনধারার কেন্দ্রগুলিকে দখল করে নেয় বর্বর সম্প্রদায়ের লোকেরা। তাদের প্রধানত জঙ্গলাকীর্ণ এবং তৃণভূমি-পরিকীর্ণ আদি নিবাসগুলিতে সুস্থিত রাষ্ট্র গড়ে তোলার কাজে তারা ব্যর্থ হয়েছিল; কারণ স্থিতিশীল কৃষিকার্যের কোনো একটা প্রণালী গড়ে তোলার উপযুক্ত পন্থা তাদের জানা ছিল না। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে পরিস্থিতিটা বদলাতে থাকে; বস্তুগত এবং সামাজিক নানান উপাদানের সম্মিলিত অভিঘাতে সে প্রণালী তাদের করায়ত্ত হয়। এইসব উপাদান সম্বন্ধে আমাদের সবে একটু একটু ধারণা জন্মাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম উপাদানটি হলো, বর্বরদের জ্ঞাতিসমাজ-কাঠামোর মধ্যে নাগরিক শ্রেণী-অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ও তজ্জনিত পরিবর্তন। শ্রেণী-অর্থনীতির প্রভাবে বর্বর-সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কর্তৃত্বাধিকার এবং অস্ত্রোৎপাদনের গুরুত্ব বেড়ে যায়।

লৌহ আবিষ্কারের অভিঘাত

লৌহ নামক একটি নতুন ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার উক্ত প্রবণতাগুলোকে জোরালো করে তুলল। সম্ভবত সে অভিঘাত একেবারে চরম রূপ ধারণ করেছিল। কবে ঠিক কোন জায়গায় বেশ অনেকটা পরিমাণ লোহা প্রথম তৈরি হয়েছিল, তা আজও এক রহস্য। একেবারে গোড়াতে উল্কাপিণ্ড থেকে পাওয়া কাঁচা লোহাকে তামার মতো তপ্ত করে পিটিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু সে লোহা এতই বিরল ছিল যে তা মহার্ঘ ধাতু হিসেবেই গণ্য হতো। অতঃপর আকরিক থেকে বিগলন মারফৎ প্রথম যে লোহা তৈরি হয়, খুব সম্ভব তা ছিল স্বর্ণ-নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার এক উপজাতক। সে লোহাও নিশ্চয়ই খুবই দুর্লভ ছিল। আকরিক থেকে যথেষ্ট পরিমাণে লোহা বিগলনের প্রথম ঘটনাটি সম্ভবত ককেশাসের দক্ষিণাঞ্চলের কোথাও ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে কিংবদন্তীখ্যাত ক্যালিবিস উপজাতি এই কার্য সমাধা করে। কিন্তু অন্যত্র যথোচিত পরিমাণে তৈরি না হওয়ায় অর্থনীতি ও প্রকৌশলের দিক থেকে লোহার গুরুত্ব ঠিক তখনই একেবারে চরম হয়ে ওঠেনি। অবশেষে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে সেই ঘটনাটি ঘটে। লোহা যেহেতু বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পাওয়া যায় এবং যেহেতু লোহার কাজ বেশ সুসাধ্য, তাই মিশর ও ব্যাবিলোনিয়ার প্রাচীন নদীমাতৃক সাম্রাজ্যভিত্তিক সভ্যতার একাধিপত্য তখন ঘুচল। আরো দুটি ঘটনা এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এক, তৃণভূমি অঞ্চল থেকে *অশ্বারোহীদের* আবির্ভাব; দুই, *জাহাজ* নির্মাণে ও জাহাজের কার্যকারিতায় অতিদ্রুত উন্নতি। তৃণভূমিতে বুনো ঘোড়াকে পোষ মানানো সম্ভব হয়েছিল, যার শক্তি গাধার চেয়ে অনেক বেশি। আর জাহাজের ঐ উন্নতিকে তো লৌহ-প্রযুক্তিরই এক উপজাতক বলা যেতে পারে।

লৌহ-সংক্রান্ত ধাতুবিদ্যা

প্রাচীনকাল কেন, একেবারে চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লোহা তৈরি করা হতো ছোটো ছোটো মাটির চুল্লি বা ভাটিতে। এই সব ভাটিতে লোহাপাথরের সঙ্গে কাঠকয়লা ভরে হাতে-টানা হাপর* দিয়ে হাওয়া দেওয়া হতো। সেই অল্প তাপে লোহাপাথর বিজারিত হয়ে থকথকে অগলিত বিশুদ্ধ লোহার তাল (bloom) বেরিয়ে আসত। এই তালকে পিটিয়ে পিটিয়ে অপেক্ষাকৃত নরম *পেটা* লোহার 'বার' তৈরি করা হতো। সেইসব পেটা লোহার বারকে আবার লাল করে তাতিয়ে, পিটে (forge), জোড়া লাগিয়ে (weld) নানারকম জটিল আকার দেওয়া হতো।

লোহা তৈরি করার এবং লোহার নানারকম জিনিস তৈরি করার পদ্ধতিকে ঢেলে সাজানোর প্রথম প্রয়াসের মূলে নিশ্চয়ই বহুদিনের কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতা সক্রিয় ছিল। লোহা-সংক্রান্ত এইসব প্রকৌশল তামা-সংক্রান্ত প্রকৌশল থেকে একেবারেই অন্যরকমের। সেইজন্যেই সম্ভবত লোহা-সংক্রান্ত ধাতুবিদ্যার উদ্ভব এত দেরিতে ঘটে। কিন্তু একবার চালু হয়ে যাওয়ার পর সে বিদ্যার প্রসার ঘটানোর জন্য এবং তা রপ্ত করার জন্য অতি সামান্য সরঞ্জামই ছিল যথেষ্ট। যেখানেই কাঠ আর লোহাপাথর পাওয়া যায় সেখানেই, অর্থাৎ প্রায় সর্বত্রই, লোহা বানানো সম্ভব—যদি তার কৌশলটা জানা থাকে।

কিন্তু সেই প্রাচীন কালে ধাতু হিসেবে লোহার একটা গুরুতর অসুবিধাও ছিল : চুল্লিতে যথোপযুক্ত হাওয়ার ঝাপট দেওয়ার কোনো প্রক্রিয়া জানা না থাকায় লোহাকে গলানো যেত না। কাজেই ঢালাইয়ের যাবতীয় কাজের জন্য ব্যবহার করা হতো ব্রন্‌জ। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল চীনদেশ। সেখানে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকেই লোহা ঢালাই করার কৌশল জানা ছিল। কিন্তু ইউরোপ সে বিদ্যা জানত না, কাজেই সেখানে লোহা ব্রন্‌জের স্থান নিলনা, বরং সাধারণ কার্যসাধনে ব্রন্‌জের সহযোগী হয়ে উঠল। বাস্তবিক, লৌহযুগে যে পরিমাণ ব্রন্‌জ তৈরি হতো, যে পরিমাণ ব্রন্‌জের কাজ হতো, খোদ ব্রন্‌জ যুগের চেয়ে তা অনেক বেশি। সেযুগে ভাটিতে বানানো যে লোহার তালকে তাতিয়ে লাল করে পেটানো হতো তা ছিল এক ধরনের পেটা লোহা কিংবা 'মৃদু ইস্পাত'। কড়া ধাতের হলেও তা ছিল অপেক্ষাকৃত নরম। এর চেয়ে অনেক কঠিন ও খাঁটি নানারকম ইস্পাতও তখন অজানা ছিল না—যথা ক্যালিবিস্-দের ক্যালিব্, ফেরাম অ্যাসেরাম, 'শার্প আয়রন', অ্যাসিয়ের প্রভৃতি। কিন্তু যেসব কর্মকার গোষ্ঠী এসবের নির্মাণপ্রক্রিয়া জানত, তারা মন্ত্রগুপ্তি বজায় রাখত। বিজ্ঞানজগৎ এসব প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে পারে 1720 সালে—রেওমূর-এর কাজের সূত্রে। মূল রহস্যটা ছিল লোহার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে কার্বন মিশিয়ে তারপর পান খাইয়ে তার কঠিনতা বৃদ্ধি করা। সে যুগে সর্বোত্তম ইস্পাত তৈরি হতো চীন আর ভারতবর্ষে। ভারতীয়দের তৈরি উৎজ নামক ইস্পাত বিদেশে চালান যেত, তা থেকেই দামাস্কাসের বিখ্যাত তলোয়ার তৈরি হতো।* উত্তম ইস্পাত সেকালে অতি দুর্লভ ও মহার্ঘ বস্তু ছিল, তাই সেই ইস্পাতের তৈরি তলোয়ারের জাদুশক্তি আছে বলে লোকে বিশ্বাস করত। পরবর্তীকালে রাজা আর্থারের 'এক্সক্যালিবার' বা সিগ্‌ফ্রীডের 'বাল্‌মুং' নামক তরবারি এর উদাহরণ। ব্রন্‌জের তুলনায় পান-খাওয়ানো ইস্পাত ছিল অতি দুর্লভ, তাই একমাত্র অস্ত্রনির্মাণ ছাড়া আর কোনো প্রকৌশলে সে ইস্পাতের তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। আঠারো শতকের পর ইস্পাত সেই গুরুত্ব অর্জন করে।

লৌহধাতুর প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটা ঘটনা ঘটে, তা হলো জন-প্রব্রজন। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তদশ শতক থেকেই পূর্ব ইউরোপ বা ক্যাস্পিয়ান অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক চলে আসতে থাকে পূর্ব ভূমধ্যসাগর এলাকায়। এরা মোটের ওপর সকলেই ছিল বর্বরীভূত উপজাতির মানুষ। এশিয়াতেও হিটাইট, শক, ইরানী এবং ভারতীয় আর্যরা অনুরূপভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

---

* দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি অঞ্চল, যেমন হায়দ্রাবাদের কোনাসমুদ্রম, মাদ্রাজের সালেম জেলা উৎকৃষ্ট ইস্পাত উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এইসব অঞ্চলে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে ইস্পাত প্রস্তুত হইত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড ও সেইসঙ্গে কিছু কাঠকয়লা মুষার [=মুচির] মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর একটি সবুজ পত্র চাপা দিয়া মুষার মুখ মৃত্তিকা দ্বারা বন্ধ করা হইত। এইভাবে প্রস্তুত 20 হইতে 24টি মুষা বাত্যা-চুল্লির মধ্যে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল রাখিলে মুষার মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট ইস্পাত তৈয়ারী হয়। হায়দ্রাবাদের স্থানীয় অধিবাসীরা এই ইস্পাতের নাম দিয়েছিল 'উৎজ' বা ভুৎজ (wootz)। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ও বিদেশে এই নামেই ভারতীয় ইস্পাত পরিচিত ছিল। —পৃ· 13, সমরেন্দ্রনাথ সেন, *বিজ্ঞানের ইতিহাস* দ্বিতীয় খণ্ড। — অনু·

অশ্বারোহীদের ও জলযান-পটু লোকেদের চলৎশক্তি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্রের সামনে প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলো সত্যিকারের কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বেশ বেগ পেল। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে এইসব প্রাচীন সভ্যতার অন্তর্গত জনগণ তাদের অপদার্থ এবং লুণ্ঠনলোলুপ শাসকদের বদলে বহিরাগত হানাদারদের সমর্থন করাই শ্রেয় বলে মনে করেছিল, আর সেটাই তাদের সামরিক ব্যর্থতার কারণ। তাছাড়া একবার থিতু হয়ে বসতি নির্মাণ করার পর লৌহযুগের মানুষ তখনো-পর্যন্ত অনাবাদী জমিতে সমৃদ্ধিশালী কৃষিসমাজ বা বাণিজ্যভিত্তিক জনসমাজ গড়ে তোলার কাজে নিজেদের যথেষ্ট পটু বলে প্রমাণ করে। সব মিলিয়ে প্রাচীনতর নদীমাতৃক সভ্যতাগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য খর্ব হয়—এতটাই খর্ব হয় যে তারা আর মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রধান প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিরাজ করতে পারল না। তাদের সাংস্কৃতিক, বস্তুগত এবং আত্মিক সম্পদের অনেক কিছুই অবশ্য গৃহীত ও সঞ্চারিত হলো, এমনকি সেসবের কিছু কিছু দলিলও সংরক্ষিত রইল।

এইসময় থেকে অগ্রগতির কেন্দ্রগুলো সরে গেল প্রাচীন সভ্যতাগুলির প্রত্যন্তদেশে। কাছাকাছি অঞ্চলের বর্বরজাতির লোকেরা সভ্যতার প্রাচীনতর কেন্দ্রগুলো আগেই দখল করে ফেলেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ বহুলাংশে ঐসব সভ্যতা থেকে স্বতন্ত্র পথে ঘটেছিল। এইবার কিন্তু মিশর আর ব্যাবিলোনিয়ার প্রাচীন সভ্যতাগুলির উত্তরাধিকার সরাসরি বর্তাল ভারতীয় আর্যদের ওপর, পারসিকদের ওপর, গ্রীকদের ওপর, পরে মাকিডোনীয় আর রোমানদের ওপর। ব্যতিক্রম ছিল চীন। বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, মরুভূমি আর পাহাড়-পর্বতে বেষ্টিত সে দেশে এককেটি অঞ্চলের সীমান্ত ছাড়িয়ে অন্যত্র কৃষিনির্ভর বর্বর রাষ্ট্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। যেসব যাযাবর বর্বর সম্প্রদায় বারবার চীনে প্রবেশ করেছে তারা চীনের প্রাচীন জীবনধারারই অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। মূলত ব্রন্‌জ-যুগীয় সেই জীবনধারা একেবারে এই যুগ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে, যদিও লৌহযুগের প্রকৌশল তাকে গভীরভাবে পরিবর্তিত করে দিয়েছে।

কুঠার ও লাঙল

লৌহযুগের গোড়ার দিকে যতই ধ্বংসকার্য আর যুদ্ধবিগ্রহ চলুক, সেসবের ফল শুধুই নেতিবাচক হয়নি। পুরোনোর জায়গায় নতুন জীবনধারার প্রচলন ঘটায় এতদিনকার নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ছেদ পড়ল তা যেমন ঠিক, তেমনি একথাও ঠিক যে বহুকাল-সঞ্চিত বিপুল সাংস্কৃতিক আবর্জনার রাশিও সেই নতুন জোয়ারে ভেসে গেল। ফলে পুরোনো ভিত্তির ওপরে নতুন এবং অনেক কার্যকর এক কাঠামো গড়ে তোলার সম্ভাবনা দেখা দিল। অশ্বারূঢ় যোদ্ধাদল আর জাহাজভর্তি দস্যুদল যদি সেই যুগের ধ্বংসক্রিয়ার প্রতীক হয়, তাহলে কুঠার-হাতে কাঠুরে আর লোহার ফালওয়ালা হলধর হলো তার সৃজনশীলতার প্রতীক। এর আগে প্রধানত নাগরিক বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের জন্য এবং অভিজাত ক্ষত্রিয়দের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীকে অস্ত্রসজ্জিত করার প্রয়োজনে ধাতুর ব্যবহার হতো। সাধারণ লোকের পক্ষে ব্রন্‌জের দাম ছিল অত্যন্ত চড়া, তারা তখনো প্রধানত পাথুরে প্রয়োগযন্ত্রই ব্যবহার করত—যার আকার সেই নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে অতি সামান্যই বদলেছিল। ব্রন্‌জের তুলনায় লোহা গোড়ার দিকে—এবং বহু শতাব্দী ধরেই—নিকৃষ্ট ছিল ঠিকই, কিন্তু লোহার সুবিধে ছিল এই তা সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রাপ্য; তা তৈরি করা ও তা নিয়ে কাজ করা গ্রামের স্থানীয় কর্মকারদের পক্ষে সুসাধ্যও ছিল। লোহা সহজলভ্য হওয়ার দরুন এককেটা আস্ত মহাদেশ কৃষিপ্রক্রিয়ার অধীনে চলে আসে। জঙ্গল কেটে সাফ করে, জলাজমি থেকে জল নিকাশ করে যেসব ক্ষেত পাওয়া গেল তাতে চাষ

আরম্ভ করে দেওয়া সম্ভব হলো। এই প্রক্রিয়ায়, একদা যে-ইউরোপ ছিল পশ্চাদপদ এক জঙ্গল-এলাকা, তা পরিণত হলো 'সোনালী পাশ্চাত্যে'—সোনার জন্যে নয়, সোনালী গমের জন্যে (ইউরোপ ভূখণ্ডের যা কিছু সোনা তা ব্রনজযুগের শেষেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল)। এইসব কারণে পশ্চিম ভূখণ্ডের জনসংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। ফলে পূর্বদেশের প্রাচীন নদী-সেচনির্ভর কৃষিসভ্যতা আর পাশ্চাত্যের শুষ্ক খামার-ভিত্তিক কৃষিকার্যের মধ্যে শক্তিসাম্য খুব দ্রুত বদলে যায়।

জাহাজ ও বাণিজ্য

মানবচিন্তায়, বিশেষত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, এই বিক্ষুব্ধ লৌহযুগের অপর একটি বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব অপরিসীম বলে প্রতিভাত হয়। সেটি হলো, সমুদ্রপথে সংস্কৃতির প্রসার। পুরোনো স্থলপথের তুলনায় সে প্রসার ঘটেছিল অনেক দ্রুত গতিতে। আরো বড়ো কথা এই যে সাগর-পরিবহনের খরচ স্থল-পরিবহনের চেয়ে বহুগুণে কম ছিল। লোহার তৈরি নির্মাণযন্ত্র হাতে থাকায় জাহাজ-নির্মাণ আগের তুলনায় অনেক সুসাধ্য হয়ে ওঠে। ফলে উন্নততর ও বৃহত্তর জাহাজ অনেক বেশি সংখ্যায় তৈরি করা সম্ভব হয়। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ব্রনজ যুগে জাহাজনির্মাণে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিল ক্রীটবাসীরা। পরে একের পর এক বহিরাগত আক্রমণে তাদের সাগর-সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। প্রথমে সে আক্রমণ চালায় স্থলভিত্তিক আধা-গ্রীক মাইসিনীয়ান্-রা, তারপর বলকান অঞ্চল থেকে আগত অপেক্ষাকৃত বর্বর আকীয়ান্-রা আর এশিয়া মাইনর থেকে আগত জ্ঞাতিসম্পর্কে আবদ্ধ বিভিন্ন উপজাতি। এইভাবে শুরু হয় দস্যুবৃত্তি আর নগরলুণ্ঠনের এক মহাপর্ব। ট্রয়ের অমর কাহিনী এমনই এক অভিযানের লিপিবদ্ধ রূপ। জলদস্যুতার ফলে বাণিজ্য চালাতে অসুবিধে যেমন হলো, তেমনি আবার বাণিজ্য আরো লাভজনকও হয়ে উঠল। খানিকটা এই কারণে, আর খানিকটা স্থানীয় মজবুত প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় প্রতিহত হয়ে অনেক জলদস্যু ক্রমশ বাণিজ্য, নূতন দেশে অভিযান ও উপনিবেশ স্থাপনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

ব্রনজ যুগে বাণিজ্যের ধারা থেবেস বা ব্যাবিলনের মতো গোটা বারো মহানগরকে ঘিরে প্রবাহিত হতো। কিন্তু লৌহযুগে সে ধারা বহুধাবিভক্ত হয়ে শত শত নতুন নগরে ছড়িয়ে পড়ল। ভূমধ্যসাগর আর কৃষ্ণসাগরের কূলে কূলে তখন লৌহযুগের মানুষ, বিশেষত ফিনিশীয় আর গ্রীকরা, নতুন নতুন নগর স্থাপন করে চলেছিল। সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোর পক্ষেই কেবল লৌহযুগীয় জীবনধারার পূর্ণ সুবিধাটি আদায় করা সম্ভব ছিল। সমুদ্র থেকে বহু দূরে অবস্থিত দেশসমূহে লৌহযুগীয় জীবনধারার দৌলতে কৃষিকার্যে ও সমরায়োজনে বৃহত্তর সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, সেকথা ঠিক; কিন্তু বিপুল পরিমাণ সামগ্রী নিয়ে বহু দূরে যাওয়ার সুযোগ না থাকায় এসব দেশ অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করতে পারেনি। এমনকি নদী-পরিবহনের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ব্রনজ যুগের সভ্যতাগুলি যে-অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করেছিল, এরা তা থেকেও পিছিয়ে ছিল। ফলে এসব দেশ থেকে আমূল নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। লৌহযুগের গোড়ার দিকের স্থলভিত্তিক দেশের এক আদর্শ উদাহরণ হলো আসীরিয়া। আসীরিয়রা প্রধানত সামরিক নির্মমতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় সংস্কৃতিকে তারা কয়েক শতাব্দী ধরে টিকিয়ে রেখেছিল; ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য অমূল্য সব জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের গণনাকেও তারা অটুট রেখেছিল; কিন্তু নিজেরা সেই ভাণ্ডারে প্রায় কিছুই যোগ করতে পারেনি।

প্রথমে পারসিক, পরে রোমানরা যেসব স্থলপথ নির্মাণ করে, সুবিধার দিক থেকে তা

সমুদ্রপথের পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারেনি। এইসব স্থলপথের প্রশাসনিক ও সামরিক গুরুত্ব যতটা ছিল, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ততটা ছিল না। পরে মধ্যযুগে যখন ঘোড়ায় জিন পরানোর কৌশল অর্জিত হয়, একমাত্র তখনই বিপুল পরিমাণ সামগ্রীর স্থল-পরিবহন অর্থনৈতিক বিচারে লাভজনক হয়ে ওঠে। এমনকি তখনো স্থলপথে খুব বেশি দূরে মাল নিয়ে যাওয়াটা খুব সুসাধ্য ছিল না। আরো পরে আঠারো শতকে যখন ভালো রাস্তা তৈরি হয় তখন সেকাজ সুসাধ্য হয়ে ওঠে। বস্তুত, জল-পরিবহনের এই সহজসাধ্যতার সুবাদেই প্রথমে ভূমধ্যসাগর অঞ্চল, পরে আঁকাবাঁকা তটরেখাঙ্কিত তামাম ইউরোপ, আফ্রিকা আর এশিয়ার তুলনায় এগিয়ে যায়।

চীনেও বহু নদী, খাল ও হ্রদের এক সমন্বিত ব্যবস্থা ছিল। তাই অনুরূপ সুবিধা তাদেরও ছিল। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে থাকা সত্ত্বেও গোটা চীনেই এক ধরনের পরিবর্ধিত ব্রনজ-যুগীয় আমলাতান্ত্রিক সরকারি ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। ফলে লৌহযুগের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের বহু সুফল থেকে তারা বঞ্চিত হয়।

2. লৌহযুগের নগর

রাজনীতি

লৌহযুগের প্রথম দিকে ব্রনজ যুগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক ইউনিটের মধ্যে জীবনযাপন করার প্রথা ফিরে আসে। আদি লৌহযুগের শহরগুলোর লোকসংখ্যা খুব বেশি হলে হতো কয়েক হাজার; আর ব্রনজ যুগের শহরগুলোতে কয়েক লক্ষ লোক বাস করত। দাসপ্রথার প্রসার ঘটার পর অবশ্য লৌহযুগে অনেক বড়ো বড়ো শহর গড়ে তোলা সম্ভব হয় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে। এথেন্সের সর্বাধিক জনসংখ্যা ছিল 3,20,000; তার মধ্যে মাত্র 1,72,000 জনের নাগরিক অধিকার ছিল। রোম যখন সমৃদ্ধির তুঙ্গে তখন তার জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ লাখের মতো। প্রথম দিকে গোটা বারো গ্রামের সমন্বয়ে একেকটা শহর গড়ে উঠত। তার অর্থ এ নয় যে সেই নব্য প্রস্তরযুগের পরিস্থিতি আবার ফিরে এল। বরং শহরগুলোর মুক্ত নাগরিকরা ব্রনজ যুগেরই সমতুল্য, এমনকি তার চেয়েও উন্নত জীবনমান উপভোগ করতেন। ব্রনজ যুগের নগরজীবনের একটি ছাড়া আর সব কৌশলই লৌহযুগের শহরগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে আয়ত্ত করেছিল। কেবল বহুবিস্তৃত বৃহদাকার কর্মসংগঠনের পদ্ধতিটি তারা রপ্ত করতে পারেনি। কারণ, প্রথম দিককার লৌহযুগের শহরগুলোর পরিধি ছিল ক্ষুদ্র; গড়, পোতাশ্রয় আর কখনো কখনো জলপ্রণালীর গণ্ডির মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ থাকত। তাছাড়া, এমন এক ধাতুর ব্যবহারে তারা অভ্যস্ত ছিল যার প্রয়োগে কৃষিকার্যে এবং দ্রব্যনির্মাণে প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। তাই বলে তাদের নিছক স্বয়ংপোষিত হয়ে ওঠার কোনো দরকার ছিল না, যেহেতু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসই হোক আর বিলাসসামগ্রীই হোক, সবকিছুই বাণিজ্যের মাধ্যমে বাইরে থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল। সম্ভব ছিল এই কারণে যে উৎপাদনের পদ্ধতিতে উন্নতি ঘটায় তখন বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে মাল তৈরি করা সম্ভব হচ্ছিল। বস্তুত, লৌহযুগেই প্রথম *পণ্যের উৎপাদন* অর্থনৈতিক তৎপরতার স্বাভাবিক, এমনকি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। লৌহযুগের আরেকটি নিজস্ব আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য হলো বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে পণ্য উৎপাদনের কাজে দাসেদের নিয়োগ। লৌহযুগের আগেও দাসেদের কাজে লাগানো হতো, কিন্তু সে কেবল সেবা আদায় করার জন্য। প্রথমে কৃষিকাজে এবং খনিতে, পরে পণ্যোৎপাদনে দাসেদের কাজে লাগানো হয় লৌহযুগে। দাসপ্রথার গুরুত্ব দিনে দিনে বাড়তে থাকে। অবশেষে একটা সময়ে তা শ্রমক্রিয়ার প্রধান রূপ হয়ে ওঠে। পরে লৌহযুগীয় জীবনধারার সার্বিক পতন

ঘটার মূলে এটা একটা প্রধান ঘটনা। সেই পতনের পরিণামেই পরিশেষে ক্রীতদাস আর দরিদ্র কিন্তু 'মুক্ত' মানুষ একাকার হয়ে গিয়ে ভূমিদাসে পরিণত হয়।

প্রায় উদ্ভবকাল থেকেই লৌহযুগের শহরগুলো পণ্যনির্মাণ ও বাণিজ্যের সুবিধাজনক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের মারফত তারা বাইরে থেকে কাঁচামাল, এমনকি শ্রমশক্তি (দাস) আমদানির কাজে সক্ষম ছিল।

এতসব সুবিধার পাশাপাশি ছিল যুদ্ধের বিপদ, যা অনেক বেড়ে উঠেছিল। সেটা স্বাভাবিক, কেননা যুদ্ধের মধ্যে থেকেই তো ঐ নূতন জীবনধারার উদ্ভব। চিরবৈরি শহরগুলোকে লুঠপাট করেই তো তার জন্ম। কাজেই সে অভ্যাস ঝেড়ে ফেলা খুবই কঠিন ছিল। ফলে প্রতিরক্ষার ওপরেই সবচেয়ে গুরুত্ব পড়ল। সেইজন্য শহরগুলো তৈরি করা হতো সবচেয়ে অসুবিধাজনক জায়গায়, যথা পাহাড়ের মাথায়, কিংবা দ্বীপে। এথেন্সের 'এক্রপলিস' (= শিখরনগরী) প্রথমটির এবং টায়ার (Tyre) দ্বিতীয়টির উদাহরণ। শহরের প্রতিটি নাগরিককে সৈন্য হতেই হতো। এতদসত্ত্বেও লৌহযুগের ছোটো ছোটো শহরগুলোর জীবনযাত্রা কিন্তু প্রাচীন নদী-উপত্যকায় অবস্থিত শহরগুলোর তুলনায় অনেক সবল এবং মুক্ত ছিল। নাগরিকদের কর্মৈষণাকে অনেক বেশি মদত দেওয়া হতো এখানে। সর্বজনীন স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁদের সংগঠিতভাবে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। প্রাচীনতর সমাজের মতো আর পূর্বনির্দিষ্ট এক স্তরবিন্যস্ত ছকের মধ্যে ধরাবাঁধা অবস্থানে আবদ্ধ থাকতে হতো না নাগরিকদের। এইভাবে লৌহযুগের নগরে *রাজনীতির* উদ্ভব ঘটে। শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে থেকেই একে একে *গোষ্ঠীতন্ত্র (oligarchy)*, *স্বৈরতন্ত্র (tyranny)* এবং *গণতন্ত্র (democracy)* প্রমুখ শাসনপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে।

টাকা ও ঋণ

লৌহযুগীয় সভ্যতার আরেকটি মস্ত সামাজিক কীর্তি হলো ধাতুমুদ্রার বা *টাকার* উদ্ভাবন। ঐ সভ্যতার প্রসার এবং তার অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা—এ দুটির মূলেই রয়েছে এই উদ্ভাবনা। প্রথমে লিডিয়াতে ছাপমারা রুপোর তাল রূপে, অতঃপর খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পরে মুদ্রা রূপে টাকার প্রচলন হয়। নির্দিষ্ট ওজনের ধাতুকে মুদ্রা হিসেবে প্রাচীনতর সাম্রাজ্যগুলোতে আগেই ব্যবহার করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে ব্যবহার ছিল নিয়মের ব্যত্যয় মাত্র; বস্তুবিনিময় বা বস্তুসামগ্রীর হিসেবে মূল্য প্রদানই ছিল প্রচলিত নিয়ম। টাকা জিনিসটা অচিরেই অন্য যাবতীয় মূল্যের মাপকাঠি হয়ে ওঠে। যাবতীয় প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্পর্ককে তা কেনাবেচার সম্পর্কে পরিণত করে। টাকার চরিত্র সর্বজনীন ও নৈর্ব্যক্তিক। সেই কারণেই টাকা থাকলে অধিকার জন্মায় কিন্তু দায় বর্তায়না। ফলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় ধনীদের হাতে। এছাড়া, পুরোনো কৌম সমাজে প্রকৃত সম্পদ বন্টনের যে প্রথা ছিল তাও টাকাব দাপটে বাতিল হয়ে যায়, ফলে গরিবরা একেবারেই নিঃসহায় হয়ে পড়ে। তাদের কাছে টাকা জিনিসটার তাৎপর্য ছিল শুধুই নেতিবাচক্। তাদের জীবন ছিল স্থায়ীরূপে *ঋণগ্রস্ত।* সভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই গরিবরা উৎপীড়িত হয়ে আসছে, একথা ঠিক। কিন্তু প্রাচীনতর সভ্যতাগুলোর উৎপীড়ন আর এই লৌহযুগীয় উৎপীড়নের ধরনের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ আছে। প্রাচীনতর কালের উৎপীড়ন ছিল আংশিক, তা একটু একটু করে বেড়ে উঠেছিল। যেহেতু সে অর্থনীতি সরাসরি কৌম সমাজের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছিল, তাই কৌম ঐতিহ্য তার যথেচ্ছাচারকে খানিকটা প্রশমিত করে রেখেছিল। সে অর্থনীতিতে কৃষকের কাজের ভার যেমন অনেক ছিল, তেমনি তার অধিকারও ছিল। কৃষকের জীবন যেমন জমির সঙ্গে বাঁধা ছিল, তেমনি জমির ওপর তার অধিকারও ছিল স্বীকৃত। তাকে

পারিশ্রমিক দেওয়া হতো বস্তুসামগ্রীর হিসেবে; বাণিজ্যিক লেনদেন আর ঋণ শহরবাসীদের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু লৌহযুগে জ্ঞাতিসমাজ-ভিত্তিক অর্থনীতি থেকে টাকাভিত্তিক অর্থনীতিতে উত্তরণ ঘটল আচম্বিতে। স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসা রীতিনীতি মাত্র কয়েক পুরুষের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল, টাকার শাসন যাবতীয় অধিকারকে বাতিল করার শক্তি অর্জন করল।

তবে, কৃষকের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি। পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠলে সে একটা দল তৈরি করে অন্য জায়গায় গিয়ে নতুন বসতি স্থাপন করবার ক্ষমতা রাখত। অনেক কৃষক যদি একসঙ্গে মনে করে যে পরিস্থিতিটা অসহনীয় তাহলে তারা বিদ্রোহ করারও ক্ষমতা রাখত। সেরকম বিদ্রোহের ঘটনা অবশ্যই ঘটত। যেহেতু লোহার তৈরি উপকরণের ব্যবহার সকলেই জানত, আর সকলেই ছিল সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, তাই এইসব বিদ্রোহ প্রায়শই সফল হতো। এইসব বিদ্রোহের আশঙ্কাই গোষ্ঠীতান্ত্রিক এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের কিছুটা সামলে রাখত।

বর্ণমালা ও সাহিত্য

বিজ্ঞানের উদ্ভবের ব্যাপারে লৌহযুগের একটি ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোর জটিল লিখনপদ্ধতি (চিত্রলিপি এবং কীলকাকার লিপি) জাত খুইয়ে ফিনিশীয়দের সাধারণ *বর্ণমালায়* পর্যবসিত হয়। এর ফলে স্বল্পব্যয়ে *সাক্ষরতা* অর্জন করা সহজ হয়ে গেল। সাক্ষরতা জিনিসটা ঠিক লোহারই মতো সর্বজনীন হয়ে উঠল। বাণিজ্য করতে গিয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোককে যখন একই বিষয়ে বার্তাবিনিময় করতে হলো, তখন বর্ণমালার উদ্ভব ঘটল। বর্ণগুলিও প্রতীক, কিন্তু তারা ধ্বনির প্রতীক। কাজেই যেকোনো ভাষাভাষী লোকের পক্ষেই তা ব্যবহার্য। শুধু তাই নয়, এই পদ্ধতিতে বুদ্ধিগ্রাহ্য বার্তাবিনিময়ের পাল্লা বহুগুণে প্রসারিত হয়ে গেল; প্রাচীনকালে এই বার্তাবিনিময় কেবল পুরোহিত আর কর্মকর্তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই ব্যাপক প্রসার ঘটার দরুন লিখন ব্যাপারটা আর সরকারি বা ব্যবসায়িক নথির মধ্যে আটকে রইল না; এবার কাব্য, ইতিহাস ও দর্শনের *সাহিত্য* রচিত হতে লাগল। বলা বাহুল্য, *মহাকাব্য* আর *বীরকাহিনীর* রূপে কাব্য এবং গদ্য-আখ্যান বর্ণমালার উদ্ভবের, এমনকি চিত্রলিপির উদ্ভবেরও, বহু আগে থেকেই রচিত হয়ে আসছিল। চারণকবি আর কথকদের মারফত যুগযুগ ধরে তারা পরিবাহিত হয়ে আসছিল। চীনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় , সাহিত্য রচনার জন্য বর্ণমালার অস্তিত্ব একান্ত অপরিহার্য নয়। তবে চীনে এক বিশেষ ধরনের আমলাতান্ত্রিক সামন্তশ্রেণী গড়ে উঠেছিল বলেই এ ঘটনাটা সম্ভব হয়েছিল। জ্ঞানচর্চার ওপর ঐ শ্রেণীর অধিকার ছিল নিরঙ্কুশ। সেই অধিকার প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে তারাই বহুলাংশে সে জ্ঞানকে বন্ধ্যা করে তোলে।

3. ফিনিশীয় এবং হিব্রুজাতি

লৌহযুগীয় সভ্যতার আবির্ভাব হওয়ায় যে নতুন পরিস্থিতির উদয় হলো, তার সুফলটি প্রথম লাভ করে সিরিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চলের ফিনিশীয়রা। তাদের কয়েকটা সুবিধা ছিল : মিশর ও আসিরিয়ার মতো দুই প্রাচীন সভ্যতার মধ্যবর্তী অঞ্চলে তারা বাস করত; তাছাড়া লেবানন থেকে প্রচুর উৎকৃষ্ট কাঠ পাওয়া যেত যা দিয়ে তারা জাহাজ বানাত। বাণিজ্যে, সাগর-পরিবহনের সুবিধা পূর্ণমাত্রায় আদায় করার ব্যাপারে এবং বর্ণমালার ব্যবহারে তারা ছিল অগ্রণী। তারাই বর্ণমালার উদ্ভাবন করে এবং যেখানেই যায় সেখানেই তাকে জনপ্রিয় করে

তোলে। অথচ তা সত্ত্বেও দেশ থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত উপনিবেশগুলোতেও (যথা কার্থেজ বা কাডিজ-এ) তাদের জীবনধারা ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য পরম্পরার বন্ধনে বাঁধা ছিল। ফলে নবনব পরিস্থিতির সঙ্গে সেই জীবনধারাকে খানিকটা খাপ খাইয়ে নেওয়া ছাড়া তারা বিশেষ নতুন কিছু অবদান রাখতে পারেনি। তবে এমন অনুমান করার যথেষ্ট সংগত কারণ রয়েছে যে যেটুকু অগ্রগতি তারা ঘটিয়েছিল, পরবর্তীকালে রোমানরা তাকে হয় বিনষ্ট নয় বিকৃত করে ফেলেছিল।

ইহুদিরা ফিনিশীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। ফিনিশীয়দেরই মতো তারা মিশরী ও ব্যাবিলোনীয় মিশ্র জীবনধারাতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইহুদিরা ফিনিশীয়দের তুলনায় এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মিশরী, হিটাইট, ফিলিস্তিনী এবং আসিরিয়, পরে পারসিক ও গ্রীক জাতিসমূহের মাঝখানে ছিল ইহুদিদের বাস। বৈদেশিক সাগরবাণিজ্যের সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। ফলে যেকোনো মুহূর্তে তাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হবার আশঙ্কা ছিল। সে-স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে গিয়ে অবশেষে তারা এক স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলে। তার জন্য তারা একটি বইয়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আইনকে অনুসরণ করে। সেই বইটিই হলো বাইবেল। তাছাড়া তাদের দেশ ছিল ছোটো এবং তুলনামূলক বিচারে দরিদ্র। সেইজন্য স্থানীয় রাজা বা গোষ্ঠীতান্ত্রিক শাসকদের কর্তৃত্ব তারা এড়াতে পেরেছিল, যদিও তার জন্য তাদের ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়েছিল। এইসব কারণবশত স্বাধীনতা, মুক্তি আর গণতন্ত্র ইহুদি ধর্মের মধ্যে একেবারে ওতপ্রোত হয়ে যায়। এইদিক থেকে ইহুদিরা ছিল প্রাচীন বিশ্বে একেবারে অনন্য। সভ্যতার পরবর্তী অগ্রগতির মূলে তাদের ধর্ম এবং তাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি বিপুল প্রভাব ফেলে।

বাইবেল : আইন ও ন্যায়পরতা

হিব্রু বাইবেল, যা কিনা আমাদের কাছে 'ওল্ড্ টেস্টামেন্ট' বলে পরিচিত, তাকে নিছক প্রাচীন ইতিহাস আর কিংবদন্তীর এক সংগ্রহ ভাবলে খুব ভুল হবে, যদিও অতীতকে বোঝবার জন্য সেই ইতিহাস আর কিংবদন্তীর মূল্য অসীম। হিব্রু বাইবেল প্রথম লেখা হয় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। সেই থেকেই ধর্মীয় ও জাতীয় সংহতি সাধনের এক কেন্দ্রীয় আহ্বানমঞ্চ হিসেবে তা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ বইয়ের একটি শিক্ষা আছে; এবং প্রচার আর কবিতায় এ বই পূর্ণ। প্রচার জিনিসটা নতুন কিছু নয়; যখন থেকে লিখনের আবিষ্কার হয়েছে তখন থেকেই প্রচার চলে আসছে। কিন্তু এর আগে সে প্রচার চালানো হতো হোমরাচোমড়াদের হয়ে, রাজা আর পুরোহিতদের হয়ে। বাইবেলের প্রচারের চরিত্র কিন্তু স্বতন্ত্র। তা জনমুখী—সে প্রচারে *আইন* আর *ন্যায়পরতার* ধারণার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে এই দুটি ধারণার মধ্যে কোনো অনন্যতা নেই, কারণ অন্যান্য জীবনচর্যায় অভ্যস্ত জাতিসমূহের মধ্যেও এই দুটি ধারণার প্রচলন ছিল। বাইবেলের অনন্যতা এইখানে যে আইন আর ন্যায়পরতার ধারণার মধ্যে তা মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিল। বাইবেলে যে-ন্যায়পরতার কথা বলা হয়েছে তা বহুলাংশে ধনবান আর শক্তিমানের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে এ- প্রতিবাদ। আজকের মতো সেকালেও ধনবান আর শক্তিমানেরা উৎপীড়নের জন্য বিদেশী ধরনধারণ রপ্ত করে নিত। এদের সংযত রাখার জন্য একই সঙ্গে অনেক কিছুর আশ্রয় নেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল—যথা আইন, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পাদিত এক পবিত্র চুক্তি এবং তদুপরি যথাকালে সংঘটিত গণবিদ্রোহ। আমরা যতদূর জানি, ইতিহাসে ইহুদিরাই প্রথম জাতি যারা একটা আদর্শের জন্য লড়াই করেছিল। 'ম্যাকাবী'দের যুদ্ধগুলি তাদের ধর্মোন্মাদনা ও জঙ্গী মনোভাবের পরিচায়ক। ইহুদিদের

গোটা ইতিহাসটাই হচ্ছে ঈশ্বরের নাম নিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের এক ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত। জনগণের বহু বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রেরণা ও মদত যুগিয়েছে বাইবেল—খ্রিস্টধর্মের ক্ষেত্রে সে প্রভাব পড়েছে সরাসরি, আর কোরান মারফৎ ইসলাম ধর্মে পড়েছে ঘুরপথে।

জেনিসিস

তবে বাইবেলের যে জিনিসটা বিজ্ঞানকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছে সেটা তার অন্য একটা দিক, এবং সেটার মধ্যে ইহুদিদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে কম পরিস্ফুট। বাইবেলের প্রথম দিককার কাণ্ডগুলো বিভিন্ন প্রাচীন ব্যাবিলোনীয়, এমনকি প্রাচীনতর সুমেরীয় সৃজন-কাহিনীর একেকটি ভাষ্য।

বিশ্বপৃথিবী এবং মানুষের উৎপত্তি কী করে হলো সেই রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস সেসব কাহিনীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সভ্যতার সেই ঊষাকালে, 3000 খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত এইসব কাহিনী মানুষের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। আদি হিব্রু উপজাতিগুলি এইসব কল্পকথাকে আত্মস্থ করে নেয়। অচিরেই এইসব কল্পকথার সহায়তায় প্রমাণ করা হয় যে ঈশ্বর তাঁর আশিসধন্য একটি বিশেষ জাতির সঙ্গে যে-পবিত্র চুক্তি সম্পাদন করেছেন তা মূলগতভাবেই ন্যায্য, তার সত্যতা প্রশ্নাতীত এবং সমালোচনাতীত। ইহুদি শাস্ত্রগ্রন্থাদির অঙ্গীভূত এইসব কল্পকথা পরম্পরাক্রমে আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়, এবং সেগুলি আক্ষরিক দৈব সত্য রূপে পরম বিশ্বাসভরে স্বীকৃত হয়।

ইহুদিদের এই ধর্মবিশ্বাস ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান যুগের পরেও যে টিকে গেল তার কারণ, সাধারণ মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষাই ছিল এই বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি। সে বিশ্বাস কেবল তার আদি রূপেই নয়, পরবর্তীকালে বহুলাংশে সেই আদি রূপ থেকেই আহরিত খ্রিস্টধর্মের মধ্যেও বজায় রইল। এই গণভিত্তি থাকার দরুন পরবর্তী দুঃসময়ের চাপ তা অনেকটাই সামলে উঠতে পেরেছিল। পক্ষান্তরে, অনেক বেশি যুক্তিসহ (যদিও সর্বদা অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত নয়) হওয়া সত্ত্বেও গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারা সে চাপ সহ্য করতে পারেনি। কারণ সাধারণ মানুষ মনে করত—সঠিকভাবেই মনে করত—সে চিন্তাধারা হচ্ছে উচ্চবর্গের শ্রেণীশাসনকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করার এক সুবিস্তারিত প্রয়াস। প্রাচীন সভ্যতাগুলির ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন যেসব সভ্যতা গড়ে ওঠে, ধর্মই ছিল তাদের মূল সংগঠক উপাদান। ফলে ধর্মবিশ্বাস আর নীতিবোধের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বৈজ্ঞানিক ব্যাপারেও বাইবেল আর কোরানের কর্তৃত্বই হয়ে উঠল পরম। পরে আমরা দেখতে পাব, আদি মানবের কল্পকথাসমূহের এইসব প্রস্তরীভূত পুরাবশেষের পাষাণভার থেকে মানবচিন্তাকে মুক্ত করবার জন্য কত কষ্ট করতে হয়েছে এবং করেও সর্বদা ফল পাওয়া যায়নি।

4. গ্রীক সভ্যতা

লৌহযুগের নবোদ্ভূত পরিস্থিতিকে সবচেয়ে সার্থকভাবে কাজে লাগায় গ্রীকরা। তাদের সুবিধে ছিল এই যে একদিকে যেমন তারা প্রাচীনতর সভ্যতাগুলোর রক্ষণশীল প্রভাবের আওতা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে বাস করত, তেমনি আবার ঐসব সভ্যতার ঐতিহ্যকেই ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতেও সমর্থ ছিল। অপরদিকে দারিদ্র্য, দূরত্ব এবং নৌশক্তি—এই তিনটি কারণ প্রাথমিক গঠনশীল পর্বে তাদের সহায়ক হয়েছিল। কেননা ঐ তিনটি কারণেই তারা প্রাচীনতর সাম্রাজ্যগুলির বহুগুণে অসংস্কৃত কিন্তু জঙ্গী উত্তরাধিকারীদের (যথা মিড ও পারসিক জাতির) স্থল-আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল।

ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সচেতন ও নিরবচ্ছিন্ন সূত্রটি আমাদের কাছে গ্রীকদের মারফত পরিবাহিত হয়েছে, একথা সত্য। এ ঘটনাটা অবশ্যই আকস্মিক, কিন্তু পুরোপুরি আকস্মিক নয়। মিশর আর ব্যাবিলোনিয়ার সুপ্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোতে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে বিধ্বংসী যুদ্ধবিগ্রহ চলায় বিদ্যাচর্চায় ভাঁটা পড়ে। কিন্তু তারপরেও জ্ঞানবিজ্ঞানের যেটুকু টিকে ছিল তার প্রধান ভাগটির উত্তরাধিকার গ্রহণ করবার ক্ষমতা সেসময় একমাত্র গ্রীকদেরই ছিল। প্রায় অজ্ঞান্তেই, প্রায় কোনো স্বীকৃতি ব্যতিরেকেই, তারা সে উত্তরাধিকার গ্রহণ করে। তবে কেবল গ্রহণ করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। নিবিড় আগ্রহ এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহকারে তারা আহরিত সেই জ্ঞানসম্ভারকে সরলতর, বিমূর্ততর এবং অনেক বেশি বুদ্ধিগ্রাহ্য এক রূপ দান করে। গ্রীকদের সেই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত জ্ঞানের ধারাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে আসছে। কখনো কখনো সে ধারা হয়তো হারিয়ে গেছে, কিন্তু আবার তাকে যথাকালে খুঁজে পাওয়া গেছে, কাজে লাগানো গেছে। এমনকি প্রাচীনতর সভ্যতাগুলোর জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাবও আমাদের কাছে গ্রীকদের মাধ্যমেই এসে পৌঁছেছে। প্রাচীন মিশরী বা ব্যাবিলোনীয়দের নিজস্ব লেখাপত্রের মাধ্যমে তাদের মননকীর্তি সম্বন্ধে আজ হয়তো আমরা অনেক কিছু জেনেছি, কিন্তু তার প্রভাব আমাদের সভ্যতার ওপর প্রত্যক্ষভাবে পড়ার সময় অনেকদিন পার হয়ে গেছে।

ধ্রুপদী সংস্কৃতি

গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে এক ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। যে জ্ঞান আগেই সঞ্চিত হয়েছিল, ঐ সংস্কৃতি তাকে যথোপযুক্তরূপে পরিপাক তো করলই, উপরন্তু সে জ্ঞানের ভান্ডারে আরো অনেক কিছু যোগ করল। এরই সম্মিলিত পরিণতিকে আমরা আজ বলি ধ্রুপদী (classical) সংস্কৃতি। আলেকজান্ড্রিয়া আর রোম সে সংস্কৃতির প্রসার ঘটায় ঠিকই, কিন্তু গুরুতর কোনো সংপরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। ঐ সংস্কৃতিই আধুনিক বিশ্ব সংস্কৃতির মূল ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে ওঠে। বহু বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ে তা গড়ে উঠেছিল। গ্রীকরা যেসব দেশ অধিকার করেছিল, যেসব দেশের সঙ্গে সংস্পর্শে এসেছিল, সেসব দেশের সংস্কৃতির প্রত্যেকটি উপাদানকে কাজে লাগিয়েছিল। তাই বলে ধ্রুপদী সংস্কৃতিকে নিছক ঐসব সংস্কৃতির প্রসারণ ভাবলে ভুল হবে। তা ছিল একেবারেই নতুন একটা কিছু। ধ্রুপদী সংস্কৃতির একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু নিছক শিল্পসাহিত্যগত নয়। কেননা, ধ্রুপদী যুগের আগে এবং পরে আরো অনেক সভ্যতার উদয় হয়েছে, তাদের অনেকেরই শিল্পসাহিত্য ধ্রুপদী শিল্পসাহিত্যের মতোই বিশিষ্ট। ধ্রুপদী সংস্কৃতির মহৎ অবদান হলো একদিকে তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি, বিশেষত গণতন্ত্র; অন্যদিকে প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞান, বিশেষত গণিত আর জ্যোতির্বিজ্ঞান।

বিমূর্ত বিজ্ঞানের জন্ম

গ্রীক চিন্তা ও সক্রিয়তার অনন্য চরিত্রটি গ্রীক জীবনধারার একটি বিশেষ দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এটি হলো আমাদের পূর্বকথিত সেই 'বৈজ্ঞানিক মার্গ'। কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অনুশীলনের কথা আমি বলছিনা, বলছি আবেগাত্মক ও ঐতিহ্যসম্মত বচনের মধ্যে থেকে তথ্যভিত্তিক ও যাচাইসাধ্য অংশটিকে আলাদা করে নেবার একটি বিশেষ ক্ষমতার কথা। এই বিশেষ মার্গটির দুটি দিক আমাদের নজরে পড়ে: এক, বুদ্ধিগ্রাহ্যতা এবং দুই, বাস্তবানুগত্য। অর্থাৎ যুক্তি সহযোগে বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার এবং সর্বজনীন অভিজ্ঞতার নিরিখে সত্য যাচাই করার ক্ষমতা।

গ্রীকরা যে খণ্ডিত আকারে হলেও এতদূর সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল, তার মূলে ছিল একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি—যা তাদের জীবনধারাকে ঐ নির্দিষ্ট রূপ দান করেছিল।

গ্রীকরা সভ্যতা 'নির্মাণ' করেনি, এমনকি উত্তরাধিকারসূত্রে 'লাভ'ও করেনি—তারা সভ্যতা 'আবিষ্কার' করেছিল। এর ফলে তাদের একটা মস্ত লাভ হয়েছিল: সভ্যতা তাদের কাছে নিছক পড়ে-পাওয়া কোনো জিনিস ছিলনা, ছিল সম্পূর্ণ অভিনব এবং রোমাঞ্চকর একটা কিছু। গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের আদি জীবনধারা ছিল সরল ইউরোপীয় কৃষিসমাজেরই মতো। কিন্তু যেসব দেশে তারা ঢুকে পড়ে তাদের জীবনধারা ছিল অনেক জটিল। গ্রীকদের সরল জীবনধারা সেই জটিলতার ধাক্কায় ভেঙে পড়ে। ক্রীট ও আনাতোলিয়ার অতিশয় সমৃদ্ধ এবং রহস্যাবৃত জীবনধারা থেকে ধ্রুপদী গ্রীক সংস্কৃতি অনেক কিছুই আহরণ করে। অন্তে '-ইসস্' এবং '-ইন্থস্' যুক্ত গ্রীক শব্দগুলি সবই ক্রীট-উৎস থেকে আহরিত বলে অনুমিত। তার মধ্যে কোনো কোনোটা আজও ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত, যেমন narcissus (নার্সিসস্) এবং hyacinth (হায়াসিন্থ্)। মেসোপটেমিয়া এবং মিশর প্রমুখ সভ্যতার আদি কেন্দ্রগুলিতেও গ্রীক সভ্যতার প্রভাব পড়ে, কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

গ্রীকরা তাদের আদি জীবনধারাটি হারিয়ে ফেলল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে অন্যান্য দেশের জীবনচর্যাকে পুরোপুরি গ্রহণ করল না—সেটা সম্ভবও ছিল না। তার বদলে তারা বিদেশী জীবনধারার মধ্যে থেকে নিজেদের পক্ষে সুবিধাজনক অংশগুলো বেছে নিল। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বেছে নিল যাবতীয় দরকারী প্রকৌশল, আর ভাবজগৎ থেকে মূলত বেছে নিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়া সংক্রান্ত নানাবিধ ব্যাখ্যা। লৌহযুগে যখন প্রাচীন সভ্যতার ওপর আক্রমণ হানা হচ্ছিল সেই অবক্ষয়ী পর্বে, এমনকি তার আগে থেকেই, ব্রহ্মাণ্ড-বিষয়ক ঐসব ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে ধর্মতত্ত্ব আর কুসংস্কারের অত্যন্ত জটিল সব গোলকধাঁধা তৈরি হয়ে উঠেছিল। গ্রীকরা ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাখ্যা গ্রহণ করল, কিন্তু ঐ সব গোলকধাঁধা বর্জন করল। গ্রীক কবিদের মধ্যে যিনি প্রথমতম এবং মহত্তম সেই হোমার তাঁর রচনায় যে অক্ষয় চিত্র এঁকে গিয়েছেন তা থেকে আমরা বুঝতে পারি গ্রীকরা কোন জগতের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। 'ইলিয়াড' আর 'ওডিসি' মহাকাব্যে দেখি, নবাগত গ্রীক জ্ঞাতিসমাজগুলোর সরল কৃষকজীবনের সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতাগুলোর বিচিত্রজটিল সুখসমৃদ্ধ জীবনযাত্রার প্রভেদ কী বিপুল। সেই সব প্রাচীন সভ্যতাকে আবিষ্কার করে গ্রীকরা, ক'রে ধ্বংস করে। হোমারের কাব্য ছিল গ্রীকদের বেদ। দেবদেবী, মানুষ, এবং শান্তির ও যুদ্ধের কৌশল সংক্রান্ত বিশ্বাসের সর্বজনীন ভিত্তি রচনা করে তাঁর কাব্য। গড়পড়তা মানুষের যেটুকু বিজ্ঞান জানলে চলে, সেটুকু বিজ্ঞান তাঁর রচনায় ছিল।

গ্রীক নগরগুলির অর্থনৈতিক ভিত্তি

পশ্চিম ভূখণ্ডের অধিকাংশ দেশের মতো গ্রীসেরও জীবনধারার অর্থনৈতিক ভিত্তিটা প্রাচীনতর নদী-সেচ-নির্ভর দেশগুলোর জীবনধারা থেকে নিতান্ত অন্যরকম ছিল। স্বভাবতই, এই দুধরনের জীবনযাত্রার অনেক কিছুই ছিল পরস্পরের সঙ্গে বেমানান। গ্রীক জীবন বহুলাংশে অনুন্নত এক ধরনের শুষ্ক কৃষিপ্রথার ওপর নির্ভরশীল ছিল। ছোটো ছোটো ক্ষেতে চাষ হতো। দ্রাক্ষাকুঞ্জ, জলপাইবন আর মৎস্যচাষের সহায়তায় তাদের একরকম করে চলে যেত। প্রাচীন গ্রীসের আদিপর্বের কবি হেসিয়ড এই জীবনযাত্রার কষ্টসাধ্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তাঁর বাবার জমি ছিল বোয়েশিয়া-র অ্যাস্ক্রা-তে। সেখানকার জীবনযাত্রা সম্পর্কে কবি লিখেছেন : 'শীতকালে কনকনে, গ্রীষ্মেতে গনগনে, ভালো নয় কখনোই।' ঋণ-নির্ভর হওয়ায় লৌহযুগের অর্থনীতিতে মাঝে মাঝেই সংকট দেখা দিত। তা সত্ত্বেও কিন্তু সে অর্থনীতি মূলত স্থিতিশীল ছিল; সেই স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয় দাসপ্রথার ব্যাপক প্রচলনের পরে। সুপ্রসারিত বৈদেশিক

বাণিজ্য সে অর্থনীতির ঘাটতি পূরণ ক'রে সামঞ্জস্য বিধান করত। পূর্বতন সভ্যতাগুলির বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানত মন্দির আর প্রাসাদের জন্য বিলাসদ্রব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। লৌহযুগে কিন্তু সাধারণ নাগরিকের প্রয়োজনার্থে বিপুল পরিমাণ পণ্যদ্রব্য নিয়ে বাণিজ্য হতে লাগল।

অ্যাটিকা ছিল গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সেখানে উত্তম শস্যোৎপাদী জমির এমনই অভাব ছিল যে মৃৎপাত্র, জলপাই তেল আর রুপো রপ্তানী ক'রে তার বিনিময়ে এথেন্স শহরের অধিবাসীদের উদরপূর্তির ব্যবস্থা করতে হতো। এথেন্সের লোকসংখ্যা তখন তিন লক্ষ—যা তখনকার বিচারে বিপুল। সেকালে গ্রীকরা তাদের স্থানীয় সম্পদকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিল। তার জন্য যে একমুখিতা ও একাগ্রতা প্রয়োজন তা কেবল একটা সুসংবদ্ধ শহরের মধ্যেই অর্জন করা সম্ভব। এ অবস্থায় অর্থনীতি ও রাজনীতিতে অনেকসময়েই আচম্বিতে পরিবর্তন দেখা দিত। কখনো কখনো সে পরিবর্তন আসত হিংসার মাধ্যমে। ফলে এতদিনকার ঐতিহ্য একেবারে বিনষ্ট না হলেও ক্রমশ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। নাগরিকদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বেশি উদ্যোগী তাঁরা নিজেদের মতো ভাবনাচিন্তা করতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে উৎসাহিত হলেন। শুধু উৎসাহ নয়, বাস্তবে সে কাজ করবার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল। এই কাজে তাঁদের সাফল্যের অনুপাতে সমাজে তাঁদের মানমর্যাদা বাড়ত। সমাজের ওপর তখন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর বা রাষ্ট্রের কোনো প্রতিবন্ধকই আর ছিল না। প্রতিষ্ঠান আর ঠাকুরদেবতার গুরুত্ব কমে গিয়ে আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয় মানুষের ওপর।

শিল্পকলা ও ডায়ালেক্‌টিক

চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে, নাটকে ও বিজ্ঞানে মানুষকে বাস্তবসম্মতরূপে উপস্থাপিত করে গ্রীকরা। গ্রীক সভ্যতার এইটিই ছিল সবচেয়ে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্য। গ্রীকদের আঁকা দেওয়ালচিত্রগুলো সবই ধ্বংস হয়ে গেছে; কিন্তু তাদের তৈরি মূর্তি আর পাত্রের গায়ে আঁকা চিত্র থেকে বোঝা যায় নগ্ন মনুষ্যদেহের প্রতি তাদের আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। এ ব্যাপারটার সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি বলে এটাকে আর অদ্ভুত বলে মনে হয় না। এর আদি উৎস নিহিত ছিল আচারবিধি হিসেবে পালনীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের মধ্যে এবং তারই মধ্যে থেকে উদ্ভূত শারীরক্রীড়া চর্চার মধ্যে। মিশরীরা সরাসরি জাদুঘটিত উদ্দেশ্যে মূর্তি তৈরি করত—যাতে সে মূর্তির মধ্যে মৃত ব্যক্তির আত্মা ('কা') নতুন করে অধিষ্ঠিত হয়। সে মূর্তি বাস্তবসংগত না হলে সেই জাদুঘটিত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে বলে তারা মনে করত। কিন্তু গ্রীক ভাস্কররা ছিলেন অনেক পরিশীলিত। তাঁরা মানবদেহের গঠনসুষমার এক পরম আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে চাইতেন। গ্রীক সংস্কৃতিতে ক্রীড়াবিদ, শিল্পী আর ডাক্তাররা হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতেন। এর নানাবিধ ফলের মধ্যে একটি ছিল এই যে ডাক্তাররা রোগ অপেক্ষা সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতেন।

শিল্পের এই বাস্তবানুগত্যের সঙ্গী ছিল বাক্যের যুক্তিগ্রাহ্যতা। প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুমোদন যেহেতু ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, তাই প্রত্যেকটি ব্যাপারকেই তখন বিচারবিবেচনা ক'রে যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হতো। গ্রীক দর্শন আর গ্রীক বিজ্ঞানের (এ দুটিকে সেকালে আলাদা করে দেখা হতো না) ইতিহাস সেই যুক্তিধারারই আনুপূর্বিক ইতিহাস। পূর্বপক্ষ আর উত্তরপক্ষের মধ্যে চাপানউতোরের ভিতর দিয়ে তাদের বিতর্ক অগ্রসর হতো। এই বিশেষ বিতর্ক-পদ্ধতিকে গ্রীকরা বলত *ডায়ালেক্‌টিক*। গ্রীক জীবনযাত্রার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলিও তাদের যুক্তি প্রয়োগের এই ক্ষমতাকে শানিয়ে তুলেছিল। সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজধানী অপেক্ষা ছোটো ছোটো নগর-রাষ্ট্রের পরিস্থিতি সাধারণ নাগরিকদের *স্বতন্ত্র ব্যক্তি* হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠার পক্ষে

অনেক বেশি অনুকূল ছিল। শহরের তীব্রমথিত বাজনৈতিক জীবন তাঁদের যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় বাড়িয়ে তুলবার উপযোগী ছিল। বস্তুত, সে ক্ষমতা না বাড়িয়ে উপায় ছিল না। কেননা, বাণিজ্যচুক্তি আর মামলা ছিল শহরের রাজনৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। সেসব মামলায় প্রতিটি পক্ষকে তার নিজের হয়ে ওকালতি করতে হতো। বিচারক ঠিক করা হতো লটারির ভিত্তিতে। বাক্যবিন্যাসেব কারুকৃতির ওপর এইভাবে গুরুত্ব আরোপিত হওয়ার দরুন মহৎ সাহিত্য ও বাগ্মিতাশক্তির বিকাশ যেমন ঘটে, তেমনি আবাব এরই ফলে চিন্তার সঙ্গে বস্তুনিরীক্ষা ও বস্তুব্যবহারেব বিচ্ছেদ ঘটে।

প্রকৌশলের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিচ্ছেদ

গ্রীক বিজ্ঞানের চরিত্রটি পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলির তুলনায় একেবারেই আলাদা ছিল। গ্রীক বিজ্ঞান ছিল অনেক বেশি যুক্তিশাসিত ও *বিমূর্ত।* অথচ প্রকৌশলগত ভাবনাচিন্তাব সঙ্গে সে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ঠিক আগেরই মতো, এমনকি হয়তো তার চেয়েও বেশি, সুদূর হয়ে রইল। সাধারণত একটা সর্বজনীন মূল সূত্রের ভিত্তিতে একটি যুক্তিসম্মত আলোচনা পেশ করাই ছিল তাদের রীতি। কিন্তু প্রাচীনতর মিশরী বা মেসোপটেমীয় রচনায় দেখি, প্রকৌশল বা প্রশাসনের কোনো বিশেষ সমস্যা থেকে উদাহরণ চয়ন ক'রে একটি আলোচনা পেশ করা হতো। গ্রীকরা এ রীতি বর্জন করে। গণিত, বিশেষত জ্যামিতিকে তারা সবিশেষ গুরুত্ব দিত। এবং এইসব ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ও প্রমাণ করার পদ্ধতিসমূহ আজও আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু এইসব পদ্ধতির সুবিপুল মর্যাদার আলোকচ্ছটায় একটা সত্য অনায়াসেই চাপা পড়ে যায় যে বিশ্বপ্রকৃতির এক অতিশয় ক্ষুদ্র অংশের প্রতিই এগুলি প্রযোজ্য। এবং সেই অংশেরও কেবল সেইটুকু ক্ষেত্রেই তারা প্রযোজ্য যেখানে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাব প্রাথমিক কাজটুকু সম্পন্ন হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যুক্তিগ্রাহ্য; একটা মূল সূত্র থেকে শুরু করে বিশুদ্ধ যুক্তির প্রয়োগে তার খুঁটিনাটি সবকিছু সম্বন্ধেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে গ্রীক বিজ্ঞানের আদিলগ্নে এই বিশ্বাস মানুষের কুসংস্কারের শৃঙ্খল মোচনের কাজে লেগেছিল। কিন্তু পরে, বিশেষত অ্যারিস্টটলের কর্তৃত্ব অবিসংবাদী হয়ে ওঠার পরে, এই বস্তুবিচ্ছিন্ন এবং *পূর্বানুমানসিদ্ধ (a priori)* যুক্তিপ্রয়োগের মনোভাব বিজ্ঞানের সর্বনাশ ডেকে আনে। এই চিন্তাধারার প্রভাবে বহু পুরুষ ধবে বহু বুদ্ধিমান লোক ধরে নিয়েছিলেন যে তাঁরা এমন সব সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন যা নিয়ে তাঁরা আসলে অনুসন্ধানও আরম্ভ করেন নি। অথচ এই পরিণতি আদৌ অ্যারিস্টটলের অভিপ্রেত ছিল না, কারণ তিনি গবেষণাকেই প্রণোদিত করতে চেয়েছিলেন।

লৌহযুগের গোড়ার দিকে, বিশেষত অ্যালেকজান্দ্রাবেব অভ্যুদয়ের আগের যুগে, যেসব প্রকৌশলগত উন্নতি ঘটে, প্রয়োগের দিক থেকে সেগুলো নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ব্রনজ় যুগের মতো তাদের একেবারে মূলগত উদ্ভাবন বলা চলে না। লোহার ব্যবহারের প্রত্যক্ষ সুফল হিসেবে কুঠার বা হাতুড়ির মতো হাতলওয়ালা নির্মাণযন্ত্র কিংবা *কোদালের* মতো প্রয়োগযন্ত্র বানানো সম্ভব হয়ে উঠল। ব্রনজ দিয়ে কোদাল বানাতে হলে এত খরচ পড়ত যে তা কোনো কাজে লাগত না। লোহা ব্যবহারের পরিণতিতেই *কব্জা* বানানোও সম্ভব হয়ে ওঠে, যার সাহায্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণযন্ত্র তৈরি হয়—চিমটে আর আঁকার কম্পাস। লোহার বারকে সহজেই বাঁকিয়ে নিয়ে 'লুপ' তৈরি করা যায় এবং তারপর ওয়েল্ড্ করে নিয়ে হাতল বা কীলক ঢোকানোর উপযোগী গর্ত করে নেওয়া যায়। এরই দরুন ঐসব যন্ত্র বানানো সুসাধ্য হয়ে ওঠে। লৌহযুগের বৈপ্লবিক প্রকৌশল-অগ্রগতির মূলে যতটা না ছিল নির্মাণযন্ত্রের উন্নতিসাধন, তার

চেয়ে বেশি ছিল নির্মাণযন্ত্রের সহজলভ্যতা। পরে যখন গ্রীক গণিতের সঙ্গে মিশরী বা সিরিয় প্রকৌশলের মেলবন্ধন ঘটে, তখনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতিগুলো সাধিত হয়। ঘূর্ণ্যগতির নানাবিধ প্রয়োগ ঘটে, জাঁতাকল বা পেষণযন্ত্র (mill) আর চাপযন্ত্র (press), কপিকল আর উইন্ডল্যাসের* পাশাপাশি জলচাপ-চালিত (hydraulic) এবং বায়ুচাপ-চালিত (pneumatic) নানাবিধ যান্ত্রিক কৌশলের, জলোত্তোলন-যন্ত্রের এবং পাম্পের প্রবর্তন হয়। এসব নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

রসায়নিক উদ্ভাবনগুলোর মধ্যে এ যুগে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো ফুৎকারের সাহায্যে কাচকে নির্দিষ্ট আকারদানের কৌশল। এ কৌশল প্রথমে মিশরে উদ্ভাবিত হয়। বহুকাল ধরে অবশ্য এ-কে বিলাসসামগ্রী বলে গণ্য করা হতো। গুটিকতক নতুন কৌশলের প্রবর্তন এবং বহুবিধ উন্নতি ঘটার দরুন গ্রীকদের প্রকৌশল, বিশেষ করে ধাতু-ঘটিত প্রকৌশল, ষষ্ঠ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে এমন এক স্তরে উন্নীত হয় যা ব্রনজ় যুগের সর্বোচ্চ মানকে বহুদূরে অতিক্রম করে যায়। বর্মাবৃত গ্রীক সৈন্যরা যে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে বিপুল সংখ্যক এশীয় সৈন্যদের কাবু করে রাখতে পেরেছিল, এটি তার অন্যতম কারণ।

কিন্তু ব্রনজ় যুগের গোড়ায় প্রকৌশলগত উন্নতি যেভাবে বিদ্বজ্জনকে প্রভাবিত করেছিল, লৌহযুগে তা করেনি। তার একটা কারণ এই যে লৌহযুগে মূলত প্রচলিত প্রকৌশলের উন্নতিসাধনের মাধ্যমেই অগ্রগতি ঘটে, আমূল নতুন উদ্ভাবন কমই হয়েছিল। ফলে কল্পনাশক্তিকে তা তেমনভাবে উদ্দীপিত করতে পারেনি। তাছাড়া, নতুন নতুন সহায়ক বৈজ্ঞানিক প্রকৌশল গড়ে তোলার তাগিদও তা সৃষ্টি করেনি। যেটুকু পাটীগণিত আর জ্যামিতি জানা ছিল তা-ই যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছিল। তবে এর সবথেকে বড়ো কারণটা এই যে কারিগরকে তখনো নিচু চোখে দেখা হতো। হস্তকর্মীকে মস্তিষ্ককর্মীর তুলনায় কিংবা ভাবুকের তুলনায় নিকৃষ্ট মানুষ বলে গণ্য করা হতো (আজও ব্রিটেনে শল্যচিকিৎসককে 'ডক্টর' না বলে 'মিস্টার' বলা হয়)। ধারণা হিসেবে এটা নতুন কিছু নয়, প্রাচীন সভ্যতা থেকেই এ-কে আহরণ করা হয়েছিল। কিন্তু দাসত্বপ্রথার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দরুন এ-ধারণা সবিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে, বিশেষ করে গ্রীক সমাজের পরবর্তী অধ্যায়ে। অ-ক্রীতদাস স্বাধীন লোকেরাও নানারকম কারিগরী কাজ করত, এবং দাসেদের সঙ্গে তুলনা ক'রে তাদের বলা হতো হীন বা দাসসুলভ।

একইভাবে, মেয়েদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদাকেও অনেক নামিয়ে দিল এই দাসপ্রথাভিত্তিক সমাজ। বস্তুত, প্রাচীনতর সভ্যতাগুলোর তুলনায় গ্রীক নাগরিকদের স্ত্রী ও কন্যাদের স্থান ছিল অনেক নিচু। কোনো প্রকাশ্য সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। বাড়ির ঝি-র সঙ্গে তাদের পার্থক্য ছিল সামান্যই। ঘর-গেরস্থালির কোনোরকম কাজ নিয়ে মাথা ঘামানোটা দার্শনিকদের পক্ষে অবমাননাকর বলে গণ্য হতো। মনে রাখতে হবে, সেকালের ঘর-গেরস্থালির কাজে কিন্তু আজকের তুলনায় অনেক বেশি কর্মকুশলতার প্রয়োজন হতো; বোনা, সাধারণ টোটকা তৈরি ইত্যাদি কাজ করতে হতো। প্রকৃতি কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে ধারণা গঠন করার জন্য দার্শনিকরা কারিগরদের কাজের সাহায্য নিতেন, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেসব কাজের ব্যাপারে তাঁদের কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান গড়ে উঠত না বললেই চলে, সেসবের উন্নতিসাধনের জন্যও তাঁদের ডাক পড়ত না। ফলে হাতেকলমে কাজ করলে যেসব মূল্যবান সমস্যা ও ইঙ্গিতের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে, এসব থেকে তাঁরা বঞ্চিত

* windlass-ভারি জিনিস টেনে নিয়ে যাবার বা ওপরে তোলবার অনুভূমিক অক্ষদণ্ডযুক্ত যন্ত্র। -অনু·

ছিলেন। ঠিক ঐ ধরনের সমস্যা ও ইঙ্গিতের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল বলেই তো পরে রেনেসাঁস যুগে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল।

স্থাপত্য

তবে যন্ত্রনির্ভর কাজকর্মের প্রতি প্রাচীন গ্রীকদের এই সার্বিক অবজ্ঞার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ছিল স্থাপত্য। সেই যুগেই স্থাপত্য নিছক কায়িক শ্রমনির্ভর এক কৌশলের স্তর থেকে উন্নীত হয়ে নাগরিকদের অনুশীলন-উপযোগী এক বৃত্তির সম্মান অর্জন করেছিল। গ্রীক এবং তৎপরবর্তী রোমান স্থাপত্যে সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব ও সুষমার জয়স্তম্ভ বিরচিত হয়েছিল. একথা সর্বজনবিদিত। লক্ষণীয় বিষয় এই যে স্থাপত্যকৌশল মূলত জ্যামিতির ওপর নির্ভরশীল। নিখুঁত রেখাচিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন হয় স্থাপত্যকৌশলে। কাজেই গ্রীক বিজ্ঞান-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী গণিতকে তা যে প্রভাবিত করবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। দুটি যন্ত্র এ ব্যাপারে সহায়ক হয়; এক, ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানের কম্পাস আর দুই, লেদ। নির্মাণযন্ত্র হিসেবে কম্পাস অতিশয় সুব্যবহার্য এবং তা অতি নিখুঁতভাবে কাজ করে। কাজেই গ্রীক জ্যামিতিতে রুলকাঠ আর কম্পাসের সাহায্যে আঁকা চিত্র যে প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করবে তাতে আর আশ্চর্যের কী। খুঁটি-লেদ (pole lathe) যন্ত্রটি ব্রন্‌জ যুগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। এটির পূর্বসূরী ছিল ধনুর্বেধযন্ত্র (bow-drill)। এই খুঁটি-লেদ যন্ত্র এগিয়ে-পিছিয়ে কাজ করত। আধুনিক লেদ মেশিন, যা বেল্ট-চালিত, তার উদ্ভব খুব বেশি দিন হয়নি—মাত্র খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে। পৃথিবীর বহু অঞ্চলে এখনো প্রাচীন খুঁটি-লেদ যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত আছে। এমনকি ইংলন্ডেও মাত্র সত্তর-আশি বছর আগেও এর প্রচলন ছিল। ঐ খুঁটি-লেদ যন্ত্রে চোং, শঙ্কু আর গোলক বানানো সম্ভব হলো। ফলে গ্রীক গণিতজ্ঞরা ভারি চমৎকার সব খেলনা পেয়ে গেলেন হাতে।

প্রকৌশল গ্রীক বিজ্ঞানকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে তা উপেক্ষণীয় নয়, কিন্তু পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলির তুলনায় সে প্রভাব অনেক কম। কাজেই গ্রীক বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত সর্বজনীন এবং স্বয়ংস্বতন্ত্র পথে বিকাশলাভ করে একথা যেমন ঠিক, তেমনি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পরিশোধিত না হওয়ায় অনুমান আর বস্তুবিচ্ছিন্ন তত্ত্বভাবনাব গোলকধাঁধায় পথ হারোনোর প্রবণতাও তার মধ্যে ছিল।

গ্রীক বিজ্ঞানের বিষয় ও পন্থা

আধুনিক বিজ্ঞান সরাসরি গ্রীক বিজ্ঞান থেকেই উদ্ভূত। গ্রীক বিজ্ঞানই তাকে দিয়েছে রূপরেখা, কর্মপন্থা আর ভাষা। যেসব সর্বজনীন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে, গ্রীকরাই সেসব প্রশ্নকে সূত্রবদ্ধ রূপ দিয়েছিল, যথা জ্যোতিষ্কলোকের চরিত্রটি কেমন, মানুষের শরীর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কীভাবে কাজ করে। দুঃখের বিষয় এই যে তারা ভেবেছিল তারা ঐসব প্রশ্নের চির-অভ্রান্ত উত্তরও বুঝি বার করে ফেলেছে—তাদের নিজস্ব যুক্তিসম্মত এবং মনোহর পথে। রেনেসাঁস যুগের পরে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম কাজই হয়ে দাঁড়ায় এইসব সমাধানের বেশির ভাগই যে অর্থহীন বা ভুল তা প্রমাণ করা। প্রায় 1400 বছর ধরে এইসব অর্থহীন বা ভুল ধারণা মানুষের মনকে অধিকার করে ছিল। তাই অনেকে বলতে পারেন, গ্রীক বিজ্ঞান যতটা না অগ্রগতির সহায় হয়েছিল তার থেকে বেশি অন্তরায় হয়েছিল। তবে, গ্রীক বিজ্ঞান না থাকলে ঐসব সমস্যা আদৌ উত্থাপিত হতো কিনা, সেটাও প্রশ্ন।

গ্রীক বিজ্ঞানের বিকাশের বিভিন্ন পর্ব

গ্রীক বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা থাকলেও অনুধাবনের সুবিধার্থে তাকে চারটি পর্বে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে : এক, আয়োনীয়; দুই, এথেন্সীয়; তিন, অ্যালেক্জান্দ্রীয় বা হেলেনীয় এবং চার, রোমান। আয়োনীয় পর্বটি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী জুড়ে ব্যাপ্ত। প্রাচীনতর সভ্যতার অভিঘাত যে অঞ্চলে সবচেয়ে তীব্ররূপে অনুভূত হয়েছিল সেখানে ঐ পর্বে গ্রীক বিজ্ঞানের জন্ম হয়। থালেস এবং পিথাগোরাসের মতো কিংবদন্তী-খ্যাত মানুষ এই পর্বের সন্তান। এঁরা এবং এই পর্বের আরো অনেক প্রকৃতিবেত্তা দার্শনিক নিতান্ত বস্তুবাদী পদ্ধতিতে বিশ্বপ্রকৃতির উপাদান ও উদ্ভব নিয়ে নানাবিধ অনুমানভিত্তিক ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। সে যুগ ছিল সামাজিক বিকাশের পর্ব, তাই এঁদের দর্শন ছিল মূলত ইতিবাচক এবং আশাবাদী।

দ্বিতীয় পর্বটি 480 থেকে 330 খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত—পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তি থেকে আরম্ভ ক'রে অ্যালেক্জাণ্ডার কর্তৃক স্বাধীন গ্রীক নগরগুলিকে বশে আনা পর্যন্ত। এই পর্বে গ্রীক জীবনধারা সাফল্যের উত্তুঙ্গ চূড়া স্পর্শ করে। এই ছিল পেরিক্লিস যুগের এথেন্সীয় গণতন্ত্রের পর্ব। কিন্তু গৃহবিবাদ আর যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে দিয়ে এ যুগ আপন ধ্বংস ডেকে আনে। এই অধ্যায়ে দার্শনিকদের আগ্রহ জড় জগৎ থেকে সরে গিয়ে মানুষের চরিত্র এবং তার সামাজিক দায়দায়িত্বকে ব্যাখ্যা করার ওপর কেন্দ্রীভূত হয়। সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল এই যুগের সন্তান। এই মহাপর্বটিকেই সচরাচর গ্রীক প্রজ্ঞার শিখরচূড়া বলে গণ্য করা হয়।

'হেলেনীয়' অভিধায় চিহ্নিত তৃতীয় পর্বটির সূত্রপাত ঘটে স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রগুলির অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে। নতুন এক ধরনের স্থলভিত্তিক সাম্রাজ্য এই নগররাষ্ট্রগুলিকে পদানত করে। আলেকজান্ড্রারের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে গ্রীক বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীনতর সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলির প্রত্যক্ষ সংযোগ নতুন করে স্থাপিত হয়। পূর্বদিকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সে যোগাযোগ বিস্তৃত হয়। অ্যালেক্জান্ড্রিয় বিজ্ঞানচর্চার এক নতুন পীঠস্থান হয়ে ওঠে। সেখানে ইতিহাসে সর্বপ্রথম এক 'সংগ্রহশালা' স্থাপনের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানচর্চাকে ভরতুকি দেওয়া হয়। এর ফলে গণিত, বলবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিপুল অগ্রগতি ঘটে। ইউক্লিড, আর্কিমিডিস আর হিপার্কাস এই পর্বের মানুষ। বিজ্ঞানের নিজস্ব ইতিহাসে—অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র থেকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে—এই পর্বটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়। কারণ এই পর্বেই পরিমাপসাধ্য (exact) বিজ্ঞান এক সুসংবদ্ধ ক্ষেত্র হিসেবে রূপ ধারণ করে। পরে অন্ধকার মধ্যযুগে তার অনেক কিছুই হারিয়ে যায়, একথা ঠিক; তবু যেটুকু টিকে যায় তারই দৌলতে প্রায় দু হাজার বছরের বিরতির পর বিজ্ঞানচর্চা আবার সজীব হয়ে উঠতে পেরেছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পর থেকেই, রোমান শাসনকালের সময় থেকেই, বিজ্ঞানচর্চায় ভাঁটা পড়ে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের বহু আগেই বিজ্ঞানচর্চার স্রোত থেমে যায়। এই চতুর্থ ও শেষ পর্বটিকে তেমন কোনো নিজস্বতা দ্বারা চিহ্নিত করা যায় না। তবে যেহেতু ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরবর্তী যাবতীয় বিজ্ঞানের সেতু হয়ে উঠেছিল এই পর্ব তাই এটি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে।

5. সূচনাপর্বের গ্রীক বিজ্ঞান

আয়োনীয় প্রকৃতিবাদ

মোটের ওপর একথা স্বীকৃত যে গ্রীক বিজ্ঞানের আদি উদ্ভব ঘটে এশিয়া মাইনরের আয়োনীয় শহরগুলিতে এবং ইতালি ও সিসিলিতে নবগঠিত গ্রীক উপনিবেশগুলোতে। আয়োনীয়

শহরগুলির মধ্যে মাইলেটাস এ ব্যাপারে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আয়োনীয় শহরগুলির সঙ্গেই প্রাচীন সভ্যতাগুলিব যোগাযোগ ছিল সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। গ্রীক বিজ্ঞান প্রথম রূপ ধারণ করে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। সেই সময়ে প্রাচীন অভিজাত জমিদারদের শাসন ভেঙে পড়ছিল, স্থানীয় সর্দাররা—*স্বৈরতান্ত্রিক* শাসকরা (tyrants)—ক্ষমতা দখল করে নিচ্ছিল। তাদের সহায় ছিল বণিক সম্প্রদায়। গ্রীক দুনিয়া সেসময় প্রচণ্ডভাবে বিস্তার লাভ করছিল। সে দুনিয়ার প্রথম বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে ওঠে পূর্ব ঈজিয়ান। সেখানে মূলত আয়োনীয়দের বাস ছিল। এই আয়োনীয়রা ছিল মূল গ্রীস ভূখণ্ডেরই অন্যতম আদি উপজাতি গোষ্ঠী। এরা ভূমধ্যসাগর এলাকা জুড়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। সুদূর মার্সেই, নেপল্‌স এবং সিসিলিতে, পূর্বে কৃষ্ণসাগর এলাকায় তাদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। পারসিকদের চাপে যখন এইসব গোষ্ঠী তাদের স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় তখন এই উপনিবেশগুলোই হয়ে ওঠে তাদের বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এবং সে বাণিজ্য ও সংস্কৃতির চরিত্র মূলত অপরিবর্তিতই থাকে। সেইজন্যেই দূরে দূরে ছড়ানো এই সব অঞ্চলের দার্শনিকদের সকলকেই 'আয়োনীয়' এই সাধারণ অভিধার অন্তর্গত করলে ভুল হয় না। যেমন থালেস ছিলেন মাইলেটাস্ নামক কেন্দ্রীয় শহরের লোক, হেরাক্লিটাস ছিলেন সমীপবর্তী ইফিসাস-এর লোক, পিথাগোরাস সামোস থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে দক্ষিণ ইতালিতে বসবাস করতেন, এম্পিডক্লিস থাকতেন সিসিলিতে।

এহেন কালে ও পরিস্থিতিতে ঐতিহ্যের বন্ধন আলগা হয়ে পড়ে, পুরোনো প্রশ্নের নতুন উত্তব শোনবার কান তৈরি হয়ে ওঠে। গ্রীক চিন্তার এই আদি পর্বের সবচেয়ে বড়ো গুরুত্ব ছিল এই যে তখন সব প্রশ্নেরই সরল এবং বস্তুনির্ভর উত্তর খোঁজার চেষ্টা হতো। তাঁরা দৈনন্দিন জীবন ও শ্রমকর্ম থেকে আহরিত ধারণার ভিত্তিতে বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে, তার উপাদান ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে একটা তত্ত্ব নির্মাণ করার প্রয়াস পেলেন।

দার্শনিক এবং জ্ঞানীজন

যাঁরা এসব প্রশ্ন তুলতেন এবং তার উত্তর দিতেন, তাঁদের তখন বলা হতো 'সফিস্ট', অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি। পরে এঁদের সম্পর্কে *দার্শনিক—philosopher*—কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন সক্রেটিস। এই 'philosopher' কথাটির অর্থ হলো জ্ঞানপ্রেমিক। এঁদের ভাবনাচিন্তার বেশির ভাগই মুখে মুখে প্রচারিত হতো। লিখিত যে সামান্য অংশটুকুর পরিচয় পাওয়া যায় তা প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের রচনায় লভ্য। পূর্বসুরীদের বক্তব্য খণ্ডনের জন্য কিংবা তাঁদের নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করবার জন্য এই দুই দার্শনিক তাঁদের কিছু কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরিচয় এবং স্মৃতি যে লুপ্ত হয়ে যায়নি, তাঁদের জীবন সম্পর্কে নানারকম কিংবদন্তী যে চালু ছিল, তা থেকেই বোঝা যায় আপন কালে তাঁরা নিশ্চয়ই খুব গুরুত্ব পেতেন। আদি লৌহযুগের যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে থেকে নতুন এক সভ্যতা যখন দানা বাঁধছে, সেই পর্বে এই দার্শনিকদের আবির্ভাব এক নতুন সামাজিক বর্গের সূচনা করে। এঁরা ছিলেন জ্ঞানবান ব্যক্তি। প্রাচ্য থেকে আহরিত প্রাচীন জ্ঞানের বার্তাকে তাঁরা নবযুগের উপযোগী ক'রে নিয়ে, তার উন্নতি ঘটিয়ে, প্রচার কবতেন। এঁরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন এবং অতীন্দ্রিয় ধর্মীয় রহস্যেরও প্রবক্তা ছিলেন। অনেক সময়েই তাঁরা আশ্রম স্থাপন করতেন, যা বিদ্যালয় হিসেবেও কাজ করত। এঁদের মধ্যে যাঁরা জীবনে সফল হতেন—বাকিদের খবর আমাদের কাছে আর পৌঁছয়নি—তাঁরা সচরাচর কোনো একজন স্বৈরতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক শাসকের রাজনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতেন। যাবতীয় বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য তাঁদের ডাক পড়ত, অথবা যেচেই হয়তো তাঁরা সে পরামর্শ দিতেন। পৃষ্ঠপোষকের সঙ্গে বিবাদ বাধলে অন্য

কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী এসে তাঁর স্থান দখল করতেন। উপদেষ্টা হিসেবে একজন বিখ্যাত দার্শনিককে নিয়োগ করতে পারলে সরকারের মর্যাদা ও স্থিতিশীলতা বাড়ত। যেমন পেরিক্লিস দার্শনিক অ্যানাক্সাগোরাসের সাহচর্যের সুবিধা লাভ করেছিলেন। এক্ষেত্রে অবশ্য দার্শনিকপ্রবর একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। প্রচলিত বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে তিনি এতদূর অগ্রাহ্য করেন যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে সরিয়ে দিতে হয়। তবে এইসব জ্ঞানী ব্যক্তিরা গণতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র যে পক্ষই বেছে নিন, এঁরা ছিলেন অবস্থাপন্ন লোক, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁদের পরিশ্রম করতে হতো না। দু একজনের কথা অবশ্য শোনা যায় যাঁরা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন; যেমন পঞ্চম শতকের প্রোটোগোরাস ও অন্যান্য সফিস্ট্রা শিক্ষাদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। তাই নিয়ে প্লেটো এঁদের বিদ্রূপ করেছিলেন। প্লেটোর নিজের অবশ্য যথেষ্ট টাকাপয়সা ছিল, তাই রোজগার করার ভাবনা তাঁকে ভাবতে হতো না। তিনি মনে করতেন, পারিশ্রমিক গ্রহণ ক'রে সফিস্টরা নিজেদের অপেশাদারী মর্যাদা খুইয়েছিলেন।

এই ধরনের দার্শনিকদের অস্তিত্ব কেবল যে গ্রীসেই ছিল তা নয়। বিক্ষোভমথিত সেই লৌহযুগে পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই অনুরূপ ধ্যানধারণা ও বার্তা প্রচার করার জন্য অনেকে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। প্যালেস্টাইনে ঋষি বা ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের আবির্ভাব ঘটে। প্রজ্ঞা– গ্রন্থমালার শেষ দিকের রচনাগুলির রচয়িতারাও এই যুগে সক্রিয় ছিলেন। ওল্ড্ টেস্টামেন্টের এক্লেসিআস্টেস (Ecclesiastes) বা জোব্-কাহিনী (Book of Job) এই সময়েরই রচনা। ঋষি জেরিমায়া-র সঙ্গে থালেসের হয়তো দেখাও হয়েছিল মিশরের নোক্রাতিস্-এ। ভারতবর্ষেও এই কালে ঋষি ও বুদ্ধদের আবর্ভাব হয়, তাঁদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধের নাম সর্বজনবিদিত। চীনের লাওৎসে আর কন্‌ফুসিয়াস্‌ও প্রায় এই সময়ের মানুষ। এঁরা সকলেই বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানুষ সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা গঠনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। এঁদের অধিকাংশই শাসক রাজাদের উপদেশ দিতেন এবং রাষ্ট্রীয় সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করতেন। সেসব সংস্কার অবশ্য বিশেষ স্থায়ী হতো না। এঁদের অধিকাংশেরই দৃষ্টিভঙ্গি গোঁড়া ছিল না, যদিও এঁরা অনেকেই (যেমন কন্‌ফুশিয়াস) দাবি করতেন যে তাঁরা কেবল সুপ্রাচীন প্রজ্ঞাকেই নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন মাত্র। পরে অবশ্য তাঁদের চিন্তাধারা থেকেই নানারকম গোঁড়া মতের জন্ম হয়।

ব্রন্‌জ যুগ থেকে লৌহযুগের সভ্যতায় অর্থনৈতিক উত্তরণ ঘটার পথে ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে যে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল, এঁরা তা পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। সেই কারণেই এঁরা এতটা সফল হয়েছিলেন। মার্ক্সের পরিভাষায় আমরা বলতে পারি, নবোদ্ভূত উৎপাদন-সম্পর্কের উপযোগী এক ভাবগত উপরিকাঠামো এঁরা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। নবোদ্ভূত সেই ব্যবস্থায় সমাজ-পরিচালনার ভার ছিল বণিক, স্বৈরশাসক আর সমরপটু রাজাদের হাতে। তাঁরা সমাজকে যে পথে নিয়ে যান তাতে মনে হয় পূর্ববর্তী ব্রন্‌জ যুগের তুলনায় এযুগে উৎপাদনের বস্তুগঠিত দিকটার সঙ্গে চিন্তাভাবনার বিচ্ছেদ অনেক বেড়ে যায়। এ যুগের দার্শনিকরা অর্থনীতির কার্যকর পরিচালনা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতেন না। অথচ পূর্ববর্তী যুগে বিদ্বান ব্যক্তিরা খালখনন, পিরামিড ও মন্দির-নির্মাণের পরিচালনকার্যে সরাসরি যুক্ত থাকতেন। এই বিচ্ছেদ ঘটার ফলে দার্শনিকরা যে উপরিকাঠামো গড়ে তুললেন তা ছিল মোটের ওপর ভাববাদী। পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞানের বিকাশের পক্ষে তা ছিল প্রতিকূল ও ক্ষতিকারক।

কিন্তু আয়োনীয় যুগের গোড়ার দিকের দার্শনিকদের সম্বন্ধে একথা পুরোপুরি খাটে না। তাঁদের কালে দাস-রাষ্ট্র এবং ধনিকশাসন পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। কাজে কাজেই, প্রাচ্যের অধিকাংশ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণের সঙ্গে তাঁদের তফাৎটা ছিল এই যে তাঁরা একই সঙ্গে

বস্তুবাদী, যুক্তিবাদী এবং নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। উত্তরসূরীদের মতো তাঁরা নৈতিকতার ও রাজনীতির প্রশ্ন নিয়ে অত মাথা ঘামাননি; তাঁরা প্রকৃতিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

বিশ্ব ও তার উপাদান

ঐতিহ্যসম্মত গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে থালেস ছিলেন প্রথম। তিনি যে-তত্ত্বের উদ্গাতা বলে অনুমান করা হয় তার মূল কথাটি হলো: সৃষ্টির আদিতে সবই ছিল জল; তা থেকেই পরে মাটি, বায়ু এবং জীব স্বতন্ত্র হয়ে যায়। স্পষ্টতই, ওল্ড টেস্টামেন্টের 'জেনিসিস' বা সৃজনবৃত্তান্ত অধ্যায়ে যে তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে এর কোনো তফাৎ নেই। এটি আসলে সুমেরীয়দের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এক সৃজন-কল্পকথা। সুমের ছিল এক বদ্বীপ-দেশ, জলাজমি বুজিয়ে সাফ ক'রে সেখানে স্থলভূমি 'আদায়' করতে হয়েছিল। তাই তাদের ক্ষেত্রে ঐ কল্পনা ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক। এইসব কল্পনার জন্ম হয় শ্রেণীসমাজের উদ্ভবের আগে এবং অবিকৃত রূপে সযত্নে তাদের সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল। তাই এইসব কল্পকথা মূলগত ভাবেই বস্তুবাদী। থালেস্-এর নবভাষ্যের নতুনত্ব এইখানে যে তিনি তাঁর তত্ত্ব থেকে সৃজনকর্তাকে বিসর্জন দিলেন। বহু শতাব্দী পরে নেপোলিয়নের প্রশ্নের উত্তরে লাপ্লাস যেমন বলেছিলেন, তেমনি থালেস্ও বলতে পারতেন : 'ঐ তত্ত্বপ্রকল্পটি (hypothesis) ছাড়াই আমি আমার অঙ্ক মেলাতে পারব।' থালেস্-এর আগ্রহ নিবদ্ধ ছিল প্রকৃতির প্রতি। অধিবিদ্যাগত দূরকল্পনা—পরে শ্রেণীসমাজকে ন্যায্য প্রমাণ করার জন্য যাকে আরোপ করা হয়েছিল—তাকে তিনি বর্জন করেছিলেন। তাঁর বস্তুবাদের মূল নিহিত ঐখানেই। তিনি যন্ত্রবৎ বস্তুবাদের প্রবক্তা ছিলেন না। তাঁর বস্তুবাদে যাবতীয় পদার্থই সপ্রাণ বলে অনুমিত। তিনি ছিলেন *hylozoist* বা *বস্তু-প্রাণবাদী*। এই মূলগত বস্তুবাদ ও নিরীশ্বরবাদ তাঁর ঘরানার পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যেও লক্ষণীয়। অ্যানাক্সিম্যান্ডার এবং অ্যানাক্সিমিনিস থালেস্-এর তত্ত্বপ্রকল্পকে প্রসারিত ক'রে নিয়ে তার সাহায্যে আরো কিছু ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা আরো বললেন, অক্ষর জুড়ে জুড়ে যেমন শব্দ তৈরি হয়, তেমনি মাটি, কুয়াশা আর আগুনের সম্মিলনে এই বিশ্বপৃথিবী তৈরি হয়েছে। এইগুলিই হচ্ছে মূল উপাদান—*elements;* 'l', 'm' এবং 'n' অক্ষর সহযোগে শব্দটি তৈরি। হেরাক্লিটাস অবতীর্ণ হন তাঁর পরিবর্তনের দর্শন নিয়ে। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল *panta rhei*—সব কিছুই বহমান। তিনি মনে করতেন, অগ্নিই হলো আদি উপাদান, যেহেতু অগ্নি অত্যন্ত সক্রিয় এবং তা সবকিছুরই রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। যেভাবে তিনি এই বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যময় : 'যাবতীয় পদার্থই অগ্নির বিনিময়ে লভ্য, আবার যাবতীয় পদার্থের বিনিময়ে অগ্নি লভ্য; যেমন পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে স্বর্ণ লাভ করা যায়, আবার স্বর্ণের বিনিময়ে পণ্যসামগ্রী লাভ করা যায়।' নব্য দর্শনের মূলে প্রকৌশল-প্রক্রিয়া এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করছিল, তা এখান থেকে আবার স্পষ্ট হয়ে যায়। বিপরীত-গুণসম্পন্ন বস্তুনিচয়ের ধারণার প্রবর্তনও তিনিই করেন। কোনো কোনো জিনিস, যেমন অগ্নিশিখা, ওপরে উঠতে চায়; আবার কোনো কোনো জিনিস, যেমন পাথর, নিচে পড়তে চায়। এই দুই বিপরীত গুণ আবার পরস্পরের পক্ষে প্রয়োজনীয়। তারা পরস্পরের মধ্যে এক টান বা আততির সৃষ্টি করে, যথা ধনুক ও তার ছিলা। দ্বন্দ্বভিত্তিক দর্শনের এই ছিল প্রথম অভিব্যক্তি।

বস্তুবাদী দার্শনিকদের এই ঘরানার উত্তরসূরী ছিলেন এম্পিডক্লিস। তিনি পরীক্ষা সহযোগে দেখান যে অদৃশ্য বায়ুও আসলে এক বস্তুগঠিত পদার্থ। তিনি আদি মৌলিক পদার্থসমূহকে ক্রমানুসারে একটির নিচে অন্যটিকে সাজান—মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি। তিনি বলেন, বিক্ষুব্ধ হলে এর প্রত্যেকটিই তার নির্দিষ্ট স্থান ফিরে পেতে প্রয়াসী হয়। তিনি মনে করতেন, প্রেম ও ঘৃণার

মতো পরস্পর-বিপরীত মানসিক প্রবণতাগুলিও বস্তু-উপাদানে গঠিত এবং তারা যন্ত্রবৎ ক্রিয়া করে। পরস্পর বিপরীত প্রবণতাসমূহ ক্রমাগতই পূর্বোক্ত মূল উপাদানগুলোকে মিশিয়ে ফেলে আর স্বতন্ত্র করে। প্রাচীন চীনেব য়িন আব ইয়াং দ্বৈতসত্তার তত্ত্বের সঙ্গে এই তত্ত্বের মিল আছে। তবে খুব সম্ভব এই দুই তত্ত্ব স্বাধীনভাবেই গড়ে উঠেছিল। চীনেব ঐ তত্ত্বেও বলা হয়, পুরুষসত্তা অগ্নি আর নারীসত্তা জল পবস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া ক'রে বাকি মূল উপাদানগুলো তৈরি করে—ধাতু, কাষ্ঠ এবং সবশেষে মাটি; অতঃপব এই সমস্ত উপাদানের মিশ্রণে বস্তুময় পৃথিবীর *'দশ সহস্র পদার্থ'* তৈবি হয়।

আয়োনীয় চিন্তাধারার মূল গতিটা ছিল বিশ্বকে এক গতিময় রূপে ব্যাখ্যা করার দিকে—যে-বিশ্বে *বস্তুঘটিত মূল উপাদানসমূহ ক্রমাগত পরস্পরের রূপান্তর ঘটিয়ে চলে*। পরবর্তী কালের অধিকাংশ দার্শনিক কিন্তু মূল উপাদানসমূহের *স্বাভাবিক অচঞ্চল দশার* প্রতি অধিক মনোযোগ দিতেন, তাঁরা মনে করতেন ওগুলো হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাঠামোর চিরনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় অঙ্গ। উপাদানসমূহের এই অচঞ্চল দশার ধারণাটি অ্যারিস্টটলের আশীর্বাদধন্য হয়ে ওঠে এবং যাবতীয় প্রগতিমূলক পরিবর্তনকে, বিশেষ করে সামাজিক পরিবর্তনকে ব্যাহত করার কাজে লাগে। মূল উপাদানগুলিকে সামাজিক শ্রেণীর সদৃশ বলে গণ্য ক'রে এই সিদ্ধান্ত আহরণ করা হয় যে সামাজিক বিশ্বের সেই অবস্থানটিই আদর্শ এবং শাশ্বত যাতে নিম্নতর শ্রেণী উচ্চতর শ্রেণীর অধীন থাকে। সমাজ ও প্রকৃতিকে এইভাবে একাকার কবে ফেলার দরুন উভয় জগৎ সম্বন্ধেই ধারণা বাধাপ্রাপ্ত হয়। আদিতে যে তত্ত্ব ছিল বস্তুবাদী, তা এইভাবে আকারবাদী এক তত্ত্বে পর্যসিত হয়। ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং রসায়নের বিকাশ ব্যাহত হয়। সুশৃঙ্খল বিশ্বব্যবস্থার দোহাই পেড়ে এইসব ক্ষেত্রকে নিছক কষ্টকল্পিত সাদৃশ্যের বোঝায় ভারাক্রান্ত করে তোলা হতো।

প্রাচীনদের বিশ্বদর্শনের গভীরে আরেকটি বিভ্রান্তি কাজ করছিল। তাঁরা তাঁদের ঐসব মূল উপাদানকে দিয়ে একই সঙ্গে এমন দুটি কাজ করিয়ে নিতেন যা পরস্পরের সঙ্গে বেমানান। একদিকে সেগুলো ছিল তাঁদের পরিচিত জগতেরই বিভিন্ন বস্তুগঠিত পদার্থ ও বাস্তবজগতে লক্ষিত নানাবিধ চলনপ্রক্রিয়া। তাদের সাহায্যে এই বিশ্বের স্থলভূমি আর সাগরের, সূর্যালোক আর ঝড়ঝঞ্ঝার বহুবিচিত্র ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা কবা হতো। সে ব্যাখ্যার জন্য ঠাকুরদেবতাদের টেনে আনার প্রয়োজন হতো না। এই কারণেই আজও ইংরেজিতে 'elements' কথাটির একটি অর্থ হলো 'ঝড়ঝঞ্ঝা'। কিন্তু ঐসব মূল উপাদানই আবার এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকা পালন করত; তারা বিশেষ বিশেষ গুণের আধার বলে গণ্য হতো—যথা তপ্ততা আর শীতলতা, আর্দ্রতা আর সিক্ততা, লঘুত্ব আর গুরুত্ব। এইসব গুণ আবার যেকোনো জিনিসের ওপরেই আরোপ করা যেত। উনবিংশ শতাব্দীতে যেমন একটি রসায়নিক মৌল বলতে একটি বিশেষ বস্তুগঠিত পদার্থকেই বোঝানো হতো, আলোচ্য প্রাচীন পর্বে তা বোঝানো হতো না। আয়োনীয় দার্শনিকদের মধ্যে যিনি শেষতম সেই অ্যানাক্সাগোরাস (আনুমানিক 500-428 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এতদূর পর্যন্ত বলেছিলেন যে সব মূল উপাদানের বীজ সবকিছুর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে—আজকে আমরা যেমন *পদার্থের অবস্থান্তরের কথা* বলি (যথা গ্যাসীয়, তরল এবং কঠিন)।

আদি আয়োনীয় ঘরানার সবচেয়ে বড়ো সাফল্য এই যে ঠাকুরদেবতাদের হস্তক্ষেপ কিংবা পূর্বনির্দিষ্ট কোনো ছকের সাহায্য ছাড়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব কী করে হলো, কীভাবে তা ক্রিয়া করে, সে ব্যাপারটার একটা চিত্র তাঁরা আঁকতে পেরেছিলেন। অপরদিকে এই ঘরানার মূল দুর্বলতাটা হলো এর অস্পষ্টতা, এর শুধুই বর্ণনাত্মক এবং নিছক গুণাত্মক চরিত্র। আপন শক্তিতে

কোনো পরিণতিতে পৌঁছনোর সাধ্য তার ছিল না, কেননা এর সাহায্যে খুব সুনির্দিষ্ট কিছুই করা সম্ভব ছিল না। দর্শনের মধ্যে *সংখ্যা* ও *রাশির* অনুপ্রবেশ বিনা সে কাজ ছিল অসাধ্য।

রাশি ও সংখ্যা : পিথাগোরাস

আকাশের জ্যোতিষ্কের সঙ্গে যদৃচ্ছভাবে সরল সংখ্যানুপাতের সম্পর্ক আবিষ্কার করার প্রবণতা অ্যানাক্সিম্যান্ডারের (611-547 খ্রি· পূ·) রচনার মধ্যে ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তিনি মনে করতেন নক্ষত্রসমূহ, চাঁদ আর সূর্য পৃথিবী নামক চাকতিটির বেধের যথাক্রমে নয়, আঠেরো এবং সাতাশগুণ দূরে অবস্থিত। এই প্রবণতার উৎস সম্ভবত ব্যাবিলোনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যে নিহিত। প্রকৃতির যাবতীয় দিককে *সংখ্যা* দিয়ে চিহ্নিত করার ব্যাপারটি পিথাগোরাসের (582-500 খ্রি· পূ·) মতবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি মাইলেটাসের সমীপবর্তী সামোস দ্বীপের মানুষ হলেও পরে দক্ষিণ ইতালিতে গিয়ে বসবাস করেন। সেখানে তিনি এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের চর্চা হতো। পিথাগোরাস মানুষটি সম্পূর্ণতই কিংবদন্তীর কল্পনা হোন বা না হোন, তাঁর নামের সঙ্গে দর্শনের যে ঘরানাটি জড়িয়ে আছে তার বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই। পরবর্তী কালে এর প্রসিদ্ধতম প্রবক্তা প্লেটো (427-347 খ্রি· পূ·) মারফত এই ঘরানা অতীব প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

পিথাগোরীয় শিক্ষার মধ্যে দুটি ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটেছিল—একটি *গণিতনির্ভর*, অন্যটি *অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী।* পিথাগোরাসের নামে প্রচলিত গণিতসূত্রাবলীর কতটুকু সত্যিই তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন, তা নিয়ে সংশয় আছে। সমকোণী ত্রিভুজ সম্পর্কে তাঁর অতি প্রসিদ্ধ উপপাদ্যটি যে মিশরীরা বাস্তবে কার্যকর একটি নিয়ম হিসেবে অনেক আগেই থেকেই জানত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'পিথাগোরীয় ত্রিভুজ' নামে যে জিনিসটি প্রসিদ্ধ, ব্যাবিলোনীয়রা বহু আগে তার সুদীর্ঘ তালিকা রচনা করেছিল। এমনকি পিথাগোরাসের সংখ্যাভিত্তিক তত্ত্বাবলীর সমস্তটাই—তার অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী এবং গাণিতিক উভয়দিকই—যদি কোনো প্রাচ্য ভাবনার সূত্র থেকে আহরিত হয়ে থাকে, তাহলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বস্তুত উক্ত তত্ত্বাবলীর যা চরিত্র তা বিচার করলে এরকম সম্ভাবনা খুবই প্রবল বলে মনে হয়। তবে পিথাগোরাস একজন মৌলিক চিন্তাবিদই হোন কিংবা অন্যের চিন্তাধারার প্রচারকই হোন, তাঁর ঘরানা গণিত, বিজ্ঞান আর দর্শনের মধ্যে যে যোগসূত্র রচনা করে দেয়, তা আর কোনোদিন ছিন্ন হয়নি।

পিথাগোরাসের কাছে *সংখ্যা* ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অনুধাবনের চাবিকাঠি। তিনি সংখ্যাকে একদিকে জ্যামিতি, অন্যদিকে পদার্থবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত করেন। তিনি দেখান যথাযথভাবে সাজালে বিন্দুর সাহায্যে ত্রিভুজ ও বর্গক্ষেত্র গঠন করা যায়। আবার, তারের সুনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের অনুপাতেই যে সুরের একেকটি গ্রাম (উদারা, মুদারা, তারা) রচিত হয়, সে আবিষ্কারও তাঁরই। এর ফলে আগে যে *সৌষম্যকে* ইন্দ্রিয় মারফত অনুধাবন করা গিয়েছিল তাকে এবার সংখ্যার অনুপাতের সঙ্গে এবং সেই সূত্রে জ্যামিতিক আকারের সঙ্গে যুক্ত করা গেল। ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র আর পঞ্চভুজের সাহায্যে পাঁচটি সুনিয়মিত আকারের ঘনবস্তুর পার্শ্বরেখা গঠন করা যায়। পিথাগোরীয়েরা মনে করতেন, এই পাঁচটি সমঘন আকারের বিশেষ মহাজাগতিক তাৎপর্য আছে। তাঁদের এই বিশ্বাস সমগ্র গ্রীক জ্যামিতির সুর বেঁধে দিয়েছিল। পঞ্চভুজের জাদুঘটিত তাৎপর্য সমধিক বলে মনে করা হতো, যেহেতু রুলকাঠ আর কম্পাসের সাহায্যে একটি পঞ্চভুজ আঁকা সত্যিই গাণিতিক সাফল্যের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। প্লেটোর সমঘনগুলির মধ্যে দ্বাদশপার্শ্বক (dodecahedron) ও বিংশতিপার্শ্বক (icosahedron)—এই দুটিতে পঞ্চভুজ-ঘটিত সুসংগতি রয়েছে। বস্তুত, ইউক্লিডের সুবিশাল জ্যামিতিক সংশ্লেষণের লক্ষ্যই যেন ছিল ঐ দুই সমঘন অঙ্কন। এর চেয়ে বেশি পার্শ্বযুক্ত সমঘন যে আঁকা সম্ভব নয় এটা গ্রীক

জ্যামিতিতে প্রমাণিত হয়। এই প্রমাণ ছিল গ্রীক জ্যামিতির চরম সিদ্ধির শিখরচূড়া। এর মধ্যে আধুনিক গণিতের 'গ্রুপ'-তত্ত্বের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়।

অনুপাত ও অমূলদ রাশি

পিথাগোরীয় আশ্রমের কাছে একটি মৌলিক আবিষ্কারের জন্য আমরা ঋণী, যদিও সম্ভবত সে আবিষ্কার ঘটে পিথাগোরাসের মৃত্যুর কিছুকাল পরে। দৈর্ঘ্যের যেকোনো পরিমাপকেই যদি সংখ্যা রূপে প্রকাশ করা যায়, তাহলে যেকোনো দুটি ভিন্ন দৈর্ঘ্যের পরিমাপের অনুপাতকেও নিশ্চয়ই দুটি সংখ্যার অনুপাত হিসেবে প্রকাশ করা যাবে। কিন্তু একটা নিতান্ত সরল নিদর্শন থেকে দেখা গেল, সর্বদা তা যায় না। একটি বর্গক্ষেত্রের পার্শ্বরেখার দৈর্ঘ্যকে যে সংখ্যা দিয়েই চিহ্নিত করা যাক না কেন, তার কর্ণের দৈর্ঘ্যকে কোনোমতেই অপর কোনো পূর্ণ সংখ্যা বা ভগ্নাংশ দিয়ে ব্যক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ কিনা, কোনো ভগ্নাংশের বর্গ কখনো পুরোপুরি 2 হতে পারে না। অন্য কথায়, $\sqrt{2}$ একটি অমূলদ রাশি। এহেন রাশির অস্তিত্ব আবিষ্কার করে পিথাগোরীয়রা মর্মাহত হন। পিথাগোরীয় আশ্রম ভেঙে যাওয়ার অন্যতম কারণ এই আবিষ্কার। এ দ্বন্দ্বের নিরসন দুভাবে হতে পারত : এক, পরিমাপ ব্যাপারটাকেই অবাস্তব বলে চিহ্নিত করা; দুই, সংখ্যার ধারণাটিকে প্রসারিত ক'রে নিয়ে অমূলদ রাশিকে তার মধ্যে স্থান করে দেওয়া। পরিশেষে এই দ্বিতীয় পথটিই অনুসৃত হয়েছিল।

জ্যোর্তিবিজ্ঞানে বৃত্ত আর গোলকের যে এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, এই ধারণাটির জন্যও আমরা পিথাগোরীয়দের কাছে ঋণী। তাঁরা মনে করতেন পৃথিবী একটি গোলক এবং অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীও একটি চিরস্থায়ী অদৃশ্য অগ্নিকেন্দ্রের চারপাশে ঘুরে চলেছে। এই 'অন্যান্য গ্রহ' বলতে তাঁরা বোঝাতেন সূর্য, চন্দ্র এবং রহস্যময় এক 'বিপরীত-পৃথিবী'কে। পরে হেরাক্লিডিস (375 খ্রি· পূ·) এবং অ্যারিস্টার্কাস্-এর (আনু· 310-230 খ্রি· পূ·) হাতে যুক্তিশাসিত হয়ে এই ধারণাই আমাদের সৌরব্যবস্থার আধুনিক চিত্রের জন্ম দেয়।

পিথাগোরীয় ঘরানার কাজই গণিতের, এবং সেই সঙ্গে ভৌতবিজ্ঞানের, মূল বনেদ রচনা করে দেয়। কিন্তু তাঁদের গণিতের মধ্যে অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী ভাবধারা সবিশেষ লক্ষণীয়। পরমাত্মাকে তাঁরা সংখ্যার বিবিধ পরম রূপের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতেন। বিশেষ করে 10 সংখ্যাটির মধ্যে পরমাত্মার অধিষ্ঠান ঘটে বলে তমারা মনে করতেন: $10=1+2+3+4$. তাঁদের মতে সমগ্র বিশ্বসংসার বিশুদ্ধ সংখ্যা দ্বারা গঠিত। ভাববাদের এই একেবারে চরম রূপটি সংখ্যা-জাদুর সঙ্গে সম্পর্কিত। খ্রিস্টধর্মের পবিত্র ত্রিদেব বা 'ট্রিনিটি'* , চার গসপেল বা সুসমাচার রচয়িতা, সাতটি মহাপাপ প্রভৃতির মধ্যে এই সংখ্যা-জাদুর প্রভাব ক্রিয়াশীল। এমনকি আধুনিক গণিতভিত্তিক পদার্থবিদ্যাতে যাঁরা ঈশ্বরকে অতুলনীয় এক গণিতজ্ঞ রূপে প্রমাণ করতে চান, তাঁরাও এর আশ্রয় নেন।

বিজ্ঞানে অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদের অনুপ্রবেশ

পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রেও পিথাগোরীয়েরা তথ্যকে বহু দূরে অতিক্রম ক'রে যান; অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের বদলে তাঁরা সংখ্যাভিত্তিক অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদের চর্চায় রত হন। পিথাগোরাসবাদের এই রহস্যবাদী দিকটির সঙ্গে অর্ফিয়ুসের রচনাভিত্তিক রহস্যাবলীর সম্পর্ক রয়েছে। এইসব অর্ফিয়ুসীয় রহস্য ছিল পুরোনো জনসমাজে প্রচলিত জাদুবিশ্বাসের পুরাবশেষ। ইতিমধ্যেই তা লৌহযুগের কঠোর বাস্তবতার হাত থেকে রেহাই পাবার পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

---

* *Trinity*— ঈশ্বরের তিন রূপ—পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মা (Holy Ghost)। —অনু·

দাসভিত্তিক ধর্ম হিসেবে অর্ফিয়ুসবাদের* সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের কিছু কিছু সাদৃশ্য রয়েছে, বিশেষত চক্র এবং গুহা-প্রতীকের ব্যবহারে। পিথাগোরীয় বিশ্বাসের মূল ভিত্তি ছিল এক দেহ থেকে অন্য দেহে আত্মার পরিগমনের তত্ত্ব। হিন্দুধর্মের জন্মান্তরবাদের সঙ্গে এ বিশ্বাসের মূলত কোনো প্রভেদ নেই, যদিও ভারতীয় প্রভাব ছাড়াই তাঁদের এ মত গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। পিথাগোরীয় সাধনার লক্ষ্য ছিল পুনর্জন্মলাভের চক্র থেকে মুক্তি অর্জন; যে মুক্তি আসবে অতীন্দ্রিয় রহস্যের যৌথ অভিজ্ঞতা লাভ এবং মরমী ধ্যানের তুরীয়ানন্দ লাভের মধ্যে দিয়ে। প্রথমটির জন্য পালনীয় আচার-অনুষ্ঠানের নাম ছিল *orgy*, আর দ্বিতীয়টির নাম *theory* (= দিব্যদর্শন)। যোগের মাধ্যমে নির্বাণ লাভের ভারতীয় ধারণার সঙ্গে এর মিল আছে। পুরাপ্রস্তর যুগে যখন পুনর্জন্মের ধারণাটির প্রথম আবির্ভাব ঘটে, তখন তা আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু লৌহযুগে সে ধারণা মূলত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। কারণ ঐ ধারণা স্বীকার করে নিলে সামাজিক ন্যায়-অন্যায় ও যুদ্ধের সমস্ত অর্থ লোপ পায়, বরং সেগুলোর প্রতি এক ধরনের অনুক্ত সম্মতিই জানায় ঐ ধারণা। যেমন, 'গীতা'য় আতঙ্কিত অর্জুন যখন প্রশ্ন করেন কী করে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের উদ্ভব হলো, তখন কৃষ্ণ তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন:

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥

—যে এঁকে (আত্মাকে) হন্তা জ্ঞান করে, এবং যে এঁকে হত জ্ঞান করে, তারা উভয়ে জানে না। ইনি হনন করেন না, হত হননা (রাজশেখব বসুর অনুবাদ)।

অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদীদের অভীষ্ট ছিল শুদ্ধিকরণের মধ্যে দিয়ে নিরাসক্তি অর্জন। শুদ্ধিকরণের এই প্রক্রিয়াটি গোড়াতে ছিল পুনর্জন্ম সংক্রান্ত নিখাদ জাদুভিত্তিক দীক্ষানুষ্ঠান। ধাতুর অগ্নিশুদ্ধির মধ্যে দিয়ে এই শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানের সঙ্গে অপরসায়নের এক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পিথাগোরীয়েরা জ্ঞানের মাধ্যমে শুদ্ধি অর্জনের ধারণার প্রবর্তন করেন। সে জ্ঞান ছিল নিষ্ক্রিয় *ধ্যানের* মধ্যে দিয়ে লব্ধ *বিশুদ্ধ জ্ঞান* অর্থাৎ ধ্যানাত্মক জ্ঞান। তাঁরা বলতেন, খেলার মাঠের মানুষদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়: একদল আসে বেচাকেনা করতে, একদল আসে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে, আরেকদল আসে নিছক খেলা দেখতে। এই শেষোক্তরা, যারা কোনো ক্রিয়ায় অংশ না নিয়ে নিছক অবধারণ করে, তারাই হলো শ্রেষ্ঠ। ধ্যানাত্মক বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের এই আদর্শটি, যা আসলে শ্রেণীসমাজের প্রভাবে অধঃপতিত এক আদিম আচারবিধি থেকে আহরিত, তা আমাদের এই যুগেও বজায় রয়েছে। এই আদর্শের দোহাই দিয়ে একশ্রেণীর মানুষ সেকালে জ্ঞানচর্চার সুবিধাটি ভোগ করত, কিন্তু সমাজের কোনো দায়িত্ব নিতনা; আজও তাই করে।

পিথাগোরীয় মতবাদের এইসব পরিণাম প্রগতিবিরোধী, একথা ঠিকই। কিন্তু এসব মতবাদ যখন গঠিত হয় তখন পিথাগোরাস জীবিত ছিলেন না। জর্জ টমসনের মতে, আদি পিথাগোরীয় সংঘ যতখানি ধর্মীয় ছিল, ততখানিই রাজনৈতিক ছিল। ফলে তা উৎপীড়নের শিকার হয় এবং শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়। তাঁর মতে, পিথাগোরীয় মতবাদ ছিল *গণতান্ত্রিকতার* প্রথম অভিব্যক্তি। ভূম্যধিকারী অভিজাত শ্রেণীর ঐতিহ্যনির্ভরতার বিপরীতে *মধ্যবিত্ত* বণিক শ্রেণীর যুক্তিবাদী মনোভাব এর মধ্যে রূপ ধারণ করেছিল। টমসন এ-কে পরবর্তীকালের ক্যালভিনবাদের সঙ্গে

* *Orphism*—অর্ফিয়ুসবাদী ধর্ম-আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। এঁদের বিশ্বাস ছিল, মানুষের আত্মা অমর; সেই অমর আত্মাকে নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করবার জন্য মানুষকে ক্রমাগত কতকগুলি শুদ্ধি-আচার পালন করতে হবে। -অনু

তুলনা করেছেন। পিথাগোরীয়েরা *মধ্যপন্থা* এবং সুসংগতির ওপর জোর দিতেন। টমসনের মতে এই মনোভাব বণিকদের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যাব সমাধান ঘটানোর প্রয়াসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আজ আমরা এই মনোভাবকে অ্যারিস্টটলের মতের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি।

পিথাগোরাসের প্রভাব

পিথাগোরীয় চিন্তাধারার প্রভাবে গ্রীক বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ফলিত উভয় ক্ষেত্রেই দুটি শাখা উদ্গত হয়। শাখা দুটি দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে বিকাশ লাভ করে। পিথাগোরীয় চিন্তাধারার সবচেয়ে বিমূর্ত ও যুক্তিশাস্ত্র-নির্ভর দিকগুলি গ্রহণ করেন পার্মেনিডিস। অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তা পরে প্লেটোর ভাববাদের ভিত্তি হয়ে ওঠে। অপরদিকে পিথাগোরাসের সংখ্যাতত্ত্ব বস্তুবাদী রূপ পরিগ্রহ করে মাইলেটাস্-এর লিউকিপ্পাস(475 খ্রি·পূ·) এবং আব্ডেরা-র ডিমক্রিটাস্-এর(420 খ্রি· পূ·) হাতে।

ভৌত রাশিকে পরিমাপ ও সংখ্যারূপে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে পিথাগোরীয়েরা ফলিত বিজ্ঞানে ঐ সব রাশি নিয়ে চর্চা করার পথ উন্মুক্ত করে দেন। প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করার কাজে ঐ সাধারণ পদ্ধতি নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজে লেগে এসেছে।অবশ্য সে পদ্ধতি নিয়ে বাড়াবাড়িও অনেক হয়েছে। গণিতের ক্ষেত্রে পিথাগোরীয়দের অবদান আরো গুরুত্বপূর্ণ। একটি *স্বীকার্য ধারণা (postulate)* থেকে ধাপে ধাপে *অবরোহী* যুক্তিপ্রয়োগেব মধ্যে দিয়ে *প্রমাণ* আহরণের পদ্ধতির প্রবর্তক তাঁরাই। ঐটিই অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ ঘটানোব সবচেয়ে জোরালো পদ্ধতি, যেহেতু এই পদ্ধতিতে অনেকগুলি উদাহরণকে একটি উপপাদ্যে পরিণত করা যায়। তবে গণিতের ক্ষেত্রে যত মূল্যবানই হোক, অবরোহী যুক্তিপ্রয়োগের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করার এই পদ্ধতি প্রথম থেকেই ভাববাদের প্রয়োজন সাধন করে আসছে। কোনো একটা স্বতঃসিদ্ধকে স্বীকার্য বলে ধরে নিয়ে তা থেকে যেকোনো হিংটিংছটকে ‘প্রমাণ’ করা সম্ভব এই পদ্ধতিতে।

পার্মেনিডিস

প্রথম যেসব দার্শনিক একাজ করেন তাঁরা হলেন দক্ষিণ ইতালির ইলিয়া-র অধিবাসী পার্মেনিডিস (470 খ্রি· পূ·)। এবং তাঁর শিষ্য জেনো (450 খ্রি· পূ·)। এঁরা দুজনেই ঐ শহরের অভিজাত ও রক্ষণশীল পার্টির সদস্য ছিলেন। দার্শনিক হিসেবে পার্মেনিডিস ছিলেন বিশুদ্ধ যুক্তির প্রবক্তা। পর্যবেক্ষণনির্ভর পরীক্ষাভিত্তিক বিজ্ঞানকে তিনি প্রবলভাবে আক্রমণ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, ঐ প্রকার চর্চা থেকে কেবল অনিশ্চিত ধারণা ছাড়া আর কিছু গঠন করা সম্ভব নয়। কেননা মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহ আদৌ অভ্রান্ত নয়। পক্ষান্তরে, বিশুদ্ধ যুক্তিব প্রয়োগে সংখ্যার গভীবে নিহিত সত্য সম্বন্ধে যে উপলব্ধিতে পৌঁছনো সম্ভব,তা নির্বিকল্প। ‘অন্ধ নয়ন আর তালা-লাগা কান’ নিয়ে, ভ্রান্তিপ্রবণ ইন্দ্রিয় নিয়ে কখনো *পরম সত্য* আর নিশ্চিতির দাবি মেটানো সম্ভব নয়। এই দাবি চিরস্থায়িত্ব অর্জনের প্রবল তাগিদের পরিচায়ক। বারবার ইতিহাসে বিশৃঙ্খলার এই যুগে দাবি ধ্বনিত হয়েছে। সাধারণত যে পক্ষ হেরে যাচ্ছে তারাই এ দাবি তোলে।

পরে প্লেটো বিজ্ঞানবিরোধী এই ভাববাদী প্রবণতার প্রবক্তা হিসেবে অবতীর্ণ হল। এবং দর্শনে আজ পর্যন্ত এই প্রবণতা বজায় রয়েছে। পার্মেনিডিস আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যুক্তিশাস্ত্রের অবতারণা ক'রে হেরাক্লিটাসের মত খণ্ডন করেন। হেরাক্লিটাস বলতেন, সব কিছুই পরিবর্তনশীল। পার্মেনিডিস বললেন, *যা আছে তা আছে* এবং *যা নেই তা নেই*; সুতরাং কখনো কোনো কিছু ঘটা সম্ভব নয়, *পরিবর্তন একটা অসম্ভব ব্যাপার।* শুধু পরিবর্তন কেন, এহেন এক ব্রহ্মাণ্ডে বৈচিত্র্যও অসম্ভব। *প্রকৃত* (‘সৎ’) ব্রহ্মাণ্ড এক ও নিত্য। আমাদের ইন্দ্রিয় মারফত

বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের যে বোধ জাগে তা বিভ্রান্তিজনক, তা প্রকৃত নয়। ইন্দ্রিয়-প্রতীত এই বস্তুবিশ্ব *মায়া* ছাড়া আর কিছু নয। চরম ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির এই ছিল প্রথম সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। *আকারবাদী যুক্তিধারার* (formal logic) এই ছিল সূত্রপাত; অনেক পরে হেগেল পার্মেনিডিস্-এর এইসব যুক্তিকে খণ্ডন কবেছিলেন এইভাবে: অস্তিত্বের ভাবটির সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় অনস্তিত্বের ভাব এবং এই প্রক্রিয়ায় নূতন একটি ভাব জন্ম লাভ করে—সেটি হলো অস্তিত্ববান হয়ে-ওঠার (becoming) ভাব। এই *দ্বন্দ্বমূলক ভাববাদ* অনুসারেই সমগ্র জটিল ভাববাদী বিশ্বজগৎকে ব্যখ্যা করা যায়। এই দর্শনকেই 'সোজা করে দাঁড় করিয়ে' মার্ক্স তাঁর *দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ* প্রতিষ্ঠা করেন। যে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী 'দৈব' অধিকার-বলে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে চায়, তাদের কাছে পার্মেনিডিস-এব এই ভাববাদের চেয়ে সুবিধাজনক আর কিছুই হতে পারে না।

পার্মেনিডিস্-এর শিষ্য জেনো পিথাগোরীয় গণিত ও ভৌত বিজ্ঞানের মূল ভিত্তির ওপর আঘাত হানেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে বুদ্ধি খাটিয়ে চারটি কূটপ্রশ্ন উপস্থাপিত করেন। এইসব কূটপ্রশ্ন থেকে আপাতবিচারে এই কথা প্রমাণ করা যায় যে সময বা দূরত্ব ছেদহীনও নয়, আবার ছেদযুক্তও নয়। দেশ যদি ছেদহীন হয় তাহলে একজন দৌড়বাজের পক্ষে কখনোই তার লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব হবে না; কারণ সে যখন অর্ধেক পথ অতিক্রম করবে তখনো বাকি অর্ধেক অতিক্রম কবার জন্য তার সময় লাগবে এবং এই প্রক্রিয়া অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে। আর দেশ যদি ছেদযুক্ত হয তাহলে একটি তীরের পক্ষে কখনোই এগোনো সম্ভব নয়, কারণ তীরটি হয 'ক' বিন্দুতে থাকবে, না হয় তাব পরবর্তী 'খ' বিন্দুতে, এবং 'ক' আর 'খ'-এর মাঝে কিছুই নেই। জেনোর এইসব কূটপ্রশ্ন একেবারে যে নিরর্থক ছিল তা নয়। এর মধ্যে দিয়ে গণিতে *যুক্তিগত নিশ্ছিদ্রতার* সন্ধান শুরু হয়। এইসব সূক্ষ্মবিচাবের সাহায্যে তাঁবা প্রমাণ করতেন যে চোখে-দেখা এই জগতের কোনো অস্তিত্ব আসলে থাকতে পারে না। তবে এগুলির সাহায্যে অনায়াসেই এটাও প্রমাণ কবা যায় যে বিশুদ্ধ যুক্তিবিচাব জিনিসটা এতই হাস্যকর আর শূন্যগর্ভ যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শত চেষ্টা করেও সে হাস্যকরতার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়।

পরমাণু ও শূন্যতা : ডিমক্রিটাস*

এইসব ভাববাদী প্রবণতাব বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর জবাব দিয়েছিলেন ডিমক্রিটাস, যাঁর *পরমাণুবাদ* পরবর্তীকালে বিজ্ঞানকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। কতকগুলো আদর্শ সংখ্যা দ্বারা গঠিত ব্রহ্মাণ্ডের বদলে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য বা অ-'কাটা' (a-tomos) কণিকায় পূর্ণ এক ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা কবলেন। শূন্য দেশের মধ্যে চলমান সেইসব পরমাণুকে বদলানো যায় না। এই ব্যাপারে তিনি পার্মেনিডিস-এর অপরিবর্তনীয়তা-তত্ত্বের সঙ্গে একমত। কিন্তু অতঃপর তিনি

* লিউকিপ্পাস বা ডিমক্রিটাসের আগেই ভারতীয় দর্শনে পরমাণুবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, একথা আজ মোটের উপর স্বীকৃত। বৈশেষিক সূত্রে কণাদ এবং ন্যাযসূত্রে গৌতম ঋষি পরমাণুতত্ত্বের অবতরণা করেন। বৈশেষিক দর্শনে বস্তুবাদী প্রবণতা খুবই প্রবল। এই দর্শন অনুসারে পরমাণুসমূহ অক্ষয়, অবিভাজ্য এবং অদৃশ্য। একটি স্বতন্ত্র পরমাণুর ব্যাপ্তিগুণ না থাকলেও অন্যান্য পরমাণুর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে তা ব্যাপ্তিগুণসম্পন্ন যাবতীয় বস্তু গঠন করে। পরমাণুসমূহের এই সম্মিলনকে নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্বাত্মা। ন্যায়দর্শন অনুসারে, বস্তুবিশ্ব পরমাণু দ্বারা গঠিত, যাবতীয বস্তু এইসব পরমাণুর সম্মিলনে গঠিত। ব্রহ্মাণ্ডে অগণিত আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে, তারা কেউ কেউ মুক্ত অবস্থায বিরাজ করে, কেউ কেউ আবার বস্তুগঠিত পরমাণুকণার সঙ্গে যুক্ত থাকে। ঈশ্বর এইসব পরমাণু ও আত্মার স্রষ্টা নন, তিনি কেবল পরমাণুসমূহের সম্মিলনের নিযন্তা। তিনিই আত্মাকে পরমাণু-কণার সঙ্গে যুক্ত বা বিযুক্ত করেন। -অনু

বললেন, পরমাণুগুলির নানারকম জ্যামিতিক আকার হয়, তারই ফলে তারা সম্মিলিত হয়ে বিশ্বের যাবতীয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তু গঠন করতে পারে। যেসব পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে তার মূলে আছে পরমাণুসমূহের *চলন।* এইভাবে ডিমক্রিটাস পিথাগোরাসের ভাবনার গাণিতিক দিকটি, বিশেষত জ্যামিতিক আকারের গুরুত্বের দিকটি গ্রহণ করে তার ভাববাদ ও রহস্যবাদের দিকটি বর্জন করতে সমর্থ হলেন।

দর্শনের মধ্যে শূন্যতার ধারণার প্রবর্তনও ছিল এক বিরাট সাহসিক পদক্ষেপ। পূর্ববর্তী দার্শনিকদের কল্পনায় ব্রহ্মাণ্ড ছিল নিশ্ছিদ্র, বস্তুনিবিড়। প্রত্যেক মর্যাদাবান দার্শনিকই শূন্যস্থান বা *শূন্যাবস্থার* (vacuum) ধারণাটিকে পরিহার করতেন। এবং সেই সূত্রে তাঁরা মনে করতেন, প্রকৃতিও বুঝি শূন্য অবস্থাকে পরিহার করে। পরবর্তীকালে রেনেসাঁস যুগের পদার্থবিদ্যায় যেসব মহতী সিদ্ধি অর্জিত হয় (যেমন গ্যালিলিও'র গতিবিজ্ঞান), কিংবা আরো পরে যে উন্নতি ঘটে বিজ্ঞানে (যেমন গ্যাসের নিয়মাবলী) বা প্রকৌশলে (যেমন বাষ্পীয় এনজিন), তার অনেকটাই ঐ ভুল ধারণাকে উৎখাত করার প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়।

পরমাণুতত্ত্বের মধ্যে প্রথম থেকেই এক ধরনের বিদ্রোহী রাজনীতির গন্ধ ছিল। কারণ ঐ তত্ত্ব খুব স্পষ্টতই বস্তুবাদী ছিল, এবং কোনোরকম পূর্বনির্দিষ্ট সুসংগতি বা সৌষম্যের কথা বলত না।প্লেটো আর অ্যারিস্টটলের ভাবধারার দাপটে এ তত্ত্ব ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়নি। এঁরা দুজন পরোৎকৃষ্ট আদর্শ বা ভাবসত্তা (ideal) এবং মানস-আরোপিত বস্তু-আকারের (substantial form) মতের সমর্থক ছিলেন। তৎসত্ত্বেও গোটা ধ্রুপদী কাল জুড়ে ডিমক্রিটাসের পরমাণু-কণাবাদ এক বিরোধী মত হিসেবে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। শুধু তাই নয়, এপিকিউরাস আর লুক্রেশিয়াসের মারফৎ তা দর্শন ও নীতিশাস্ত্রকেও পরবর্তীকালে কিছুটা প্রভাবিত করে। পরমাণুবাদ-কল্পিত বিশ্ব এমনই যার বিভিন্ন অঙ্গ প্রাকৃতিক নিয়মে কাজ করে চলে, তাই কোনো ঐশ্বরিক নির্দেশ ছাড়াই তা আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম। ডিমক্রিটাসের পরমাণুবাদ অবশ্য সম্পূর্ণত পরিণামবাদী (deterministic) ছিল। পরে এপিকিউরাস তার কিছুটা ব্যাপ্তি ঘটান। তিনি বলেন যে পরমাণুদের খানিকটা নিজস্ব বৈচিত্র্য বা ঝোঁক থাকা সম্ভব; এর সাহায্যে তিনি মানুষের বিভিন্নতা ও নিজস্ব ইচ্ছাশক্তিকে ব্যাখ্যা করেন।

এই গ্রীক পরমাণুবাদকে পদার্থবিদ্যার এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ভাবলে অবশ্য ভুল হবে। কেননা, এই ধারণা থেকে এমন কোনো সিদ্ধান্ত আহরিত হয়নি যাকে বাস্তবে যাচাই করা সম্ভব। তবু আধুনিক পরমাণুতত্ত্বের যাবতীয় রূপের স্বীকৃত আদিবীজ ঐ পরমাণুবাদ। আধুনিক পরমাণুতাত্ত্বিকদের মধ্যে যিনি প্রথম, সেই গাসঁদি সবাসরি ডিমক্রিটাস আর এপিকিউরাস্-এর কাছ থেকে তাঁর ধারণা গ্রহণ করেছিলেন। নিউটন নিজে ছিলেন উদগ্র পরমাণুবাদী। নিউটনের কাজের দ্বারা উৎসাহিত হয়েই অবশেষে জন ড্যাল্টন রসায়নে পরমাণুতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। রসায়নের এই পরমাণুগুলো যে আদৌ 'পরম' বা অবিভাজ্য নয় তা আজ প্রমাণিত; তবু একথা অনস্বীকার্য যে নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যার গভীরতর যা কিছু ব্যাখ্যা সেসবই ঐ পরমাণুবাদী চিন্তাধারার খাতেই প্রবাহিত।

পেরিক্লিস যুগ

479 খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধের অবসানের পর এথেন্স শহর গ্রীক দুনিয়ার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতা হয়ে ওঠে। সাহসের সঙ্গে একটানা শত্রুর মোকাবিলা করার মধ্যে দিয়ে এথেন্স সে মর্যাদা অর্জন করে। তার সাফল্যের এক প্রধান কারণ ছিল লোরিঅন্-এর রূপোর খনি থেকে প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহার। থেমিস্টোক্লিস্-এর পরামর্শে এথেন্স এক নৌবাহিনী গড়ে তোলে। সে নৌবাহিনীতে কাজ করত অপেক্ষাকৃত দরিদ্র নাগরিকরা। এই

নৌবাহিনীর দৌলতে এথেন্‌স শুধু যে বিজয় অর্জন করে তাই নয়, এরই দৌলতে এথেন্‌সের সরকারে সাধারণ মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত হয়। বাণিজ্যক্ষেত্রে এথেন্‌সের প্রাধান্য তার সম্পদ আরো বাড়িয়ে তোলে। শুধু চিত্রকর ও ভাস্করই নয়, ইতিহাসবিদ ও দার্শনিকরাও এথেন্‌সের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তী একশো বছর ধরে এথেন্‌সই হয়ে দাঁড়ায় গ্রীক দুনিয়ার মননকেন্দ্র। এমনকি স্পার্টার সঙ্গে বিপর্যয়কর যুদ্ধের পরেও এ অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। আয়োনীয় বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার, বিশেষ করে আয়োনীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের পিথাগোরীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করে এথেন্‌স।

বিশ্ববিজ্ঞানের বিকাশে এই পর্বটির গুরুত্ব অপরিসীম। আয়োনীদের কাব্যময় দূরকল্পনার সঙ্গে অ্যালেকজান্ড্রীয়দের সূক্ষ্ম ও নিখুঁত গণনার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে এই পর্ব। বস্তুত, আয়োনীয় দার্শনিকদের মধ্যে যিনি শেষতম, ক্লাজোমেনি থেকে আগত সেই অ্যানাক্সাগোরাস এথেন্‌সেই বসতি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন পেরিক্লিসের বন্ধু। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে অত্যধিক যুক্তিপ্রবণতার দরুন তাঁকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল।

বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান প্রশ্নসমূহ এই পর্বেই উত্থাপিত হয়েছিল—সমাজবিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিষয়ক বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে সেইসব প্রশ্নের নানা ধরনের সমাধানের প্রস্তাব একের পর এক উত্থাপিত হতে থাকে। উল্লিখিত পর্বটি থেকেই গ্রীক বিজ্ঞান এক স্বয়ংস্বতন্ত্র চরিত্র অর্জন করে। আপন সীমাবদ্ধতার গণ্ডির মধ্যেই অবশ্য সেই বিশেষ চরিত্রটি গড়ে ওঠে, যদিও তারা নিজেরা সে সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বহুলাংশে অনবহিত ছিল। প্রকৃতিবিষয়ক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই বিশেষ চরিত্রটি ছিল: গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানকেই সত্যের কষ্টিপাথর হিসেবে গণ্য ক'রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং তার পাশাপাশি, খানিকটা নিম্ন স্তরে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষার উপায় হিসেবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর গুরুত্বারোপ।

জ্যামিতির বিজয়তোরণ

অমূলদ রাশির আবিষ্কারের পর থেকেই গ্রীক গণিতজ্ঞরা সংখ্যা ছেড়ে রেখা আর ক্ষেত্রের প্রতি মনোযোগী হন, কেননা তাতে ঐ ধরনের যুক্তিশাস্ত্রীয় সমস্যার উদ্ভব হয় না। এরই ফলে পরিমাপনির্ভর *জ্যামিতি* গড়ে *ওঠে*—যা সম্ভবত বিজ্ঞানে গ্রীকদের সবচেয়ে বড়ো অবদান। কারণ ব্যাবিলোনীয় গণিত এবং তার উত্তরসূরী ভারতীয় ও ইসলামি গণিত প্রধানত পাটীগণিত ও বীজগণিতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। গ্রীক গণিতের এই রূপান্তরের মূলে ছিলেন দুই ব্যক্তি—কিঅস্‌-নিবাসী হিপক্রেটিস (প্রায় 450 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এবং ইউডক্সাস (408-355 খ্রি· পূ·)। এথেন্‌সে ইউডক্সাস্‌-ই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি পড়িয়ে টাকা নিতেন। তিনিই প্রথম অক্ষরের সাহায্যে জ্যামিতিক চিত্র চিহ্নিত করেন। বৃত্তকে বর্গক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা বা ঘন-কে দ্বিগুণিত করার ধ্রুপদী সমস্যার জ্যামিতিক সমাধান বার করার প্রয়াসে রত ছিলেন তিনি। সে সমাধান তিনি বার করতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু ঐ প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে তিনি অতি মূল্যবান কতকগুলি প্রতিজ্ঞা-মালা প্রমাণ করেন। পরবর্তী কালে ইউক্লিড সেগুলির ভিত্তিতেই তাঁর 'Elements' রচনা করেন।

গ্রীক গণিতজ্ঞদের মধ্যে ইউডক্সাস সম্ভবত মহত্তম। অনুপাতের তত্ত্ব তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন, যা ছোটোবড়ো যে কোনো রাশির প্রতিই প্রযোজ্য। রেখা আর ক্ষেত্রের পরিমাপের জন্য একাদিক্রমিক আসন্নায়নের (successive approximation) পদ্ধতির আবিষ্কারটি তাঁরই। পরে এই পদ্ধতি আর্কিমিডিসের হাতে ব্যাপকতর রূপ লাভ ক'রে অবশেষে অণুকলনের (infinitesinal calculus) ভিত্তি রচনা করে।

গোলীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান

পিথাগোরীয় বিশ্বছবির যুক্তিশাস্ত্রীয় উদ্ভবও এই পর্বেরই ঘটনা। এক্ষেত্রেও প্রধান ব্যক্তি ছিলেন সেই ইউডক্সাস। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল গণিতের মতোই সুগভীর সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহদের চলনকে তিনি এককেন্দ্রীয় কতকগুলি গোলকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হলেন। তিনি দেখালেন, ঐ গোলকগুলোর প্রত্যেকটি পরবর্তী গোলকটির মধ্যে অবস্থিত একটি অক্ষের চারপাশে ঘুরে চলেছে। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে মডেলটি বানান তা যতই স্থূল ও যান্ত্রিক হোক, সত্যিকারের ধাতব গোলকের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ চালানোর এই পদ্ধতিটি প্রাচীন 'gnomon' বা মুখপট্ট (dial) অপেক্ষা অনেক নমনীয় ছিল। আজ পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানে যত যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছে সেসবের আদি উৎস তাঁর ঐ মডেল। তাঁর ঐ গোলকতত্ত্ব ছিল সরল—এতই সবল যে ব্যাবিলোনীয়রা যেসব ঘটনা বহু আগে থেকেই জানত, সেগুলোকেও এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো না। যেমন শরৎ-হেমন্ত ঋতু 89 দিন 19 ঘণ্টা আর শীতকাল 89 দিন 1 ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়; কিন্তু বসন্তকাল 92 দিন 20 ঘণ্টা আর গ্রীষ্মকাল 93 দিন 14 ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়। শরৎ-হেমন্ত ও শীতকালের এই আপেক্ষিক হ্রস্বতার কারণ ইউডক্সাসের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেল না। সেকালে এইসব ত্রুটিকে অবশ্য খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হতো না। তাঁরা মনে করতেন, জ্যোতিষ্কলোকের ঘড়িকলটাকে আরো জটিল করে তুলতে পারলে এসব গরমিল মিলে যাবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে এবং নানাবিধ সমস্যারও উদ্ভব হতেই থাকে, যতদিন না কোপার্নিকাস আর নিউটন এসে মুশকিল আসান করে দেন।

গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞান: হিপক্রেটিস

সুসংবদ্ধ এক বিশ্বছবি গড়ে তোলার পথে গ্রীকরা আরো একটি অবদান রাখে। তারা চিকিৎসাশাস্ত্রের অভিজ্ঞতানির্ভর এবং দর্শননির্ভর দুটি ধারা গড়ে তোলে। সেই থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞান ঐ দুই খাতে এগিয়ে চলেছে। গ্রীক গণিতের মতো গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞানও প্রাচীন সভ্যতাগুলির ঐতিহ্যের সঙ্গে এক অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় যুক্ত ছিল। গ্রীক ডাক্তাররা ছিলেন 'এস্‌ক্লেপিয়াডেআ' বা এস্‌ক্লেপিয়াস্-কুলের অন্তর্ভুক্ত। এই এস্‌ক্লেপিয়াস অর্ধ-ঈশ্বর জ্ঞানে পূজিত হতেন। এস্‌ক্লেপিয়াস-কুল ছিল পেশাভিত্তিক জ্ঞাতিসমাজ বা সংঘ। আজও ডাক্তারদের যে 'হিপক্রেটীয় শপথ' গ্রহণ করতে হয় তা আসলে ঐ প্রাচীন বৈদ্যসমাজের সভ্য হিসেবে গৃহীত হবার এক উৎসব অনুষ্ঠানের পুরাবশেষ, যা মোটামুটি অক্ষতভাবেই সংরক্ষিত হয়েছে। ঐ বৈদ্যসমাজের সভ্য এবং তাদের পরিবারের প্রতি কতকগুলো অবশ্যপালনীয় কর্তব্য এই শপথের অন্তর্গত (যা আজও পালন করা হয়ে থাকে)। যেমন, এই শপথের একটি ধারায় রয়েছে: 'নৈতিক উপদেশ, পাঠদান এবং শিক্ষাদানের অন্যান্য যাবতীয় পদ্ধতির সহায়তায় আমি এই বিদ্যা শিখাইব: কেবল আমার আপন পুত্রগণকেই নহে, আমার শিক্ষকের পুত্রগণকেও। বৈদ্য-নিয়ম অনুসারে যাহারা অঙ্গীকার ও শপথ গ্রহণ করিয়াছে সেইসকল শিষ্যদেরও আমি এই বিদ্যা শিখাইব। কিন্তু ইহারা ব্যতীত অপর কাহাকেও এই বিদ্যা শিখাইব না'। প্রাচীনতর সভ্যতাগুলিতে যেমন তেমনি গ্রীসেও ডাক্তাররা ছিলেন একধরনের অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁরা প্রধানত ধনবান মক্কেলদেরই চিকিৎসা করতেন। সাধারণ লোকের চিকিৎসার ভার থাকত ঠাকুমা-দিদিমা আর মেকি-ডাক্তারদের হাতে। এঁরা টোটকা, জড়িবুটি বা তুকতাকের সাহায্যে চিকিৎসা করতেন।

গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রথম ধারাটির সঙ্গে যে কিংবদন্তী-প্রতিম চিকিৎসকের নামটি জড়িয়ে আছে তিনি হলেন কজ-নিবাসী হিপক্রেটিস। হিপক্রেটিয় রচনাসংগ্রহ বলে যে জিনিসটি পরিচিত তা হচ্ছে বহুসংখ্যক চিকিৎসা-গ্রন্থের সমাহার। সম্ভবত 450 থেকে 350 খ্রিস্টপূর্বাব্দের

মধ্যে এগুলি রচিত হয়েছিল। এইসব রচনার মধ্যে চিকিৎসা সম্বন্ধে যে মনোভাবটি ফুটে ওঠে তা কঠোরভাবে রোগ পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক। চিকিৎসাবিজ্ঞানকে তখন রোগী সারানোর এক কৌশল বা বিদ্যা বা technè রূপে গণ্য করা হতো। হিপক্রেটিসের যে উদ্ধৃতিটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সেটি ডাক্তাররা জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের পাছে খেতে দেন, সে ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়ার উপলক্ষ্যে রচিত: 'জীবন হ্রস্ব, এই বিদ্যা সুদীর্ঘ; সুযোগ ক্ষণস্থায়ী; পরীক্ষা বিপজ্জনক এবং বিচার কঠিন কর্ম। তথাপি কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত থাকিতেই হইবে—কেবল আমাদিগকেই নহে, রোগীর পরিচর্যাকারী এবং বাহ্য পরিস্থিতি সমুদয়কেই সহযোগিতা করিতে হইবে।' প্রত্যেকটি 'কেস' নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে ভাবতে হবে, কিন্তু তা নিয়ে মতামত নির্ভর করবে অন্যান্য অনুরূপ 'কেস' পর্যবেক্ষণের ওপর। এই ব্যাপারে হিপক্রেটিস ঘরাণা মিশরী ডাক্তারদেরই উত্তরাধিকারী। রোগের জাদুঘটিত বা ধর্মীয় কারণ বা চিকিৎসার কোনো উল্লেখ নেই এই ঘরানার রচনায়। বরং হিপক্রেটিস এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এইসব কারণকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন, 'পবিত্র' রোগ বলে কথিত অপস্মার বা মৃগিরোগ সম্বন্ধে এক জায়গায় তিনি বলছেন: 'আমার এইরূপ মনে হয় যে পবিত্র বলিয়া কথিত এই রোগটি আদৌ স্বর্গজাত বা দৈব নহে; বস্তুত কোনো রোগই তাহা নহে। সকল রোগের মতো এই রোগেরও প্রাকৃতিক কারণ রহিয়াছে। লোকে ইহাকে স্বর্গজাত বা দৈব রোগ মনে করে এই কারণে যে তাহারা ইহাকে বুঝিতে পারে না। ...প্রকৃতিতে সমুদয় ব্যাপারের মধ্যে একটি সাদৃশ্য বিদ্যমান; তাহা এই যে প্রত্যেকটি ব্যাপারই পূর্ববর্তী কোনো কারণপ্রসূত।' শুধু তাই নয়, কজ-এর এই ঘরাণা চিকিৎসাবিজ্ঞানে দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োগের প্রতিও খড়্গহস্ত ছিল। 'প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র' শীর্ষক রচনায় (সফিস্ট প্রোটাগোরাস যার রচয়িতা বলে অনুমিত) দেখি: 'অনেকেই রোগ নিরাময়কৌশলের আলোচনা করেন কোনো একটি পূর্বানুমানের ভিত্তিতে। যাঁহারা যাহা খুশি তাহাই অনুমান করিয়া লন—কেহ তপ্ততা, কেহ শৈত্য, কেহ আর্দ্রতা, কেহ বা শুষ্কতা-গুণকে বাছিয়া লন। ইঁহাদের মতে মনুষ্যের রোগ ও মৃত্যু কেবল একটি বা দুটি পূর্বানুমিত কারণবশতই ঘটে। স্পষ্টতই ইঁহারা ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তি নিরতিশয় দোষাবহ। কারণ এমন একটি ক্ষেত্রে তাঁহারা ভ্রান্ত যাহা একটি বিদ্যা বা প্রকৌশল *(technè)*—এমনই এক প্রকৌশল যাহা সমুদয় মনুষ্যই জীবনের বিভিন্ন সংকটকালে প্রয়োগ করে; এই বিদ্যার চর্চাকারীগণ এবং কারুকৃৎগণ কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করিলে সাতিশয় সম্মানের অধিকারী হন।' এই তীব্র ধিক্কার সত্ত্বেও চিকিৎসাশাস্ত্রে দর্শনভিত্তিক অনুমানের অনুপ্রবেশ বাড়তেই থাকে। এমনকি হিপক্রেটিস-ঘরানার লেখাপত্রেও তার অনুপ্রবেশ ঘটে।

তার একটা কারণ হলো শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত (physiology) নিয়ে চর্চার সূত্রপাত। যেমন পিথাগোরাসের আল্‌ক্‌মিঅন্ নামক এক শিষ্য ব্যবচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে স্নায়ুর ক্রিয়া সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করেন; তিনি সাহস করে এই কথা বলেন যে হৃৎপিণ্ড নয় মস্তিষ্কই হলো সংবেদন ও চলনের নিয়ন্ত্রণকারী অঙ্গ। কার্যক্ষেত্রে এই ঘটনাটা নিশ্চয়ই আদিমযুগের শিকারীদেরও জানা ছিল। তবু দুহাজার বছর পরেও ডাক্তাররা কিছুতেই এই সত্যকে স্বীকৃতি দিতে চাননি। অথচ অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী তত্ত্বগুলোকে তাঁরা অনেক সহজে স্বীকৃতি দিতেন। অপর একজন পিথাগোরাসপন্থী ফিলোলাউস মানুষের ত্রি-আত্মার তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। একটি হলো স্থিতিশীল উদ্ভিদ-আত্মা; ইনি নাভিতে অধিষ্ঠিত। যাবতীয় বর্ধনশীল বস্তুর মধ্যেই এঁর অবস্থান। দ্বিতীয়টি হলো চলৎ-আত্মা, যিনি কেবল মানুষ আর পশুদের মধ্যে বিরাজ করেন। ইনিই সংবেদন ও চলনের নিয়ন্তা; এঁর অধিষ্ঠান হৃৎপিণ্ডে। তৃতীয়টি হলো বৌদ্ধিক আত্মা। একমাত্র মানুষের মধ্যেই এর অস্তিত্ব আছে। এঁর অধিষ্ঠান মস্তিষ্কে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে

শারীরতত্ত্ব আর শারীরস্থানবিদ্যার ক্ষেত্র জুড়ে এইসব আত্মারা দাপাদাপি করে বেড়ায়। এদের দাপটে মানুষ তার নিজের ইন্দ্রিয়লব্ধ সাক্ষ্যকে ব্যবহার করতে ভয় পেত। অবশেষে হার্ভে এসে ভূত ছাড়িয়ে সুস্থতা বিধান করেন।

রসতত্ত্ব

তত্ত্বে ও প্রয়োগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছিল শরীরের চারটি রসের মতবাদ। এ মতের আদি প্রবক্তা ছিলেন এম্পিডক্লিস। একাধারে ডাক্তার ও দার্শনিক হওয়ায় তিনি স্বভাবতই তাঁর বিশ্বজাগতিক ধ্যানধারণাকে চিকিৎসাতত্ত্বের ওপর আরোপ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চারটি মূল উপাদান বা বস্তুমূল দ্বারা গঠিত; সুতরাং মানুষ সমেত যাবতীয় সপ্রাণ সত্তার মধ্যেও নিশ্চয়ই ঐ চারটি উপাদানের অস্তিত্ব রয়েছে। খুব সম্ভব প্রাচীনতর নানা অতীন্দ্রিয়বাদী আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ হচ্ছে এক অণুবিশ্ব (microcosm), এক ক্ষুদ্র জগৎ—যা নিজের মধ্যে মহাবিশ্বের (macrocosm) এক মডেল রচনা করে রেখেছে। অগ্নি, মরুৎ, অপ্ ও ক্ষিতি—বিশ্বের এই চারটি মূল উপাদানের সঙ্গে তুলনীয় চারটি রস শরীরে থাকে; তারা হলো: রক্ত, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও কৃষ্ণপিত্ত (black bile)। আলকেমি বা অপরসায়নে কথিত চার পবিত্র বর্ণের আধার এগুলি—লোহিত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণ। এই চারটি রসের মধ্যে যেটি প্রবল সেইটিই মানুষের স্বভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে; কেউ আত্মস্থ ও হাসিখুশি, কেউ রাগী, কেউ ভাবলেশহীন, কেউ বিষণ্ণ। এর ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ মত গড়ে ওঠে, যা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিশাসিত। এর প্রভাবে আদি হিপক্রেটীয় ঘরানা কর্তৃক প্রবর্তিত রোগ-নিরাময়ের ব্যবহারিক প্রকৌশল শত শত বছর ধরে চাপা পড়ে থাকে। রসতত্ত্ব অনুসারে চিকিৎসার লক্ষ্য হলো মূল উপাদানসমূহের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা। পরস্পরবিপরীত একেক জোড়া গুণকে নিয়ন্ত্রণ করে এই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হয়—যেমন তপ্ততা আর শীতলতা, সিক্ততা আর শুষ্কতা। রসতত্ত্ব অনুযায়ী এইসব গুণই মূল উপাদানগুলিকে নির্ধারণ করে। অগ্নি গরম এবং শুষ্ক, বায়ু গরম এবং ভিজে, জল ঠাণ্ডা এবং ভিজে, মাটি ঠাণ্ডা এবং শুষ্ক। কারো যদি জ্বর হয়, তাহলে তার প্রয়োজন আরো শীতলতা; কারো যদি শীত করে তাহলে তার প্রয়োজন আরো তাপ।

আজকে এটা স্পষ্ট যে শারীরবৃত্তীয় ঘটনাবলীর সঙ্গে এসবের কার্যত কোনো সম্পর্ক ছিল না। এসবের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা চিকিৎসাশাস্ত্র যে সুফল দিতে পারবে না, সেটাই স্বাভাবিক। মুশকিল এই যে সতর্কভাবে রোগ পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সত্ত্বেও কজ-ঘরানাও কিন্তু রোগের কার্যকর চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত করতে অপারগ ছিল। তাঁরা রোগের গতিপ্রকৃতি সুন্দরভাবে নির্ধারণ করতে পারতেন, কিন্তু কষ্টদায়ক বা অনুপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা ছাড়া বাকি যা কিছু তাঁরা করতেন তা হলো প্রকৃতির নিজস্ব নিরাময়কারী প্রভাবের ওপর ভরসা করে রোগীকে রেখে দেওয়া। কাজেই চিকিৎসাকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ সেই তত্ত্বকেই বেশি গুরুত্ব দিলেন যাতে নিরাময়ের ব্যাপারে প্রকৃতি অপেক্ষা চিকিৎসকের অবদান বেশি বলে স্বীকৃত; যে তত্ত্ব চিকিৎসকদের কাজকে একটি দর্শনের মর্যাদা দিত, বলত যে সে-দর্শনের চর্চা সর্বোত্তম শ্রেণীর মানুষ ছাড়া আরো কারো কর্ম নয়।

6. এথেন্‌সের কর্মকৃতি

এথেন্‌সের সামাজিক দর্শন

গ্রীক চিন্তাধারার দ্বিতীয় এবং কেন্দ্রীয় পর্বটিতে দর্শনচর্চার মূল স্রোত বস্তু অপেক্ষা ভাবের দিকেই ধাবিত হলো। তখনো বিজ্ঞান দর্শনেরই অঙ্গ। এক নাটকীয় প্রক্রিয়ায় এথেন্‌সের নগর-রাষ্ট্র এথেন্‌সীয় সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে সেই প্রক্রিয়ারই অন্তিম অধ্যায়ের প্রতিফলন এই ভাববাদমুখী পরিবর্তনের মধ্যে লক্ষণীয়। আজও এইসব ঘটনাবলীর গুরুত্ব বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অপরিসীম। তার কারণ দুটি। প্রথমত, ঐ প্রক্রিয়ায় সমাজের নতুন নতুন শক্তি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, থুকিদিদিস প্রমুখ ইতিহাসবিদের কলমে ঐসব ঘটনাবলীর বিবরণ ভবিষ্যৎকালের জন্য অতি স্পষ্ট ও অপরূপভাবে চিত্রিত হয়। সচেতনভাবে সংগঠিত নাগরিক গণতন্ত্রের উদ্ভবের মধ্যে দিয়ে সেই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। মানব ইতিহাসে গণতন্ত্রের সেই প্রথম আবির্ভাব। সে গণতন্ত্র যতদিন স্থায়ী হয়েছিল তার মধ্যেই তার সুবিপুল সৃজনশীলতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। পার্থেনন এবং এথেন্‌সীয় ট্র্যাজেডি নাট্য আজও তার সাক্ষী। পরিশেষে তার পতন ঘটল এইজন্যে যে তা দাসপ্রথা এবং বিদেশী এলাকাকে কাজে লাগানোর ওপর নির্ভরশীল ছিল। রাষ্ট্র হিসেবে স্পার্টার চরিত্র ছিল অনেক বেশি আদিম, কিন্তু পারসিক স্বর্ণের সহায়তা তাকে শক্তিশালী করে। স্পার্টার মধ্যে অভিজাততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া মূর্ত রূপ ধারণ করে। তারই আক্রমণে ভেঙে পড়ে এথেন্‌সীয় গণতন্ত্র।

এথেন্‌সের গণতন্ত্রের পতন ধ্রুপদী সভ্যতার পটপরিবর্তন ঘটায়। সামাজিক জীবনের ওপর জনগণেব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার কিংবা ধনবানদের শাসনকে উৎখাত করার লক্ষ্যে ঐ গণতন্ত্র যতটা এগোতে পেরেছিল, পরবর্তীকালের ধ্রুপদী সভ্যতায় আর কোনোদিনই তা সম্ভব হয়নি। ঐ গণতন্ত্রের পতনের পর গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলোর যথেষ্ট জাগতিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল, তাদের মননকৃতিও যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিল; তবু তাদের ধ্বংস ছিল অনিবার্য। কেননা, লৌহযুগের নগর-অর্থনীতিতে যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছিল, তা থেকে রেহাই পাবার একটা পথ প্রায় তৈরি হয়ে উঠেছিল এথেন্‌সীয় গণতন্ত্রের মধ্যে। সে পথ ব্যর্থ হওয়ার পর বিকল্প হিসেবে অন্য একটি পথই কেবল খোলা থাকে। সেটি হলো: নগর-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দাসপ্রথাকে আরো জোরদার করা আর বিদেশে সামরিক অভিযান চালানো। এরই ফলে পরবর্তী পাঁচটি শতক জুড়ে গ্রীক সভ্যতা পৃথিবীর ব্যাপক অংশে ছড়িয়ে পড়ে ঠিকই, কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ বিকাশ থেমে যায়।

প্রতিক্রিয়ার দর্শন

গ্রীসের প্রসিদ্ধ তিন দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল এথেন্‌সেরই সন্তান বটে, কিন্তু সে হলো অবক্ষয়ী এথেন্‌স। মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করার কাজে এঁদের পারদর্শিতা আর ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। মানব ইতিহাসের প্রথম স্বাধীন নগরের বৈপ্লবিক মহত্ত্ব থেকেই তাঁরা সে ক্ষমতা আহরণ করেছিলেন। কিন্তু আহরিত সেই ক্ষমতাকে তাঁরা প্রতিবিপ্লবের স্বার্থে নিয়োগ করেন। সক্রেটিস (অন্তত প্লেটোর কলমে তিনি যেভাবে চিত্রিত হয়েছেন), প্লেটো স্বয়ং, এবং অ্যারিস্টটল—এঁরা প্রত্যেকেই গণতন্ত্র সম্পর্কে যে তাচ্ছিল্যের মনোভাব প্রকাশ করেছেন তা থেকে তাঁদের গণতন্ত্রভীতি বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। বস্তুত, 'দার্শনিকরা এতাবৎ বিশ্বকে কেবল অনুধাবনই করতে চেয়েছেন; যেটা দরকার তাহলো বিশ্বকে বদলে ফেলা'—এই কথার মধ্যে মার্ক্স দার্শনিকদের সম্বন্ধে একটু বেশি উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন (অথবা হয়তো তিনি তাঁর অতি প্রিয় এপিকিউরাস্-এর কথাই বলতে চেয়েছিলেন)। কেননা প্লেটো খুব

সচেতনভাবেই *বিশ্ব যাতে বদলাতে না পারে*, অন্তত গণতন্ত্রের অভিমুখে রূপান্তরিত না হতে পারে, সেই লক্ষ্যসাধনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

সক্রেটিস ও যুক্তিশাস্ত্র

গ্রীক চিন্তাধারায় ভাববাদী প্রতিক্রিয়া এক নতুন কৌশলের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হলো—সেটি হলো *লজিক* অর্থাৎ কথার ব্যবহার (কথা=words=logoi)। গণতান্ত্রিক যুগে এথেন্সের রাজনীতিতে যুক্তিবিস্তার এবং বাগ্মিতার গুরুত্ব ছিল খুবই বেশি—অন্য অধিকাংশ গ্রীক নগরের তুলনায় বেশি। খ্যাতি ও সমৃদ্ধি লাভের সুনিশ্চিত পথ ছিল যুক্তিবিস্তারের ও বাগ্মিতার নৈপুণ্য। এর ফলে কথা ও তার অর্থ নিয়ে বিশেষ ধরনের আগ্রহ জাগে। কর্মের মাধ্যমে বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করার বদলে কথার মাধ্যমে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক লাভজনক হয়ে ওঠে। একদল বিচক্ষণ পেশাদার মানুষের উদ্ভব হয় (যাঁদের বলা হতো 'সফিস্ট') যাঁরা জীবনে সাফল্য অর্জনের এই পথটি মানুষকে শেখাবার জন্য সদা আগ্রহী ছিলেন—অবশ্যই দক্ষিণার বিনিময়ে। প্রোটাগোরাস ছিলেন এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। 'সবকিছুরই মাপকাঠি হচ্ছে মানুষ'—এই বিখ্যাত বচনটি তাঁরই। পরম জ্ঞান অপেক্ষা মানবিক প্রথা বা রীতিনীতির গুরুত্ব যে বেশি, সেই ধারণা এই বচনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়। প্রোটাগোরাস-এর প্রতিপক্ষ ছিলেন সক্রেটিস স্বয়ং। তিনি এমন এক যুক্তিপ্রণালী গড়ে তোলেন যার সাহায্যে প্রতিপক্ষের নিজের জ্ঞান সম্বন্ধে একপ্রস্থ প্রশ্ন করে জনসমক্ষে সহজেই প্রমাণ করে দেওয়া যেত যে প্রতিপক্ষ নিজেই জানে না তার বক্তব্য কী। সক্রেটিসের মতে মানুষের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যক্তিগতভাবে ভালো বা সৎ হওয়া; জ্ঞান আহরণ করতে পারলে আপনা থেকেই ভালো বা সৎ হওয়া যাবে। ভালোত্ব বা সদাশয়তার গ্রীক প্রতিশব্দ হলো *arete*, আর লাতিন হলো *virtus;* দুটিরই আদি অর্থ বীরোচিত পৌরুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট: Ares ছিলেন রণদেবতা। অনেক পরে ঐ সদাশয়তার আদর্শ অনেক নরম হয়ে প্রথমে নাগরিকতার আদর্শে এবং অতঃপর খ্রিস্টীয় নম্রতার আদর্শে রূপ নেয়। সক্রেটিসের মতে যে জ্ঞান থেকে সদাশয়তার জন্ম হয় তা ভৌত জ্ঞান নয়; বস্তুত সে জ্ঞান আদৌ শিক্ষণীয় জ্ঞানই নয়; যাবতীয় *অভিমতকে* প্রত্যাখ্যান ক'রে অন্তরের *স্বজ্ঞার*(intuition) ওপর নির্ভর ক'রে সে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এ ব্যাপারে সক্রেটিসের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক চৈনিক দার্শনিক লাওৎসের মিল আছে। লাওৎসে-ও সামাজিক প্রথা বা রীতিনীতি সম্বন্ধে একই রকম সন্দিহান এবং অন্তরের স্বাভাবিক 'সহজ' সত্যের ওপর একই রকম বিশ্বাসী ছিলেন।

সক্রেটিসের একান্ত নিজস্ব এক ইষ্টদেবতা ('daemon') ছিলেন যিনি বিশেষ বিশেষ ক্রান্তি-মুহূর্তে তাঁকে প্রেরণা যোগাতেন। তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস কী ছিল তা বলা শক্ত, কারণ তিনি নিজে কিছুই লেখেননি, তাঁর সম্পর্কে যা কিছু আমরা জেনেছি তা সবই প্লেটোর রচনা মারফত। তবে এটুকু নিশ্চিত যে সক্রেটিস এক অসাধারণ ভালো বক্তা এবং বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। সমাসাময়িক এথেন্সে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম, ফলে তাঁর ভক্ত আর শত্রু দুই-ই জুটেছিল অনেক।

নিজে সাধারণ পরিবারের মানুষ হলেও সক্রেটিস কিন্তু গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন না। তাঁর মেলামেশা ছিল—অন্তত জীবনের শেষ দিকে—প্রধানত ধনী ও অভিজাত তরুণদের সঙ্গে। স্পার্টার সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে এদের কেউ কেউ—যেমন অ্যালকিবিয়াডিস—শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে। স্পার্টার কাছে হেরে যাওয়ার পর এথেনসে 'ত্রিশ টাইর‍্যান্টের' যে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার গঠিত হয়, তাতেও এইসব তরুণদের মধ্যে কেউ কেউ যোগদান করে—যেমন ক্রিটিয়াস আর কার্বিডিস। 403 খ্রিস্টপূর্বাব্দে এক গণবিদ্রোহে ঐ সরকারের পতন ঘটার পর নতুন করে গণতন্ত্র

প্রতিষ্ঠিত হয়—কিন্তু সে গণতন্ত্র স্পার্টার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিশোধ না নেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এই সরকারের আমলেই সক্রেটিসকে অধার্মিকতার ও তরুণদের নীতিভ্রষ্ট করার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। তবে সক্রেটিসের বিচারের পেছনে আসল কারণটা ছিল রাজনৈতিক। মনে হয় তাঁর শত্রুরা তাঁকে নির্বাসন দিয়েই ক্ষান্ত হতে চেয়েছিল, কিন্তু তাঁর স্থিতধী এবং আপসহীন আত্মপক্ষ-সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে তারা তঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ফলে সক্রেটিস হন দর্শনের প্রথম এবং প্রসিদ্ধতম শহীদ। তাঁব নিজস্ব চরিত্র, এবং বিশেষ করে যে পরিস্থিতিতে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু হয় তা গ্রীক দর্শনচিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই সময় থেকে গ্রীক দর্শন দুটি শাখায় বিভক্ত হয়—একটি নৈতিক, অন্যটি প্রাকৃতিক বা ভৌত। পরবর্তী 2000 বছর ধরে প্রথম শাখাটির মর্যাদা দ্বিতীয়টির চেয়ে অধিক বলে পবিগণিত হয়।

প্লেটো

এথেন্সের অভিজাত বংশীয় ধনবান তরুণ প্লেটো সক্রেটিসেব শিষ্য হন এমন এক সময়ে যখন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন প্লেটোর মনে হয়েছিল তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাশা চিবতরে অস্তমিত হয়ে গেছে। তিনি স্থির করেন, অতঃপর দর্শনচর্চাতেই জীবন কাটাবেন। সে দর্শনের লক্ষ্য হবে আদর্শ রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলি নিরূপণ করা, যাতে মানুষ উন্নততর জীবন গড়ে তুলতে পারে। এই কাজে ব্রতী হয়ে তিনি দর্শনে *ভাববাদের* পথ অনুসরণ করেন। বস্তুত তিনিই হয়ে ওঠেন ভাববাদী দর্শনের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। তিনিই যে প্রথম ভাববাদী ছিলেন তা মোটেই নয়; কিন্তু কথোপকথনের আঙ্গিকে যেভাবে তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন তার সৌন্দর্য অতুলনীয়, তা মনকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। দার্শনিক রচনায় প্লেটোর রচনার এই দুটি গ্রন্থে প্লেটোর মুখ্য বাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাণীরূপ ধাবণ করে। তিনি এমন এক রাষ্ট্রের সংবিধান বচনা করতে চেয়েছিলেন যাতে *অভিজাততন্ত্রের* (অর্থাৎ সর্বোত্তম মানুষদের) যাবতীয় বিশেষ অধিকার চিরতরে বজায় তো থাকবেই, উপরন্তু সেই ব্যবস্থাটিকে সমাজেব নিম্নতর বর্গের কাছেও গ্রহণযোগ্য করে তোলা যাবে। তিনি এহেন এক বাষ্ট্রব্যবস্থার প্রেরণা পেয়েছিলেন স্পার্টার কাছ থেকে। সেখানে নাগরিকরা সেনাবাসে যে যৌথ জীবন যাপন করত তা নাকি তাদেব অসদুপায় অবলম্বন ও রাজনৈতিক চক্রান্ত করা থেকে নিরস্ত করত, আর 'হেলট্' বা ভূমিদাসেদেরও বশে রাখত। কিন্তু বাস্তব তথ্য এই যে স্পার্টার ঐ জীবনযাত্রা প্রথম লক্ষ্যসাধনে নিতান্তই ব্যথ হয়েছিল*, এবং পরিশেষে দ্বিতীয় লক্ষ্যসাধনেও ব্যর্থ হয়। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিকে'র নাগরিকদের চার বর্গে ভাগ করেন : অভিভাবক; দার্শনিক—যাঁরা শাসন করেন; সৈনিক—যারা দেশ রক্ষা করে, আর জনসাধারণ—যারা যাবতীয় কাজ করে। রাষ্ট্রের যাঁরা অভিভাবক তাঁদের নিজস্ব বা ব্যক্তিগত বলে কোনো কিছু থাকবে না, এমনকি পরিবারও না। সাধারণ মানুষকে অবশ্য পারিবারিক জীবনযাপনের বিলাসিতাটুকু মঞ্জুব করা হবে, কিন্তু তাদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না। এই সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ চিরস্থায়ী হবে। এ-কে ন্যায্য প্রমাণ করার জন্যে একটি কল্পকথা বা 'মহতী মিথ্যা' প্রচার ক'রে বলা হবে যে ঈশ্বর চার ধরনের মানুষ সৃজন করেছেন—সোনার, রুপোর, পেতলের এবং লোহার।

* 'হেরোডোটাস, যিনি স্পার্টার সবচেয়ে গৌরবময় যুগে জীবন কাটিয়েছিলেন, তিনি আশ্চর্যজনকভাবে মন্তব্য করেছেন যে কোনো স্পার্টাবাসীই উৎকোচের প্রলোভন সংবরণ করতে পারত না।'—বার্ট্রান্ড রাসেল, *A History of Western Philosophy*, 1960 অনু

আমরা লক্ষ্য করেছি, উপরোক্ত চারটি পদার্থের বর্ণ—পীত, শ্বেত, লোহিত এবং কৃষ্ণ—দেহরস-তত্ত্বের মধ্যে আগেই আসন করে নিয়েছিল। ভারতবর্ষীয় সমাজের চতুবর্ণের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এফ· এম· কর্নফর্ড তাঁর *The Unwritten Philosophy and Other Essays* (কেমব্রিজ, 1950) গ্রন্থে অবশ্য বলেছেন, প্লেটো ঠিক সামাজিক শ্রেণীগত অর্থে এই বিভাগ করেননি, কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে সর্বাধিক উপযুক্ততার ভিত্তিতেই তিনি শ্রেণী নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কর্নফর্ড স্বয়ং প্লেটোর রচনা থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা থেকে এ বক্তব্য আদৌ প্রমাণিত হয় না। প্লেটোর রূপকাশ্রিত ভাষায় : 'শাসকরা যদি লক্ষ্য করেন তাঁদের কোনো সন্তানের ধাতের মধ্যে লোহা কিংবা পেতলের খাদ মিশেছে, তাহলে তাঁরা এতটুকু দ্বিধা না করে তাকে তার স্বভাবের উপযুক্ত কাজে নিয়োগ করবেন, মিস্তিরি আর চাষাদের স্তরে নামিয়ে দেবেন। পক্ষান্তরে এইসব নিম্নশ্রেণীতে যদি এমন কোনো সন্তান জন্মায় যার ধাতে সোনা কিংবা রূপার স্পর্শ রয়েছে তাহলে তারা তাকে তার কদর অনুযায়ী অভিভাবক শ্রেণীতে উন্নীত করবে।' এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সচরাচর শ্রেণীগুলি ছিল বংশভিত্তিক, এবং প্লেটো খুবই বিচক্ষণতা সহকারে এ ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে হীনতর শ্রেণীর দুচারজন দক্ষ লোককে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করাটাই হচ্ছে উচ্চশ্রেণীর শাসনকে চিরস্থায়ী করার সবচেয়ে সহজ রাস্তা।

এহেন এক কট্টর শ্রেণী-ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে প্লেটো এক আদর্শ শাসনব্যবস্থা, সর্বোপরি এক সুস্থিত শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন। ঐ ব্যবস্থায় অভিভাবকদের কোনো পারিবারিক দায়দায়িত্ব থাকবে না, থাকবে কেবল রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব; তাঁদের কোনো বৈষয়িক ভাবনাচিন্তা বা উচ্চাশাও থাকবে না। তাঁদের দর্শন, গণিত ও সংগীতের শিক্ষা দান করা হবে। প্লেটোর মতে, সে শিক্ষা তাঁদের মধ্যে পরহিতৈষণার উন্নত চেতনা জাগ্রত করবে। এইভাবে তিনি স্পার্টার সংবিধানের সঙ্গে পেরিক্লিস-যুগের এথেন্সের স্মরণীয় গৌরবের কিছু কিছু অংশ জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন : পেরিক্লিস-যুগের এথেন্সে নবজাত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিছুকালের জন্য নগরশাসনের ভার একদল সংস্কৃতিবান ধনী নাগরিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। প্লেটোর ধারণা ছিল, এমন একজন প্রিন্সকে যদি পাওয়া যায় যিনি একাধারে দার্শনিকও বটেন, অন্ততপক্ষে যাঁকে দর্শন শিখিয়ে নেওয়া যাবে, তাহলে প্লেটো আপন রাজনৈতিক মতামতের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারবেন। এ ব্যাপারে তাঁর অন্তিম প্রচেষ্টা চলে সিরাকিউজ-এর 'টাইর‍্যান্ট' প্রিন্স 'ছোটো ডায়োনিসাস্'-কে নিয়ে। কিন্তু প্রিন্স স্বয়ং কিংবা তাঁর সভাসদবর্গ কেউই প্লেটোর গাণিতিক প্রশিক্ষণের ধকল সহ্য করতে পারেন নি।

প্লেটোর 'রিপাবলিক' সম্বন্ধে বিচার যুগে যুগে বদলেছে। মধ্যযুগের নিরক্ষর রাজা আর জমিদারদের স্বৈরতান্ত্রিক অপশাসনের তুলনায় তাকে এক প্রগতিবাদী আদর্শ বলে মনে হয়েছিল, বিশেষত যেহেতু অমন অনবদ্য এবং প্রভাবশালী গদ্যের আধারে সে-আদর্শ ব্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু আজকের দিনে আমরা প্লেটোর রিপাবলিকের মধ্যে পুঁজিপতিদের শ্রেণীশাসন বজায় রাখার অতি কুৎসিত পূর্বাভাস দেখতে পাই। ফ্যাশিবাদীদের তথাকথিত 'যৌথ রাষ্ট্রে'র ধারণার মধ্যেও প্লেটোর আদর্শের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

আদর্শ নগরীর মূল ধারণাটির সমর্থনে, এবং সেই সঙ্গে সে-নগরীর দার্শনিক-অভিভাবকদের জীবনযাত্রাকে ন্যায্য প্রমাণ করার প্রয়োজনে প্লেটো পিথাগোরাস আর পার্মেনিডিস্-এর ভাবনাচিন্তা গ্রহণ করেন। এঁরা দুজন চিরন্তন, যুক্তিশাস্ত্রসম্মত এবং গাণিতিক পরম সত্যের উপলব্ধিকে মূল্য দিয়েছিলেন। কথা বা শব্দ এবং তার প্রকৃত অর্থ নিয়ে আলোচনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব অরোপিত হয়। ফলে কথা বা শব্দকে স্বয়ম্ভূ, স্বাধীন সত্ত্বা বলে গণ্য করার প্রবণতা

দেখা দেয়। যে-বাস্তবতা বা যে-ক্রিয়া শব্দের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়, সেই বাস্তবতা বা সেই ক্রিয়া থেকে নিরপেক্ষভাবে শব্দকে গণ্য করা হতে লাগল। যেমন, সৌন্দর্য ব্যাপারটিকে ব্যক্ত করবার জন্য একটি শব্দ রয়েছে বলেই সৌন্দর্য ব্যাপারটা বাস্তব। বস্তুত, সুন্দর একটি জিনিসের চেয়েও সৌন্দর্য অধিকতর বাস্তব। কারণ কোনো সুন্দর জিনিসই পুরোপুরি সুন্দর নয়, কাজেই তা সুন্দর কিনা তা নিজস্ব মতামতের ব্যাপার; কিন্তু সৌন্দর্যের মধ্যে যেহেতু সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুই নেই, সুতরাং এই পরিবর্তনশীল ত্রুটিপূর্ণ বিশ্বের যেকোনো বস্তু থেকে নিরপেক্ষভাবেই সৌন্দর্যের এক স্বাধীন সত্তা রয়েছে। এই একই যুক্তি বস্তুময় পদার্থ সম্পর্কেও প্রযোজ্য : পাথর নামক সর্বজনীন পদার্থটি একটি বিশেষ পাথর অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব।

প্লেটোর ভাববাদ

এমনি করে *ভাব*-গঠিত এক কল্পবিশ্ব গড়ে উঠল। আদর্শ ভাব বা ideal হচ্ছে পূর্ণতা বা পরমোৎকর্ষের চিত্রকল্প। ইহজীবনে যে গুহার মধ্যে আমরা বন্দী হয়ে কালাতিপাত করি, তার দেওয়ালে সেই ভাবগঠিত বিশ্বের ক্ষীণ কম্পমান ছায়া পড়ে। সেই ছায়াটিই হচ্ছে আমাদের পরিচিত এই বস্তুগঠিত বিশ্ব।

এই বাহ্য রূপগুলির ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রকৃত প্রয়াস প্লেটো করেন নি। তিনি সর্বপ্রযত্নে কেবল এইটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে কতকগুলি বিমূর্ত ধারণা পরম এবং চিরন্তন, তারা ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী নয়, কেবলমাত্র আত্মার নিজস্ব আলোকেই তাদের আয়ত্ত করা সম্ভব। তিনি তিনটি পরম মূল্যবোধের কথা বলেন : সত্য, সদাশয়তা, সৌন্দর্য। প্রথমটির জন্য তিনি পার্মেনিডিস এবং দ্বিতীয়টির জন্য সক্রেটিসের কাছে ঋণী; তৃতীয়টি তাঁর নিজস্ব সংযোজন। তাঁর যৌবনকালের সমৃদ্ধিশালী এথেন্সে কলাকৈবল্যবাদী সৌন্দর্যচর্চার প্রচলন ছিল; তা থেকেই ঐ ধারণাটি তিনি আহরণ করেছিলেন। এই তিনটি পরম *মূল্যবোধের* কথা আজও আমরা বলি। এইসব মূল্যবোধ ইন্দ্রিয়সমূহের চেয়ে উন্নত এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আহরিত জ্ঞানের অনধিগম্য—এই কথা ব'লে আজ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটিকে সীমাবদ্ধ ক'রে তুলে তার বদলে স্বজ্ঞাজাত, অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণাকে মদত দেওয়ার চেষ্টা চলে।

অথচ প্লেটো নিজে কিন্তু আপন যুগের বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই তাঁর ধারণার সমর্থনে যুক্তিপ্রয়োগ করেছিলেন। বহুলাংশে গণিত আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের—জ্যোতির্বিজ্ঞান না বলে জ্যোতিষশাস্ত্র বলাই ভালো—মধ্যে থেকেই তিনি তাঁর ধারণাগুলি আহরণ করেছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র বা *astrology* কথাটির অর্থ হলো জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে *বিচার (logos)*; শব্দটি স্বয়ং প্লেটোই চয়ন ক'রে পুরোনো জ্যোতির্বিজ্ঞান বা *astronomy* কথাটির বদলে প্রবর্তন করেন। 'Astronomy' কথাটির অর্থ হলো জ্যোতিষ্কসমূহের *বিন্যাস* (nomos)। পরে জ্যোতিষ-গণনার এমনই বদনাম ছড়ায় যে ঐ পুরোনা 'astronomy' বা জ্যোতির্বিজ্ঞান কথাটিই আবার ফিরিয়ে আনতে হয়। সংখ্যা আর জ্যামিতিক আকারের মহাজাগতিক তাৎপর্য রয়েছে—পিথাগোরাসের এই অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী ধ্যানধারণাকে সযত্নে গ্রহণ করেন প্লেটো এবং তাকে আরো প্রসারিত করে তোলেন। তিনি এসবের মধ্যে ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ পরম সত্যের নিদর্শন খুঁজে পান। গণিতে প্লেটোর নিজস্ব অবদান খুব বেশি কিছু ছিল বলে মনে হয় না; কিন্তু তাঁর প্রভাবে গণিতচর্চার মর্যাদা খুব বেড়ে যায়, যে কারণে পরে অনেক মেধাবী মানুষ গণিতচর্চায় আকৃষ্ট হন। কিন্তু প্লেটোর প্রভাবে সে চর্চা সচেতনভাবেই বিমূর্ত এবং ধ্যানাত্মক খাতে প্রবাহিত হয়, ফলে গণিত তার আদি উৎস, অর্থাৎ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে

সরে যায়, তার ব্যবহারিক প্রয়োগও আর বিশেষ ঘটেনা। পরিণামে বীজগণিত ও গতিবিজ্ঞানের বিকাশ ব্যাহত হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্র

প্লেটো গণিতের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে যুক্ত করেন। কিন্তু সে এক আশ্চর্য ধরনের জ্যোতির্বিজ্ঞান। আকাশের জ্যোতিষ্ক বাস্তবে কেমন সেটা তার উপজীব্য নয়, তার উপজীব্য হলো জ্যোতিষ্ক কেমন হলে ভালো হয় সেইটা। প্রাচীনতর কালে লোকে বিশ্বাস করত যে জ্যোতিষ্কসমূহ, বিশেষ করে সূর্য, চন্দ্র আর গ্রহসমূহ, হচ্ছে ঐশী সত্তা। তাই, আয়োনীয় দার্শনিকরা যখন বললেন যে জ্যোতিষ্কেরা আকাশে পবিক্রমণরত অগ্নিগোলক বই আর কিছু নয়, তখন প্রাচীনপন্থীরা সে বক্তব্যকে পাষণ্ডোচিত মনে করে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। প্লেটো এসে এই অবস্থাটা সামাল দিলেন। কিন্তু তার জন্যে বিজ্ঞানকে অতি ভয়ানক মূল্য দিতে হলো। ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে গণিতের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে বললেন যে নিখুঁত বৃত্তাকার কক্ষপক্ষে ব্যতিক্রমহীন নিযম অনুসাবে গ্রহেরা ঘুরে চলে; এই চলনের মধ্যে দিয়েই তাদের ঐশ্বরিকতা প্রকাশ পায; জ্যোতিষ্কলোকের অশ্রুত সুরসংগতি নিরন্তর বেজে চলে তাদের চলনের মধ্যে দিয়ে। সংগৃহীত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই তিনি একথা বললেন। জ্যোতিষ্কলোকে কোনোরকম পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে তিনি বাতিল করে দিলেন—ঠিক যে কাজটি তিনি মর্ত্যলোকের মানবব্যাপারে করতে চেয়েছিলেন। পরিবর্তনহীন সেই অনন্তের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থেকে তারই মধ্যে আপন অমরত্বের প্রমাণ সন্ধান করাই মানুষের সর্বোত্তম কর্তব্য। প্রশ্নহীন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, প্লেটোর দর্শন এইভাবে তাকে নিরস্ত করল। জ্যোতিষ্কলোকের পরমোৎকর্ষের ধারণা প্রচার করে তিনি পৃথিবীই যে ঘুরছে সেই ধারণার শ্বাসরোধ করলেন। অথচ পিথাগোরীয়দের ভাবনায় ইতিমধ্যেই সে-ধারণা জন্ম নিয়েছিল। প্লেটো এবং তাঁর মহান প্রতিপক্ষ ও উত্তরসূরী অ্যারিস্টটল—এঁদের সম্মিলিত প্রভাবে জ্যোতিষ্কলোকের চলনেব প্রকৃত চরিত্র বিষয়ে মানুষের জ্ঞান পরবর্তী দুটি হাজার বছর ধরে বিকৃত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, বাস্তবগ্রাহ্য পদার্থবিদ্যা গড়ে ওঠার পথও কন্টকিত হয়ে থাকে।

অ্যাকাডেমি

দার্শনিক-প্রিন্সের সন্ধানে বিফলমনোরথ হয়ে প্লেটো অবশেষে এথেন্সে ফিরে আসেন। পথে বন্দী হয়ে আর একটু হলেই তিনি ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রী হয়ে যাচ্ছিলেন। এথেন্সে বিখ্যাত পৌরাণিক বীব আকাডেমুস-এর নামাঙ্কিত কুঞ্জে বাছাই-করা শিষ্যদের কাছে চাল্লিশ বছর ধরে (387-347খ্রি· পূ·) তিনি তাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তাঁর আশ্রমের প্রবেশতোরণে লেখা থাকত : *গণিতে যাহারা অজ্ঞ তাহাদের প্রবেশ নিষেধ।* প্লেটোর মৃত্যুর পরেও এই 'অ্যাকাডেমি'র শিক্ষাকার্য থেমে থাকেনি। প্লেটোর ভাবধারাকে তা খুব একটা বিকশিত করে তুলতে না পারলেও সযত্নে সংরক্ষণ করেছিল। প্লেটোর নিজের এবং এথেন্সের মর্যাদার জোরে তা প্রায় এক হাজার বছর ধরে অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল; অবশেষে রোম সম্রাট জাস্টিনিয়ান 525 খ্রিস্টাব্দে অ্যাকাডেমি তুলে দেন। পিথাগোরীয়দের অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী ঘরানা অ্যাকাডেমি-র মধ্যে সুবিস্তারিত এবং যুক্তিগ্রাহ্য রূপ ধারণ করে। এখানে দীক্ষিতদের মধ্যে আলোচনা যেমন চলত, তেমনি শিক্ষাব্রতীদের শিক্ষাদানের কাজও চলত। আমাদের কালের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞানসভার আদিরূপ এই অ্যাকাডেমি—সেই এর মস্ত গুরুত্ব। প্লেটো স্বয়ং এই প্রতিষ্ঠানের চরিত্র ও সুর বেঁধে দিয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের চরিত্র যে আধুনিক অর্থেই

সারস্বত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশুদ্ধ, অর্থাৎ বস্তু-নিরপেক্ষ জ্ঞানের চর্চা হতো এখানে। সে চর্চা কার্যত গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান আর সংগীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। রচনা পাঠের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা হতো—প্রকৃতিকে অনুধাবন করার মাধ্যমে নয়; কেননা প্রকৃতি তো ছলনাময়ী এবং নিয়মের ব্যতিক্রমে পূর্ণ। তবে গণিতচর্চার ওপর প্লেটো জোর দেওয়ায় অ্যাকাডেমির শিক্ষাক্রমে অন্তত একটি বৈজ্ঞানিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছিল, নতুবা সে শিক্ষাক্রম পুরোপুরিই সাহিত্যভিত্তিক হয়ে উঠত। সেটি হলে কী ধরনের ক্ষতি হতো তার প্রমাণ পাওয়া যায় চীনের ইতিহাসের দিকে তাকালে। পাশ্চাত্যে শিক্ষার ওপর প্লেটোর প্রভাবের মতোই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল চীনে শিক্ষার ওপর কন্‌ফুশিয়াসের প্রভাব, এবং কন্‌ফুশিয়াস তাঁর শিক্ষাক্রম থেকে গণিতকে বাদ দেওয়ার ফলেই হয়তো চৈনিক বিজ্ঞান তুলনামূলক বিচারে পিছিয়ে পড়েছিল। আদর্শগত স্তরে এথেন্‌সীয় অ্যাকাডেমিতে সত্য, সদাশয়তা আর সৌন্দর্যের জ্ঞান নিয়ে চর্চা করা হতো বিশুদ্ধ জ্ঞান আহরণেরই তাগিদে। কিন্তু কার্যত পরবর্তীকালের গ্রীক ও রোমানরা অ্যাকাডেমির ঐ শিক্ষাকে সম্পন্ন ঘরের তরুণদের কর্মজীবনে সাফল্য লাভের উপযোগী অতি উত্তম তালিম বলে গণ্য করত।

প্লেটোবাদ

প্লেটোর প্রভাব অবশ্য অ্যাকাডেমির প্রভাবকে অনেক দূরে ছাপিয়ে যায়। যুক্তিশাস্ত্রীয় এবং গাণিতিক উপাদানকে অবহেলা ক'রে অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী উপাদানকে গুরুত্ব দিতে থাকায় প্লেটোবাদ উত্তরোত্তর নিকৃষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। ধ্রুপদী যুগের শেষের দিকে যাবতীয় আপসপন্থী ভাবধারাই প্লেটোবাদে আপ্লুত ছিল। খ্রিস্টধর্মের সঙ্গেও তার অচিরে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বস্তুত খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের প্রধান মননগত বনেদ গড়ে দেয় প্লেটোবাদ। অ্যাকাডেমি উঠে যাওয়ার পর প্লেটোর একটি ছাড়া বাকি সব মূল রচনার কথা লোকে বিস্মৃত হয়ে যায়—সেটি হলো *Timaeus*, যা কিনা তাঁর যাবতীয় রচনার মধ্যে সবচেয়ে উদ্ভট। এর মধ্যে প্লেটো বিশ্বগঠনের এক কল্প-বৃত্তান্ত রচনা করেছিলেন। প্লোটিনাস, যিনি অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী ভাবনায় আরো গভীরভাবে নিমগ্ন ছিলেন, প্রধানত তাঁর নব্য-প্লেটোবাদী চিন্তাধারার মারফত প্লেটোর শিক্ষা প্রচারিত হতে থাকে। অতঃপর আরবরা তাঁর কিছু কিছু রচনা পুনরাবিষ্কার ক'রে অনুবাদ করে। তবু রেনেসাঁস যুগের আগে তাঁর মূল রচনা নিয়ে গভীর অধ্যয়ন হয়নি। উক্ত যুগে প্লেটোর চিন্তাধারা পুনরায় যে প্রভাব ফেলে তা সেই প্রাচীন ধ্রুপদী যুগের মতোই বিপুল ছিল। রেনেসাঁসের গোড়ার দিকে 'হিউম্যানিস্ট'রা যে বিজ্ঞানমনস্ক হননি তার একটা প্রধান কারণ হলো প্লেটোর প্রভাব। কিন্তু তারপর ষোলো এবং সতেরো শতকে প্রথমে কেপলার ও গ্যালিলিও এবং পরে কেমব্রিজের প্লেটোপন্থীদের মারফত স্বয়ং নিউটনের চিন্তাধারার সংগঠনে প্লেটোর গাণিতিক প্রেরণা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অ্যারিস্টটল

অ্যারিস্টটল ছিলেন প্লেটোর শিষ্য। কিন্তু পরে তিনি অ্যাকাডেমি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। গুরুর মৃত্যুর পর 335 খ্রিস্টপূর্বাব্দে 'লাইসিয়াম' নামে এক পাল্টা দর্শন-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। থ্রেস্‌-এর স্ট্যাগিরা-তে জন্মলাভ করলেও অ্যারিস্টটল ছিলেন 'অ্যাস্‌ক্লিপিয়াডি' নামক গ্রীক বৈদ্যকুলের সন্তান। নানাবিধ কারণে বিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী হন। গ্রীক রাজনৈতিক জীবনের একটি পর্বের চূড়ান্ত অধ্যায়ে এবং অন্য একটি পর্বের সূচনালগ্নে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। ফলে তাঁর পক্ষে স্বাধীন গ্রীক নগরসমূহের সংগৃহীত যাবতীয় জ্ঞান আহরণ করে পরবর্তী পর্বের সাম্রাজ্যগুলোর ব্যবহারার্থে তাদের হাতে

তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। প্রায় সারা জীবনই তিনি বিভিন্ন নগর ও রাজাদের বিশেষ আনুকূল্য লাভ করেছিলেন, সে আনুকূল্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহারও করেছিলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনার পরিমাণ ও পরিধি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যে-কোনো ব্যক্তির চেয়ে বেশি। আরো একটা ব্যাপার এই যে তাঁর অধিকাংশ রচনাই উত্তরকালের হাতে পৌঁছতে পেরেছিল, যেহেতু 'লাইসিয়াম' বিপুল পরিমাণ টীকাভাষ্য সহযোগে সেসব রচনাকে পরম্পরাক্রমে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে পেরেছিল। প্লেটো-স্থাপিত 'অ্যাকাডেমি' ধ্যানকর্মে যতখানি তৎপর ছিল, 'লাইসিয়াম' গোড়ার দিকে ঠিক ততখানি তৎপরতার সঙ্গেই অনুসন্ধানকর্মে ব্রতী ছিল।

নীতিশাস্ত্রভিত্তিক দর্শন অপেক্ষা যুক্তিশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের প্রতিই অ্যারিস্টটলের প্রবণতা ছিল বেশি। সক্রেটিস কিংবা প্লেটোর মতো সমাজ-সংস্কারের মহদাশয় উৎসাহ তাঁর ছিলনা। তিনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ, তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্লেটোর সমাজভাবনা সেকেলে হয়ে পড়েছে। প্লেটোর হাতেগড়া সিরাকিউজের দার্শনিক-প্রিন্স ছোটো ডায়োনিসাস প্লেটো-কল্পিত স্বাধীন অভিজাততান্ত্রিক রিপাব্লিকের চরিত্র বজায় রাখতে পারেননি—রাখবার ইচ্ছাও তাঁর ছিলনা। অ্যারিস্টটলেরও একজন অনুগত প্রিন্স ছিল— স্বয়ং অ্যালেকজান্ডার, যাকে তিনি 343 থেকে 340 খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন ছিল অনেক বড়ো— নিছক একটি গ্রীক নগর-রাষ্ট্র শাসন নয়, তিনি স্থাপন করবেন এক বিশাল মাকিডোনীয় সামরিক সাম্রাজ্য।

অ্যারিস্টটল কেবল বিদ্যমান অবস্থার পূর্ণতম সদ্ব্যবহার করেই ক্ষান্ত থাকতেন। তাঁর দর্শনের সবচেয়ে বড়ো কথা ছিল সহজ কাণ্ডজ্ঞান, তাঁর কারবার ছিল অতি সাধারণ ঘটনা নিয়ে। রাষ্ট্রকে বদলানোর কোনো তাগিদ তিনি অনুভব করেননি। তাঁর মতে, লোকে যদি একটা মধ্যপন্থা অনুসরণ করে তাহলে বিদ্যমান অবস্থাটার মধ্যেই সবকিছু ঠিকঠাক চলবে। তাঁর বহুখ্যাত এই *মধ্যপন্থা* তত্ত্বের মূল কথা হলো : খুব বেশিও নয়, খুব কমও নয়। এরই ওপর দাঁড়িয়ে আছে তাঁর *নীতিশাস্ত্র।*

বর্গীকরণ ও আকারবাদী যুক্তিশাস্ত্র

যুক্তিশাস্ত্র, *পদার্থবিদ্যা*, *জীববিজ্ঞান* এবং *মানবিকী বিদ্যা*—এইসব ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলের অবদান ছিল বিরাট। বস্তুত তিনিই এই বিষয়গুলিকে সুনির্দিষ্ট আকার দান করেন। তিনি আরো একটি বিষয় যোগ করেন—*অধিবিদ্যা* (metaphysics); যেসব ব্যাপার পূর্বোক্ত বিষয়গুলির আওতায় পড়েনা সেগুলি অধিবিদ্যার আলোচ্য। *বর্গীকরণের* ধারণাটি যুগপৎ তাঁর সবচেয়ে মহৎ ও সবচেয়ে বিপজ্জনক অবদান। তাঁর যাবতীয় রচনার মধ্যে এই ধারণাটি সক্রিয় ছিল। এটিই ছিল তাঁর *যুক্তিশাস্ত্রের* বনেদ। সাদৃশ্য এবং প্রভেদের ভিত্তিতে বস্তুসমূহকে বাছাই করার যে পদ্ধতির প্রবর্তন তিনি করেন—অন্তত পক্ষে প্রণালীবদ্ধ রূপ দান করেন—তা আমরা আজও ব্যবহার করি। তাঁর প্রশ্নগুলো ছিল এইরকম : জিনিসটা কীসের মতো? —অর্থাৎ গণ (genus); অনুরূপ অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এর প্রভেদ কী? —অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যচিহ্ন (differentia)। তাঁর প্রবর্তিত বাক-ছল বা *ন্যায়* (syllogism) আজও যুক্তিশাস্ত্র হিসেবে পড়ানো হয়ে থাকে—সকল মনুষ্য মরণশীল; সক্রেটিস একজন মনুষ্য; অতএব সক্রেটিস মরণশীল। কিন্তু বিশেষকে জানবার আগে সামান্যকে জানা কী করে সম্ভব?

অ্যারিস্টটল ছিলেন প্রথম দিকপাল বিশ্ববিদ্যাবিশারদ। প্রকৃতি ও মানবজীবনের যেসব দিক নিয়ে তখন আগ্রহ ছিল তার প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই তিনি কিছু না কিছু বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এবং সে কাজটা তিনি সুশৃঙ্খলভাবে করতে পেরেছিলেন; বস্তুত এই জায়গাতেই পরবর্তীকালের অনেক বিশ্ববিদ্যাবিশারদের খামতি ছিল। এই সুশৃঙ্খল বিন্যাসের ব্যাপারটা

অ্যারিস্টটল পূর্বসূরীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। চন্দ্রের নিম্নবর্তী মণ্ডলের জন্য *তেজ, মরুৎ, অপ্* এবং *ক্ষিতি*—এই চারটি মূল উপাদানের তত্ত্ব তিনি গ্রহণ করলেন, উপরন্তু উচ্চতর মণ্ডলের জন্য নতুন একটি মূল উপাদান যোগ করলেন—**ঈথর**, যা কিনা সবকিছুর সারাৎসার। এই চিন্তাপ্রণালী বা মত চিরসত্য বলে স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর মতে পৃথিবী, জল এবং বায়ু বহুবিধ জীবিত বস্তু দ্বারা পূর্ণ; প্রত্যেকটি জীবিত বস্তুই যথাযোগ্য স্থানে এবং যথাযোগ্য রূপে বিদ্যমান। প্রতিটি ব্যক্তি জন্ম ও মৃত্যুর, উদ্ভব ও বিলয়ের অধীন হলেও, তার রূপ বা আকার অবিনশ্বর। বিশ্ব কীভাবে তৈরি হলো, এই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হননি অ্যারিস্টটল। এই ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী আয়োনীয় দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদটা পাকাপাকি হয়ে যায়। তাঁর মতে এই বিশ্ব চিরকাল এই রূপেই বিরাজ করে আসছে; কেননা এই রূপটিই বিশ্বের পক্ষে সবচেয়ে ন্যায্য; সুতরাং সৃজনের প্রশ্নটাই উঠছে না। পরে যখন অ্যারিস্টটলের মতবাদ ক্যাথলিক চার্চের দার্শনিক বনেদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন এই ধারণাটা নিয়ে তাঁদের বেশ অসুবিধে হয়েছিল। কিন্তু সে অসুবিধে সহজেই দূর করা গিয়েছিল এই বলে যে একেবারে আদিতে আকস্মিকভাবে একবার সৃজন হয়েছিল আর একেবারে অন্তে আকস্মিকভাবে একবার বিলয় হবে, কিন্তু মাঝখানে সমস্ত কিছুই যেমন আছে তেমনি থাকবে।

অ্যারিস্টটলের 'physics'

Physics-ই অ্যারিস্টটলের মতে বিশ্বকে অনুধাবন করবার চাবিকাঠি। কিন্তু ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যা বলতে আজকে আমরা যা বুঝি, অর্থাৎ জড় পদার্থের চলনের নিয়মাবলী, তিনি কিন্তু তা বুঝতেন না। বরং ঠিক বিপরীতটাই বুঝতেন। কোনো একটি সত্তা বিকাশ লাভ ক'রে কীসে পরিণত হতে চায় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় তার আচরণ কেমন, সেটাই তাঁর মতে সেই বস্তুর *physics* বা স্বভাবধর্ম। আসলে পারিবারিক বৈদ্য-পটভূমির কল্যাণে এবং জীববিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ থাকায় অ্যারিস্টটল বিশ্ব নিয়ে এমনভাবে বিচার করতেন যেন সব কিছুই জ্যান্ত। 'কুকুরের কাজ কুকুরে করুক / কামড়াক আর গজরে মরুক/ ওটাই ওদের স্বভাব'—এই ক্ষেত্রে *স্বভাব* (nature) কথাটা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তিনি ঠিক সেই অর্থে *physics* কথাটা ব্যবহার করতেন। তাঁর মতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের লক্ষ্য হলো সমস্ত কিছুর স্বভাবধর্ম জানা। কেন পাথর মাটিতে পড়ে সে প্রশ্ন থেকে আরম্ভ করে কেন কিছু কিছু মানুষ ক্রীতদাস হয়—সে সমস্তই এই অনুসন্ধানের অন্তর্গত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই উত্তর কিন্তু একই—'ওটাই তাদের স্বভাবধর্ম'। একথা না বলে 'সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা' বললেও এর অর্থ এতটুকু বদলাত না; কিন্তু আগের উত্তরটা শুনতে অনেক বিজ্ঞানসম্মত। অনেক পরবর্তীকালে দার্শনিক হুডিব্রাস সম্বন্ধে স্যামুয়েল বাটলার* ছড়া কেটে যা বলেছিলেন তা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য : 'অধিবিদ্যা-মহাজ্ঞানী অতি বিচক্ষণ/ কাহাকে কী কয় তাহা জানে বিলক্ষণ।' *Physics* এবং *জ্যোতিষ্কলোক (On the Heavens)* গ্রন্থ দুটিতে অ্যারিস্টটল ভৌত ব্রহ্মাণ্ডের ওপর তাঁর এই পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটান—ঠিক যেক্ষেত্রে ঐ পদ্ধতির প্রয়োগ একেবারেই অবাঞ্ছিত। ফলে তিনি যে ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন তা প্লেটোর চেয়ে বেশি যুক্তিগ্রাহ্য তো নয়ই, উপরন্তু প্লেটোর রচনার আবেগময় আবেদন এবং গাণিতিক মূল্যও তাঁর রচনায় অনুপস্থিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু তা মহতী অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিশাস্ত্রসম্মত ব্রহ্মাণ্ডের এক অংশ, তাই ব্রহ্মাণ্ডের কাঠামো-সংক্রান্ত গ্রীক ভাবনার মূল স্রোত ঐ খাতেই প্রবাহিত হয় এবং ঐ রূপেই তা উত্তরকালের মননে সঞ্চারিত হয়। পদার্থবিদ্যার পরবর্তী অগ্রগতি এর ফলে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। অ্যারিস্টটল-সঞ্জাত

(বাইবেল-আহরিত নয়) মতবাদকে উৎখাত করবার জন্য জিওর্দানো ব্রুনোকে পুড়ে মরতে হয়েছিল, অবমানিত হতে হয়েছিল গ্যালিলিওকে। সত্যি কথা বলতে, বিজ্ঞানের পরবর্তী ইতিহাস হচ্ছে বহুলাংশে একটার পর একটা ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলের পরাজয়ের কাহিনী। বস্তুত, 'অ্যারিস্টটল যা কিছু শিখিয়েছিলেন, সবই মিথ্যে'—1536 সালে রেমাস-এর (Ramus)* এই বিখ্যাত মন্তব্য খুব একটা ভুল ছিলনা।

পরম কারণের তত্ত্ব

অ্যারিস্টটলের ভৌত বিশ্ব এক আদর্শ সামাজিক বিশ্বের আদলে কল্পিত—যে সামাজিক বিশ্বে বশ্যতাই হচ্ছে স্বাভাবিক দশা। এই বিশ্বে প্রতিটি জিনিসের একটি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে, এবং প্রতিটি জিনিস মোটের ওপর সেই নির্দিষ্ট স্থান ছেড়ে নড়ে না। প্রকৃতিতে চলন তখনই ঘটে যখন একটা জিনিস তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে চ্যুত হয়ে আবার সেই স্থানে ফিরে যেতে চায়। বাতাস আর জলের মধ্যে দিয়ে একটা পাথর নিচে পড়ে এইজন্যে যে তা আবার মাটিতে তার নিজস্ব নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে যেতে চায়; অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরে ওপরে ওঠে এইজন্যে যে তা আবার জ্যোতিষ্কলোকে তার নিজস্ব নির্দিষ্ট অগ্নিময় স্থান ফিরে পেতে চায়। কিন্তু একথা কেবল সেইসব বস্তুর প্রতি প্রযোজ্য যাদের নিজস্ব স্বাভাবিক চলন নেই। পক্ষান্তরে পাখির স্বভাবধর্মই হচ্ছে আকাশে ওড়া, মাছের স্বভাবধর্মই হচ্ছে জলে সাঁতার কাটা—ওটাই ওদের *কাজ।* এইসব উদাহরণের মধ্যে তাঁর অন্যতম প্রধান ভাবনা *'পরম কারণ'*-তত্ত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সে তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি জীব, এমনকি প্রতিটি পদার্থের মধ্যে রয়েছে একটি পরম লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্যটি হলো যথাযথ *পরিণতি* লাভ করা। অ্যারিস্টটল এ ছাড়াও বস্তুর *উপাদান-কারণ* (material cause) এবং *ক্রিয়া-কারণের* (effective cause) কথা বলেছেন। উপাদান-কারণ প্রয়োজনীয় পদার্থের যোগান দেয়, আর ক্রিয়া-কারণবশত কাজ চলে। কিন্তু তাঁর মতে এ দুটি কারণ পরম কারণের তুলনায় গৌণ। বিজ্ঞানের ওপর এক অভিশাপ হয়ে উঠেছিল এই পরম কারণের তত্ত্ব। কেননা এর সাহায্যে যেকোনো ব্যাপারকেই খুব স্বচ্ছন্দে উপযুক্ত পরিণতির দোহাই দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে—ব্যাপারটা কী প্রক্রিয়ায় ঘটছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজনই আর থাকে না।

চলন ও শূন্যাবস্থা

এই 'পরম কারণ'-তত্ত্বের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানে লড়াই চলেছে সুদীর্ঘকাল ধরে এবং আজও চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়নি। অ্যারিস্টটলের মতে, কেবল স্বাভাবিক গতি বা চলনই হচ্ছে পরম; বাকি যাবতীয় চলনের জন্য একজন চালক লাগে, যেমন ঘোড়ায় রথ টানে, ক্রীতদাসেরা দাঁড় টেনে বজরা চালায়, কিংবা যেমন 'অচল চালক' নিজে অচল থেকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের বাইরের দিকের গোলকগুলোকে চালান। কিন্তু তাহলে বিক্ষুব্ধ গতি সম্বন্ধে কী বলা যাবে, যেমন ধনুকের টান-টান ছিলা থেকে ছিটকে-বেরোনো তীরের গতি? গ্রীক পদার্থবিদ্যায় এই প্রশ্নটা বরাবরই খুব কঠিন বলে বিবেচিত হয়েছে। যুক্তিশাস্ত্রের আশ্চর্য চাতুর্য দেখিয়ে জেনো এর আগেই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে তীরটার পক্ষে চলা আদৌ সম্ভবই নয়। অ্যারিস্টটল এই কঠিন প্রশ্নের সমাধান করলেন এইভাবে: বাতাস হচ্ছে চালক—'সম্মুখভাগের বাতাস বিদীর্ণ হইয়া পথ করিয়া

দেয় আর পশ্চাদভাগের বাতাস ফাঁক ভরাট করিয়া দেয়।'

এই ভ্রম থেকে আরেকটি ভ্রান্তির জন্ম হয় যা পরবর্তীকালের পদার্থবিদ্যায় একইরকম গুরুতর প্রতিবন্ধক বলে প্রমাণিত হয়। বিক্ষুব্ধ গতির জন্য যদি বাতাসের প্রয়োজন হয়, এবং চন্দ্রলোকের নিম্নবর্তী মণ্ডলে যদি বিক্ষুব্ধ গতির অস্তিত্ব থাকে, তাহলে সে মণ্ডল অতি অবশ্যই বায়ুতে পূর্ণ, সুতরাং বায়ুশূন্যতা বা *শূন্যাবস্থা (vacuum)* কখনো থাকতে পারে না। অ্যারিস্টটলীয় ন্যায় অনুসারে এ যুক্তি একেবারে নিশ্ছিদ্র। কিন্তু যেহেতু এর অপ্রধান হেতুবাক্যটি (minor premiss) ভুল, তাই গোটা যুক্তিটাই ধসে পড়ে। শূন্যাবস্থার বিরুদ্ধে অ্যারিস্টটল আরো একটি যুক্তি দিয়েছেন যার সঙ্গে পূর্বোক্ত যুক্তিটির কিছু বিরোধ আছে। তিনি লিখছেন: 'বাতাস গতিকে প্রতিহত করে। সুতরাং বায়ুশূন্য অবস্থায় কোনো বস্তু হয় স্থির থাকিবে (যেহেতু তাহার গমন করিবার মতো কোনো স্থানই থাকিবে না), নতুবা সমগতিতে অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেই থাকিবে। ইহা অসম্ভব; সুতরাং বায়ুশূন্য অবস্থা কখনো থাকিতে পারে না।' লক্ষণীয় বিষয় এই যে নিউটনের প্রথম গতিসূত্রটি প্রায় যেন আক্ষরিকভাবে উচ্চারিত হয়েছে এই বক্তব্যে। অথচ বিনা বিশ্লেষণে তিনি ঐ ধারণাকে খারিজ করে দিয়েছেন। ফলে একটি সত্যের একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসেও তিনি সে সত্যকে অসম্ভব বলে প্রমাণ করেছেন। আসলে শূন্যাবস্থাকে যেকোনো প্রকারে অস্বীকার না করে তাঁর উপায় ছিল না; কেননা তা না হলেই সরাসরি কণিকাবাদ ও নাস্তিকতাকে স্বীকার করতে হতো। 'প্রকৃতি শূন্যাবস্থা পরিহার করে'—তাঁর এই মতবাদটির পেছনে ছিল তরল চোষণের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, যা থেকে পরে চোষক (suction) পাম্পের উদ্ভব হয়। পরিশেষে এই পাম্পের সীমাবদ্ধতাই তরিচেল্লিকে শূন্যাবস্থার অস্তিত্ব প্রমাণ করার কাজে প্রণোদিত করে।

জীববিজ্ঞান

অ্যারিস্টটলীয় 'পদার্থবিদ্যার' এইসব অসম্পূর্ণতা আর ভ্রান্তির দোষ কিছু পরিমাণে ক্ষালিত হয়ে যায় তাঁর জীববৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা। সে পর্যবেক্ষণের পরিধি আর মান দুটোই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'কিছু পরিমাণে' কথাটার মধ্যে অ্যারিস্টটলের প্রতি কোনো কটাক্ষ নেই। কেননা প্রাণীদের বর্গীকরণ ও শারীরিক গঠন নিয়ে তিনি যে অবদান রেখেছিলেন তা খুবই মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি সেকালে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। সেই গুরুত্ব আরোপ করা হয় আমাদেব এই যুগে এসে; কিন্তু ততদিনে তার উপযোগিতা ফুরিয়ে গিয়েছিল। জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরম কারণের তত্ত্বটি অনেকটা বাস্তবগ্রাহ্য, যেহেতু পরিবেশের সঙ্গে জীবের সার্থক অভিযোজনের ব্যাপারটিই ঐ তত্ত্বের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়। 'ঠাকুমা, তোমার দাঁতগুলো কত বড়ো গো!' 'হ্যাঁ বাছা, তাই তো তোমাকে ভালো করে কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাব।'—গল্পের এই দুষ্টু নেকড়ে ছিল খাঁটি অ্যারিস্টটলবাদী, পরিবেশবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তার ধারণা মন্দ ছিল না। এতদসত্ত্বেও পরম কারণের তত্ত্ব এমনকি জীববিজ্ঞানেও গবেষণার ধার ভোঁতা করে দেয়। কেননা এ তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো একটা অঙ্গ বা জীবের উদ্দেশ্য কী সে বিষয়ে একটা আন্দাজ করে নিতে পারলেই কাজ চলে যেত।

অ্যারিস্টটলীয় জীববিজ্ঞানের মূল ধারণাটি এই যে প্রকৃতিতে প্রত্যেকটি জিনিসই আপন সাধ্য অনুযায়ী চরম উৎকর্ষ বা পূর্ণতা লাভ করতে সচেষ্ট, এবং একেকটি জিনিস একেক মাত্রায় সে উৎকর্ষ লাভ করে। এই ধারণা দ্বারা চালিত হয়ে অ্যারিস্টটল এক 'প্রাকৃতিক মাপকাঠি' রচনা করেন, যার একেবারে নিচে ছিল খনিজ পদার্থ, তার ওপরে গাছপালা, তার ওপরে একে একে অপেক্ষাকৃত 'উৎকৃষ্ট' প্রাণীসমূহ এবং 'সবার উপরে' মানুষ। এহেন এক মাপকাঠি বিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু অ্যারিস্টটল এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত ছিলেন যে

বিশ্বে কোনো কিছুই আসলে বদলায় না, এবং প্রজাতিগুলি উৎকর্ষ বা অপকর্ষের চিরন্তর দিকচিহ্ন রূপেই চিরবিরাজমান। বস্তুত, তাঁর ধারণা অনুযায়ী পশু হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ মানুষ, আবার মাছ হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ পশু—অর্থাৎ বিবর্তনের ঠিক বিপরীত ক্রমটাকে সত্য বলে স্বীকার করতেই তিনি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর সুবিপুল মর্যাদা বাইবেলের 'জেনিসিস'-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে দুহাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিবর্তনের ধারণাকে *ঠেকিয়ে* রেখেছিল।

উৎকর্ষের বিভিন্ন মাত্রার এই ধারণাটি আরো একটা কাজে লেগেছিল। কিছু মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই প্রভু আর কিছু মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই দাস—এই বিশ্বাসটাকে তা ন্যায্য প্রতিপন্ন করল। এবং দাসেরা যদি প্রকৃতির এই সহজ নিয়মটাকে স্বীকার করতে না চায় তাহলে যুদ্ধ করে তাদের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করাটা স্বভাবতই ন্যায্য কাজ বলে পরিগণিত হলো।

বস্তু ও আকার

প্রভু-ভৃত্য, শৃঙ্খলা-বশ্যতা—এই ধারণাগুলি অ্যারিস্টটলের যাবতীয় ভাবনার মধ্যে সক্রিয়। প্লেটোর 'আদর্শ ভাব'কে তিনি তাঁর মতো করে যেভাবে বদলে নিলেন তার মধ্যেও সেটা লক্ষণীয়। প্লেটোর তত্ত্বকে তিনি *বস্তু* আর *আকার*—এই দ্বৈত ধারণায় রূপান্তরিত করলেন। বস্তু হচ্ছে স্থূল, নির্দিষ্ট আকারবিহীন; মনই *(nous)* তাতে আকার আরোপ করে। স্থূলতম বস্তুও যেকোনো আকার ধারণে সক্ষম। তার মধ্যে যেকোনো আকার ধারণের *সম্ভাবনা* রয়েছে। আকারের মধ্যে পূর্ণতা লাভের বা পরমোৎকর্ষের উদ্দেশ্য রয়েছে; কিন্তু সে উদ্দেশ্য সর্বদা সিদ্ধ হয় না। যেমন, একটি মূর্তি নির্মাণের সময় বস্তু-উপাদানটি খানিক দূর অব্দি নিষ্ক্রিয় থাকে এবং কর্ম-সহায়ক হয়; কিন্তু মাঝে মাঝে তা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তখন তা হাতুড়ি ভেঙে দেয় কিংবা মূর্তিকারের ইচ্ছামতো আকার ধারণ করতে রাজি হয় না। বস্তুর এই বিক্ষুব্ধ চরিত্রের জন্যই চন্দ্র-নিম্নবর্তী বিশ্বে কোনো কিছুই পূর্ণ বা *পরমোৎকৃষ্ট* হয় না এবং প্রতিটি জিনিসের মধ্যে *আকস্মিকতাপ্রসূত* লক্ষণ দেখা যায়। *বস্তু* আর *আকস্মিকতার* যৌথ আক্রমণে *উদ্দেশ্য* প্রতিহত হয়।

বস্তুবত্তা ও সারবত্তা

অ্যারিস্টটলের *আকারের* সঙ্গে প্লেটোর *ভাবের* তফাৎ এই যে ভাব হচ্ছে নির্বিশেষ, *সর্বজনীন*. বিশেষ একেকটি প্রাণী বা জিনিসের সম্বন্ধে তা প্রযোজ্য। অ্যারিস্টটলের পরিভাষায় এইসব আকার 'বস্তু-উপাদানে' গঠিত। কিন্তু বস্তু-উপাদান বা 'substance' বলতে আধুনিক বিজ্ঞান যা বোঝে, তিনি তা বুঝতেন না। তাঁর ধারণায় বস্তু উপাদান হচ্ছে এক অধিবিদ্যক বা আধ্যাত্মিক গুণ যা কোনো একটি জিনিসকে বিশিষ্ট ও অনন্য করে। ['বস্তুবত্তা' বললে হয়তো এর সঠিক অনুবাদ হয়।] স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও কিছু কিছু পরিবর্তন যাতে ঘটতে পারে তার জন্য প্রতিটি বস্তুবত্তার গভীরে নিহিত থাকে *সারবত্তা (essence)*। যেমন, বস্তুবত্তার দিক থেকে একজন লোকের দুটো পা রয়েছে; কিন্তু সে দুটো তার সারবত্তার অঙ্গ নয়, যেহেতু একটা কিংবা দুটো পা খোয়ালেও সে মানুষই থাকবে। সারবত্তা আর নিহিত *সম্ভাবনার* ধারণা দুটি জীববিজ্ঞান থেকে আহরিত। কোনো একটি প্রজাতির একজন স্বতন্ত্র সদস্যের নিম্নতম এবং উচ্চতম জৈবিক সীমা এই দুটি ধারণার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। সারবত্তা-গুণের বলে সে নিছক টিকে থাকে, আর নিহিত সম্ভাবনা-গুণের বলে সে পূর্ণ শক্তি প্রদর্শন করে।

নিহিত সম্ভাবনার এই ধারণাটি এই ভাবনার পথ প্রশস্ত করে যে আকার অপূর্ণ থেকে পূর্ণের অভিমুখে বিবর্তনরত। পার্মেনিডিস এবং প্লেটোর অনুসরণে পরমোৎকর্ষ বা পূর্ণতাকে সর্বদাই উন্নততর এবং চিরন্তন বলে মনে করা হতো। জীবিত বস্তুমাত্রেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ক্ষয়প্রবণ।

জ্যোতিষ্কসমূহ সে তুলনায় উন্নত; তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও অক্ষয়। *চেতন-আত্মা* (rational soul) জ্যোতিষ্কদের চেয়েও উন্নত, তা ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য এবং অক্ষয়। কিন্তু সর্বোন্নত হলেন ঈশ্বর; তিনি সকল বস্তুবত্তার মধ্যে শাশ্বত, চিরন্তন এবং সেই কারণে তিনি সত্য, তাঁর মধ্যে সকল সম্ভাবনার পূর্ণতম বিকাশ ঘটেছে।

মানুষ ও ঈশ্বর

অ্যারিস্টটল মানুষকে—যা তাঁর ভাষায় এক সামাজিক প্রাণী (zoon politikon)—তাঁর অধ্যয়ন-ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। শুধু তাই নয়, সে-ক্ষেত্রটিকে তিনি ঈশ্বর পর্যন্ত প্রসারিত করে তুললেন। এটাই তাঁর সর্বোত্তম কৃতিত্ব বলে গণ্য। ফিলোলাউসের মত অনুসরণে তিনি বললেন, মানুষের অভ্যন্তরে তিনটি আত্মা থাকে : *উদ্ভিদ-আত্মা, চলৎ-আত্মা* এবং *চেতন-আত্মা (nous)*। তৃতীয়টি একমাত্র মানুষেরই থাকে। প্রত্যেকটি আত্মার মধ্যে আপন পূর্ণতা লাভের *উদ্দেশ্য* রয়েছে, সেই উদ্দেশ্যটিই তার চালিকা শক্তি। উদ্ভিদ-আত্মার উদ্দেশ্য হলো *বাড়বৃদ্ধি* চলৎ-আত্মার উদ্দেশ্য *চলন* আর চেতন-আত্মার উদ্দেশ্য হলো *ধ্যান*। চেতন-আত্মা আবার পূর্ণতর এক লক্ষ্য সাধনের প্রয়াসী। সেই লক্ষ্যটিই হলেন ঈশ্বর, যিনি স্বয়ং অচল থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চালনা করেন, যিনি অ্যারিস্টটলীয় অধিবিদ্যার একাধারে কেন্দ্র ও পরিধি। আকাঙ্ক্ষা ও প্রেম সদা উর্ধ্বগামী : 'সর্বোত্তমের দর্শন মাত্রই তাঁহার প্রেমে নিমগ্ন হওয়া আবশ্যিক'; যেমন প্রভুর প্রতি দাসের, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং ঈশ্বরের প্রতি মানুষের প্রেম। নিম্নগামী প্রেম অবাঞ্ছিত। অ্যারিস্টটলের এই ভগবৎ-কেন্দ্রিক সিদ্ধান্তটি পরে মধ্যযুগের চার্চের ধর্মশাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের কাছে পরম উপাদেয় বলে মনে হয়েছিল। এরই সাহায্যে তাঁরা অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের সঙ্গে বাইবেলোক্ত সৃজন-উপাখ্যানের দ্বন্দ্বটিকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন।

সামগ্রিক বিচারে, অ্যারিস্টটলের দার্শনিক মতটির মধ্যে মোটামুটি সম্পন্ন নাগরিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতা ও মনোভাব আশ্চর্যরকমের সর্বগ্রাহী ও যুক্তিগ্রাহ্য রূপে প্রকাশিত হয়। তাঁর মধ্যে অপরিসীম শ্রমশীলতা আর অটল আত্মতুষ্টতার সমন্বয় ঘটেছিল বলেই তিনি ঐ মতটিকে অমন সবিস্তারে গড়ে নিতে পেরেছিলেন। তাঁর কর্মের স্বাতন্ত্র্য কোনো বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে পরিস্ফুট নয়। বস্তুত, নিজস্ব উদ্যোগে পরিচালিত কয়েকটি জীববৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ছাড়া তাঁর রচনার কোনো কিছুই মৌলিক নয়। কিন্তু যা কিছু তিনি আহরণ করেছিলেন, তা একেবারে সর্বোত্তম উৎস থেকেই আহরণ করেছিলেন। তাঁর রচনার একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটি হলো তার সর্বগ্রাহিতা, তার সুশৃঙ্খল বিন্যাস এবং তার সামগ্রিক ঐক্য—যে ঐক্য তিনি তাঁর যুক্তিশাস্ত্র সহযোগে বিধান করেছিলেন।

এই সর্বগ্রাহিতা অর্জন করার জন্য অ্যারিস্টটল এমন এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যা ভবিষ্যতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়। প্লেটোর 'অ্যাকোডেমি'তে সহকর্মীদের সঙ্গে কোনো কাজ নিয়ে আলোচনা চালানোই ছিল রীতি। অ্যারিস্টটল কেবল এর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, আবার যাবতীয় কাজ নিজেও করেননি। তার বদলে তিনি *গবেষণাকে সংগঠিত* করেন। তাঁর 'লাইসিয়ামে' (যা সম্ভবত অ্যালেকজান্ডারের কাছ থেকে অনুদান পেত) তরুণ কর্মীরা প্রায় সমস্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেন—সাহিত্যের সামাজিক ও স্বাভাবিক রূপ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন শহরের সংবিধান পর্যন্ত, প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে আরম্ভ করে পাথর পর্যন্ত। সেই অনুসন্ধানের যেসব ফসল আজও রক্ষিত রয়েছে সেগুলিই গ্রীক জীবনধারা ও চিন্তার সবচেয়ে মূল্যবান ও সুবিন্যস্ত পরিচয়। কিন্তু যে পদ্ধতিতে ঐসব অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল তার মূল্য আরো বেশি। প্লেটোর 'অ্যাকাডেমি' যদি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি রূপ,

তাহলে অ্যারিস্টটলের 'লাইসিয়াম' হচ্ছে গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের আদিরূপ।

অ্যারিস্টটলের প্রভাব

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখাব যে অ্যারিস্টটলীয় গবেষণা-পদ্ধতির প্রয়োগে অচিরেই তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তসমূহের বেশির ভাগই দুর্বল বা ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়—এমনকি যে-সিদ্ধান্ত তাঁর ভাবনায় কেন্দ্রীয় গুরুত্বের অধিকারী সেই 'পরম কারণ'-তত্ত্বও। বস্তুত বহু বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশিত হবার আগেই সেকেলে হয়ে পড়েছিল। তবু, এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও—অথবা হয়তো সেই জন্যেই—পরে আরবী ও মধ্যযুগীয় চিন্তার ওপর তাঁর সুবিপুল প্রভাব পড়েছিল। গ্রীক বিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত উন্নত রূপগুলি হয় একেবারে হারিয়ে যায়, নাহয় রেনেসাঁস-যুগের আগে পর্যন্ত তাদের গুরুত্ব বোঝা যায়নি—যেমনটি হয়েছিল আর্কিমিডিসের কাজের ব্যাপারে। উচ্চাঙ্গের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুপরিশীলিত পাঠক ছাড়া সেসবের মর্ম উদ্ধার করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর সেরকম পাঠক অন্ধকার মধ্যযুগে খুব সুলভ ছিল না। পক্ষান্তরে, অ্যারিস্টটলের রচনা যত দুরূহই হোক, তা পাঠের জন্য সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ছাড়া আর কোনো পুঁজি প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না—অন্তত বাহ্যত। হিটলারের মতো অ্যারিস্টটলও কাউকে কখনো সে যা বিশ্বাস করে তার বাইরে কিছু বলেননি। তাঁর পর্যবেক্ষণসমূহের সত্যতা যাচাই করার জন্য কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ছিল না, সেসব থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য কোনো কষ্টসাধ্য অঙ্ক কষার প্রয়োজন ছিল না, তাদের গূঢ় তাৎপর্য অবধারণ করার জন্য কোনো অতীন্দ্রিয় স্বজ্ঞারও প্রয়োজন ছিল না। মানুষের কল্পনাশক্তির কাছে প্লেটোর আবেদন ছিল বেশি, তাঁর রচনার নৈতিক ঝাঁজও অনেক বেশি; পক্ষান্তরে অ্যারিস্টটল লোককে এই কথা বোঝালেন যে বিশ্বকে তারা যে রূপে চেনে, বিশ্বের রূপটা প্রকৃতই সেইরকম। মলিয়্যার-এর সেই বিখ্যাত 'ল বুর্জোয়া জঁতিলম্' নাটকের চরিত্র র্জুদ্যাঁর মতো তারাও যেন আপন অজান্তে বরাবরই দার্শনিক ছিল! বিশ্ব যতদিন অপরিবর্তিত ছিল, ততদিন অ্যারিস্টটলকে দিয়ে কাজ চলেছিল; কিন্তু আমরা একটু পরেই দেখব, বিশ্ব চিরকাল অপরিবর্তিত থাকেনি।

আয়োনীয় দার্শনিকদের মধ্যে দিয়ে চিন্তাজগতে যে অগ্রগতির সূত্রপাত ঘটেছিল, অবক্ষয়ী এথেন্সের এই তিন মহা-দার্শনিকের মধ্যে, সামগ্রিক বিচারে, তার বদলে এক সুনিশ্চিত স্থবিরতা প্রকট হয়ে ওঠে। সমাজব্যবস্থায় যেহেতু কোনো অগ্রগতি হলো না, তাই প্রকৃতি স্বয়ং যে পরিবর্তমান ও বিকাশমান এই ধারণাটিও প্রত্যাখ্যাত হলো। দর্শন আর প্রগতিমুখী রইল না। ফলে সেই একই প্রতিক্রিয়াশীল প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে তা আর বস্তুবাদীও রইল না। সক্রেটিস আর প্লেটোর কথিত অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী রূপে, কিংবা অ্যারিস্টটলের আপসপন্থী ছকের মধ্যে ভাববাদ দৃঢ় আসন লাভ করল। জীবন যেমন চলছে তাকেই মেনে নিতে শেখাল দর্শন। যাদের কাছে জীবন দুঃসহ তাদের তা এই কথা বলল যে দুঃখদুর্দশা অবশ্যম্ভাবী, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মেরই অঙ্গ। এহেন দর্শন ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করার পথে এক পা বাড়িয়েই ছিল—এমন এক ধর্ম যা কেবল উচ্চতর শ্রেণীসমূহেরই স্বার্থসহায়ক।

7. অ্যালেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য

সাধারণভাবে দার্শনিক ভাবনার অগ্রগতি রুদ্ধ হওয়ার অর্থ এ নয় যে ব্যবহারিক বিজ্ঞানও শেষ হয়ে গেল; বরং ঐ কারণেই ব্যবহারিক বিজ্ঞানে বিপুল প্রণোদনা জাগে। একথা অবশ্যই সত্যি যে অ্যারিস্টটলের যুগ আর বেকন ও দেকার্ত্-এর যুগের মধ্যবর্তী পর্বে প্রকৃতি ও সমাজের

সমস্যাগুলিকে অনুধাবন করার কোনো সর্বাত্মক বড়ো রকমের প্রয়াস চালানো হয়নি। কারণ মধ্যযুগের ধর্মশাস্ত্রীয় পণ্ডিতরাই হোন আব আরবরাই হোন, কেউই কোনো মৌলিক চিন্তার পরিচয় দেননি, সেরকম দাবিও তাঁদের ছিল না। তবু একথাও অনস্বীকার্য যে গ্রীক গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বলবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্বের যা কিছু বিস্তারিত কীর্তি তার অধিকাংশই অ্যারিস্টটলের পরবর্তী অ্যালেকজান্ড্রিয় বা হেলেনীয় যুগের অবদান। অভাব ছিল কেবল মৌলিক চিন্তার। গ্রীকরা স্বভাবতই মৌলিক চিন্তায় অক্ষম হয়ে পড়েছিল এ কথা বললে চলবে না; কারণ পরবর্তী যুগের গ্রীকদের বুদ্ধি পূর্ববর্তী যুগের গ্রীকদের তুলনায় হঠাৎ কমে যেতে পারে না। সুতরাং মৌলিক চিন্তার এই ঘাটতির কারণ অনুসন্ধান করতে হবে সামাজিক ক্ষেত্রে। সমাজে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যা সাধারণভাবে সৃজনশীলতাকে নিরুৎসাহ করলেও বিশেষ বিশেষ সীমিত ক্ষেত্রের সুবিস্তৃত চর্চাকে এবং ফলিত প্রয়োগকে মদত দেয়।

এথেন্‌সের পতনের একশো বছরের মধ্যে গ্রীসে এক মস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। নবোদ্ভূত সুবৃহৎ ভৌমিক সাম্রাজ্যগুলো গ্রীসের পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী নগর-রাষ্ট্রগুলোকে বলপূর্বক ঐক্যবদ্ধ করে। এইসব বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যগুলো অভিন্ন উৎস থেকে তাদের সাংস্কৃতিক রসদ সংগ্রহ করত। এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন যে অনেক আগেই ঘটা উচিত ছিল সেটা বোঝা যায় মাকিডন্‌-এর ফিলিপ এবং অ্যালেকজান্ডারের কর্মকাণ্ড থেকে। অভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রামের ফলে দুর্বল এবং পারস্পরিক বিদ্বেষে দীর্ণ নগর-রাষ্ট্রগুলো এতই জীর্ণ হয়ে উঠেছিল যে তারা কোনো কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। সু-প্রশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত যে নতুন ধরনের পেশাদার সৈন্যবাহিনী গড়ে ওঠে তার গতি ছিল অপ্রতিরোধ্য। বংশানুক্রমে অভিজাত দলপতিদেব দ্বারা পরিচালিত, যথেষ্ট তালিমবিহীন কৃষকদের দ্বারা গঠিত পুরোনো পারসিক সাম্রাজ্যের সেনাদল সংখ্যায় ভারি হওয়া সত্ত্বেও এই নতুন সেনাদলের সামনে দাঁড়াতেই পারল না।

মাকিডোনীয়রা গ্রীক ধাঁচের যে-সভ্যতা অধিগ্রহণ করে নিয়েছিল তা প্রত্যেকটি অধিকৃত দেশেই সার্বিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখে। প্রকৌশলে, সংগঠনী দক্ষতায়, জ্ঞানে, কলায়, সর্বক্ষেত্রে গ্রীক কর্মপন্থা সর্বত্রই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। গ্রীক সেনাবাহিনীর পিছু পিছু গ্রীক বণিক আর প্রশাসকদের আবির্ভাব ঘটত, গড়ে উঠত গ্রীক ধাঁচের শহর। অনেক সময়ে সেসব শহরে গ্রীকরাই হতো সংখ্যালঘু। মিশরের 'অ্যালেকজান্ড্রিয়া' (যা এধরনের শহরের মধ্যে প্রথম এবং প্রসিদ্ধতম) থেকে সুদূর আফগানিস্তানের 'অ্যালেকজান্ড্রিয়া এস্‌ক্যাটা' (কোজান্ড) পর্যন্ত বহু শহর এইভাবে গড়ে ওঠে। গ্রীক প্রভাব সেখানেই থেমে থাকেনি; অ্যালেকজান্ড্রিয় সাম্রাজ্যের চৌহদ্দি ছাড়িয়েও সে প্রভাব বহুদূরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। দূবপ্রাচ্যের দূরত্বের দরুন সে প্রভাব কিছুটা লঘু হয়ে পড়ে। তবু, প্রথম ভারতীয় সাম্রাজ্য বলে খ্যাত বৌদ্ধ রাজা অশোকের শাসন ছিল অ্যালেকজান্ডারের আক্রমণের সাক্ষাৎ পরিণতি। এবং বৌদ্ধধর্মের হাত ধরে গ্রীক কলা, দর্শন ও বিজ্ঞানের কিছু কিছু অংশ সুদূর চীনেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় সমসময়ে চীনে অনুরূপ কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত এক আন্দোলন দানা বেঁধেছিল। 221 খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেখানে আধা-বর্বর ছিন্ রাষ্ট্রের শাসক অস্ত্রসহযোগে প্রথম লৌহযুগীয় ধাঁচের চৈনিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনি নিজেকে কিংবদন্তীর প্রথম সম্রাট হুয়াং তি নামে অভিহিত করেন। তাঁর রাজবংশের শাসন বেশিদিন স্থায়ী না হলেও চৈনিক সাম্রাজ্যের ঐক্য আর কখনো একটানা দীর্ঘকাল ধরে বিনষ্ট হয়ে যায়নি। গোটা ধ্রুপদী কাল জুড়ে চীনের অতিশয় সভ্য হান্ সাম্রাজ্য পারসিক ও ভারতীয় সাম্রাজ্যের সীমান্তদেশে বিরাজ করেছিল।

পাশ্চাত্য দেশসমূহের ওপর হেলেনীয় বা অ্যালেকজান্ড্রিয় প্রভাব পড়েছিল অনেক বেশি;

কারণ সেসব দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি দুর্বল হওয়ায় পুরোনোর বদলে নতুনকে স্থান করে দিতে তাদের বিশেষ অসুবিধে হয়নি। ইতালি অঞ্চলের জ্ঞাতিসমাজভুক্ত মানুষ অতি সত্বর হেলেনীয় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এর মূলে দুটি ঘটনার প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, উত্তর-পশ্চিম ইতালির এত্রুস্কান্-দের নাগরিক জীবনধারা তাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, এবং এই এত্রুস্কানরা নিজেরাই ছিল এশিয়া মহাদেশ থেকে আগত। দ্বিতীয়ত, উপকূলবর্তী শহরগুলোতে গ্রীস থেকে এসে যারা বসতি স্থাপন করেছিল তাদের প্রভাবও সক্রিয় ছিল। এই সব শহরগুলোর মধ্যে রোম নামক শহরটি সবচেয়ে শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়। এত্রুস্কান রাজাদের বিতাড়ন করার পরে রোমে প্রচণ্ড অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাত চলে। সে সংঘাতের অবসানে রোম এক ধনিকতন্ত্রী রিপাব্লিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পরে এই রিপাব্লিক রোমক সাম্রাজ্যরূপে সমগ্র অঞ্চলটিতে আধিপত্য বিস্তার করে।

হেলেনীয় শহর এবং মাকিডোনীয় সাম্রাজ্যসমূহ

হেলেনীয় বা অ্যালেকজান্ড্রিয় শহরগুলো গ্রীক শহরের আদলেই গড়ে ওঠা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। প্রথমত, প্রাচীনতর গ্রীক শহরগুলোতে যে-শ্রেণীবিভেদ সক্রিয় ছিল, সেটি ছাড়াও হেলেনীয় শহরগুলোতে একটি নতুন বিভেদ সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেটি হলো গ্রীক-ভাষী কর্মকর্তা বা বণিকশ্রেণীর সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের এক নরগোষ্ঠীগত বা সাংস্কৃতিক 'জাতিভেদ'। রাজনৈতিকভাবে উৎপীড়িত দক্ষিণ ও পূর্বের এইসব স্থানীয় অধিবাসীরা খুব ভালো করেই জানত যে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি গ্রীকদের চেয়ে অনেক প্রাচীন এবং কোনো অংশেই নিকৃষ্ট নয়। পরে এই বিভেদের তীব্রতা অনেক কমে এলেও, ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান যুগের একেবারে অন্ত্যকাল পর্যন্ত তা বজায় ছিল; ঐ পর্বের প্রাচীন সংস্কৃতিগুলি নতুন করে এক নবধর্মের মধ্যে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে। দ্বিতীয়ত, এইসব হেলেনীয় শহর স্ব-নির্ভর ছিল না। মিশরের টলেমি, সিরিয়ার অ্যান্টিওকিড় সাম্রাজ্যের, কিংবা এশিয়া মাইনর ও গ্রীসের বিভিন্ন রাজবংশীয় শাসনের অঙ্গ হিসেবে তারা বিরাজ করত। আংশিকভাবে হলেও, এর মধ্যে সেই প্রাচীন সাম্রাজ্যের ছকটি যেন আবার পরিস্ফুট হয়ে উঠল: ঈশ্বরপ্রেরিত এক রাজা, এক রাজসভা এবং তার অঙ্গস্বরূপ এক সেনাবাহিনী। এই সেনাবাহিনী গোড়াতে শুধুই মাকিডোনীয়দের দ্বারা গঠিত হতো; পরে যাবতীয় স্থানীয় সেনা এবং পেশাদার সৈন্য সে বাহিনীতে স্থান পায়। অত্যাচারী রাজাদের হাতে তো বটেই, দুর্বল রাজাদের হাতে আরো বেশি করে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হতো নাগরিকদের। কিন্তু এ নিয়ে তাঁদের বিশেষ কিছুই করার ছিল না; কারণ আসল সিদ্ধান্তগুলো সবই নেওয়া হতো রাজসভায় কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে। ফলে নাগরিকরা ধন উপার্জন এবং জীবন উপভোগের প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। আর গরিবরা, স্থানীয় বাসিন্দারা আর ক্রীতদাসেরা দুরবস্থাকে সাধ্যমতো সহ্য করে নিল। এইসবের সম্মিলিত পরিণামে সমাজ যেভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ল তা ছিল মানুষের ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব। এ অবস্থায় নাগরিকেরা এক নিরতিশয় স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত এবং উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি গড়ে তোলার সুযোগ পেলেন বটে, কিন্তু সে সংস্কৃতির বন্ধ্যাত্ব ছিল মৃত্যুর মতো অবধারিত।

মেনে-নেওয়ার দর্শন

হেলেনীয় বা অ্যালেকজান্ড্রিয় সভ্যতার বাহ্যিক প্রসার ঘটল ঠিকই, কিন্তু গ্রীসের অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক বিকাশ স্তিমিত হয়ে পড়ল। কলায়, নাটকে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে পরের দিককার গ্রীকদের কাজকর্মের মধ্যে স্থবিরতা প্রকট হয়ে উঠল, বিশেষ করে এথেন্সের সাংস্কৃতিক কর্মের মধ্যে। ঈষৎ অতিরঞ্জিত ও ভাবালু হেলেনীয় শৈলীতে পুরোনো আদর্শ রূপগুলিকে অনুকরণ

করা হতে লাগল; টীকাভাষ্য এবং সমালোচনা লেখা হলো প্রচুর, কিন্তু প্রকৃত অর্থে মহৎ ও নতুন কিছুই রচিত হলো না।

দর্শনের ক্ষেত্রে, ডিমক্রিটাস, প্লেটো বা অ্যারিস্টটলের ঘরানার কোনো প্রকৃত উত্তরসূরীব দেখা মিলল না। বস্তুত দর্শন আগেই বিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল; অ্যালেকজান্ডারের সময় থেকে তা রাজনৈতিক জীবন থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ঐ সময় থেকে নীতিশাস্ত্রই যেন দর্শনের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। সে সময় নাগরিকেবা ধন উপার্জন করতে পারতেন ঠিকই, কিন্তু রাষ্ট্রশাসনে তাঁদের আর ভূমিকা রইল না—অবশ্য রাজসভা কৃপা করে তাঁদের সে অধিকার দিলে অন্য কথা। এমতাবস্থায়, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় ক্লিষ্ট, যুদ্ধ-বিদীর্ণ এই পৃথিবীতে কী করলে রাজনৈতিকভাবে অক্ষম মানুষ জীবনের অনিশ্চয়তাগুলোর সঙ্গে আপস করে নিতে পারবে, সেটাই হয়ে উঠল দর্শনের বিবেচ্য। *Cynic* আর *Sceptic*-রা তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষার কথা বললেন। *Stoic*-রা মহতী ঔদাসীন্য প্রদর্শন করলেন। তাঁরা সদ্‌গুণের নিজস্ব মূল্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা বলতেন, 'নিয়তি কেন বাধ্যতে', মানুষের অদৃষ্ট গ্রহতারকার অমোঘ নির্দেশে বাঁধা। *Epicurean*-রা বললেন, 'হেসে নাও; দুদিন বই তো নয়।' তাঁরা সততাকে সুখলাভের সুনিশ্চিত পথ বলে চিহ্নিত করলেন, মানুষকে বললেন, ঠাকুরদেবতাদের নিয়ে মাথা ঘামিও না, এই ঘূর্ণ্যমান পরমাণু-গঠিত জগতের বহু ঊর্ধ্বে তাঁদের বাস। প্রাচীন দুনিয়ার দর্শন পরে নস্টিক (Gnostic) এবং নব্য প্লেটোপন্থীদের অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদে পর্যবসিত হয়। প্রাচীন দুনিয়ার দর্শনের অন্তিম প্রতিধ্বনি শোনা যায় বয়টিয়াস-এর (Boëthius)* -এর 'দর্শনের সান্ত্বনা'-র মধ্যে। বয়টিয়াস্-এর মধ্যে একটি যুগের অন্ত এবং অন্য একটি যুগের সূচনা লক্ষিত হয়। এই দার্শনিকদের রচনার মধ্যে যা রূপ লাভ করে তাকে বলা যেতে পারে পরিশীলিত উচ্চশ্রেণীর *ধর্ম।* নিম্নতর শ্রেণীর লোকেদের ধর্ম ছিল অনেক স্থূল এবং অনেক বেশি প্রাণবন্ত। কিন্তু পরে যখন তারা ক্ষমতায় এল তখন তাদের ধর্ম মননশীল ভাষায় ব্যক্ত হলো। পূর্বোক্ত দার্শনিকদের রচনা তখন সেই ভাষার যোগান দিল।

হেলেনীয় বিজ্ঞান

মননশীলতার এই সার্বিক অবক্ষয়ের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞান—যা কয়েক শতাব্দী ধরে বিকশিত হয়ে চলে। কতকগুলি ক্ষেত্রে সৃজনশীল চিন্তার নতুন জোয়ার আসে, বিশেষত গণিত, বলবিজ্ঞান আর জ্যোতির্বিজ্ঞানে। অ্যালেকজান্ডারের সাম্রাজ্য বিস্তারের দরুন অর্থনীতিতে ও প্রকৌশলে যে প্রণোদনা জাগে, প্রধানত তারই কল্যাণে এই বিকাশ ঘটে। গ্রীক বাণিজ্য এমন এক বিশাল এলাকা জুড়ে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে যা আগে তাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। গ্রীক নগর-রাষ্ট্রে দরিদ্র মানুষ আর ক্রীতদাসেদের অবস্থা নিতান্তই হীন হওয়ায় তাদের ভোগক্ষমতা ছিল অত্যল্প; সেটাই ছিল গ্রীক অর্থনীতির বরাবরের সংকট। এবার যে নতুন বাজার করায়ত্ত হলো তার দৌলতে সেই সংকট কিছুকালের জন্য প্রশমিত হলো। পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করার এই যে বাজার তা অবশ্য বিশেষ শ্রেণীগন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধানত বড়োলোকেদের ব্যবহার্য সামগ্রীই রপ্তানি করা হতো, যথা খোদাই করা রৌপ্যপাত্র, শৌখীন মৃৎপাত্র, বিভিন্ন আকৃতির কাচপাত্র, রঙে ছোপানো কাপড়, প্যাপাইরাস, চিত্রবিচিত্রিত

* *Boëthius* (480-524)—রোমান দার্শনিক। ইতালি ও গথদের রাজা থিওডোরিক তাঁকে হত্যা করেন। বাহ্যত নব্য-প্লেটোপন্থী হলেও তাঁর মধ্যে বিজ্ঞান-প্রবণতা লক্ষণীয়। নৈতিক ভাবনায় তিনি অনেকটা স্টোয়িক-পন্থী ছিলেন।—অনু·

বস্ত্রখন্ড। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বাজার ছিল যথেষ্ট বড়ো, ফলে এইসব সামগ্রী অনেক পরিমাণে প্রস্তুত করতে হতো। এর পরিণতিতে পণ্যোৎপাদনের জন্য ছোটো ছোটো নগরী গড়ে উঠল, সেখানে প্রধানত মজুরি দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ করা হলো। ক্রীতদাসেদের প্রতিযোগিতা শ্রমিকদের মজুরিকে বাড়তে দিত না। এর পাশাপাশি একেকটি সরকারের অধীন বৃহত্তর এলাকায় কৃষি ছাড়া অন্য কাজে নিয়োজিত এই জনসমষ্টির জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির চাহিদা মেটানোর জন্য সীমাবদ্ধ আকারে সাগরবাহিত বাণিজ্যবিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে উঠল। এইসব প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল খাদ্যশস্য। এর ফলে কেবল পণ্যোৎপাদনেই নয়, কৃষিকার্যেও প্রকৌশলগত উন্নতি ঘটল। ক্রীতদাসদলকে উত্তরোত্তর বেশি করে কৃষিকার্যে নিয়োগ করা হলো। এইসব উন্নতিসাধনের ভার ছিল শাসকদের ওপর, অর্থাৎ তাদের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাদের ওপর। নতুন নতুন প্রকৌশল উদ্ভাবনের আরেকটা বড়ো তাগিদ ছিল যুদ্ধ। তখন সাম্রাজ্যগুলো প্রায় সর্বদাই একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ চালাত। যে কারণে নিত্যনতুন জটিলতর এনজিনের চাহিদা কখনো ফুরোত না। হেলেনীয় রাষ্ট্রগুলোর মাকিডোনীয় শাসকরা গ্রীক বিদ্যার্চর্চার মর্যাদাবান পরিমণ্ডলে বড়ো হয়েছিলেন; কাজেই তাঁরা কেবল যে বিদ্যার্চর্চার অনুমতি দিতেন তাই নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে সে চর্চাকে সর্বপ্রযত্নে উৎসাহ দিতেন। সাহিত্য বা দর্শন অপেক্ষা গ্রীক বিজ্ঞানই এর ফলে বেশি লাভবান হয়েছিল। পরে যে রোমান শাসকরা ক্ষমতা অধিকার করেন, তাঁদের কাছে বিদ্যার্চর্চার এই গুরুত্ব ছিল না।

অ্যালেকজান্ড্রিয়ার সংগ্রহশালা

উত্তরকালের বিজ্ঞানের জন্য গ্রীক বিজ্ঞান যে মহৎ অবদান রেখে যায় তার অধিকাংশই আদি হেলেনীয় বা অ্যালেকজান্ড্রিয় যুগের (330-200 খ্রি· পূ·) কর্মকৃতি থেকে আহরিত। সেসব কাজ প্রধানত অ্যালেকজান্ড্রিয়া শহরেই করা হয়েছিল, যা ছিল অ্যালেকজান্ডারের উত্তরসূরী নব্য টলেমি সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর। প্রাচীন এশীয় সংস্কৃতির প্রকৌশল, বিজ্ঞান এবং সমস্যাবলী প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে গ্রীক বিজ্ঞান— মিশর বা মেসোপটেমিয়ার তো বটেই, এমনকি কিছু পরিমাণে ভারতেরও। মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম বিজ্ঞানকে সংগঠিত করে তোলবার ও ভরতুকি দেবার সচেতন ও সক্রিয় প্রয়াস চলে। অ্যালেকজান্ড্রিয়ার সংগ্রহশালাটি পৃথিবীর প্রথম রাষ্ট্রপোষিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রাচীন গ্রন্থগুলিকে সংরক্ষণ করা ছাড়া এর শৈল্পিক, সাহিত্যিক ও দার্শনিক অবদান ছিল নগণ্য; কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান অভূতপূর্ব। বস্তুত আজ পর্যন্ত আর কোনো একক প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞানে এত বেশি অবদান রেখেছে কিনা সন্দেহ। এই সংগ্রহশালার বৈজ্ঞানিক কর্ম ছিল খুবই বিশেষীভূত। এই ধরনের বিশেষীভূত বৈজ্ঞানিক কাজ এর আগে তো কখনো হয়নি বটেই, এমনকি পরবর্তী দু'হাজার বছরেও হয়নি। এর মধ্যে অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন সদস্যদের কাজ এবং ধ্রুপদী দুনিয়ার অন্যত্র যাঁরা এঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন (যেমন আর্কিমিডিস) তাঁদের কাজও অন্তর্ভুক্ত। গ্রীক নাগরিকদের বিচ্ছিন্নতা এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিফলিত হয় আরো বেশি করে। বিজ্ঞানের দুনিয়া ততদিনে বেশ বড়ো হয়ে উঠেছিল; যার ফলে ছোটোখাটো এক বোদ্ধা 'এলিট' গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এঁরা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের যেসব কাজ নিয়ে আলোচনা করতেন তা এতই বিশেষীভূত হয়ে উঠেছিল যে এমনকি সাধারণ শিক্ষিত নাগরিকরাও তা পড়ে মানে বুঝতে পারত না। আর নিচুতলার লোকেরা সন্দেহমিশ্রিত সম্ভ্রমে তার দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকত। এর ফলে বিজ্ঞানীদের পক্ষে সূক্ষ্ম জটিল যুক্তিতর্কের অবতারণা করা সম্ভব হয় এবং

পারস্পরিক সমালোচনার মধ্যে দিয়ে অতিদ্রুত বিপুল অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব হয়। কিন্তু একই সঙ্গে এইসব অগ্রগতির ভিত্‌টা হয়ে থাকে নড়বড়ে। কারণ এই বৈজ্ঞানিক প্রয়াস সম্পূর্ণত এক প্রবুদ্ধ রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষণার ওপারেই নির্ভরশীল ছিল। সেই পৃষ্ঠপোষণা যখন আর রইল না তখন ঐ বিশাল জ্ঞানসৌধও প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল। বড়ো বড়ো শহরের বাইরে ঐ জ্ঞানচর্চার কোনো সজীব শিকড় না থাকায় তা কার্যত বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে গেল। তবে কয়েকটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ রচনা রক্ষা পেয়েছিল; পরে রেনেসাঁসের যুগে সেগুলি পুনরাবিষ্কৃত হয়।

প্রথম দিকে অ্যালেকজান্ড্রিয় বিজ্ঞানচর্চার প্রধান ঝোঁকটা ছিল অ্যারিস্টটল ও তাঁর ঘরানার অনুসারী। বস্তুত অ্যালেকজান্ড্রিয়ার ঐ সংগ্রহশালাটিকে লাইসিয়ামের মিশরী শাখা বললে ভুল হয়না। যেহেতু এই শাখা অনেক বেশি পৃষ্ঠপোষণা লাভ করে তাই মূল কান্ডটিকে তা কয়েক বছরের মধ্যেই ছাড়িয়ে যায়। স্ট্রাটো (প্রায় 270 খ্রি·পূ·), যিনি ছিলেন হেলেনীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে সামগ্রিক বিচারে সবচেয়ে দক্ষ, তিনি অ্যালেকজান্ড্রিয়া আর এথেনস দু'জায়গাতেই পড়িয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন লাইসিয়ামের শেষ বিশিষ্ট অধ্যক্ষ।

তবে দুটি প্রতিষ্ঠানের কোনোটিতেই অ্যারিস্টটলের সুবিশাল কর্মসূচীর সমগ্র ক্ষেত্রটি জুড়ে গবেষণা চালানোর সুযোগ ছিল না। জীববিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্ব নিয়ে অ্যারিস্টটলের নিজস্ব গবেষণার সূত্র ধরে একমাত্র তাঁর সাক্ষাৎ উত্তরসূরী থিওফ্রাস্টুস ছাড়া আর কেউই কাজ করেন নি। অ্যারিস্টটল প্রাণিবিজ্ঞানের জন্য যা করেছিলেন, থিওফ্রাস্টুস উদ্ভিদবিজ্ঞানের জন্য ঠিক তাই করেন। তিনি এক ধরনের বর্ণনাত্মক মণিকবিদ্যারও (mineralogy) সূত্রপাত করেছিলেন। যত স্থূলই হোক, পরবর্তী দু'হাজার বছরে সে মণিকবিদ্যার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। এছাড়া যেসব ক্ষেত্রে সনিষ্ঠ গবেষণা চলে সেগুলি হলো পদার্থবিদ্যার তিনটি শাখা: *জ্যোতির্বিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান* এবং *বলবিজ্ঞান।* অ্যারিস্টটল *যুক্তিশাস্ত্র* নিয়ে সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন; এবার তার বদলে প্লেটোর অনুসরণে *গণিতশাস্ত্রের* দ্রুত বিকাশ ঘটানো হলো। সেই গণিতশাস্ত্রের প্রধান উপজীব্য ছিল আদর্শ রূপ বা আকারের অন্তর্নিহিত সুষমার সন্ধান এবং নিছক চাক্ষুষ এই জগতের ওপর সেই সুষমাকে আরোপ করা। তবে নিম্নতর স্তরে এই গণিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের আরো নিখুঁত বিবরণ রচনা করার কাজে লাগে এবং বলবিজ্ঞান, গ্যাস-বলবিজ্ঞান (pneumatics) এবং জলস্থিতিবিদ্যাকে (hydrostatics) পরিমাপযোগ্য বিজ্ঞানে পরিণত করে।

গবেষণাকর্মের উপযোগী আদর্শ পরিবেশ এবং পরীক্ষানিরীক্ষার উন্নত যন্ত্রপাতির কল্যাণে অল্পকাল পরেই প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের অপেক্ষাকৃত অপরিমার্জিত স্বজ্ঞার প্রয়োজন ফুরোল। পরমোদ্দেশ্যবাদ, স্বাভাবিক স্থান এবং পরম কারণের মতবাদ, এসবই বর্জন করা হলো। প্রত্যাখ্যাত হলো অ্যারিস্টটলের গতিতত্ত্ব, যা বায়ুশূন্যতাকে 'অসম্ভব' বলে চিহ্নিত করেছিল। ডিমক্রিটাসের যে কণিকাবাদকে এথেন্সের এই দার্শনিক কঠোরভাবে নির্বাসন দিয়েছিলেন তার অনেকটাই আবার স্বীকৃতি লাভ করল। মধ্যযুগে যে দর্শনকে 'প্রাচীনদের দর্শন' নামে অভিহিত করা হতো তার ধ্বংসসাধনের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শুরুতেই বহুলাংশে সমাধা হয়ে যায়। স্ট্রাটোর চিন্তাভাবনার সঙ্গে বয়েল্-এর চিন্তাভাবনা চমৎকার খাপ খেয়ে যেতে পারত; বয়েলের পক্ষে অবশ্য তা নিয়ে কোনো চর্চা করা সম্ভব হয়নি। একমাত্র গণিত ছাড়া হেলেনীয় যুগের অগ্রসর গ্রীক ভাবনার অধিকাংশই হারিয়ে যায়। এর কারণ নিয়ে আগেই কিছু আলোচনা করেছি। অ্যালেকজান্ড্রিয়া, এথেন্স ও সিরাকিউজের বিজ্ঞানীরা ছিলেন কার্যত বিচ্ছিন্ন—সামাজিক এবং মতাদর্শগত দিক থেকে। তাঁরা আর দার্শনিক পদবাচ্য ছিলেন না। সিসেরো'র ভাষায়, স্ট্রাটো 'নীতিশাস্ত্রকে বর্জন করিয়া প্রকৃতির অনুসন্ধানে

রত হইয়াছিলেন; অথচ নীতিশাস্ত্রই হইল দর্শনের সর্বাধিক অপরিহার্য অঙ্গ।' সুতরাং এই বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা যুগের চিন্তাধারার মূলস্রোত ছেড়ে অন্য খাতে প্রবাহিত হয়। সেই সংকট আর অবক্ষয়ের যুগে যুগের মূল চিন্তাস্রোত অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছিল, ব্যক্তিমানুষের অন্তর্বিশ্বই তার উপজীব্য ছিল। ফলে প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীদের এইসব অগ্রসর ভাবনাচিন্তা প্রচার লাভ করল না। ক্রমে তা বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে গেল। পক্ষান্তরে প্লেটো আর অ্যারিস্টটলের অপেক্ষাকৃত অবৈজ্ঞানিক এবং সহজবুদ্ধিনির্ভর ধ্যানধারণা অতি সযত্নে সংরক্ষিত হলো। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের ভাবনাচিন্তাকে গ্রহণ করা হলো, কারণ যুগের কতকগুলো সীমিত কর্মভার সম্পাদনের জন্য, বিশেষত জ্যোতিষচর্চার স্বার্থে, তার প্রয়োজন ছিল।

হেলেনীয় গণিত : ইউক্লিড

হেলেনীয় কালে ভৌত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার চর্চা করা হতো দুটি উদ্দেশ্যে: তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক। বলা বাহুল্য, তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যটি ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্বচর্চার কেন্দ্রে ছিল গণিত। গণিতচর্চার সূত্রেই জ্যামিতিচর্চার প্রসারণ ঘটে এবং তা সুশৃঙ্খল রূপ ধারণ করে। সংখ্যা সহযোগে গণনাকে তখন সুনিশ্চিতভাবেই হীন চোখে দেখা হতো এবং সে গণনা প্রকাশ করার প্রয়োজন হলে তাকে জ্যামিতিক প্রচ্ছদের আড়ালে প্রকাশ করতে হতো। তবে এই করতে গিয়ে অতি চমৎকার ও অকাট্য সব ফল পাওয়া গিয়েছিল। ইউডক্সাস এইসবের জন্য আগেই যে সমস্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, আর্কিমিডিস সেগুলোকে প্রয়োগ করলেন, তাদের উন্নতিসাধন করলেন। এইসব পদ্ধতি সহযোগে তিনি বৃত্তের সম-আয়তনযুক্ত সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্র অঙ্কনের ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানে পাঁচ স্থান পর্যন্ত π-এর মান নিরূপণ করতে সমর্থ হলেন। শুধু তাই নয়, তিনি গোলক, চোঙ এবং আরো জটিল গঠনের বস্তুর আয়তন ও পৃষ্ঠতল নির্ণয় করার সূত্র আবিষ্কার করেন। বস্তুত এরই মধ্যে দিয়ে ইনফিনিটেসিমল ক্যালকুলাসের সূত্রপাত ঘটে, যা পরে নিউটনের হাতের ছোঁয়ায় পদার্থবিদ্যায় বিপ্লব ঘটায়। একটি কোণকে ত্রিখণ্ডিত করা বা একটি ঘনককে দ্বিগুণিত করার মতো সাবেকী এবং নিরর্থক সমস্যার সমাধান করতে গিয়েও নানা ধরনের জটিল বক্রক্ষেত্র নিয়ে অসাধারণ সব গবেষণা চলে। তবে সবচেয়ে যা ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয় তা হলো কনিক সেকশন নিয়ে, অর্থাৎ উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত এবং অতিবৃত্ত (hyperbola) নিয়ে গবেষণা। প্রায় 350 খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেনিক্মস (Menaechmos) কর্তৃক আবিষ্কৃত এই জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলি নিয়ে সুবিস্তৃত চর্চা করেন পের্গা-র অ্যাপলনিয়াস (প্রায় 220 খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। তাঁর এই কাজ এতই সর্বাঙ্গসুন্দর ছিল যে প্রায় দুহাজার বছর পরে কেপলার ও নিউটন বিনা পরিবর্তনে সেগুলি ব্যবহার করে গ্রহের কক্ষপথের চরিত্র নিরূপণে সমর্থ হন।

এইসব স্বতন্ত্র কৃতির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল হেলেনীয় যুগের গণিতকে এক সুশৃঙ্খল রূপদান। যুক্তিশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে বিভিন্ন উপপাদ্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার প্রণালী ইতিমধ্যেই চালু ছিল। বস্তুত, অ্যারিস্টটলের যুক্তিশাস্ত্র তো জ্যামিতিক প্রমাণপদ্ধতিরই বাক্যনিবদ্ধ রূপ মাত্র। ইউক্লিড (প্রায় 300 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এসে নতুন একটা কাজ করলেন। তিনি গণিতের একটা প্রধান অংশকে এক ঐক্যবদ্ধ জ্ঞানসৌধে পরিণত করলেন। সে সৌধটি *সিদ্ধান্ত* আর *স্বতঃসিদ্ধের* ওপর নির্মিত। গণিতে এর গুরুত্ব যে কতখানি তার প্রমাণ এই যে এখনো জ্যামিতি শেখাতে গেলে ইউক্লিড কোনো না কোনো আকারে অপরিহার্য। কিন্তু ভৌত বিজ্ঞানে এর গুরুত্ব কতটা তা নিয়ে সংশয় আছে। কারণ এই পদ্ধতিতে *আবিষ্কার* অপেক্ষা

প্রমাণের শ্রেষ্ঠত্ব, এবং পর্যবেক্ষণ-ও পরীক্ষা-নির্ভর *অবরোহী* যুক্তি অপেক্ষা স্বতঃসিদ্ধ-নির্ভর *আরোহী* যুক্তির শ্রেষ্ঠত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়। জ্যামিতির এই সাফল্য বীজগণিতের অগ্রগতিকে রোধ করে। গ্রীকদের নিতান্ত অপরিণত অঙ্কপাতন পদ্ধতিও এর জন্য দায়ী। এর আংশিক ব্যতিক্রম হলো ডায়োফান্টুস্-এর (প্রায় 250 খ্রি·পূ·) সমীকরণ বিষয়ক কাজ। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের এই কাজের মধ্যে সমসাময়িক ব্যাবিলোনীয় ও ক্যাল্‌ডীয় গণিতের প্রভাবের অভ্যন্তরীণ চিহ্ন চোখে পড়ে।

হেলেনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান: হিপার্কাস ও টলেমি

তাত্ত্বিক আর ফলিত বিজ্ঞানচর্চার মাঝামাঝি জায়গায় ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান। প্লেটোর মত অনুসারে জ্যোতির্বিজ্ঞান ছিল দেবলোকনিবাসী ও দেবতাদের মর্যাদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এক আদর্শ নভোজগত নিয়ে চর্চা; বাস্তবে সে আকাশে যদি কোনো বিচ্যুতি বা ব্যত্যয় চোখে পড়ে তবে তা হয় অগ্রাহ্য করতে হবে, নতুবা কোনো একটা ব্যাখ্যা দিয়ে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হবে। অপরদিকে নভোজগতের অন্য একটা নিগূঢ় তাৎপর্যের কথাও স্বীকার করা হতো; সেই তাৎপর্যের খাতিরে নক্ষত্রসমূহের, বিশেষত গ্রহসমূহের, অবস্থান নিখুঁতভাবে পূর্বাহ্নেই জানা প্রয়োজন ছিল, নতুবা জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী এড়াবার সব আশাই যে বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই দুই প্রবণতার সম্মিলিত পরিণামে হেলেনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান তার সরলতা ও সুষমার মূলনীতিকে ব্যাহত না করে মহাবিশ্বের উত্তরোত্তর জটিল ছককে ভৌত পর্যবেক্ষণের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কাজে ব্যাপৃত রইল। এর ফলে গণিত এবং ভৌত পর্যবেক্ষণ— দুটিরই উন্নতি ঘটে। বলা যেতে পারে যে প্রায় আমাদের এই আধুনিক কাল পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানই ছিল বিজ্ঞানের যাবতীয় হাতিয়ারকে শাণিয়ে তোলার শাণপাথর। এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। গ্রীক বিজ্ঞানের যাবতীয় শাখার মধ্যে একমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানই আমাদের কাছে এক অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছেছে।

এই জ্যোতির্বিজ্ঞানের গাণিতিক ভিত্তি ছিল ইউডক্সাসের প্রকল্পিত গোলকসমূহ। কিন্তু বাস্তব গণনার জন্য গ্রহের চলাচলকে একটি সমতল ক্ষেত্রে রেখে বিচার করাটা ছিল অনেক সুবিধাজনক। অতঃপর তত্ত্বের মুখরক্ষার জন্য 'চক্রের ভিতর চক্রে'র ধারণা প্রবর্তন করা হলো। প্রাচীনকালের পর্যবেক্ষণাত্মক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম, সেই হিপার্কাস (190-120 খ্রি·পূ·) এই কাজটি করেন। পরবর্তী দু'হাজার বছর ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, তার বেশির ভাগই তাঁর উদ্ভাবিত। প্রথম জ্যোতিষ্ক-তালিকা রচনার কৃতিত্বও তাঁর। তিনি যে গ্রহব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তার ফলে অনেক নিখুঁত গণনা করা সম্ভব হলো ঠিকই, কিন্তু সে ব্যবস্থাটি ছিল ইউডক্সাসের তুলনায় অতিরিক্ত জটিল। তাছাড়া হিপার্কাস -প্রবর্তিত প্রণালীতে গ্রহজগতের চলাচলের বলবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনাও আর রইল না। দুশো বছর পরে টলেমি (90-168 খ্রিস্টাব্দ) হিপার্কাসের প্রবর্তিত গ্রহব্যবস্থাটিকে যে-রূপে উপস্থাপিত করেন, সেটাই রেনেসাঁস যুগের আগে পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের স্বীকৃত রূপ হিসেবে বিরাজ করে। এই ব্যবস্থাটা যে এইভাবে স্বীকৃতি লাভ করল তার কারণ হচ্ছে, পৃথিবী আর স্বর্গের মাঝখানে হিসেবের যাবতীয় গরমিলকে তা দূর করে দিতে সক্ষম হয়; আর স্বর্গে তুচ্ছ বলবিজ্ঞানের সূত্র যে অচল, এটা তো বলাই বাহুল্য। তাছাড়া এই ব্যবস্থাটা একেবারে মাপজোক অনুসারে বানানো হয়েছিল, কোথাও হিসেবে কোনো গরমিল হলেই চলমান বৃত্তিকা (epicycle) জুড়ে দিয়ে হিসেব মেলানোর বন্দোবস্ত ছিল। ফলে, এই ব্যবস্থা অনুযায়ী যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হতো, তা ছিল মোটের ওপর অভ্রান্ত।

বিকল্প চিন্তাধারার একটি ঐতিহ্যও বরাবরই সক্রিয় ছিল। সে চিন্তাধারা অনুযায়ী পৃথিবী মোটেই স্থির নয়, তা–ই আসলে ঘুরে চলে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এক্‌ফান্টুস বা হয়তো খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে হিকেটাস এই মত প্রচার করেন। এই চিন্তাধারা কোনোদিনই লুপ্ত হয়ে যায় নি। পন্টুস্-এর হেরাক্লিডিস্ (প্রায় 370 খ্রি·পূ·) এই মতকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সমর্থন করেন। তিনি যে ব্রহ্মাণ্ডের কথা বললেন তার কেন্দ্রে আছে ঘূর্ণনশীল পৃথিবী; পৃথিবীকে ঘিরে সূর্য আর চন্দ্র পাক খায়; কিন্তু গ্রহেরা পৃথিবীর বদলে সূর্যের চারপাশে ঘুরে চলে। অর্থাৎ পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে যা চোখে পড়ে তার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় এই ব্যবস্থায়। পরে টাইকো ব্রাহে এই মতই গ্রহণ করেছিলেন। হেরাক্লিডিস্-এর পরে যুক্তিগত দিক থেকে চূড়ান্ত পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন সামোস-এর অ্যারিস্টার্কাস। তিনি সাহসভরে এই কথা বলেন যে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য—পৃথিবী নয়। অ্যারিস্টার্কাস্-এর নিজস্ব মর্যাদা যত উচ্চই হোক, তাঁর এই মত কিন্তু বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেনি। তার প্রধান কারণ এই যে এ মতকে ধর্মবিরোধী এবং দার্শনিক দিক থেকে অসম্ভব বলে গণ্য করা হয়েছিল। তাছাড়া এ তত্ত্ব ছিল মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতারও বিরোধী। তা সত্ত্বেও তা এক বিদ্রোহী মতবাদ হিসেবে বরাবরই অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। পরে আরবদের মারফত এই তত্ত্ব সঞ্চারিত হয় এবং কোপার্নিকাস তাকে নবজীবন দান করেন। অতঃপর গ্যালিলিও, কেপলার এবং নিউটন বিপুল উদ্যমে একে যথার্থ বলে প্রমাণ করেন।

বিজ্ঞানসম্মত ভূগোল

জ্যোতির্বিজ্ঞানে উন্নতি ঘটায় এতদিনে এক পরিমাপনির্ভর এবং বিজ্ঞানসম্মত ভূগোলবিদ্যা গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে উঠল। মানচিত্র রচনার মূল সমস্যাটি ছিল: একটি গোলকের ওপর জ্যোতিষ্কসমূহের অবস্থানের নিরিখে, কতকগুলি কাল্পনিক সমান্তরাল অক্ষাংশের ও মধ্যরেখার (মধ্যদিবা রেখা) সাপেক্ষে ভ্রমণকারী এবং কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন অনুসারে শহর, নদী এবং উপকূলসমূহের অবস্থান চিহ্নিত করা। এর অর্থ হলো *পৃথিবীর আকার পরিমাপ করা।* সাইরিন্-এর এরাটোস্থেনিস্ (275-194 খ্রি·পূ·) প্রথম এই কাজটি করতে সমর্থ হন। তিনি ছিলেন অ্যালেকজান্ড্রিয়ার সংগ্রহশালার একজন পরিচালক। তাঁর পরিমাপ অনুযায়ী পৃথিবীর পরিধি হলো 24,700 মাইল। প্রকৃত হিসেবের সঙ্গে এর গরমিল মাত্র 250 মাইল। এরাটোস্থেনিস্-এর এই হিসেব একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্বীকৃত ছিল, তারপর তার উন্নতি ঘটানো হয়। অ্যালেকজান্ডারের সাম্রাজ্যবিস্তারের ফলে গ্রীকদের পরিচিত দুনিয়ার সীমা অনেক প্রসারিত হয়ে যায় ঠিকই; কিন্তু তারপর আর বিশেষ কোনো প্রসারণ ঘটেনি। পূর্বে বা পশ্চিমে অভিযান চালানোর আর কোনো অর্থনৈতিক তাগিদ ছিলনা। মার্সেই-এর পিথেআস্-এর (প্রায় 330 খ্রি·পূ·) মতো দু একজন অভিযাত্রী এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। নতুন নতুন অভিযান চালানোর সেই প্রণোদনা রেনেসাঁস যুগের আগে আর ফিরে আসেনি। সাগরযাত্রায় এই অনীহার দরুন নৌচালন-সংক্রান্ত নিখুঁত জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চায় ভাঁটা পড়ে; কেননা উপকূল ধরে ধরে সাগরযাত্রার পক্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিতান্ত প্রাথমিক জ্ঞানই ছিল যথেষ্ট।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক গৌণ উপজাতক ছিল আলোকবিজ্ঞান। প্রাচীনকালে লেন্স বানানো সম্ভব হয়নি, কারণ তখনকার কাচ ছিল ত্রুটিযুক্ত, আর কেলাস বা স্ফটিক ছিল অতি দুর্লভ। দর্পণে আলোর প্রতিফলন নিয়ে তাঁরা যে চর্চা করেছিলেন (catoprics) তার সাহায্যে দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করা বা দর্পণ পোড়ানোর ক্ষমতা তাঁরা অর্জন করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেসব তেমন বড়ো কোনো কাজে লাগত না। অপরদিকে, আলোর প্রতিসরণ নিয়ে তাঁরা যে চর্চা

করেছিলেন (dioptrics) তার কল্যাণে তাঁরা নিখুঁত দর্শন-সহায়ক যন্ত্রের সাহায্যে কোণ নির্ণয় করতে সমর্থ হন। নিখুঁত জরিপের কাজে এর প্রয়োগ ঘটে। এতদসত্ত্বেও, সঠিক পরিপ্রেক্ষিত রচনার কৌশলটি তাঁরা আয়ত্ত কবতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়না। সে কৌশল মানুষের আয়ত্তে আসে রেনেসাঁস যুগে।

হেলেনীয় বলবিজ্ঞান : আর্কিমিডিস

ভৌত বিজ্ঞানে হেলেনীয় যুগেব মহত্তম অবদান আসে বলবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রণোদনা এসেছিল সম্ভবত প্রকৌশলের দিক থেকে। অ্যালেকজান্ডারেব অভ্যুদয়ের আগেই গ্রীকদের কর্মকুশলতা ছিল খুবই উচ্চাঙ্গের, বিশেষত ধাতুকর্মে। মিশর বা সিরিয়ার মতো দেশে গিয়ে সেই কর্মকুশলতা যাবতীয় যন্ত্রপাতির বিরাট উন্নতিসাধনের কাজে লাগল। কারণ ঐসব দেশে গ্রীকদের হাতে অনেক বেশি ধনসম্পদ চলে আসে। এর ফলে বিশেষ করে সেচকর্ম, ভারি জিনিস স্থানান্তরণ, জাহাজনির্মাণ এবং সামরিক এনজিন-নির্মাণে প্রভূত উন্নতি ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ নানাবিধ নতুন যন্ত্রকৌশলের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়. কিন্তু তাদের উদ্ভবের বৃত্তান্ত আমাদের অজানা। এমন হতে পারে যে দখলদার গ্রীকরা স্থানীয় কারিগবদের ব্যবহৃত চিরাচরিত যন্ত্রপাতি আবিষ্কাব করে এবং পরে শিক্ষিত গ্রীক প্রকৌশলবিদরা সেগুলোব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন ও সেগুলোর উন্নতিসাধন করেন। নিখুঁত কর্মকুশলতা এবং অভ্রান্ত গণনার এই পাবস্পরিক প্রণোদনার ব্যাপারটি পুনরায় লক্ষ্য করা যাবে রেনেসাঁস যুগে। বহুমাত্রিক কপিকল (compound pulley) আর উইন্ডল্যাসের প্রচলন সম্ভবত পালতোলা জাহাজ চালানোব অভিজ্ঞতা থেকে ঘটেছিল। কিন্তু ইস্ক্রুপ জিনিসটার উদ্ভাবন বেশ পবিশীলিত ভাবনার পরিচাযক। খুব সম্ভব কয়েকজন গণিতজ্ঞের ভূমিকা এর পিছনে সক্রিয ছিল। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকদেব চাহিদা মেটানোর তাগিদে দার্শনিকরা তখন যন্ত্রপাতির গাণিতিক নকশা বচনার মতো হীন কাজেও মনোযোগ দিতে রাজি ছিলেন। প্লুটার্ক যদিও আর্কিমিডিস সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে 'এনজিনিয়ারের কাজকে এবং যা কিছু জীবনের প্রযোজন মেটায় সেসব কাজকে তিনি হীন এবং কুৎসিত বলে মনে করতেন', তবু আর্কিমিডিস-উদ্ভাবিত নানান সমরযন্ত্র সম্পর্কে চালু কিংবদন্তীগুলোর মূলে কিছুটা সত্য নিশ্চয়ই ছিল। আর্কিমিডিস ছিলেন গ্রীক গণিত ও বলবিজ্ঞানের মহত্তম পুরুষদের অন্যতম। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সত্যিকারেব স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত শেষ গ্রীক বিজ্ঞানী। সিরাকিউজ়-এর শেষ স্বৈরশাসক দ্বিতীয় হীয়েরো-র সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল; রোমানদের বিরুদ্ধে সে শহরেব প্রতিরক্ষাতেও তাঁর বড়ো ভূমিকা ছিল। একটি সম্পাদ্যের সমাধান রচনায় ব্যাপৃত অবস্থায় তিনি এক রোমান সেনার হাতে নিহত হন। হয় সে তাঁর পবিচয় জানতনা, নাহয় তাঁর কাজ নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা ছিলনা। আর্কিমিডিস একান্তভাবেই *বিশুদ্ধ* গ্রীক বিজ্ঞান-ঘরানার অনুসারী ছিলেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে *পদ্ধতি* সম্পর্কে তাঁর যে রচনাটি আবিষ্কৃত হয় তা থেকে দেখা যায় কার্যক্ষেত্রে তিনি যান্ত্রিক মডেলের সহায়তায় গাণিতিক ফলে *উপনীত হতেন*, কিন্তু অতঃপর *প্রমাণ উপস্থাপনের কালে* সেগুলোকে বর্জন করতেন। ধ্রুপদী যুগে তাঁর কাজ নিয়ে বিশেষ চর্চা হয়নি। তাঁর কাজের গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা হয় রেনেসাঁসের যুগে। আর্কিমিডিসের রচনার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় 1543 সালে—যেবছর কোপার্নিকাসের *De Revolutionibus* এবং ভেসালিয়াসের *Fabrica* প্রকাশিত হয়। তাঁর গ্রন্থও ঐ দুই মহাগ্রন্থের মতোই বিপুল প্রভাব ফেলে।

স্থিতিবিজ্ঞান ও জলস্থিতিবিজ্ঞান

তাঁর *বলবিজ্ঞানের মূলকথা* শীর্ষক রচনায় আর্কিমিডিস সরল যন্ত্রের ক্রিয়াপদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ এবং পরিমাণাত্মক বিবরণ দেন। এই গ্রন্থেই তিনি *স্থিতিবিজ্ঞানের (statics)* ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর বিশ্লেষণের চরিত্রটি ছিল অভ্রান্তভাবে গ্রীক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কোন কোন পরিস্থিতিতে বলসমূহের মধ্যে পরিপূর্ণ সাম্য রচিত হবে তারই বিশ্লেষণ করেন তিনি। আর্কিমিডিস *জলস্থিতিবিজ্ঞানেরও (hydrostatics)* ভিত্তিপ্রণেতা। ভাসমান বস্তুর নিয়মাবলীর এই আবিষ্কার দুভাবে কাজে লেগেছিল। প্রথমটি হলো, জলেব মধ্যে ওজন করে কোনো বস্তুর ঘনত্ব নির্ণয়। মহার্ঘ ধাতুর বিশুদ্ধতা নিরূপণেব কাজে উপযোগী হওয়ায় এই প্রক্রিয়াটি অচিরেই চালু হয়ে যায়, এবং সেই থেকে তাব ব্যবহার 'সমানে চলেছে'। দ্বিতীয়টি হলো, জাহাজের ভারবহন-ক্ষমতার নিরূপণ। এই ব্যাপারটি জাহাজনির্মাতারা কার্যক্ষেত্রে পুরুষানুক্রমে জানত; কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর আগে এ নিয়ে গণনাকার্য হয়নি। পরে এ নিয়ে আলোচনা করব।

গ্যাস-বলা

বলবিজ্ঞানেব এক সম্পূর্ণ নতুন শাখা রূপে আবির্ভাব হয় গ্যাস-বলবিজ্ঞানের (pneumatics) অর্থাৎ বায়ুর চলন নিয়ে গবেষণা ও তার প্রয়োগ। টেসিবিয়াস (Ctesibius, প্রায় 250 খ্রি·পূ·) এবং হীয়েরো (প্রায় 100 খ্রিস্টাব্দ) সঞ্চাপিত বায়ুর সাহায্যে নানারকম অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করেন—প্রধানত মন্দিরের প্রয়োজনে। হীয়েরো এমনকি জেট-প্রতিক্রিয়া নীতির প্রয়োগে একধরনের বাষ্পীয় এনজিনের প্রাথমিক রূপও তৈরি করেছিলেন। তবে পাম্প উদ্ভাবনের ব্যবহাবিক গুরুত্ব ছিল অবশ্যই অনেক বেশি। সেযুগের ধাতুকর্মীদের নৈপুণ্য এতই উচ্চাঙ্গের ছিল যে তাঁরা যেসব দ্বৈত-ক্রিয়াপর বল-পাম্প বানান তার গুণমান উনিশ শতকে প্রচলিত পাম্পের সঙ্গেই তুলনীয়। শুধু তাই নয়, সেগুলো এতই শস্তা ছিল যে সুদূর ব্রিটেনেও তাদের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। গ্যাস-বলবিজ্ঞানের আরেকটি যান্ত্রিক অবদান ছিল জলশক্তি-চালিত বায়ুবাদিত অর্গ্যান বাদ্যযন্ত্র। এযুগের অর্গ্যান বা পিয়ানোর মতোই চাবি টিপে সেগুলো বাজানো হতো।

হেলেনীয় যুগের যান্ত্রিক জ্ঞান ও সিদ্ধি এতই অগ্রসর ছিল যে তার ভিত্তিতে অনায়াসেই শিল্পবিপ্লব ঘটানোর উপযোগী যান্ত্রিক প্রকরণসমূহ আয়ত্ত করে ফেলা সম্ভব ছিল—যথা বহুক্রিয়া-সমন্বিত বস্ত্রনির্মাণযন্ত্র এবং বাষ্পীয় এনজিন। কিন্তু সেই সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এসে তা থমকে দাঁড়ায়। একথা সত্যি যে শিল্পবিপ্লব যুগের মূল উপকরণটি তাঁদের হাতে ছিলনা—শস্তা ঢালাই লোহা। কিন্তু সে লোহা তৈরি করে নেবার মতো যাবতীয় উপকরণ তাঁদের হাতে ছিল। পাওয়ার-চালিত হাপর বানানোর সাধ্য তাঁদেব যথেষ্টই ছিল। তা সত্ত্বেও এই ব্যর্থতার আসল কারণ হলো প্রণোদনার অভাব। ব্যাপক আকারে যন্ত্রনির্মিত পণ্যের বাজারই তখন ছিলনা। হাতে-তৈরি জিনিসের চড়া দাম দেবাব সাধ্য ধনীদের যথেষ্টই ছিল; অপরদিকে গরিব এবং ক্রীতদাসেরা তো নিছক অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনের বাইরে কোনো কিছু কেনার কথা ভাবতেই পারতনা।

বিজ্ঞানসম্মত রসায়নের উষাকাল

গ্রীক বিজ্ঞান গণিত আর বলবিজ্ঞানের বনেদের ওপরে গড়ে উঠেছিল। হাত নোংরা হতে পারে এমন কোনো কিছু নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করায় তাদের ছিল ঘোর অনীহা। ফলে রসায়নে তারা বেশি দূর এগোতে পারেনি। তবে আলকেমি এবং পাতন-প্রক্রিয়ার (যার গুরুত্ব রসায়নে সমধিক)

সূত্রপাত হয়তো অ্যালেকজান্ড্রিয় যুগের গোড়ার দিকেই হয়ে থাকবে। 'হয়তো' বলছি এইজন্যে যে আলকেমির এবং তৎসহ বিজ্ঞানসম্মত রসায়নের উদ্ভব সত্যিই অ্যালেকজান্ড্রিয়াতে ঘটেছিল কিনা তা নিয়ে এখনো প্রশ্ন আছে। এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য প্রথম যেসব রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলোর রচয়িতা হলেন প্যানোপলিস-নিবাসী জজ়িমাস এবং ইহুদী-রমনী মেরি। কিন্তু এগুলি অনেক পরের দিকের লেখা—চতুর্থ এবং পঞ্চম খ্রিস্টাব্দের। এমন হতে পারে যে এঁদের যদি কোনো তত্ত্বভাবনা থেকে থাকে, তা হয়তো চৈনিক আলকেমির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। হেলেনীয় রসায়নের যে প্রকৌশলগত কর্মকৃতিত্ব, যার ওপর আমাদের সমগ্র আধুনিক রসায়ন দাঁড়িয়ে আছে, তার মূলে আছে ফুৎকার-সহযোগে কাচকে বিভিন্ন রূপদানের কৌশলের উন্নতিসাধন। বকযন্ত্র প্রস্তুত করবার জন্য, এবং বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশন করবার জন্য সে কৌশলের প্রয়োজন হতো।

প্রকৃতিচর্চা

ভৌতবিজ্ঞানের বাইরে একমাত্র ডাক্তারি ছাড়া আর কোনো ক্ষেত্রে হেলেনীয় বিজ্ঞানীদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় দিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ চর্চা করার যে প্রেরণা অ্যারিস্টটল যুগিয়েছিলেন, তা এক পুরুষের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রাণী ও উদ্ভিদ নিয়ে চর্চার ক্ষেত্রে অল্প দু একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে। ব্যবহারিক কৃষিকর্ম সম্পর্কে পুস্তক রচনার সূচনা অবশ্য এই সময়েই ঘটে।

চিকিৎসাশাস্ত্র : গ্যালেন

চিকিৎসাশাস্ত্রের ঐতিহ্যকে কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয়েছিল, এমনকি তার কিছুটা উন্নতিও সাধন করা গিয়েছিল। কারণ হেলেনীয় সমাজ-পরিস্থিতি তার অনুকূল ছিল। কথাটা জ্যোতির্বিজ্ঞান অপেক্ষাও চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিই বেশি প্রযোজ্য। শাসক এবং ধনীসম্প্রদায়ের কাছে ডাক্তাররা ছিলেন অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের জীবনযাত্রা যত বেশি অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে, ততই ডাক্তারদেব ওপর তাঁদের নির্ভরতা বাড়ে। অ্যালেকজান্ড্রিয়ার সংগ্রহশালা শারীরস্থান ও শারীরতত্ত্বের গবেষণাকে রীতিমতো উৎসাহিত করে।

ক্যাল্সিডন-নিবাসী হীয়েরোফিলাস (300 খ্রি·পূ·) ছিলেন শারীরস্থান ও শারীরতত্ত্বের এক দিকপাল। তিনি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ভিত্তিতে কাজ করতেন। স্নায়ুগুলির কাজ কী এবং নাড়ি টিপে কীভাবে শরীরের অবস্থা বোঝা যায়, তা অনুধাবন করার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। সংবেদন-স্নায়ু এবং চেষ্টীয় (motor) স্নায়ুর পার্থক্য তিনিই প্রথম নির্ণয় করেন। এরাসিস্ট্রেটাস (280 খ্রি·পূ·) আরো এগিয়ে গিয়ে মানবমস্তিষ্কের ভাঁজগুলির তাৎপর্য লক্ষ্য করেন। অ্যালেকজান্ড্রিয় পর্বের আদিযুগের শ্রেষ্ঠ মূল রচনাগুলির অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। তবু তাদের নির্যাসটুকু পরম্পরাক্রমে সঞ্চারিত হয়। ধ্রুপদী যুগের শেষ বৈদ্য-চূড়ামণি গ্যালেন্-এর (130-200 খ্রিস্টাব্দ) সুবিপুল রচনায় তা স্থান লাভ করে। এশিয়া মাইনরের পার্গ্যামম্-এ তাঁর জন্ম। সেখানে এবং অ্যালেকজান্ড্রিয়ায় শিক্ষালাভ করার পর তিনি অবশেষে রোমে গিয়ে ডাক্তারি করেন। সেখানে তাঁর প্রচুর পসার হয়। তিনিই পরে আরবী ও মধ্যযুগীয় চিকিৎসাশাস্ত্র এবং শারীরস্থানবিদ্যার (anatomy) অবিসংবাদী উৎস হয়ে দাঁড়ান। স্বক্ষেত্রে তাঁর মর্যাদা এবং কর্তৃত্ব অ্যারিস্টটলের সঙ্গেই তুলনীয় হয়ে ওঠে। পরবর্তী কালের ডাক্তাররা গ্যালেন্-এর জ্ঞানের পরিধি এবং পরীক্ষা-পটুতার পরিচয় পেয়ে এতই অভিভূত হয়ে পড়তেন যে প্রয়োজনে গ্যালেন্-এর বিরুদ্ধে তাঁদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণকে তুলে ধরতে ভরসা পেতেন না। বস্তুত গ্যালেনীয় চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে দুটি ধারার সুপটু সংমিশ্রণ ঘটেছিল: একদিকে ত্রি-আত্মা তত্ত্বের

মতো প্রাচীনতর নানারকম দর্শন, অপরদিকে শারীরস্থান বিষয়ে তন্নিষ্ঠ কিন্তু প্রায়শই বিভ্রান্তিজনক পর্যবেক্ষণ। সে পর্যবেক্ষণ বিভ্রান্তিজনক ছিল প্রধানত এইজন্যে যে তিনি কেবল জন্তুজানোয়ারদের দেহব্যবচ্ছেদের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। গ্যালেনীয় শারীরতত্ত্ব অনুসারে শরীরের ধমনী আর স্নায়ুর মধ্যে বিভিন্ন আত্মার এবং রক্তের জোয়ার-ভাঁটা খেলে; হৃৎপিণ্ড হলো তাপের উৎস আর সে তাপকে শীতল করে ফুসফুস। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় এইসব কথার প্রচলন আজও আছে। জ্যোতিষ্কলোক সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের মহাবিশ্বতত্ত্ব যেমন এক হাজার বছর ধরে মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, গ্যালেনের এই শারীরতত্ত্বও তেমনি মানুষের নিজস্ব ক্ষুদ্র দেহজগৎ সম্বন্ধে—'অণুবিশ্ব' সম্বন্ধে—বিশ্বাসের ভিত্তি হয়ে উঠেছিল। গ্যালেনের তত্ত্ব অবশেষে পরাভূত হয় রেনেসাঁস যুগে। কেননা ততদিনে বিপুল পরিমাণ পাল্টা পর্যবেক্ষণেব এক তুলনীয় সম্ভার গড়ে উঠেছিল এবং তার পিছনে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এক বলবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মদত ছিল। বস্তুত, রেনেসাঁস যুগে গ্যালেনের মতবাদের যে একেবারে মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব হয়েছিল তার প্রমাণ এই যে তাঁর রচনার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় মাত্র 1952 সালে!

৪. ধ্রুপদী বিজ্ঞানের অবক্ষয় ও রোম

একদিকে নৈরাজ্যময়তা, অন্যদিকে পরাক্রান্ত রোমের শক্তির চাপে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই হেলেনীয় সাম্রাজ্যগুলো ভেঙে পড়ছিল। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে রোম যে এতটা ক্ষমতাবান হয়ে উঠল, তার মধ্যে কিন্তু রহস্যময় কিছুই নেই। কেননা ঐ কালে ইতালির অভ্যন্তরে একবার প্রাধান্য বিস্তার করতে পারলে যেকোনো স্থানীয় শহরের পক্ষেই একদিকে গ্রীক বা ফিনিশীয় নগর-রাষ্ট্রসমূহের ওপর, অপরদিকে এশিয়ার অন্তর্গত হেলেনীয় সাম্রাজ্যসমূহের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভব ছিল। বহু শতকের অপচয়ী শোষণ এইসব নগর-রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে জীর্ণ করে দিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকেও ইতালি ছিল এক কৃষিনির্ভর দেশ; তার জলবায়ু অতি চমৎকার, এবং তার কাষ্ঠসম্পদ ছিল সুপ্রচুর। তখন সেদেশ বিস্তার লাভ করার জন্য উন্মুখ, তার জনসংখ্যা বর্ধমান এবং জনগণ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। প্রথম দিকে ইতালি খুব ধীরে বিকাশ লাভ করেছিল বলে প্রাচীনতর সভ্যতাগুলোর তুলনায় সেখানকার সমাজ-সংগঠন প্রাচীন জ্ঞাতিসমাজের সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। রোমান রিপাব্‌লিক জানত, যুদ্ধ হলে দেশের মানুষ একজোট হয়ে তাকে সমর্থন করবে; কিন্তু অন্যান্য নগর-রাষ্ট্র সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শত্রু-রাষ্ট্রসমূহের প্রকৌশল বারংবার রপ্ত করে নিয়ে রোমান সৈন্যবাহিনী অস্ত্রসজ্জা শিখেছিল; যুদ্ধে পরাজিত হলেও রোম কখনো অধিকৃত হয়নি। তাকে গুরুতর বিপদে ফেলবার মতো একমাত্র প্রতিপক্ষ ছিল কার্থেজের বণিক-রিপাব্‌লিক। কিন্তু সম্পদের দিক থেকে সমকক্ষ হলেও, জনশক্তির দিক থেকে কার্থেজ রোমের সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম ছিল না।

যে ধরনের শ্রেণীসংগ্রামে গ্রীক শহরগুলো মথিত হয়েছিল, মূলত সেই ধরনেরই শ্রেণীসংগ্রাম রোমের অভ্যন্তরেও সংঘটিত হয়েছিল; তবে রোমে তার চেহারাটা ছিল আরো নগ্ন। অভিজাত প্যাট্রিশিয়ান আর সাধারণ প্লীবিয়ানদের মধ্যে ক্ষমতা অধিকারের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, যা তুঙ্গে ওঠে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে। ঐ সময় প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। তার পরিণামে প্রথমে সামরিক একনায়কত্ব এবং পরে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয়। সাম্রাজ্য স্থাপনার মধ্যে দিয়ে ধনীরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লুণ্ঠিত সম্পদের কিছু খুদকুঁড়ো ছুঁড়ে দিয়ে দরিদ্রদের মুখ বন্ধ করার একটা রাস্তা পেয়ে গেল। মুখ বন্ধ করার আরেকটা পথ ছিল

রোমের বাইরের প্রাদেশিক লোকেদের রোমক নাগরিকের মর্যাদা দান। প্রথমে কেবল ইতালির অন্তর্গত প্রদেশসমূহে, পরে অন্যান্য অঞ্চলভুক্ত প্রদেশেও এই প্রক্রিয়া চালু হয়। এইভাবে, গোড়াতে যা ছিল এক নগর-রাষ্ট্র, তা এক ভৌম সাম্রাজ্যে পরিণত হলো। দাস-মালিক এবং সমৃদ্ধিশালী ধনিকরা ছিল সেই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। একে একে পূর্ব ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো সবই রোমের কুক্ষিগত হলো। তারই পাশাপাশি গল, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার মতো অনুন্নত বর্বর এলাকার মধ্যেও অনুপ্রবেশের পথ সুগম হলো। সব মিলিয়ে গড়ে উঠল এক সুবিশাল সাম্রাজ্য, সমগ্র ভূমধ্যসাগর অঞ্চল যার অধীন। পুরোনো হেলেনীয় রাজত্বগুলোতে অবশ্য রোমের অধিকার নিরঙ্কুশ হলো না, সেখানে সদ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত পারস্যদেশের সঙ্গে তাকে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতে হলো।

রোম সাম্রাজ্যের বন্ধনশক্তি ছিল তার সৈন্যবাহিনী। সৈন্যবাহিনীই সাম্রাজ্য জয় করেছিল, সৈন্যবাহিনীই বর্বরদের একের পর এক আক্রমণ প্রতিহত করে। সম্রাট অগাস্টাস্-এর শাসনকালের পর থেকে অবশ্য সে কাজে সৈন্যবাহিনীর পটুতা উত্তরোত্তর কমতে থাকে। রোমক সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি রূপে রোমসম্রাট যে পরিমাণ রাজস্ব ধার্য ও আদায় করতে সমর্থ হতেন তা সৈন্যদের বিদ্রোহ করার পথ থেকে, অর্থাৎ অন্য একজন সম্রাটকে সিংহাসনে বসানোর পথ থেকে, নিবৃত্ত করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কার্যক্ষেত্রে রোম সাম্রাজ্য ছিল বহু নগরের এক শিথিলবদ্ধ সংঘ। সেই সংঘভুক্ত নগরগুলোর প্রশাসনভার নিজেদের ওপরেই থাকত। রোম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় থাকার ফলে পারস্পরিক বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে তাদের সকলেরই লাভ হতো। গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে উর্বরা জমি চাষ করত ধনী নাগরিকদের খামার-প্রাসাদ ('villa') থেকে প্রেরিত ক্রীতদাস-দল। যেসব অঞ্চলের জমি অত ভালো নয় সেগুলো চাষের ভার ছেড়ে দেওয়া হতো স্থানীয় গ্রামসংগঠনের (পেজাই—*pagi*) ওপর। এর সদস্যদের বলা হতো পেগ্যান *(pagan)*। এই 'পেগ্যান'রা মোটের ওপর নিজস্ব কৌম রীতিনীতিই মেনে চলত। পরে মধ্যযুগে এরাই 'চাষী' (peasant) নামে পরিচিত হয়। ফরাসি ভাষায় 'পায়ি' *(pays)* কথাটির অর্থ হলো 'দেশ'; শব্দটি এই উৎস থেকেই আহৃত। খারাপ জমি চষবার ভার এইসব স্থানীয় পেগ্যান ছাড়া অন্য যাদের হাতে দেওয়া হতো তারা হলো নতুন বহিরাগত বসতিস্থাপনকারী *(coloni)* এবং খামার-প্রাসাদ বা 'ভিলা' থেকে আগত মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। এই শেষোক্তরা ক্রমে ভূমিদাসে পরিণত হয়। এদের বলা হতো *villani*, যার থেকে 'villeins' মারফত ইংরেজি 'villains'(=বদমাইশরা) শব্দটির উদ্ভব ঘটে।

অ্যালেকজান্ডারের সাম্রাজ্যবিস্তারের তুলনায় রোমান সাম্রাজ্যবিস্তারের সাংস্কৃতিক ফলাফল একেবারেই অন্যরকমের হয়েছিল। রোমানরা যে সময় প্রভাব বিস্তার করে তার আগেই গ্রীক সভ্যতা তার প্রণোদনার তুঙ্গ পার হয়ে এসেছে। বিজ্ঞানে ও শিল্পকলায় ইতিমধ্যেই অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। আরেক দিক থেকেও রোমানদের সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয় বড়ো বেশি দেরিতে। রোমানদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি ধনী প্যাট্রিশিয়ান ও তাদের অনুগত সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সে ব্যবস্থা এতই অনমনীয় ছিল যে বিজ্ঞানকে কার্যকররূপে ব্যবহার করার সাধ্য তার ছিল না। সাম্রাজ্যের গঠনপর্বে রোমে উচ্চশ্রেণীর নাগরিক ছাড়া আর কারোরই কোনো গুরুত্ব ছিল না। এই উচ্চশ্রেণী গ্রীক সভ্যতার ধড়াচূড়া অঙ্গে ধারণ করল ঠিকই, কিন্তু ঘৃণাভরে। তারা নিজেরা, কিংবা সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের প্রাদেশিকেরা কেউই গ্রীক সভ্যতার ভাণ্ডারে মূল্যবান কিছুই যোগ করতে পারল না। বড়ো জোর তারা গ্রীক দর্শনের সাধারণ ভাবধারার কিছু কিছু অংশ বেছে নিয়ে আপন শ্রেণীশাসনের সমর্থনে কাজে লাগাল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে 'অগ্রজ' কাটো (234 খ্রি· পূ·) ছিলেন এক গ্রাম্য কট্টরপন্থী মানুষ। গ্রীক

বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর ঘৃণা তিনি চাঁছাছোলা ভাষাতেই ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর মতে, গ্রীক ডাক্তাররা রোমানদেব দেহে বিষ প্রয়োগ কবার জন্যে এবং গ্রীক দার্শনিকরা রোমানদের লাম্পট্যে দীক্ষিত করবার জন্যই আবির্ভূত হয়েছিলেন। একশো বছর পরে উদীয়মান আইনজীবী সিসেরো (106 খ্রি· পূ·) অবশ্য অপেক্ষাকৃত অগ্রসর মনোভাবের পরিচয় দেন। তিনি প্লেটো আব অ্যারিস্টটলেব দর্শনের মধ্যে প্রশংসনীয় অনেক কিছুই খুঁজে পান, কেননা সে দর্শন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের শাসনকে ন্যায্য মনে করে। কিন্তু তিনি এপিকিউরাসের মতবাদের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন। তাঁব স্বদেশবাসী লুক্রেশিয়াস (?99-55 খ্রি· পূ·) ঠিক সেই সময়েই রোমকে এপিকিউরাসেব দর্শনের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছিলেন। সিসেরোর মনে হয়েছিল, এর ফলে মানুষের ঈশ্ববিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে, আব তা যদি যায় তাহলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার প্রতিও তাদের বিশ্বাস টলে যাবে। তবে, রোম সাম্রাজ্য যখন মধ্যগগনে তখন যে দর্শন সবচেযে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তা হলো স্টোয়িকবাদ। বর্তমান যুগেব অস্তিবাদের (existentialism) মতো সে যুগের স্টোযিকবাদও গোড়াতে কিছুটা প্রতিরোধের দর্শন হিসেবে আত্মপ্রকাশ কবেছিল। কিন্তু স্টোযিকবাদে সততা বা সদগুণকে গুরুত্ব দেওয়া হতো নিছক এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ হিসেবেই; ফলে এই চিন্তাধারার প্রসাদে রোমান প্রশাসকদেব মধ্যে, এমনকি মার্কাস অরেলিয়াসের মতো দু-একজন সম্রাটের মধ্যেও জনকল্যাণে আত্মোৎসর্গেব তুষ্টি জেগে উঠেছিল। তাঁরা মনে কবতেন, কোনো প্রাপ্তির আশা ছাড়াই তাঁরা 'আত্মোৎসর্গ' করছেন। রোমান স্টোয়িকদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সেই সেনেকা (?4 খ্রি· পূ·-65 খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন শিল্পোৎসাহী সম্রাট নীরো-র শিক্ষক। ঐহিক নিরাসক্তির স্টোয়িক দর্শনের সঙ্গে সুবিশাল সম্পত্তি গড়ে তোলার কোনো বিরোধ দেখতে পাননি সেনেকা! বলা বাহুল্য তাঁর সে সম্পদ গড়ে উঠেছিল এক 'পবিত্র নিধি' হিসেবে।

আদি রোমান সম্রাটদের শাসনেব সময় থেকেই বিজ্ঞানচর্চার অধঃপতন শুরু হয়। সচরাচর এর জন্যে রোমানদের নেহাৎই কেজো দৃষ্টিভঙ্গিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু এই অধঃপতনেব কারণ অত সরল নয় বলেই আমার মনে হয়। আসলে ধ্রুপদী সমাজব্যবস্থার মধ্যেই এক সার্বিক সংকট দেখা দিয়েছিল। অ্যালেকজান্দ্রিয়াতেই হোক আর রোমেই হোক, মুষ্টিমেয় দুচারজন ধনী লোকেব হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়াতেই এই সংকট দেখা দেয়। বিপুল সংখ্যক দাস-জনসমষ্টিকে যেভাবে পশুর স্তরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটাও এই অধঃপতনের আরেক কারণ। শুধু দাস-জনসমষ্টি কেন, আজকালকার ভাষায় যাদের 'দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ' বলা হয় তাদের সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। ব্যাপক জনসমষ্টি এইভাবে হৃতদরিদ্র হয়ে পডাব দরুন পণ্যসামগ্রীর চাহিদা কমে আসে এবং তার পরিণামে বণিক ও কারিগরদের অবস্থাও খারাপ হযে পড়ে। এ হেন এক পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানের বিকাশের কোনো প্রণোদনা থাকা সম্ভব নয়। বিকাশ তো দূরের কথা, যেটুকু বিজ্ঞানচর্চার অস্তিত্ব ইতিমধ্যেই ছিল, কিছুদিন গড়িয়ে গড়িয়ে চলার পর তাও দ্রুত তার মৌলিক প্রকৃতি-অনুসন্ধানী চরিত্র হারিয়ে ফেলে, নতুন কিছু করার প্রেরণাও লুপ্ত হয়ে যায়।

পূর্ত কর্ম ও বাণিজ্য

কিন্তু যে জ্ঞান ইতিমধ্যেই সঞ্চিত হয়েছিল, রোমক যুগে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে অনেক ব্যাপক হারে এবং আগের তুলনায় ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে তার প্রয়োগ ঘটে। বিশাল বিশাল রাস্তা, বড়ো বড়ো পোতাশ্রয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলপ্রণালী, সুপরিসর স্নানাগার, মস্ত মস্ত থিয়েটার, এসব তো গড়ে উঠলই, উপরন্তু বাণিজ্য অবাধে এবং উচ্ছ্বসিতভাবে বিকাশ লাভ করল। রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত যাবতীয় অঞ্চলের পণ্যসামগ্রীর অবাধ বিনিময় ঘটতে লাগল। এর ফলে

প্রায় আধুনিক প্রথায় কারখানায় নির্দিষ্ট মান অনুসরণে কোনো কোনো সামগ্রীব (যথা মৃৎসামগ্রীর) উৎপাদন চালু হয়ে যায়। কিন্তু দাস-শ্রম যেহেতু নিতান্তই সুলভ ছিল, এবং পণ্যেব বাজার যেহেতু তখনো অবস্থাপন্ন শ্রেণীব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাই অগ্রণী পণ্য-উৎপাদকবা উৎপাদনে যন্ত্রের ব্যবহাবে উৎসাহী হলেন না। ফলে শিল্পবিপ্লব ঘটাব মতো কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলো না।

স্থাপত্য

রোমান করণকৌশল বিশিষ্ট অবদান রাখে স্থাপত্যে ও কৃষিতে। জলপ্রণালী, বৃত্তাকাব প্রেক্ষাগৃহ এবং বিশালাকাব পৌর ভবন নির্মাণের জন্য খিলান ও অর্ধবৃত্তাকাব ছাদ তৈরি করবতে হতো। এর জন্যে প্রচুর পবিমাণ পোড়া ইট লাগত, এবং চুণ আর আগ্নেয়গিরি-ভস্মের মিশ্রণে প্রস্তুত এক ধরনের কংক্রীট ব্যবহার করা হতো। তবে রোমান স্থাপত্যকর্মের বিপুলত্ব যতই চমকপ্রদ হোক, পরবর্তীকালের গথিক স্থাপত্যকর্মে খিলান আর অর্ধবৃত্তাকার ছাদকে নানাভাবে ব্যবহাব কববাব ব্যাপারে যে পটুত্ব লক্ষিত হয, তার পবিচয় রোমক স্থাপত্যে পাওয়া যায় না। রোম সাম্রাজ্যের একেবারে শেষ পর্বে কনস্ট্যান্টিনোপলে অবশ্য পারসিক ছাঁদে ত্রিকোণ হালকা 'পেনডেনটিভ'-এর ওপরে বৃত্তাকার ছাদ বা 'ডোম' গাঁথবাব প্রক্রিয়াটির উদ্ভব ঘটে। এটি ছিল প্রকৃত উদ্ভাবনশীলতার পরিচায়ক।

কৃষি

প্রাচীনকালে জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান সঞ্চিত হযেছিল, শুধু তার ভিত্তিতে কৃষিকার্যকে বিজ্ঞানে পরিণত করা দুঃসাধ্য ছিল। বস্তুতপক্ষে, আজকেব দিনেও কৃষিকার্যকে সঠিক অর্থে বিজ্ঞান বলা চলে না। কৃষিকার্য সম্বন্ধে রোমানদের যেসব রচনা পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো কবি ভার্জিল ((70-19 খ্রি· পূ·) রচিত *Georgics*. এসব রচনা স্বভাবতই কৃষকদের চিরাচবিত কর্মধারার বিবরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া দাসশ্রমভিত্তিক খামার-প্রশাসনের দুঃসহতার নানা ইতিবৃত্তও এগুলোর মধ্যে লভ্য। এগুলো পড়লে এটুকু অবশ্য জানা যায় যে আজকের অধিকাংশ কৃষিকৌশলই—বিশেষ করে ফলচাষ ও সবজিচাষেব কৌশল— সেকালে জানা ছিল এবং ব্যাপক মাত্রায় সেসবের প্রয়োগ হতো। এ-ও জানা যায় যে ঘোড়া জোতবার উপযুক্ত সরঞ্জামের এবং উপযুক্ত লাঙলের অভাবে চাষেব কাজ কেবল বিশেষ কয়েক ধরনের জমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

প্রশাসন ও আইন

যেকোনো ইতিহাস-বই খুললেই দেখা যাবে আইনব্যবস্থাব প্রবর্তনকেই রোমানদেব বিবাট সদর্থক কীর্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু রোমক আইনব্যবস্থাকে মানুষের সঙ্গে মানুষের ন্যায়সম্মত আচরণের বনেদ রচনার এক বৈজ্ঞানিক প্রয়াস হিসেবে আদৌ চিহ্নিত করা চলেনা। কারণ, খুব পরিষ্কারভাবেই তার উদ্দেশ্য ছিল, যেসব সৌভাগ্যবানেরা সম্পত্তি আহবণে সফল হয়েছে তাদের অধিকার সংরক্ষণ। ভিকো প্রথম দেখান যে রোমক আইনের মধ্যে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তিনটি প্রাচীন পুরাবশেষের (relics) স্তর রয়েছে। প্রথমটি হলো, কৌম *(tribal)* রীতিনীতি—যা আদি মাতৃতান্ত্রিক পর্ব থেকে বিবর্তিত হয়ে এক কঠোর পিতৃতান্ত্রিক রূপ ধাবণ করে। অস্থাবর 'গোধনে'র *(pecunia)* ওপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে এই বিবর্তন ঘটে। এই হলো রোমানদের বহুখ্যাত *পরিবার* প্রথার ভিত্তি, যাতে গৃহকর্তা কড়া হাতে তার স্ত্রী, সন্তানাদি এবং ক্রীতদাসেদের *(famuli)* শাসন করে। রোমক আইনের দ্বিতীয় স্তরটির মধ্যে নাগরিক ও বাণিজ্যিক আইনের চিহ্ন লক্ষণীয়। রোমক রিপাবলিকের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন

ধরে যেসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চলেছিল তারই চিহ্ন রয়ে গেছে এসব আইনের মধ্যে। সেখানে টাকাপয়সা এবং ঋণের টাকা আদায়ের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উল্লিখিত তিনটি স্তরের মধ্যে তৃতীয়টি গড়ে ওঠে সাম্রাজ্যের প্রশাসন পরিচালনার মধ্যে থেকে—যাতে 'প্রিন্স'দের খাসক্ষমতাকে *(pierogative)* স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই তিনটি স্তরের সংমিশ্রণে রোমক আইনব্যবস্থা যে পরিণত রূপ লাভ করে তার মধ্যে কঠোর স্টোয়িক দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। চীনের কনফুশীয় মতবাদের মতোই ঐ দর্শন রোমক কর্মকর্তাদের নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করেছিল। ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের শাসনকালে যখন রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে তখনো এই প্রভাব অটুট ছিল। রোমক আইন অধ্যয়ন করলে সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়, একথা ঠিক; কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার একমাত্র অবদান হলো সর্বজনীন *স্বভাবসম্মত আইনের* ধারণার প্রবর্তন। পরবর্তী সামন্ততান্ত্রিক যুগে অর্থনীতির চরিত্র এতই বদলে যায় যে রোমক আইন সেখানে মূলত অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ে। আরো পরে রেনেসাঁস যুগে তার পুনরুজ্জীবন ঘটে পুঁজিতন্ত্রের মূল সংহিতা রূপে। রোম 'সাম্রাজ্যে'র মহিমা-ছটা সে পুনরুজ্জীবনে সহায়ক হয়।

অবক্ষয় ও পতন

রোম সাম্রাজ্যের উত্তরার্ধে হেড্রিয়ানের (117-138 খ্রিস্টাব্দ) সময় থেকেই রোম সাম্রাজ্যের সমগ্র অর্থনীতিটা ধসে পড়তে থাকে। যে সৈন্যবাহিনীর কল্যাণে ক্রীতদাস ও অন্যান্য ধনসম্পদ লুণ্ঠনের মধ্যে দিয়ে রোম সাম্রাজ্য অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হয়ে উঠেছিল, সেই সৈন্যবাহিনীই ক্রমশ বোঝা উঠতে লাগল—এমন বোঝা যা আবার অতিশয় প্রয়োজনীয়ও বটে। কেননা তখন নতুন নতুন অঞ্চল আর অধিকার করা হচ্ছিল না; বরং রোম সাম্রাজ্যের আত্মরক্ষার কাজটিই উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে পড়ছিল। নানারকম সংস্কার সাধনের প্রয়াস অর্থনীতির দুর্দশাকে পরিশেষে আরো বাড়িয়েই তোলে। মুদ্রাস্ফীতির দরুন মুদ্রার মাধ্যমে পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের বদলে সরাসরি বস্তুবিনিময়ের প্রথা চালু হয়ে যায়। মূলত একেকটি অঞ্চলে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত সামগ্রীর বিনিময় সে প্রথার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। করের বোঝা থেকে রেহাই পাবার জন্য ধনীরা শহর ছেড়ে নিজ নিজ খামার-প্রাসাদে গিয়ে আশ্রয় নিত। সেইসব খামার-প্রাসাদই ক্রমে স্থানীয় উৎপাদনের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পুরোনো শহরগুলো আর অর্থনীতির কেন্দ্র রইল না এবং বাণিজ্য উত্তরোত্তর বিলাসসামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। এসবই আসলে প্রাচীন যুগের শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার গভীরে নিহিত এক কঠিন রোগের অন্তিম উপসর্গ মাত্র। সে ব্যবস্থার সামগ্রিক পতন ছাড়া শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো রাস্তাই খোলা ছিল না।

অর্থনীতির ও মননশীলতার অবক্ষয়

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী, এমনকি হয়তো তারও আগে থেকে ধ্রুপদী সভ্যতার অন্তিম পতনের নানা নিগূঢ় লক্ষণ পরিস্ফুট হচ্ছিল। বিজ্ঞানের দিক থেকে যেটা সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার তা এই যে এই পতনটা ঘটতে এতবেশি সময় লাগল। কারণ, পূর্বে বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে যে সম্পদ জমা হয়েছিল তার বেশির ভাগই এই সুদীর্ঘ পতনকালে নষ্ট হয়ে যায়। অর্জিত জ্ঞানকে যদি নতুনতর জ্ঞান অর্জনের কাজে ব্যবহার করা না হয় তা হলে সে জ্ঞান অবক্ষয়িত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। কিছুকাল বইগুলো তাকের ওপর পড়ে থেকে ধুলো খায়, কেননা সেগুলো কারো কোনোভাবে লাগে না, সেগুলো পড়বার ইচ্ছেও হয় না কারো। অচিরেই সেগুলো আর বোধগম্য থাকে না, অপঠিত অবস্থাতে তাদের শরীরে পচ ধরে; যেগুলো পড়ে থাকে সেগুলো

পুড়িয়ে স্নানাগারের জল গরম হয়, কিংবা হাজারো পথে তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। অ্যালেকজান্ড্রিয়ার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অতুলনীয় মহাগ্রন্থাগারটির অন্তিম দশা ঠিক তাই হয়েছিল।

অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ ও প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম

প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞানের এই ক্রমবিলুপ্তির ফলে মানুষের চিন্তা যে স্তব্ধ হয়ে গেল তা নয়; কিন্তু সে-চিন্তা পুনরায় অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ ও ধর্মের দিকে ধাবিত হলো। আবেগগত দিক থেকে মানুষ অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদের দিকে ছুটে গেল এই দুষ্ট পৃথিবী থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষায়। তার এক সুবিস্তৃত দার্শনিক মননগত বনেদ তৈরি হয়েই ছিল। গণতান্ত্রিক নগর-রাষ্ট্রের অবক্ষয়ের যুগে প্লেটোর ভাবধারা থেকে রসদ আহরণ ক'রে সে বনেদ তৈরি হয়েছিল। প্লেটো-পরবর্তী যুগে যেসব দার্শনিক ঘরানা গড়ে ওঠে, তারা—বিশেষত স্টোয়িকরা আর নব্য-প্লেটোপন্থীরা—প্লেটোর ভাববাদের গাণিতিক দিকটিকে বর্জন করে অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী দিকটিকে সুপুষ্ট করে তোলে। গাণিতিক দিকটি সংখ্যা-জাদুতত্ত্বে পর্যবসিত হয়, যার মধ্যে জাদুগুণসম্পন্ন সমচতুর্ভুজ আর অতীন্দ্রিয় গুণসম্পন্ন সংখ্যার ছড়াছড়ি দেখা যায়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই অতীন্দ্রিয় দার্শনিক রহস্যবাদ মুক্তির প্রতিশ্রুতি-দায়ক বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়। এইসব ধর্মের মধ্যে খ্রিস্টধর্মই সবচেয়ে সফল হয়। মননগত দিক থেকে এদের সকলের মধ্যেই একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়; সেটি হলো · *ইন্দ্রিয়*, এমনকি *যুক্তিবোধ* অপেক্ষা *অন্তঃপ্রেরণা* এবং *দিব্যজ্ঞানকেই সত্যের মহত্তর* উৎস বলে গণ্য করা। তার্তুলিয়ানের কথায় : 'ধর্ম অবিশ্বাস্য *বলেই* আমি ধর্মবিশ্বাসী।'

এইসব ধর্মের উদ্ভব থেকে বোঝা যায় ক্রীতদাসেদের, এমনকি সাধারণ অ-ক্রীতদাস নাগরিকদের অবস্থা কতটা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তারা অনুভব করত, যে-ব্যবস্থাটা তাদের দলেপিষে শেষ করে দিচ্ছে তার হাত থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। তাদের সামনে দুটি মাত্র বিকল্প খোলা ছিল : হয় বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের 'অ্যাপোক্যালিপ্‌স' অধ্যায়ের মতো প্রায় বিপ্লবাত্মক ধরনে ঐ দুর্বিষহ ব্যবস্থাটাকে ধিক্কার দিয়ে কর্তৃপক্ষীয় উপাসনা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগানো; নতুবা এই কলুষিত পৃথিবীর 'কলুষকল্মষ' থেকে দূরে মরুপ্রান্তরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। কেবল মূর্তিপূজা নয়, যা কিছু ঐ উচ্চশ্রেণী-শাসিত রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সে সবই ঘৃণ্য, কুৎসিত বলে প্রতিভাত হলো এই ধার্মিকদের কাছে। উচ্চশ্রেণীর বিলাসিতা, শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান সব কিছুই শুধু নরকের পথ সুগম করছে বলে মনে হলো তাঁদের। এই মানসিকতার বশবর্তী হয়েই অগাস্টিন এবং অ্যামব্রোস শয়তানি অপ-জ্ঞানের পথ পরিত্যাগ ক'রে সুপবিত্র হিংটিংছটের পথ বেছে নেন, এই মানসিকতারই বশবর্তী হয়ে এক সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে একদল ক্ষিপ্ত জনতা পাথর ছুঁড়ে মারে হাইপেশিয়া-কে, যিনি ছিলেন শেষ গ্রীক গণিতবিদদের অন্যতম। পশ্চিমে যখন ধ্রুপদী ভাবনাকে একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হলো, এবং পূর্বে যখন সে ভাবনাকে পোষ মানানো সম্ভব হলো, তখন, একমাত্র তখনই, চার্চ কিয়ৎপরিমাণে জাগতিক বিজ্ঞানচর্চার অনুমতি দিল—তাও খুবই সীমিত মাত্রায় এবং নিতান্ত অনিচ্ছাভরে। কী করে এই ঘটনাটা ঘটল তার ইতিবৃত্ত আমরা পাব পরের অধ্যায়ে, যখন ধ্রুপদী দুনিয়ার অবক্ষয়ের পরিণামে একে একে নতুন সভ্যতার উদয়ের কাহিনী বিবৃত হবে। সেই অধ্যায়েই খ্রিস্টধর্মেরও এক বিবরণ পাওয়া যাবে। খ্রিস্টধর্ম ধ্রুপদী সভ্যতার গর্ভ থেকেই জন্ম নেয় একথা ঠিকই। কিন্তু ধ্রুপদী সভ্যতার সমস্ত কিছুর প্রতি সাধারণ মানুষের সার্বিক বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই তা রূপ লাভ করে। তাই সঠিক বিচারে খ্রিস্টধর্মের স্থান সমাজবিকাশের পরবর্তী পর্বের অন্তর্গত। তবে ধ্রুপদী সংস্কৃতির প্রতি খ্রিস্টধর্মের যতই বিরোধিতা থাকুক, সে সংস্কৃতির পচন ও পতনের জন্য খ্রিস্টধর্মকে দোষী সাব্যস্ত করা অর্থহীন।

কেননা সে-বিরোধিতাকে রোগের কারণ না বলে বরং রোগের লক্ষণ বলাই সংগত। ধনিকশাসিত দাস-নির্ভর এক রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলেই ধ্রুপদী যুগের শেষদিকে মাথা চাড়া দেয় অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ, উদ্ভট বিশ্বাস, চিন্তাবিভ্রম এবং পচনশীলতা। অ্যারিস্টটলীয় অর্থে তার 'নীতিভ্রষ্টতা' বড়ো বেশি গভীরে চলে গিয়েছিল; কিংবা চৈনিক অর্থে তা স্বর্গের 'মহানির্দেশ' থেকে বড়ো বেশি দূরে সরে গিয়েছিল। পরবর্তী এক হাজার বছর ধরে কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল-এর শাসকেরা নামে রোমান হলেও, তাঁদের সে সাম্রাজ্য পূর্ববর্তী রোম সাম্রাজ্যের তুলনায় এক নতুন যুগেরই অন্তর্গত ছিল।

বর্বর সম্প্রদায়

ধ্রুপদী সভ্যতার পতনের অন্তিম পর্বটি রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম অঙ্গনে দুই ভিন্ন রূপ ধারণ করে। সাম্রাজ্যের পূর্ব অঙ্গনটি ছিল প্রাচীনতর এবং অপেক্ষাকৃত সভ্য; সেখানে হেলেনীয় প্রভাব ছিল অনেক বেশি। সেই পূর্ব অঙ্গন বর্বর হানাদারদের নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নিল। নাগরিক জীবন আদৌ স্তব্ধ হলো না সেখানে। নিরবচ্ছিন্নতার তেমন ব্যাঘাত না ঘটিয়েই সেখানেই নাগরিক শাসন ইসলামী খলিফাদের হাতে এবং বাইজান্টীয় সম্রাটদের হাতে চলে গেল (এই সম্রাটদের ওপর আবার রোমান অপেক্ষা গ্রীক প্রভাবই বেশি ছিল)। রাষ্ট্রগুলোর নবগঠিত কাঠামো আর আগের মতো রইল না ঠিকই, কিন্তু বাণিজ্য, সংস্কৃতি আর বিদ্যাচর্চার প্রবাহ বজায় রইল, এমনকি স্বল্পকালের জন্য হলেও তা উচ্ছ্বসিতভাবে বিকশিত হয়ে উঠল।

রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম অঙ্গনটি অপেক্ষাকৃত দেরিতে সাম্রাজ্যের অধীন হয়েছিল। সেখানে নাগরিক জীবন ছিল বাইরের এক আমদানি। সেখানকার গ্রামাঞ্চল তখনো প্রধানত পেগ্যানদের প্রভাবাধীন ছিল। এই পশ্চিম অঙ্গনে এক ধরনের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে, যার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে বর্বর হানাদারেরা। তারা নিজেরা কিন্তু এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটানোর জন্য দায়ী ছিল না। প্রথমত, এক অর্থে তাদের 'হানাদার' বলাটাই ভুল; কারণ ভাড়াটে সৈন্য, ক্রীতদাস বা ভূমিদাস রূপে তাদের তো নিয়েই আসা হয়েছিল। নিয়ে আসাটা জরুরি হয়ে পড়েছিল এইজন্যে যে রোমান জমিদার আর কর-সংগ্রাহকদের অমানুষিক শোষণের ফলে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শ্রমিকদের সংখ্যা প্রচণ্ডভাবে কমে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, উত্তর ও পশ্চিমের ঘন অরণ্যাবৃত এলাকায় রোমানরা খাদ্য উৎপাদনের ব্যবহারিক বিদ্যাটির বিশেষ উন্নতি ঘটাতে পারেনি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে রোমানদের বদলে যে বর্বরেরা ক্ষমতায় এল, তাদের কৃষি-প্রকৌশল অনেক উন্নত ছিল। পশ্চিম ইউরোপের উর্বরা কিন্তু কঠিন জমি চাষের ব্যাপারটাকে রোমানরা অবহেলা করেছিল; কিন্তু বর্বরেরা সে জমি চাষ করতে সফলকাম হয়। যেমন ধরা যাক, ব্রিটেনে বর্বর স্যাক্সনরা যে পরিমাণ জমি দখল ও চাষ করতে সক্ষম হলো, রোমান খামারগুলো তার এক ভগ্নাংশ মাত্র করতে সফল হয়েছিল।

সংগঠন ও প্রকৌশলের অবলুপ্তি

তবে পশ্চিম ইউরোপে বর্বর হানাদারির ফলে যেটা হারিয়ে গেল তা হচ্ছে জীবনধারার বাস্তব সংগঠনের ওপর নির্ভরশীল যাবতীয় অঙ্গ। সড়ক, জলপ্রণালী, সেচপ্রণালী—সবই আস্তে আস্তে ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেল। সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট মান অনুসারে নির্মিত পণ্যসামগ্রীর বণ্টনব্যবস্থাও নষ্ট হয়ে গেল; যেমন, গুটিকতক কেন্দ্রীয় কারখানায় প্রস্তুত মৃৎসামগ্রীর ব্যাপক বণ্টন আর সম্ভব হলো না। তবে গহনা ও অস্ত্রশস্ত্রের মতো বহনযোগ্য সামগ্রী নির্মাণের জন্য ধাতুর যেসব সূক্ষ্ম কারুকর্ম প্রয়োজন হতো সেগুলো টিকে গেল; শুধু টিকে গেল নয়, সেইসব সূক্ষ্ম কারুকৌশলের প্রভূত উন্নতি ঘটল। শহরে শিক্ষিত, ধনবান মানুষ এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল

লোকেদের নিয়ে গঠিত শ্রেণীটিরও বিলোপ ঘটে। ফলে দর্শনের ঐতিহ্য বলতে অতি সামান্যই টিকে রইল, বিজ্ঞানের তো প্রায় কিছুই রইল না। ধ্রুপদী যুগের অন্ত্যপর্বের মনীষীরা কেউ কেউ চার্চের আশ্রয় নেন (যেমন তুর্-এর গ্রেগরি কিংবা নোলা-র পাউলিনাস); কেউ কেউ বর্বর রাজাদের অধীনে কর্মকর্তার কাজ নেন (যেমন বয়টিআস); কেউ কেউ আবার নিজস্ব জমিদারিতে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন (যেমন আউসোনিয়াস [প্রায় 310-395 খ্রিস্টাব্দ])।

এতদসত্ত্বেও ইউরোপে সংস্কৃতির যেটুকু অংশ টিকে রইল, তা পরে ঐ সংস্কৃতির পুনর্জন্মলাভের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। রোম সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্যসূচক অধিকাংশ সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠে তবেই সে পুনর্জন্ম ঘটে। ভেনিস, সালের্নো, মধ্যযুগীয় আয়ার্ল্যান্ড প্রমুখ স্থান সজীব, মৌলিক মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির প্রবাহের উৎসমুখ হয়ে ওঠে। অবশেষে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইসলামী প্রাচ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত মূল স্রোতের সঙ্গে সেই প্রবাহের পুনর্মিলন ঘটে।

9. ধ্রুপদী দুনিয়ার উত্তরাধিকার

ইতিহাসকে বিজ্ঞান কীভাবে প্রভাবিত করেছে, বিশেষত ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান দুনিযার প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞান সমকালের এবং পরবর্তীকালের জীবনযাত্রাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, সেটাই এই বইয়ের প্রধান আলোচ্য। গ্রীক নগরজীবনে বিজ্ঞানের তাৎপর্য কী ছিল, সে জীবনে বিজ্ঞানের কার্যকর ভূমিকা কতটা ছিল, তার কিছুটা পরিচয় বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার মধ্যে থেকে পরিস্ফুট হওয়া উচিত। গ্রীকদের মনীষা আর শিল্পনৈপুণ্যের চোখ-ধাঁধানো দীপ্তি আমাদের ভুলিয়ে দেয় যে তাদের ঐ জ্ঞান ও কর্মকুশলতা জীবনের বাস্তব, বস্তুগঠিত দিক অপেক্ষা তার সুশোভন বহিরঙ্গকেই মূলত স্পর্শ করেছিল। গ্রীক নগব, মন্দিব, মূর্তি আব পুষ্পপাত্রেব সুষমা অতি অপরূপ। তাদের যুক্তিশাস্ত্র, তাদের গণিত, তাদের দর্শনের সূক্ষ্ম পবিশীলন অতীব মনোমুগ্ধকর। ফলে এই বাস্তব সত্যটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় যে রোম সাম্রাজ্যের পতনের কালে সভ্য দেশগুলোর অধিকাংশ মানুষেব জীবনযাত্রাব মান ছিল প্রায় দুহাজার বছর আগেরই মতো—অর্থাৎ যখন ব্রনজ যুগের সভ্যতা ভেঙে পড়ে সেই সময়েই মতো। কৃষিকার্য, খাদ্য, জামাকাপড, ঘরবাড়ি—এসবের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি। সেচকর্মে আর সড়ক-নির্মাণে এবং নতুন শৈলীতে বৃহদাকাব স্থাপত্যকর্ম ও নগব-পরিকল্পনায় যে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয, গ্রীক বিজ্ঞানের ফলিত প্রয়োগ কার্যত তাবই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এর মধ্যে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, প্রথমত, ধনবান নাগরিকবা ফলিত প্রয়োগ ঘটানোর উদ্দেশ্যে আদৌ বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটাননি; বস্তুত ঐ উদ্দেশ্যটিকে তাঁরা অন্তব থেকে ঘৃণা করতেন। তাছাড়া, দ্বিতীয়ত, শত সদিচ্ছা থাকলেও তাঁরা সে উদ্দেশ্য সাধনে সফল হতেন না; কাবণ, বিজ্ঞানের যে জ্ঞান তাঁরা আহরণ করেছিলেন তা ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে নিতান্তই অপ্রতুল ছিল। তদুপরি তা ছিল একান্তই গুণাত্মক। গ্রীক গণিতের সুষমা এবং নিটোল পূর্ণতা যতই মনোমুগ্ধকর হোক, পরীক্ষানির্ভর পদার্থবিদ্যা কিংবা নিখুঁতভাবে পরিমাপসাধ্য বলবিজ্ঞানের অভাবে কার্যক্ষেত্রে সে-গণিতের প্রয়োগের ক্ষেত্রটি ছিল অতিশয় সীমাবদ্ধ। গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞান যতই মনোহর হোক, ব্যবহারিক দিক থেকে তার অবদান সীমাবদ্ধ ছিল ভালো একটি ক্যালেন্ডার নির্মাণে এবং মাঝারি মানের কয়েকটি মানচিত্র অঙ্কনের মধ্যে। এছাড়া সে-জ্যোতির্বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হতো জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্যে। ফলিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রকৃত লালনক্ষেত্র হলো সমুদ্রে নৌচালনের কৌশল। কিন্তু একদিকে জাহাজ,

অন্যদিকে 'অকূল পাথারে' ভেসে পড়বার উপযুক্ত প্রণোদনা—এ দুটিরই অভাবে গ্রীকদের কাছে সে কৌশল কার্যত অজানাই ছিল।

ধ্রুপদী যুগের প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি কামার, পাচক, কৃষক আর বৈদ্যদের সাধারণ পর্যবেক্ষণসমূহের বর্ণনাত্মক পঞ্জির বেশি আর কিছু বলা যায় না—প্লিনি'র সুবিখ্যাত *প্রাকৃতিক ইতিহাস* যার নিদর্শন। বিজ্ঞান সেসব পর্যবেক্ষণের মধ্যে যেখানেই অনুপ্রবেশ করত, সেখানেই তা 'চতুর্ভূত' তত্ত্ব, কিংবা দেহের 'রসতত্ত্ব'-ভিত্তিক নানান অতিসরল বা অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী ধারণার আমদানি ঘটাত—যার ফলে প্রকৃতিকে অনুধাবনের প্রক্রিয়াটি বিভ্রান্ত ও বিকৃত হয়ে পড়ত। গ্রীকদের সমাজবিষয়ক বিজ্ঞানের ফলাফল ছিল আরো অনেক প্রত্যক্ষ। তবে সে-বিজ্ঞান বিশেষভাবেই নগর-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল বলে ঐ ব্যবস্থা যখন বদলে গেল তখন সে-বিজ্ঞান আর প্রযোজ্য রইল না। গ্রীক বিজ্ঞানের তুলনায় তাদের প্রকৌশলসমূহের পরিণতি অনেক ভালো হয়েছিল, প্রকৌশলের ক্ষতিও অনেক কম হয়েছিল। বস্তুত, সড়ক-নির্মাণ বা জলপ্রণালী-নির্মাণের মতো যেসব ক্ষেত্রে আনুপাতিক পরিমাপের (scale) ওপর নির্ভর করতে হতো, সেগুলো বাদ দিলে বাকি সব প্রকৌশল মূলত অপরিবর্তিত আকারেই হস্তান্তরিত হয়, যদিও—অন্তত পাশ্চাত্যে—সেসব প্রকৌশলের মহিমা খর্ব হয় এবং সেগুলো সরলতর রূপ ধারণ করে।

ধ্রুপদী জীবনচর্যা যে-সভ্যতার কাঠামোর মধ্যে জন্মলাভ করেছিল, সে কাঠামোয় তার যাবতীয় সম্ভাবনার সার্থক রূপায়ন সম্ভব হয়নি। আমরা দেখেছি, দাস-মালিক ধনিকতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা কীভাবে পদে পদে সেই সার্থক রূপায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রীক বিজ্ঞান তার প্রকৃত অবদান রাখতে সমর্থ হয় ভবিষ্যতে। তবে ধ্রুপদী জীবনচর্যার প্রাণসঞ্চারী উপাদানগুলিকে যে পরিমাণে সংরক্ষণ করা এবং ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, সেই অনুপাতেই ঐ অবদান রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে। সৌভাগ্যবশত, ধ্রুপদী জীবনচর্যা নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেও, তার মর্যাদা ছিল এমনই সুবিপুল যে তার কিছু কিছু কীর্তিকে কোনোমতেই ভুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না; এইগুলিই পরে নববিকাশের ভিত্তি হয়ে ওঠে।

হেলেনীয় এবং রোমান পর্বে অ্যাটল্যান্টিক থেকে আরম্ভ করে সুদূর হিন্দুকুশ পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সভ্যতার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। এইসব বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যের শক্তি এবং সংস্কৃতির মর্যাদা এমনই তুঙ্গে ওঠে যে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার বহু পরেও সে মর্যাদা বজায় থাকে। তারই ফলে হেলেনীয় সভ্যতার প্রাথমিক উদ্দীপনা অবসিত হয়ে যাওয়ার পরেও হেলেনীয় ভাবধারা, হেলেনীয় কর্মপন্থা, হেলেনীয় রীতি এবং হেলেনীয় প্রকৌশল ব্যাপকতর বিস্তার লাভ করে। প্রাচ্যে মধ্য এশিয়া, চীন ও ভারতের ওপর তার প্রভাব পড়ে; ঐসব অঞ্চলের নিজস্ব প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে তার মিশ্রণ ঘটে। আর পাশ্চাত্যে গ্রীকযুগের হারিয়ে-যাওয়া জ্ঞানের মর্যাদার শক্তিতে ইউরোপের বর্বরদের বশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

বস্তুত, এমন বলা যেতে পারে যে ধ্রুপদী যুগের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে সবচেয়ে মহার্ঘ যে জিনিসটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়, তা হলো প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞানের ধারণাটি। পরবর্তীযুগের বহু কিংবদন্তীতেই এই বিশ্বাসটি বারংবার ঘুরে ফিরে এসেছে যে প্রাচীন কালের মানুষ সুগভীর চর্চার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান আয়ত্ত করেছিল তার সাহায্যে তারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়েছিল। যেমন, অ্যারিস্টটলের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অ্যালেকজান্ডার নাকি ডুবোজাহাজ বানিয়েছিলেন, তিনি নাকি ঈগল-চালিত বায়ুরথে [পুষ্পক!] করে আকাশভ্রমণ করতেন! ধ্রুপদী সংস্কৃতির সত্যিকারের বড়ো কীর্তির মধ্যে বিজ্ঞান, বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান আর গণিত, সবচেয়ে স্থায়ী বলে প্রমাণিত হয়। কারণ জ্যোতিষী ভাগ্যগণনার উদ্দেশ্যে হলেও

গ্রহাদিব গতিপথ নিরূপণের কাজটি হাতেকলমে অনুশীলন করতে হতো। সেইভাবেই সে-জ্ঞানের সঞ্চারণ ঘটেছিল। গ্রীক বিজ্ঞানেব অন্যান্য শাখাব অধিকাংশই পুঁথির মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে থাকে; আরবরা এবং রেনেসাঁস যুগেব 'হিউম্যানিস্ট'রা সেসব জ্ঞানকে পুঁথিব অন্ধকাব থেকে নতুন করে আবিষ্কার করেন। গ্রীক বিজ্ঞানের কতখানি যে চিবতরে বিনষ্ট হয়ে গেছে তা আমবা কোনোদিনই জানতে পাববনা। তবে একথা তো প্রমাণিত যে যেটুকু টিকে গিয়েছিল তা যুগে যুগে মানুষেব চিন্তা ও কর্মকে পথ দেখিয়েছে। বাস্তবিক, গত পাঁচশো বছরে ধ্রুপদী সভ্যতার এতকিছু নতুন করে আবিষ্কৃত ও অনুকৃত হয়েছে যে আমাদেব এ যুগের সভ্যতাব সঙ্গে তা একেবারে ওতপ্রোত হয়ে গেছে। করণকৌশলে আর বিজ্ঞানে সেই স্বাঙ্গীকবণ সবচেয়ে সচেতনভাবে এবং সার্থকভাবে ঘটেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্মানুশাসনের যুগে বিজ্ঞান

ভূমিকা

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা যে কালপর্বটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি বিশাল। পঞ্চম শতাব্দীতে ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির ক্রমবিলুপ্তি থেকে শুরু করে একেবারে রেনেসাঁস যুগে এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এবং পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন জীবনচর্যার উদ্ভব—এই সুবিশাল পর্বটি এখানে আমাদের আলোচ্য। তবে এত দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও, বর্তমান গ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই দশটি শতক জুড়ে পরিব্যাপ্ত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি এক গতিশীল ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। এই সমগ্র পর্বটি জুড়ে আমরা যেসব প্রকৌশল, যেসব ধ্যানধারণার অবক্ষয়, সঞ্চারণ, পুনরুজ্জীবন এবং অভ্যন্তরীণ রূপান্তর লক্ষ্য করি, সেগুলি প্রধানত পূর্ববর্তী হেলেনীয় যুগ থেকে আহরিত। একথা কেবল ইউরোপ সম্পর্কেই নয়, এশিয়া সম্পর্কেও প্রযোজ্য; কারণ এশিয়া মহাদেশও তার প্রকৌশল ও বিজ্ঞানের জন্য ঐ একই উৎস থেকে প্রচুর রসদ সংগ্রহ করেছিল (এশিয়ায় চীন অবশ্য ছিল এর ব্যতিক্রম, সেখানে এক প্রাচীনতর ঐতিহ্য অনেকদিন ধরে প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল)। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের রচনায় হেলেনীয় বিশ্বছবির এক সুসংহত রূপ পরিস্ফুট হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে তবেই আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভবের ব্যাপারটা বোধগম্য হয়ে ওঠে। আমাদের আলোচ্য পর্বের প্রায় সমগ্র ক্ষেত্রটি জুড়ে—এমনকি তারও পরে, পঞ্চদশ শতাব্দীতেও—সেই বিশ্বছবিটাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার ক'রে নবোদ্ভূত এক অর্থনীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াটাই ছিল প্রধান কাজ। সেই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা ছিল মূলত সামন্ততান্ত্রিক। দাস-মালিকদের ধনিকতান্ত্রিক শাসন ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্বত্রই সেই নতুন অর্থনীতি রূপ লাভ করে। কিন্তু শুধু সেই অর্থনীতির সঙ্গে নয়, প্রথমে খ্রিস্টধর্মের এবং পরে ইসলামের অনুশাসন-ভিত্তিক মতবাদের সঙ্গে উক্ত বিশ্বছবিটিকে মননগত দিক থেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কাজটাও জরুরি ছিল। পুরোনো দুনিয়ার পতনের পরেও খ্রিস্টধর্মের অস্তিত্ব বজায় থাকে; আর ইসলাম তো বহুলাংশে সেই পতনপ্রক্রিয়ারই ফসল।

এই ব্যাপারটা যে আদৌ সম্ভব হয়েছিল, সম্পূর্ণ নতুন কোনো বিশ্বছবি অঙ্কনের প্রয়োজন যে অনুভূত হয়নি, তা থেকে বোঝা যায়, সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে আমূল নতুন কোনো মনন-প্রক্রিয়া গড়ে তোলার বিশেষ তাগিদ ছিলনা। প্রকৌশল এবং অর্থনীতির দিক থেকে সামন্ততন্ত্র পূর্বতন ব্যবস্থাটির তুলনায় অনেক অসংহত এবং অনুন্নত ছিল। তবে যে কাজটা তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল এবং যে কাজটা তা সত্যিই করেছিল, তা হলো উৎপাদনের নতুন নতুন প্রকৌশলের প্রবর্তন। সেসব প্রকৌশল ধ্রুপদী যুগে প্রবর্তিত নানাবিধ প্রকৌশলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোটো মাত্রায় প্রযুক্ত হলেও তাদের প্রচলন ঘটে অনেক ব্যাপক মাত্রায়, জনগণের মধ্যে সেসবের প্রসার ঘটে অনেক বেশি। আমরা পরে দেখাব যে মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার শেষ দিকের এইসব বৈশিষ্ট্য, এবং তারই সহযোগী নানান অর্থনৈতিক পরিবর্তন, ষোড়শ শতাব্দীতে আমূল রূপান্তর ঘটায়। সেই রূপান্তরের প্রক্রিয়াতেই একচোটে *আধুনিক বিজ্ঞান* আর *পুঁজিতন্ত্রের* জন্ম হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম কী করে হলো তা ব্যাখ্যা করতে গেলে পূর্ববর্তী পর্বের ঘটনাবলী জানা প্রয়োজন। যে সুদীর্ঘ, অন্ধকারাচ্ছন্ন 'সলতে-পাকানোর' প্রস্তুতিপর্বের মধ্যে দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে; ধ্রুপদী এবং প্রাক-ধ্রুপদী সভ্যতার কাছে, ইসলামী, পারসিক, ভারতীয় এবং চৈনিক সভ্যতার কাছে তার ঋণ কতটুকু; এসব অন্তত কিছু পরিমাণে জানা প্রয়োজন।

সবচেয়ে বেশি করে জানা প্রয়োজন, আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব আদৌ ঘটল কেন? কেন ইতালিতে ষোড়শ শতাব্দীতে নতুন বিজ্ঞান জন্ম নিল? কোন কারণে তা সতেরো শতকে ইংলন্ডে, ফ্রান্সে আর হল্যান্ডে অমন উচ্ছ্বসিতভাবে প্রস্ফুটিত হলো? কেন ভারতবর্ষ আর চীনের মতো দেশ ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে ঐসব দেশেরই মতো ক্রান্তিকারী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়েও শেষ চূড়ান্ত পদক্ষেপটি গ্রহণে ব্যর্থ হলো? এইসব প্রশ্ন, এবং তাদের কিছু কিছু উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াস বর্তমান অধ্যায়ের মূল উপজীব্য। কোন কোন কারক উপাদান থাকার ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের উদয় হয় তার একটি মূল্যায়ন পাওয়া যাবে এখানে। আমরা দেখাব, এইসব কারক উপাদানের মধ্যে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো অর্থনৈতিক প্রণোদনা। এই প্রণোদনা সক্রিয় হয়ে *ওঠে* বলেই মধ্যযুগের শেষদিকে প্রকৌশলে অগ্রগতি ঘটানোর, বিশেষ করে শ্রম বাঁচানোর, প্রচণ্ড তাগিদ লক্ষিত হয়। ঐ একই প্রণোদনার বলে *সামন্ততন্ত্রের* অর্থনৈতিক কাঠামো রূপান্তরিত হয়ে *পুঁজিতন্ত্রের* অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিণত হয়। বাস্তবিক, ইউরোপে পুঁজিতন্ত্র আর বিজ্ঞান একই পথরেখায়, একই দেশে ও কালে বিকাশ লাভ করে। আমরা দেখাব, গোড়ার দিকে বিজ্ঞান জায়মান পুঁজিতন্ত্রের পিছনে পিছনে হাঁটলেও পরে বিজ্ঞান নিজেই পুঁজিতন্ত্রের বিকাশধারাকে প্রভাবিত করে। মধ্যযুগের সমগ্র পর্ব জুড়ে কিন্তু বিজ্ঞানের সাধারণ চরিত্রটি প্রধানত বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতির দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছিল; ভিন্ন ধরনের এক অনাগত সামাজিক অবস্থার জন্য প্রতীক্ষার লক্ষণ তার অঙ্গে পরিস্ফুট হয়নি। বিদ্যমান সেই সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতি বিজ্ঞানকে খর্ব করেছিল।

এই অধ্যায়ে আমরা যেসব পর্ব নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে আছে: উত্তর ইউরোপ এবং ভূমধ্যসাগর এলাকায় সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্ভব, বিকাশ, পরিণতিলাভ এবং অবক্ষয়। এরই সঙ্গে আমরা এশীয় ভূখণ্ডের সমান্তরাল কিন্তু স্বতন্ত্র বিকাশের ধারাটি নিয়ে আলোচনা করব। বিশ্বসংস্কৃতির অঙ্গনে এশিয়ার অবদানই ছিল এই পর্বে মহত্তম। স্বভাবতই আমাদের আলোচনা দুটি নিতান্ত অসমান অংশে বিভক্ত থাকবে। প্রথম অংশে, অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায়ে, আমরা মোটামুটি 450-1150 খ্রিস্টাব্দ, অর্থাৎ প্রায় সাতশো বছর-ব্যাপী উত্তরণপর্বটি নিয়ে আলোচনা করব। ইউরোপে এই পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি ছিল ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান যুগের ফেলে-যাওয়া প্রকৌশল ও বিজ্ঞানের অবশিষ্টাংশের পুনরাবিষ্কার। সিরিয়া, মিশর, পারস্য, ভারতবর্ষ এবং চীনে এগুলির বিকাশ নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে। তার পিছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিঘাত হিসেবে কাজ করেছিল হেলেনীয় সংস্কৃতি। এই সমস্ত কিছুর সংশ্লেষণে এই পর্বের শেষের দিকে *ইসলামী* সংস্কৃতি রূপ ধারণ করে। অল্পকালের জন্যে হলেও তা অসাধারণ দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে *ওঠে*। একদিকে তা প্রাচীন সংস্কৃতির সঞ্চারকের ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে বিজ্ঞানে নতুন অগ্রগতির প্রেরণা যোগায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে, অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশটিতে, 1150 থেকে 1440 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বটি আলোচিত হয়েছে। এই পর্বটি কেবল ইউরোপেই এক স্বতন্ত্র রূপে প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞানের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি এই যে এই পর্বের শুরুতেই হেলেনীয় সংস্কৃতির ইসলামী ভাষ্য ইউরোপের প্রাণবন্ত সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। তারই সুবাদে মধ্যযুগীয় শাস্ত্রচর্চার আন্দোলন অল্পকালের জন্য হলেও উদ্ভাসিত হয়ে *ওঠে*। এই পর্বেই লক্ষ্য করা যায় যে *সামন্ততান্ত্রিক* ব্যবস্থাটি ক্রমশ নড়বড়ে হয়ে পড়ছে, এবং সেই পরিস্থিতিতে ধীর কিন্তু ক্রমবর্ধমান গতিতে প্রকৌশলের এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উন্নতি ঘটছে। এই যে উন্নতি ঘটতে শুরু করে তারই পরিণতিতে এবং তার অর্থনৈতিক ফলাফল স্বরূপ পরবর্তী সমাজব্যবস্থার, অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রের, উদ্ভবের পথ প্রশস্ত হয়। সেই সমাজব্যবস্থাতেই *আধুনিক* বিজ্ঞান জন্ম লাভ করে। সে বৃত্তান্ত নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

সামন্ততন্ত্রে উত্তরণের যুগে বিজ্ঞান

1. রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তীকালে সভ্যতার বিকাশ

ইস্কুল কলেজে আমরা সাধারণত যে শিক্ষা লাভ করি তাতে রোম সাম্রাজ্যের, বিশেষত তার পশ্চিম অঙ্গনের ইতিহাসের ওপর এত বেশি জোর দেওয়া হয় যে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মানো খুবই স্বাভাবিক যে তৃতীয় থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে সভ্যতার বুঝি এক সার্বিক বিপর্যয় ঘটেছিল। আসলে ঘটনাটা এই যে প্রাচীন দুনিয়ার যেসব অংশ সবচেয়ে পরে এবং কৃত্রিম পদ্ধতিতে সভ্য দুনিয়ার অঙ্গ হয়ে উঠেছিল (অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাইনল্যান্ড, স্পেন এবং ইতালি) সেখানে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সেখানে দাস-মালিক অভিজাত 'প্যাট্রিশিয়ান' এবং স্থানীয় শাসকদের দ্বারা গঠিত শ্রেণীর শাসনের বদলে ধীরে ধীরে অন্য এক শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। নতুন সেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাটির ভিত ছিল প্রশস্ততর কিন্তু অসংবদ্ধ। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বর্বরবাহিনীর হানাদারির ঘটনাগুলো সে-পরিবর্তনের কারণ নয়, বরং ফল।

এই একই কালে কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের বাকি অংশে অ্যালেকজান্ড্রিয়া, অ্যান্টিওক এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের মতো বড়ো বড়ো শহর অটুট থাকে। শুধু তাই নয়, সেসব স্থানে সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থাও বজায় থাকে, যদিও সে শাসনে মানুষের স্বাধীনতা উত্তরোত্তর খর্ব হতে থাকে। অ্যালেকজান্ডারের অভিযানের পর থেকে যেসব ভূভাগে হেলেনীয় সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে, অথচ যারা রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিলনা, সেইসব অঞ্চলেও (অর্থাৎ পারস্য, ভারতবর্ষ এবং মধ্য এশিয়ায়) সভ্যতার উচ্ছ্বসিত বিকাশ ঘটতে থাকে। অর্থনীতি, প্রকৌশল, শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানে ধ্রুপদী যুগের শেষদিককার জীবনচর্যায় যে অচলাবস্থা, যে সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে উঠেছিল তা এইসব দেশের সভ্যতার ওপর ছায়া বিস্তার করতে পারেনি। যে যুগটাকে আমরা 'তামস যুগ' বলি, পঞ্চম আর নবম শতাব্দীর অন্তর্বর্তী সেই পর্বেই পারস্যের সাসানিয়ান সাম্রাজ্য (226-637), ভারতবর্ষের গুপ্ত সাম্রাজ্য (320-480) ও চালুক্য সাম্রাজ্য (550-750) এবং মধ্য এশিয়ার অপেক্ষাকৃত কম-পরিজ্ঞাত খোরাসমিয়ান সাম্রাজ্য (400-600) সগৌরবে বিরাজ করত। তবু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে ঐ যুগের নাম 'তামস যুগ'! ভাবখানা এই যে নিতান্তই আংশিক অর্থে সভ্য পশ্চিম ইউরোপে ঐ পর্বে কী ঘটেছিল তা যেহেতু তমসাবৃত, সুতরাং গোটা পৃথিবীটাই যেন এক 'অদ্ভুত আঁধারে' নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। অথচ উল্লিখিত সভ্যতাগুলি ছাড়াও ঐ পর্বে ওয়েই (386-549) এবং তাং (618-906) রাজবংশের শাসনে চীন অর্থনীতিতে ও সংস্কৃতিতে অতুলনীয় কীর্তি অর্জন করেছিল।

গ্রীক এবং রোমান প্রভাবাধীন দেশগুলো তাদের প্রচলিত আদি ব্রনজ-যুগীয় জীবনধারার কাঠামো থেকে বহু দূরে সরে এসেছিল। কিন্তু ওপরে উল্লেখিত দেশগুলো তা করেনি। কাজেই টাকা-কেন্দ্রিক অর্থনীতির এবং দাসপ্রথার প্রবর্তনের ফলে ধ্রুপদী সভ্যতা-বলয়ের অন্তর্গত দেশসমূহে যে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘাত বেধেছিল, ঐসব দেশকে সেই বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতা ভোগ করতে হয়নি। ঐ সংঘাতই একদা ধ্রুপদী সভ্যতা-বলয়ের দেশগুলোকে গড়ে তুলেছিল, আবার ঐ সংঘাতই তাদের শেষ করে দেয়। ধ্রুপদী সভ্যতা-বলয়ের বহির্ভূত বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবশ্য ঐ একটি ছাড়া আর কোনো বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল না। পারস্য তখনো প্রাচীন কৌম *(tribal)* অভিজাততন্ত্রের প্রভাবাধীন; সেখানে পরম উৎসাহে সরল জরথুস্ত্রবাদী ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর চেষ্টা করছিল সংস্কারপন্থী রাজবংশ। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই অতীব জটিল ধর্মীয় মত ও জাতিভেদপ্রথার উদ্ভব ঘটে

গিয়েছিল; বৌদ্ধরা সেই জাতিভেদপ্রথাকে রোধ করতে ব্যর্থ হন। ওদিকে চীন তখন কনফুশিয়াস-প্রদর্শিত পথে এগিয়ে চলেছে; সেখানে উচ্চশিক্ষিত গ্রামীণ ভদ্রসমাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে উচ্চশিক্ষিত হলেও এই ভদ্রসমাজের জীবনধারায় আদিম জ্ঞাতিসমাজের বহু বৈশিষ্ট্যই অটুট ছিল; তার একটি নিদর্শন হলো পূর্বপুরুষ-উপাসনার রীতি।

এইসব দেশের জীবনধারা যার যার নিজস্ব পথ ধরে চললেও এই পর্বে তাদের মধ্যে যোগাযোগ আগের তুলনায় অনেক বেড়ে উঠেছিল—বিশেষত বাণিজ্যের মাধ্যমে। প্রধানত বিলাসসামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তখন পণ্যসামগ্রীর বাজার রীতিমতো বড়ো ছিল, যে কারণে উৎপাদনের প্রকৌশলে উন্নতি ঘটে—বিশেষত বয়নকৌশল, মৃৎকৌশল এবং ধাতুকর্মের। সেই যুগে প্রাচ্যে নানাবিধ প্রকৌশল বিকাশ লাভ করে—যথা তাঁত, সেচের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং বলবিজ্ঞানের ও নৌচালনের এমন অনেক মৌলিক উদ্ভাবন যার প্রবর্তন মধ্যযুগীয় ইউরোপের চেহারা বদলে দেয়। শিল্পকলার যে অসামান্য বিকাশ ঘটেছিল, তা তো আমাদের সংগ্রহশালাগুলোয় রক্ষিত ঐ পর্বের মহামূল্যবান শিল্পসামগ্রীসমূহের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। শিল্পকলার গ্রীক রীতি সুদূর ভারতবর্ষ পর্যন্ত, এমনকি আরো দূরে ছড়িয়ে পড়ে ঠিকই, কিন্তু গ্রীকদের শীতল আদর্শায়িত শিল্পআঙ্গিক এইসব দেশে দ্রুত রূপান্তর লাভ করে, তার মধ্যে এক নতুন ও ইন্দ্রিয়নন্দন জীবন সঞ্চারিত হয়।

বিজ্ঞানের বিকাশ ভারতবর্ষ আর চীনের বাইরে কতটা ঘটেছিল তা বিশেষ জানা যায়না। তবে পরে ইসলামী অনুপ্রেরণায় না হোক, ইসলামী আশ্রয়ে পারস্যে এবং মধ্য এশিয়ায় বিজ্ঞান যেভাবে অতি দ্রুত বিকশিত হয়ে ওঠে, তা থেকে এটুকু অনুমান করা সংগত যে ঐসব দেশেও বিজ্ঞানের চর্চা ভালোরকমই হতো। বিশেষ করে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে গ্রীক প্রভাব চোখে পড়ে। গ্রীক বিজ্ঞানের এইসব শাখা এই নতুন পরিবেশে যেভাবে বিকাশ লাভ করে তা গ্রীসের অভ্যন্তরে আর সম্ভব ছিলনা। সব মিলিয়ে এই সমস্ত ঘটনার সম্মিলিত পরিণামে পরে এক সর্বজনীন সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটে একথা ঠিকই; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে এগুলির নিজস্ব মূল্য তত বেশি নয়; বরং এগুলির সহযোগী মৌলিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহের গুরুত্ব সে তুলনায় অনেক বেশি।

রোম সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন সমগ্র মানুষের ইতিহাসে এক স্পষ্টচিহ্নিত যুগের অবসান সূচিত করে। রোম সাম্রাজ্য যখন ক্ষমতার শিখরে, তখন তা ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র। তার সামরিক ও নাগরিক সংগঠন, তার বাণিজ্য পরিসর ও মাত্রার দিক থেকে যে চরম সীমা স্পর্শ করে, বহু শতাব্দী ধরে মানবসমাজের পক্ষে তা অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর যেসব রাষ্ট্র সে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন পুরোনো এলাকায় ক্ষমতা অধিকার করে, তাদের কেউই অত দীর্ঘকাল ধরে অত বড়ো সংগঠন অত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বজায় রাখতে পারেনি। রোম সাম্রাজ্যের চৌহদ্দির বাইরে একমাত্র তুলনীয় সাম্রাজ্য ছিল চীন; কিন্তু চীনের রাষ্ট্রীয় সংগঠনের চরিত্র খুবই অন্যরকম ছিল। রোমের ধনিকশাসিত দাস-নির্ভর অর্থনীতি ভেঙে পড়ার প্রক্রিয়ায় প্রায় সর্বত্রই বিকেন্দ্রীভূত এক নতুন ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বীজ ছড়িয়ে পড়ে।

এর দুহাজার বছর আগে ব্রন্জ-যুগীয় সভ্যতার পতন ঘটেছিল। সেই পতনের পরিণামের সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরিণামের লক্ষণীয় কিছু সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্যটাই বেশি। উভয় ক্ষেত্রেই পতনের পর নিম্নতর মানের প্রকৌশল থেকে নতুন করে জীবন গড়ে নিতে হয়েছিল। কিন্তু রোম সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার পর অর্থনীতির যে পতন ঘটল তা আপেক্ষিক বিচারে অনেক গুরুতর—অন্তত ইউরোপে তো অবশ্যই তাই। তেমনি আবার, জ্ঞান

ও সংস্কৃতির অনেক কিছুই বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হলো—যেটা ব্রনজ যুগের সভ্যতার পতনের পর সম্ভব হয়নি। পরে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব। উভয় ক্ষেত্রেই বৃহদাকার কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভরশীল সমস্ত কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—যথা যোগাযোগ, দূর-পাল্লার বাণিজ্য, পূর্ত জলকর্ম। তবে ব্রনজ যুগের অবসানে বহুসংখ্যক বাণিজ্যনির্ভর এবং পরিশেষে গণতান্ত্রিক নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব লৌহযুগের সূচনা চিহ্নিত করেছিল। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর যা গড়ে উঠল তার সঙ্গে কিন্তু এর কোনো সাদৃশ্য নেই।

সামন্ততন্ত্রে উত্তরণ

রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব অঙ্গনে শহরগুলির অস্তিত্ব বজায় থাকলেও, নবগঠিত এই ব্যবস্থায় অর্থনীতি সর্বত্রই মূলত গ্রামভিত্তিক ছিল। অর্থনীতির ইউনিটটা ছিল জমিদারবাড়ি, খামার-প্রাসাদ বা সামন্ত-ভবন। সামন্ত জমিতে কাজ করত ভূমিদাসরা। ক্রীতদাসদের সঙ্গে এদের তফাৎ এই যে প্রচণ্ড পরিশ্রমের মূল্য হিসেবে ভূমিদাসেরা স্থায়ীভাবে জমির সঙ্গে যুক্ত থাকার অধিকারটুকু পেত। সাম্রাজ্যের পূর্ব অঙ্গনে অধিকাংশ জমিদারির মালিক ছিল পুরোনো ধনিকদের বংশধরেরা। আর জার্মান বা আরব-অধিকৃত এলাকায় বর্বর জাতিসমাজের সর্দাররা জমিদারির মালিক হয়ে বসে। গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতি পূর্ব পশ্চিম উভয় অঙ্গনেই মূলত সামন্ততান্ত্রিক ছিল। পূর্ব অঙ্গনে ভূমধ্যকারীরা গোড়ার দিকে শহরেই থাকত বেশি। পশ্চিম অঙ্গনে যোগাযোগব্যবস্থা খারাপ হওয়ার দরুন তারা নিজ নিজ জমিদারিতেই বাস করত।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষক, *coloni* (বহিরাগত চাষী), ভূমিদাস, 'রায়ত' প্রমুখের স্বত্ব থাকত জমি এবং চাষের যন্ত্রপাতির ওপর, কিন্তু তারা উৎপন্ন ফসলের বা শ্রমের ভাগ জমিদারকে দিতে বাধ্য থাকত—খাজনা, কর বা সামন্ততান্ত্রিক প্রভুসেবা মারফত। পশ্চিমাঙ্গনে জমি ব্যবহারের পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন আসে তার ফলে পুরোনো জীবনধারণ-অর্থনীতির (subsistence economy) প্রত্যাবর্তন ঘটে; তবে লৌহযুগের তুলনায় সে অর্থনীতির প্রকৌশল-মান ছিল উন্নত। পূর্ব অঙ্গনে অবশ্য উৎপাদনের উদ্বৃত্ত পরিমাণটি বরাবরই অনেক বেশি থাকায় তার সাহায্যে বাণিজ্য সচল থাকে। সামন্ততন্ত্রে এই উত্তরণ একচোটে ঘটেনি, বলাই বাহুল্য। এর জন্য কয়েকশো বছর সময় লাগে; সব জায়গায় সে উত্তরণের গতিও সমান ছিলনা। সামন্ততন্ত্রের বিকাশ পূর্ণমাত্রায় বিস্তৃত হবার আগেই তার কেন্দ্রে পচন ধরে। কেবল পুরোনো গ্রীক বা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এলাকাতেই সামন্ততন্ত্র সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইউরোপ এবং এশিয়ায় নতুন যেসব জমি চাষের আওতায় চলে আসে সেখানেও সামন্ততন্ত্রই প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রসার লাভ করে।

2. ধর্মানুশাসনের যুগ

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতিতে বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর প্রণোদনা একেবারেই স্তিমিত হয়ে আসে। মধ্যযুগের শেষের দিকে বাণিজ্য আর নৌচালন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠে নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি করার আগে পর্যন্ত সে প্রণোদনা আর বাড়েনি। ফলে মানুষের মননক্রিয়া এই পর্বে এক ভিন্ন পথে ধাবিত হলো। তা এমন এক জিনিসের সেবায় নিয়োজিত হলো যার উদ্ভব মানুষের সভ্যতার একেবারে নতুন এক বৈশিষ্ট্য—*প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মানুশাসন।*

রাজনীতিতে ও সমাজে এক প্রধান শক্তি হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আত্মপ্রকাশ খ্রিস্টীয় অব্দের প্রথম কয়েক শতাব্দীর ঘটনা। এ ঘটনা কেবল যে খ্রিস্টধর্মের ক্ষেত্রেই ঘটেছিল তা নয়,

এ ছিল এক বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া। অন্যান্য ব্যাপারে শত প্রভেদ থাকলেও এই ব্যাপারে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নানাবিধ অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তার থেকে বোঝা যায়, কতকগুলি অভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর অভিন্ন সম্ভাবনার মধ্যে থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উদয় হয়। তৃতীয় থেকে সপ্তম খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে; ওদিকে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মও শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। একথা ঠিকই যে ভারতে বৌদ্ধধর্ম এবং পারস্যে জরথুস্ট্র-ধর্ম প্রায় সাতশো বছর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; কিন্তু আলোচ্য পর্বেই ঐ দুই ধর্মের মতবাদ সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে এবং তাদের পুরোহিতবর্গ প্রতিষ্ঠানবদ্ধ হয়। এই পর্বেই হিন্দুধর্ম, যা কিনা যাবতীয় ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে বহুরূপ-সমন্বিত এবং সবচেয়ে অসংগঠিত, তা ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মকে বিদায় ক'রে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এই পর্বেই হিন্দুধর্ম আপন শাস্ত্রগ্রন্থগুলিকে সুনির্দিষ্ট সংহিতার রূপ দেয়।*

এইসব দেখেশুনে এই কথাই মনে হয় যে ইতিহাসে সেই প্রথম সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস-ও মতের ভিত্তিতে ধর্মকে সংগঠিত করে নেবার, এবং সেই সঙ্গে তা পালন করিয়ে নেবার উপযোগী পন্থা গড়ে নেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কী সেই উপযোগী পন্থা তার হদিশ মেলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিশেষ কয়েকটি লক্ষণের দিকে তাকালে। এগুলি হলো: মর্যাদার ক্রমে স্তরবিন্যস্ত যাজকতন্ত্র, অবশ্যপালনীয় একপ্রস্থ আচারবিধি, এবং ঐক্যবদ্ধ আহ্বানমঞ্চ হিসেবে ও বিশ্বাসের প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত এক *ধর্মমত।* সেই ধর্মমতের মধ্যে নিহিত থাকে বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে এক নির্দিষ্ট বিশ্বাস যা *শাস্ত্রগ্রন্থের* মধ্যে ব্যক্ত হয়। এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আরো কতকগুলো আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এগুলো অবশ্য অত সুনির্দিষ্ট নয়। যেমন, সাধক বা ভক্তদের বাহ্যরূপ—একক উপাসনায় রত ঋষি, ফকির, যোগী কিংবা মঠের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী, লামা বা দরবেশ। এঁরা কেউ কৃচ্ছ্রব্রত অবলম্বন করেন, কেউ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, কেউ ধর্মপ্রচার করেন, কেউ কেউ এমনকি কাজও করেন। এর মধ্যে অনেকগুলো বৃত্তিই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উদ্ভবের আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। বস্তুত আদিমতম স্তরে বাসরত অধিকাংশ জনসমাজের মধ্যে এখনো এসব বৃত্তির প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু অগ্রসর নগরজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব বৃত্তি এক নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠল। রোম সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের পর্বে উৎপীড়ক এবং পাপ-পঙ্কিল শহর থেকে পালিয়ে বাঁচবার যে প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠে, ঋষি ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে তার ধর্মীয় দিকটি পরিলক্ষিত হয়; আর এর জাগতিক দিকটা প্রকট হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যের কর-সংগ্রাহকদের হাত থেকে বাঁচবার তাড়নায়

* সুনির্দিষ্ট কোনো মতবাদ (creed) নেই হিন্দুধর্মের; বরং বলা যায়, নানাবিধ মতবাদ হিন্দুধর্মের অন্তর্গত। বিশ্বের অন্য যেকোনো ধর্মের তুলনায় এইখানে হিন্দুধর্ম অনন্য। নিখাদ বস্তুবাদী নিরীশ্বরবাদ থেকে আরম্ভ করে *একেবারে আদিম প্রাণসত্তাবাদ—সবই উদার হিন্দু বিশ্বাসে স্থান পায়। হিন্দুধর্মে কে কোন দেবতাকে পূজা করবে,* কোন আচার পালন করবে, সেটা উপাসকের নিজস্ব ব্যাপার। পক্ষান্তরে, হিন্দু উপাসক নিজে কিন্তু এক নিতান্ত সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। হিন্দু উপাসনা কেবল হিন্দুদের জন্যই সংরক্ষিত। নিজস্ব গণ্ডির মধ্যেও হিন্দুরা জাতপাত ও পরিবারের অজস্র বাধানিষেধে জর্জরিত। ভারতবর্ষের গত আটশো বছরের দুঃখজনক ইতিহাসের পরিণামে হিন্দুধর্ম মূলত এক ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধর্ম হিসেবেই রয়ে গেছে, অন্যায় এবং অকেজো এক সমাজব্যবস্থাকে তা স্বীকার করে নিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে হিন্দুধর্মের ইতিবাচক মূল্যবোধগুলিকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করার, পুরোনো ধ্যানধারণা আর অন্ধবিশ্বাসের জটিল জালটিকে ছিন্ন করার, সর্বনাশা শ্রেণী-বিভেদগুলিকে দূর করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

—জে· ডি· বি·

শহর ছেড়ে পালিয়ে বড়োলোকেদের নিজ নিজ জমিদারিতে আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে।

নতুন এই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যটি হলো চার্চ কর্তৃক নির্ধাবিত ও আরোপিত ধর্মমতের এবং চার্চ সংগঠনের সামাজিক সুসংবদ্ধতা। সর্বজন-পালিত আচারবিধি এবং সর্বজন-স্বীকৃত দার্শনিক বিশ্বাসের মারফত এই সুসংবদ্ধতা গড়ে ওঠে। এই সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ই হলো, মহম্মদের ভাষায়, 'পবিত্র গ্রন্থোল্লেখিত জাতি'। এই কথার মধ্যে এই সত্যটিও ব্যক্ত হয় যে ধর্ম বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও, সেই শ্রেণীর বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কিছুটা প্রসাব না ঘটলে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করতে পাবে না। সব মানুষকেই যে চার্চ-অনুমোদিত আচারবিধি এবং চার্চের অনুশাসনসমূহের আওতায় আনাব প্রচেষ্টা চলে তা থেকে বোঝা যায় যাজকসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ছিল এক 'সর্বজনীন' ('ক্যাথলিক') * সম্মতি অর্জন। গঠনপর্বে প্রত্যেকটি ধর্মই ছিল বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত; কিন্তু পরে তারা প্রত্যেকেই মূলত সুস্থিতি-বিস্তারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অজ্ঞাতসারে, কখনো কখনো জ্ঞাতসারেই, তাবা বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থাটাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চায় এই কথা ব'লে যে সে-ব্যবস্থা এক শাশ্বত অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই সঙ্গে দেবদেবী, পুরাণকথা এবং পরলোকের ধারণার প্রবর্তন ক'রে ধর্ম এই জাগতিক দুনিয়ার অন্যায়-অবিচারেব বিপরীতে এক স্বর্গীয় জগতের মানসচিত্র জাগিয়ে তোলে, মনকে নানাভাবে ভারমুক্ত করে।

খ্রিস্টধর্মের আদিরূপ

এতক্ষণ যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হলো, খ্রিস্টধর্মের আদিরূপের ইতিহাসের মধ্যে তার প্রত্যেকটিই নিতান্ত প্রকট। এই ইতিহাস জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন এই কারণে যে সংক্ষিপ্ত ইসলামী অধ্যায়টুকু বাদ দিলে, আধুনিক বিজ্ঞান সর্বতোভাবেই খ্রিস্টীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। রোম সাম্রাজ্যের অধীনে সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থেকে খ্রিস্টধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল। ইহুদিদের মধ্যে যে তার প্রথম আবির্ভাব ঘটে, সেটা আদৌ আকস্মিক নয়। কারণ রোমের পদানত জাতিসমূহের মধ্যে ইহুদিরা ছিল সবচেয়ে নিপীড়িত না হোক সবচেয়ে বিদ্রোহী। বহু-আকাঙ্ক্ষিত ত্রাণকর্তা যিশু স্বয়ং বিপ্লবী বলেই পরিগণিত হয়েছিলেন, এবং বিপ্লবীদের পরিণতি যা হয় তাঁরও তাই হয়েছিল। গোড়ার দিকের খ্রিস্টীয় গোষ্ঠীগুলি হয় এসেন্-দের দ্বারা গঠিত হয়েছিল, না হয় এসেন্-দেরই আদলে গড়ে উঠেছিল। এইসব ইহুদি গোষ্ঠী ছিল সম্প্রদায়বদ্ধ, অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর এবং সাম্যবাদী। মাকাবী এবং ফ্যারিসি উভয় সম্প্রদায়কেই তারা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ প্রথমে বিপ্লবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরিশেষে মাকাবী-সম্প্রদায় ধনসম্পদ আর বিদেশী রীতিনীতির সঙ্গে আপস করেছিল। অপরদিকে ফ্যারিসি-রা নিজস্ব আচারবিধি পালনের মধ্যে দিয়ে এক গোঁড়া গোষ্ঠীতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।

এইভাবে আদি খ্রিস্টধর্ম একদিকে ইহুদি গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে, অন্যদিকে জাগতিক শক্তিমত্তার সঙ্গে কোনোরকম আপসকে প্রত্যাখ্যান করার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ওঠে। এর ফলে তাব প্রতি জনসাধারণের সমর্থন সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। কর্তৃপক্ষের অত্যাচার যত বাড়ে, খ্রিস্টধর্মের প্রতি জনসমর্থনও ততই বাড়তে থাকে। সাধারণ মানুষের কাছে খ্রিস্টধর্মের আবেদন

* ইংবেজি *catholic* শব্দটি গ্রীক *katholikos* থেকে লাতিন *catholicus* মারফত ফরাসি *catholique* থেকে গৃহীত। মূল গ্রীক শব্দটির অর্থ হলো 'সর্বজনীন'। গ্রীক *katholikos* শব্দটি আবার দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত: *kata* (=প্রসঙ্গে, ব্যাপারে) + *holos* (সর্ব, সমগ্র)।—অনু·

তুঙ্গে ওঠে প্রথম দুই শতাব্দীতে—ঠিক যেসময়ে রোম সাম্রাজ্যের ধনবান ও সংস্কৃতিবান নাগরিকরা রোম সাম্রাজ্যকে সবচেয়ে নিরাপদ, সবচেয়ে গৌরবময় বলে স্বস্তি পেতেন। সেই পর্বেই রোমের শাসন সাধারণ মানুষের এবং ক্রীতদাসেদের কাছে সবচেয়ে দুঃসহ হয়ে ওঠে। ইহজগতে তাদের সামনে মুক্তির সামান্যতম কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই ইহজীবনের ভয়ানক পরিণতি নিয়ে তাদের আলাদা করে শঙ্কিত হবার কোনো কারণ ছিলনা। জুডাইজমের তুলনায় খ্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটে অনেক তাড়াতাড়ি, কারণ একদিকে তা যেমন জুডাইজমের কট্টর গোষ্ঠীতান্ত্রিক মনোভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে, অপরদিকে তেমনি জনসাধারণের কাছে জুডাইজমের ব্যাপক আবেদনকে পূর্ণমাত্রায় ধারণ করতে সক্ষম হয়। ঐ একই কালে মিত্র-ধর্মও (Mithraism) ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। কিন্তু সে ধর্ম ছিল আর পাঁচটা গুহ্য রহস্যবাদী ধর্মেরই মতো আরেকটি ধর্ম। খ্রিস্টধর্মের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা তাকে সবার থেকে একেবারে স্বতন্ত্র এক রূপ দিয়েছিল। খ্রিস্টধর্মের মধ্যে দিয়ে এক সর্বগ্রাহী সংগঠন গড়ে উঠল। আপাতদৃষ্টিতে যতই নিরীহ আর বশংবদ হোক, সে সংগঠন ঐ অত্যাচারী এবং পাপ-পঙ্কিল ধ্রুপদী সভ্যতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না-রাখার ব্যাপারে কৃতসংকল্প ছিল। অবধারিতভাবেই তা এক রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিল। সে আন্দোলনের মধ্যে গোড়ার দিকে বড়ো বড়ো শহরের নিপীড়িত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হলো। সেই সঙ্গে ক্ষমতাবান উচ্চশ্রেণীর হেলেনীয় জীবনধারার বিরুদ্ধে প্রাচ্য মানুষের জাতীয় প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত হলো তার মধ্যে।

তবে খ্রিস্টধর্ম খুব বেশিদিন সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। আস্তে আস্তে ধর্মান্তরিত সংস্কৃতিবান মানুষ অনেক বেশি সংখ্যায় খ্রিস্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হতে থাকে; ফলে খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারণার মধ্যে ধ্রুপদী সংস্কৃতির অনেক কিছুই অনুপ্রবেশ করতে থাকে। বহিরাগত এইসব ধ্যানধারণার মধ্যে কোনোকোনোটি অপেক্ষাকৃত সহজে খ্রিস্টধর্মের অঙ্গীকৃত হয়ে যায়—যেমন প্লেটো-পন্থা এবং তারই আধা-খ্রিস্টীয় উপজাতক নব্য প্লেটোবাদ। এই দ্বিতীয়োক্ত মতটি বিশেষভাবে খ্রিস্টধর্মের অঙ্গীভূত হয়। এরই দৌলতে ধর্মের 'অনৈহিকতা'র ওপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব হয়। খ্রিস্টধর্মের সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে এই দুটি ধারা প্রবহমান—এমনকি আজও। একদিকে জনচিত্তে ধর্ম সম্বন্ধে এক ইহজাগতিক বৈপ্লবিক ধারণা, এক অন্তিম প্রলয়কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে 'শেষ বিচারের দিনে'র আগমনের প্রত্যাশা এবং 'স্বর্গরাজ্য' প্রতিষ্ঠার আশা; অন্যদিকে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে নিস্পৃহ আধ্যাত্মিক সাধনার ধারা, যা বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীভুক্ত লোকেদের সমর্থনপুষ্ট।

গিবন তাঁর ইতিহাস-গ্রন্থে খ্রিস্টধর্মকেই ধ্রুপদী অর্থনীতি ও সংস্কৃতির পতনের জন্য দোষী করেছেন। গিবনের যুগে এই মত পোষণ করা যতই স্বাভাবিক হোক, আজকের দিনে এ মতের কোনো যৌক্তিকতা নেই। আমরা আগেই দেখিয়েছি, ঐ পতন ঘটেছিল অভ্যন্তরীণ কারণে। ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান যুগের পতনের পর প্রথমে 'তামস যুগ' ও পরে মধ্যযুগের অভ্যুদয় ঘটে। ঐ দুই যুগে যে নতুন জীবনধারা গড়ে ওঠে, চার্চ-ই বহুলাংশে তার চরিত্র নির্ধারণ ক'রে দেয়। ঐ দুই যুগেই চার্চের ভূমিকা ছিল প্রধান। ধ্রুপদী যুগের শেষদিকে যেসব সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে একমাত্র চার্চই রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম অঙ্গনের বিপর্যয়ের পরেও আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়। শুধু তাই নয়, রোমসাম্রাজ্যের পতন সম্পূর্ণ হবার বহু আগেই চার্চ সাম্রাজ্যের প্রাচীন চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বহু দূরে প্রসার লাভ করতে পেরেছিল। আয়ার্ল্যান্ড থেকে ককেশাস পর্যন্ত ইউরোপের সুবিস্তীর্ণ এলাকায় তার প্রভাব পড়েছিল। এশিয়াতেও তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। সংস্কৃতি, এমনকি সাক্ষরতা ব্যাপারটাই যেভাবে যাজকদের

কুক্ষিগত হয়ে পড়ে তা প্রাচীন মিশরের পর আর কোথাও দেখা যায়নি। কেবল আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার সম্পাদনই নয়, শিক্ষা, প্রশাসন, এবং মধ্যযুগের গোড়ার দিকে আইন ও চিকিৎসাও, চার্চের আওতায় চলে আসে।

গির্জা সংগঠন

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরেও যে চার্চ টিকে রইল তার কারণ, চার্চের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বনেদ অনেক বেশি পোক্ত ছিল। কার্যত এক বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চার্চের সূত্রপাত ঘটে। সে আন্দোলন যে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু একথাও ঠিক যে তা খোলাখুলিভাবেই পৌর প্রশাসনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। ফলে আত্মরক্ষার তাগিদে অচিরেই তা এক সুসংবদ্ধ সংগঠন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। সে সংগঠনের চরিত্র ছিল আধা-অর্থনৈতিক, আধা-আন্দোলনমূলক। সে সংগঠনের প্রবীণ ব্যক্তিদের বলা হতো *presbuteroi* (আচার্য); আর তাঁদের অধীন যাজকদের বলা হতো *diaconoi*—যাঁরা গরিবদের দানখয়রাতির দেখাশোনা করতেন। এঁদের উভয়ের মাধ্যমে উক্ত সংগঠন প্রত্যেকটি খ্রিস্টানের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রাখত। ফলে প্রতিটি খ্রিস্টানের ব্যক্তিগত সমর্থনের ওপর সে সংগঠন ভরসা রাখতে পারত—যা রোম সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কোনো কর্মকর্তার পক্ষে আশার অতীত ছিল। পরে দ্বিতীয় শতকে যখন চার্চের অধীন সংস্থার সংখ্যা অনেক বেড়ে উঠল, তখন উন্নততর সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দিল, যাতে ধর্মমত সংক্রান্ত এবং ব্যক্তিগত বাদবিবাদের ফলে চার্চ টুকরো টুকরো হয়ে না পড়ে। তখন রাষ্ট্রের সমান্তরাল এক সংগঠন গড়ে তোলা হলো, এমনকি তাতে অনেক সময় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পরিভাষাই ব্যবহার করা হলো। যেমন লাতিন *ecclesia* (যার আদি অর্থ সমাবেশ) থেকে উদ্ভূত হয় ফরাসি *église*, যার অর্থ চার্চ। লাতিন *basilica* শব্দটির আদি অর্থ ছিল রাজদরবার; পরে তার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় খ্রিস্টীয় গির্জাভবন। ইংরেজি *diocese* শব্দটি এসেছে গ্রীক *dioikésis* থেকে, যার অর্থ ছিল প্রশাসন। সরকারি পরিদর্শকদের *(episcopoi)* ছাঁদে 'বিশপ'দের নিয়োগ করা হয়.। পরে এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রধানতম বলে পরিগণিত হন তাঁরাই জেরুসালেম, রোম, কন্স্ট্যান্টিনোপ্‌ল, অ্যালেকজান্ড্রিয়া এবং অ্যান্টিওক্‌-এ 'মহাচার্যে'র *(patriarch)* মর্যাদা লাভ করেন। কয়েক শতাব্দী পরে রোমের বিশপরা নিজেদের সর্বপ্রধান বলে দাবি করেন; তাঁরা পবিত্র পিতা রূপে, পোপ রূপে, মর্ত্যলোকে ঈশ্বরের সহকারী রূপে, Pontis Maximus নামে পূজিত হন। এই Pontis Maximus কথাটির অর্থ হলো 'মুখ্য সেতুনির্মাতা'। একদা এঁর কাজ ছিল টাইবার নদীতে সেতু বাঁধা; এবার ইনি স্বর্গলোক আর মর্ত্যলোকের মধ্যে সেতু নির্মাণে প্রবৃত্ত হলেন।

তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ খ্রিস্টীয় চার্চ রোম সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী, বহুব্যাপ্ত এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক সংগঠনে রূপ নিল—যদিও তখনো মোট জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশই খ্রিস্টীয় চার্চের অধীন ছিল। রোম সম্রাটদের উৎপীড়নেও সে সংগঠন ভেঙে পড়েনি। চতুর্থ শতাব্দীতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে সাম্রাজ্যকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে চার্চকে অধিগ্রহণ করা ছাড়া গতি নেই। 312 খ্রিস্টাব্দে কন্স্ট্যানটাইন সেই চূড়ান্ত পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন, যদিও তিনি নিজে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন তার বহু পরে।

পেগ্যান মতবাদের অবসান

চার্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তা যুগপৎ পৃষ্ঠপোষণ এবং শাস্তিদানের নীতি অনুসরণ করতে থাকে। যার ফলে অ-খ্রিস্টীয় মূর্তিপূজক পেগ্যানরা সত্বর চার্চের বশ্যতা স্বীকার ক'রে

নেয়—অন্তত শহরে। প্রতিরোধ যেটুকু ছিল তা নগণ্য। কারণ ততদিনে অলিম্পাসের অমরাবতীতে প্রতিষ্ঠিত পেগ্যান দেবদেবীর আরাধনায় আর কারো অন্তরের তাগিদ ছিল না, সে আরাধনা কেবল বাহ্য সামাজিক কেতার অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। আর দর্শনের দিক থেকে বিচার করলে, খ্রিস্টধর্মের মধ্যেই প্রায় সবকটি দার্শনিক মতের স্থান ছিল। চার্চ কেবল একটি ব্যাপারে অসহিষ্ণু ছিল; তা হলো, খ্রিস্টীয় 'প্রত্যাদেশ' থেকে সরকারিভাবে স্বতন্ত্র যে কোনো মতবাদ। কিন্তু সচরাচর সেরকম মতবাদকে চার্চ সরাসরি দমন করত না। একথা ঠিকই যে গণিতবিদ হাইপেশিয়াকে ঐ কারণে খুন করা হয়েছিল; কিন্তু সেটা খ্রিস্টীয় মঠের উগ্র অতি-উৎসাহীদের কাণ্ড, চার্চের নীতির অনুসরণে তা সংঘটিত হয়নি। বরং ধ্রুপদী যুগের বিজ্ঞানের অবসানের পরিপ্রেক্ষিতে চার্চের নীতির এক অভ্রান্ত নিদর্শন হলো 529 খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত খ্রিস্টান সম্রাট জাস্টিনিয়ান কর্তৃক এথেন্সের বিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। বন্ধ করে দেওয়ার পর শেষ কয়েকজন অধ্যাপককে পারসিক সম্রাট খুস্‌রোএস কর্তৃক জুন্দিশপুরে স্থাপিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ এঁদের কাছে অতি অদ্ভুত বলে মনে হওয়ায় পারস্যসম্রাট এঁদের ফেরত পাঠিয়ে দেন। ফেরত পাঠানোর সময় তিনি এই মর্মে চুক্তি করেন যে এঁদের ওপর যেন অত্যাচার করা না হয়।

ভবিষ্যতের নিরিখে যে ঘটনাটার তাৎপর্য অনেক বেশি তা হলো, আজ আমরা যাঁকে দার্শনিক জন ফিলোপোন'স (530 খ্রিস্টাব্দ) বলে জানি তাঁর খ্রিস্টধর্ম-গ্রহণ। তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হন ঐ সময়েই। ধর্মান্তরিত হয়ে তিনি প্রবল উদ্যমে কাজ শুরু করে দেন। অ্যালেকজান্ড্রিয়ায় এক সক্রিয় কর্মীদলে যোগ দেন তিনি। এই দলটি 'ফিলোপনের দল' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এদের প্রধান কাজ ছিল 'অ-খ্রিস্টান পেগ্যান অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া এবং মাঝে মাঝে তখনো-টিকে-থাকা মিশরী মন্দিরগুলোকে আক্রমণ করা।' শেষ পর্যন্ত ফিলোপোন'সের অতি-উৎসাহে তাঁকে 'অতি-ট্রিনিটিবাদী' করে তোলে, তিনি হয়ে ওঠেন ত্রি-ঈশ্বরবাদী ধর্মদ্রোহী! অ-খ্রিস্টীয় পেগ্যান দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করার অতি-উৎসাহে তিনি অবশেষে অ্যারিস্টটলের গতিতত্ত্বকেও প্রত্যাখ্যান করে বসেন। তার বদলে তিনি 'অভিঘাত'-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। আরবদের এবং ধর্মশাস্ত্রীদের কিছুটা অনুমোদন লাভ করে এ তত্ত্ব। পরে গ্যালিলিও-র হাতে পড়ে এই তত্ত্বই আধুনিক গতিবিজ্ঞানের জনক হয়ে ওঠে।

3. ধর্মানুশাসন ও বিজ্ঞান

খ্রিস্টধর্ম জয়লাভ করায় কার্যক্ষেত্রে এই ঘটল যে পাশ্চাত্যে চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে বিজ্ঞান সমেত যাবতীয় মননকর্ম খ্রিস্টীয় ধর্মানুশাসনের আধারে ব্যক্ত হতে লাগল। যত দিন গেল, ততই মননকর্ম চার্চের সঙ্গে যুক্ত লোকেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। প্রাচ্যেও ইসলামের অভ্যুত্থান ঘটবার আগে পর্যন্ত চিত্রটা এইরকমই ছিল। চতুর্থ থেকে সপ্তম খ্রিস্টাব্দে অপস্রিয়মান রোম সাম্রাজ্যের এলাকায় মানবচিন্তার ইতিহাস বলতে খ্রিস্টীয় চিন্তাভাবনার ইতিহাসই বোঝায়।

খ্রিস্টধর্মের অভ্যুত্থানের প্রথম দিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো, যেহেতু তা ঘৃণিত পেগ্যান উচ্চশ্রেণীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু এই মনোভাব বদলে গেল। চার্চ যখনই সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী হয়ে উঠল, তখনই যিশুপ্রচারিত নিছক মানবপ্রেমের বাণীতে সন্তুষ্ট থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হলো না। সাধু জন-লিখিত সুসমাচার থেকেই স্পষ্ট দেখা যায় যে অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী প্লেটোবাদের অনুসরণে ঐশ্বরিক শব্দ-পূজার

(logos) গূঢ় রীতিনীতি খ্রিস্টধর্মের ভিত্তিমূলে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বস্তুত, সাধু পলের বাণীর মধ্যে কিছুটা তরলীকৃত আকারে তার বহিঃপ্রকাশ ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

গোঁড়ামি ও ধর্মদ্রোহিতা

চার্চ-পিতারা প্রাচীন দর্শনের নিরাপদ অংশগুলিকে বেছে নিয়ে খ্রিস্টীয় ধর্মানুশাসনের অঙ্গীভূত করতে উদ্যোগী হলেন। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন ওরিগেন (প্রায় 185-253)। ইনি ছিলেন নব্যপ্লেটোবাদের প্রবর্তক প্লোটিনাসের সহাধ্যায়ী। প্রাচীন দর্শনের অনেক কিছু ইতিমধ্যে অজ্ঞাতসারেই খ্রিস্টীয় ধর্মমতের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সে কাজ সহজসাধ্য ছিল না। তার একটা কারণ এই যে ওল্ড টেস্টামেন্টের দার্শনিক ভিত্তিটা একেবারেই অন্যরকম ছিল। ফলে অবধারিতভাবেই দেখা দিল বাগবিতণ্ডা। উভয়পক্ষই নিজেকে বিশুদ্ধপন্থী এবং অন্যকে ধর্মদ্রোহী বলে চিহ্নিত করল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে খ্রিস্ট দুনিয়ার পূর্বাঞ্চলে নানান বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে মহাবিতর্ক চলার ফলে খ্রিস্টসমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে। আরিয়াস-পন্থী, নেস্টরিয়াস-পন্থী, 'মোনোফিজাইট' প্রমুখ গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল বিতণ্ডা চলে। আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে নব্যপ্লেটোবাদী ধ্যানধারণার ব্যাখ্যা এবং নশ্বর বা অবিনশ্বর দেহের সঙ্গে সে আত্মার সম্পর্ক কী—তা নিয়েই প্রধানত মতবিরোধ দেখা দেয়।

বিশপ-পরিষদ এসব বিতর্কের আপাতগ্রাহ্য সমাধান করে দিত। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে চার্চের এক মূলগত গণতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। কার্যত অবশ্য যে-পক্ষ সম্রাটকে দলে টানতে সমর্থ হতো, সচরাচর তারই অনুকূলে বিশপ-পরিষদ রায় দিত। ঈশ্বরের প্রকৃতি কেমন তা নিয়ে চতুর্থ শতাব্দীতে বিরোধী আরিয়ান গোষ্ঠীর সঙ্গে যে প্রবল বিতর্ক চলে, 325 খ্রিস্টাব্দে নিকাইয়ার বিশপ-পরিষদ এইভাবেই তার সমাধান করে। সেখানে অ্যাথানাসিয়াস আপন ট্রিনিটি-পন্থী মতকে অলঙ্ঘনীয় বলে আরোপ করেন। তা সত্ত্বেও আরিয়ানদের পুরোপুরি পরাভূত করা যায়নি; দুশো বছর পরে সম্রাট জাস্টিনিয়ান আরিয়ান-পন্থী গথ্‌দের পরাস্ত করার পর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

পঞ্চম শতাব্দী নাগাদ সেন্ট অগাস্টিন একদিকে ধর্মবিশ্বাস অন্যদিকে দর্শন, এ দুয়ের মধ্যে এক আপসরক্ষা করতে সমর্থ হন। তিনি বাইবেলোক্ত ঐতিহ্য আর প্লেটোবাদের যে মিশ্রণ ঘটান তার মধ্যে ম্যানিকি-বাদীদের অভিজ্ঞতা থেকে আহরিত পূর্বনির্দিষ্ট নিয়তিবাদের জোরালো প্রভাব পড়ে। সেই সময় থেকেই এই প্রভাব খ্রিস্টধর্মকে বিব্রত করে রেখেছে, বিশেষ করে পিউরিটান-পন্থী খ্রিস্টধর্মকে। মূলত জরথুস্ট্রবাদী ভাবনা থেকে আহরিত সু আর কু-এর মহাজাগতিক সংঘাতের (অর্মুজদ্ এবং এরিমান্) ধারণার সঙ্গে শয়তান আর নরকাগ্নির ধারণার মিলন ঘটে সেন্ট অগাস্টিনের প্রবর্তিত সেই মিশ্ররূপের মধ্যে। তাঁর এই আপসরফা কিন্তু টিকল না। একের পর এক বিরোধী ধারণা জন্ম নিতেই থাকে। মধ্যযুগে তাদের নতুন করে দমন করার প্রয়োজন হয়। পরিশেষে 'রিফর্মেশন'-পর্বে সেই দমন-প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

তবে যত বিতর্কই বাধুক, যেসব দর্শনের ভিত্তিতে ধর্মতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল, এক জায়গায় তাদের মিল ছিল : তাদের প্রত্যেকটিকেই অধ্যাত্মলোক বিষয়ে চর্চারত এক ধর্মের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষণ যে-বিজ্ঞানের ভিত্তি তাকে তো আর ঐভাবে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, প্রথমত, মুক্তি বা নির্বাণ লাভের জন্য পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষা স্পষ্টতই অপ্রয়োজনীয়; দ্বিতীয়ত, ইন্দ্রিয়বোধের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার দরুন পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের মূল্য কমিয়ে দেয়। এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে বহু শতাব্দী সময় লেগেছিল। অবশেষে যে যুগে এই মনোভাব পরিবর্তিত হয় তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাতাবরণ অবক্ষয়ী রোম সাম্রাজ্যের তুলনায় একেবারেই অন্যরকম ছিল।

এই সমস্ত ধর্মীয় বাগবিতণ্ডার কোপ অবধারিতভাবে গিয়ে পড়ে প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞানের ওপর। এমনিতেই ধ্রুপদী যুগের, বিশেষত তার অন্ত্যপর্বের, দর্শন রীতিমতো বাস্তববিমুখ ছিল। অপরদিকে ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্ট কোনোটাই প্রকৃতির ব্যাখ্যাদানের প্রয়াসে বিরচিত হয়নি। তাছাড়া তাদের মধ্যে একেবারে প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় যুগ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রাচীন যুগের নানারকম পৌরাণিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যার সমাবেশ ঘটেছিল। স্বভাবতই তা স্ববিরোধিতায় পূর্ণ ছিল। আসলে দর্শন আর শাস্ত্রগ্রন্থের মিলন ঘটানোর প্রয়াস যুক্তিবোধের সম্পূর্ণ বিরোধী; প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা গঠনের প্রক্রিয়াকে তা মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। হয় ধর্মবিশ্বাসকে রূপক হিসেবে ব্যাখ্যা করা, নতুবা যুক্তিবোধকে বিকৃত করা—এছাড়া অন্য কোনোভাবেই ধর্মবিশ্বাস আর যুক্তিবোধকে মেলানো যায় না। এবং এই দুটি প্রক্রিয়াই সনিষ্ঠ চিন্তার পরিপন্থী।

আজকাল খ্রিস্টধর্মকে এই বলে প্রশংসা করার একটা রেওয়াজ উঠেছে যে তা প্রাচীন কালের বিজ্ঞানকে সংরক্ষণ করে রেখেছিল বলেই নাকি আজকের দিনে আমরা সে বিজ্ঞানের পরিচয় পাই। কিন্তু আমরা দেখাব যে ঘটনা তা নয়; বিজ্ঞান টিকে থেকেছিল এইজন্যেই যে ধর্মবিশ্বাস যেখানে বাস্তব জগতের মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছিল সেখানে বিজ্ঞান সে কাজে সফল হয়েছিল। খ্রিস্টধর্ম শত শত বছর ধরে বিজ্ঞানকে কতকগুলো জরাজীর্ণ এবং স্ববিরোধী মতের অধীন করে থাকার চেষ্টায় রত ছিল; সে প্রয়াসকে প্রতিহত করেই বিজ্ঞান আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। যুগ যুগ ধরে একটার পর একটা ঘটনায় আমরা দেখতে পাই, সবচেয়ে স্পষ্ট সমাধানগুলোরও স্বীকৃতি পেতে বহু দশক কেটে গেছে কেবল এইজন্যে যে তারা বাইবেলের 'জেনিসিস' অধ্যায়ের সঙ্গে বেমানান। এর অন্যতম উদাহরণ এই সেদিনের ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ-বিরোধী বিতর্ক। এ কথা বলে চার্চকে বা চার্চ-সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ছোটো করছি না; কেননা সেই যুগে তাঁরা তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী যথেষ্ট করেছিলেন। কিন্তু আজকের দিনে যাঁরা এসব কথা বলেন, তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে সংশয় জাগে। রেনেসাঁস যুগের আগে পর্যন্ত খ্রিস্টান দুনিয়ায় বিজ্ঞান বেশ শ্লথগতিতে বিকাশ লাভ করে; কিন্তু তার জন্য প্রধানত দায়ী চার্চ নয়, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। সেই পরিস্থিতির তাড়নাতেই চার্চ এতকাল ধরে প্রগতিবিরোধী আচ্ছন্নতাবাদী ভূমিকা পালন করেছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ওর চেয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না।

4. গ্রীক-বিরোধী প্রতিক্রিয়া

সিরিয়া ও মিশরে বিজ্ঞান

আরিয়াস-পন্থী বিদ্রোহীদের পরে একে একে আরো অনেক বিদ্রোহী খ্রিস্টীয় গোষ্ঠী মাথা চাড়া দেয়। তার মধ্যে নেস্টরিয়াস-পন্থী আর মোনোফিজাইট গোষ্ঠী দুটির গুরুত্ব সমধিক। কারণ এই দুই গোষ্ঠী মিশর ও সিরিয়ায় গ্রীক-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে, সমগ্র এশিয়া জুড়ে বিজ্ঞানের প্রসারে সহায়তা করে এবং ইসলামের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে। খ্রিস্টধর্ম রোম সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্ম হিসেবে পরিগণিত হওয়ায়, সুপ্ত জাতীয় বা আঞ্চলিক স্বাধীনতার বিভিন্ন আন্দোলন অবধারিতভাবেই বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিকে কেন্দ্র করে দানা বাঁধে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির মত কী ছিল সেটা অবশ্য আজ আর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। 428 খ্রিস্টাব্দে সিরিয় সন্ন্যাসী নেস্টর এই মত ঘোষণা করেন যে মেরিকে ঈশ্বরের মাতা বলা উচিত নয়, কেননা তিনি কেবল যিশুর মানবিক সত্তার জন্মদাত্রী, ঐশ্বরিক সত্তার নয়। 431 খ্রিস্টাব্দে ইফিসুস্-এর পরিষদ-সভা এই মত প্রচারের জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। তখন হাজার

হাজার সিরিয় চার্চ-কর্মী, সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষ তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এসে নিপীড়নের শিকার হন। এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তাঁরা ঘৃণিত বাইজান্টীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সিরিয়দের সুপ্ত জাতীয়তাবোধ প্রবল বিক্রমে জাগ্রত হয়ে ওঠে, তাঁরা গ্রীক কর্মকর্তা আর উচ্চশ্রেণীর লোকেদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান। কিন্তু রোমক শাসকদের উৎপীড়ন এতই তীব্র হয়ে ওঠে যে নেস্টরপন্থীদের অনেকেই সাম্রাজ্যের সীমান্ত পার হয়ে পারস্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সেখানে তখন সাসানীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এক প্রাণবন্ত সংস্কৃতি গড়ে উঠছিল। জরথুস্ত্রবাদই পারস্যের সরকারি ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও পারসিকরা নেস্টরপন্থীদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়। কারণ চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে নেস্টরপন্থীদের পাণ্ডিত্য সুবিদিত ছিল। রাজসভার সন্নিকটেই জুন্দিশপুরে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তাঁরা সেখানে এক সুবিখ্যাত মানমন্দির গড়ে তোলেন। নেস্টরপন্থী সন্ন্যাসীরা সমগ্র পারস্য ব্যেপে ছড়িয়ে পড়েন। অনেক লোককে তাঁরা ধর্মান্তরিত করেন। সুদূর চীনে পর্যন্ত তাঁরা গির্জা স্থাপন করেন। *

ষোলো বছর পরে [অর্থাৎ 447 সালে—অনু·] অ্যালেকজান্ড্রিয়ার বিশপ ইউটিকেস (Eutyches) নেস্টরপন্থী বিদ্রোহী মতবাদের ছোঁয়াচ এড়াবার মানসে এতদূর পর্যন্ত ঘোষণা করতে রাজি হন যে যিশু খ্রিস্টের মানবিক সত্তা আর ঐশ্বরিক সত্তা এক ও অভিন্ন। এই অদ্বৈত প্রকৃতির মতবাদকে 'মোনোফিজাইট' মতবাদ (গ্রীক *monos* এক+*physis* স্বভাব, প্রকৃতি) বলা হয়। কিন্তু এই মতবাদও বিদ্রোহী বলে গণ্য হলো এবং যথাকালে রোম সাম্রাজ্যের প্রশাসনের চাপে 451 সালে ক্যাল্‌সিডন-এর পরিষদ-সভায় এই গোষ্ঠীও দোষী সাব্যস্ত হয়। মিশরের প্রায় সমস্ত, এবং সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের বহু চার্চ-কর্মী এই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে রুখে দাঁড়ান। আজও মিশর ও আবিসিনিয়ার খ্রিস্টানরা মোনোফিজাইট সম্প্রদায়ভুক্ত।

আক্রান্ত মোনোফিজাইটরাও পারস্যে পলায়ন করেন। সেখানে নেস্টরপন্থীদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তাঁরাও পা থেকে গ্রীক জীবনচর্যার ধুলো ঝেড়ে ফেলে সিরিয়দের মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পত্তন করেন ধর্মতাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে। এর জন্য প্রধান প্রধান গ্রীক দর্শনগ্রন্থকে সিরিয় ভাষায় অনুবাদ করতে হলো। এই ভাবেই গ্রীক বিজ্ঞান-মহীরুহের একটি শাখা থেকে স্বতন্ত্র জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার অঙ্কুর প্রথম মুকুলিত হলো। এইসব ঘটনার পাশাপাশি সিরিয়াতে প্রবল অর্থনৈতিক অগ্রগতিও ঘটতে থাকে। তার ফলে গ্রীকদের টেক্কা দিয়ে সিরিয় বণিকরা কেবল সমগ্র ভূমধ্যসাগর অঞ্চল জুড়েই নয়, সুদূর ব্রিটেনে এবং এশিয়া মহাদেশের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ

রোমের পতনের পরবর্তী 500 বছরে বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ইউফ্রেটিস নদীর পূর্বে সরে গেল। পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতকে বিপুল সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটে—কেবল পারস্যে আর সিরিয়াতেই নয়, ভারতবর্ষেও। চালুক্য এবং রাষ্ট্রকূট রাজবংশের প্রাণবন্ত শাসনকালে জরাজীর্ণ বৌদ্ধধর্মকে অপসারিত করে পুর্নজাগ্রত হিন্দুধর্ম। এলিফ্যান্টা আর ইলোরার অপূর্ব মন্দিরগুলি সেই নবজাগরণের সাক্ষী। তবে সারা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে যে ঘটনাটার গুরুত্ব সর্বাধিক তা হলো এই যে এই পর্বে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের বিকাশে এক নতুন গতি সঞ্চারিত হয়—বিশেষত

* দক্ষিণ ভারতের সিরিয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও নেস্টরপন্থীদের প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল। —অনু·

গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে। পঞ্চম শতকে আর্যভট (জন্ম আনুমানিক 499) এবং বরাহমিহির (জন্ম আনুমানিক 505) ও সপ্তম শতকে ব্রহ্মগুপ্তের (জন্ম আনুমানিক 598) মতো বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে। ভারতীয় বিজ্ঞানের এই বিকাশের ভিত্তিটি ছিল হেলেনীয় বিজ্ঞান; সেই সঙ্গে সরাসরি ব্যাবিলোনিয়া থেকে এবং সম্ভবত চীন থেকেও কিছু অবদান আসে।

ভারতীয়দের সংখ্যাতত্ত্ব : 'শূন্য'

ভারতবর্ষে এই সময়ে এমন একটি নতুন উদ্ভাবন ঘটে যার গুরুত্ব অপরিসীম। *দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন* এবং শূন্যের প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে *সংখ্যামালাকে* নিখুঁত করে তোলা হয়। পাশ্চাত্যে এই পদ্ধতিই "আরবী" সংখ্যামালা নামে পরিচিত। এই পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটায় গণনকার্য ব্যাপারটা নিতান্তই সবল হয়ে গেল। লক্ষণীয়, 662 সালে পাশ্চাত্যে এই পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ করেন সিরিয়ার এক মোনোফিজাইট —সেভেরুস সেবক্ত্। এডেসা-র জোব (প্রায় 800) নামক আরেকজন সিরিয় খুবই কল্পনামণ্ডিত ঢঙে এই পদ্ধতির বর্ণনা করেন। নয়টি সংখ্যাকে নয়টি দেবদূতমণ্ডলী রূপে কল্পনা ক'রে তিনি শূন্যের গোল আকারকে এই বলে ব্যাখ্যা করেন : 'সংখ্যাসমূহের চলন এক প্রকার চক্রের মধ্যে দিয়া সম্পন্ন হয়। সেই কারণেই প্রাচীনকালের জ্ঞানীগণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীকে মুখে মুখে বৃত্তাকারে যুক্ত করিলে যে শূন্যস্থান গঠিত হয় তাহাকে এই সংখ্যাটির [দশ] আদি চিহ্ন রূপে ব্যবহার করিতেন। বস্তুত সংখ্যাগুলি এই দশম মাত্রায় উপনীত হইবা মাত্র তাহাদের চলন থামিয়া যায়, তাহারা ঘুরিয়া দাঁড়ায় এবং এক ধাপ উন্নীত হয়; এইরূপে একের পর এক ধাপে তাহাদের উন্নয়ন ঘটিতে থাকে।' এই পর্বে বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা সমেত গ্রীক সংস্কৃতির নানাবিধ উপাদান বৌদ্ধধর্ম মারফত চীনে, এমনকি জাপানে ছড়িয়ে পড়ে। এইসব উপাদান চীনের তখনো-বিকাশমান প্রাচীন সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়। তবে প্রকৌশলের ও বিজ্ঞানের মূল স্রোতে চৈনিক সংস্কৃতি আপন অবদান রাখে আরো কিছু পরে।

বাইজ্যান্টিয়ামের সংস্কৃতি

সামগ্রিক বিচারে ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দী আদৌ 'তামস যুগে'র সবচেয়ে তমসাচ্ছন্ন অধ্যায় ছিল না। বরং এই অধ্যায়ে বিশ্বব্যাপী এক সভ্যতার বিকাশ ঘটে। গ্রীসের উত্তরাধিকার সর্বত্রই নবনব সুষমা ও নবনব চিন্তাধারার জন্ম দেয়। কিছু শর্তসাপেক্ষে একথা এমনকি রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব অঙ্গনে টিকে থাকা কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল অবশ্য ততদিনে পুরোপুরি 'গ্রীসীয়' হয়ে উঠেছিল। সেখানে জাস্টিনিয়ান (প্রায় 482-565) প্রমুখ সম্রাটদের শাসনাধীনে শিল্পকলায় ও প্রকৌশলে এক নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। সেন্ট সোফিয়ার মোজাইক-চিত্র ও স্থাপত্যকর্মগুলি তার সাক্ষী। তবে সেখানকার সংস্কৃতিতে গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের ঐতিহ্য সংরক্ষিত হলেও সে ঐতিহ্যের বিকাশলাভের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার একটা কারণ হলো চার্চের প্রগতিবিরোধী আচ্ছন্নতাবাদী মনোভাব। বস্তুত, এই মনোভাবের বশবর্তী হয়েই সম্রাট জাস্টিনিয়ান এথেন্‌সের বিদ্যালয়গুলি তুলে দেন। কিন্তু এর আরো বড়ো কারণটা এই যে খোদ গ্রীসেই সে ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সাবেকী বিদ্যা হিসেবে তাকে খাতির করা হতো বটে, কিন্তু তা আর নতুন কোনো উদ্দীপনা জাগাত না। তাছাড়া মঠে-মঠে খেয়োখেয়ি, প্রাসাদের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র আর হিপোড্রোমের রথ-প্রতিযোগিতা—এইসব মিলে তখন গ্রীসে যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তার সঙ্গে ঐ ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

ধ্রুপদী সংস্কৃতির সঞ্চারণ

2000 বছর আগে নদীমাতৃক সভ্যতাগুলোর ভাঙনের সময় বিজ্ঞান সর্বতোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি; ধ্রুপদী সভ্যতার ভাঙন সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য। ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান সভ্যতার বদলে ধীরে ধীরে নতুন যে সভ্যতা গড়ে উঠল তা গ্রীক সভ্যতার কতকগুলো ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতাকে বর্জন করতে সক্ষম হয়। ঐসব সীমাবদ্ধতা থাকার ফলেই গ্রীক সভ্যতা আপন উন্মেষকালে অগ্রগতির অমন বিপুল আশা জাগানো সত্ত্বেও পরিশেষে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তবে নদীমাতৃক থেকে ধ্রুপদী সভ্যতা, আর ধ্রুপদী থেকে উত্তর-ধ্রুপদী সভ্যতা—এই দুই উত্তরণের চরিত্রের মধ্যে একটা মস্ত তফাতও রয়েছে। প্রথমটির মধ্যে কোনো সচেতন নিরবচ্ছিন্নতা ছিল না বললেই চলে; কোনোরকম উত্তরাধিকার-চেতনা বা মর্যাদার বোধ তো একেবারেই ছিল না। দ্বিতীয় উত্তরণটিব মধ্যে কিন্তু একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারা লক্ষ্য করা যায়। সিরিয়ার সংস্কৃতি, ইসলামী সংস্কৃতি, মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি, এবং বিশেষ করে রেনেসাঁস যুগের ইউরোপীয় সংস্কৃতি ধ্রুপদী গ্রীক সংস্কৃতির সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন বন্ধনে যুক্ত ছিল। একদিকে লিখিত প্রামাণ্য রচনা, অন্যদিকে প্রাচীনদের উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রবল বোধই সেই বন্ধনের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল। বস্তুত ধ্রুপদী ঐতিহ্যের মূল সূত্রটা কখনোই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে মুসলিম আর খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ই ধ্রুপদী যুগের প্রধান মনীষীদের অনেকের রচনা নিয়ে চর্চা করতেন। রেনেসাঁস যুগে এইসব এবং আরো অনেক রচনা মুদ্রিত গ্রন্থের মাধ্যমে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছয়।

একথা মনে করলে ভুল হবে যে ধ্রুপদী সংস্কৃতির প্রবাহ যে জায়গাতে এসে থেমে গিয়েছিল ঠিক সেই জায়গা থেকেই তাকে পুনরায় প্রবাহিত করা হলো। এমনও নয় যে ধ্রুপদী সংস্কৃতির শিখরচূড়া থেকে সে ধারাকে নতুন করে প্রবাহিত করা হলো। রেনেসাঁস যুগের মানুষ অবশ্য সেই ভুল ধারণাই পোষণ করত। সে কালে সে ভুল ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক; কিন্তু আজকের দিনে তা অমার্জনীয়। আসলে যা ঘটেছিল তা খুবই অন্যরকম, এবং তার গুরুত্ব অনেক বেশি। ধ্রুপদী সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকারের ভার যাতে পরবর্তী যুগের সভ্যতাগুলিকে পিষে না ফেলে তাব জন্য তাদের কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। গত অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, এমনকি পর্বাঞ্চলেও সে সংস্কৃতির চর্চা কোন নিম্ন মান স্পর্শ করেছিল। তা সত্ত্বেও বিপুল জ্ঞানেব সঞ্চয় রক্ষিত ছিল বইয়ের মধ্যে। পড়বার ইচ্ছা এবং দক্ষতা থাকলে যেকোনো লোকের পক্ষেই ঐসব বই থেকে সে জ্ঞান উদ্ধার করা সম্ভব ছিল। প্রথমে সিরিয়ানরা আর আরবরা, পরে মধ্যযুগের ধর্মশাস্ত্রীরা এবং রেনেসাঁস যুগের 'হিউম্যানিস্ট'রা ধাপে ধাপে পিছিয়ে গিয়ে সেই জ্ঞানভাণ্ডারের আদি গ্রীক উৎসগুলিকে খুঁজে বার করেন। যা দুর্বোধ্য তাকে প্রাচীন মনীষীদের পবিত্র এবং রহস্যপূর্ণ জ্ঞান বলে বিনা প্রশ্নে মেনে নেবার প্রলোভন বারংবার তাঁদের বিপথগামী করতে চেয়েছে। সে প্রলোভনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে এগোতে হয়েছে তাঁদের। প্রাচীন সেই জ্ঞানভাণ্ডারটিকে তাঁরা যে আয়ত্ত করতে এবং নবরূপ দিতে সমর্থ হন, সে কেবল তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রাণবন্ত বিকাশের দৌলতে। নবম শতাব্দীতে ইসলামী বিজ্ঞানচর্চার সূচনাপর্বে মননশীলতার উচ্ছ্বাস; দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানচর্চা; এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেনেসাঁস যুগের বিজ্ঞানচর্চা; —এইসব ঘটনার অভিঘাতেই প্রাচীন মনীষীদের রচনাবলীর পুনরাবিষ্কার ঘটে। অর্থাৎ ঐসব রচনার পুনরাবিষ্কারকে উক্ত ঘটনাবলীর কারণ না বলে পরিণাম বলাই সংগত।

এইসব অগ্রগতি আরো সহজসাধ্য হয়ে ওঠে এই কারণে যে প্রতিটি পর্বেই নবলব্ধ জ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রটি পুরোনো জ্ঞানের তুলনায় অনেক দূর প্রসারিত হয়। ভৌগোলিক এবং সামাজিক

উভয় দিক থেকেই ধ্রুপদী যুগের শেষ দিককার সংস্কৃতি ছিল সীমাবদ্ধ। সামাজিক দিক থেকে তা একান্তভাবেই উচ্চশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। মননগত উন্নাসিকতা সে সংস্কৃতিকে অতিরিক্ত বস্তুবিচ্ছিন্ন ও ভাষানির্ভর করে তুলেছিল। প্রায়-নিরক্ষর কারিগরদের কাছে ব্যবহারিক জ্ঞানের যে বিপুল ঐশ্বর্য বন্দী হয়ে পড়ে ছিল, উচ্চশ্রেণীভুক্ত পণ্ডিতরা তার কোনো খবরই রাখতেন না। পরবর্তী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো, কারুকর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং কারিগরদের সঙ্গে বিদ্বৎসমাজের এই বিচ্ছেদের অবসান। এই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে রেনেসাঁস পর্বে।

ভৌগোলিক দিক থেকে ধ্রুপদী সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ ছিল ভূমধ্যসাগর অঞ্চল ও তার পূর্বপ্রান্তীয় দেশসমূহে। এই অঞ্চলের এমন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ চরিত্র ছিল যে ভারতবর্ষ ও চীন প্রমুখ অন্যান্য প্রাচীন দেশের সংস্কৃতি, প্রকৌশল ও চিন্তাভাবনার সর্বজনীন ভাণ্ডারটিকে ব্যবহার করার পথে তা বাধা সৃষ্টি করে। রোম সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার ফলে সে বাধা অপসারিত হয়, যোগাযোগের এবং নানা ধরনের প্রভাব বিনিময়ের পথ সুপ্রশস্ত হয়।

5. মহম্মদ ও ইসলামের অভ্যুদয়

বাধা-অপসারণকারী এইসব নেতিবাচক ঘটনার পাশাপাশি এক ইতিবাচক ঘটনাও অল্পকাল পরেই ঘটে। সেটি হলো : নতুন এক বিশ্বধর্মের উদয় ও ব্যাপক প্রসার। ভাষা, ধর্ম আর শাসনব্যবস্থার যেসব প্রাচীর সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিটি সংস্কৃতিকে আপন অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল, সহসা তা ভেঙে পড়ল। সিন্ধুনদ থেকে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল অঞ্চলে, প্রাচীন সভ্যতাগুলির প্রায় সমগ্র ক্ষেত্র জুড়ে এই ঘটনা ঘটল। মহম্মদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ইসলামের অভ্যুদয়ের নির্দিষ্ট চরিত্রটিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল ঠিকই, তবু সে অভ্যুদয় মোটেই ব্যাখ্যাতীত কোনো ঘটনা নয়, পুরোপুরি অনন্যও নয়। রোম সাম্রাজ্যের অবক্ষয় রোম সাম্রাজ্যের মর্যাদাকে স্পর্শ করেনি; সাম্রাজ্যের পতনের পরেও তার মর্যাদা বহুকাল বজায় ছিল। জনপ্রিয় যে খ্রিস্টধর্ম ধীরে ধীরে রোম সাম্রাজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, সাম্রাজ্যের অবক্ষয় তার প্রভাবকেও স্পর্শ করেনি। বস্তুত চার্চের এবং খ্রিস্টীয় ধর্মমতের গণ্ডি ছাড়িয়ে সে প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। উত্তর ইউরোপে অন্য কোনো সংস্কৃতির প্রভাব না থাকায়, এবং রোম সাম্রাজ্য সম্বন্ধে ভয় বহুকাল আগেই কেটে যাওয়ায় সে অঞ্চলের মানুষ খ্রিস্টধর্মকেই ববণ করে নেয়। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থাটা ছিল অন্যবকম। সে অঞ্চলের মানুষের কাছে খ্রিস্টধর্ম এক অপরিচিত, বৈরিভাবাপন্ন বা অত্যাচারী সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। অপরদিকে খ্রিস্টধর্মের অন্তর্বস্তু মননগত দিক থেকে এত সুসংবদ্ধ এবং আবেগগত দিক থেকে এত মর্মস্পর্শী ছিল যে তার পাশে প্যারস্যের সরকারি জরথুস্ট্রবাদ কিংবা আরব ও আফ্রিকার উপজাতীয় ঠাকুরদেবতাদের আবেদন খুবই ম্লান হয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মহাপুরুষদের বাণীর ভিত্তিতে নতুন নতুন ধর্ম সংশ্লেষণের পথ প্রশস্ত হয়। সেইসব নতুন ধর্ম ছিল জনভিত্তিক। চার্চের কাছে সরাসরি নতি স্বীকার না করে, চার্চের মতবাদ পুরোপুরি স্বীকার না করে, খ্রিস্টধর্মের যতখানি গ্রহণ করা সম্ভব সেটুকু গ্রহণ করার জন্য তারা উৎসুক ছিল।

এই ধরনের সংশ্লেষণের প্রথম প্রয়াস পান মানি, তৃতীয় শতাব্দীতে। তাঁর সে প্রয়াস সীমিত কিন্তু স্থায়ী ফল লাভে সমর্থ হয়। মানি দাবি করেন যে জরথুস্ট্র আর যিশুখ্রিস্টের পরে তিনিই হচ্ছেন তৃতীয় এবং শেষ ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মহাপুরুষ। তিনি এই বার্তা প্রচার করেন যে কারা অনন্ত

মুক্তি অর্জন করবে তা ঈশ্বর আগে থেকেই স্থির করে রেখেছেন: মুক্তি *নিয়তি-নির্দিষ্ট।* মুক্তিলাভের অধিকারী ঐ ব্যক্তিদের যারা সেবা করবে, ইহজগতে তারা সান্ত্বনা লাভ করবে। 276 সাল নাগাদ মানি শহিদ হন। পারস্যে তাঁর অনুগামীদের ওপর অত্যাচার চলে। তবু তাঁদের প্রভাব পূর্বে চীনদেশ থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমে প্রভঁস্ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। তাঁদের কোনো কোনো মত, বিশেষ করে নিয়তি-নির্দিষ্ট মুক্তির ধারণাটি, সেন্ট অগাস্টিন মারফত খ্রিস্টধর্মে অনুপ্রবেশ করে। পরে ক্যালভিন-বাদের মধ্যে ঐ ধারণার পুনরুদয় ঘটে। মানি-পন্থা ছেড়ে যাঁরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে সেন্ট অগাস্টিন-ই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

মহম্মদ তাঁর সংশ্লেষিত ধর্ম সংস্থাপনের প্রয়াস চালান 622 থেকে 632 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। আরবরা ততদিনে প্রাণবন্ত এবং প্রসারণশীল হয়ে উঠেছিল। দুর্বল ও বহুধাবিভক্ত রোমান ও পারসিক সাম্রাজ্য ছাড়া আর কোনো বাধা মহম্মদের সামনে ছিল না। সুতরাং মহম্মদের সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি। একক প্রয়াসে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেন, আজও তা অবাক করে দেয়। প্রাচীন উপজাতীয় ঠাকুরদেবতাদের বিসর্জন দিয়ে মহম্মদ এক-ঈশ্বরের—আল্লার—উপাসনা প্রবর্তন করেন। সকল মানুষকে ভ্রাতৃভাবে আহ্বান করে ইসলাম, ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যপালনীয় খুবই সুনির্দিষ্ট কিন্তু সরল কিছু আচারবিধির প্রবর্তন করে। ইসলামী ধর্মতত্ত্বও এক নিতান্ত সরল একেশ্বরবাদে রূপ নেয়। ধর্মবিশ্বাসীদের সামনে যে সুনিশ্চিত বেহেস্তের ছবি তা তুলে ধরে তা অতিশয় বাস্তব। এই সমস্ত কিছু কোরান নামক এক কাব্যময় গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়। কোরান কেবল অনুপ্রেরণার এক আকরই নয়, ইসলামী আচারবিধি, নৈতিকতা এবং আইনের সংহিতাও বটে। ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকল মুসলমান এই কোরানকে মানতেন—এবং মানেন।

ইসলামে কোনো ধর্মমন্দির বা যাজকের স্থান ছিল না, ছিল কেবল সর্বসমক্ষে উপাসনা করার সভা বা 'মসজিদ'; আর ছিলেন কোরান-পাঠের ভারপ্রাপ্ত *'ইমাম'।* এই ইমামরা ছিলেন একাধারে ধর্মপ্রচারক ও আইন-ব্যাখ্যাতা। ইসলাম প্রথম থেকেই লিপিবদ্ধ ধর্ম হিসেবে রূপ ধারণ করে। আজও পৃথিবীর সর্বত্র কোরান মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গণ্য হয়। খলিফাকে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মহাপুরুষের, অর্থাৎ মহম্মদের,পরম-সম্মানিত উত্তরাধিকারী মনে করা হতো। প্রথম প্রথম এই খলিফাই হতেন রাজ্যের শাসক। তবে ইসলাম ধর্মের শক্তি এই শাসনকর্তৃত্বের মধ্যে নিহিত ছিল না, ছিল সুপরিব্যাপ্ত ভক্তমণ্ডলীর গভীর বিশ্বাসের মধ্যে। প্রথম দিকে আদি ইসলামী ধর্মীয় রাজ্যের রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারাটি রোম সাম্রাজ্যের শেষ দিককার কিংবা বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের ছাঁদের সঙ্গেই তুলনীয় ছিল। সেই একই চিত্র এখানেও প্রকট হয় : ধনবান, বিলাসী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, একের পর এক ষড়যন্ত্রে বিভক্ত রাজসভা উত্তরোত্তর তার দেহরক্ষী-বাহিনীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সেই বাহিনী গঠিত হয়েছিল বিদেশী, প্রধানত তুর্কী, ক্রীতদাসেদের দ্বারা। ফলে প্রথম দুশো বছর পরেই ইসলামী শাসন বহুসংখ্যক সামন্ত রাজ্যে খণ্ডবিভক্ত হয়ে পড়ে। পরে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রের যাযাবরেরা, এমনকি অসংগঠিত এবং পরস্পর-বিবদমান 'ক্রুসেডারে'রাও অতি সহজে এইসব সামন্তরাজ্য আক্রমণ করে। এই ইসলামী অপশাসনের বিপরীতে ইসলাম ধর্মের মূল কিন্তু জনগণের একেবারে গভীরে প্রোথিত ছিল। ফলে এত সব পরাজয়ের ধাক্কা সামলেও ইসলাম ধর্ম আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়। উত্তরাঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম যেমন বিজয়ীদেরই ধর্মান্তরিত করে নিয়েছিল, ইসলামও তা-ই করল। এশিয়া ও আফ্রিকার সুবিশাল এলাকা জুড়ে তার প্রসার ঘটে। এই অঞ্চলে তা এক সুবদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে তোলে। সে সংস্কৃতি আজও বজায় রয়েছে, যদিও আজ আর তা প্রগতি-সহায়ক নয়।

ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছিল আচম্বিতে। 632 সালে মহম্মদের মৃত্যুর পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁর অনুগামীদের সৈন্যবাহিনী রোমান আর পারসিক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। সেই সময় থেকে বহু বছর ধরে ইসলাম অপ্রতিবোধ্য শক্তি অর্জন করে। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই তাদের শাসন মধ্য এশিয়া থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এশিয়া মাইনরের অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমটি বাদ দিলে, আফ্রিকা ও এশিয়ার রোম-শাসনাধীন রাজ্যগুলি সবই তাদের অধীনে চলে আসে। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সমগ্র ভূভাগটি তারা দখল করে—মধ্য এশিয়া পেরিয়ে একেবারে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত। সেই সময় থেকে এই সুবিস্তীর্ণ এলাকার অধিকাংশেই এক অভিন্ন সংস্কৃতি, অভিন্ন ধর্ম এবং অভিন্ন লিখিত ভাষা প্রচলিত হয়। কয়েক শতাব্দী জুড়ে এই অঞ্চলের শাসনব্যবস্থাও অভিন্ন ছিল এবং অবাধ বাণিজ্য চালু ছিল। ধর্ম এবং তীর্থযাত্রার কল্যাণে মরক্কো থেকে শুরু করে চীন পর্যন্ত পণ্ডিত আর কবিদের অবাধ যাতায়াত আরো অনেক বছর ধরে অক্ষুণ্ণ থাকে।

আরব নবজাগরণ

এর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ সংস্কৃতিতে ও বিজ্ঞানে বিপুল উদ্দীপনা জাগল। আরবরা যে এই প্রথম সভ্য হয়ে উঠল তা নয়। এর আগেই তারা তাদের নিজস্ব শহর গড়ে তুলেছিল, রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় বাণিজ্য-সংগঠনেও তাদের এক অপরিহার্য ভূমিকা ছিল। এবার এমন অনায়াসে যে তাবা বিভিন্ন অঞ্চল দখল কবে নিতে পারল, তা থেকে বোঝা যায় যে স্থানীয় অধিবাসীদের সক্রিয় সম্মতি নিয়েই তারা ভূমধ্যসাগর এলাকার নাগরিক সভ্যতাকে অধিগ্রহণ করেছিল। এই এলাকার বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা প্রায় কেউই রোম সাম্রাজ্যের সরকারি প্রশাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করতে রাজি ছিলনা। কেননা একের পর এক করের বোঝা বাড়ানো, আর উত্তরোত্তর অপটু হয়ে ওঠা ছাড়া সে সবকারের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব ছিলনা। রোম সাম্রাজ্যের এশীয় এবং আফ্রিকীয অংশের অধিবাসীরা অধিকাংশই বিভিন্ন বিদ্রোহী খ্রিস্টান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল; খ্রিস্টধর্ম রোম সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্ম হয়ে ওঠায় এদের প্রতিরোধ-সংগ্রামের ক্ষতি বই লাভ হয়নি। কট্টর খ্রিস্টান রোম সম্রাট অপেক্ষা মুসলিম খলিফাদের অধীনে এদের উৎপীড়িত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম ছিল।

বড়ো বড়ো বণিক আর কর্মকর্তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা ছাড়া কোনো অঞ্চলের বা নগরের স্থানীয় অর্থনীতির আর কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাইত না আরবরা। দামাস্কাসের ওমাইয়াদ খলিফা-সরকারের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাত গ্রীক-কর্মকর্তারা, গ্রীক ভাষায়। অর্থাৎ বিশেষভাবে ইসলামী আর্থব্যবস্থা বলে কিছু ছিলনা। ইসলামী শাসনে ধ্রুপদী যুগের শেষ পর্বের নাগরিক অর্থনীতিই চালু রইল—কেবল তার সামরিক কর্তৃত্বটা বিশুদ্ধ আরব বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের জন্যে সংরক্ষিত রইল। পরে সেটাও আর থাকল না; ঠিক রোমেরই মতো, এখানেও ক্ষমতাশালী যে কোনো দুঃসাহসী লোকই সামরিক কর্তৃত্ব দখল করে নিতে পারত। দাসপ্রথা উঠে গেল না; তবে দাসেদের সরবরাহ কমে আসায় প্রধানত গার্হস্থ্য কাজেই তাদের নিয়োগ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। ক্রীতদাস-দলকে দিয়ে যেখানে উৎপাদনের কাজ করানো হতো সেখানে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। পারস্য উপসাগর অঞ্চলের সোরা উৎপাদন-কেন্দ্রে নিগ্রো জাঞ্জ-দের বিদ্রোহ প্রচণ্ডতার দিক থেকে রোমের শাসনাধীন স্পার্টাকাস-পন্থীদের বিদ্রোহের সঙ্গেই তুলনীয় ছিল। জমি চাষ কবত *রায়ত* রা, যারা ছিল কার্যত ভূমিদাস। এদের ওপর বিপুল করের বোঝা চাপানো হতো। মাঝে মাঝে এই রায়তরাও বিদ্রোহ করত। সাম্যবাদী 'কর্মট'-গোষ্ঠীর বিদ্রোহীরা শতাধিক বছর ধরে আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

বাণিজ্য আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠায় বণিকদের গুরুত্ব ধ্রুপদী যুগের শেষপর্বের তুলনায় বেড়ে উঠল। বস্তুত ইসলামী ঐক্য বিশেষভাবেই বাণিজ্যের সহায়ক হয়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের শেষ দিককাব অশান্তিময় পরিস্থিতিতে বাণিজ্যের যে বিশাল ক্ষেত্রটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাকে নতুন করে সক্রিয় করে তোলে ইসলামের এই ঐক্য, আবার একই সঙ্গে সে-ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত ও বিকেন্দ্রীভূতও করে। কর্ডোবা থেকে বুখারা পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম-অধিকৃত সমগ্র অঞ্চলে এমন কোনো একক কেন্দ্র ছিল না যা গোটা অঞ্চলের অর্থনীতির ওপর প্রাধান্য বিস্তার ক'রে তাকে শুযে নিত। রোম সাম্রাজ্যে রোম কিন্তু ঠিক সেই কাজটাই করত। এক্ষেত্রে মক্কা শুধুই ধর্মীয় কেন্দ্র রূপে বিরাজ করত; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে নয়। এই পরিস্থিতিতে অ্যালেকজান্ড্রিয়া, অ্যান্টিওক এবং দামাস্কাসের মতো পুরোনো শহর তো 'নূতন প্রাণ' লাভ করলই, উপরন্তু ঐ একই ছাঁচে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠল সর্বত্র। বিশেষ করে কায়রো, বাগদাদ বা কর্ডোবা-র মতো মস্ত রাজধানী-শহর এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সব শহরের মধ্যে নিয়তই যোগাযোগ ঘটত। বিভিন্ন শহরে উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে দিয়ে একদিকে বাণিজ্য অন্যদিকে প্রকৌশলগত উন্নতির এক সুদৃঢ় বনেদ তৈরি হয়।

ধ্রুপদী বিজ্ঞানের নবজন্ম

মননচর্চার দিক থেকেও ধারাবাহিকতার খুব একটা ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রথম দিকে মানবচিন্তার ওপর ইসলামের প্রভাব খ্রিস্টধর্মের মতো অতটা শ্বাসরোধী হয়নি—যদিও পরে অবস্থাটা বদলে যায়। আসলে ইসলামের অভ্যুত্থান যখন ঘটে তখন মূর্তিপূজার পেগ্যানপন্থা বা গ্রীক দর্শন ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আর আগের মতো বিপজ্জনক ছিল না। ফলে দেশবিজয় নিয়ে একশো বছর ধরে ব্যস্ত থাকার পর ইসলামী নেতারা নিজেরাই বিপুল আগ্রহে প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞানভাণ্ডারটির সন্ধানে ব্রতী হলেন। শুধু জ্ঞানভাণ্ডারই নয়, গ্রীক সংস্কৃতির অন্যান্য দিকগুলোকেও তাঁরা কোরান-নির্দেশিত গণ্ডির মধ্যে যতদূর সম্ভব আয়ত্ত করে নিতে উৎসাহী হলেন। ইসলামের ওপর এই সব বিদেশী প্রভাব যেসময় পড়ে ঠিক সেইসময়েই বাগদাদের ওমাইয়াদ রাজবংশের পতন ঘটে। 749 খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আসেন আবাসিদ্-রা। এঁরা নিজেরা পারসিক না হলেও পারসিক সমর্থনের ওপরে নির্ভর করতেন। সুপ্রাচীন সংস্কৃতির অধিকারী পারসিক জনগণের ঐতিহ্যাগত জ্ঞানবিজ্ঞানকে এঁরা অর্গলমুক্ত করেন। নতুন গড়ে-ওঠা রাজধানী বাগদাদ হয়ে ওঠে পারসিক, ইহুদি, গ্রীক, সিরিয় এবং অন্যান্য দূরদেশ থেকে আগত পণ্ডিতদের মিলনক্ষেত্র। বাগদাদ আর জুন্দিশপুরেই গ্রীক বিজ্ঞানের আকরগ্রন্থগুলির আরবী অনুবাদের কাজ শুরু হয়। প্রধানত মূল রচনার সিরিয় অনুবাদ থেকে, কখনো কখনো মূল গ্রীক থেকে, সে অনুবাদ করা হয়। গোড়া থেকেই খলিফারা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই কাজের ব্যয় বহন করতেন। খলিফা আল-মামুন এই উদ্দেশ্যে 'দার্ এল্ হিখ্মা' নামে এক অনুবাদ-সংস্থা স্থাপন করেন। বিখ্যাত দুই পণ্ডিত হুনাইন ইব্ন্ ইশাক এবং থাবিট ইব্ন্ খুরা এই সংস্থাতেই অ্যারিস্টটল ও টলেমির অধিকাংশ রচনার আরবী অনুবাদ করেন। তাঁরা অনেক পারসিক ও ভারতীয় গ্রন্থও অনুবাদ করেন। কিন্তু লাতিনে অনুবাদ না হওয়ায় এসব বইয়ের খবর আর পশ্চিমে গিয়ে পৌঁছায়নি।

অনুবাদিত বইগুলো প্রায় সবই ছিল বিজ্ঞান ও দর্শনের। সেটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ গ্রীকদের ইতিহাস নিয়ে আরবদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। গ্রীক নাটক আর কবিতারও খুব একটা প্রয়োজন ছিল না তাদের কাছে, কারণ তাদের নিজস্ব পৌরাণিক কল্পকথার ভাণ্ডারটি রীতিমতো সমৃদ্ধ ছিল, তাদের কাব্যচর্চার ধারাটিও ছিল সজীব। ইসলামী জ্ঞানচর্চার ধারা

এইভাবে একমুখী হয়ে ওঠে। ফলে যখন সে ধারা পশ্চিমকে স্পর্শ করে তখন তা প্রথমে কেবল বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। পরে রেনেসাঁসের সময় মানবিকী চর্চার ধারাটিকে পশ্চিম প্রধানত গ্রীক ও লাতিন লেখকদের মূল রচনা থেকে পুনরুদ্ধার করে। এইভাবে বিজ্ঞানচর্চা আর মানবিকী বিদ্যাচর্চার দুটি ধারা দুই স্বতন্ত্র খাতে আধুনিক সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রবেশ করে। বিজ্ঞানের চর্চার সঙ্গে মানবিকী চর্চার যে বিরোধ আজও রয়ে গেছে, উক্ত ঘটনা তার জন্যে অনেক পরিমাণে দায়ী।

6. ইসলামী বিজ্ঞান

জ্ঞানের এই ভাণ্ডারে ইসলামী পণ্ডিতদের নিজেদের অবদানের মূল্য ঠিক কতটা তা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তাঁদের হাতে গ্রীক জ্ঞানচর্চা নবজীবন লাভ করে; তাঁরা যে নিছক অপরিবর্তিত আকারে সে জ্ঞান গ্রহণ করেছিলেন তা নয়। প্রাচীন প্রাচ্য থেকে আহরিত বিদ্যা নিয়ে গ্রীকরা যেভাবে চর্চা করেছিল এক্ষেত্রেও প্রক্রিয়াটা অনুরূপ। তবে গ্রীক বিদ্যাচর্চার সঙ্গে ইসলামী বিদ্যাচর্চার সম্পর্কটা অনেক প্রত্যক্ষ এবং স্বীকৃত। প্রাচীন গ্রীক পুরাণকথার প্রতি ইসলামী পণ্ডিতদেব কোনো আবেগগত সহমর্মিতা না থাকায় তাঁরা গ্রীক পণ্ডিতদেব তুলনায় অনেক নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব নিয়ে গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করতে পেরেছিলেন। ইসলামী বৈজ্ঞানিক রচনা পাঠ করলে তার যুক্তিশাসিত পরিচ্ছন্নতা দেখে অবাক হতে হয়; ঐ পরিচ্ছন্নতাই তো আধুনিক বিজ্ঞানের চরিত্রলক্ষণ বলে স্বীকৃত। অপরদিকে ধ্রুপদী যুগের শেষদিককার গ্রীক দর্শনের অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী দিকগুলোও তাঁদের সমানে—হয়তো বা বেশি করে—আকৃষ্ট করেছিল। তাঁরা বিশেষ করে নব্যপ্লেটোবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই মতবাদের সঙ্গে অ্যাবিস্টটলবাদেব পার্থক্য তাঁরা প্রথমে বুঝতে পারেননি, কারণ অ্যারিস্টটলের রচনাবলীর মধ্যে *অ্যাবিস্টটলের ধর্মতত্ত্ব* এবং *গোপন কথাব গোপন কথা*-র মতো জাল রচনা ঢুকে গিয়েছিল। এই অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী বিভ্রান্তির অনেকটাই ইসলামী পণ্ডিতদের মারফত মধ্যযুগের খ্রিস্টান ধর্মশাস্ত্রীদের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হয়। আরেকটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এই যে ইসলামী পণ্ডিতরা গ্রীকদের রচনাকে বেদবাক্য জ্ঞানে সমীহ করতেন, বিশেষত প্লেটো আর অ্যারিস্টটলের রচনাকে। এই অতিভক্তির ভূত কেবল ইসলামী বিজ্ঞানকেই নয়, গোটা মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানকেই তাড়া করে বেড়িয়েছে। একদিকে প্লেটো-কল্পিত সংখ্যা-জাদু, অন্যদিকে অ্যারিস্টটল-কথিত গুণাত্মক ক্রমে বিভক্ত স্তরবিন্যাস—এ দুয়ের সম্মিলনে উদ্ভট সব হিংটিংছটের সৃষ্টি হয়, যা থেকে ইসলামী বিজ্ঞান কোনোদিনই মুক্ত হতে পারেনি।

অথচ লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে আদি যুগের বিজ্ঞানের প্রধান যে দুই রহস্যাচ্ছন্ন অতীন্দ্রিয়বাদী রূপ, অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র আর অপরসায়ন, তা নিয়ে আরবরা যথেষ্ট মাতামাতি করা সত্ত্বেও আল্-কিন্দি, রাজেস্ এবং আভিসেন্না প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিজ্ঞানীরা সুস্পষ্ট ভাষায় ঐসব মেকি-বিজ্ঞানের অতিরঞ্জিত দাবিগুলোকে খারিজ করে দিয়েছিলেন।

ধ্রুপদী যুগের শেষ দিকে বিজ্ঞানীদের যে সামাজিক মর্যাদা ছিল তার সঙ্গে ইসলামী বিজ্ঞানচর্চার আদিযুগে বিজ্ঞানীদের সামাজিক অবস্থানের মূলত কোনো তফাত ছিলনা। আবাসিদ রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অল্প কিছুকাল—741 থেকে 861 পর্যন্ত—বিজ্ঞানচর্চাকে যেভাবে উৎসাহিত করা হয় তা অ্যালেকজান্ড্রিয়ার সংগ্রহশালার আদি যুগের পর আর দেখা যায়নি। ঐ পর্বে আল-মনসুর, হারুন-আল্-রশিদ, আল-মামুন, এমনকি ঘোর ভক্ত আল-মুতাওয়াকিল প্রমুখ খলিফা বিজ্ঞানকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করেন।

কার্ডোবা-তে ওমাইয়াদ খলিফাদের শাসনকালে (928-1031) এবং স্পেন আর মরক্কোয় তৎপরবর্তী ছোটো ছোটো আমীরদের শাসনকালেও বিজ্ঞানকে বিশেষভাবে মদত দেওয়া হয়। এমনকি মুসলিম সংস্কৃতির অবক্ষয়ের যুগেও সাল্যাদিন, গজনি-র মামুদ, সমরকন্দের উলুঘ বেগ প্রমুখ উচ্চাশী শাসকরা বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষণা করে গর্ব বোধ করতেন। শুধু শাসকরা নয়, ধনী বণিক এবং কর্মকর্তারাও বিজ্ঞানীদের ভরণপোষণ করতেন, কেউ কেউ বিজ্ঞান নিয়ে মাথাও ঘামাতেন। বার্মিসিডিস্-দের (প্রায় 750-803) পারসিক পরিবারটি কিংবা মুসা-দের (প্রায় 850) তিন ভাই এর উদাহরণ। ইসলামী বিজ্ঞানচর্চার এই ধর্মনিরপেক্ষ ও বাণিজ্য-নির্ভর পটভূমিটি মধ্যযুগের খ্রিস্টান দুনিয়ার বিজ্ঞানচর্চার পটভূমি থেকে খুবই স্বতন্ত্র; কেননা খ্রিস্টান দুনিয়ায় সে পটভূমি প্রায় পুরোপুরিই চার্চ-নিয়ন্ত্রিত ছিল। ইসলামী বিজ্ঞানের এই পটভূমির সঙ্গে বরং রেনেসাঁস যুগের মিল রয়েছে। রাজসভার এবং ধনী ব্যক্তিদেব এই পৃষ্ঠপোষণা ছিল বলেই ইসলামী ডাক্তার আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা কবতে ও পযবেক্ষণ চালাতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, ধর্মান্ধ লোকেবা যখন এই বলে সোরগোল তুলল যে এইসব দর্শনের চর্চা ভক্তদের ভক্তি টলিয়ে দেবে, তখন ঐ পৃষ্ঠপোষণাই বিজ্ঞানচর্চাকাবীদের রক্ষা করে। তবে এই পৃষ্ঠপোষণা চিরস্থায়ী হয়নি, বলাই বাহুল্য।

রাজা-রাজরা, ধনবান বণিক এবং অভিজাতদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে যেমন বিজ্ঞানেব তাৎক্ষণিক লাভ হলো, তেমনি ঐ কারণেই অবশেষে তার ক্ষতিও হলো। কারণ, যত দিন গেল ততই বিজ্ঞান সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। লোকের ধাবণা হলো, বড়োলোকেদের এই সব পণ্ডিত উপদেষ্টারা নিশ্চয়ই কু-মতলব আঁটছে। ফলে বিজ্ঞানীরা অতি সহজেই ধর্মান্ধ উন্মত্ততার শিকার হলেন। যতদিন শহরগুলোর এবং বাণিজ্যের সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন সংস্কৃতিবান এক বর্ধিষ্ণু মধ্যশ্রেণীব অস্তিত্ব ছিল। এঁরা আলাপ-আলোচনা আর অগ্রগতিব সুনিশ্চিত উপায়রূপে বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহী ছিলেন। এই শ্রেণী ভেঙে পড়ায় বিজ্ঞানীরা ক্রমশ ভ্রাম্যমান পণ্ডিতে পবিণত হলেন, স্থানীয় রাজবংশের পতন-অভ্যুদয়ের সঙ্গে তাঁদের ভাগ্য জড়িয়ে গেল। এঁদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ইবন সিনা (বা আভিসেন্না)-ও কোনো সুনিশ্চিত আশ্রয় পাননি। পারস্য এবং মধ্য এশিয়াব একাধিক সুলতানেব অধীনে তিনি কাজ করেন, কখনো ডাক্তার, কখনো উজীর রূপে। হামাদান-এ বিদ্রোহীরা তাঁর শিরশ্ছেদের দাবি জানালে অসুস্থতার ভান করে তিনি পালিয়ে যান। শেষ বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ ইবন খাল্দুন (1332-1406) ছিলেন সেভিল থেকে আগত এক উদ্বাস্তু। যখন যেখানে সুবিধে হতো, সেখানে কাজ করতে বাধ্য হতেন তিনি। স্পেনের 'নিষ্ঠুর পেদ্রো' এবং সিরিয়ার তৈমুর লঙেব সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলেন খালদূন; এঁবা উভয়েই তাঁকে নিয়োগ কবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

ইসলামী বিজ্ঞানের চরিত্র

ইসলামী বিজ্ঞানীরা মোটের ওপব ধ্রুপদী যুগের শেষ পর্বেব বিজ্ঞানেব ধবনটিকেই গ্রহণ ও প্রণালীবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। সে ধরনটিকে উন্নত করে তোলার বাসনা তাঁদেব ছিলনা বললেই চলে—কোনোরকম বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের ইচ্ছা তো একেবারেই ছিলনা। আল-বিরুনির কথায়: 'প্রাচীনকালের বিদ্বজ্জনেরা যেসকল বিষয় লইয়া কর্ম করিয়াছেন, আমাদিগের কেবল তাহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত এবং সেই সীমার মধ্যে যে সকল ব্যাপারকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করা সম্ভব তাহা করা উচিত।' কেউ কেউ বিশেষ কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৈপুণ্য অর্জন করলেও বিজ্ঞান তখন এক ঐক্যবদ্ধ সমগ্ররূপেই বিরাজ করত। সে ঐক্য বিধান কবত দর্শন। বিজ্ঞানের প্রধান দুই ক্ষেত্র ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান আর চিকিৎসাশাস্ত্র। উভয়ের মধ্যে ঐক্য বিধান

করত মোটের ওপর সর্বস্বীকৃত এক জ্যোতিষশাস্ত্র। এই জ্যোতিষশাস্ত্রই বাইরের বৃহৎ মহাবিশ্ব বা *macrocosm*-এর সঙ্গে মানুষের অন্তরের অণুবিশ্ব বা *microcosm*-এর যোগসূত্র হিসেবে বিবেচিত হতো। খাঁটি দর্শনচর্চাকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো, যেহেতু তার সঙ্গে কোরানকে মেলানো কঠিন। ধর্মপ্রাণ মুসলিম পণ্ডিতরা সে কাজ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কট্টরপন্থীরা তাতে মোটেই খুশি হয়নি। *দার্শনিকদের বিনাশ* নামক বইতে আল-গাজালি (1058-1111) ঐ প্রয়াসের নিরর্থকতা সম্বন্ধে সাবধান করে দেন। বহুনিন্দিত আভেরোএস, যাঁর আসল নাম ইবন্ রুশ্দ্ (1129-98), *বিনাশের বিনাশ* নামে এক ওজস্বী বই লিখে এই অভিযোগের উত্তর দেন। তবু কট্টরপন্থীদের ঐ সতর্কবাণীকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি। ফলে 'দুই সত্যে'র ইসলামী মতই চালু হয়ে যায়—উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্য এবং নিম্নতর যুক্তিগ্রাহ্য সত্য। এই মত অতীতে গ্রীক খ্রিস্টানদের চিন্তাধারাকে নিষ্ফলা করে তুলেছিল; ইসলামী দেশগুলোতেও পরিশেষে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। মুসলিম ধর্মের প্রকৃত গ্রহণযোগ্য উন্নত দিকগুলির সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়াস অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সম্ভবত সেই কারণেই পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে ইসলামী দেশগুলোতে বিজ্ঞানচর্চার ধারাটি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়, ইসলামী সংস্কৃতি ও মননচর্চা স্থবির হয়ে পড়ে।

নবম, দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে যখন ইসলামী বিজ্ঞান উচ্ছ্বসিতভাবে বিকাশ লাভ করছিল, তখন কিন্তু এইসব ভাবনা অতটা প্রবল হয়ে ওঠেনি। বরং এরকমই যেন মনে হয় যে মহত্তম বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই তখন ধর্মের অস্তিত্বকে খানিকটা তাচ্ছিল্যভরে সহ্য করে নিয়েছিলেন, জাগতিক জ্ঞানচর্চার প্রয়াসের মধ্যে ধর্মকে নাক গলাতে দেননি। সর্ববিদ্যা-সংগ্রহের ঐতিহ্যও বিজ্ঞানের ঐক্যকে আরো সুবদ্ধ করে তুলেছিল। ঐ ঐতিহ্যের অনুসরণে শ্রেষ্ঠ ইসলামী লেখকদের প্রত্যেকেই, এমনকি কয়েকজন গৌণ লেখকও, নানাবিধ বিষয়কে একত্রিত করে সর্বগ্রাহী গ্রন্থ রচনা করেন। আল-ফার্গানির (অথবা আল ফ্রাগানুস, মৃত্যু প্রায় ৪50) *জ্যোতির্বিজ্ঞান সহায়িকা*, রাজেস্-এর (৪65-925) *হাউই*, *লিবের কনটিনেন্স*, আভিসেন্নার *কানুন*, আভেরোএস-এর *কলিজেট* ('কুলীয়াৎ') প্রমুখ চিকিৎসাশাস্ত্র-বিষয়ক আকরগ্রন্থ এর নিদর্শন। রাজেস্, আভিসেন্না এবং আভেরোএস্-এর এই বিখ্যাত গ্রন্থগুলি এমনকি সতেরো শতকেও ইউরোপে পাঠ্যপুস্তক রূপে পড়ানো হতো।

নানা বিদ্যাকে একত্রিত করার এই সর্বগ্রাহী প্রবণতাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ এরই সুবাদে অন্যান্য দেশ থেকে জ্ঞান আহরণের মধ্যে দিয়ে ইসলামী বিজ্ঞান ধ্রুপদী যুগের বিজ্ঞান অপেক্ষা এক ধাপ এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়। প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় যুগ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত মেসোপটেমিয়ার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক জ্ঞানচর্চার ধারাটিকে তা ব্যবহার তো করলই, উপরন্তু ভারতবর্ষের—কিছু পরিমাণে চীনেরও—সুপ্রাচীন জ্ঞানচর্চার ধারাটিকেও কাজে লাগাল।

গণিত

জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চাই হয়ে উঠল জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রীয় বিষয়। তার দার্শনিক এবং জ্যোতিষী তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে গণিত সম্বন্ধে নতুন করে আগ্রহ জেগে উঠল। তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানই ছিল কার্যত গণিতের ফলিত প্রয়োগের একমাত্র ক্ষেত্র। এর মধ্যে দিয়েই জ্যামিতি এবং গণনকার্য নিয়ে চর্চা বাড়ল। প্রধানত ব্যাবিলোনীয় এবং ভারতীয় প্রভাবে ইসলামী গণিতজ্ঞরা এই ক্ষেত্রেই সবচেয়ে অগ্রসর হন। সংখ্যাকে নানারকম প্রক্রিয়ার অধীন করার ব্যাপারটির সূত্রপাত ঘটেছিল গ্রীক গণিতচর্চার শেষ দিকে— ডায়োফান্টুস-এর হাতে। এই

ব্যাপারটির অনেক উন্নতি ঘটল এবার। হিন্দু সংখ্যা-পদ্ধতির অন্তর্গত বিপুল সংখ্যামালার প্রবর্তন এই উন্নতি ঘটাল। হিন্দুদের এই পদ্ধতিটি সিরিয়রা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছিল, কিন্তু বিশেষ ব্যবহার করেনি। বর্ণমালার আবিষ্কার লিখনপদ্ধতিকে যেভাবে বদলে দিয়েছিল, এই প্রকরণগত উদ্ভাবনটিও পাটীগণিতকে প্রায় সেইভাবেই প্রভাবিত করল। তার আগে অঙ্গুলিমেয় সংখ্যা অথবা অ্যাবাকাস-গণনযন্ত্রে গণনীয় সংখ্যা ছাড়া পাটীগণিতের অন্যান্য প্রক্রিয়া কেবল দুচারজন মহাপণ্ডিত ছাড়া আর কারো অধিগম্য ছিল না। সে ছিল এক মস্ত রহস্য। কিন্তু "আরবী" সংখ্যামালার প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে পাটীগণিত হয়ে উঠল ছেলেখেলা, তা গুদামের কেরাণীরও অধিগম্য হয়ে উঠল। এবার যেন তা গণতান্ত্রিক রূপ ধারণ করল। আরবরা আরো একটা কাজ করল: অজ্ঞাত রাশি নিয়ে গণনা করার পদ্ধতি নিয়ে একাধিক হিন্দু গণিতজ্ঞের রচনা তারা সংগ্রথিত করল। এই পদ্ধতিকেই আমরা বলি *algebra*-বীজগণিত। ইংরেজি শব্দটি এসেছে আল্-খোয়ারিজমি রচিত বিশাল সহায়িকাটির নাম থেকে—*হিসাব আল্-জাবর ও-আল্-মুকাবালা*, অর্থাৎ 'আল্-জাবর্' এবং 'আল্-মুকাবালা' পদ্ধতির মাধ্যমে সমীকরণ সমাধানের প্রণালী।* আরবরা *ত্রিকোণমিতি*-রও বিশেষ উন্নতি সাধন করে। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জরিপকার্য উভয় ক্ষেত্রেই ত্রিকোণমিতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

জ্যোতির্বিজ্ঞানে আরবরা গ্রীক ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করে চলল। টলেমি জ্যোতিষ্কলোকের যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিলেন তাকেই তারা বিনা বিচারে, কোনো মৌলিক অগ্রগতি সাধন না করেই মেনে নিল। টলেমির *আল্মাজেস্ট* নামক গ্রন্থটি তারা অনুবাদ করে। তবে তত্ত্বগত দিক থেকে কোনো কিছু সংযোজন না করলেও তারা প্রাচীনদের জ্যোতিষ্ক-পর্যবেক্ষণের ধারাটি অব্যাহত রাখল। বিশেষত ক্যাল্‌ডিয় নক্ষত্র-পূজারীদের শহর হারান-এর মানমন্দিরগুলোতে পর্যবেক্ষণ অব্যাহত থাকে একেবারে আব্বাসিদ-শাসনকাল পর্যন্ত। মুসলিমরা এ পর্যবেক্ষণে বাধা দেয়নি এইজন্যে যে তাদের ধারণা ছিল উক্ত নক্ষত্র-পূজারীরা কোরানোক্ত 'পবিত্র গ্রন্থোল্লেখিত জাতি' সাবিয়ানদের অন্তর্ভুক্ত। পর্যবেক্ষণের ধারা এইভাবে অব্যাহত থাকার ফল হয়েছিল এই যে পরে রেনেসাঁস যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ন-শো বছরের পর্যবেক্ষণের ফসল নিয়ে কাজ করতে পেরেছিলেন। তা যদি না হতো তাহলে যেসব অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ওপর আধুনিক বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোর আবিষ্কার হতে অনেক দেরি হয়ে যেত, হয়তো সেসব আবিষ্কার হতোই না।

ভূগোল

গ্রীকদের মতো ইসলামী বিজ্ঞানীদের কাছেও ভূগোল ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানেরই এক বিশেষ শাখা। তত্ত্বগতভাবে ইসলামী বিজ্ঞানীরা গ্রীক ভূগোলচর্চায় বিশেষ কিছু সংযোজন করতে না পারলেও ব্যবহারিক দিকে তাঁরা বিপুল অবদান রাখতে সমর্থ হন। তারই সুবাদে তাঁরা এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার আধুনিক ভূগোলের ভিত্তি রচনা করেন। এই সাফল্যের মূলে রয়েছে দুটি ঘটনা। এক, ইসলামী দুনিয়ার ব্যাপক বিস্তার ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকেন্দ্রীভবন—যার ফলে ফেজ থেকে আরম্ভ করে সমরকন্দ পর্যন্ত সর্বত্রই পণ্ডিত মানুষের দেখা মিলত। দুই, ব্যবসায়ীদের সুদীর্ঘ ভ্রমণ

* 'তিনি বীজগণিতে ঋণাত্মক রাশিদের চিহ্ন বদলাইয়া সমীকরণের এক দিক হইতে অপর দিকে লইয়া যাইবার এবং সমচিহ্নবিশিষ্ট রাশিদের যোগ দিবার পদ্ধতির নির্দেশ দেন। আরবী ভাষায় প্রথম পদ্ধতির নাম 'আলজেবর' এবং দ্বিতীয়টির নাম 'আলমুকাবালা'।' —সমরেন্দ্রনাথ সেন, *বিজ্ঞানের ইতিহাস* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ 126—অনু

এবং দেশদেশান্তর থেকে তীর্থযাত্রীদের মক্কা যাত্রা। ইসলামী চৌহদ্দির বাইরেও বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েন ব্যবসায়ীরা। আল্-মাসুদি-র (900-957) মতো কৃতবিদ্য ভ্রমণকারীরা রাশিয়া এবং মধ্য আফ্রিকা ও ভারত আর চীনের সর্বত্র গমন করেন। তাঁরা সেইসব ভ্রমণের যে সুশৃঙ্খল ও বাস্তবসম্মত বিবরণ রচনা করেন, তা মধ্যযুগের ইউরোপের ভূগোলবিদদের কল্পকথা আর আশ্চর্যবস্তুর কাহিনীর তুলনায় বহুগুণে উন্নত ছিল। আল্-বিরুনি তাঁর ভারত-বিষয়ক সুবিখ্যাত রচনায় ভারতের কেবল ভৌগোলিক বিবরণই দেননি, হিন্দুদের সমাজব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস ও বৈজ্ঞানিক কর্মকৃতিরও বিবরণ দেন। গুণমানের দিক থেকে তাঁর এই রচনা আঠেরো শতক পর্যন্ত দ্বিতীয়রহিত ছিল। ইসলামী ভূগোলচর্চা নিছক বর্ণনাত্মক ছিল না, পরিমাপ-ভিত্তিকও ছিল। মানচিত্র এবং তালিকা তৈরি করা হতো, নৌচালনে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার হতো। খলিফা আল্-মাসুম (প্রায় 430) এক ডিগ্রি অক্ষাংশের দুটি পরিমাপ নির্ধারণ করার নির্দেশ দেন। চীনের ই-শিং অবশ্য এ ব্যাপারে না জেনেই তাঁর পূর্বসূরী ছিলেন। ইউরোপে ষোলো শতকে ফের্নেল অক্ষাংশ মাপার কাজে সাফল্য অর্জন করার আগে পর্যন্ত এটিই ছিল এ ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ।

ইসলামী চিকিৎসাশাস্ত্র

ইসলামী জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতো ইসলামী চিকিৎসাশাস্ত্রও সরাসরি গ্রীকদেরই অনুসরণে অগ্রসর হয়। তবে ইসলাম বহু দেশে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় নতুন নতুন নানান রোগ ও ওষুধ সম্বন্ধে জ্ঞান সে ভাণ্ডারে সংযোজিত হয়। শুধু ইসলামী নয়, ইহুদি ডাক্তাররাও বহুবিধ অসুখ নিয়ে চর্চা করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা জলবায়ু, স্বাস্থ্যবিধান ও খাদ্যাভ্যাসের ফলাফল নিয়ে এবং রন্ধনকার্যের ব্যবহারিক কৌশল নিয়েও ভাবনাচিন্তা করতে ভোলেন নি। শাসক ও বণিকদের অধীনে কাজ করতেন বলে ডাক্তারদের সামাজিক মর্যাদা খুবই উচ্চ ছিল। তাঁদের মননশীলতার মানও ছিল খুব উচ্চাঙ্গের। রাজেস কিংবা আভিসেন্নার মতো ইসলামী ডাক্তারদের জ্ঞানের পরিধি ছিল বিরাট। জ্যোতিষী গণনাকার্যের সূত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেমন তাঁদের ব্যুৎপত্তি জন্মেছিল, তেমনি ঔষধ নির্বাচন ও তৈরি করবার প্রয়োজনে উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়নের চর্চাও তাঁরা করতেন। ইসলামী পণ্ডিতদের প্রায় সকলেই ছিলেন ডাক্তার, নিয়মিত ডাক্তারি করতেন তাঁরা; তাঁদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ধ্যানধারণার গঠনের পিছনে এই ঘটনাটার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। কিন্তু এই প্রভাবকে সচরাচর তেমন স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।

আলোকবিদ্যা

চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি শাখায় তখন খুবই উন্নতি হয়েছিল—সেটি হলো চক্ষুরোগ। সম্ভবত মরু এলাকায় এবং উষ্ণমণ্ডলীয় দেশে চোখের অসুখ বেশি হয় বলেই এই উন্নতি ঘটে। চোখের নানারকম গণ্ডগোলে শল্যচিকিৎসার প্রয়োগ করতে গিয়ে চোখের গঠন সম্বন্ধে নতুন করে আগ্রহ জেগে ওঠে। এরই ফলে প্রতিসরণ বা dioptrics সম্পর্কে প্রথম সত্যিকারের একটা ধারণা জন্মায়। স্বচ্ছ বস্তুর মধ্যে দিয়ে আলোর চলন সম্পর্কে নতুন যে ধারণা গড়ে ওঠে তারই সুবাদে আধুনিক *আলোকবিদ্যার* ভিত্তি রচিত হয়। চোখের মধ্যে যে লেন্স থাকে তার চর্চা থেকেই ছোটো জিনিসকে বড়ো করে দেখানোর জন্য এবং বিশেষ করে বৃদ্ধদের পড়বার সুবিধের জন্য প্রথমে স্ফটিকের ও পরে কাচের তৈরি লেন্সের ব্যবহার প্রচলিত হয়। চশমার মধ্যে লেন্স আঁটার কৌশল অবশ্য উদ্ভাবিত হয় আরো পরে। এ ব্যাপারে আলোচনার প্রথম সনিষ্ঠ প্রয়াস লক্ষিত হয় ইব্ন্ আল-হাইতাম বা আল-হাজেন-এর (প্রায় 1038) *আলোকবিদ্যার বিষয়পঞ্জী* নামক গ্রন্থে। মধ্যযুগীয় আলোকবিদ্যার যাবতীয় গ্রন্থই এই বইটির

ভিত্তিতে রচিত। পরে এর নানান উন্নতি ঘটানো হলেও, সতেরো শতকের আগে এমন কোনো বই রচিত হয়নি যা ঐ গ্রন্থের স্থান অধিকাব কবতে পারত। মানুষের ক্রিয়াক্ষমতা বলবিজ্ঞানেব মধ্যে দিয়ে ইতিমধ্যে প্রসার লাভ করেছিল; এবার তারই সঙ্গে সংগতি রেখে মানুষের ইন্দ্রিয়যন্ত্রেরও প্রসারণ ঘটল। লেন্স-ই প্রথম জিনিস যার মধ্যে দিয়ে মানুষেব ইন্দ্রিয়যন্ত্রের সেই প্রসারণ ঘটল। পরবর্তী কালে দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, ক্যামেরা প্রভৃতি যত আলোক-যন্ত্র উদ্ভাবিত হয় যেসবেরই আদি প্রতিরূপ ঐ লেন্স। কেবল এই আলোকবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামী ডাক্তারবা বিজ্ঞানে অক্ষয় স্থানের অধিকাবী হতে পাবতেন।

বিজ্ঞানসম্মত রসায়নের সূত্রপাত

তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সামগ্রিক ধারায় ইসলামী ডাক্তাব, সুর্বভিনির্মাতা আর ধাতুকর্মীরা সবচেয়ে বড়ো অবদান রাখেন রসায়নে। যেসব শ্রেণীগত সংস্কাবের বশে গ্রীকবা কায়িক শ্রমনির্ভর কলাকৌশল থেকে নিজেদের সবিয়ে বাখত, মুসলমানবা তা থেকে অনেকাংশে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। এটি তাঁদের সাফল্যেব অন্যতম প্রধান কারণ। তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলি পাঠ করলে বোঝা যায়, লেবরেটবিতে নানারকম ওষুধ, লবণ ও মহার্ঘ ধাতু নিয়ে হাতেকলমে কাজ করবাব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল। বসায়নের সূত্রপাত অবশ্য আববদেব হাতে ঘটেনি। মিশবী আব ব্যাবিলোনীয়দের প্রবর্তিত যেসব ধ্যানধাবণা ও প্রক্রিয়ার শিকড় অনেক গভীরে চারিয়ে গিয়েছিল, গ্রীকরা যাকে অতি সামান্য মাত্রায় যুক্তিসম্মত রূপ দিয়েছিল, আরবরা তারই ভিত্তিতে কাজ করত। তাছাড়া, ভারতীয়দেব এবং চৈনিকদের সুসমৃদ্ধ রসায়নিক জ্ঞানভাণ্ডার থেকেও তারা রসদ সংগ্রহ করতে পেরেছিল—যদিও এই আহরণেব মাত্রা ঠিক কতটা তা নির্ণয় করা শক্ত। বহুসংখ্যক পদার্থ আব প্রক্রিয়াব সঙ্গে সুপরিব্যাপ্ত পবিচয়ের ওপর রসায়নের চর্চা নির্ভর করে; জ্যোতির্বিজ্ঞান আর বলবিজ্ঞানের সঙ্গে এইখানে তাব পার্থক্য। এই বহুবিধ পদার্থ ও প্রক্রিয়াকে যদি সুসংবদ্ধ ক'রে এক বুদ্ধিগ্রাহ্য সামগ্রিকতাব মধ্যে গ্রথিত করা যায়, যদি তাদের মধ্যে কতকগুলি সাধাবণ সূত্র প্রতিষ্ঠা কবা যায়, তবেই তা বিজ্ঞানে পরিণত হতে পারে। আরবরা ঠিক সেই কাজটাই করেছিল, তাই ন্যায্যত তারা দাবি করতে পারে যে রসায়নের জনক তারাই।

রসায়নিক অগ্রগতিব জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহারিক দিক থেকে আবশ্যিক তা হলো পাতনযন্ত্র। কেবোটাকিস বা আলেম্বিক নামক বকযন্ত্র রূপে ইতিমধ্যেই এব আবিষ্কার ঘটেছিল। আরব রসায়নবিদবা এর প্রভূত উন্নতিসাধন ক'রে ব্যাপক মাত্রায় আতর *পাতন* করতে সমর্থ হন। কোরানে যদি সুরাপান নিষিদ্ধ না হতো তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি গ্রহণ ক'রে অ্যালকোহল তৈরি কবতেন; কিন্তু সে কাজটা খ্রিস্টানদের জন্যেই তোলা থাকে। এখানেই না থেমে একের পব এক নতুন নতুন প্রকৌশলেব প্রবর্তন ঘটতে থাকে। ধ্রুপদী যুগে অধিকাংশ প্রকৌশলই প্রবর্তিত হওয়ার পর নিছক কারিগরদের নিজস্ব লোক-ঐতিহ্যে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটল না। সুদক্ষ ডাক্তাব আর সুপণ্ডিত দার্শনিকরা এসব প্রকৌশল নিয়ে অনুসন্ধান ও আলাপ আলোচনা চালাতে লাগলেন। ফলে এই প্রথম রসায়নিক রূপান্তরণের ব্যাপারটাকে যুক্তিসম্মতভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হলো। তবে বলবিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে সরল বিশ্লেষণপদ্ধতি ফলপ্রদ হয়েছিল, তা এক্ষেত্রে কখনোই প্রযুক্ত হয়নি; কারণ বাস্তবে রসায়নিক রূপান্তরণের প্রক্রিয়া অনেক জটিল।

রসায়নিক ধ্যানধারণার উদ্ভব হয় সাদৃশ্যবিচারের মাধ্যমে চিন্তা করার কার্যকর প্রণালীর মধ্যে থেকে। সে চিন্তাপ্রণালী মূলত জীববিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল ছিল। রসায়নে এক মৌলিক দ্বৈতরূপের অস্তিত্ব রয়েছে, যা ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে পরিস্ফুট। আজ আমরা জানি,

এই দ্বৈতরূপের কারণ হচ্ছে, ইলেকট্রনের ঘাটতি বা বাড়তি। সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে মনে হয় এই দ্বৈতচরিত্রের প্রথম ফলিত প্রয়োগ ঘটায় চীনারা। সুদূর প্রাগৈতিহাসিক কালেই তারা রক্তের জাদু-বিকল্প হিসেবে লাল হিঙ্গুল ব্যবহার করেছিল। সেই হিঙ্গুল-কে তারা গন্ধক আর পারদ—এই দুই মৌল উপাদানে বিভক্ত করে নিয়েছিল। তাও-পন্থীরা এই দুটি মৌলকে তাঁদের পুরুষ-উপাদান ইন আর স্ত্রী-উপাদান ইয়াং-য়ের সাধারণ তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নেন (এই দুই উপাদানের মূল আবার নিহিত ছিল প্রাচীনতর টোটেমের মধ্যে)। এর মধ্যে থেকে তাঁরা অপরসায়নের (আলকেমির) এক ধারা গড়ে তোলেন। সম্ভবত এই উৎস থেকেই প্রথমে ভারতীয় এবং পরে আরবী অপরসায়নের উদ্ভব ঘটে। প্রথম দিকে অবশ্য সোনা নয়, অমৃত পানীয় তৈরির পন্থা আবিষ্কারই ছিল অপরসায়নের অম্বিষ্ট।

আরবরা এই পারদ-গন্ধক তত্ত্বকে গ্রহণ ক'রে আরো প্রসারিত করে। প্যারাসেল্‌সস্‌-এর 'spagyric' তত্ত্বের বীজ নিহিত ছিল এই তত্ত্বেরই মধ্যে। প্যারাসেল্‌সসের হাত ধরে ফ্লজিস্টন তত্ত্ব এবং পরিশেষে আধুনিক রসায়নও এই তত্ত্বের বীজ থেকেই অঙ্কুরিত হয়। এই বিষয়ে আরবদের আদি রচনাগুলি হয় হারিয়ে গেছে, না হয় পৃথিবীর 'শুষ্ক ও সিক্ত বাষ্পত্যাগে'র মেকি-অ্যারিস্টটলীয় মতবাদের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। ঐ মতবাদের সাহায্যেই তখন আকরিক পদার্থের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করা হতো। বলা হয়ে থাকে যে জাবির-ও পারদ-গন্ধক তত্ত্বের অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। আববী বসায়নের জনক বলে পরিগণিত জাবির অষ্টম শতাব্দীতে সক্রিয় ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। সে যাই হোক, আরবী ডাক্তারদের মধ্যে যিনি মহত্তম সেই আল-বাজি বা রাজেস্‌-এর রচনায় নানাবিধ রসায়নিক প্রক্রিয়া ও পদার্থের সুবিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ইসলামী দেশে স্থানীয় এলাকার মধ্যে সোডা, ফটকিরি, আয়রন সালফেট, সোরা, এবং রপ্তানিযোগ্য ও সারা বিশ্বের বস্ত্রশিল্পে ব্যবহারযোগ্য অন্যান্য লবণের উৎপাদন পূর্ণমাত্রায় চালু হয়। এইসব রসায়নিক উৎপাদন-শিল্পের ওপরেই রসায়নের ভবিষ্যৎ বিকাশ নির্ভর করছিল।

ইসলামী বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার

এত সংক্ষিপ্ত রূপরেখায় বিজ্ঞানে ইসলামী অবদানের ব্যাপ্তি ও গুরুত্বের প্রতি আদৌ সুবিচার কবা সম্ভব নয়। ইসলামী বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি স্পষ্টতই গ্রীক বিজ্ঞানের ধারা থেকে আহরিত হয়েছিল। কিন্তু সে ধারাকে তা নবজীবন দান করেছিল, তার প্রসার ঘটিয়েছিল। ইসলামী পণ্ডিতরা কেবল যে নতুন করে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড শুরু করে দিলেন তা নয়, প্রাচীনতর ও শ্রেষ্ঠতর প্রামাণ্য উৎসের সন্ধানে ব্রতী হলেন। তাঁদের এই দ্বিমুখী প্রয়াসে রোম সাম্রাজ্যের শেষ দিককার গ্রীক বিজ্ঞান পচনশীল দশা থেকে উদ্ধার পেল। এ কথা ঠিক যে ইসলামী বিজ্ঞান কখনোই আয়োনীয় প্রকৃতি-দার্শনিকদের তত্ত্বভাবনার মহোচ্চ স্তরে উঠতে পারেনি, অ্যালেকজান্ড্রিয় ঘরানার জ্যামিতিক কল্পনাপ্রতিভাও তার অনায়ত্ত ছিল। তবু একথা অনস্বীকার্য যে তাঁরা এক সজীব ও বর্ধিষ্ণু বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। পারস্য, ভারতবর্ষ এবং চীনের মতো অ-গ্রীক দেশের অভিজ্ঞতা থেকে রসদ সংগ্রহ করে তাঁরা গ্রীক গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের সংকীর্ণ ভিত্তিটিকে অনেক প্রসারিত করে নিতে পেরেছিলেন। বীজগণিত আর ত্রিকোণমিতির কৌশলগুলোর প্রবর্তন করেন তাঁরা, আলোকবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইসলামী বিজ্ঞানের যে প্রসারণ ঘটে, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটি ছিল রসায়ন—বা অপরসায়ন। এক্ষেত্রে তাঁরা প্রাচীন তত্ত্বগুলির রূপান্তর ঘটিয়ে নবনব পরীক্ষানিরীক্ষার প্রবর্তন ক'রে বিজ্ঞানচর্চার এক নতুন শাখা ও ঐতিহ্য গড়ে তোলেন। এই নতুন ঐতিহ্যের চরিত্রটি ছিল অনেকাংশেই গুণাত্মক. এমনকি রহস্যবাদী। তবু সেই কারণেই তা বহু শতাব্দী ধরে গ্রীকদের

অত্যধিক যুক্তিশাসিত এবং গণিতনির্ভর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাশাস্ত্রগত ঐতিহ্যের পাল্টা এক প্রবণতা হিসেবে কাজ করে। এই বিপরীত প্রবণতা বিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হয়েছিল।

7. ইসলামী সংস্কৃতির অবক্ষয়

একাদশ শতকের পরে ইসলামী বিজ্ঞান যে একেবারে ধসে পড়ল তা নয়; তবে বোঝা গেল যে তার সুদিন বিগত হয়েছে। অসামান্য কয়েকজন বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত প্রয়াস তখনো অব্যাহত থাকে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আভোরোএস দ্বাদশ শতাব্দীর মানুষ, ইবন্ খালদূন তো আরো পরের লোক—চতুর্দশ শতাব্দীর। কিন্তু এঁরা আর সেই সুপরিব্যাপ্ত সজীব আন্দোলনের অঙ্গ ছিলেন না। ইসলামের আদি রূপটির যে সামগ্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, বিজ্ঞানের এই ব্যর্থতা ছিল তারই এক লক্ষণ। যে ধরনের সামাজিক উপাদানের ক্রিয়ায় ধ্রুপদী সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এক্ষেত্রেও সেইসব উপাদানেরই বিলম্বিত ক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল। কী ইসলাম, আর কী টিকে-থাকা পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের বাইজ্যান্টিয়াম—উভয় পরিমণ্ডলেই সম্পদের বন্টনে যে অসাম্য ছিল তার ফলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। আরবরা যখন রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলো অধিকার করে তখন সেসব অঞ্চলের সম্পদের পাশাপাশি সমস্যার ভারও চাপে তাদের ওপর। কৃষক আর কারিগরদের পদানত করে রাখতে গিয়ে বর্ধিষ্ণু উৎপাদন-শিল্পের বাজার নষ্ট হয়ে যায়। বাইজ্যান্টিযাম সাম্রাজ্যের সঞ্চিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে এবং রাশিয়া, মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকায় বাণিজ্য প্রসারণের নতুন ক্ষেত্র গড়ে তুলে এর পরিণামকে কিছুদিনের জন্য ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হলেও পরিশেষে পতন ছিল অবধারিত।

অবশেষে সুবিস্তৃত রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন বজায় রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল—বাইজ্যান্টীয় ও ইসলামী উভয় সাম্রাজ্যের পক্ষেই। দশম শতাব্দী নাগাদ উভয় সাম্রাজ্যেরই ভেতর থেকে ভাঙন দেখা দিল। সামরিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তারা স্থানীয় প্রয়াসের ওপরেই উত্তরোত্তর নির্ভরশীল হয়ে উঠল। ধর্মযুদ্ধের ('ক্রুসেডে'র) সময়ে এরা উভয়েই এক সীমিত স্থানে আবদ্ধ সামন্ততন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছিল। পশ্চিমের তুলনায় তা সামরিক দিক থেকে দুর্বল ছিল; তার সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বও আর আগের মতো সুপরিস্ফুট ছিল না। তাছাড়া, একটু পরেই আমরা দেখাব যে পশ্চিমের নবজাগ্রত সামন্ততন্ত্রের যে অর্থনৈতিক সম্বল ছিল, যে সাংস্কৃতিক আশাময়তা তাকে উদ্দীপ্ত করে রেখেছিল, তা পূর্বাঞ্চলের সামন্ততন্ত্রের ছিল না। পশ্চিমের সামন্ততন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো সুবিধে ছিল জমিদারি-ভিত্তিক (manorial) গ্রামের অস্তিত্ব। এর ফলে তা এক সুপরিব্যাপ্ত ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিল। গ্রামের উপজাতিক সংঘের সজীব লোক-ঐতিহ্যের ভাণ্ডারটিও তাকে সমৃদ্ধ করেছিল। ঠিক এই জিনিসটারই অভাব ছিল পূর্বাঞ্চলের সামন্ততন্ত্রে।

বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চল থেকে আগত বর্বর হানাদারির একের পর এক তরঙ্গের অভিঘাতে ইসলামী সভ্যতার পতন ত্বরান্বিত হয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলামী দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা যদি মজবুত থাকত তাহলে তুর্কী আর মঙ্গোলরা নিছক আপন শক্তিতে এইভাবে সেসব দেশ দখল করে নিতে পারত না, তাদের সংস্কৃতিকেও এইভাবে নিষ্ফলা করে তুলতে পারত না। অভ্যন্তরীণ অপশাসন এবং বহিরাগত মঙ্গোল হানাদারির যৌথ অভিঘাতে মেসোপটেমিয়ার সেচনির্ভর কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ে; উভয় কারণেই সেচপ্রণালীর

রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাহত হয়। বর্বর হানাদারিই যে পতনের একমাত্র কারণ নয় তার একটা প্রমাণ মেলে মিশর আর উত্তর আফ্রিকার দিকে তাকালে। মঙ্গোলরা হানা না দেওয়া সত্ত্বেও সেখানে সভ্যতার অবক্ষয় ঘটে। অপরদিকে চীন আর ভারতে বর্বররা হানা দেওয়া সত্ত্বেও তাদের অর্থনীতি ভেঙে পড়েনি, সংস্কৃতিও বিপর্যস্ত হয়নি; তার কারণ তাদের অর্থনীতি মূলগতভাবে অনেক সুস্থিত ছিল।

ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, আজো তার অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু প্রথম উন্মেষের কালে যে বৈজ্ঞানিক প্রণোদনা তাকে প্রাণচঞ্চল করে রেখেছিল তা আর কোনোদিনই ফিরে পায়নি ইসলাম। মূল আরব সাম্রাজ্যগুলোর বদলে যেসব মঙ্গোল আর তুর্কী রাষ্ট্র গঠিত হয়, সেখানে এক ধরনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান একাদশ শতাব্দীতে যে স্তরে উপনীত হয়েছিল সেই স্তরেই স্থাণু হয়ে থাকে। বাহ্যত এর কারণ এই যে যাজকদের একাংশ ক্ষমতাবান হয়ে উঠে দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চাকে সক্রিয়ভাবে বাধা দেয়। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার সত্যিকারের কোনো তাগিদ যদি থাকত তাহলে এ বাধা কিছুতেই এভাবে কার্যকর হতে পারত না। রেনেসাঁস যুগের ইউরোপেও তো এ বাধা ছিল, কিন্তু তা বিজ্ঞানকে স্তব্ধ করতে পারে নি। পূর্বাঞ্চলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের প্রণোদনা স্তিমিত হয়ে পড়ার পরে মননগত প্রণোদনাও হারিয়ে যায়। উভয় প্রণোদনাই পরে আবার জাগ্রত হয়, কিন্তু ততদিনে নবীন ইউরোপীয় পুঁজিতন্ত্রের উন্নত বাণিজ্যিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডের অভিঘাত তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে। মোগল শাসনাধীন ভারতবর্ষ এর উদাহরণ।

ইসলামী বিজ্ঞানচর্চা অবশ্য বিফলে যায়নি; তবে যেসব দেশে সে চর্চা হয়েছিল তারা তার ফসল ভোগ করতে পারেনি। ইসলামী বিজ্ঞানের সমগ্র সৌধটি সরাসরি চলে আসে বর্ধিষ্ণু নব্য খ্রিস্টীয় সামন্ততান্ত্রিক বিজ্ঞানের অধিকারে। ইসলামী বিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্য, পরীক্ষানিরীক্ষা, তত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি—সব কিছুরই উত্তরাধিকারী হয় খ্রিস্টীয় বিজ্ঞান। আমার এ বইটা যদি বিজ্ঞানের প্রভাবের ইতিহাস না হয়ে শুধুই বিজ্ঞানের ইতিহাস হতো তাহলে সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বটিকে মননগত অগ্রগতির একটা অখণ্ড অধ্যায় হিসেবে গণ্য করাই যুক্তিসংগত হতো। সেক্ষেত্রে সিরিয়, পারসিক, হিন্দী, আরবী বা লাতিন—যে ভাষাতেই বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলো রচিত হয়ে থাকুক, একটা একক আন্দোলন হিসেবে তাদের আলোচনা করাই সংগত হতো। ইউরোপের ষোলো শতকের নব্য বিজ্ঞানের সঙ্গে ত্রয়োদশ শতকের বিজ্ঞানের পার্থক্যটা দ্বাদশ শতাব্দীতে আরবী বিজ্ঞান আর লাতিন বিজ্ঞানের পার্থক্যের তুলনায় বহুগুণে বেশি। মধ্যযুগের ইসলামী আর খ্রিস্টীয় বিজ্ঞানের গৌরব ও সীমাবদ্ধতা—উভয়ই একই উৎস-সঞ্জাত। সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বনিয়াদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সুবাদেই তার বাড়বৃদ্ধি, আবার ঐ কারণেই তার মধ্যে সীমাবদ্ধতার জন্ম হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সেটাই দেখাব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগের বিজ্ঞান ও প্রকৌশল

1. পশ্চিম ইউরোপের তামস যুগ

রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব অঙ্গনে এবং ইসলামী দেশগুলোতে যেসময় এক উজ্জ্বল সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করছিল, ঠিক সেই সময়ে ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চল বিভ্রান্তির কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। রোম সাম্রাজ্যের বিপর্যয় এবং বর্বরদের হানাদারির ধাক্কা তা তখনো সামলে উঠতে পারেনি। পঞ্চম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের সর্বত্র শহরগুলো ভেঙে পড়ে। ব্রিটেনে শহর জিনিসটা তখনো বাইরে থেকে চাপানো একটা ব্যাপার; তা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু ইতালিতে এক হাজার বছর আগেই শহর গড়ে উঠেছিল; তাই জীর্ণদীর্ণ এবং পরিত্যক্ত হলেও তা একরকম করে টিকে রইল। প্রথম বর্বর শাসকরা—পশ্চিমে ফ্র্যাঙ্ক আর গথ এবং পূর্বে স্লাভরা—রোম সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার একটা আভাসমাত্র টিকিয়ে রাখল। বিলাসসামগ্রী আর দাসেদের নিয়ে বাণিজ্য ভালোভাবেই বজায় রইল, কিন্তু ধ্রুপদী সংস্কৃতি আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেল। বয়টিয়াস্-এর মধ্যে সে সংস্কৃতির অন্তিম বিদায়গীতি শোনা গেল। বয়টিয়াস তাঁর জীবৎকালেই ধ্রুপদী সংস্কৃতির এক পুরাবশেষ হয়ে উঠেছিলেন। নব্য খ্রিস্টীয় সংস্কৃতি আয়োনা বা কিয়েভ্-এর মতো সুদূরবর্তী কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হতে লাগল। সে সংস্কৃতির মধ্যে প্রাচীন শাস্ত্র এবং লাতিন ও গ্রীক সাহিত্যের কিছু কিছু ভগ্নাংশ সংরক্ষিত রইল। একমাত্র কনস্ট্যান্টিনোপ্‌লে এক খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্য আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়। সে সাম্রাজ্যেব সংস্কৃতির ওপর অবশ্য রোমান অপেক্ষা গ্রীক প্রভাবই ছিল অধিক।

পশ্চিম ইউরোপের রাজত্বগুলোকে রাজা শার্লমায়েন্ ঐক্যবদ্ধ করা সত্ত্বেও নর্ম্যান, ম্যাগিয়ার আর সারাসেন-দেব ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে তারা রোমান ধাঁচের রাষ্ট্রীয় সংগঠন বজায় রাখতে পারল না। তবে তারা একেবারে ভেঙে পড়ল না; কয়েক বছর পরে খন্ডবিভক্ত কিন্তু প্রাণবন্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করল। স্থানীয় এলাকার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা এবং স্বয়ংভরতার ভিত্তিতে তারা সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। এই স্বয়ংভর ভিত্তিটিই হলো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা। 1000 সালে এই ব্যবস্থা বেশ পোক্ত রূপ ধারণ করে। সেই সময় থেকে এইসব দেশ খুব দ্রুত মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে। একদা ঘন অরণ্য এবং অতিঘন মাটিই পশ্চিম ইউরোপের অগ্রগতির পথে বাদ সেধেছিল; এবার ঠিক সেই কারণেই তার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হলো। দশম শতাব্দী থেকেই ইউরোপের নিজস্ব অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। জঙ্গল কেটে সাফ করার এবং ঘন জমি চাষ করাব প্রকৌশলগত সমস্যাগুলোর সমাধান হওয়া মাত্রই দেখা গেল, পশ্চিম ইউরোপের জলবায়ু ও মৃত্তিকা শুষ্ক চাষের পক্ষে কত উপযোগী। পক্ষান্তরে পূর্বাঞ্চলের ইসলামী দেশগুলোর জমি ছিল প্রধানত শুখা। কাজেই সে-জমির উত্তরোত্তর জল-রিক্ত হয়ে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল সমধিক। তার ওপরে যখন সরকারি সংগঠন ভেঙে পড়ল, তখন ফল হলো মারাত্মক; কারণ সেচব্যবস্থাকে বজায় রাখার এবং ক্রটিপূর্ণ কৃষিকার্যের ভয়ানক কুফলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা একমাত্র সরকারি সংগঠনেরই ছিল।

সেচব্যবস্থার এইরকম সুপরিব্যপ্ত সংগঠন বজায় রাখার কোনো প্রয়োজন পশ্চিম ইউরোপে ছিল না। সেখানে স্থানীয় স্তরে সীমাবদ্ধ প্রয়াসই ছিল যথেষ্ট, দেশব্যাপী বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন হতো না। তাই চরম ভগ্নদশা থেকেও যদি শুরু করতে হতো, তবু পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতির পক্ষে চাঙ্গা হয়ে ওঠা সম্ভব হতো—একটি একটি করে গ্রাম পুনর্জীবন লাভ করত। সুপ্রচুর, উর্বর এবং সু-কর্ষিত জমির সুদৃঢ় বনেদের ওপর এক নতুন সভ্যতা গড়ে উঠতে লাগল—ধীরগতিতে, কিন্তু অপ্রতিরোধ্যভাবে। অচিরেই সে সভ্যতা পূর্বসূরীদের পিছনে ফেলে

এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়। তবে এই সুবিধাজনক পরিস্থিতিকে কেবল পশ্চিম আর উত্তর ইউরোপের দেশগুলোই দীর্ঘকাল ধরে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়। তাদের একটা বিশেষ সুবিধে ছিল। তারা কেন্দ্রভূমি থেকে দূরে অবস্থিত এবং এমন নিবিড় অরণ্যের দ্বারা বেষ্টিত ছিল যে এশিয়া থেকে আগত, চারণভিত্তিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত জাতিগুলি সেখানে হানা দেবার শেষ প্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাতাররা অতিশয় সুসভ্য কিয়েভ রাষ্ট্রকে পর্যুদস্ত করে। রাজা শার্লমায়েনের ফ্র্যাঙ্কিশ 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্যে'র বাইজ্যান্টিয় বিকল্প ছিল এই কিয়েভ রাষ্ট্র। তাতারদের ধাক্কায় সে সভ্যতা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল না ঠিকই, তবে উত্তরাঞ্চলের অরণ্যভূমিতে ছড়িয়ে-পড়া শাখাপ্রশাখার মধ্যে থেকে তাকে নতুন করে গড়ে নিতে হলো। তারই পরিণতিতে রুশ রাষ্ট্র সক্রিয় হয়ে উঠল। পশ্চিম ইউরোপের আত্মপ্রকাশের কয়েক শতাব্দী পরে রুশ রাষ্ট্র 'মহান মস্কোভি' নামে আত্মপ্রকাশ করল। চর্তুদশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে একই ঘটনা ঘটল দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে। সেখানে তুর্কিরা প্রথমে স্লাভদের রাজত্বগুলোকে, পরে খোদ বাইজ্যান্টিয়ামকেই দখল করে নেয়।

কাজেই মধ্যযুগের খিস্টীয় জগৎ একটা নিতান্ত ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তার মূল অক্ষটি ইতালি থেকে পূর্ব ফ্রান্স হয়ে ইংলন্ড পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। পূর্বে কেবল রাইন নদী সংলগ্ন এলাকা (রাইনল্যান্ড) এবং 'লো কান্ট্রিজ' (হল্যান্ড, বেলজিয়াম আর লুক্সেমবুর্গ যার অন্তর্গত), আর পশ্চিমে গ্যাসকনি আর ক্যাটালোনিয়া তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যেও আবার, সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসূচক ঘটনাগুলি এক ক্ষুদ্রতর অঞ্চলের মধ্যেই ঘটে। ফ্ল্যান্ডার্স, নর্মান্ডি, শঁপায়ে আর পারি-বদ্বীপের চারপাশে এবং ইংলন্ডের দক্ষিণাঞ্চলে তা সীমাবদ্ধ থাকে। মধ্যযুগের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, তার স্থাপত্য, মধ্যযুগের জ্ঞানচর্চার মননগত বিকাশ—এসব কিছুর প্রথম উন্মেষ ঘটে ফ্যাঙ্ক জাতির পীঠস্থান 'ফ্রান্সভূমিতে'। তাব কেন্দ্রে ছিল পারি। সংস্কৃতির অপর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রটি ছিল ইতালি, বিশেষ করে তার লম্বার্ডি ও টাস্‌ক্যানি অঞ্চল। কিন্তু সেখানে প্রাচীন ধ্রুপদী জগতের প্রভাব তখনো এতই প্রবল যে তা অনুরূপ স্বাতন্ত্র্যযুক্ত অবদান রাখতে পারেনি। ইতালি সেই অবদান রাখতে সক্ষম হয় পরে—মধ্যযুগের শেষ দিকে এবং রেনেসাঁস যুগে।

2. সামন্ততন্ত্র

পূর্ববর্তী ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান যুগের অর্থনীতি ছিল দাসভিত্তিক; আর পরবর্তী যুগের অর্থনীতি হবে পুঁজিতান্ত্রিক। মাঝখানে পঞ্চম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পর্বের অর্থনীতিকে সামন্ততান্ত্রিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে, ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত রাজনৈতিক ও যাজকীয় শাসন-কাঠামো এবং আনুষঙ্গিক শিল্পকলা ও জ্ঞানের সম্ভার—এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে *সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার* যে পূর্ণ পরিণত রূপ তা একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর ইউরোপেই কেবল পরিলক্ষিত হয়।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক বনেদ ছিল জমি। সে ব্যবস্থায় স্থানীয় কৃষি-উৎপাদনের ওপর এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হস্তশিল্পের ওপর নির্ভরশীলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কৃষি-উৎপাদন যেস্থানে হতো, উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রধানত সেই স্থানেই ব্যবহার বা ভোগ করা হতো। *গ্রাম* ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ইউনিট। সেখানে কয়েক শো মানুষ জমি আর কাজ ভাগ করে নিত। এরা অধিকাংশই পরস্পরের আত্মীয় ছিল। বেশির ভাগ জমির স্বত্ব ছিল সর্বজনীন। গ্রামের লোকেদের বোধবুদ্ধি প্রাচীন জ্ঞাতিগোষ্ঠীগুলোর চেয়ে খুব একটা আলাদা ছিলনা, অনেক সময়ে তাদের বংশপরিচয়ও ঐ একই সূত্রে আবদ্ধ থাকত। তারা শস্য

ফলনের এক সরল মরশুমি চক্র অনুসরণ করত। উত্তরাঞ্চলে জমিকে সাধারণত স্বতন্ত্র চাষের জমি, কিছু জঙ্গল আর চারণভূমি—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হতো। কৃষকদের ঘাড়ের ওপর চেপে থাকত ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত এক শাসনকাঠামো—লর্ড (চার্চের অন্তর্গত অথবা চার্চ-বহির্ভূত), তাদের ঊর্ধ্বতন লর্ড-বৃন্দ, বিশপ আর রাজা; নামত এদের সকলের প্রভু ছিলেন সম্রাট আর পোপ। একেকজন লর্ড এক বা একাধিক গ্রামের, অথবা বিভিন্ন গ্রামে ছড়ানো জমির স্বত্বাধিকারী হতে পারতেন। তাঁর ভূমিদাসেরা তাঁর এবং নিজেদের ভরণপোষণের জন্য কাজ করতে বাধ্য থাকত। সেবাদানের এই বাধ্যবাধকতাই পুঁজিতান্ত্রিক শ্রম-মজুরি প্রথার সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের প্রধান পার্থক্য। বাধ্যতামূলক এই কর্ম হয় বলপ্রয়োগ করে আদায় করা হতো, নতুবা এমন সামাজিক প্রথার মাধ্যমে আদায় করা হতো যার পেছনে বলপ্রয়োগের হুমকি থাকত। নিজ জমিতে চাষের স্বত্বসমেত চাষীদের ওপর চাপানো এই বাধ্যবাধকতাই হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার সঙ্গে ধ্রুপদী যুগের দাসপ্রথার পার্থক্য।

তত্ত্বগতভাবে অবশ্য এই সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতার ব্যাপারটা একতরফা ছিলনা। চাষীদের এই সেবার বিনিময়ে লর্ডরা তাদের রক্ষা করবার জন্য দায়বদ্ধ থাকতেন। লর্ডরা অবশ্য তাঁদের সে দায়িত্বকে মোটের ওপর সেইভাবেই পালন করতেন, যেভাবে পাড়ার মস্তানরা পাড়ার অধিবাসীদের 'রক্ষা' করে। কারণ সাধারণত যে 'বিপদে'র হাত থেকে তাঁরা চাষীদের রক্ষা করতেন তা হলো অন্য লর্ডদের আক্রমণ। অভিজাত লর্ডের কর্তব্য ছিল ঊর্ধ্বতন লর্ডের কাছ থেকে আহ্বান আসা মাত্র তাঁর হয়ে লড়াই করা, যদিও তেমন মনে করলে লর্ড তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধেও লড়াই করতে পারতেন। এছাড়া লর্ডের 'কাজ' বলতে ছিল খাওয়া আর শিকার করা। অপরদিকে আধ্যাত্মিক লর্ডের কর্তব্য ছিল প্রার্থনা করা; কিন্তু সে কর্তব্যটুকু সম্পন্ন করতে গিয়ে তিনি তাঁর চার্চ-বহির্ভূত ভ্রাতা-লর্ডের সমপরিমাণ পানভোজনই করতেন। চার্চের অন্তর্গত এবং চার্চ-বহির্ভূত উভয় গোত্রের উচ্চতর মার্গের প্রভুরা সপারিষদ ঘুরে ঘুরে তাঁদের বিভিন্ন জমিদারিতে গিয়ে থাকতেন ও খেতেন। এক জায়গায় থিতু হয়ে থেকে খাদ্যদ্রব্য আনিয়ে নেবার অসুবিধে ছিল, যেহেতু পরিবহন-ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুপযুক্ত। এমনকি স্বয়ং রাজার পক্ষেও এক জায়গায় বেশি দিন থাকা সম্ভব হতো না; ভ্রাম্যমান সার্কাসের মতো তিনি সভাসদবর্গ নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভূম্যধিকারী আর চার্চের যাজকরা গ্রামের অর্থনীতির ওপর পরজীবী হয়ে থাকতেন। সেই পরজীবিতা একেবারে নিশ্ছিদ্র ছিল, এবং বেশ বুদ্ধিসহকারেই তাঁরা সেই পরজীবী জীবন যাপন করতেন। চার্চের জমিদারিই হোক, আর চার্চ-বহির্ভূত জমিদারিই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই গোমস্তারা ভূমিদাসদের কাছ থেকে সেবা ও পাওনার শেষ বিন্দুটুকু নিংড়ে নেওয়ার কাজ খুব সুন্দর রপ্ত করে নিয়েছিল।

সপারিষদ এই পরজীবী শ্রেণী ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ। বড়ো রকমের বাণিজ্য বা সংগঠন ছাড়াই যে এই অনুৎপাদক শ্রেণীকে খাওয়ানো পরানো সম্ভব হতো তা থেকে বোঝা যায়, সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ অর্থনীতি মোটেই আদিম স্তরের ছিল না। বাহ্য সামাজিক রূপের বিচারে সে অর্থনীতি প্রাক্-ধ্রুপদী অতীত যুগের সঙ্গে তুলনীয় হলেও সেই প্রাচীন কালের তুলনায় সামন্ততন্ত্রের প্রকৌশল-মান ছিল অনেক উন্নত। লোহার ব্যবহার ছিল ব্যাপক। উন্নততর লাঙল, অশ্ব-সরঞ্জাম ও তাঁত চালু ছিল। জলচালিত কল বা হাওয়া-কলের মতো শ্রমহারক যন্ত্রেরও প্রচলন ছিল। ধ্রুপদী যুগে প্রকৌশলে যেসব অগ্রগতি ঘটেছিল তা মূলত শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। সে যুগে খামার-প্রাসাদ-কেন্দ্রিক বাগিচাগুলোতে ক্রীতদাসেদের দিয়ে যে উৎপাদন করানো হতো তা ভোগে লাগত কেবল বণিক আর জমিদারদের দ্বারা গঠিত ধনিকসম্প্রদায়ের। পক্ষান্তরে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রকৌশলের

অগ্রগতি সমগ্র গ্রামাঞ্চল জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়। সর্বত্রই তা স্থানীয় স্তরে কিছু পরিমাণ উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। কাজেই প্রকৌশলের দিক থেকে এবং সামাজিক দিক থেকে ধ্রুপদী ধনিকতন্ত্রের তুলনায় সামন্ততন্ত্র পরবর্তী অগ্রগতির বনেদ হিসেবে অনেক বেশি মজবুত ছিল।

অপরদিকে তা এতই খণ্ডবিভক্ত, এতই ছড়ানো ছিল যে নিজস্ব অভ্যন্তরীণ উদ্যোগে দ্রুত সে অগ্রগতি সাধন করার ক্ষমতা তার ছিলনা। যে কাজটা তার সাধ্যের মধ্যে ছিল তা হলো ইউরোপের অনাবাদী ও পোড়ো এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়া। প্রধানত একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে সামন্ততন্ত্র ঠিক সেই কাজটাই করে। এইভাবে জমিচাষের ব্যাপক প্রসারণই ছিল নিজস্ব চরিত্র না খুইয়ে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ সাধনের একমাত্র পথ। জমিদার আর চার্চ-কর্তা—উভয়ের কাছ থেকেই মদত পায় সামন্ততন্ত্র। উভয়েই জমিদারির পরিসর এবং ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এ কাজে অনেকসময় ভূমিদাসেরাও তাঁদের সহায় হতো, কারণ তাদের আশা ছিল, নতুন নতুন এলাকা দখল করতে পারলে তারা তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য প্রভুর সঙ্গে দরকষাকষি করতে পারবে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে গিয়ে এই প্রসারণের পাল্লা অতিরিক্ত বেড়ে যায়; ফলে এক গুরুতর অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। সামন্ততন্ত্র সে সংকট থেকে আর কোনোদিনই প্রকৃত অর্থে বেরিয়ে আসতে পারেনি। ইতিমধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে অন্যরকমের কিছু কিছু অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া চালু হয়ে গিয়েছিল। সেইসব অন্য প্রক্রিয়ার ভিত্তি ছিল বাণিজ্য ও শহুরে ম্যানুফ্যাকচার। এইসব প্রক্রিয়ার প্রভাবে সামন্ততন্ত্রের স্থানীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ স্বয়ংভরতা আস্তে আস্তে কমে আসে। এই প্রক্রিয়ারই অন্তিম পরিণতিতে অবশেষে সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু সে আরো পরের কথা। প্রথম দিকে এইসব ভিন্ন প্রক্রিয়াকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। ব্রিটেন আর ফ্ল্যান্ডার্সে সামন্ততন্ত্র আরো দুশো বছর টিকে থাকে, ইউরোপের অন্যত্র আরো বেশি। একদা ধ্রুপদী অর্থনীতি ভেঙে পড়ার ফলে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, যা বর্বরদের হানাদারি আর অশান্তিকে ডেকে আনে, তারই পরিণামে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি রূপ ধারণ করেছিল। অতঃপর পরিস্থিতি যখন শান্ত হয়ে এল, যুদ্ধবিগ্রহ যখন আর নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা রইল না, তখন নিছক জমি-ভিত্তিক নয় এমন সব সাংগঠনিক রূপ গড়ে তোলার প্রবণতা সমাজে আবার সক্রিয় হয়ে উঠল।

মধ্যযুগের শহর

ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের দক্ষিণ ইতালি, প্রভঁস এবং ক্যাটালোনিয়ায় 'তামস যুগে' সবচেয়ে কম ক্ষতি হয়েছিল; সেখানে একে একে শহরগুলো আবার গড়ে উঠতে থাকে। রাইন নদী সংলগ্ন অঞ্চলে, 'লো-কান্ট্রিজ'-এ এবং লম্বার্ডিতে শহর গড়ে ওঠে; এইসব জায়গায় কৃষিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হতো। একাদশ শতাব্দী নাগাদ শহরগুলো বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ ধারণ করে। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে উত্তর ফ্রান্সে, ইংলন্ডে এবং জার্মানিতে রাইন নদীর পূর্বাঞ্চলেও শহর গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় শহরগুলো চার্চের বাধানিষেধ এবং সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাইল। জার্মানি আর ইতালিতে কেন্দ্রীয় সরকার সবচেয়ে দুর্বল ছিল; তাই ঐ দুই দেশে শহরগুলো কার্যত স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রে পরিণত হলো। ফ্রান্স আর ইংলন্ডে শহরগুলো রাজশক্তির অনুগত থাকলেও সামন্তশক্তির অনুগত রইল না। এইসব শহরের দেওয়াল-ঘেরা চৌহদ্দির মধ্যে নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করত হস্তশিল্পীদের কারুসংঘ। সেইসব পণ্যদ্রব্য সামন্ততন্ত্রের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সঙ্গে বিনিময় করা হতো। শহরগুলো এইভাবেই জীবন ধারণ করত। প্রথম দিকে শহরের বাসিন্দাদের সংখ্যা ছিল মোট

জনসংখ্যার এক নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র। মধ্যযুগের শেষের দিকেও ইতালি বা ফ্ল্যান্ডার্সেব মতো অগ্রসর নগরায়নের দেশেও সে সংখ্যা মোট জনসংখ্যাব পাঁচ শতাংশের বেশি ছিল বলে মনে হয় না। তা সত্ত্বেও এই নাগরিক জনপদ পত্তনের ব্যাপারটার গুরুত্ব ছিল সমধিক। কেননা এই ক্ষুদ্র জনমন্ডলীর মধ্যে থেকেই পরে বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব হয়, যারা অবশেষে পুঁজিতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। নগরায়নের এই একই প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে নতুন এক উপযোগবাদী বিজ্ঞান গড়ে ওঠে, যার চরিত্র প্রাচীন বিজ্ঞানের চেয়ে মূলগতভাবেই স্বতন্ত্র।

কিন্তু সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে শহরগুলোব এই বিপ্লবী ভূমিকার কোনো লক্ষণ পরিস্ফুট হয়নি। প্রয়োজনীয় স্বাধীনতাটুকু অর্জন কবার পবেই তাবা খুব অনায়াসে মূলত গ্রামভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে খাপ খেয়ে গেল। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে প্রাথমিক পর্বে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা কবা ও তাব বিস্তাব ঘটানোব ওপবেই জোর পড়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর কিন্তু সে ব্যবস্থাটা ভেঙে পডতে থাকে। ইতালিতে সামন্ততন্ত্রেব বনেদ সবচেয়ে নড়বড়ে ছিল; সেখানে তো ভাঙন দেখা দিলই, এমনকি সামন্ততন্ত্রেব মূল ঘাঁটি 'লো কান্ট্রিজ', ইংলন্ড এবং উত্তর ফ্রান্সেও সামন্ততন্ত্রের ভাঙন দেখা দিল। এই ভাঙনটা মোটের ওপর প্রগতিরই সূচক, অবক্ষয়ের নয়। কেননা এই ভাঙনেব মধ্যে দিয়েই উৎপাদন বাড়তে থাকে--কেবল খাদ্যদ্রব্যের নয়, বস্ত্রেরও। সেই সঙ্গে চাষীদেব মধ্যে যে স্তরবিভাজন ঘটে তার ফলে অন্তত ধনী চাষীরা সামন্ততান্ত্রিক সেবাদানের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তিলাভ কবে। নিছক জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনেব লক্ষ্যে নিয়োজিত অর্থনীতির বদলে বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদনের প্রথা চালু হয়। তাব ফলে বাণিজ্য আর শহরের গুরুত্ব বাড়ে। এই পরিস্থিতিতে ম্যানুফ্যাকচারে ও পবিবহনে প্রকৌশলগত উন্নতি সাধনের তাগিদও বাড়ে। সেইসব উন্নতিই পরে নবযুগের পুঁজিতন্ত্রেব জন্ম দেয়।

প্রকৌশলগত উদ্ভাবনের তাগিদ অবশ্য মধ্যযুগের শুরু থেকেই ছিল। বিশেষ করে চাষেব জমিকে সুষ্ঠুতরভাবে কাজে লাগানোর এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ানোর মধ্যে তা লক্ষণীয়। এই ক্ষেত্রেই গ্রীক-রোমানদের রেখে-যাওয়া নানারকম প্রকৌশল এবং আরবদের নতুন নতুন সংযোজন মধ্যযুগের কৃষক ও শ্রমিকদের সবচেয়ে কাজে লেগেছিল। আমরা আগেই বলেছি, প্রাচীন উত্তরাধিকারের যে অংশটুকু বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল তা হলো কেবল বিলাসসামগ্রী নির্মাণের কারুকৌশল আর বৃহদাকাব নগর-সংগঠনের প্রক্রিয়া। রোমান ধাঁচেব জলপ্রণালী কিংবা স্নানাগার নির্মাণের বিদ্যা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পেষাই-কল আর কামারশাল বানানোর কৌশল বিনষ্ট হয়নি। আমর দেখতে পাব যে প্রাচ্য থেকে আহরণের মধ্যে দিয়ে এবং নিজস্ব নানারকম উদ্ভাবনের মারফত কৃষিকাজে ও ব্যবহারিক বহুবিধ কর্মে উন্নতি ঘটে। এই উন্নতি সাধনের মধ্যে দিয়ে একটা বিশেষ প্রবণতা পরিস্ফুট হয়; তা হলো : মানুষের শ্রমক্রিয়ার বদলে যান্ত্রিক ক্রিয়াব প্রবর্তন এবং মানুষের শ্রমশক্তির বদলে পশুশক্তি ও জলশক্তির নিয়োজন। একথা অবশ্যই সত্যি যে মধ্যযুগের কারিগররা এমন একটা কাজও করেনি যা গ্রীক বা রোমানদের অসাধ্য ছিল। কিন্তু অল্পসংখ্যক লোককে দিয়ে আরো বেশি পরিমাণ কাজ করিয়ে দেওয়ার যে অপ্রতিরোধ্য তাগিদে মধ্যযুগের কারিগররা ঐসব উন্নতি সাধন করে, সেই তাগিদটাই গ্রীক-রোমানদের যুগে ছিল না।

মধ্যযুগের অধিকাংশ কাল জুড়ে যথেষ্ট সংখ্যায় শ্রমিক পাওয়া যেত না। গ্রীক-রোমান যুগের মতো এযুগে ক্রীতদাসেদের যথেচ্ছ-ব্যবহার্য শ্রম আর সুলভ ছিল না (ঐ সুলভতাই তো গ্রীক-রোমানদের প্রকৌশলগত উন্নতিকে ব্যাহত করেছিল)। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু তাই নয়।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার নিজস্ব চরিত্রই ছিল বিস্তারণমুখী। সেই তাড়নার বশে ভূম্যধিকারীরা কেবলই আরো বেশি জমি চাষ করাতে চাইত। কিন্তু এত জমি চাষ করার জন্য, বিশেষত ফসল তোলবার জন্য, যত চাষী দরকার তা কখনোই পাওয়া যেত না। বলা বাহুল্য, চাষীদের আরো বেশি খাটিয়ে নিয়ে, আরো বেশি ফসল লর্ডের হাতে তুলে দিতে বাধ্য ক'রে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ছিল না। কারণ চাষীদের খাটবার ক্ষমতার যে একটা সীমা আছে তার প্রমাণ মাঝে মাঝে মিলত কৃষক-বিদ্রোহেব মধ্যে। ফলে সমৃদ্ধি অর্জনের বিকল্প পথের অনুসন্ধান চলে। জলকল বা হাওয়াকল-চালিত পেষণযন্ত্র, বস্ত্র কারখানা, খনি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে ধন উপার্জনের প্রচেষ্টা চলে। প্রথমে উদ্যোগী জমিদার ও যাজকরা, পরে ধনবান বণিকরা এইসব নতুন পথের অনুসন্ধানে রত হন। ভূম্যধিকারীদের আর কারু-সংঘগুলোর কায়েমী স্বার্থের বাধায় প্রকৌশলের এইসব উন্নতি শ্লথগতিতে ঘটলেও তাকে থামিয়ে দেওয়া যায়নি। প্রকৌশলের এইসব উন্নতির পরিণামেই অবশেষে সামন্ততন্ত্রের ভিত ধ্বসে পড়ে। সেই সঙ্গে বিশ্বব্যবস্থা সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার ভিতটাও ধ্বসে পড়ে। ঐসব ধ্যানধারণা ছিল মননগত স্তরে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থারই অভিব্যক্তি।

3. মধ্যযুগে চার্চ

সমগ্র মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ভিতটা গড়ে দিয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা। আর মধ্যযুগের মননগত ও প্রশাসনিক অভিব্যক্তি রূপ ধারণ করেছিল চার্চের মধ্যে। চার্চের মধ্যে যে সংহতি ও শৃঙ্খলা ছিল তা ভূম্যধিকারীদেব নৈরাজ্যময় প্রবণতাগুলিকে প্রশমিত করে এবং সমগ্র খ্রিস্টান দুনিয়ায় কর্তৃত্বের এক অভিন্ন বনেদ তৈরি করে দেয়। বিশেষ বিশেষ ঘটনায় হয়তো সম্রাটের সঙ্গে পোপের, কিংবা রাজার সঙ্গে বিশপেব ক্ষমতাব দ্বন্দ্ব দেখা দিত; কিন্তু সমাজ-সংরক্ষণে উভয় পক্ষই উভয়ের উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। চার্চ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিপক্ষ ছিল না, ছিল এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বস্তুত একে অপরের সঙ্গে এতই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল যে একটিকে না বদলালে অন্যটিকেও বদলানো সম্ভব ছিল না; পরে রিফর্মেশন আন্দোলনে তার প্রমাণ মেলে।

দশম শতাব্দীর আগে, উত্তরণের কালে পশ্চিম ইউরোপে চার্চ নিছক আপন সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রাণপণ প্রয়াসে রত ছিল। গথ, ভ্যাণ্ডাল, ফ্র্যাঙ্ক, স্যাক্সন, লম্বার্ড প্রমুখ যেসব বর্বর গোষ্ঠীর আক্রমণ একের পর এক ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাচীন সভ্যতার একমাত্র আহ্বান-মঞ্চ ছিল চার্চ। এইসব গোষ্ঠী একেক করে রোম সাম্রাজ্যের আওতার মধ্যে চলে আসে, তাদের খ্রিস্টীয় ধর্মে টেনে নেওয়া হয়। পরে এই ধর্মান্তরণের প্রক্রিয়া আরো বিস্তার লাভ করে—নর্স আর ম্যাগিয়ারদের ধর্মান্তরিত করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই চার্চ নিজেকে রোম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলে তুলে ধ'রে আপন কর্তৃত্ব আরোপ করে। বর্বর গোষ্ঠীপ্রধানদের উচ্চাশাকে তা জাগিয়ে তুলত। বর্বরদের পরিবারের মধ্যে অবিশ্বাস্য জিনিসকে বিশ্বাস করার এবং আশ্চর্য জিনিস দেখে মুগ্ধ হওয়াব যে প্রবণতা ছিল তাকেও কাজে লাগায় চার্চ। এই করতে গিয়ে চার্চ নিজেই বর্বরীভূত হয়ে উঠল। ধর্মের মনোমুগ্ধকর বাহ্যিক উপসর্গগুলো সবই বজায় রইল, যথা আচারবিধি, ধড়াচূড়া, পুরাবশেষ, অলৌকিক ঘটনার প্রদর্শন; কিন্তু অন্তরের যে মননগত সম্পদ চার্চ অর্জন করেছিল, তার অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেল। যেটুকু রক্ষা পেল তা গোড়ার দিককার আয়ার্ল্যান্ড আর নর্দামব্রিয়ার মিশনগুলোর কল্যাণে। সেখানে বীড় (Bede, 673-735) এবং এরিগেনা (প্রায় 800-প্রায়

৪77) প্রমুখ সন্ন্যাসীরা ধ্রুপদী বিদ্যাচর্চা ও দর্শনের কিছু কিছু চর্চাকে সজীব রাখেন।

ইউরোপে এই মননগত দৈন্যদশা থেকে উদ্ধার লাভের প্রথম বড়ো আন্দোলন করেন চার্লস দ গ্রেট। নিজে নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তিনি নবম শতাব্দীতে রাজকীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু নর্স, ম্যাগিয়ার আর সারাসেনরা নতুন ধরে হানা দেওয়ায় এ আন্দোলন ব্যাহত হয়। অতঃপর দশম শতাব্দীতে মঠগুলোর সংস্কারসাধনের কাজ আরম্ভ হয়; বার্গান্ডির ক্লুনি মঠটিকে দিয়ে এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। এরই মধ্যে দিয়ে চার্চ এমন এক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে সত্যি সত্যিই সচেষ্ট হয় যা রাজা থেকে আরম্ভ করে ভূমিদাস পর্যন্ত যাবতীয় খ্রিস্টানের জীবন ও ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এই সংগঠন নিজেই ছিল সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের। দু দিক থেকে তার সে চরিত্র প্রকট হয়। একদিকে যেমন মঠ-বহির্ভূত যাজক, পোপ, আর্চবিশপ, বিশপ ও পুরোহিতরা সকলেই সামন্ত জমিদার ছিলেন, তেমনি মঠের সন্ন্যাসীরাও নিজ নিজ মঠ-এলাকায় নতুন নতুন জমি অধিকার করার কাজে নেমে পড়েন। এঁরা ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক প্রসারণের অগ্রবাহিনী।

মধ্যযুগের সমগ্র পর্ব জুড়ে, অন্তত ত্রয়োদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত তো বটেই, সর্বত্রই— এমনকি ইতালিতেও —বিদ্যাচর্চার ওপর, বস্তুত সাক্ষরতা ব্যাপারটার ওপরেই পুরোহিত আর সন্ন্যাসীদের মারফত কার্যত একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করে চার্চ। সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসনের কাজকর্ম চালাত চার্চের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা। ইংরেজি 'clerk' কথাটির মধ্যে এর চিহ্ন রয়ে গেছে।* এই একচ্ছত্র অধিকার থাকার ঘটনাটি মধ্যযুগীয় ভাবনাচিন্তায় এক ধরনের ঐক্য বিধান করে ঠিকই, কিন্তু সেই কারণেই তার গণ্ডি সীমিত হয়ে পড়ে। গ্রীক বা ইসলামী কোনো চিন্তাধারাই এমন একবর্গীয় ছিল না।

মানবব্যাপারের প্রতি মধ্যযুগের চার্চের ঘোষিত মনোভাবটি রোম সাম্রাজ্যের পতনের সেই ঘনতমিস্র দিনগুলোতে নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করেছিল। তার মূল কথা এই যে মানুষের ইহজীবন নরকে বা স্বর্গে অনন্ত জীবন কাটানোর এক প্রস্তুতিপর্ব মাত্র। মানুষের জীবনযাত্রার পরিস্থিতিতে সুস্পষ্ট উন্নতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এই মনোভাবে ভাঁটা পড়ে ঠিকই; তবু তা রেনেসাঁস যুগের আগে অব্দি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। তবে ঘোষিত মনোভাব যাই হোক, কার্যক্ষেত্রে চার্চ বৈষয়িক ও জাগতিক ব্যাপারের প্রতি সবিশেষ মনোযোগী ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখার কাজে তা গভীরভাবে জড়িত ছিল।

ভিক্ষু সন্ন্যাসীদের আবির্ভাব

এইভাবে মূলত গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার দরুন দ্বাদশ শতাব্দী থেকে চার্চের স্বার্থের সঙ্গে নবোদিত শহরনিবাসী বণিক ও কারিগরদের চার্চ-বহির্ভূত সমাজের স্বার্থের সংঘাত বাধে। এঁরা বিভিন্ন চার্চ-বিরোধী মতবাদের মধ্যে দিয়ে আপন অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। এইসব মতবাদ ছিল প্রধানত ম্যানিকিবাদী ও অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী। বিদ্রোহী মতবাদগুলোর মূল কথা ছিল এই যে কতকগুলো লোভী আর ভ্রষ্ট যাজকের মধ্যস্থতা ছাড়াই মানুষ সরাসরি ঈশ্বরকে ডাকতে পারে। তরবারির সাহায্যে কিছুকালের জন্য এইসব বিদ্রোহী মতবাদকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয়; 1209 সালে অ্যালবিজেনসদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ঘোর ধর্মযুদ্ধ তার নিদর্শন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ এর চেয়ে সন্তোষজনক এক সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল।

* ইংরেজি clerk কথাটির আদি লাতিন উৎস হলো *clericus*, যার অর্থ ছিল খ্রিস্টীয় চার্চের ধর্মীয় কর্ম সম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। —অনু

চার্চের অনুমতিক্রমে ভিক্ষুক এবং ধর্মপ্রচারকরা, ফ্রান্সিসকান এবং ডমিনিকান 'ফ্রায়ার'রা আসরে নামলেন। খানিকটা ঐ পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় এবং খানিকটা তারই অভিব্যক্তিস্বরূপ এঁদের আবির্ভাব ঘটে।

আসিসি-র সেন্ট ফ্রান্সিসেব (1182-1226) জীবন ও ধর্মপ্রচারণার মধ্যে অত্যধিক বৈষয়িকতার এবং অমিত ধনসম্পদ আহরণেব বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শহরবাসীদেব বিদ্রোহ প্রতিফলিত হয়। তাঁর বাণী এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে অবশেষে পোপতন্ত্র আশঙ্কিত হয়ে পড়েন, পাছে তা ধর্মদ্রোহিতা ও গৃহবিবাদে পরিণত হয়। বহুচেষ্টায় কূটকৌশলে তাঁরা সে সম্ভাবনাকে নিরস্ত করেন। এখনো ফ্রান্সে 'শ্রমিক পুরোহিত'দের নিয়ে এই একই সমস্যা দেখা দেয়। 1312 সালে ফ্রান্সিসপন্থীদের এই 'আধ্যাত্মিক' প্রতিরোধকে বিচূর্ণ করা গেলেও তাঁদের মতবাদ অকখ্যাম (Occam, মৃত্যু প্রায় 1349) ও ওয়াইক্লিফ্-এর (প্রায় 1324-84) মাধ্যমে সক্রিয় থাকে এবং রিফর্মেশন আন্দোলনের পথ প্রশস্ত কবে।

সেন্ট ডমিনিক-পন্থী 'ফ্রায়ার'রা কিন্তু প্রথম থেকেই সচেতনভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের লক্ষ্য ছিল বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মানুষকে চার্চ-বিরোধিতার পথ থেকে সরিয়ে আনা। শহরের বাসিন্দারা তখন বুদ্ধিমান এমনকি কৃতবিদ্য হয়ে উঠছিলেন; তাঁদের পরাস্ত করবার জন্যে কট্টর শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যের সুবিপুল সম্ভার সাজাতে হলো। এই উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন দার্শনিক সেন্ট অ্যালবার্ট (1193-1280) এবং সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস (প্রায় 1227-74)। এই উদ্দেশ্য সাধনে তাঁদের সহায় হন অ্যারিস্টটল। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার মস্ত প্রবক্তা অ্যারিস্টটলের প্রতি এঁরা দুজন এক সহজাত সহমর্মিতা অনুভব করতেন। ধর্মযুদ্ধের (ক্রুসেডের) এবং ধর্ম-আদালতের (ইনকুইজিশন) পাশবিক পদ্ধতির তুলনায় সম্মতকরণের (persuasion) এই পদ্ধতি অধিক কার্যকর হয়েছিল কিনা বলা শক্ত; তবে একথা ঠিক যে খ্রিস্টীয় চার্চ-বিরোধিতাকে প্রায় 300 বছর ধরে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল।

তবে ফ্রায়ারদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও মধ্যযুগের শেষ দুই শতকে উদীয়মান শহরগুলোর প্রভাবে এবং রাজাদের ক্রমবর্ধমান শক্তির সম্মুখে চার্চের ক্ষমতা কমতে থাকে। রাজারা তখন ক্রমশই বেশি করে শহরগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গ্রামীণ ভূম্যধিকারীদের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হতে থাকেন। 1309 সালে পোপতন্ত্রের পীঠস্থানকে বলপূর্বক আভিনিয়ঁ-তে সরিয়ে দেওয়া হয়। 1378 থেকে 1418-র মধ্যে চার্চের কর্তৃত্ব দুই বা তিনজন পোপের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছেদ দূর করবাব মানসে সাধারণ সভার ক্ষমতা বাড়ানো হয়। কিন্তু তাতেও শৃঙ্খলা ফেরে না। হাস্-কে 1415 সালে তাঁরা পুড়িয়ে মারেন ঠিকই, কিন্তু হাস্-এর অনুগামীরা চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং বোহেমিয়াতে 1526 সাল পর্যন্ত এক স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তবে চার্চের এই দুর্বলতা কেবল তার সংগঠনকেই স্পর্শ করেছিল; মননগত স্তরে, সমাজভাবনায় তার প্রভাব এত গভীবভাবে পড়েছিল যে আগামী কয়েকশো বছর ধরে রাজনীতি আর বিজ্ঞানের যে কোনো বিতর্কই প্রধানত ধর্মের পরিভাষায় ব্যক্ত হয়।

4. ধর্মশাস্ত্রীগণ ও মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিম ইউরোপে খ্রিস্টীয় জগতের পুনরুজ্জীবন শুরু হয় দশম শতাব্দীতে। সেই পুনরুজ্জীবনের জন্য একটা দৃঢ় মননশীলতার বনেদ প্রয়োজন ছিল। বীড বা এরিগেনা-র মতো সুদক্ষ চিন্তাবিদরা যতই নিপুণভাবে পুরোনো ধ্রুপদী লোককাহিনীর পুনঃপ্রচার করুন না কেন, কেবল ঐটুকুর জোরে সে বনেদ গড়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। চার্চভুক্ত যাজকদের চিন্তা করতে ও

লিখতে শেখানো প্রয়োজন ছিল; চার্চের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক দাবিসমূহকে ন্যায্য বলে প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল। প্রথম দিকে ক্যাথিড্রাল বিদ্যালয় স্থাপন করে এই প্রয়োজন মেটানো হতো—যথা শার্ত্র (Chartres) এবং রেঁআঁজ (Reims)-এর বিদ্যালয়। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এইসব বিদ্যালয়ের কলেবর স্ফীত হয়, তারা পরিণত হয় *বিশ্ববিদ্যালয়ে।* সেখানে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসারে শিক্ষা দান করা শুরু হয়। 'উদার সপ্তবিদ্যা' (পাটীগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্র), দর্শন এবং 'সবার উপরে' ধর্মতত্ত্ব সেই শিক্ষাক্রমের অঙ্গ ছিল। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পারি ছিল সর্বাগ্রগণ্য। 1160 সালে তার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়; তার প্রতিষ্ঠা আগেই হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধারণাটি—যেখানে বিশ্বের যাবতীয় বিষয় একসঙ্গে অধ্যয়ন করা যাবে—নতুন নয়। প্রাচীন কালে এথেন্সে একাধিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল; অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছিল; মুসলিমদের মসজিদ-সংলগ্ন মাদ্রাসাগুলোতে শত শত বছর ধরে দর্শন আর ধর্ম পড়ানো হয়ে আসছিল, এবং অল্পকাল আগে একাদশ শতাব্দীতে সালের্নোতে একটি ডাক্তারি বিদ্যালয় পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছিল। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এই সব প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণী হলেও তাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল আগের তুলনায় অনেক সর্বজনীন এবং সুশৃঙ্খল। খ্রিস্টীয় জগতে অল্পকালের মধ্যেই জ্ঞানপীঠ রূপে এইসব বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠে। বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভবত পারির আগেই স্থাপিত হয়েছিল, অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় 1126 সালে—কার্যত পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শাখা-বিদ্যালয় রূপে; কেমব্রিজ স্থাপিত হয় 1209 সালে। অতঃপর একে একে 1222 সালে পাদুয়া, 1224 সালে নেপ্‌লস, 1227 সালে সালামাঙ্কা, 1347 সালে প্রাগ, 1364 সালে ক্রাকফ, 1367 সালে ভিয়েনা এবং 1410 সালে সেন্ট অ্যানড্রুস বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

প্রথম থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান কাজ ছিল যাজকদের প্রশিক্ষণ দান। এই অবস্থা বহুদিন বজায় ছিল। তবে তখন শিক্ষানির্ভর যাবতীয় বৃত্তি এবং যাবতীয় প্রশাসনিক কর্মের ওপর চার্চ-ভুক্ত যাজকদের একচ্ছত্র অধিকার থাকায় এর ফলে বিশেষ কিছু এসে যায়নি। কারণ তখন যেকোনো রকম শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াটাই, বিশেষ করে কিছু প্রাচীন গ্রীক-রোমান ভাবনাচিন্তার সংস্পর্শে আসাটাই ছিল বড়ো কথা। বক্তৃতা এবং আলোচনাই ছিল শিক্ষার মাধ্যম, কেননা বই ছিল বিরল। এর সঙ্গে ডাক্তারি শিক্ষা যখন যোগ করা হয় তখনো ঐটাই ছিল শিক্ষাদানের পদ্ধতি। প্রাচীন গ্রীক-রোমান জ্ঞানচর্চার এক অতিসরল সারসংক্ষেপের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম তৈরি করা হতো। 'উদার সপ্তবিদ্যা'র প্রথম তিনটি ('trivium') ছিল ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র এবং ন্যায়শাস্ত্র। এই তিনটি বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীকে বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে কথা বলতে বা লিখতে শেখানো—বলা বাহুল্য লাতিনে। প্রথম তিনটি বিষয় শিক্ষা করবার পর দ্বিতীয় পর্বে চারটি বিষয় ('quadrivium') শিখতে হতো—পাটীগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান আর সংগীত। এই শিক্ষা সমাপ্ত না হলে দর্শন আর ধর্মতত্ত্বের শিক্ষা শুরু করা হতো না। একটা ব্যাপার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে এই শিক্ষার প্রাথমিক ক্রমটা কেবল ধর্মনিরপেক্ষই নয়, বিজ্ঞানভিত্তিকও ছিল। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষাক্রম ইসলামী ধাঁচটিকেই অনুসরণ করত। অন্যান্য শিক্ষাক্রমে আইন ও ডাক্তারি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও ইতিহাস এবং সাহিত্যের কোনো স্থান আদৌ ছিল না। এই অভাবেরই প্রতিক্রিয়ায় পরে রেনেসাঁস যুগে 'হিউম্যানিস্ট'রা এই গোটা ধর্মশাস্ত্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।

কার্যত অবশ্য যেটুকু বিজ্ঞান পড়ানো হতো তা নামমাত্র। পাটীগণিতের শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল গণনা বা অঙ্কপাতনের মধ্যে; জ্যামিতিশিক্ষা ইউক্লিডের প্রথম তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানেব শিক্ষায় বর্ষপঞ্জী রচনা এবং ঈস্টার পরবের দিন নিরূপণের বাইরে আর বিশেষ কিছু শেখানো হতো না। যে পদার্থবিদ্যা আর সংগীত শেখানো হতো তার সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ, তার ভিত্তি ছিল প্লেটোবাদ। প্রকৃতির সঙ্গে বা ব্যবহারিক কর্মকৌশলের সঙ্গে এই শিক্ষাব বিশেষ সংযোগ ছিল না, সংযোগ স্থাপনের প্রয়াসও ছিল না। তবে জ্ঞানচর্চার প্রতি প্রীতি এবং যুক্তিপ্রয়োগের আগ্রহকে লালন কবা হতো। মধ্যযুগের উত্তবার্ধে পাদুয়া প্রমুখ দু একটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সবই প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানেব রক্ষক রূপে এবং সমস্তরকম সাংস্কৃতিক অগ্রগতিব প্রতিবন্ধক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু প্রথম দিকে তারা ইউরোপেব মননচর্চাব কেন্দ্ররূপেই বিরাজ কবত।

আরবী ও গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞানের অভিঘাত

এই সীমাবদ্ধ কিন্তু প্রগাঢ় মননচর্চার পবিমণ্ডলে আরবী বিদ্যাবত্তার অভিঘাত এসে পৌঁছল। পশ্চিমে ধ্রুপদী জ্ঞানবিজ্ঞানের যে সামান্য অংশটুকু সংরক্ষিত হয়েছিল তার তুলনায় বহুগুণে উন্নত জ্ঞানবিজ্ঞানের মুক্ত হাওয়ার এক ঝাপটা নিয়ে এল আরবী বিদ্যাবত্তা। একাদশ শতকে অল্প দু-একটি রচনার অনুবাদের মধ্যে দিয়ে এই যোগাযোগের সূত্রপাত ঘটে। অতঃপর দ্বাদশ শতাব্দীতে একের পর এক আরবী ও গ্রীক আকরগ্রন্থের অনুবাদ হয় লাতিনে। বেশির ভাগ অনুবাদই হয় আরবী থেকে, আর অল্প কিছু সরাসরি গ্রীক থেকে। অনুবাদের কাজ প্রধানত স্পেনে সম্পন্ন হয়, কিছু পরিমাণে সিসিলিতেও। সংস্কৃতির এই প্রসারণে ধর্মযুদ্ধের সামান্যই প্রভাব পড়েছিল। সাংস্কৃতিক সঞ্চারণের এই প্রক্রিয়াটি ছিল অভূতপূর্ব; একমাত্র ভারতীয় আর ইসলামী বিজ্ঞানেব মধ্যে সংযোগের ঘটনাটি ছাড়া এর সঙ্গে তুলনীয় ঘটনা আগে বোধহয় ঘটেনি। কারণ অকেজো জ্ঞানবিজ্ঞানের মৃত ঐতিহ্যের সঙ্গে এক প্রাণবন্ত নবীন সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটানোর বদলে এক্ষেত্রে যা ঘটল তা এই যে অল্পকাল আগেও যে-সংস্কৃতি পূর্ণ তেজে বিরাজ করছিল তার সুফলগুলি তুলে দেওয়া হলো অন্য এক সংস্কৃতির হাতে। প্রথম দিকে নিশ্চয়ই ভাবধারার সঞ্চারণের এই প্রক্রিয়া খুবই বাধা পেয়েছিল। কারণ সে ভাবধারা ব্যক্ত হয়েছিল এমন এক ভাষায় যা একেবারেই স্বতন্ত্র; যারা সেই ভাবধারার বাহক তাদের ধর্মবিশ্বাস কেবল যে অন্যরকম তাই নয়, সক্রিয়ভাবে খ্রিস্টানদের প্রতি শত্রুতামূলক ছিল। কিন্তু দেখা গেল এইসব প্রতিবন্ধক নিছক উপরিগত। লাতিন সংস্কৃতির সঙ্গে আরবদের বাহিত সংস্কৃতির অন্তর্লীন সাদৃশ্যটি সেসব প্রতিবন্ধককে ছাপিয়ে উঠল। বস্তুত যে হেলেনীয় সংস্কৃতির আশ্রয়ে লাতিন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তাকেই যেন আরো গভীরভাবে, মূল উৎসের আরো কাছ থেকে ফিরে পেল লাতিন সংস্কৃতি। আরবী ভাবধারা আর লাতিন ভাবধারা উভয়েই গড়ে উঠেছিল প্লেটোপন্থী এবং নব্যপ্লেটোবাদী চিন্তাভাবনার বনেদের ওপর; ভাষা আলাদা হতে পারে, কিন্তু ব্যক্ত ভাবগুলি আলাদা ছিল না।

তাছাড়া, মননগত স্তরে ইসলাম ধর্মকেও খ্রিস্টধর্মের মতো একই সমস্যাবলীর মোকাবিলায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব সৃজন; ধর্মানুশাসন আর বিচারবুদ্ধির মধ্যে সমঝোতা; কোরাণেব আক্ষরিক প্রেরণা বা অনাদি অস্তিত্ব; অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সত্যতা। আল্-গাজ়ালি আর আভেরোএস্-এর মধ্যে যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল, ডানস স্কোটাস আর টমাস অ্যাকুইনাস সেই বিতর্কটিই চালিয়ে যান। নিছক বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলে নবম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত কালপর্বটিকে একটাই অখণ্ড প্রয়াসের পর্ব বলে বিবেচনা করা যেতে পারে—যে পর্বে আরবী ও লাতিন সংস্কৃতি ধর্ম আর দর্শনের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি করতে এবং ধ্রুপদী যুগে রচিত বিশ্বছবিটিকে সম্পূর্ণ করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এইভাবে অখন্ড কালপর্ব হিসেবে

বিবেচনা করলে যেসব ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্যের পরিণামে ঐ প্রয়াসের ফলাফল সুনিশ্চিতভাবে বিভিন্নমুখী হয়ে ওঠে তাকে অগ্রাহ্য করতে হয়। কারণ, ফল যে দু জায়গায় দুরকম হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই : ইসলামী দেশগুলোতে ঐসব প্রশ্নে এমন এক আপসরফা হয় যার পরিণামে বিজ্ঞান বন্ধ্যা হয়ে পড়ে; পক্ষান্তরে খ্রিস্টানদের মধ্যে ঐসব প্রশ্নে বিতর্ক চলতেই থাকে, যতদিন না অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধাক্কায় গ্রীকদের তৈরি বিশ্বছবিটা একেবারে ভেঙে পড়ে এবং তার জায়গা অধিকার করে অন্য এক বিশ্বছবি।

ধর্মানুশাসন ও বিচারবুদ্ধি

তর্কবিতর্ক চলেছিল তা একটা মূল সমস্যার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে—কী করে বিচারবুদ্ধির মধ্যে ধর্মানুশাসনের একটা ভিত্তি রচনা করা যায়, আবো সংকীর্ণ অর্থে বললে, কী করে শাস্ত্রবচনের সঙ্গে এবং 'ফাদার'দের সঙ্গে গ্রীক যুক্তিশাস্ত্রের একটা সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। শাস্ত্রবচনের সঙ্গে এবং 'ফাদার'দের সঙ্গে গ্রীক যুক্তিশাস্ত্রেব একটা সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। প্রথম দিকে মনে হয়েছিল কাজটা বেশ সহজ; সেন্ট আনসেল্ম (1033-1109) পরম পূর্ণতাব আদর্শের ভিত্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। কিন্তু যুক্তিসম্মত ধর্মেব খুঁটিনাটি প্রশ্নগুলোব সমাধান বেশ বেগ দিল। *Sic et Non* নামক রচনায় আবেলার (1079-1142) উদ্ধৃতি সহযোগে দেখালেন যে প্রায় প্রত্যেকটি গুরুতর প্রশ্নেই পূজ্যপাদ 'ফাদার'দেব বক্তব্যগুলি পরস্পরবিরোধী। দ্বাদশ শতকে অ্যারিস্টটলের প্রধান প্রধান রচনাব পুনরুদ্ধারের ফলে এসব প্রশ্নের সমাধানের পথনির্দেশ পাওয়া যাবে বলে মনে হলো। সেসব রচনার পুনরুদ্ধার হওযার পর অ্যারিস্টটলের পাণ্ডিত্যের কিংবদন্তী পূর্ণ মাত্রায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়। তাঁব অগাধ জ্ঞান, তাঁর যুক্তিপ্রণালীব নিশ্ছিদ্রতা চমৎকৃত করে। তাছাড়া আমরা আগেই দেখেছি, অ্যারিস্টটলের রক্ষণশীল মতবাদ এক স্থিতিশীল, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উপযোগী করেই রচিত হয়েছিল। অল্পকিছু অদলবদল করে নিলেই তাকে মূর্তিপূজক অখ্রিস্টান দাসভিত্তিক অর্থনীতির বদলে খ্রিস্টীয সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উপযোগী রূপ দেওয়া সম্ভব ছিল।

এ ব্যাপারে আভেরোএস ইতিমধ্যেই প্রাথমিক কাজটি করে রেখেছিলেন। গোটা মধ্যযুগ ধরে তাঁকে এক মহান ভাষ্যকার রূপে শ্রদ্ধা করা হতো। কিন্তু তিনি এত বেশি মাত্রায় অ্যারিস্টটল-ভক্ত ছিলেন যে তাঁব অ্যাবিস্টটল-ভাষ্যকে অপরিবর্তিত আকাবে খ্রিস্টীয় প্রত্যাদেশেব সঙ্গে খাপ খাওযানো সম্ভব ছিল না। সেই কাজটিই করেন ডমিনিকান সন্ন্যাসী (ফ্রায়ার) সেন্ট অ্যাকুইনাস। তাঁর বহুখ্যাত *Summa Theologia* গ্রন্থে তিনি ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতি ও বিশ্বের এক ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। সেই কাঠামোর মধ্যে ঐশ্বরিক পরিচালনা এবং মানুষের মোক্ষলাভের পরম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। সমগ্র গ্রন্থটি অতি সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে বচিত। আলোচিত প্রতিটি বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে যুক্তি উপস্থাপন করা হয় এমনভাবে যাতে কট্টরপন্থী সমাধানটিই অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয। তিনি বলেন, ধর্মবিশ্বাস সর্বদাই যুক্তিবিচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ এমন অনেক কিছু আছে, নিছক যুক্তিসহযোগে যার নাগাল পাওয়া যাবে না। তিনি এ কথাও বলেন যে তাই বলে অন্তবে লব্ধ প্রত্যাদেশের সঙ্গে যুক্তিবিচারের কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। উত্তরগুলো যেহেতু আগে থেকেই জানা, তাই অ্যাকুইনাসের প্রদত্ত যুক্তিগুলো অনেক সময় খানিকটা ওকালতির মতো শোনায়। পরবর্তীকালেও সেসব যুক্তির কোনো উন্নতি কেউ ঘটাননি; আজকের দিনেও ঐসব যুক্তিই ক্যাথলিক মতবাদের ভিত্তি।

স্বীয় যুগের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাকুইনাসের কর্মকৃতি এক অসাধারণ শৃঙ্খলাপরায়ণ মন এবং কুশলতার পরিচায়ক। কারণ তিনি কেবল অ্যারিস্টটলের রচনাকে যুগের সঙ্গে খাপ

খাইযেই ক্ষান্ত হননি, তিনি অ্যারিস্টটলীয় পদ্ধতিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করেছিলেন। গ্রীকরা কখনো সে ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। তবে অ্যাকুইনাসের রচনায় চিন্তাধারার মৌলিক অগ্রগতির কোনো পরিচয় নেই। তাই আজকের দিনেও যাঁরা অ্যাকুইনাসকে নিজেদের দার্শনিক মতের ভিত্তি রূপে ঘোষণা করেন, প্রতিক্রিয়া-সমর্থক সেই নব্য-অ্যাকুইনাসপন্থীদের মতবাদের মননগত দেউলেদশাই ঐ ঘোষণার মধ্যে পরিস্ফুট হয়।

অ্যাকুইনাসের দক্ষতার কোনো তুলনা হয় না। তিনি যুক্তিবিচারের সঙ্গে আদি খ্রিস্টীয় মতের বিক্ষিপ্ত এবং প্রায়শ স্ববিরোধী ধ্যানধারণাগুলির সমন্বয় সাধন করলেন। নব্য-প্লেটোপন্থীরা 'অ্যারিওপ্যাজাইট ডায়োনিসিয়ুস্'-এর নামে *স্বর্গীয় শাসনকাঠামো* শীর্ষক যে জাল রচনাটি প্রচার করেছিলেন, অ্যাকুইনাস প্রধানত তারই ভিত্তিতে তাঁর বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুললেন। সত্যের খাতিরে একথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে অ্যাকুইনাস একা নন, মধ্যযুগের প্রায় সকল মনীষীই এই জাল রচনাকে বেদবাক্য জ্ঞানে সম্মান করতেন।

আধুনিক বিজ্ঞান মধ্যযুগের এই ধর্মশাস্ত্রীয় বিদ্যাচর্চার মধ্যে থেকে রূপলাভ করেছে বলে অনেক ইতিহাসবিদ ধর্মশাস্ত্রীদের ঐ যুক্তিপ্রয়োগের গুণমানকে বিশেষ প্রশংসনীয় বলে মনে করেন। এই মতের বিরুদ্ধে দুটি কথা বলার আছে। প্রথমত, আধুনিক বিজ্ঞান সৃষ্টি করেছিলেন ধর্মশাস্ত্রীরা নন, লিওনার্দো, বেকন আর গ্যালিলিও-র মতো মানুষ—যাঁরা ধর্মশাস্ত্রীদের অনুসৃত লক্ষ্য ও কর্মপন্থাকে প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে বিজ্ঞানের পত্তনের প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টদায়ক কাজ ছিল বহুযুগ ধবে সঞ্চিত আবোল-তাবোল ধারণাগুলিকে দূর করা। এক হাজার বছরের কাছাকাছি সময় জুড়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভাবনার যে সম্ভার গড়ে উঠেছে, তা ঐসব বাধা না থাকলে দুশো বছরের মধ্যেই গড়ে উঠতে পারত। একথা মনে রাখলে, যাঁরা ঐসব মতবাদ প্রতিষ্ঠা ক'রে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে এমন সফলভাবে প্রতিহত করতে পেরেছিলেন তাঁদের শ্রদ্ধাভক্তি করার ইচ্ছেটা কমে আসে।

সংজ্ঞাবাদীদের বিরোধিতা

সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসেব বিপুল প্রয়াস অনেক পরবর্তীকালে যতটা সমাদর লাভ করেছিল, সমকালে তা করেনি। প্লেটোর 'ভাব' কিংবা অ্যারিস্টটলের 'মানস-আরোপিত আকার'-কে *বাস্তব* ধরে নিয়ে তার ভিত্তিতে অতিশয় সর্বজনীন পদ্ধতিতে যে যুক্তিপ্রয়োগ করা হতো তার প্রতি একটা বিরোধিতা আগে থেকেই ছিল। আরবী জ্ঞানবিজ্ঞানের অভিঘাত এসে পৌঁছবার আগে থেকেই সে বিরোধিতা সক্রিয় ছিল। অ্যাকুইনাসের মতামতকে অগ্রাহ্য ক'রে ফ্রান্সিস্কান সন্ন্যাসী (ফ্রায়ার) ডানস্ স্কোটাস আদি সংজ্ঞাবাদী *(nominalist)* রসেলিনাস্-এর (প্রায় 1050-প্রায় 1122) যুক্তিধারাকে ফিরিয়ে আনলেন। সংজ্ঞাবাদীরা ছিলেন মধ্যযুগের পূর্বোক্ত 'বাস্তববাদী'দের বিরোধী। তাঁরা বস্তুর স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দিতেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, নাম বা ভাব জন্ম দেওয়ার আগে বস্তু জন্ম নেয়। এই মত অনুসরণ করলে ধর্মতত্ত্বকে যুক্তিশাসিত করে তোলার গোটা ছকটিকেই প্রত্যাখ্যান করতে হয়। কিন্তু যেহেতু তাঁরা ছিলেন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান, তাই এই মতের অনুসরণে তাঁরা সংশয়পন্থী হয়ে উঠলেন না, প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষভাবে অধ্যয়নের পন্থাও অনুসরণ করলেন না। তার বদলে তাঁরা আল্-গাজালির পথ ধরে অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী অন্ধবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরলেন; বললেন, সে বিশ্বাস এতই উচ্চমার্গের যে মানুষের বিচারবুদ্ধি তার নাগাল পায় না। তা সত্ত্বেও মধ্যযুগের প্লেটো বা অ্যারিস্টটলপন্থী 'বাস্তববাদী'দের সঙ্গে বিতর্ক চালাতে গিয়ে তাঁদের যুক্তিধারাকে বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় শাণিয়ে

তুলতে হলো। এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা যেসব যুক্তি উপস্থিত করেন, তা পরে প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের সহায়ক হয়। উইলিয়াম অব অক্‌খ্যামের একটি বিখ্যাত বচন হলো : 'অকারণে বস্তুসত্তার (entities) সংখ্যা বাড়ানো অনুচিত'। তিনি ঠিক যে কথাগুলো বলেছিলেন তা এই : 'কম জিনিস দিয়ে যে কাজ করা যায় তার জন্য বেশি জিনিস ব্যবহার করা নিরর্থক।' তাঁর এই মত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যে থেকে অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল দূর করার কাজে খুবই সহায়ক হয়। আরো পরে পারিতে বুরিদাঁ (প্রায় 1297-1388) এবং ওরেস্‌ম্‌-এর (1320-82) ঘরানা অক্‌খ্যামের পদ্ধতি প্রয়োগ করে অ্যারিস্টটলের গতিতত্ত্বের সমালোচনা করেন—যা পরে গ্যালিলিও কর্তৃক গতিবিজ্ঞানের সংস্কারের পথ প্রশস্ত করে। রসায়নে যুক্তির স্থানটি বহুকাল ধরেই খুব নড়বড়ে ছিল; রসায়নের চর্চায় অপ-রসায়নিক (আলকেমীয়) দৃষ্টিভঙ্গিও অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী লোকেদের কাছ থেকে সমর্থন পেল। প্রধানত মাজোর্কা-র রেমন্ড লাল্‌-এর (প্রায় 1235-1315) প্রয়াসে ইসলামী সুফী রহস্যবাদ খ্রিস্টীয় জগতে অনুপ্রবেশ লাভ করে; এই রেমন্ড লাল্‌-ই আবার এমন এক রসায়নিক চিন্তাধারার ঐতিহ্যের প্রবর্তন করেন (অন্তত জনশ্রুতি তাই বলে) যা প্যারাসেল্‌সসের এবং ভান হেলমন্টের হাত ধরে একেবারে আজকের দিনের রসায়ন পর্যন্ত প্রসারিত।

5. মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান

মধ্যযুগের বিজ্ঞানচর্চা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করার আগে এই দীর্ঘ ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভূমিকাটির প্রয়োজন ছিল। কারণ মধ্যযুগে যে যৎসামান্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলে তা প্রায় সম্পূর্ণতই ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে চালানো হয়। চার্চের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই সে কাজ করেন—পুরোহিতরা, মঠের সন্ন্যাসীরা কিংবা ভিক্ষু সন্ন্যাসী বা 'ফ্রায়ার'রা। খ্রিস্টীয় বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে ইসলামী বিজ্ঞানচর্চার এই জায়গায় মস্ত প্রভেদ; ইসলামী বিজ্ঞানীদের অধিকাংশেরই বিশেষ ধর্মীয় আনুগত্য ছিল না, অনেকেই খোলাখুলিভাবে উপযোগবাদী উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানচর্চা করতেন।

আজকাল রেনেসাঁস যুগের বিজ্ঞানের তুলনায় মধ্যযুগের বিজ্ঞানকে বেশি প্রশংসা করার একটা রেওয়াজ উঠেছে। এটা নিতান্তই ছেলেমানুষি। তথ্যের দিক থেকেও ভুল এই ধারণাটি মধ্যযুগের যাজক আর ধর্মশাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের প্রতি আদৌ সুবিচার করেনা। তাঁরা যে কৃতিত্ব কোনোদিন দাবি করেননি, সেই কৃতিত্বের বোঝা তাঁদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে তাঁদের সত্যিকারের অবদানকে অস্বীকার করে এই ধারণা। রজার বেকন (প্রায় 1235-1315) খুব চড়া ভাষায় বিশ্রীভাবে তাঁর সমসাময়িকদের নিন্দা করেছিলেন, সেন্ট অ্যালবার্ট আর সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসকে তিনি 'মূর্খ বালক' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এহেন রজার বেকনের মনেও এ ব্যাপারে এতটুকু সন্দেহ ছিলনা যে বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো অন্তরে লব্ধ দৈব প্রত্যাদেশকে শক্তি যোগানো। সমসাময়িকদের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ ছিল এই যে তিনি বিশুদ্ধ যুক্তিবিচারের বদলে অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁর সত্যের প্রমাণ অনুসন্ধান করতেন। মধ্যযুগের পণ্ডিতরা যুক্তিপ্রয়োগের ব্যাপারে, এবং পরীক্ষাকার্যের পরিকল্পনা ও সংঘটনে সম্পূর্ণ পারঙ্গম ছিলেন। কিন্তু এইসব পরীক্ষাকার্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়ে থাকত। গ্রীক আর আরবদের পরীক্ষাকার্যের মতো এইসব পরীক্ষাকার্যও মূলত প্রদর্শনাত্মক ছিল; তা থেকে বড়ো কোনো অগ্রগতি ঘটতনা। মুষ্টিমেয় যেকজন পরীক্ষাবিদ মধ্যযুগে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তার জন্য তাঁদের কৃতিত্ব নিশ্চয়ই প্রাপ্য। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে এইসব পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা প্রকৃতিকে

অনুধাবন করার চেষ্টা বিশেষ করেননি, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা তো আরো কম। সে কাজে ব্রতী হওয়ার কোনো তাগিদ তাঁদের ছিলনা, বরং সে কাজে নিরুৎসাহ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। চার্চের সঙ্গে যুক্ত থাকার দরুন এঁদের আরো অনেক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো। প্রথম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী গেরবার্ট (প্রায 930-1003) পোপের পদ অধিকার করেছিলেন। সেকালের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে সুদক্ষ সেই রবার্ট গ্রোসেটেস্ট (প্রায় 1168-1253) ছিলেন বিশপ এবং অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। মহামতি সেন্ট অ্যালবার্ট ছিলেন ডমিনিক্যান সম্প্রদায়ের প্রাদেশিক ভারপ্রাপ্ত যাজক; গোটা জার্মানি প্রদেশের যাজকীয় দায়িত্ব তাঁব ওপরে ছিল। সেযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা-সংগঠক ফ্রেইবুর্গের ডীট্রিশ্-ও (1300) তাই ছিলেন। এমনকি মধ্যযুগের সবচেয়ে দুঃসাহসী চিন্তাবিদ কুসা-র নিকোলাস-ও (1401-64) পোপতন্ত্রের প্রচাবকর্মে জড়িয়ে পড়েন এবং ব্রিক্সেন-এর বিশপ হন। সুতরাং যেটুকু বৈজ্ঞানিক কাজ তাঁরা করতেন তা তাঁদের কেবল অবসর সময়ের কাজ ছিল।

রজার বেকন আর রহস্যময় পিটার দ পিলগ্রিম এর ব্যতিক্রম। কিন্তু ব্যতিক্রম নিয়মকেই প্রমাণ করে মাত্র। রজার বেকন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য দু হাতে টাকা খরচ করেন, এবং তার পরিণামে পোপের আশিসধন্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। পিটার দ পিলগ্রিম চুম্বকক্রিয়ার পরীক্ষানির্ভর গবেষণার পথপ্রদর্শক ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি একটি ছোটো চিঠি প্রকাশ করেছিলেন (একটু পরে আমরা তা নিয়ে আলোচনা করব)। তাঁর গুণমুগ্ধ রজার বেকনের কথায়, 'ভাষণে এবং বাগযুদ্ধে তাঁহার কোনোই আগ্রহ নাই; তিনি আপন মনে জ্ঞানের চর্চা করিয়া চলেন, তাহার মধ্যেই শান্তি লাভ করেন।'

মধ্যযুগে প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞানচর্চায় অর্জিত সাফল্যগুলির তালিকাটিকে এইভাবে সাজানো যায়: সেন্ট অ্যালবার্ট রচিত প্রকৃতি-ইতিহাস ও আকরিক পদার্থের ওপর কয়েকটি আলোচনা; সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক কর্তৃক রচিত শিকারী পাখিদের ওপর একটি মূল্যবান গ্রন্থ; আল হাজেন-এর আলোকবিদ্যার ওপর ফ্রেইবুর্গ-এর ডীট্রিশ্ এবং ভিটেলো কর্তৃক সাধিত কিছু উন্নতি (রামধনু সম্পর্কে যে বিবরণ এর অন্তর্গত ছিল তার চেয়ে ভালো লেখা নিউটনের আগে আর কেউ লেখেননি); এবং বুরিদাঁ ও অরেস্‌ম্ কর্তৃক লিখিত অ্যারিস্টটলের গতিতত্ত্বের এক সমালোচনা—যা খুব একটা মৌলিক ছিল না। এই কটি সাফল্যের ভিত্তিতে আজ দাবি করা হচ্ছে যে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনালগ্ন হিসেবে ত্রয়োদশ শতাব্দীকে গণ্য করা হোক এবং সেন্ট অ্যালবার্টকে (যাঁকে বহু বিলম্বে 1931 সালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'সেন্ট' মর্যাদায় ভূষিত করা হয়) বিজ্ঞানেব হোতার মর্যাদা দেওয়া হোক।

গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান

গণিত আর জ্যোতির্বিজ্ঞানে মধ্যযুগের কর্মকৃতিত্বের পরিচয় এর চেয়ে খানিকটা ভালো হলেও, মূল ধাঁচটা একই রকম। 'পিসা-র লিওনার্দ' নামে অভিহিত ফিবোনাচ্চি (1202) খ্রিস্টীয় জগৎকে আরবী বীজগণিত ও ভারতীয় সংখ্যামালার সঙ্গে পরিচিত করান। গণিতে তাঁব যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি থাকলেও তিনি কোনো ঘরানা তৈরি করে যেতে পারেন নি। ফলে রেনেসাঁস যুগের আগে গণিতচর্চায় উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি ঘটে নি। বলবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জর্দানুস নেমোরাবিয়াস (মৃত্যু প্রায় 1237) লিভারের তত্ত্ব নিয়ে এক সরল রচনা লেখেন। তাতে তিনি এই নীতি উপস্থাপন করেন যে একটি মেশিনের কৃত কাজ ঐ মেশিনের ওপর চাপানো কাজেব সমান। কিন্তু তখনকার প্রকৌশলের মান যা ছিল তাতে ফলিত বলবিজ্ঞানে এই নীতির কোনো প্রভাব না পড়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রেমোনা-র জেরার 1175 সালে আরবী ভাষা থেকে টলেমির *আলমাজেস্ট* অনুবাদ করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা 'জ্ঞানী' আলফানসো-র আদেশে প্রাচীনতর আরবী জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আধুনিক জ্যোতিষ্ক-তালিকা রচিত হয়। একদিকে টলেমির অনুবাদ, অন্যদিকে এই তালিকার অনুধাবন—এই দুয়ের সম্মিলিত ফলস্বরূপ খ্রিস্টীয় জগতে গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হয়। তবে, যেমন ইসলামী দুনিয়ায় তেমনি এখানেও সে চর্চা প্রধানত বর্ষপঞ্জী রচনা ও জ্যোতিষী গণনার কাজে লাগে। এ ব্যাপারটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে পর্যবেক্ষণ-নির্ভর জ্যোতির্বিজ্ঞানই তখন বিজ্ঞানেব একমাত্র শাখা যেখানে নিখুঁত পর্যবেক্ষণ, গণনা ও ভবিষ্যদ্বানীর আবশ্যকতা ছিল; আর এই ক্ষেত্রেই ইসলামী প্রাধান্য সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। মারাগা (প্রায় 1260) আর উলুঘ বেগ-এর (1394-1449) প্রকাশিত জ্যোতিষ্ক-সারণীর চেয়ে ভালো তালিকা রেনেসাঁস যুগের আগে আর রচিত হয় নি। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গণনাকর্মের কিছু কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপারে মধ্যযুগেব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা, বিশেষত চতুর্দশ শতকে মের্টন কলেজের অন্তর্গত বিদ্যালয়টি, কতকগুলি উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হন। ত্রিকোণমিতিতে এবং যন্ত্রপাতি-নির্মাণেও তাঁরা কুশলতা দেখান। এইসব যন্ত্রপাতির মধ্যে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো 'ক্রস স্টাফ'। এটি হলো সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের একধরনের আদিম রূপ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে যেসব নাবিক সাগর-অভিযানে বেরোন, এ যন্ত্র তাঁদের কাজে লাগে। এটির ব্যবহার প্রচলিত করেছিলেন প্রভঁস্-এর লেভি বঁ গের্স (1288-1344)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ইংরেজিতে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক রচনা বলে অনুমিত একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার বিবরণ অল্পকাল আগে পাওয়া গেছে। এটি হলো *Equatorial Planetatie;* এর সাহায্যে গ্রহের অবস্থান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী করা যায়। জেফ্রি চসার (প্রায় 1340-1400) এটির বর্ণনা দেন, যদিও এটির উদ্ভাবন তিনি করেন নি। 'আমার ছোট্টো ছেলে লিউয়িস-এর জন্য' চসার-রচিত *Treatise on the Astrolabe* অবশ্য বহুকাল ধরেই পরিচিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনো আমূল সংস্কার তখন সাধিত হয় নি। স্যাক্সনি-র অ্যালবার্ট (প্রায় 1357), অরেস্‌ম্ এবং বিশেষ করে কুসা-র নিকোলাস অবশ্য সাহস করে এই ইঙ্গিত দেন যে পৃথিবীই দৈনিক ঘুবে চলে, জ্যোতিষ্কলোক নয়। তাঁদের এই বিরোধী ঘরানার নাম ছিল 'অভিঘাত' (impetus) ঘরানা। কিন্তু তাঁরা কেবল দার্শনিক বিচার করে এই ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন, তাঁরা নিজেরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন না। পেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একেবারে সতেরো শতক পর্যন্ত টলেমিব পথই অনুসরণ করে চলেন।

মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

বিজ্ঞানের ইতিহাসে মধ্যযুগের খ্রিস্টীয় জগতের অবদানকে অতীতে হয়তো কিছুটা অন্যায়ভাবে অবহেলা করা হয়েছিল; কিন্তু আজকে বিপদটা হয়েছে এই যে সেই অবদানকে এতটা বাড়িয়ে দেখা হচ্ছে যে তার ফলে বিজ্ঞানের গোটা ইতিহাসটাই দুর্বোধ্য হয়ে পড়ছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে মধ্যযুগের বিজ্ঞানের ঐতিহ্য সজীব ও উচ্ছ্বসিত রূপে কেবল দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকেই বিরাজ করত; পঞ্চদশ শতকের গোড়াতেই তা নিরর্থক পণ্ডিতি কচকচিতে পরিণত হয়েছিল। রেনেসাঁস যুগের লোকেরা যে কেন 'গথিক বর্বরতা'র প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল তার ব্যাখ্যা এইখানেই পাওয়া যায়। তাছাড়া ধর্মশাস্ত্রীয় পণ্ডিতরা যেসব বিষয় নিয়ে চর্চা করেছিলেন, আলোচনার যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন, সেগুলো কার্যত ইসলামী বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে অভিন্ন। সুতরাং সব মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে মধ্যযুগের বিজ্ঞান এক

মনন-প্রক্রিয়াব সূত্রপাত নয়, বরং অবসানই সূচিত করে। বাইজ্যান্টীয়-সিরিয়-ইসলামী ঐতিহ্য গ্রীক বিজ্ঞানকে নিজের মতো করে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল; সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সে ঐতিহ্যের সামঞ্জস্য বিধানের অন্তিম পর্বটিই মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানের মধ্যে প্রতিভাত হয। প্রাচীন ধ্রুপদী অর্থনীতিব বিপর্যয়ের পরিণতিতে তার উদ্ভব হয়, এবং সেই অর্থনীতির উত্তরসূরী সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির অবক্ষয ও অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানও অবক্ষয়িত ও অবলুপ্ত হয়।

এহেন এক বিজ্ঞানের কাছে নিজকালের চাহিদা মেটানোর বাইরে আর কিছুর প্রত্যাশা করা অন্যায়। মুসলিমদের কাছে এবং খ্রিস্টানদেব কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর-নির্ধারিত বিন্যাসটিকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করাটা ছিল এক মস্ত কাজ। সে বিন্যাসেব বাহ্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে দৈব প্রত্যাদেশেব মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করতে হতো, এবং যুক্তিবিচারের মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ বিমূর্ত যুক্তিশাস্ত্র ও দর্শনেব মধ্যে দিয়ে তাকে সমর্থন করা হতো। এই বিরাট কর্মভার সম্পাদনের প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞানেরও কিছুটা ভূমিকা ছিল ঠিকই, তবে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মধ্যযুগের পণ্ডিতদের মধ্যে সম্ভবত রবার্ট গ্রোসেটেস্ট-এর মনীষা ছিল তীক্ষ্ণতম, মধ্যযুগের বিজ্ঞানের বিকাশে তাঁর প্রভাব ছিল সর্বাধিক; কিন্তু তাঁর মতো মেধাবী মানুষের কাছেও বিজ্ঞান ছিল মূলত ধর্মতাত্ত্বিক সত্যের অভ্রান্ততার নিদর্শন সংগ্রহের এক উপায় মাত্র। আলোককে তিনি দিব্য বিভার সঙ্গে তুলনীয় মনে করেছিলেন বলেই আলোকের চরিত্র নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, হাতেকলমে লেন্সের প্রতিসরণের ব্যাপারটাকে যাচাই করেছিলেন।

যে অল্প দু একজনের চিন্তাধারা ভিন্ন খাতে বইত তাঁদের ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে প্রাণদণ্ড দেওয়াটাই ছিল তখন স্বাভাবিক ব্যাপার; খুব বেশি সদয় হলে তাঁদের উপেক্ষা করা হতো। এক্ষেত্রেও গ্রোসেটেস্ট-এব ছাত্র রজার বেকন্‌ই আমাদের দেখিয়ে দেন যে মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা কতদূরে সবে এসেছি। রজার বেকনের মধ্যে মধ্যযুগের বিজ্ঞান অভ্রান্ত বাণীমূর্তি ধাবণ করেছিল। তিনি মানুষেব সেবার্থে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনের কথা প্রচার করেন, ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে একদিন জ্ঞানের সহায়তায় মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে সমর্থ হবে। মোটর-চালিত জাহাজ, গাড়ি এবং এরোপ্লেনের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি, এমন এক আলকেমি-ভিত্তিক বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ বিকাশেব কথা বলেছিলেন 'যাহা মনুষ্যের আয়ুবৃদ্ধি ঘটানোর উপযোগী নানাবিধ বস্তু আবিষ্কারের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষাদান করে।' এত সব কিছু সত্ত্বেও কিন্তু মূলত ধর্মতাত্ত্বিক কারণেই তিনি বিজ্ঞানে উৎসাহী হযেছিলেন। ধ্যানের মাধ্যমে পূর্ণ-সংহত এক প্রজ্ঞাকে লাভ ক'রে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাকে আয়ত্ত ক'বে, ঈশ্বরের সেবায় তাকে নিয়োগ করাই ছিল তাঁর সাধনা; অন্তবে লব্ধ প্রত্যাদেশের মতো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও সেই প্রজ্ঞার এক অংশমাত্র।

খ্রিস্টধর্মোক্ত সত্যসমূহকে অভ্রান্ত বলে, পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃত *উদ্দেশ্যের* নির্দেশক বলে, প্রমাণ করাটা তখন খুবই জরুরি ছিল। সেই প্রয়োজনের কাছে বাকি সব কিছু ছিল গৌণ। পবিত্র শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকরণ আর ঐতিহ্যবাহিত কৃত্যের মধ্যে দিয়ে কী করে মুক্তি অর্জন করতে হবে সে জ্ঞান একমাত্র চার্চেরই আয়ত্ত, কোনো জাগতিক জ্ঞানের সাধ্য কী তার কাছে পৌঁছয়—এই ভাবনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মধ্যযুগের চিন্তাবিদরা যাবতীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে এক সুবিন্যস্ত ক্রমে সাজিয়ে ফেলতে উদ্যোগী হলেন। যাবতীয় জ্ঞানের সমন্বয়ে তাঁরা যে সুবিশাল বিশ্বছবি রচনা করলেন তার মধ্যে মানুষের জ্ঞাতব্য যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েব সারাৎসার স্থান পেল। এই সর্ববিদ্যাসংগ্রহের প্রবণতা মধ্যযুগে সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করে। কেবল অ্যাকুইনাসের *Summa*-র নিটোল যুক্তিশাস্ত্রীয় ছকের মধ্যেই নয়, বহু সর্বজনীন তথ্য-সংবলিত

আরো অনেক রচনার মধ্যেই এই প্রবণতা মূর্ত রূপ ধারণ করে। ইংরেজ চিন্তাবিদ বার্থলমিউ (প্রায় 1230-40) আর বোভে-নিবাসী ভঁ্যাসঁ-র (মৃত্যু প্রায় 1260) রচনা এর উদাহরণ। ভঁ্যাসঁ-র *Speculum Majus* নামক গ্রন্থটি ছিল সুদীর্ঘ; আঠেরো শতকে ফরাসি 'বিশ্বকোষ' *(Encyclopédie)* রচনার আগে অব্দি ওটিই ছিল দীর্ঘতম গ্রন্থ।

মধ্যযুগে রচিত বিশ্বছবি

মধ্যযুগের এই বিশ্বছবিটি নিয়ে দু কথা বলা প্রয়োজন। কারণ এটা তো অনস্বীকার্য যে প্রধানত ঐ ছবিটাকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রয়াসের মধ্যে থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। আধুনিক বিজ্ঞানের অঙ্গে সে সংগ্রামের বহু ক্ষতচিহ্ন আজও রয়ে গেছে। গ্রীক, আববী এবং মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার সমন্বয়জাত ঐ বিশ্বছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সুসম্পূর্ণতা এবং ক্রমবিন্যস্ত কাঠামো। অ্যারিস্টটল এবং অ্যালেকজান্ড্রিয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে ঈশ্বব-পরিব্যাপ্ত মহাজাগতিক ছকের কথা বলেছিলেন তা অবশেষে এক অনড় ধর্মতাত্ত্বিক ও ভৌত ছকেব মধ্যে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। সে জগৎ বহু গোলকের দ্বারা পূর্ণ—চন্দ্রগোলক, সূর্যগোলক; বিভিন্ন গ্রহরূপ গোলক; সর্বোপরি স্থির তারকাখচিত এক মহাগোলক, যার ওপারে স্বর্গের অবস্থান। ধর্মতাত্ত্বিক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনে এক রসাতলেরও পরিকল্পনা করতে হলো—যা বহু বৃত্ত ও গহ্বরে পরিপূর্ণ। দান্তের *কুম্ভীপাকে (Inferno)* তার ভয়াবহ বর্ণনা রয়েছে। উচ্চনীচ মর্যাদার স্থায়ী ক্রমে সাজিয়ে এই বিশ্বকে নির্মাণ করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হলো। ইহুদি আর খ্রিস্টীয় বিশ্বাসমতে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল এক চোটে, তার বিলয়ও হবে এক চোটে। অন্যদিকে অ্যারিস্টটলের মতে এই বিশ্ব চিরবিরাজমান। এই দুই মতের মধ্যে আপসবফা করে মধ্যযুগের বিশ্বছবিটি রচিত হয়। সে আপসবফা এই রকম: এ জগৎ এক মধ্যবর্তী জগৎ; এর নিজস্ব নিয়ম থাকলেও আসলে তা এক নাট্যমঞ্চ মাত্র, যাতে প্রতিটি মানুষ সারাজীবন ধরে যে ভূমিকা পালন করে তারই ভিত্তিতে হয় তাব অন্তিম মুক্তি নতুবা নরকপ্রাপ্তি নির্ধারিত হয়।

ক্রমবিন্যস্ত কাঠামো

ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত সামাজিক কাঠামোই ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিন্যস্ত কাঠামোর মধ্যে প্রতিফলিত হলো। সমাজে যেমন পোপ, বিশপ আর আর্চবিশপের এবং সম্রাট, রাজা ও ভূম্যধিকারীদের অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনি স্বর্গলোকের কাঠামোতেও মোট নয়টি মার্গে বিন্যস্ত দেবদূতদের অস্তিত্ব কল্পনা করা হলো: সেরাফ, চেরাব ও থ্রোন; ডমিনেশন, ভার্চু আর পাওয়ার; প্রিন্সিপ্যালিটি, আর্কেনজেল্ ও এনজেল। এগুলি সবই আমাদের পূর্বোল্লেখিত 'জাল ডায়োনিসিয়ুসে'র কল্পনার ফসল। ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনার কাজে এই প্রত্যেক মার্গের দেবদূতদেব একেকটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে। যথাযোগ্য মর্যাদা অনুসারে তারা গ্রহ-গোলকগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত থেকে তাদের সঠিকভাবে গতিশীল রাখে। নিম্নতম মার্গের দেবদূত হলো 'এনজেল'রা; এরা চন্দ্র-গোলকের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং ঠিক নিম্নবর্তী মনুষ্যজগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হতো যে তিন ধরনের ব্যবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে. মহাজাগতিক ব্যবস্থা. সামাজিক ব্যবস্থা এবং মনুষ্যদেহের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা। প্রতিটি ব্যবস্থাই হলো 'স্বাভাবিক দশা'; প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হলে পুনরায় সেই স্বাভাবিক দশা ফিরে পেতে চায়। বিশ্বসংসারে প্রতিটি জিনিসের স্থান সুনির্দিষ্ট, এবং প্রতিটি জিনিস জানে তার স্থান কোথায় নির্দিষ্ট রয়েছে। মূল পদার্থগুলো নির্দিষ্ট ক্রমে বিন্যস্ত: সবার নিচে মাটি, তার ওপরে জল, জলের ওপরে বায়ু, এবং সবার উপরে অগ্নি—যা কিনা মহত্তম পদার্থ। শরীরের উন্নত অঙ্গ হলো হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস; পেটের ভেতরকার নিকৃষ্ট অঙ্গগুলোর থেকে তাদের স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে মধ্যচ্ছদার

(diaphragm) দ্বারা। এই সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পশুপক্ষী এবং গাছপালারও যথাযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। মানুষের নিত্যপ্রয়োজন তো তারা মিটিয়ে দেয়ই, উপরন্তু মানুষের সামনে নানান নৈতিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরে, যেমন পিঁপড়ের শ্রমশীলতা, সিংহের সাহসিকতা, পেলিক্যানের আত্মোৎসর্গপরায়ণতা। এই মহাবিশ্ব সুবিশাল ও জটিল হলেও খুবই সুবিন্যস্ত। শুধু তাই নয়, যুক্তিগ্রাহ্যতার দিক থেকেও তা আদর্শ। প্রাচীন কালের জ্ঞানী ব্যক্তিদের সর্বতোভাবে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে বাইবেলোক্ত প্রশ্নাতীত সত্যাদির এবং চার্চের ঐতিহ্যসম্মত কৃত্যগুলির সম্মিলন ঘটে ঐ মহাবিশ্ব-ব্যবস্থার মধ্যে। এই বিশ্বছবির কোনো কোনো খুঁটিনাটির ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন ঘরানার মধ্যে মতভেদ থাকলেও, ঐ ছবিটা যে মূলত সত্য তা নিয়ে কারো কোনো সংশয় ছিল না। তাঁদের মতে মূল সমস্যাটার স্থায়ী সমাধান তাঁরা চিরকালের মতো করে ফেলেছিলেন। তাঁদেব ব্রহ্মান্ড ছিল ব্যবহারিক দিক থেকে উপযোগী, ধর্মতাত্ত্বিক বিচারে নিশ্ছিদ্র এবং অতি চমৎকারভাবে যুক্তিসিদ্ধ।

6. নবনব প্রকৌশল সহযোগে মধ্যযুগীয় অর্থনীতির রূপান্তর

এই পরিপ্রেক্ষিতটা মাথায় রাখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না কেন এই বিশ্বছবির কোনো একটি অংশের ওপরে আঘাত এলে তাকে গোটা সমাজব্যবস্থার ওপর, ধর্মের ওপর, এমনকি খোদ ব্রহ্মান্ডব্যবস্থার ওপর আঘাত রূপে গণ্য করা হতো। সে আঘাতকে নিছক বুদ্ধিগত স্তরে রদবদলের মধ্যে দিয়ে সামলে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং চার্চ এবং রাষ্ট্রের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সর্বপ্রযত্নে সে আঘাতকে প্রতিহত করা আবশ্যক ছিল। মধ্যযুগের চিন্তাভাবনার প্রণালীটা ছিল সর্বতোভাবে রক্ষণশীল। বাইরে থেকে নাড়া না খেলে হয়তো আজও সে চিন্তাপ্রণালী অটুট থাকত। কিন্তু তা হয় নি। মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা যতই পরিবর্তন-নিরোধী হয়ে উঠতে প্রয়াসী হোক, মধ্যযুগের অর্থনীতি স্থাণু হয়ে থাকে নি।

আমরা আগেই দেখেছি, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা আপন গর্ভের মধ্যেই নিজের রূপান্তরের বীজ বহন করছিল। ধরা-বাঁধা বাধ্যতামূলক সেবাকর্মের ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতির বদলে পণ্যসামগ্রী-নির্ভর এবং টাকা-নির্ভর অর্থনীতির উদ্ভবের পথ নিরন্তর প্রশস্ত হয়ে উঠছিল। তার কারণ হলো প্রসারমান বাণিজ্য, আর পরিবহন ও ম্যানুফ্যাকচারের উন্নততর প্রকৌশল। এই অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রকৌশলগত দিকটির অভিঘাতেই মধ্যযুগেব স্থিতিশীল, ন্যায়শাস্ত্রসম্মত বিজ্ঞানের বদলে পরে এক নবীন, প্রগতিশীল, পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। কারণ প্রকৌশলের অগ্রগতি রেনেসাঁস যুগের মানুষের সামনে এমন সব পরিস্থিতি ও সমস্যা তুলে ধরে যার মোকাবিলায় প্রাচীন জ্ঞান অপারগ ছিল।

মননগত স্তরে বদবদল ঘটে পরবর্তী যুগে: কিন্তু যেসব প্রকৌশলগত পরিবর্তন সে বদবদল ঘটায় তা ঘটেছিল মধ্যযুগেই। প্রকৃত পক্ষে সেইসব পরিবর্তনই হচ্ছে ভবিষ্যৎ যুগের বৈজ্ঞানিক সভ্যতাব উদ্দেশে মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। মধ্যযুগের সমাজ আপাতদৃষ্টিতে এতই সুবিন্যস্ত এবং পরিবর্তন-নিরোধী ছিল যে প্রকৌশলের এইসব পরিবর্তন বহুদিন ধরে চার্চের প্রতিবেদন-রচয়িতাদের গোচরেই আসে নি। জমিদারি হিসাবপত্রে ও মামলা-মকদ্দমায় কিন্তু এসবেব সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। ভিলাব দ অনকুর (প্রায় 1250) নামক এক ওস্তাদ রাজমিস্ত্রীর নোটবইতে এধরনের এক মূল্যবান দলিল পাওয়া গেছে। সেই নোটবইতে নানাবিধ যন্ত্রকৌশল সংক্রান্ত হিসেবনিকেশ এবং রেখাচিত্র রয়েছে। অথচ মধ্যযুগের পণ্ডিতদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই প্রকৌশলের ব্যাপার নিয়ে কথা বলেছিলেন, তাকে বোঝবার চেষ্টা তো প্রায় কেউই

a

b

c

d

1

3

Leo.
Virgo
Libra.
Scorpio.
Pisces. similes
cancro.

M
A

F
G
A
D
D
D
E
E
E

PVS A·
RITH
TICAE·
BOETIVS
RAS
PY

ANDREAE VESALII
Libri septem.

Oceanica Classis

GALILEO GALILEI LINCEO FILOSOFO E MATEMATICO DEL SER.mo GRAN DVCA DI TOSCA
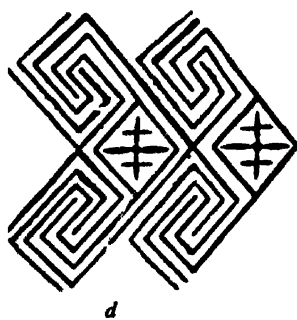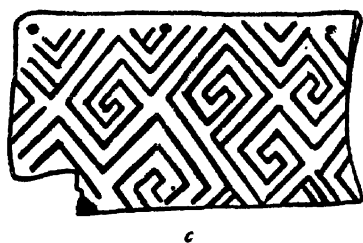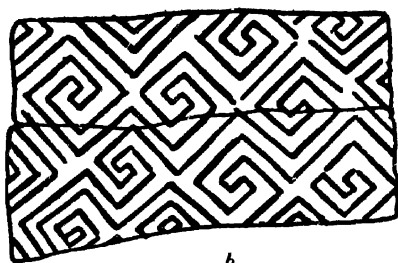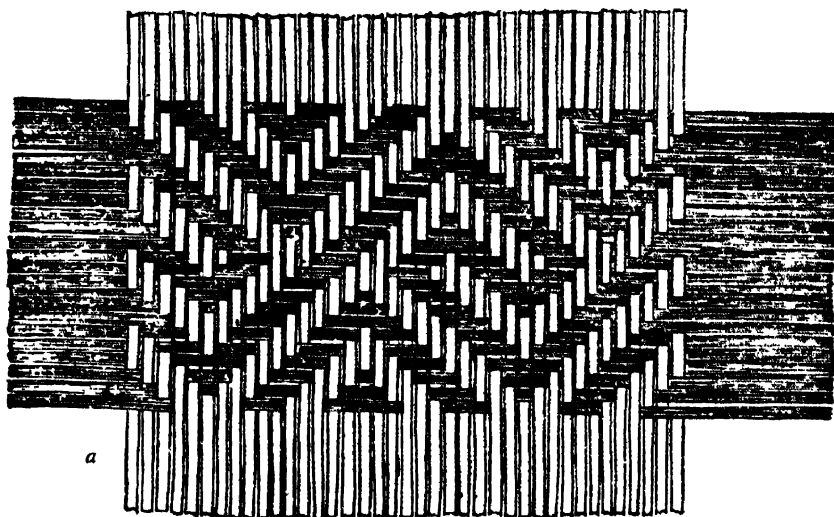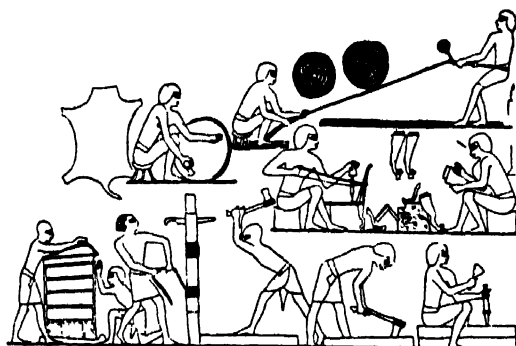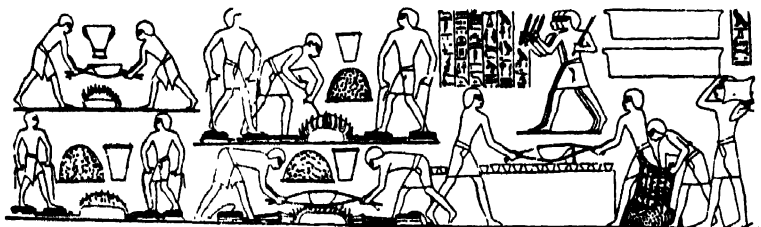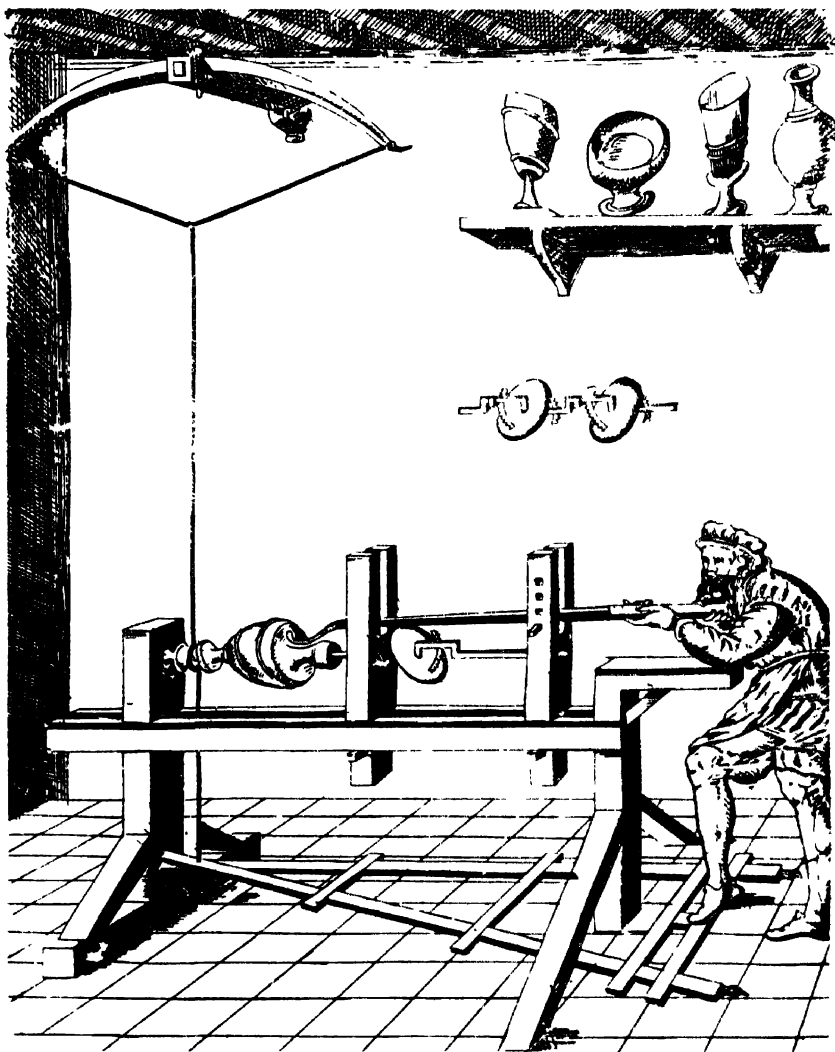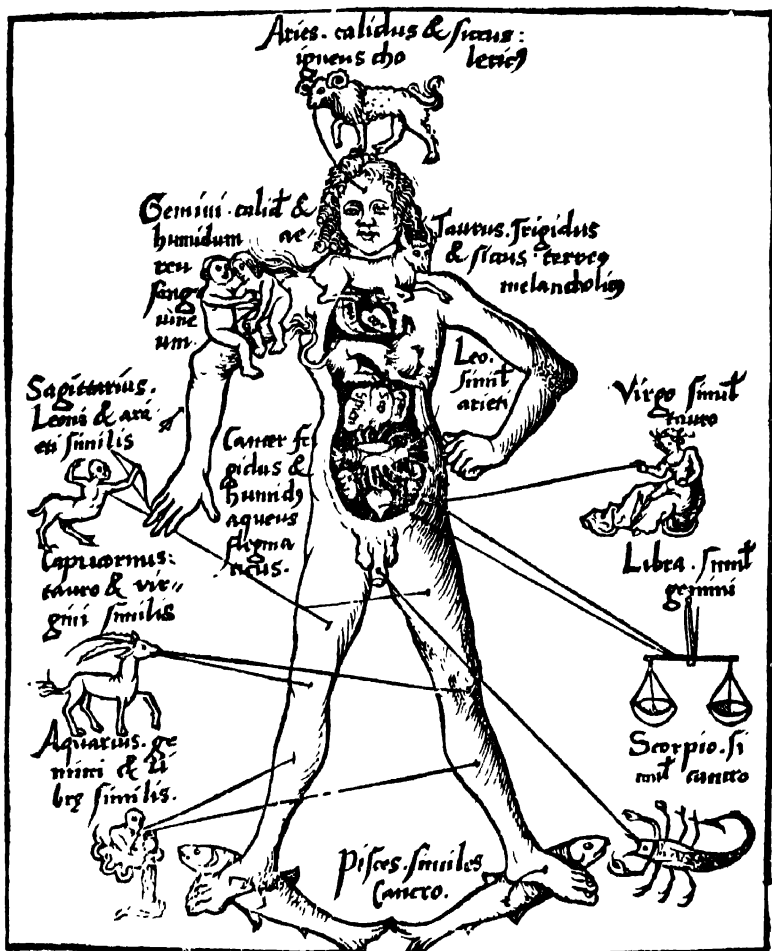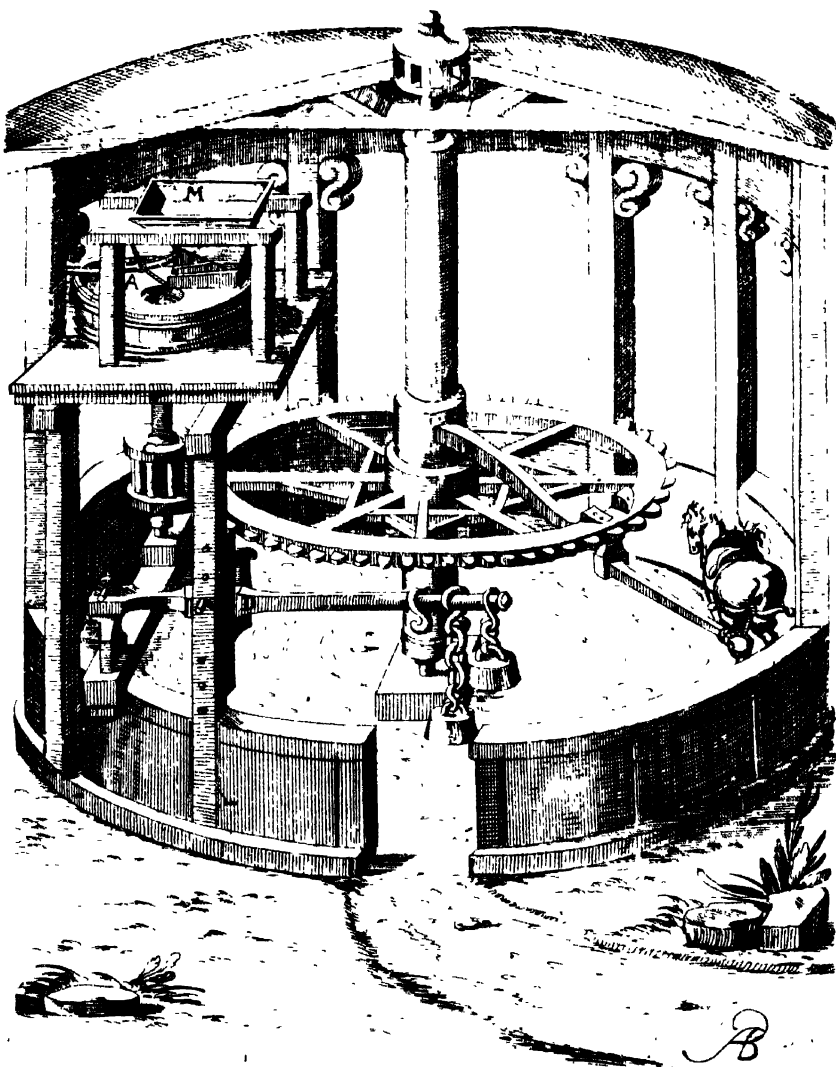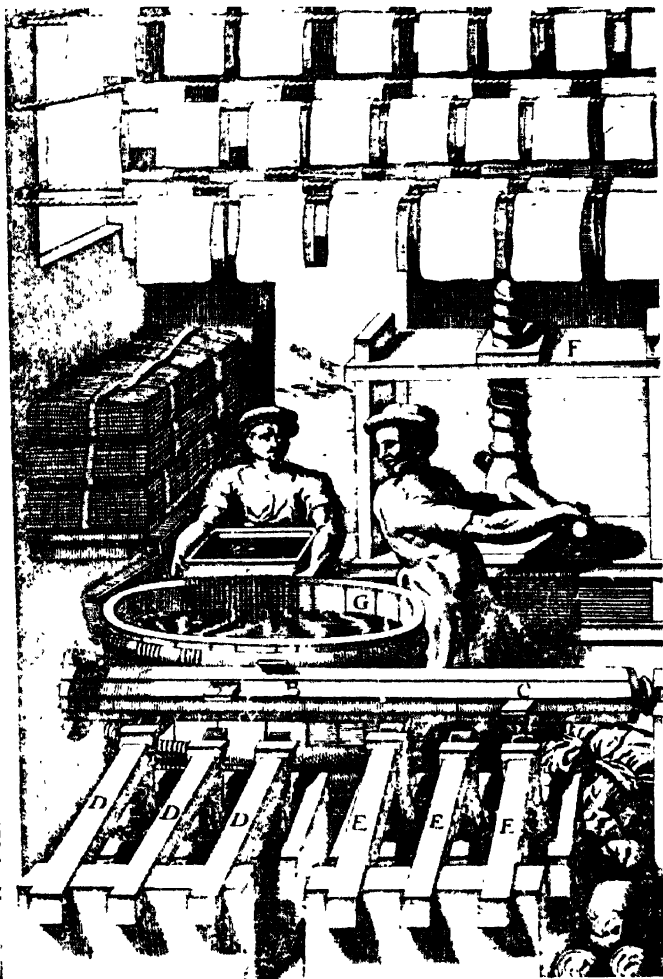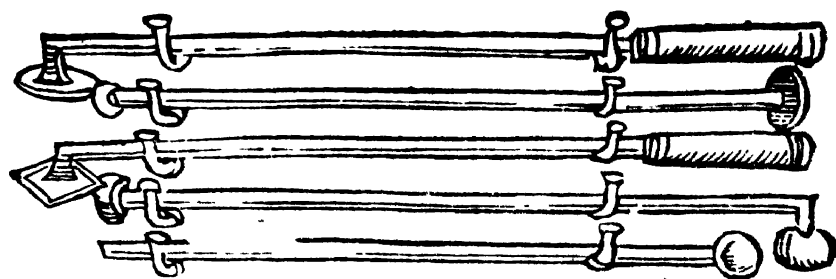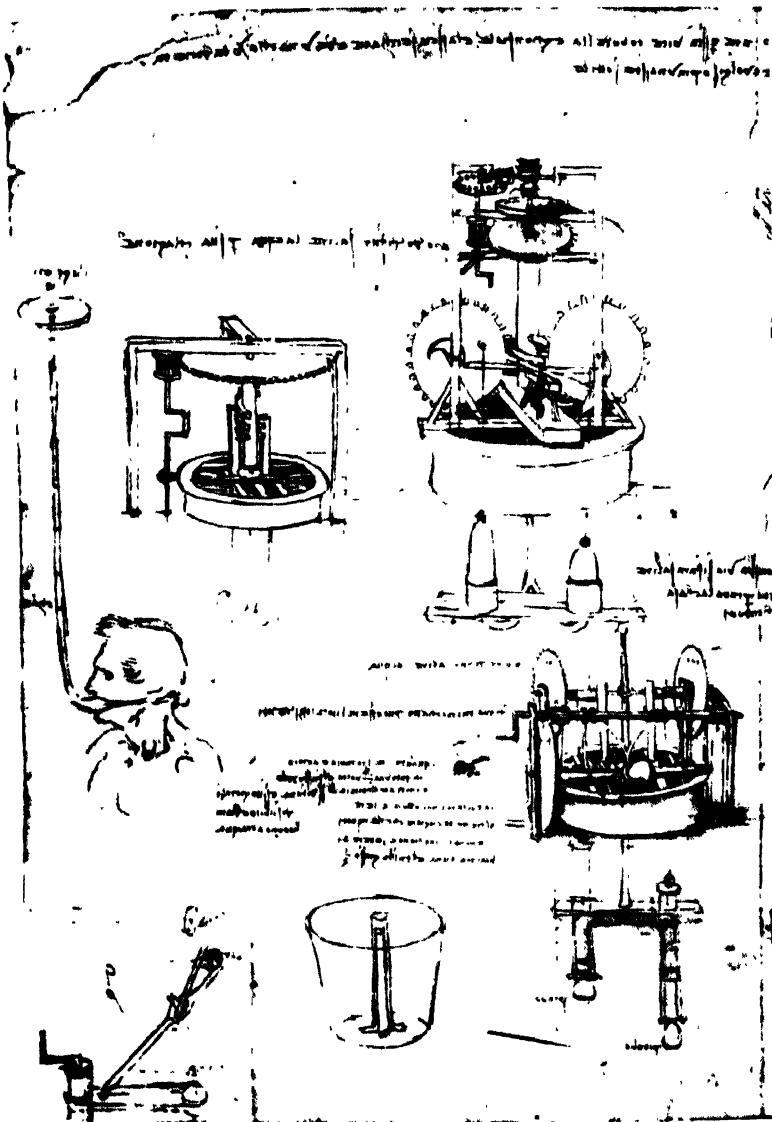
PHILOSOPHIÆ
NATURALIS
PRINCIPIA
MATHEMATICA

Autore *J S. NEWTON, Trin. Coll. Cantab. Soc.* Mathefeos Profeffore *Lucafiano*, & Societatis Regalis Sodali.

IMPRIMATUR·
S. PEPYS, *Reg. Soc.* PRÆSES.
Julii 5. 1686.

LONDINI,

Juffu *Societatis Regiæ* ac Typis *Jofephi Streater*. Proftat apud plures Bibliopolas. *Anno* MDCLXXXVII.

করেন নি। প্রকৌশলগত ব্যাপারে পণ্ডিতদের আগ্রহ যে কত বিরল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পিটার দ পিল্‌গ্রিম-এর রজার বেকন রচিত প্রশস্তির মধ্যে। বেকন লিখেছেন: 'পরীক্ষা সহযোগে তিনি প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কবিয়াছেন। ভেষজবিদ্যা, অপরসায়ন এবং জ্যোতিষ্কলোক ও তন্নিম্ন লোকের যাবতীয় বিষয় তাঁহার জ্ঞাত। যদি কোনো অশিক্ষিত ব্যক্তি, কোনো বৃদ্ধা বা কোনো গ্রাম্য ব্যক্তি কিংবা কোনো সৈনিক তাঁহাকে মৃত্তিকা সম্বন্ধে এমন কিছু জ্ঞান দান করিতে পারে যাহা তাঁহার অজ্ঞাত, তবে তিনি লজ্জা বোধ কবিবেন। ধাতু ঢালাই করার বিদ্যা: স্বর্ণরৌপ্যাদি বিভিন্ন ধাতু এবং আকরিক লইয়া কর্ম করিবার বিদ্যায় তিনি পটু। যুদ্ধকর্ম, অস্ত্রশস্ত্র এবং মৃগয়া সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় তাঁহার করায়ত্ত। কৃষিকর্ম, জমির জরিপকার্য এবং খামারপালন বিষয়ে তিনি পবীক্ষা-নিরীক্ষা কবিয়াছেন। এমনকি বহুকাল-প্রচলিত তুকতাক এবং ভবিষ্যৎ-গণনা লইয়াও তিনি বিচারবিবেচনা করিযাছেন। তিনি এইসকল এবং যাবতীয় জাদুকরদিগের নানাবিধ জাদুকৌশল লইয়া চর্চা করিযাছেন। বিভিন্ন কৌশলে যাঁহারা মাযাবিভ্রম প্রদর্শন করেন তাঁহাদেব বিদ্যাও তাঁহার অনায়ত্ত নহে। কিন্তু তিনি সম্মান ও পুবস্কারাদিকে অবজ্ঞা করেন, মনে করেন যে উহারা তাঁহার পরীক্ষানির্ভর সুমহৎ কর্মকাণ্ডের পক্ষে বাধাস্বরূপ।' ধর্মশাস্ত্রীয় পণ্ডিতরা কিন্তু এহেন আদর্শে একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। একদিকে মুক্তি, অন্যদিকে পদোন্নতির সঙ্গে যার সম্পর্ক ক্ষীণ সে বিষয়ে তাঁদের প্রায় কোনোই আগ্রহ ছিল না। রেনেসাঁস যুগের 'হিউম্যানিস্ট'রা, যাঁরা বিশ্বাস কবতেন যাবতীয় ভালো জিনিসের উৎস হলো গ্রীস আর রোম, তাঁরা খুব সচেতনভাবেই মধ্যযুগের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে অস্বীকাব করেন। সমগ্র মধ্যযুগের যাবতীয় কর্মসিদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁরা বিদ্রোহ করেছিলেন, মধ্যযুগকে 'বর্বরোচিত এবং গথিক' বলে ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

মধ্যযুগের স্থাপত্যকর্ম

কিন্তু আজকের দিনে আমরা আর সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে মরণ-বাঁচন সংগ্রামে লিপ্ত নই; কাজেই আমরা অনেক খোলা চোখে ব্যাপারটাকে দেখতে পাই। মধ্যযুগের গথিক স্থাপত্যের দিকে তাকানো মাত্র আমরা বুঝতে পারি, ঐ তিনশোটি বছরে প্রকৌশলে অতি দ্রুত অগ্রগতি ঘটেছিল। ব্রিটেনের নর্মান স্থাপত্যরীতির ছায়াচ্ছন্ন বিশালত্ব থেকে আরম্ভ করে 'পার্পেন্ডিকুলারে'ব লঘুভার উজ্জ্বলতা তারই সাক্ষী। বস্তুত, মধ্যযুগের প্রকৌশল ও চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠতম এবং সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল স্থাপত্যকর্মে। তবে এই সাফল্য পুরোপুরিই প্রকৌশলগত, একে বৈজ্ঞানিক সাফল্য বলা ঠিক হবে না। গম্বুজ আর 'buttress'-এর গঠনগুলি ছিল অনিন্দ্য; গ্রীক আর রোমানরা কখনো ঐ ধরনের গঠনকার্যে হাত দিতে ভরসা পায় নি। কিন্তু একই সঙ্গে একথাও মানতে হবে যে এই সমস্ত অপূর্ব উদ্ভাবনগুলির প্রত্যেকটাই একেকটি স্বতন্ত্র ব্যবহারিক সমস্যার স্বতন্ত্র সমাধান হিসেবে জন্ম নিয়েছিল। এসবের মধ্যে তত্ত্বের কোনো স্থান ছিল না; থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ খিলান নির্মাণের পেছনে যে তত্ত্ব নিহিত, তার আবিষ্কার তো আধুনিক যুগের ঘটনা, যদিও তার নির্মাণ-কৌশল অনেকদিন ধরেই জানা। এই কারণেই বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মধ্যযুগের স্থাপত্যকর্মের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান নেই বললেই চলে। কিন্তু মধ্যযুগের অন্যান্য বেশ কয়েকটি উদ্ভাবন বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছিল। কম্পাস বা বারুদের আবিষ্কার নব্য বিজ্ঞানের বনেদ গড়ে দিয়েছিল। গাড়িতে ঘোড়া জোতার সরঞ্জাম বা জলযানের পিছনে-বসানো হালের আবিষ্কারের ফলে উৎপাদনশীলতা যেভাবে বেড়ে যায় তা বিজ্ঞানকে পরোক্ষে প্রভাবিত করে।

প্রাচ্যের এবং চীনের প্রকৌশল-উদ্ভাবন

মধ্যযুগের ইউরোপে প্রকৌশলে যে অগ্রগতি ঘটে তার মূলে ছিল কিছু নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের সদ্ব্যবহার ও উন্নতিসাধন। সেইসব উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের দৌলতেই ইউরোপীয়রা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার—এবং পরিশেষে অনুধাবন করার—ব্যাপক শক্তি অর্জন করে। ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান ঐতিহ্য তাদের সেই শক্তি দেয় নি। লক্ষণীয়, প্রধান প্রধান উদ্ভাবনগুলির কোনোটিই সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে আবিষ্কৃত হয় নি। ঘোড়ার গলাবন্ধ, ঘড়ি, কম্পাস, জলযানের পিছনে-বসানো হাল, বারুদ, কাগজ, মুদ্রণ—এসবই প্রাচ্য থেকে, প্রধানত চীন থেকে আহরিত বলে মনে হয়।

চীনের প্রকৌশল ও বিজ্ঞানের উদ্ভব এবং ইতিহাস বিষয়ে ড· জোসেফ নীডহ্যামের অমূল্য গবেষণা থেকে আমরা চৈনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে উত্তরোত্তর বেশি করে জানতে পারছি। এবিষয়ে আমাদের জ্ঞান যতই বাড়ছে ততই আমরা সমগ্র বিশ্বের পটভূমিকায় চীনের প্রকৌশলগত বিকাশের সুবিপুল গুরুত্বটি বুঝতে পারছি। ইতিমধ্যেই যতটুকু জানা গেছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে 'পাশ্চাত্য খ্রিস্টীয় সভ্যতা'র তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাটি দুনিয়ার বাকি অংশ সম্বন্ধে পশ্চিমের এক ঔদ্ধত্যমিশ্রিত অজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৌশলের জ্ঞানের সঞ্চার ঠিক কীভাবে ঘটে তা প্রমাণ করা সর্বদাই কঠিন; কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে পশ্চিম ইউরোপে যেসব উদ্ভাবন দশম শতাব্দীতে বা তারও পরে ঘটে, তার মধ্যে অনেকগুলির পূর্ণ বিবরণ চীনে প্রথম দুয়েক শতাব্দীতেই পাওয়া যায়।

তবে, অতকাল আগে প্রকৌশলে এমন অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও চীন—কিছু পরিমাণে ভারতবর্ষ এবং ইসলামী দেশগুলিও—মস্ত সম্ভাবনার আশা জাগিয়ে কেন পঞ্চদশ শতাব্দীর আগেই একেবারে নির্বাপিত হয়ে গেল; কেন প্রাচ্য সভ্যতা প্রকৌশলের এক উচ্চমানের স্তরে স্থাণু হয়ে রইল;—সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া এখনো বাকি। চীনের এই পরিণতির কারণ হিসেবে ড· নীডহ্যাম আমলাতান্ত্রিক 'মান্দারিন' বর্গের অভ্যুদয়কে দায়ী করেছেন। এঁদের শিক্ষা ছিল সাহিত্যভিত্তিক। প্রকৌশলের উন্নতি সাধনের ব্যাপারে এঁদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না, এঁরা বণিক সম্প্রদায়কে দমন করার ব্যাপারেই বেশি উৎসাহী ছিলেন। অথচ প্রকৌশলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কেবল ঐ নতুন-বাজার-সন্ধানী বণিকদেরই ছিল।

বস্তুত ইউরোপে ঠিক সেই ঘটনাটাই ঘটে। নবোদ্ভাবিত কৌশলগুলি যতটা পারা যায় ব্যবহৃত হতে থাকে। তার ফলে প্রকৌশলে এক বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া চালু হয়ে যায়। একটু একটু করে সে প্রক্রিয়া বেগবান হয়ে উঠে অবশেষে বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও বাণিজ্যের অভিঘাতে সামন্ততান্ত্রিক সংগঠনকে ভেঙে ফেলার কাজে সহায়ক হয়। গ্রামে গ্রামে কৃষি-উৎপাদনের উন্নততর পদ্ধতি চালু হওয়ার অর্থই হলো বিনিময়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি। বিপুলায়তন সামগ্রীর উন্নততর পরিবহন চালু হওয়ার পরোক্ষ প্রভাবে জমির উৎপাদশীলতাও বাড়ে। কারণ আগে উপযুক্ত পরিবহনের অভাবে বাধ্য হয়ে একই জমি থেকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে হতো; অথচ সে জমি হয়তো একটা বিশেষ কোনো ফসল চাষেরই উপযোগী। যেমন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের বোর্দো অঞ্চলকে একান্তভাবেই সুরা প্রস্তুত করার দ্রাক্ষা চাষের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, সুরাই ছিল প্রথম বিপুল পরিমাণে পরিবাহিত পণ্যদ্রব্য। ভারি ওজনের যে একক আজও আমাদের মধ্যে চালু সেই টন (ton) আদিতে ছিল সুরার পিপে বা টান্-এর (tun) ওজন। বাণিজ্য এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বণিকদের, এবং সেই সূত্রে শহরের গুরুত্ব বাড়ে, ফলে শহরে ও গ্রামে হস্তশিল্প বিকাশ লাভ করতে থাকে।

ভবিষ্যতের নিরিখে মধ্যযুগের অর্থনীতির যে বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এই যে

শহর গ্রামের ওপব আধিপত্য বিস্তাব কবে নি। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার দৌলতে গ্রামাঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল; অপবদিকে ক্রীতদাসেদের অভাবে পুরোনো গ্রীক-বোমান ধবনের কেন্দ্রীভূত কর্মশালাও গড়ে উঠতে পারে নি। নতুন যেসব কৌশল প্রচলিত হয় তাব কল্যাণে যে উৎপাদন-শিল্প গড়ে ওঠে তা শত শত গ্রাম জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল। বায়ুচালিত বা জলচালিত কল যখন শক্তি যোগান দেওয়ার প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়াল তখন তো উৎপাদন-শিল্প খুবই পবিব্যাপ্ত রূপ ধারণ করল, কারণ তাদের সুবাদে খরস্রোতা ছোটো নদী এবং বায়ুবিক্ষুব্ধ পাহাড় ববাবর উৎপাদনেব প্রসাব ঘটল। আকরখনন আব ধাতু বিগলনেব (smelting) কাজ স্বভাবতই গ্রামাঞ্চলেব বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে কবতে হতো। উৎপাদন এইভাবে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকার ফলে উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিকেব স্থায়ী ঘাটতি দেখা দেয়, যে কথা আমবা আগে উল্লেখ করেছি। তার ফলে যান্ত্রিক উদ্ভাবনশীলতার ওপর জোব পড়ে। গ্রামাঞ্চলে কাজ করার আরো একটা সুবিধে ছিল। উদ্ভাবিত নতুন নতুন প্রক্রিয়াব ওপর শহরেব কারুসংঘেব লোকেবা যে নিষেধাজ্ঞা জারি কবত সেগুলোকে এব ফলে এড়ানো যেত। কারুসংঘেব লোকেরা শহরে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করত পাছে তারা নিজেবা কর্মহীন হয়ে পড়ে।

ঘোড়া জোতবার সরঞ্জাম

ওপরে আমরা যেসব উদ্ভাবনের কথা বললাম, তার মধ্যে ঘোড়াব গলাবন্ধ ও জলকল এবং হাওয়াকল হচ্ছে মূলত শক্তি সম্প্রেরণের কার্যকব পন্থা। এর মধ্যে প্রথমটিব প্রভাব তৎক্ষণাৎ অনুভূত হয়। আগে ঘোড়ার বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে পটি বাঁধা হতো, যে কাবণে ঘোড়ার শ্বাসনালীব ওপর চাপ পড়ত। কিন্তু তাব বদলে এই গলাবন্ধ চালু হওয়ায় ঘোড়াব বুকের বদলে কাঁধের ওপর চাপ পড়ল। এব ফলে ঘোড়ার বোঝা টানবার ক্ষমতা পাঁচ গুণ বেড়ে গেল। সপ্তম শতাব্দীতে চীনে উদ্ভাবিত এই প্রকৌশলটি ইউরোপে প্রচলিত হয় একাদশ শতকের গোড়ায়। এব সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ লাঙল চালানোব কাজে বলদের পরিবর্তে ঘোড়া জোতা হলো, উপরন্তু যে সমস্ত জমি বলদ দিয়ে চাষের অনুপযুক্ত তা-ও চাষের আওতায় চলে এল। তাছাড়া গরুর গাড়ির বদলে ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন ঘটল। একই সঙ্গে ঘোড়ার ক্ষুরে নাল লাগানোব প্রথা চালু হওয়ায় মালবহনের জন্যে এবং মালগাড়ি টানবাব জন্যে সড়ক পথে ঘোড়াব ব্যবহার শুরু হয়ে গেল। ঘোড়া জোতার এইসব সরঞ্জাম প্রবর্তনেব সুফল সবাব আগে ফ্র্যাঙ্ক আর নর্মানদের দেশে প্রকট হয়ে ওঠে। এর দরুন নর্থ সী এবং ইংলিশ চ্যানেল সন্নিহিত অঞ্চলটি আস্তে আস্তে উৎপাদনের এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সুফলা জমি আর খরার প্রকোপমুক্ত জলবায়ুর কল্যাণে ঐ অঞ্চল এই বিকাশের পক্ষে বিশেষভাবেই অনুকূল ছিল। শস্য, মাছ, চামড়া, কাঁচা পশম আর কাপড়—এইসব নতুন 'ভারি' পণ্যেব উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সম্ভার শঁপায়েঁ-র (Champagne) মতো বড়ো বড়ো হাটে নিয়ে আসা হতো। ঐসব হাটে পূর্বদেশ এবং দক্ষিণদেশ থেকে আনীত অপেক্ষাকৃত সুপরিণত কিন্তু হালকা জিনিসপত্রেব সঙ্গে পূর্বোক্ত পণ্যসম্ভার বিনিময় করা হতো।

হাওয়াকল ও জলকল

জলশক্তি-চালিত কলের সত্যিকারের উদ্ভাবন ঘটেছিল ধ্রুপদী যুগেই। ভিট্রুয়াস্-এর (প্রায় 50 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) রচনায় ঐ প্রকার একটি কলের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সঠিক অর্থে জলচালিত কলকে মধ্যযুগের এক কৌশল বলাটাই সংগত। কারণ মধ্যযুগেই এর ব্যবহার ব্যাপক হয়ে ওঠে। রোমক যুগে মাত্র কতিপয় জলকল চালু ছিল, জলধারাগুলি সে কল চালানোর পক্ষে খুব উপযোগীও ছিল না; তাছাড়া সে যুগে কাজ করার জন্যে ভূমধ্যসাগর অঞ্চল থেকে প্রচুর

ক্রীতদাস পাওয়া যেত। পক্ষান্তরে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে প্রথম থেকেই অঙ্গাঙ্গী হয়ে জড়িয়ে ছিল এই জলকল। প্রায় প্রত্যেকটি জমিদারিতেই একটি করে জলকল এবং জলকলচালক থাকত (Domesday Book-এ * পাঁচহাজারটির তালিকা রয়েছে)। লর্ডরা তাঁদের পূর্ণ অধিকার প্রয়োগ করে ভূমিদাসেদের ঐসব কলে শস্য চূর্ণ করতে বাধ্য করতেন।

জলকলগুলো যে শুধু শস্য পেষাইয়ের কাজে লাগত তা নয়; ব্যাপকতর ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করার পথ প্রশস্ত করে এইসব জলকল। জলশক্তি-চালিত এই কল স্বভাবতই এক জায়গায় স্থিত হয়ে থাকত; তার কাছে কাজ নিয়ে আসতে হতো। যেসব কাজে ক্রমাগত সমলয়ে বল প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতো, তাতে জলকলের সাহায্য নেওয়া হতো। ঘূর্ণগতিকে বিপরীতমুখী (reciprocal) গতিতে রূপান্তরিত করে নেবার জন্য দুটি যান্ত্রিক কৌশলের প্রচলন ঘটে, দুটিরই আদি উদ্ভব সম্ভবত চীনে। এগুলি হলো, ট্রিপ-হ্যামার আর ক্র্যাঙ্ক। এর মধ্যে ক্র্যাঙ্ক-কৌশলের প্রবর্তনের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি এই কারণে যে এর সাহায্যে বিপরীতমুখী গতিকে আবার ঘূর্ণ্যগতিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব—যেটা ট্রিপ-হ্যামারের সাহায্যে সম্ভব নয়। 1150 সাল নাগাদ ইউরোপে বায়ুশক্তি-চালিত হাওয়াকল বা উইন্ডমিলের প্রবর্তন ঘটে—সম্ভবত পারস্য দেশ থেকে। নানাধরনের কাজে এইসব কলের প্রয়োগ ঘটত, যথা কাপড় পরিষ্কার করা ও পুরু করা (fulling), হাপরে হাওয়ার ঝাপটা দেওয়া, লোহা পেটাই করা কিংবা কাঠ কাটা। কিন্তু সুতো কাটা, বয়ন করা বা শস্য ঝাড়াইয়ের মতো শ্রমসাধ্য কিন্তু অপেক্ষাকৃত বিক্ষিপ্ত কাজে এইসব কলের ব্যবহার শিল্পবিপ্লব যুগের আগে হয় নি। মধ্যযুগের ইউরোপে হাওয়াকল আর জলকলের সাহায্যে যে এতরকমের কাজ করা হতো এবং এইসব কলের যে অতি দ্রুত বিকাশ ঘটে, তা থেকেই শ্রমিকদের সংখ্যাল্পতার ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে; এবং শ্রমিকদের সংখ্যাল্পতার সঙ্গে প্রকৌশল ও বিজ্ঞানের উন্নতির সম্পর্কটাও পরিষ্কার হয়ে যায়।

হাওয়াকল আর জলকল বানানো আর মেরামত করা অধিকাংশ গ্রামের কামারেরই সাধ্যের বাইরে ছিল। কাজেই *কল-মিস্তিরিদের* (*millwrights*) একটা বিশেষ পেশা গড়ে উঠল। এঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে কল বানাতেন ও মেরামত করতেন। আধুনিক অর্থে এঁরাই হচ্ছেন প্রথম 'মিস্তিরি'। এঁরা গীয়ার তৈরির কাজ বুঝতেন, গীয়ার কীভাবে ক্রিয়া করে তা জানতেন, সেই সঙ্গে বাঁধ আর জলকপাট (sluice) নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় তাও জানতেন। অর্থাৎ এঁরা ছিলেন একাধারে জল-এনজিনিয়ার এবং যান্ত্রিক এনজিনিয়ার। এঁরা ছিলেন নির্মাণকুশলতার এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডার থেকেই রেনেসাঁস যুগে তো বটেই, তৎপরবর্তী শিল্পবিপ্লব যুগেও কারিগরেরা রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। নব্য দর্শনসঞ্জাত ভাবনাগুলিকে কার্যে পরিণত করার ক্ষমতা একমাত্র এই কারিগরদেরই ছিল।

'Clock' ও 'Watch'

মধ্যযুগের ইউরোপে যন্ত্রচালিত 'clock'-এর বর্তমান রূপটির বিকাশের পেছনেও ঐই মিস্তিরিদের একটা ভূমিকা ছিল। ইংরেজি clock শব্দটি ফরাসি *cloche*-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যার অর্থ হলো 'ঘণ্টা'। আদিতে ঘড়ি বলতে ঘণ্টাই বোঝাত। সেই ঘণ্টা বাজিয়ে ধর্মানুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ সময়গুলিকে চিহ্নিত করা হতো। পরে প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজানোর রেওয়াজ চালু হয়।

* *Domesday Book*—1086 সালে রাজা প্রথম উইলিয়ামের নির্দেশে ইংলন্ডের যাবতীয় জমির বিবরণ-সংবলিত একটি **নথি-পুস্তক** সংকলিত হয়। তারই নাম Domesday Book —অনু

বালিঘড়ির সাহায্য নিয়ে প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজাত প্রহরী। একাদশ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে এক সুনিপুণ কৌশলের (the verge and folliot) প্রবর্তন ঘটে। এর ফলে ঘণ্টার ভেতরকার যে দণ্ডসদৃশ হাতুড়িটা দিয়ে ঘণ্টার গায়ে আঘাত করা হয় তাকে একবার এদিকে একবার ওদিকে চালানো সম্ভব হলো। এর জন্যে প্রহরীকে কেবল একটা কাজই করতে হতো---নির্দিষ্ট উপাসনাকালে একটা ওজন বা বাটখারাকে খুলে দেওয়া; তখন সেই ওজনটি গিয়ে ঘণ্টার গায়ে এদিকে ওদিকে বাজত। একটা ঘড়িকলের (clockwork) সাহায্যে এই ঘটনাটা ঘটত, সে ঘড়িকল ছিল মূলত ঐ হাওয়াকল আর জলকলেরই এক লঘু সংস্করণ। অতঃপর কোনো একজন কল-মিস্ত্রির অথবা কোনো একজন সন্ন্যাসীর মাথায় এই বুদ্ধি আসে যে ঐ কৌশলের বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারলে কেবল বিশেষ বিশেষ উপাসনাকাল নয়, সাধারণভাবে সময় নির্দেশ করার কাজটিও নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এইভাবেই গড়ে ওঠে যন্ত্রচালিত 'watch'। এর উদ্ভব ঘটায় প্রহরী বা 'watchman'-এর আর প্রয়োজন রইল না। এই 'watch' নামেই যন্ত্রটি আজও প্রচলিত। এইভাবেই যন্ত্রচালিত ক্লক-ঘড়ির উদ্ভব ঘটে ('watch' যার অঙ্গ)। আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রব্যবস্থার আদিরূপ এই ক্লক-ঘড়ি স্ব নিয়মিত এবং স্ব চল।

ঘড়ি জিনিসটা অবশ্য বহু প্রাচীন; গ্রীকদের জল-ঘড়ির বহু উন্নতি ঘটিয়ে তার ভিত্তিতে আরবরা নানান জটিল ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকৌশলের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। নানারকম ভাসমান বস্তু ও রজ্জুর সাহায্যে সেসব যন্ত্র ক্রিয়া করত, গীয়ারের চক্রসজ্জার মতো সুমিত চলন বা জোর তাদের ছিল না। আজ অবশ্য আমরা জানি, কাঁটাওয়ালা চাকার গীয়ার-ব্যবস্থা প্রাচীন গ্রীসে ও চীনেও প্রচলিত ছিল। ক্লক-ঘড়িকে ইউরোপীয় উদ্ভাবন বলে দাবি করার কোনো ভিত্তি আজ আর নেই। তবে একথা ঠিক যে ইউরোপেই তার প্রভূত উন্নতি ঘটে। ক্লক-ঘড়ি যতটা না কাজের জিনিস তার চেয়ে বেশি মর্যাদা-বর্ধক জিনিস ছিল। শহর বা ক্যাথিড্রালের গর্বের জিনিস ছিল ক্লক-ঘড়ি। তবে ক্লক-ঘড়ি তৈরির এবং পরে ছোটো ঘড়ি ('watch') তৈরির এই বিরল পেশাকর্মই পরে রেনেসাঁস যুগে উদ্ভাবনপটুতা ও কর্মকুশলতার এক ফলপ্রদ উৎস হয়ে উঠে বিজ্ঞানের বিকাশে সহায়ক হয়। অনুরূপ কারণে কল-মিস্ত্রিদের পেশাকর্মও উৎপাদন-শিল্পের বিকাশে সহায়ক হয়।

নৌ কম্পাস

স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত চুম্বক বা চুম্বকপাথরের ওপর পৃথিবীর চুম্বকশক্তি যেভাবে নির্দিষ্ট দিক অভিমুখে ক্রিয়া করে তার পর্যবেক্ষণকর্মটি মানুষের সবচেয়ে দুরূহ---এবং গুরুত্বপূর্ণ---বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির মধ্যে অন্যতম। এ বিষয়ে আর বিশেষ কোনো সন্দেহ নেই যে একটি কেন্দ্রীয় দণ্ডের ওপর স্থাপিত চুম্বকপাথরের নির্দিষ্ট দিক-অভিমুখী বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারটি বহু কাল আগেই চীনাদের জানা ছিল। আবিষ্কৃত দলিলপত্র থেকে দেখা গেছে, চীনে এর ব্যবহার ঘটার অন্তত কয়েক শো বছরের মধ্যে অন্য কোনো দেশে এর ব্যবহারের কোনো নজির নেই।

ড নীডহ্যামের মতে, একটি বোর্ডের ওপর বিভিন্ন বস্তু ছুঁড়ে দিয়ে তাদের অবস্থান বিচার ক'রে ভবিষ্যৎ-গণনার (geomancy) যে রীতি চালু ছিল, তারই উপজাতক হিসেবে এই আবিষ্কারটি ঘটে। আজও এসব প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। প্রসঙ্গত, পাশা, তাস, দাবা প্রমুখ খেলার উদ্ভব এ ভাবেই হয়েছে। বোর্ডের ওপর যেসব জিনিস ছুঁড়ে দেওয়া হতো তার মধ্যে একটি হলো সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রতীকরূপে পরিগণিত চামচ, যা উত্তরদিকের চিহ্ন। এইসব চামচ তৈরি

হতো চুম্বকপাথর কেটে, যা ছিল পাঁচটি 'পবিত্র প্রস্তরে'র অন্যতম। এই চামচগুলো সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট দিকে মুখ করে থাকত। ষষ্ঠ শতকের আগে এটাও আবিষ্কৃত হয় যে চুম্বকপাথরের সংস্পর্শে এলে লোহার টুকরোর মধ্যেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার ঘটে; এমন কি উত্তর-দক্ষিণ মুখে রেখে তপ্ত লোহাকে শীতল করলেও তা অনুরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে ওঠে। কাঠের ওপর বসানো ঐরকম একখণ্ড লোহার তৈরি জল-কম্পাসের পূর্ণ বিবরণ একাদশ শতাব্দীতে পাওয়া যায়; খুব সম্ভব তা আরো অনেক আগে থেকেই জানা ছিল। এটিই হলো চীনের ঐতিহ্যবাহিত কম্পাস; এর বাইরের কাঠামোয় যেসব প্রতীকচিহ্ন খোদা থাকে তা থেকে বোঝা যায় ভবিষ্যৎগণনার উদ্দেশ্যে একটি বোর্ডের সঙ্গে তা যুক্ত থাকত। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় এই কম্পাস কীভাবে এসে পৌঁছল তা আজও এক রহস্য। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত এক গাথা-কাহিনীতে বেশ সুপরিচিত জিনিস হিসেবে কম্পাসের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি দণ্ডের ওপর বসানো চুম্বক-শলাকাসূচির পাশে বাতাসের বিভিন্ন গতিমুখ-নির্দেশিত কার্ড লাগানোর কৌশলটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীয়রা উদ্ভাবন করে।

প্রথম আবিষ্কারের পর কম্পাসের উন্নতি ঘটতে অনেক সময় লাগে। এই শ্লথতা ঐতিহ্যবাহিত পথে প্রকৌশলের উন্নতিসাধনের প্রক্রিয়ার এক অভ্রান্ত লক্ষণ। তবে বিজ্ঞান অল্পকালের মধ্যেই এর ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়। পিটার দ পিলগ্রিম (দ মেরিকুর)-এর *Epistola de Magnete* (1269) গ্রন্থটি পাশ্চাত্য খ্রিস্টজগতের প্রথম মৌলিক বিজ্ঞানরচনা। আমরা একটু আগেই দেখেছি, রজার বেকন তাঁর এই সমসাময়িক মানুষটিকে সেযুগের সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে ব্যবহারিক বোধসম্পন্ন বিজ্ঞানী রূপে সম্মান করতেন। উক্ত রচনাটির মধ্যে তাঁর স্বাধীন চিন্তাশক্তির এবং সুশৃঙ্খল পরীক্ষানিরীক্ষার পরিকল্পনা ও সংঘটন-পটুতার প্রকাশ ঘটেছে। বহুকাল পরে এই রচনাটির ভিত্তিতেই নর্ম্যান ও গিলবার্ট যে গবেষণা করেন তা চুম্বকক্রিয়া ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমগ্র সৌধটির ভিত গড়ে দেয়। শুধু তাই নয়; 'প্রভাব' ও 'আবেশের' যেসব মতবাদ আগে নিছক জাদুনির্ভর ছিল, কম্পাসের ওপর চুম্বকের ক্রিয়ার সাহায্যে তাদের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করা সম্ভব হলো। আরো বড়ো কথা এই যে চুম্বক-ক্রিয়া সংক্রান্ত এই গবেষণার মধ্যে থেকে 'আকর্ষণ'-বিষয়ক মতবাদের এক কার্যকর কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয় যা বিজ্ঞানকে সর্বতোভাবে প্রভাবিত করে। নিউটনের সুমহৎ তত্ত্বীয় সংশ্লেষণের পথে এই মতবাদ ধ্রুবতারার মতো বিরাজ করেছিল।

পিছনে-বসানো হাল

ইউরোপে জলযানের পিছনে-বসানো হালের প্রচলনও চৈনিক সূত্রেই ঘটে বলে মনে হয়। চ্যাপ্টা তলদেশযুক্ত চীনা 'জুঙ্ক'-এর সঙ্গে জাহাজের তফাৎটা একেবারে মৌলিক। গাছের গুঁড়ি খুদে বানানো ক্যানু নৌকো থেকে ধীরে ধীরে জাহাজের উদ্ভব ঘটেছিল। ক্যানু নৌকোর ঠিক মধ্যেখানের শিরদাঁড়া-সদৃশ দণ্ডটির (keel) দুপাশে পাঁজরার মতো কাঠামো গড়ে তুলে জাহাজ নির্মাণ করা হতো। পক্ষান্তরে চীনা 'জুঙ্ক' নামক জলযানের ঐরকম কোনো শিরদাঁড়া-সদৃশ কেন্দ্রীয় দণ্ড ছিল না; বাঁশের তৈরি ভেলার সম্মুখভাগ ও পশ্চাদভাগকে উন্নত করে তুলে ঐ জলযান নির্মিত হতো। শিরদাঁড়া-সদৃশ দণ্ডটি না থাকার দরুন 'জুঙ্ক'-এ স্বভাবতই হাল বসানো হতো পশ্চাদভাগের মধ্যস্থলে। কিন্তু পুরোনো ইউরোপীয় জাহাজের শিরদাঁড়া-সদৃশ অনুভূমিক দণ্ডটি পিছনের দিকে ঢালু হওয়ায় মাঝখানে হাল বসানোর কাজটি অনেক কষ্টসাধ্য ছিল। তাই জাহাজের গতিমুখের দক্ষিণপার্শ্বে একটি পরিচালন-দাঁড় লাগিয়ে জাহাজের যাত্রামুখ নিয়ন্ত্রণ করা হতো। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কোনো এক সময়ে জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে একটি উল্লম্ব

খুঁটি যোগ ক'রে এই সমস্যার সমাধান করা হয়। সেইসময় থেকে ভাইকিংদের মডেল অনুসরণে ইউরোপীয় জাহাজগুলোর নৌ-নৈপুণ্য অনেক বেড়ে যায়। ভাইকিংদের জাহাজে শিরদাঁড়া-সদৃশ দন্ডটি অনেক গভীরে স্থাপিত হতো। উন্নততর এইসব জাহাজের পাল বাতাসের আরো অনুকূলে খাটিয়ে জাহাজের যাত্রাপথকে আরো ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলো। এর পরিণামে আরো একটা পবিবর্তন ঘটল। আগে মাস্তুলের 45° কোণে ত্রিকোণ পাল (lateen sail) খাটানো হতো; এবার তার বদলে জাহাজের সম্মুখ থেকে পশ্চাদভাগ পর্যন্ত প্রসারিত পাল (fore-and-aft sail) খাটানোর প্রথা চালু হলো। এর ফলে পশ্চাদমুখী হাওয়ার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন ফুরোল, এবং অপেক্ষাকৃত ঝোড়ো হাওয়াতেও সমুদ্রযাত্রা সম্ভবপর হয়ে উঠল।

কম্পাস আর পশ্চাদস্থাপিত হাল—নৌচালন সংক্রান্ত এই দুটি উদ্ভাবনের সম্মিলিত অভিঘাত স্থলে ঘোড়া জোতবার সরঞ্জাম উদ্ভাবনের সঙ্গেই তুলনীয়। ঐ দুটি উদ্ভাবনের কল্যাণে দূর সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠল, আগের মতো উপকূল ধরে ধরে জাহাজ চালানোর আর প্রয়োজন রইল না। সুতরাং এই প্রথম অভিযান, যুদ্ধ এবং বাণিজ্য চালানোর উদ্দেশ্যে মহাসাগরগুলিকে ব্যবহার করার সম্ভাবনা দেখা দিল। এর ফলে অর্থনীতি ও রাজনীতিতে দ্রুত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

নৌচালন

নৌচালনের বিকাশেব বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব পরে অপরিসীম বলে প্রতিভাত হয়েছিল। দূর সমুদ্রে, এমনকি ভূমধ্যসাগরেও. জাহাজ চালাতে গেলে প্রয়োজন মানচিত্র। কাজেই নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম এক জ্যোতির্বিজ্ঞান, পরিমাণাত্মক গণনা-নির্ভর এক নবা ভূগোলবিদ্যা এবং জাহাজে ব্যবহারেব উপযোগী যন্ত্রপাতির বিকাশ ঘটানোর তাগিদ প্রবল হয়ে উঠল। শুধু তাই নয়, মহাসাগরে জাহাজ চালানোর এক প্রধান সমস্যা ছিল দ্রাঘিমাংশ নিরূপণ। পরে সতেরো শতকের বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীরা সকলেই জরুরি ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধানের কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। অপরদিকে কম্পাস এবং নৌচালনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতি নির্মাণের তাগিদে নতুন এক সু-প্রশিক্ষিত উৎপাদন-শিল্পের জন্ম হয়—কার্ড আর ডায়াল নির্মাণ-শিল্প। বিজ্ঞানের বিকাশে এই শিল্প বিরাট প্রভাব ফেলেছিল, বিশেষত পরিমাপনের কাজকে উত্তরোত্তর নিখুঁত করে তোলার ব্যাপারে। অনেক বিজ্ঞানীই, এমনকি স্বয়ং নিউটনও, হাতেকলমে যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতেন। যন্ত্রপাতি-নির্মাতাদের মধ্যে একজন উৎপাদন-শিল্পে ও বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক প্রভাব ফেলেন—তাঁর নাম জেমস ওয়াট।

লেন্‌স ও চশমা

লেন্‌স আবিষ্কারের কথা আমরা আগেই বলেছি। 1350 সাল নাগাদ সেই আবিষ্কারের পরিণতিতে চশমা জিনিসটা উদ্ভাবিত হয়, মনে হয় ইতালিতে। চশমার প্রচলন ঘটায় আলোকবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করার তাগিদ বাড়ে। লেন্‌স কী ক'রে আলোকরশ্মিকে একটি বিন্দুতে ফোকাস করে, কী ক'রে বিম্বের বিবর্ধন ঘটায়, তা ব্যাখ্যা করেন গ্রোসেটেস্ট, রজার বেকন এবং ফ্রাইবুর্গ-এর ডীট্রিশ। অপরদিকে চশমার চাহিদা বাড়ায় লেন্‌স ও চশমা তৈরির পেশাকর্মের উদ্ভব ঘটে। শস্তায় পরিষ্কার কাচ সুলভ হওয়ার ফলে অনেকেই এই দুই পেশায় নিযুক্ত হন। এঁদেরই মধ্যে একজনের কাছে আমরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির উদ্ভাবনের জন্য ঋণী। ধরে নেওয়া হয় যে 1608 সালে লিপার্শে দূরবীক্ষণ উদ্ভাবন করেন। অবস্থা বিচার করে এই কথাই মনে হয় যে এই উদ্ভাবনের ব্যাপারে বিম্বের বিবর্ধন সংক্রান্ত তত্ত্বভিত্তিক অনুমান অপেক্ষা যথেচ্ছভাবে একাধিক লেনসের সম্মিলন ঘটানোই বেশি কার্যকর হয়েছিল। বলাবাহুল্য, চশমা প্রস্তুতকারকেব কর্মশালাই ছিল একমাত্র জায়গা যেখানে লেন্‌স নিয়ে ঐভাবে নাড়াচাড়া করার সুযোগ ছিল।

বারুদ এবং কামান

মধ্যযুগে পাশ্চাত্য জগতে যে-কটি নতুন উদ্ভাবনের প্রবর্তন ঘটে তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে বিধ্বংসী সেই বারুদের প্রভাবই সবচয়ে প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছিল—রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে এবং বিজ্ঞানে। বলা হয়ে থাকে যে বারুদের আদি আবিষ্কারের কৃতিত্ব আরবদের এবং বাইজ্যান্টিয়ামেব গ্রীকদের। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণের পাল্লা ঝুঁকে আছে চীনাদের দিকে। বারুদের ক্রিয়ার মূল কথাটা হলো দাহ্য পদার্থের মধ্যে কোনো নাইট্রেট (সোরা) যোগ করা, যাতে তা বায়ু ছাড়াই জ্বলতে পারে। কোনো কোনো নুন-গহ্বরে আপনা থেকেই সোরা পাওয়া যায়। তাছাড়া অতিরিক্ত পশুমলসার-যুক্ত মাটিতেও সোরা থাকে। হয়তো ঘটনাচক্রে বাজি তৈরির কাজে সোরার ব্যবহার হয়েছিল। অথবা হয়তো এ ব্যাপারটা কারো নজরে পড়ে যে ধাতু-বিগালক (flux) হিসেবে কাঠকয়লার সঙ্গে আকরিক সোডার (নেট্রন) বদলে সোরা মেশালে উজ্জ্বল ঝলক দেখা দেয় এবং হালকা বিস্ফোরণ ঘটে। চীনে কয়েক শতাব্দী ধরে বারুদ কেবল নানারকম তারাবাজি, পটকা এবং হাউই বাজি তৈরির কাজে ব্যবহার হতো।

যখন থেকে কামানে বারুদের ব্যবহার চালু হলো তখন থেকেই এর সামরিক গুরুত্বের সূত্রপাত ঘটে। বাইজ্যান্টিয়ামের অগ্নি-নল থেকে, অথবা চীনাদের বাঁশ-পটকা থেকে কামানের উদ্ভব ঘটে। দ্বিতীয়টার সম্ভাবনাই বেশি। কামানের নলকে ইংরেজিতে বলে 'ব্যারেল'। এই ব্যারেল বা পিপে জিনিসটা প্রথম দিকে বক্রপৃষ্ঠ কয়েকটি কাঠের ফলককে পাশাপাশি জোড়া লাগিয়ে তাদের ধাতুর পটির বেষ্টনী দিয়ে শক্ত করে আটকে তৈরি করা হতো। সুতরাং এই 'ব্যারেল' নাম থেকেই বোঝা যায়, আদিতে কামানের নলও ঐভাবেই তৈরি হতো, তবে কাঠের বদলে বক্রপৃষ্ঠ ধাতুর লম্বালম্বা পাত ব্যবহার করা হতো। এই কামানের, এবং তারই হাত ধরে অল্পকাল পরেই যেসব বন্দুক তৈরি হলো তাদের, পাল্লা ও ক্ষমতা পুরোনো শিলা-ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর তুলনায় অনেক বেশি ছিল। কিন্তু শুধু সেই কারণেই যে তারা যুদ্ধে আরো ফলপ্রদ বলে প্রমাণিত হলো তা নয়। তার অন্যতম কারণ এই যে কামান বা বন্দুকের চেহারা যতই বেঢপ হোক, তাদের নির্মাণব্যয় যতই বেশি হোক, এগুলো ব্যবহারের ফলে সব মিলিয়ে কিন্তু খরচ অনেক কম পড়ত এবং সচলতা বাড়ত। যুদ্ধকালে এবং শত্রুপক্ষের দুর্গরক্ষিত স্থানকে ঘেরাও করে তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার কাজে কামানের উপযোগিতার দৌলতে সমরায়োজনে এক প্রকৌশল-বিপ্লবের সূচনা হয়। তিন হাজার বছর আগে লৌহযুগের প্রারম্ভকালে যে বিপ্লব ঘটেছিল, এ বিপ্লব তারই সঙ্গে তুলনীয়।

যাদেব হাতে কামান আর গাদাবন্দুক ছিল তারা তখন অজেয় হয়ে ওঠে। ফলে 'সভ্য' মানুষ কার্যক্ষেত্রে বহুগুণে সংখ্যাগরিষ্ঠ 'নেটিভ'দের প্রভু হয়ে ওঠে। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন এমনকি সভ্যজগতের মধ্যেও শক্তিসাম্যে বিপুল পরিবর্তন ঘটাল। যুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য কামান একেবারে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ফলে প্রথম দিকে তার ব্যবহারে যতই সাশ্রয় হয়ে থাকুক, অচিরেই তা যুদ্ধপ্রক্রিয়াকে ব্যয়বহুল করে তুলল। কামান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ধাতুসম্পদের উৎসগুলোর ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার এবং সেই ধাতু থেকে কামান গড়ার জন্য যথোপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন প্রকৌশলীদের নিয়োগ করার ক্ষমতা কেবল ধনবান রাজ্যগুলির কিংবা বণিকদের সমর্থনপুষ্ট রাজাদেরই ছিল। অভিজাত ভূম্যধিকারীদের স্বাধীনতা এর ফলে চূর্ণ হলো, ঠিক যেভাবে কামানের অপ্রতিহত গোলার আঘাতে তাদের দুর্গপ্রাসাদগুলো চূর্ণ হয়ে গেল। বারুদের বিজয়লাভের মধ্যে দিয়ে জাতিরাষ্ট্রের বিজয় সূচিত হলো আর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানের সূত্রপাত ঘটল।

সমুদ্রবক্ষে বারুদের যে প্রভাব পড়ল তা-ও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। নবা জ্যোতির্বিজ্ঞান

এবং নব্য কম্পাসের সাহায্যে নির্দিষ্ট দিকনির্ণয়ে সক্ষম জাহাজের ওপর বসানো কামানে বারুদ ঠাসা হলো। এই বারুদের বলে বলীয়ান হয়ে পশ্চিম ইউরোপীয়রা সেই যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দীর মধ্য লগ্ন পর্যন্ত বিশ্বের সাগরপথে আপন নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে ও বজায় রাখে। এরই সুবাদে ইউরোপীয়রা অন্যান্য অঞ্চলের সংস্কৃতির ওপর নিজেদের সংস্কৃতির ছাঁদটি আরোপ করে, যদিও ঐসব অঞ্চল আদিতে সাংস্কৃতিক বা সামরিক দিক থেকে আদৌ নিকৃষ্ট ছিল না। বারুদের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা অল্পকালের মধ্যেই তাদের অধিগম্য দুনিয়ার সম্পদ কুক্ষিগত করে নিতে সমর্থ হলো। এই প্রক্রিয়ায় তাদের হাতে যে পুঁজি জমল তারই দৌলতে শিল্পবিপ্লব ঘটে।

বারুদের বৈজ্ঞানিক ফলাফল

তবে সমরায়োজনে বারুদের যত প্রভাবই পড়ুক, শেষ বিচারে বিজ্ঞানের ওপর তার অভিঘাতটিই যন্ত্রযুগের প্রবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল। বারুদ আর কামানের শক্তি কেবল যে মধ্যযুগের অর্থনীতি আর রাজনীতিকেই ধ্বংস করল তা নয়, মধ্যযুগের চিন্তাপ্রণালীকে বিনষ্ট করার মূলেও তাদের ভূমিকা ছিল সমধিক। মেয়ো-র (Mayow) কথায় : 'সোরা কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই নহে, দর্শনের অঙ্গনেও প্রচুর সোরগোল তুলিয়াছিল।' প্রথমত পৃথিবীতে বারুদ এমনই এক আশ্চর্য জিনিস যার কোনো নাম গ্রীক ভাষায় ছিল না! দ্বিতীয়ত, বারুদের প্রস্তুতপ্রণালী, তার বিস্ফোরণ, কামানের নলের মধ্যে থেকে সবেগে গোলা নির্গমন এবং অতঃপর শূন্যপথে তার যাত্রা—এসবই নতন নতুন সমস্যা তুলে ধরল। সেসব সমস্যার ব্যবহারিক সমাধান বার করতে গিয়ে নতুন ধরনের কারণ নিয়ে অনুসন্ধান করতে হলো, এবং তার পরিণতিতে বিজ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্রের উন্মোচন ঘটল।

বারুদের উদ্ভব যেভাবেই হয়ে থাকুক, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে তার মূল উপাদান সোরা (পট্যাশিয়াম নাইট্রেট) তৈরি করতে গিয়ে বিভিন্ন লবণকে সযত্নে স্বতন্ত্র ও বিশুদ্ধ করার পদ্ধতিটি রপ্ত করতে হয়েছিল। সম্ভবত অপরসায়নের চর্চা এব্যাপারে সহায়ক হয়েছিল। বারুদ তৈরির প্রক্রিয়ায় দ্রবীভবন এবং কেলাসন এই দুটি ব্যাপারের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। তাছাড়া বারুদের বিস্ফোরণ কী করে ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মধ্যযুগের রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা হিমশিম খেয়ে যায়। সে বিস্ফোরণ যে আগুনেরই কীর্তি সেটা স্পষ্ট; অথচ পৃথিবীর অন্যান্য বিস্ফোরণের মতো এই বিস্ফোরণে বায়ুর দরকার হয় না। এই নিয়ে ভাবতে গিয়ে তাঁদের মনে হলো, তাহলে সোরা জিনিসটাই প্রয়োজনীয় বায়ুর যোগান দেয়, এবং, বিপরীতক্রমে, বায়ুর মধ্যেই নিশ্চয়ই সোরা (nitre) না হোক অন্তত সোরা জাতীয় কোনো আত্মা (nitrous spirit) থাকে, যার নাম দেওয়া হয় *anima*. সেই সময় থেকে দহনক্রিয়া, এবং সেই সুবাদে শ্বাসক্রিয়াকে (যার সাহায্যে বায়ুর প্রয়োজন মেটায় প্রাণী) ব্যাখ্যা করার যাবতীয় প্রয়াস চলে এই ভাবনার কাঠামোর মধ্যে। চারশো বছর ধরে এই নিয়ে তর্কবিতর্ক ও পরীক্ষানিরীক্ষার পর অবশেষে অক্সিজেনের আবিষ্কার হয়। আধুনিক রসায়নের সমগ্র সৌধটির ভিত গড়ে দেয় এই আবিষ্কার।

যে তীব্রতা নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটত, যেভাবে নলের মধ্যে থেকে গোলা ছিটকে বেরোত তা দেখে প্রাকৃতিক শক্তিকে, বিশেষত আগুনকে, কত জোরালো কাজে লাগানো যায় তার সম্ভাবনার আভাস মেলে। বাষ্পীয় এনজিন গড়ে তোলার পেছনে এই ঘটনাটা প্রেরণা যুগিয়েছিল। পরে আমরা দেখতে পাব যে কামানের নল বানানোর জন্য যেসব যন্ত্রপাতি গড়ে উঠেছিল তাদের সাহায্যে নিখুঁত চোং বানানো সম্ভব হয়ে ওঠে এবং তারই ফলে প্রথম দিককার বাষ্পীয় এনজিনের কার্যদক্ষতার প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ মেলে।

শেষত, বাতাসে কামান-গোলার চলন অনুধাবনের, অর্থাৎ ক্ষেপণবিদ্যার (ballistics) সূত্র ধরে পরে নব্য গতিবিজ্ঞান রূপ ধারণ করে। ধ্রুপদী গ্রীক যুগের বিজ্ঞানীরা স্থির বস্তুর ধর্ম নিয়ে, কিংবা পরস্পরের ওপর মোটের ওপর অবিক্ষুব্ধ বলে ক্রিয়ারত বিভিন্ন বস্তুর ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু, নতুন দুনিয়া বস্তুসমূহের বিক্ষুব্ধ চলন নিয়ে গবেষণায় রত হয়, আর তারই ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত সুসম্পূর্ণ এক নব্য বলবিজ্ঞানের পত্তন করে।

কামান উদ্ভাবনের বহু আগেই 'অভিঘাত'-তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছিল; কিন্তু বাতাসে গোলার চলন নিয়ে আগ্রহ জেগে ওঠার ফলে সে তত্ত্বের প্রতি নতুন করে মনোযোগ নিবদ্ধ হলো। নবযুগের বলবিজ্ঞানের সঙ্গে ধ্রুপদী বলবিজ্ঞানের একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে নব্য বলবিজ্ঞান ছিল গণিতনির্ভর, পরিমাণাত্মক এবং সংখ্যাভিত্তিক। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই গণিতেরও বিকাশ ঘটে।

পাতন ও অ্যালকোহল

ইউরোপে দ্রাক্ষাসবের কড়া আরক প্রথম তৈরি হয় দ্বাদশ শতকে, যদিও তার প্রস্তুতপ্রক্রিয়ার প্রায় সবকটি ধাপই আরবদের ইতিমধ্যে জানা ছিল; তারা আগেই পাতনপ্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটিয়েছিল। অ্যালকোহল চোলাইয়ের চূড়ান্ত পদক্ষেপটি সম্ভবত সালের্নোতে গৃহীত হয়। সেখানকার ডাক্তারি-শিক্ষালয় ততদিনে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। নবম শতাব্দীতে স্থাপিত এই শিক্ষালয়টি আরবী বিজ্ঞানের সর্বোত্তম অংশটিকে পরিপাক করে নিতে পেরেছিল সিসিলি থেকে। তখন সিসিলি ছিল গ্রীক, আরবী আর নর্মান সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। নানারকম আতর ও তেলের পাতনপ্রক্রিয়া আগে থেকেই জানা ছিল; সুতরাং এরকম অনুমান খুবই সংগত যে কোনো একটা ওষুধ তৈরি করতে গিয়ে ঘটনাচক্রে অ্যালকোহল জিনিসটা তৈরি হয়ে যায়। অ্যালকোহল চোলাইয়ের মূল কৌশলটা ছিল 'আলেম্বিক' নামক পাতনভাণ্ডটি যথোচিত পরিমাণে ঠাণ্ডা ক'রে অ্যালকোহল আর জল, দুটো পদার্থকেই তরলীভূত করা। পাতনের পরিণতিতে প্রাপ্ত তরলটিকে প্রথমে এক বিরল ঔষধ হিসেবে পান করা হয়। এর চাঙ্গায়নী বৈশিষ্ট্য অচিরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শীঘ্রই যথেষ্ট কড়া আরক বানিয়ে তাকে জ্বালানো সম্ভব হয়। তার ফলে এর কদর আরো বাড়ে। শোনা যায় চতুর্দশ শতাব্দীতে রেমন্ড লাল্ কলিচুণ সহযোগে দ্রাক্ষাসব চোলাই ক'রে প্রায় নির্জলা অ্যালকোহল তৈরি করেন। 'অ্যালকোহল' নামটি কিন্তু অপপ্রযুক্ত; কেননা ঐ আরবী শব্দটির আদি অর্থ ছিল 'নয়নরঞ্জক প্রসাধনী'; পরে যেকোনো মিহি চূর্ণকে আল্-কুহ্ল্ বলা হতো।* অ্যালকোহলের চাহিদা প্রচণ্ডভাবে বাড়ে চতুর্দশ শতকে 'Black Death' নামে কুখ্যাত প্লেগ মহামারীর সময়ে। 'আগুনে-জল' (fire water), 'আস্কুইবঅ' (usquebaugh), 'হুইস্কি', 'দগ্ধ দ্রাক্ষাসব' (burnt wine), দ্রাক্ষাসব থেকে চোলাই করা ব্র্যান্ডি প্রভৃতির চাহিদা বাড়ে। লোকে মনে করত অ্যালকোহল নিয়মিত পান করলে অমর হওয়া যাবে। অ্যালকোহলকে এইজন্যেই *aqua vitae* বা জীবনরস নামে অভিহিত করা হতো। কিন্তু তারপর এর ব্যবহার একেবারেই ডাক্তারদের হাতের বাইরে চলে যায়। তখন এত বেশি পরিমাণে অ্যালকোহল চোলাই হতে থাকে যে শেষ পর্যন্ত এর ব্যবহার বন্ধ করবার জন্য বহু আইন প্রণয়ন করতে হয়। অ্যালকোহলই প্রথম বিজ্ঞাননির্ভর শিল্পের জনক। সুরাকরণ-শিল্প আধুনিক রসায়নিক শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করে।

অ্যালকোহল তৈরি করার নানাবিধ সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক ফল পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে

* আরবী *কুহ্ল্ (Kuhl)* কথাটির অর্থ কৃষ্ণ চূর্ণ, প্রধানত লেড সালফাইড বা অ্যান্টিমনি সালফাইড। অনু-

সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ফলটি হলো সুরাপানের নানাবিধ প্রতিক্রিয়া এবং সুরাপানের তীব্র আকর্ষণ। সামাজিক দিক থেকে ইউরোপে আলাদা ক'রে এ ঘটনাটির বিশেষ কোনো গুরুত্ব না থাকলেও, অ-খ্রিস্টান জগৎকে সভ্য করার 'মহান' ব্রত পালনে এর ভূমিকা ছিল বারুদের ঠিক পরেই (1626 সালে ওলন্দাজরা তিন পিপে রাম্-এর বিনিময়ে স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে মানহাটান দ্বীপটি কিনে নেয়; ঐ নামটির অর্থ হচ্ছে 'যে জায়গায় আমরা মাতাল হয়েছিলাম')। বিজ্ঞানে অ্যালকোহলের প্রভাব পড়ে দুভাবে—রসায়নে ও পদার্থবিদ্যায়। অ্যালকোহল-জাত নানাবিধ সুরা প্রস্তুত করতে গিয়ে অন্যান্য পদার্থের প্রতিও অনুরূপ কৌশল প্রয়োগ করার প্রবল প্রেরণা জাগে। সুরাশিল্পের প্রয়োজনে বহুগুণে উন্নত শীতলকের (condenser) প্রবর্তন ঘটে, যাতে জলের সাহায্যে শীতলীভবন করা হয়। এইগুলির সাহায্যে ঈথর প্রমুখ অন্যান্য উদ্বায়ী পদার্থকেও তরলীভূত করা সম্ভব হলো। আগে 'আলেম্বিক' নামক পাতনযন্ত্র এবং বকযন্ত্র—এই দুটিই ছিল লেবরেটরির প্রধান যন্ত্র; তার বদলে এবার উন্নত পাতনযন্ত্র ও শীতলকের ব্যবহার চালু হলো। জৈব রসায়নের উদ্ভবের মূলে এই ঘটনাটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পাতনের ভৌত প্রক্রিয়াটিকে, বিশেষত আগুন থেকে শীতলীভূত জলে তাপের পরিগমন ঘটার আশ্চর্য ব্যাপারটিকে বুঝে ওঠা খুবই দুরূহ বলে প্রমাণিত হয়। পরিশেষে এই আশ্চর্য ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দেন ব্ল্যাক, অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তিনি ঐ ঘটনার মধ্যে থেকে লীন তাপের (latent heat) তত্ত্বটি প্রণয়ন করেন। আবার, ব্ল্যাকের এই তত্ত্বের সাহায্য নিয়েই তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার যন্ত্রনির্মাতা এক স্বতন্ত্র শীতলক উদ্ভাবন করেন এবং সেই সুবাদে প্রথম কার্যদক্ষ তাপ-চালিত এনজিন নির্মাণে সমর্থ হন। ডঃ ব্ল্যাকের সেই যন্ত্রনির্মাতাটির নাম জেমস ওয়াট।

কাগজ

প্রাচ্য দেশ থেকে আগত অপর দুটি উদ্ভাবন পশ্চিমে প্রবল প্রভাব ফেলে। যেসব দেশ এই দুটি প্রকৌশলের জনক সেখানে কিন্তু তাদের প্রভাব অত ব্যাপক হয় নি। এদুটি হলো কাগজ আর মুদ্রণ; দুটি উদ্ভাবন পরস্পর-সম্পর্কিত। ছাগল বা ভেড়ার চামড়া থেকে প্রস্তুত 'পার্চমেন্ট' রীতিমতো দামী জিনিস ছিল। স্বভাবতই সাক্ষরতার প্রসার হওয়ার পর থেকে শস্তা লিখন-সামগ্রীর চাহিদা প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। উদ্ভিজ্জ তন্তু বা অংশু থেকে কাগজ তৈরির প্রক্রিয়ার আদি উদ্ভব ঘটেছিল চীনে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকেই সে দেশে ঐ সুলভ কাগজের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইউরোপ এর সঙ্গে পরিচিত হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে, আরবদের মারফত। ছেঁড়াখোঁড়া শণজাত লিনেন কাপড়কে কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহার ক'রে ইউরোপে প্রথম উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরি হয়—আজ পর্যন্ত তার উৎকর্ষমান অনতিক্রান্ত। এত উঁচুমানের কাগজ এত শস্তায় এত বেশি তৈরি হতে লাগল যে তার সঙ্গে তাল রেখে উপযুক্ত সংখ্যক লিপিকর পাওয়া গেল না। ফলে মুদ্রণের মধ্যে দিয়ে নকল করার যে নতুন পদ্ধতি চালু হলো তার সাফল্য ছিল সুনিশ্চিত।

মুদ্রণ

মুদ্রণকৌশলের উদ্ভাবন বা প্রয়োগ এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। বাস্তবিক, মুদ্রাঙ্ক বা সীলমোহর, সীলমোহরের ছাপ, রঙিন খড়ি দিয়ে পাথরের ওপর থেকে তোলা ছাপ, প্রভৃতির মধ্যে মুদ্রণপ্রক্রিয়ার প্রয়োগ একেবারে আদি যুগ থেকেই চলে আসছিল। ইউরোপে মুদ্রণের যে অতিদ্রুত এবং ব্যাপক প্রচলন ঘটল তা থেকে বোঝা যায় সামাজিক ও সাংগঠনিক তাগিদ কীভাবে একটা জানা প্রকৌশলকে কাজে লাগায় এবং তার উন্নতি ঘটায়। একটা চাহিদা কার্যকর

হয়ে ওঠে তখনই যখন তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু বিশেষ একটা চাহিদা মেটাতে গিয়ে বিশেষ একটা নতুন প্রকৌশলের উদ্ভব ঘটার অর্থ এ নয় যে সেই প্রকৌশলের ভূমিকা শেষ পর্যন্ত ঐ বিশেষ চাহিদাটি পূরণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

মধ্যযুগের শেষের দিকেও খুব কম লোকই বিপুল সংখ্যায় কাগজেব বইয়ের প্রয়োজন অনুভব করত। সত্যি কথা বলতে, নিছক সাহিত্যিক উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে কোনোদিনই হয়তো মুদ্রণের উদ্ভব ঘটত না। মুদ্রণের উপযোগিতাটা তখনই অনুভূত হয় যখন একটা কোনো রচনার অনেকগুলো শস্তা কপির প্রয়োজন দেখা দেয়। কাজেই প্রাচ্য দেশে তাও-পন্থী বা বৌদ্ধদের প্রার্থনামন্ত্র ছাপানোর জন্যই যে মুদ্রণকৌশলের প্রথম প্রয়োগ ঘটে, তার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই; কেননা বহু সংখ্যায় মন্ত্র ছাপাতে পারলে আধ্যাত্মিক দিক থেকে লাভ অনেক। অতঃপর প্রাচ্যদেশে কাগজের টাকা ছাপানো হয়; সেখানেও সংখ্যা ব্যাপাবটা গুরুত্বপূর্ণ। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে পশ্চিমে কিন্তু ব্লক সহযোগে মুদ্রণকৌশলেব প্রথম ব্যাপক চাহিদা জেগে ওঠে তাস ছাপানোর জন্যে। গোড়াতে তাসখেলা ছিল এক ধরনের ভবিষ্যৎ-নির্দেশক জাদুপ্রক্রিয়া। তাস ছাপার পর পোপেদেব ঘোষণা, স্তবস্তোত্র এবং পবিত্র ছবি ছাপার তাগিদ অনুভূত হয।

শস্তা বই, ধর্ম এবং নব্য বিদ্যার্চর্চা

সরণযোগ্য কাঠেব হরফ সাজিয়ে ছাপানোর কৌশল প্রথম উদ্ভাবন করে চীনাবা, একাদশ শতাব্দীতে। সরণযোগ্য ধাতুব হবফ প্রথম ব্যবহার করে কোরীয়রা, চতুর্দশ শতাব্দীতে। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তা ইউরোপে প্রবর্তিত হয এবং ত্বরিতে বিস্তার লাভ করে। প্রথমে প্রার্থনামন্ত্র, পরে বই ছাপার প্রয়োজনে কাজে লাগে ঐ প্রকৌশল। একদিকে নতুন নতুন শস্তা বই ছেপে বেরোনোর ফলে পড়বার অভ্যাস গড়ে ওঠে, আবার তারই দরুন বইয়েব চাহিদাও প্রচণ্ডভাবে বাড়ে। এইভাবে প্রায় এক বিস্ফোরক বিক্রিয়া-মালার জন্ম হয়। স্বাভাবিকভাবেই মুদ্রাকরেরা বেশি বেশি করে সেইসব বইই ছাপাতে লাগলেন, পাণ্ডুলিপি-আকারে এতদিন যেগুলোব চাহিদা সবচেয়ে জোরালো ছিল। আগ্রহের মূল কেন্দ্রটি ছিল ধর্ম, বিশেষ করে বাইবেল। উদীয়মান মধ্যশ্রেণীর হাতে মুদ্রিত বাইবেল পৌঁছে গেল। তাদেব মনে চার্চেব সার্বিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবার যে আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল, বাইবেলের বাণী তাতে ইন্ধন যোগাল। এর পরিণতিস্বরূপ রিফর্মেশন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ধর্মপুস্তকের পরেই যেসব বইয়ের চাহিদা বেশি ছিল সেগুলো হলো প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য এবং কবিতা। ইতিমধ্যে সংস্কৃতিবান-হয়ে-ওঠা অভিজাতকুল এবং রেনেসাঁস যুগেব বুর্জোয়াশ্রেণীব উচ্চকোটি - এরাই ছিল সে সাহিত্যেব রসপিপাসু।

আরো পরে, প্রধানত ষোলো শতকে, মুদ্রণেব মধ্যে দিয়ে প্রকৌশলে ও বিজ্ঞানে বড়ো বড়ো পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। প্রকৃতিজগতের, বিশেষ করে নব-আবিষ্কৃত অঞ্চলগুলির, বিবরণ সংবলিত যেসব বই ছেপে বেরোয় তা অবাধে পঠিত হতে থাকে। তাছাড়া, ইতিহাসে সেই প্রথম নানাবিধ কারুকৌশল এবং পেশাকর্ম নিয়ে বই ছাপা হয়। এর আগে অব্দি কারিগরদের কারুকৌশলের জ্ঞান চিরাচরিত পথে সঞ্চারিত হতো, তার কোনো লিখিত রূপ থাকত না; ওস্তাদ-নবিশ পরম্পরায় হাতেকলমে তা শিক্ষা করতে হতো। কিন্তু ছাপানো বইয়েব আবির্ভাব ঘটায় কারিগরদের লেখাপড়া শেখা সম্ভবপর হয়ে উঠল; এমনকি অচিরেই তাঁরা লেখাপড়া শিখতে বাধ্য হলেন। নানাবিধ কারুপ্রক্রিয়ার যে বর্ণনা তাঁরা লিখলেন, বিশেষ করে যেসব ছবি আঁকলেন, তার সুবাদে বিদ্বৎমণ্ডলীর সঙ্গে কারুকর্মী এবং পেশাকর্মী মহলের ঘনিষ্ঠ সহযোগের পথ অবারিত হলো।

7. মধ্যযুগের অন্ত্যপর্বের অর্থনীতি

মুদ্রণের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা মধ্যযুগের গণ্ডি পার হয়ে গেছি। কিন্তু মধ্যযুগ পার হয়ে রেনেসাঁস যুগে বিজ্ঞানে যে বিপ্লব ঘটে তা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে একবার দেখে নেওয়া উচিত, বিভিন্ন প্রকৌশলগত অগ্রগতির সম্মিলিত অভিঘাত মধ্যযুগের শেষদিককার অর্থনীতি ও ধ্যানধারণার ওপর কীভাবে পড়েছিল। উন্নত উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং উন্নত পরিবহনের সম্মিলিত অভিঘাতে সমগ্র গ্রামাঞ্চলেই উদ্বৃত্ত উৎপাদনের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে গ্রামাঞ্চলে ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রীর পরিমাণও বেড়ে গিয়েছিল।

তামাম ইউরোপ জুড়ে সামন্তপ্রভুদের আধিপত্য শিথিল না হলেও ধনী চাষী এবং শহুরে শ্রমিকদের অবস্থা অনেক জোরালো হয়ে ওঠে। এদের দৌলতে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা ব্যাপক হয়ে ওঠে। ফলে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদনে প্রণোদনা জাগে। সুরা বা উৎকৃষ্ট কাপড়ের মতো কিছুটা শৌখিন জিনিসের চাহিদা বাড়ে (মোটা কাপড় অবশ্য তখনো বাড়িতে চরকা কেটে হাতে বোনা হতো)। নুনে-জবানো মাছ প্রভৃতি বাড়তি খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনও বাড়ে। সেই সঙ্গে ধাতুর উৎপাদন, বিশেষ করে নির্মাণযন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র বানানোর প্রয়োজনে লোহার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এইসব সামগ্রীর উৎপাদন প্রধানত গ্রামেই হতো, চাষীরা অবসর সময়ে এ কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। কিন্তু এই উৎপাদনের ওপর আধিপত্য থাকত শহুরে বণিকদের। ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ (যাকে মধ্যযুগের মোড় ফেরার লগ্ন বলে অভিহিত করা যেতে পারে) শহরের ধনী বণিকরা কারু-সংঘগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং পরিশেষে একচ্ছত্র ক্ষমতা অর্জন করেন। সেই ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে তাঁরা শস্তায় পণ্যসামগ্রী কিনে বেশি দামে বিক্রি করতে থাকেন। শহরের শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ববিবাদ প্রায়ই তীব্র আকারে ফেটে পড়ত, কখনো কখনো যুদ্ধও বাধত। কিন্তু মধ্যযুগের উত্তরার্ধে তারা ক্রমশ বুঝতে পারল যে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখতে পারলে এখনো যেসব অঞ্চলকে ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়নি তাদের কাজে লাগানো সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্যে সহযোগিতার জন্য যেসব সংঘ গড়ে ওঠে তার মধ্যে উত্তর জার্মানির 'হান্স' নামক সংঘটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। বাল্টিক অঞ্চলের বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে এই সংঘ গঠিত হয়। 1358 থেকে 1550 পর্যন্ত স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ভাইকিংদের ঘাঁটিগুলোকে কার্যত শাসন করত এই সংঘ। এদের নিজস্ব নৌবহর ছিল, নানা দেশের শহরে এদের নিজস্ব কারখানা ছিল—লণ্ডনের ইস্পাত কারখানা থেকে শুরু করে নভ্‌গরদ পর্যন্ত। তাদের অধিকারের ওপর ঐসব দেশের আইন খাটত না। দূরবর্তী দেশগুলো থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ ক'রে এনে এরা পরিণত পণ্যসামগ্রী প্রস্তুত ক'রে বিক্রি করত। এর ফলে তাদের নিজস্ব শহরের বাইরে অন্যত্র শিল্পবিকাশ ব্যাহত হতো।

শহরের এই সব সংঘের কর্মকাণ্ডের পরিধি বেড়ে ওঠায় শহরের অভ্যন্তরে সংঘাতকে তখনকার মতো ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হলেও, সংঘাতের কারণগুলো রয়েই গেল। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের নিজস্ব সম্পদ আস্তে আস্তে বিকাশ লাভ করতে থাকায় বিদেশী বণিকদের পক্ষে চিরকাল বাণিজ্যিক আধিপত্য বজায় রাখাও সম্ভব ছিল না। যেমন ধরা যাক ব্রিটেনের কথা। পঞ্চদশ দশক পর্যন্ত ব্রিটেন ছিল কাঁচা পশম সরবরাহকারী দেশ। সেই কাঁচা পশম থেকে ফ্ল্যান্ডার্স আর ইতালিতে পরিণত পণ্যসামগ্রী তৈরি হতো। আর্থিক দিক থেকে ব্রিটেনের ওপর লম্বার্ডি, ফ্লরেন্স এবং হানস-সংঘের আধিপত্য ছিল। কার্যত তা হয়ে উঠেছিল এক আধা-উপনিবেশ। কিন্তু অষ্টাদশ দশকের উত্তর আমেরিকার মতন মধ্যযুগের ব্রিটেনও

অর্থনৈতিক সম্পদে এত সমৃদ্ধ ছিল যে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজ হোক আর কাল হোক আসতই। বাস্তবিক, চতুর্দশ শতকেই ব্রিটেনের ঘরে ঘরে পশম বোনার মধ্যে দিয়ে সেই মুক্তির সূত্রপাত ঘটেছিল।

মধ্যযুগের ইতালি কিংবা 'লো কান্টিজ'-এর (হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ) মতো সবচেয়ে অগ্রসর অঞ্চলের শহরগুলোতে ধনবান সংঘ-সদস্যদের শাসনের প্রতিক্রিয়ায় কারিগরদের ও তাঁতিদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। 1378 সালে ফ্লরেন্সের চিঅম্পিতে কারিগরেরা বিদ্রোহ করেন। 1302 থেকে 1382 সালের মধ্যে ব্রুঝ, লিয়্যাঝ এবং গেন্ট্-এ তাঁতিদের বিদ্রোহ ফেটে পড়ে। এইসব বিদ্রোহ সফল হওয়া সত্ত্বেও মধ্যযুগে প্রাচীন গ্রীক ধাঁচের নগর-গণতন্ত্র গড়ে ওঠেনি; কারণ মধ্যযুগের শহরগুলো উন্নত এবং জনবহুল সামন্ততান্ত্রিক গ্রামাঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বরং শহরের ভেতরে, কিংবা বিভিন্ন শহরের মধ্যে, সংঘাতের চরম পরিণতিতে হয় সামন্ততান্ত্রিক রাজারা নাহয় বণিক-শাসক ও ভাড়াটে অধিনায়করাই (condottieri) শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ইতালিতে এরাই ক্ষমতা দখল করে। রেনেসাঁস যুগে এইভাবেই জাতিরাষ্ট্র গড়ে ওঠে। তখনো মূলত সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের হওয়া সত্ত্বেও সেসব রাষ্ট্র শহরেই কেন্দ্রীভূত হয়। আরো পরে এই বুর্জোয়া কেন্দ্রীয় কোষটিকে ঘিরে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

বাণিজ্য ও গণিত

সুতরাং মধ্যযুগের উত্তরার্ধে ভাবনাচিন্তার, বিশেষত বিজ্ঞানের বিকাশ কীভাবে হয়েছিল তা জানতে গেলে শহরগুলোরই শরণাপন্ন হতে হবে। এইসব শহরে অ-যাজকীয় এক নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে উঠছিল। এই শ্রেণী ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও বহুলাংশে চার্চ-নিরপেক্ষ, এমনকি অল্পবিস্তর চার্চ-বিরোধীও ছিল। চার্চ তখনো বৃহত্তম ভূম্যধিকারী হিসেবে অধিষ্ঠিত এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। গোড়ার দিকে অবশ্য দু পক্ষের স্বার্থের মধ্যে বিশেষ কোনো সংঘাত বাধেনি, কারণ নবোদ্ভূত *বুর্জোয়াশ্রেণী* তখন ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষা মুনাফা এবং জাঁকজমক নিয়েই বেশি আগ্রহী ছিল। বিভিন্ন খ্রিস্টীয় আশ্রমের বাদবিতন্ডা অপেক্ষা বাণিজ্যিক পাটীগণিত, সূক্ষ্ম কারুকর্ম এবং শিল্পকলা নিয়েই তারা বেশি মাথা ঘামাত। পরে যখন চার্চ তাদের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল তখন তারা চার্চকে সংশোধন করবার প্রয়াসকে সোৎসাহে সমর্থন করল।

লিওনার্দো ফিবোনাচ্চি 1202 সালে ইউরোপে আরবী সংখ্যামালার প্রবর্তন করেন। এই সংখ্যামালা প্রধানত বাণিজ্যিক হিসাবরক্ষণের কাজে লাগে। পাটীগণিতের যে চারটি প্রক্রিয়া আগে এক গূঢ় রহস্য রূপে মুষ্টিমেয় কয়েকজন গণিতজ্ঞের অধিগম্য ছিল, মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে তা প্রত্যেক বণিক-শিক্ষার্থীর আবশ্যিক প্রশিক্ষণের অঙ্গ হয়ে ওঠে। ফলে গণিতের মূল্য বোঝবার মতো লোকের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। বাণিজ্যিক গণিতের এই প্রসার ঘটার পরিণতিতেই বীজগণিতের ' + ' এবং ' − ' সংকেত দুটির প্রচলন ঘটে। আদিতে এ দুটি ছিল ওজন-পরীক্ষকদের ব্যবহৃত চিহ্ন; তাঁরা ওজন বেশি হলে +, এবং কম হলে − চিহ্ন দেগে দিতেন। এই বাণিজ্যিক আগ্রহই জ্যোতিষ্ক-সারণী এবং মানচিত্র নিয়ে চর্চা অব্যাহত রাখে এবং পরে নৌচালনের স্বার্থে তাদের উন্নতিসাধান করে।

শিল্পকলা ও বিজ্ঞান

বণিকদের ধনসম্পদের পরিমাণ ক্রমশই বাড়তে থাকায় শিল্পকলায় এক নতুন প্রণোদনা জাগে। শুধু তাই নয়, শিল্পের বিষয়বস্তু ও শৈলীতেও পরিবর্তন আসে। তখনো তা ধর্মের অবয়বেই

ব্যক্ত হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু আদি মধ্যযুগের চার্চ-সংশিষ্ট শিল্পকলার সঙ্গে (যা গথিক ক্যাথিড্রালগুলোর মধ্যে মূর্ত রূপ ধারণ করেছিল) তার অনেক তফাৎ। ধর্মতাত্ত্বিক প্রতীকের বদলে এখন প্রকৃতি থেকে চয়ন-করা চিত্র উপস্থাপিত করা হলো। শিল্পকলা যুগপৎ আরো জাগতিক ও প্রকৃতিনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। বণিকদের হাতে যে-উদ্বৃত্ত জমা হয়েছিল তার অনেকটাই প্রাসাদভবন নির্মাণে এবং অঙ্কিত চিত্রের পেছনে ব্যয়িত হলো—অংশত আনন্দ আর অংশত মর্যাদা লাভ করার জন্য। কারিগরদের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে গেল, তাঁদের প্রকৌশলের উৎকর্ষ নিয়তই বাড়তে লাগল। বস্ত্র, মৃৎপাত্র, কাচের জিনিস এবং ধাতুকর্ম—এইসব ক্ষেত্রে বস্তুর ভৌত ও রসায়নিক ধর্ম নিয়ে ব্যবহারিক গবেষণা চালাবার প্রচুর উৎসাহ ও সুযোগ পাওয়া গেল। এগুলোই ছিল বিজ্ঞানের নবজীবন লাভের বস্তুগঠিত বনেদ। রেনেসাঁস যুগের উচ্ছ্বসিত বিকাশের ক্ষেত্র এইভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

৪. মধ্যযুগের কর্মকৃতিত্ব

মধ্যযুগ যে উত্তরাধিকার রেখে যায় তা মূলত অর্থনৈতিক, প্রকৌশলগত এবং রাজনৈতিক; তার মননগত অবদান খুব একটা স্থায়ী হয় নি। সেই কারণেই নগরনির্ভর বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অদলবদল ঘটিয়ে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিতেই রেনেসাঁস যুগ এবং শিল্পবিপ্লব যুগের অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব হয়েছিল; সে-অগ্রগতির জন্য ঐ ভিতটাকে একেবারে ভেঙে ফেলার প্রয়োজন হয় নি। পক্ষান্তরে, মধ্যযুগের ধ্যানধারণাকে একেবারে চুরমার করে দিয়ে তবেই নতুন এক বিজ্ঞাননির্ভর দর্শন গড়ে তোলা সম্ভব হয়। একথা বলে মধ্যযুগের ধর্মশাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের সুবিপুল মনন-প্রয়াসকে ছোটো করছি না। প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার এবং তার আত্মীকরণে তাঁদের ভূমিকা বিরাট। কিন্তু পূর্ববর্তী আরবদের মতো তাঁরাও প্রায় দুহাজার বছর আগে অ্যারিস্টটল কর্তৃক নির্ধারিত গণ্ডির বেড়া ভাঙতে অক্ষম হন; কেন হন তা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি।

মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের অবদান আরবদের অবদানের তুলনায় নিঃসন্দেহে অনেক সু-মার্জিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল নীতিগুলি তাঁরা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। মধ্যযুগের শুরুতেই রবার্ট গ্রসেটেস্ট *বিশ্লেষণ* (resolution) ও *সংশ্লেষণের* (composition) কিংবা *আরোহ* ও *অবরোহের* যুগ্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেছিলেন—ঠিক পাঁচশো বছর পরের নিউটনেরই মতো প্রাঞ্জলভাবে। কিন্তু পদ্ধতিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ইচ্ছা বা উপায় কোনোটাই যদি না থাকে তাহলে সে পদ্ধতির কী মূল্য? বরং মনে আত্মতুষ্টতার ভাব জাগিয়ে তা অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে।

সে অগ্রগতি ঘটতে যে এত দেরি হলো তার কারণ হচ্ছে, সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে—তা সে ইসলামীই হোক আর খ্রিস্টানই হোক—যুক্তিশাসিত বিজ্ঞানকে ব্যবহারিক সুবিধার্থে প্রয়োগ করার কোনো পথই খোলা ছিল না। 'প্রিন্স'রা জ্যোতিষী গণনায় বিশ্বাসী হওয়ায় জ্যোতিষচর্চার সূত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা অব্যাহত থাকে, একথা ঠিক। অপরসায়ন চর্চার সূত্রে রসায়নিক প্রকৌশলের উন্নতি ঘটে, তাও ঠিক। কিন্তু এসবের মূলে যুক্তিবিচারের ভূমিকা ছিল নগণ্য, কারণ বিশুদ্ধ জাদুতত্ত্ব দিয়ে এসবকে ব্যাখ্যা করা হতো। বিজ্ঞানের ডাক পড়ত প্রধানত ধর্মতাত্ত্বিকদের উদাহরণ যোগাবার জন্যে; অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিছক বাহ্য সাদৃশ্যসন্ধান ছাড়া বিজ্ঞানের কাছে আর কোনো দাবি রাখা হতো না। ব্যবহারিক প্রয়োগের নিরিখে কখনোই বিজ্ঞানকে বাজিয়ে দেখার প্রয়োজন হতো না। কাজেই সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে বিজ্ঞান প্রধানত পুঁথিগত বিদ্যা এবং পণ্ডিতি কচকচির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। পরবর্তীকালে মননক্ষেত্রে যে

অগ্রগতি ঘটে তার মূলে মধ্যযুগীয় ধর্মশাস্ত্রীদের প্রায় কোনোই অবদান ছিল না; তাঁদের অবদান এইটুকু যে তাঁদের ভুল প্রমাণ করার তাগিদেই সে অগ্রগতি ঘটেছিল। একদিকে প্রাচীন গ্রীক চিন্তাভাবনার শ্রেষ্ঠ অংশটির পুনরাবিষ্কার; অন্যদিকে প্রকৃতিজগৎ ও শিল্পজগতের প্রতি নবজাগ্রত ব্যবহারিক আগ্রহের প্রেরণায় নবনব পরীক্ষানির্ভর পদ্ধতির বিকাশ; এই দুটি ঘটনার সম্মিলনেই মননক্ষেত্রে ঐ অগ্রগতি ঘটে।

পণ্যনির্মাণের এবং পরিবহনের প্রকৌশলে মধ্যযুগে রীতিমতো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল। তাছাড়া মধ্যযুগে নানান কঠিন ব্যবহারিক সমস্যাও উত্থাপিত হয়েছিল; পরবর্তীকালে বুদ্ধি সহযোগে তাদের সমাধান করতে হয়। সুতরাং ভবিষ্যৎ বিকাশের দিক থেকে মধ্যযুগের তত্ত্বীয় চিন্তাভাবনা অপেক্ষা এইগুলির অবদানই ছিল অনেক বেশি। এই বইয়ের শুরুতে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মলগ্ন ও জন্মস্থান নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছিলাম তার আংশিক উত্তর এ থেকে মেলে। গ্রীক প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞানের প্রথম উচ্ছ্বসিত বিকাশ-পর্বটির উত্তরাধিকার যাদের ওপর বর্তায় তাদের মধ্যে একমাত্র পশ্চিম ইউরোপই খানিকটা অগ্রগতি ঘটাবার মতো অবস্থায় ছিল। কেননা পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই ইসলামী জগৎ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়েছিল। নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ আর বাইরের আক্রমণ তাদের শেষ করে দিয়েছিল। তুর্কি বা মঙ্গোলদের পরবর্তী সাফল্য যতই উল্লেখযোগ্য হোক, এটা স্পষ্ট যে ইসলামী সভ্যতা তার মননশীলতার বেগ হারিয়ে ফেলেছিল। উদারতা হারিয়ে ইসলাম ধর্ম সংকীর্ণ গোঁড়ামির কানাগলিতে ঢুকে পড়েছিল। অপরদিকে ভারতবর্ষে তখন হিন্দুধর্ম একের পর এক ইসলামী আক্রমণ ঠেকানোর লড়াইয়ে রত। সে হিন্দুধর্ম জাতপাতের স্থবির এক কাঠামোয় এমনভাবে আটকে পড়েছিল যে স্থিতিশীলতার মূল্য হিসেবে তাকে অগ্রগতির সমস্ত সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল। ওদিকে চীন তার প্রাচীন সংস্কৃতিকে বজায় রাখতে পারলেও, এমনই ছিল সেদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা যে চীনের পক্ষে প্রকৌশলের সঙ্গে পুঁথিগত বিদ্যার অতি প্রয়োজনীয় মেলবন্ধনের কাজটি করা সম্ভব ছিল না—পরবর্তী চারশো বছরেও তা সম্ভব হয় নি।

মধ্যযুগের শেষে ইউরোপের সংস্কৃতি বস্তুগত, এমনকি মননগত দিক থেকেও এশিয়ার সুবিশাল সাম্রাজ্যগুলোর তুলনায় বিশেষ উন্নত ছিল না। তবু তার ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনা বেশি ছিল এই কারণে যে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোগুলো অত অনড় ও সুসম ছিল না। ঐতিহ্যের ভার যত বেশিই হোক, সর্বত্রই সে ঐতিহ্যকে বিরোধের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। শহর আর গ্রামের নানাবিধ স্বার্থের সংঘাত, চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংঘাত ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে মথিত করেছিল। শুধু তাই নয়, পোপ আর সম্রাটের কর্তৃত্বও পরিবর্তনের সীমাকে পাকাপাকিভাবে বেঁধে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না; পোপ আর সম্রাট নিজেরাই প্রায়শ দ্বন্দ্ববিবাদে মত্ত থাকতেন। যে-সামন্ততন্ত্র মধ্যযুগের মূল চরিত্র নির্ধারণ করে দিয়েছিল তা নিজেই চতুর্দশ শতকের শেষ দিক থেকে ভেঙে পড়তে থাকে। অথচ সেই ভাঙন সামাজিক পচনশীলতার সূচক ছিল না; কারণ বহু জায়গাতেই অর্থনৈতিক ও প্রকৌশলগত অগ্রগতির চিহ্ন ছিল সুস্পষ্ট। পুরোনো সমাজ মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু এক নতুন সমাজ তার বদলে গড়ে উঠছিল; এমন এক নতুন সমাজ যা ইউরোপের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শ্রমসম্পদকে মধ্যযুগের লর্ড এবং যাজকদের তুলনায় অনেক সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম।

সপ্তম অধ্যায়

আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব

ভূমিকা

মধ্যযুগের শেষ নাগাদ ছোটো শহর, বাণিজ্য এবং উৎপাদন-শিল্পের বিকাশে গতি সঞ্চারিত হতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে এই বিকাশ ছিল সামঞ্জস্যহীন; অথচ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিমণ্ডলেই এইসব পবিবর্তন আস্তে আস্তে পরিণত হয়ে উঠতে থাকে এবং অবশেষে স্পষ্ট রূপ ধারণ করে। একের পর এক জায়গায় অর্থনীতিতে এবং বিজ্ঞানে এইসব পরিবর্তনের কল্যাণে নতুন নতুন ব্যবস্থাব উদ্ভব হতে থাকে। উন্নততর প্রকৌশল, উন্নততর পরিবহন এবং বিস্তৃততর বাজারের দৌলতে বিক্রয়যোগ্য পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন একটানা বাড়তে থাকে। এইসব বাজার কেন্দ্রীভূত হলো শহরগুলোতে। অথচ সামগ্রিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে এতদিন এই শহরগুলোর ভূমিকা ছিল গৌণ, প্রায় পরগাছার মতো। পঞ্চদশ শতাব্দীতেই 'burgher'-দের বা বুর্জোযাদের ক্ষমতা রীতিমতো বেড়ে উঠেছিল। তারা ঐ পুরোনো অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করতে আরম্ভ করে। রূপান্তরিত এই অর্থনীতিতে উৎপাদনের রূপটিকে নিয়ন্ত্রণ করবে টাকাব লেনদেন— জোর করে আদায়-কবা শ্রমসেবা নয়। তীব্রতম বাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং মননগত লড়াই ল'ডে তবে বুর্জোযাবা—এবং তাদেব সৃষ্ট ঐ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা—জয়যুক্ত হয়েছিল। স্বভাবতই, রূপান্তর লাভের এই প্রক্রিয়াটি ছিল মন্থর এবং অসম। ইতালিতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। অথচ ব্রিটেন বা হল্যান্ডেব মতো সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলোতেও বুর্জোয়ারা মধ্য-সতেরো শতকের আগে তাদের আধিপত্য কায়েম করতে পারেনি। তামাম ইউরোপে বুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হতে হতে আরো দুশো বছর কেটে যায়।

1450 থেকে 1690—এই পর্বটিতে পুঁজিতন্ত্রই সমাজের মুখ্য উৎপাদনপদ্ধতি রূপে বিকশিত হয়ে ওঠে। আর ঠিক ঐ পর্বেই প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞানের নতুন পদ্ধতি রূপে স্বীকৃতি ও বিকাশ লাভ করে পরীক্ষানিরীক্ষা ও গণনা। রূপান্তরণের এই প্রক্রিয়াটি ছিল জটিল। একদিকে প্রকৌশলগত নানান পরিবর্তন বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটায়, আবার অন্যদিকে বিজ্ঞান প্রকৌশলের নানারকম নতুন নতুন এবং ঘনঘন পরিবর্তন ঘটায়। করণকৌশলে, অর্থনীতিতে এবং বিজ্ঞানে এই যে যৌথ বিপ্লব—এ এক অনন্য সামাজিক ঘটনা। বস্তুত, যে-কৃষির উদ্ভব না হলে মানবসভ্যতাই থাকত না, শেষ বিচারে এই সামাজিক বিপ্লবের গুরুত্ব সেই কৃষির আবিষ্কারের চেয়েও বেশি। কারণ, বিজ্ঞানের উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরন্তর অগ্রগতির বীজটি তার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

পুঁজিতন্ত্র আর বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করেছে দুটি পরস্পর-সম্পর্কিত ধারায়। আর সে সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে কার্য-কারণের সরল ছকে ফেলে তাকে দেখানো যায় না। এটুকু অবশ্য বলা যেতে পারে যে আলোচ্য পর্বটির গোড়ার দিকে অর্থনৈতিক ঘটনাটির গুরুত্বই ছিল মুখ্য। যে পরিস্থিতিতে পুঁজিতন্ত্র বিকাশ লাভ করে, সেই পরিস্থিতিই পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞানের উদ্ভবকে সম্ভবপর এবং আবশ্যিক করে তোলে। আলোচ্য পর্বটির শেষের দিকে কিন্তু এর উল্টো ব্যাপারটা খানিকটা টের পাওয়া যেতে থাকে। ততদিনে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক সুফলগুলির কল্যাণে করণকৌশলে অগ্রগতির পরবর্তী প্রকাণ্ড পদক্ষেপটির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে উঠছিল—পথ প্রশস্ত হচ্ছিল শিল্পবিপ্লবের। এই পর্বেই প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞান তার মহাসন্ধিক্ষণটি পার হয়ে আসে। সমাজের অন্যতম উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে এই পর্বেই বিজ্ঞানের স্থানটি পাকা হয়ে

যায়। ইতিহাসের দীর্ঘতর প্রেক্ষণিকায় এই ঘটনাটির গুরুত্ব সমকালীন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর তুলনায় ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমাজের অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধারায় পুঁজিতন্ত্র একটা সাময়িক স্তর মাত্র; আর বিজ্ঞান সমগ্র মানবজাতির এক চিরসম্পদ। পুঁজিতন্ত্র বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে ঠিকই, তবে বিজ্ঞানই একদিন পুঁজিতন্ত্রকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে।

প্রথম দিকে পুঁজিতন্ত্র প্রাণবন্ত এবং বর্ধিষ্ণু ছিল। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শিকলগুলোকে তা ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছিল। ম্যানুফ্যাকচার এবং বাণিজ্য তখন ক্রমশ বিকশিত হচ্ছিল, ছড়িয়ে পড়ছিল নিত্যনতুন এলাকায়। অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে বস্তুগত চাহিদা বেড়ে চলল, আর তারই দরুন নানান প্রকৌশলের আরো উন্নতি ঘটতে লাগল—বিশেষ করে আকরখনন, সমরায়োজন এবং নৌচালনের ক্ষেত্রে। এরই ফলে আবার, নতুন নতুন পদার্থ বা প্রক্রিয়ার আচরণ নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটাল। সনাতন প্রচলিত বিজ্ঞান সে সব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেল। কারণ ইউরোপে তখনো কম্পাস বা বারুদের মতো জিনিসের আবিষ্কার ঘটেনি। এ ছাড়া, নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের অভিযানগুলিও প্রাচীনদের অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। ফলে একটা নতুন দর্শনের প্রয়োজন তীব্রতর হয়ে উঠল—এমন এক দর্শন যার দৃষ্টিশক্তি আর কর্মশক্তি দুটোই হবে আগের চেয়ে জোরালো।

সতেরো শতকের শুরুতে নবীন উদ্যমী বুর্জোয়াশ্রেণী এইসব প্ররোচনায় সাড়া দিতে সক্ষম হলো। তারাই পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করল। আগে দুঃসাহসী বণিকদের যেমন সংগঠিত করা হয়েছিল, এখন তেমনি এই নব্য বিজ্ঞানীদেরও সংগঠিত করা হলো। সতেরো শতক শেষ হবার আগেই অল্প কয়েকজন দক্ষ ব্যক্তি মিলে বলবিজ্ঞান (mechanics) আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল প্রশ্নগুলির সমাধান বার করতে সক্ষম হলেন। প্রাচীনকালের বিজ্ঞানীরা কোনোদিনই যা করতে পারেননি, ঠিক সেইটিই এঁরা করলেন—অর্থাৎ ঠিক যেক্ষেত্রে প্রয়োজন সেক্ষেত্রে কার্যকর সহায়তা যোগালেন। সেই ক্ষেত্রটি হলো *নৌচালন*। কিন্তু পরে যা ঘটবে সে তুলনায় এ তো সামান্য ব্যাপার। এই নব্য বিজ্ঞানীদের সত্যিকারের বিজয়তোরণ রচিত হলো তখনই যখন তাঁরা প্রকৌশলের এবং প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে নতুন প্রণোদনা যোগালেন; যখন তাঁরা প্রকৌশল এবং প্রকৃতি-বিষয়ক সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানে নবোদ্ভূত *পরীক্ষামূলক* এবং *গাণিতিক* পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হলেন। এর পরিণত ফসল আমরা পেয়েছি পরবর্তী শতকগুলিতে। সতেরো শতকের শেষ অব্দি অবস্থাটা ছিল এইরকম যে বিজ্ঞান আমূল রূপান্তর ঘটিয়ে প্রকৌশলের উন্নতি যতটা না ঘটিয়েছিল, তার থেকে ঢের বেশি লাভবান হয়েছিল নিজে। কারণ, নতুন করে ব্যবহারিক কর্মপ্রক্রিয়ার নিবিড় সংস্পর্শে আসার সুফল ফলেছিল বিজ্ঞানে। অর্থাৎ, বিজ্ঞান তখনো যতটা না *দাতা*, তার চেয়ে বেশি *গ্রহীতা*।

বৈজ্ঞানিক বিপ্লব

জন্ম ও শৈশবের মহাসন্ধিক্ষণটি পার হয়ে এই নব্য বিজ্ঞান কীভাবে মননগত পরিপক্কতায় উপনীত হলো, তার ইতিবৃত্ত রচনাই এই অধ্যায়ের কাজ। রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের নতুন নতুন সামাজিক শক্তিগুলির সঙ্গে তার সম্পর্কটি কেমন ছিল, সেটিই হবে প্রথম আলোচ্য। তার পর দেখানো হবে নব্য বিজ্ঞানের কীর্তিগুলি কীভাবে আগামী আধুনিক যুগের করণকৌশলকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রভাবিত করেছিল, এবং কীভাবে সে যুগের ধারণাগুলিকে রূপ দিয়েছিল। অতীব

গুরুত্বপূর্ণ এই পর্বে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনায় যে পরিবর্তন আসে তা ঐ যুগের রাজনীতি এবং ধর্মক্ষেত্রের ভাবনাগত পরিবর্তনের তুলনায় ঢের বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। সেকালে অবশ্য এর উল্টোটাই সত্যি বলে মনে হয়েছিল। বিজ্ঞানভাবনার এই পরিবর্তনটি প্রকৃত অর্থেই ছিল এক *বৈজ্ঞানিক বিপ্লব।* প্রাচীন গ্রীকদের কাছ থেকে আহরিত মননগত অনুমানের ভিত্তিতে যে বিশাল কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল; যেটি ইসলামী ও খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিকদের আশীর্বাদে অকাট্য আপ্তবাক্যের এক সমষ্টিতে পর্যবসিত হয়েছিল; সেই অচলায়তনটি এই বিপ্লবের ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেল। তার জায়গা নিল সম্পূর্ণ নতুন এক চিন্তাপ্রণালী। মধ্যযুগের মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিকরা গ্রীকদের কাছ থেকে যে বিশ্বছবিটি আহরণ করেছিলেন সেটি ছিল গুণাত্মক, ছেদহীন, সীমিত এবং ধর্মাশ্রয়ী। এবার তার বদলে যে নতুন বিশ্বছবিটি রচিত হলো তা পরিমাণাত্মক, বিচ্ছিন্ন কণিকাবাদী, অসীম বিস্তৃতিসম্পন্ন এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ। অ্যারিস্টটলের ক্রমোচ্চ-স্তরে-বিন্যস্ত (hierarchical) ব্রহ্মাণ্ডের জায়গা এবার নিল নিউটনের বিশ্ব-মেশিন। এই উত্তরণের পর্বে ধ্বংসাত্মক সমালোচনা আর গঠনমূলক সংশ্লেষণ এমনই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল যে এ দুটি প্রক্রিয়াকে আলাদা করে চেনাই যায় না।

এই যে পরিবর্তনটি সাধিত হলো, এটি ছিল জ্ঞান সম্পর্কে নতুন এক মনোভঙ্গির একটি লক্ষণ মাত্র। আগে জ্ঞান বলতে মনে করা হতো এমন একটা কিছু যা এই চির-অপরিবর্তিত, চির-অপরিবর্তনশীল, চিব-অপরিবর্তনসাধ্য বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে মানুষের একটা আপসমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলে। আর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জ্ঞান বলতে বোঝাল এমন একটা কিছু যার সাহায্যে প্রকৃতির শাশ্বত নিয়মগুলিকে জেনে নিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বস্তুগত সম্পদ নিয়ে যে নতুন আগ্রহ জেগে উঠেছিল, এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তারই ফসল। এই আগ্রহ জেগে ওঠায় বিদ্বান ব্যক্তিরা কারিগরদের বিভিন্ন পেশা নিয়ে চর্চায় নতুন করে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। এইভাবে রেনেসাঁসের কল্যাণে অভিজাত তত্ত্ব আর অনভিজাত প্রয়োগকর্মের মধ্যে বিচ্ছেদ অংশত হলেও ঘুচল। সভ্যতার আদিপর্বে শ্রেণীসমাজের উদ্ভবের মধ্যে দিয়ে একদা এই বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত এই বিচ্ছেদ থাকার দরুনই গ্রীক মননের অসামান্য ধারণক্ষমতা পরিশেষে অমন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত কীভাবে হলো সেটা ঠিকমতো বুঝতে গেলে রেনেসাঁস-আনীত রূপান্তরের ব্যবহারিক ও মননগত দুটো দিককেই বোঝা দরকার। বিজ্ঞানের ইতিহাস-লেখকরা কিন্তু সাধারণত এই দ্বিতীয় দিকটিব ওপরেই জোর দিয়ে থাকেন। তাঁরা রূপান্তরণের এই গোটা প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করেছেন দুভাবে। একদলের মতে, রেনেসাঁসের আগে যেসব যুক্তি প্রয়োগ করা হতো সেগুলি ছিল স্বতঃসিদ্ধ মূল প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সংগতিবিহীন; কিন্তু রেনেসাঁসের যুগে তা হয়ে উঠল অধিকতর সংগতিপূর্ণ। আরেকদলের মতে, প্রত্যক্ষ ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণে আগের তুলনায় দেখা দিল অধিকতর সতর্কতা, এবং সেগুলির মূল্যায়ন হয়ে উঠল অপেক্ষাকৃত নির্ভুল। এই দুটো ব্যাখ্যাই অসম্পূর্ণ। কারণ অর্থনীতি, প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান—এই তিনটি ক্ষেত্রেই যে অগ্রগতি ঘটল, তা একই সময়ে এবং একই কালে ঘটল কেন তার উত্তর মেলেনা এসব ব্যাখ্যায়। তাছাড়া, বিজ্ঞান যেসব বিষয় নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠল, সমাজের পরিচালক-গোষ্ঠীও ঠিক সেই একই ধরণের সমস্যার মোকাবিলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন, সে প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যায় না এসব ব্যাখ্যায়।

পক্ষান্তরে, আলোচনাটাকে কেবল প্রযুক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ রাখলেও ভুল হবে। মনোভঙ্গি এবং বস্তুগত সমস্যা—এই দুটি বিষয় নিয়েই যুগপৎ আলোচনা করতে হবে। উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর সংগ্রামের মতাদর্শগত দিকগুলির ছাপ পড়েছিল উত্তরণপর্বের এই কয়েক

শতকের বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মীয় ভাবধারার ওপর। বস্তুত, বহু শতাব্দী ধরে স্বীকৃত ভাবধারাগুলির ওপর আঘাত তখনই হানা যায় যখন সমাজের মূল ভিত্তিটাই সংশয়ের আঘাতে নড়বড়ে হয়ে ওঠে।

পূর্ববর্তী উত্তরণপর্বগুলির সঙ্গে এই পর্বটির তফাৎ আছে। যেমন, রোম সাম্রাজ্যের শেষ দিকটাতে পুরাতনের ধ্বংসাবশেষের ওপরেই গড়ে উঠেছিল এক নতুন বিজ্ঞান। কিংবা ধরা যাক মধ্যযুগের গোড়ার দিককার কথা। তখন এক ধরনের সংস্কৃতি থেকে আরেক ধরনের সংস্কৃতিতে সঞ্চালিত হয়েছিল বিজ্ঞান। কিন্তু যে বিপ্লব আধুনিক বিজ্ঞানের জননী, সেখানে অনুরূপ কোনো ছেদ বা বহিরাগত প্রভাব পড়েনি। এর থেকে একটা জিনিস আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটা এই যে সরাসরি ঐ পুরোনো সমাজেরই গর্ভ থেকে আহরিত উপাদান নিয়ে একটা সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাপ্রণালী গড়ে উঠছিল। যাঁরা বিপ্লব সংঘটিত করলেন সেইসব ব্যক্তির ভাবনাচিন্তা ও তৎপরতার অভিঘাতে ঐসব উপাদান রূপান্তর লাভ করে। পুরোনো সামন্ত সংস্কৃতির খামতি ধরা পড়ে যায়। ঐ সংস্কৃতি তার নিজেরই সৃষ্ট সব সংঘাতের ধকল সামলাতে পারেনি। সামন্ত সমাজেরই গর্ভজাত বুর্জোয়াশ্রেণীকে তাই নিজস্ব নতুন এক সমাজব্যবস্থা গড়ে নিতে হলো, বিকাশ ঘটাতে হলো নিজস্ব নতুন এক চিন্তাপ্রণালীর। রেনেসাঁস যুগের এবং সতেরো শতকের ব্যক্তিরা অজ্ঞাতসারে অতীতের কাছে যতই ঋণী হোন, সচেতনভাবে তাঁরা অনুভব করতেন যে তাঁরা অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছেন।

এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সঙ্গে আগেকার পরিবর্তনগুলোর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ আছে। সেটি এই যে এই বিপ্লবের চৈতন্যে, বিশেষত বিপ্লবের গোড়ার দিকটাতে, এমন একটা ধারণা কাজ করেছিল যে এটি হচ্ছে প্রাচীনতর, মহত্তর এবং অধিকতর দার্শনিকতায় সিঞ্চিত এক সংস্কৃতিতে প্রত্যাবর্তন। এর ফলে বিপ্লব ঘটানো সহজতর হয়েছিল। কারণ এরই ফলে কোপার্নিকাস বা হার্ভের মতো সত্যিকারের যুগপ্রবর্তকদের পক্ষে প্রাচীনদের কর্তৃত্বকে সাক্ষী মানা সম্ভব হয়েছিল। ইন্দ্রিয়লব্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণের চেয়ে ঐ কর্তৃত্বের সমর্থনের গুরুত্ব তো কিছু কম ছিলনা। আসলে, সবরকমের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার বদলে বিশেষ কোনো কোনো কর্তৃত্বকে তখন স্বীকার করে নেওয়া হলো। যে ব্যক্তি 'হিউম্যানিস্ট', মানবতাবাদী, তাঁর তো বেছে নেওয়ার অধিকার থাকবেই। এবং নিজস্ব অন্তর্নিহিত কাবণবশতই তিনি তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্বটি বাছাই করে নেবেন, এটাই সংগত। এতদিনকার অ্যারিস্টটলীয় একাধিপত্যের আগলটি ভাঙতে সাহায্য করল প্রাচীন গ্রীসেরই শ্রেষ্ঠ গাণিতিক ঐতিহ্যের আংশিক পুনরাবিষ্কার—বিশেষ করে অ্যাপলোনিয়াস ও আর্কিমিডিসের কাজ। প্লেটোও নতুন করে প্রেরণা যোগালেন—ধর্মতাত্ত্বিক রূপে নয়, গণিতজ্ঞ রূপে। এক অর্থে, এবং একান্তই সদর্থে, নবোদিত বিজ্ঞান এই প্রাচীন ঐতিহ্যেরই প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার। কারণ প্রাচীনদের অনুসৃত বিবিধ পদ্ধতির সাহায্যেই নবযুগের এইসব মানুষ প্রাচীন ধ্যানধারণার অবসান ঘটিয়ে শ্রেষ্ঠতর কীর্তি রাখতে পেরেছিলেন।

রূপান্তরের প্রধান প্রধান পর্ব

বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের যুগটিকে তিনটি পর্বে ভাগ করে নিলে নবীন বিজ্ঞানের সৃজনপ্রক্রিয়ার আসল বৈশিষ্ট্যগুলোকে বুঝতে সুবিধে হবে. (এক) *রেনেসাঁস-পর্ব* (1440-1540); (দুই) *ধর্মযুদ্ধের পর্ব* (1540-1650) এবং (তিন) *রেস্টোরেশন-পর্ব* (1650-90)। মনে রাখতে হবে, এই তিনটি পর্ব পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়; সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের যে সামগ্রিক প্রক্রিয়া, এরা তারই অন্তর্গত তিনটি পর্ব মাত্র।

যেসব রাজনৈতিক ঘটনা প্রথম পর্বটির অন্তর্গত সেগুলি হলো : রেনেসাঁস, মস্ত মস্ত নৌ-অভিযান, আর যুদ্ধবিগ্রহ—যে যুদ্ধবিগ্রহের পরিণামে ইতালি রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারায়, আর স্পেন উঠে আসে পৃথিবীর প্রথম বিশ্বশক্তি হিসেবে।

দ্বিতীয় পর্বে ইউরোপীয় বাণিজ্য ও জলদস্যুতার ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করে আমেরিকায় ও প্রাচ্য ভূখণ্ডে। পরিণামে পণ্যসামগ্রীর দাম নিয়ে এমনই এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা সারা ইউরোপের অর্থনীতিকে কাঁপিয়ে তোলে। এই যুগেই ফ্রান্স আর জার্মানির মধ্যে ধর্ম নিয়ে নিষ্ফল যুদ্ধ চলে। ইতিহাসের দিক থেকে এসবের চেয়ে অনেক বড়ো ঘটনাটি হলো, হল্যাণ্ডে এই পর্বের শুরুতেই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের, এবং ব্রিটেনে এই পর্বেরই শেষে বুর্জোয়া কমনওয়েলথের প্রতিষ্ঠা।

তৃতীয় পর্বটি রাজনৈতিক সমঝোতার। অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর প্রতিটি দেশেই বড়ো বুর্জোয়াদের হাতেই ক্ষমতার সুতোটি ধরা ছিল, অথচ সরকারগুলি ছিল রাজতান্ত্রিক। এই পর্বের মূল সুরটি বেঁধে দেয় ওলন্দাজরা, যদিও ফ্রান্সের ভের্সাইয়ের 'রাজাধিরাজে'র (Grand Monarque) ধুমধাম ছিল অনেক বেশি। ব্রিটেনে এই পর্বেই নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের এবং ব্যাপক বাণিজ্যিক ও শিল্প-বিকাশের সূত্রপাত ঘটে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রথম পর্বটিতে চ্যালেঞ্জ আসে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে স্বীকৃত ধারণাটির বিরুদ্ধে। এই চ্যালেঞ্জের চূড়ান্ত অভিব্যক্তিটি হলো কোপার্নিকাস কর্তৃক অ্যারিস্টটলীয় ভূ-কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান। তার বদলে কোপার্নিকাস এক সৌর-কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা প্রচার করলেন : ঘুরন্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে এই মহাবিশ্বকেই আমরা দেখতে পাই; এবং আমাদের এই পৃথিবী অন্যান্য গ্রহের মতোই একটা গ্রহ।

দ্বিতীয় পর্বে, প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মোকাবিলা ক'রে কোপার্নিকাসের এই ধারণাকে সত্য বলে প্রমাণ করলেন কেপলার ও গ্যালিলিও। মানবদেহ-সংক্রান্ত প্রাচীন ধারণাতেও আঘাত হানলেন হার্ভে। নতুন নতুন পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগেই এইসব কীর্তি সম্ভব হয়েছিল। এই পর্বেই বিজ্ঞানে নবযুগের আগমনী শোনা যায় বেকন ও দেকার্ত্-এর কণ্ঠে।

তৃতীয় পর্বটি নবোদিত বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগ। বিজ্ঞান এই সময়ে অতি দ্রুত বিকাশ লাভ করে, ছড়িয়ে পড়ে নতুন নতুন ক্ষেত্রে। আদি বিজ্ঞানসভাগুলিও এই যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুগ ছিল বয়েল, হুক, হাইগেন্স-এর যুগ, গাণিতিক ও বলবৈজ্ঞানিক দর্শনের যুগ। এ যুগে অনেক মানুষের অনেক শ্রম, অনেক ভাবনা অবশেষে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে নিউটনের *Mathematical Principles of Natural Philosophy*-এর মধ্যে—যা বিজ্ঞানের পরবর্তী বিকাশের সুনিশ্চিত বনেদ বলে পরিগণিত হয়েছিল। অ্যারিস্টটল-কথিত 'পরম উদ্দেশ্যে'র তত্ত্ব আর খাটল না, তার বদলে এল বলবিজ্ঞান-সম্মত কারণের তত্ত্ব। মধ্যযুগের স্বীকৃত ক্রমোচ্চ-স্তরে-বিন্যস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা বাতিল হয়ে গেল। এল নতুন এক ধারণা। সে ধারণা অনুযায়ী, স্বয়ংস্বতন্ত্র কণাসমূহ যথেচ্ছভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায়, এবং এই ব্যাপারটিকে পরিচালিত করে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অদৃশ্য এক নিয়ন্ত্রণ। অপরদিকে, এইসব প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলে মানুষ প্রকৃতির শক্তিসমূহকে যে কাজে লাগাতে পারবে, এটাও বোঝা গেল। উচ্চমার্গের ধ্যাননিমগ্নতার জায়গা এবার নিল ফলপ্রদ সক্রিয়তা।

বৈজ্ঞানিক বিপ্লব

1. প্রথম পর্ব : রেনেসাঁস 1440-1540

রেনেসাঁস এবং রিফর্মেশন, এই দুটি আন্দোলনই সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রে রূপান্তরের প্রথম পর্বটির অন্তর্গত। যদিও, প্রাক্-পরিস্থিতি ও ফলাফল, উভয় দিক থেকেই এই দুটি আন্দোলন দীর্ঘতর কাল জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো শহরে টাকাপয়সার লেনদেন-ভিত্তিক বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদনের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াটি চালু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অর্থনীতির প্রধান রূপ হিসেবে এটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ইতালি থেকে শুরু করে দক্ষিণ জার্মানি (High Germany) এবং রাইন নদী সংলগ্ন এলাকা (the Rhineland) হয়ে 'লো কান্ট্রিজ়' (হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ) পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডেই প্রথম অর্থনীতির এই নতুন রূপটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর মধ্যে একমাত্র ইতালিতেই ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লরেন্স এবং মিলান-এর মতো বড়ো বড়ো শহর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন হয়ে ওঠে। রেনেসাঁস-যুগের অসামান্য নান্দনিক ও মননগত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এইসব শহরেই। ইতালিতে এজন্য চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার দরকার হয়নি, কারণ তামাম খ্রিস্টান দুনিয়ার দানে সুপুষ্ট ছিল রোমের পোপতন্ত্রের তহবিল। কিন্তু যখন এ আন্দোলন জার্মানিতে এবং অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ল, তখন ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে দাঁড়াল। ঐসব দেশে এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ একদিকে দেখা দিল জাতীয় ভিত্তিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার জোরালো স্বীকৃতি—যা রূপ লাভ করল লুথারীয় 'রিফর্মেশনে'; অন্যদিকে জেগে উঠল প্রবল সামাজিক সংঘাত—যা রূপ লাভ করল 1525-26-এর কৃষকযুদ্ধে এবং 1533-35-এ Münster-এর অ্যানাব্যাপ্‌টিস্ট বিদ্রোহে। হাঙ্গেরিতে, এমনকি ক্যাথলিক প্রভাবাধীন স্পেনেও, অনুরূপ বিদ্রোহ দেখা দিল। পরে রিফর্মেশন আন্দোলন আরো দূরে ছড়িয়ে পড়ে—যথা হল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ প্রভৃতি দেশে, এবং ব্রিটেনে ও ফ্রান্সে। এ আন্দোলন আরো চরমপন্থী ক্যাল্‌ভিনবাদী রূপ পরিগ্রহ ক'রে যাজকতান্ত্রিক চার্চ-শাসনের গোটা কাঠামোকেই অস্বীকার করে। ক্যাল্‌ভিনবাদ চাইল শুধু নাগরিক আইনগত (civil) ক্ষমতাই নয়, চার্চ-সংক্রান্ত ক্ষমতাও নির্বাচিত ব্যক্তিমণ্ডলীর গণতান্ত্রিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হোক।

গণতন্ত্রের প্রশ্নটা অবশ্য ঐ পর্বে যথেষ্ট জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়নি। ক্ষমতার এবং আনুগত্যের স্তরবিন্যস্ত সামন্ততান্ত্রিক রূপটির বদলে আলোচ্য পর্বে যে রাজনৈতিক রূপটি চালু হলো সেটি হচ্ছে : বণিকদের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল 'প্রিন্স'-দের শাসন। কখনো কখনো বণিকস্তর থেকেই উন্নতি লাভ করে শাসক পদ পেতেন এই 'প্রিন্স'রা। ফ্লরেন্সের শাসক মেদিচি যার নিদর্শন। রাজতন্ত্রের এই পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে সম্রাট এবং পোপের ঐহিক ক্ষমতা বলতে আর কিছু রইল না। সুতরাং মধ্যযুগীয় দুনিয়ার গোটা কাঠামোটাই ধসে পড়ল। তার বদলে গড়ে উঠতে লাগল জাতি-রাষ্ট্র। এদের মধ্যে অস্থায়ী সন্ধি আর যুদ্ধবিগ্রহ চলতেই লাগল। সব মিলিয়ে এমন একটা ঠুনকো শক্তিসাম্য রচিত হলো যেখানে কারোই কোনো অপ্রতিহত ক্ষমতা রইলনা।

এইসব 'প্রিন্স'দের সভাগুলো নব্য 'হিউম্যানিস্ট' এবং বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষণা করল। এখন আর এঁরা চার্চের মুখাপেক্ষী রইলেন না। বস্তুত, আরবদের আমলে বিদ্বান ব্যক্তিরা যেমন রাজার অলংকার বলে পরিগণিত হতেন, বুদ্ধিজীবীদের অবস্থাটা এখন প্রায় সেরকমই হয়ে দাঁড়াল। ইতালির বাইরে পুরোনো মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার ঘাঁটি রূপে বিরাজ করতে লাগল। এদের কাজ হয়ে দাঁড়াল নব্য জ্ঞানের বিরোধিতা করা। মানবিকী বিদ্যায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 1530 সালে ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস Collège Royal নামে এক

নতুন কলেজ খুলতে বাধ্য হন (যার আধুনিক নাম Collège de France); কারণ প্রাচীন সর্বন্ বিশ্ববিদ্যালয় ঐসব বিষয়ে পড়াতে নারাজ ছিল।

সামন্তযুগে মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি ছিল সুনির্দিষ্ট বংশ-পরিচয়। তার বদলে পণ্য-কেনাবেচা আর শ্রমের ভিত্তিতে এক নতুন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার যে আন্দোলন, রেনেসাঁস আর রিফর্মেশন তারই দুটি দিক। এই আন্দোলনের মূলে যে প্রধান অর্থনৈতিক ঘটনাটি ক্রিয়াশীল ছিল সেটি হলো : বাণিজ্যের অতিদ্রুত বিস্তার। এই বিস্তার সম্ভব হয়েছিল প্রাপ্য উদ্বৃত্ত বেড়ে ওঠার সুবাদে। মধ্যযুগের শেষ দিকেই করণকৌশলের নানারকম উন্নতি ঘটে, বিশেষত কৃষিতে এবং বস্ত্রনির্মাণে। আর তারই ফলে জমে ওঠে এই উদ্বৃত্ত। একই সঙ্গে, এই উদ্বৃত্তকে অত্যন্ত সহজলভ্য করে তোলে জাহাজ ও নৌচালনার উন্নতি। সমগ্র পনেরো শতক জুড়ে প্রধানত বিলাসদ্রব্য নিয়েই বাণিজ্য হতো। এই বাণিজ্যের মূল স্রোত পূর্বদিক থেকে এসে ভেনিসের মধ্যে দিয়ে জার্মানিতে প্রবাহিত হতো। জার্মানির আউগ্স্বার্গ এবং নুর্ন্বার্গ এই বাণিজ্যে লাল হয়ে যেত। অতঃপর ঐ স্রোত প্রবাহিত হতো হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ হয়ে ব্রিটেনে। বস্তুত এই বাণিজ্যের কল্যাণেই এইসব অঞ্চল সম্পদে ও সংস্কৃতিতে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

পঞ্চাদশ শতাব্দীর অন্তে, রেনেসাঁস আন্দোলন যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই বাণিজ্যের এই প্রচলিত ছাঁদটিতে এক চরম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, এবং সে-পরিবর্তনের পেছনে বিজ্ঞানের ভূমিকা ছিল অমোঘ। নৌ-চালনে যে উন্নতি ঘটে তার ফলে এই সময়ে পুরোনো, ব্যয়বহুল স্থলপথ-ভিত্তিক বাণিজ্য-সড়কগুলোর তুলনায় যাতায়াত অনেক দ্রুত ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, অতি অল্প খরচে এমন সব নতুন নতুন বাজারের রাস্তা খুলে যায় যা আগে কল্পনার অতীত ছিল। নৌ-চালনে এই উন্নতির সবচেয়ে চমকপ্রদ ফল অবশ্যই আমেরিকা-আবিষ্কার। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছিল, তা হলো : এশিয়া-মুখী সাগর-বাণিজ্যের ওপর পর্তুগীজদের আধিপত্য বিস্তার, এবং বাল্টিক ভূখণ্ডের ও রাশিয়ার অতি দ্রুত বিকাশ। বাণিজ্য-পথগুলি এইভাবে বদলে যাওয়ায় তামাম ইউরোপের অর্থনৈতিক ভারসাম্যটির চেহারাও বদলে যায়। ইতালি আর দক্ষিণ জার্মানির বাণিজ্যের একেবারে মূলে ঘা লাগে, ফলে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব কমে যায়। তবে তাদের সাংস্কৃতিক ও প্রকৌশলগত প্রভাব অবশ্য আরো কিছু দিন বজায় ছিল। এইসব দেশগুলির বদলে সাগর-বাণিজ্যপটু দেশগুলি এখন আধিপত্য বিস্তার করে। প্রথমে পর্তুগাল এবং স্পেন, পরে হল্যান্ড এবং ব্রিটেন আসর জাঁকিয়ে থাকে। শেষোক্ত দুটি দেশ মৌলিক সম্পদে অপেক্ষাকৃত ধনী হওয়ায় একটানা অনেকদিন ধরে আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

সাগরপারের বৈদেশিক বাণিজ্যের দৌলতেই প্রথম জঙ্গম পুঁজি (fluid capital) সঞ্চিত হতে থাকে। জঙ্গম পুঁজি বলতে সেই পুঁজির কথা বলা হচ্ছে যা কেবল স্থাবর জমিতে নয়, উৎপাদনশীল উদ্যোগে বিনিয়োজিত হয়। মুনাফা বাড়ানোর তাগিদে জাহাজ-নির্মাণে এবং নৌচালনে অতি সত্বর উন্নতি ঘটানো হয়। নৌচালনে এই যে উন্নতি ঘটে, আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভবের মূলে এর প্রভাব ছিল সমধিক। সামন্তপ্রভুদের কাছ থেকে কর-স্বরূপ সংগৃহীত সৈন্যবাহিনীর বদলে এখন মাইনে-করা পেশাদার সৈন্যদল পোষা হতে লাগল। ফলে অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যেমন সম্ভব হয়ে উঠল, তেমনি যুদ্ধের খরচও গেল বেড়ে। সুতরাং ব্রন্জ আর লোহার, রুপো আর সোনার চাহিদাও বেড়ে গেল। স্বভাবতই আকর-খনন আর ধাতু-কর্ম রমরম করে বেড়ে উঠল। একই সঙ্গে বারুদ-নির্মাণ আর কড়া আরক চোলাই-এর কাজও হৈ-হৈ করে এগিয়ে চলল।

সব মিলিয়ে এই পর্বটি ছিল অর্থনৈতিক প্রসারণের কাল। ইউরোপের সর্বত্র উৎপাদন বেড়ে চলে—কেবল শিল্প-উৎপাদন নয়, কৃষি-উৎপাদনও। আরো শস্য, আরো গবাদি পশু, আরো মাছ উৎপন্ন হতে থাকে। এর মূলে যে বিশেষ কোনো একটা প্রকৌশলগত উন্নতি কাজ করেছিল তা বলা যায় না। বরং এটা বলা যেতে পারে যে অসংখ্য স্বতন্ত্র উন্নতির সম্মিলিত পরিণতিতে ঐ অর্থনৈতিক প্রসারণ ঘটে। সেইসঙ্গে একথাও বলা দরকার যে নতুন নতুন বাণিজ্য-পথ চালু হয়ে যাওয়ায় এইসব উন্নত প্রক্রিয়াগুলো অতি দ্রুত বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। এই পর্বে প্রকৌশলগত অগ্রগতির দিক থেকে একটাই ঘটনা ঘটেছিল যাকে সম্পূর্ণ নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়—সেটি হলো মুদ্রণ-কৌশলের প্রবর্তন। অনুধাবনের সুবিধার্থে এ বিষয়ে বিগত অধ্যায়েই আলোচনা করে নিয়েছি। মুদ্রণকে ঠিক উৎপাদন-প্রক্রিয়া বলে চিহ্নিত করা যায়না ঠিকই, কিন্তু প্রকৌশলে যেসব অগ্রগতি তখন ঘটেছিল সেগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে মুদ্রণের ভূমিকাই ছিল সমধিক। কৃষি, উদ্যানপালন, রন্ধন এবং নানারকম পেশাকর্ম (trades) নিয়ে যেসব বই সেই আদিযুগে ছাপা হয়েছিল, তার সংখ্যাই একথার প্রমাণ।

মানবতাবাদী বিপ্লব

কিন্তু রেনেসাঁস যদি কেবল অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমিক বা ত্বরিত উন্নতি ঘটিয়েই ক্ষান্ত হতো, তাহলে বিশ্ব-ইতিহাসে তা এত বড়ো স্থান দখল করতে পারত না। বিজ্ঞানে, চারুশিল্পে এবং রাজনীতিতে রেনেসাঁস আন্দোলনের গুরুত্ব এইখানেই যে এ ছিল এক সচেতন আন্দোলন—শুধু সচেতন নয়, এক বৈপ্লবিক আন্দোলন। এর মননগত দিকটি রূপ লাভ করেছিল অল্প কয়েকজন সচেতন পণ্ডিত এবং কলাবিদের প্রয়াসে—যাঁরা ছিলেন সংখ্যালঘু। মধ্যযুগীয় জীবনধারার একেবারে বিপরীতে এঁরা নিজেদের স্থাপন করেছিলেন, প্রয়াসী হয়েছিলেন সম্পূর্ণ নতুন এক জীবনধারা গড়ে তুলতে। তাঁরা চেয়েছিলেন নতুন সেই জীবনধারা হবে যতদূর সম্ভব ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান জীবনধারার অনুসারী। প্রাচীনদের তাঁরা দীর্ঘবাহিত ঐতিহ্যের চশমা দিয়ে, অর্থাৎ আরবদের এবং মধ্যযুগীয় ধর্মতাত্ত্বিকদের ভাষ্য অনুযায়ী আর দেখতে রাজি হলেন না। পরের মুখে ঝাল না খেয়ে তাঁরা একেবারে সরাসরি প্রাচীনদের জানতে চাইলেন, মাটি খুঁড়ে তুলে আনলেন পুরোনো মূর্তি, স্বচক্ষে পাঠ করলেন মূল পুঁথিগুলি। ফলে তাঁদের গ্রীক ভাষা নিয়ে চর্চা করতে হলো, আর তাই করতে গিয়ে তাঁরা প্লেটো আর অ্যারিস্টটলের পাশাপাশি ডিমক্রিটাস আর আর্কিমিডিসের চিন্তাধারা সম্পর্কেও সরাসরি জ্ঞান লাভ করলেন।

চতুর্দশ শতাব্দীতেই 'হিউম্যানিস্ট' আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল ইতালিতে। পেত্রার্ক আর বোকাচ্চিও ছিলেন এর প্রবক্তা। ধ্রুপদী সাহিত্যের ন্যায়শাস্ত্রগত খুঁটিনাটির বদলে তার প্রকাশমাধুর্য, তার উচ্চ ভাব, এইসবই তাঁদের মুগ্ধ করেছিল। দর্শন নিয়ে যেটুকু তাঁরা মাথা ঘামিয়েছিলেন, সেই বিচারে তাঁদের বলা চলে প্লেটোপন্থী। মানবতাবাদী এই আন্দোলন পরে, ষোড়শ শতাব্দীতে, ফ্রান্সে এবং উত্তর ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ততদিনে অবশ্য তা অনেকটা ধর্মীয় ভাবনায় সিঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার অর্থই হয়ে দাঁড়ায় যাজকতন্ত্র সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট সামন্ততান্ত্রিক ধারণাগুলিকে প্রত্যাখ্যান ক'রে সমাজ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত ধর্মনিরপেক্ষ একটা মনোভাব গ্রহণ করা। তার মানে এ নয় যে এই আন্দোলন ধর্মকে, এমনকি অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদকে, প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু তার মানে এই যে এঁরা গুরুত্বের বদল ঘটালেন, চাইলেন অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিগত এক ধর্মের ওপর গুরুত্ব দিতে, যে-ধর্মে চার্চের খবরদারির প্রয়োজনটা কমবে। প্রাচীন রোমে পুরুষোচিত আত্মনির্ভরতাকেই মনে করা হতো ব্যক্তির মহিমা, তার সদগুণ;এগুলির চর্চাই এখন আবার আদর্শ হয়ে উঠল।

প্রোটেস্টান্ট দেশগুলিতে নিজস্ব বিচারের (private judgement) বা বিশেষ নির্বাচনের (special election) অধিকার প্রবর্তিত হয়। এইসব দেশে মানবতাবাদীরা আদি গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় রচিত শাস্ত্রকে পুনরুদ্ধার ক'রে সরাসরি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এর দ্বারা মূল বাইবেলের কর্তৃত্ব আরো বেড়ে গেল। সন্ত পিটারের শিষ্য-প্রশিষ্যদের দ্বারা প্রচারিত ভাষ্য অপেক্ষা ঈশ্বরের স্বকথিত আক্ষরিক বচনই এখন অধিকতর প্রামাণ্য হয়ে উঠল। যে বণিকশ্রেণী তখন সামন্ত আধিপত্যকে অস্বীকার করে মাথা চাড়া দিচ্ছিল, এই সবকিছুই ছিল তাদের নৈতিক মনোভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সামন্তযুগীয় অতীতকে এই শ্রেণী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল। এযুগের 'হিউম্যানিস্ট'রা সামন্তযুগীয় স্থাপত্যশৈলীকে (যাকে তাঁরা মুখ বেঁকিয়ে বলতেন 'গথিক'), মধ্যযুগীয় ধর্মশাস্ত্রীদের দর্শনকে, সন্ন্যাসীদের ধ্যানপ্রশান্ত জীবনযাত্রাকে, 'ফ্রায়ার'-যাজকদের ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রবলভাবে অস্বীকার করলেন। শেষ পর্যন্ত খোদ ক্যাথলিক চার্চের পক্ষেও সংস্কারকর্মে রাজি না হয়ে আর উপায় রইল না। মধ্যযুগীয় অতীতের সঙ্গে ক্যাথলিক চার্চের যে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটল তা সংস্কারপন্থীদের দাবির সঙ্গে অনেকটাই সংগতিপূর্ণ। ঈশ্বরভক্তির মধ্যে দিয়েই ঘটবে ত্রাণ—এই তত্ত্বের রোমক বিকল্প রূপে প্রচারিত হলো ঐশ্বরিক কৃপার (grace) তত্ত্ব। এক শতাব্দী ধরে রোমের পোপতন্ত্র যাঁদের দ্বারা পরিচালিত হলো, তাঁরা ছিলেন সহিষ্ণু মানবতাবাদী, তাঁদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষণায় তাঁদের আগ্রহ ছিল প্রশ্নাতীত। পরে কিন্তু এঁরা চরম কট্টর প্রোটেস্টান্ট গোষ্ঠীভুক্ত ধর্মধ্বজীদের মতোই গোঁড়া এবং ততোধিক অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন।

সুখভোগ, শিল্প, অর্থ

কী-ক্যাথলিক আর কী-প্রোটেস্টান্ট, উভয় দেশসমূহেই অতীতের সঙ্গে এক স্পষ্ট এবং সচেতন বিচ্ছেদ ঘটাল রেনেসাঁস। সে অতীতের অনেক কিছুই অবশ্য রয়ে গেল, কিন্তু সেসবও এক নতুন খাতে পরিচালিত হলো। অর্থনীতি, গৃহনির্মাণ, শিল্পকলা, চিন্তাভাবনা—এসবের মধ্যযুগীয় রূপগুলি চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তার বদলে আসে এক নতুন সংস্কৃতি—যার অর্থনীতি পুঁজিতান্ত্রিক, যার শিল্পকলা ও সাহিত্য প্রাচীন গ্রীক আদর্শে অণুপ্রাণিত, প্রকৃতির প্রতি যার দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞাননির্ভর।

ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান যুগের শেষের দিকে যে হতাশা ফুটে উঠেছিল; কিংবা তৎপরবর্তী ধর্মানুশাসনের যুগে সব কিছুকেই নিস্পৃহভাবে মেনে নেবার যে প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছিল; সে তুলনায় রেনেসাঁস ছিল এক বিক্ষুব্ধ কিন্তু আশা-উদ্দীপ্ত যুগ। এ যুগ ইহজীবন নিয়ে যতটা ব্যস্ত ছিল, পারলৌকিক জীবন নিয়ে ততটা নয়। তারই ফলে ইহজীবনমুখী শিল্প অতি দ্রুত বিকশিত হয়। চিত্রকলায়, কাব্যে, সংগীতে, প্রতিটি প্রকাশরূপেই শারীরিক সুখভোগের কথা অকুণ্ঠভাবে ব্যক্ত হয়। এ ঘটনাটা ছিল নতুন। এ যুগের মস্ত প্রবক্তা ছিলেন ড· ফ্রাঁসোআ রাবলে (প্রায় 1490-প্রায় 1553)। আদর্শ জনসম্প্রদায় বলে কথিত তাঁর তেলিমা (Thelema) মঠের মূলমন্ত্র ছিল : 'যা প্রাণ চায় তাই করো।' তবে আদর্শগত স্তরে মানুষ সে যুগে যতই বাধাবন্ধহীন জীবন যাপন করুক, যতই বিপজ্জনক চিন্তা করুক, কার্যত কিন্তু খুব কম লোকের পক্ষেই সেটা করা সম্ভব ছিল। কারণ এই নতুন ধরনের জীবনযাত্রার খরচ ছিল প্রচুর, এবং সে খরচ মেটাতে হতো হাতে-হাতে। যে কারণে টাকাপয়সা ব্যাপারটার গুরুত্ব অসম্ভবরকম বেড়ে গেল। আগে কখনো এমনটি দেখা যায়নি। ফলে টাকা রোজগার করা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে গেল। যে কোনো উপায়ই ছিল স্বাগত, যদি তা অর্থ-প্রসবিনী হয় : সৎ উপায়ে ম্যানুফ্যাকচার বা বাণিজ্য; নতুন কোনো সুবিধাজনক কৌশলের প্রবর্তন; খনি চালু করা; বিদেশীদের ওপর হামলা;

তেজারতি—কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই। চার্চ যদি আপত্তি তোলে, তুলুক। তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে শেষ পর্যন্ত চার্চেরই ক্ষতি। রিফর্মেশন আন্দোলনে তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল। অর্থপ্রতিপত্তি অর্জনের পন্থা হিসেবে এমনকি জাদুকৌশলও নতুন করে আগ্রহ জাগাল। ফাউস্ট্-এর কাহিনী তার নিদর্শন। সত্যি কথা বলতে, জাদুকৌশল আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে তখন ফারাক ছিল সামান্যই।

কারিগর আর বিদ্বানের রাখিবন্ধন

টাকা রোজগার আর টাকা খরচ, এই দুটো কাজের জন্যই প্রয়োগকুশলী ও শিল্পীদের প্রয়োজন সমধিক। আর সেই কারণেই ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান যুগ কিংবা মধ্যযুগের মতো এঁদের এখন আর হেয় করে দেখা হতো না। অলংকার নির্মাণ, সাজসজ্জা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্প এযুগে অতি দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠল। প্রাচীন যুগের মতো বিপুলায়তন হতো না এইসব শিল্পকর্ম, কিন্তু হতো অনেক বেশি নিজস্বতায় মণ্ডিত। তবে, যে ব্যাপারটা একেবারেই নতুন সেটা হলো : সুতো কাটা, কাপড় বোনা, মৃৎশিল্প, কাঁচের কাজ প্রভৃতি নেহাৎ 'কেজো' বিদ্যা এখন মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠল। আর স্বভাবতই, এই মর্যাদার তালিকায় সবার ওপরে ছিল খনি-কর্মী আর ধাতুকর্মীদের স্থান—কেননা বৈভব হোক, আর যুদ্ধই হোক, উভয় প্রয়োজনেই এঁদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। এই সব ক্ষেত্রে প্রকৌশলের উপযোগিতা প্রাচীন যুগের তুলনায় রেনেসাঁস যুগে অনেক বেড়ে গেল। কারণ প্রাচীন যুগে এইসব প্রকৌশল যাঁরা হাতেকলমে প্রয়োগ করতেন তাঁরা স্বাধীন মানুষ ছিলেননা—ছিলেন দাস। মধ্যযুগেও সমাজের শাসকদের কাছ থেকে এঁরা অনেক দূরে অবস্থান করতেন—সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই। যেমন ধরা যাক মধ্যযুগীয় ফ্লরেন্সের কথা। সেখানকার প্রধান বণিক-সংঘ *Medici e Speciali*-এর মূল সদস্য ছিলেন ডাক্তার ও মশলা-কারবারীরা। কলাবিদরা গৌণ সদস্য হিসেবে স্থান পেতেন। ভাস্করদের স্থান ছিল আরো নিচে—রাজমিস্ত্রীদের যে অপ্রধান সংঘটি ছিল, তাতে। ষোড়শ শতাব্দীর শুরু থেকেই কিন্তু চিত্রকর এবং ভাস্কররা অনেকেই পোপ এবং রাজার আনুকূল্য আদায় করে নিতে সক্ষম হন যদিও পাওনা টাকা আদায় গিয়ে প্রায়ই তাঁদের ঘাম ছুটে যেত।

কারিগরদের সামাজিক মর্যাদা এইভাবে বেড়ে যাওয়ায় সুবিধে হলো এই যে সভ্যতার প্রায় ঊষাকালেই কারিগরদের ঐতিহ্যবাহিত বিদ্যা আর বিদ্বানদের পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল তা আবার জোড়া লাগবার সম্ভাবনা দেখা দিল। উভয় তরফেই অবদানের সম্ভার ছিল বিপুল। সেই প্রাচীন যুগ থেকে বিকশিত হয়ে সমগ্র মধ্যযুগ ধরে কারিগরেরা যেসব নবনব কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন, তার ভাণ্ডারটি ছিল সমৃদ্ধ। অপরদিকে বিদ্বান মানুষের ভাণ্ডারে ছিল নানান ভাবধারা। বিদ্বানদের দিক থেকে সম্ভবত সবচেয়ে মূল্যবান অবদানটি ছিল আরবদের ও মধ্যযুগীয় ধর্মশাস্ত্রীদের মারফত আহরিত যুক্তিপ্রয়োগের ন্যায়সম্মত ধারা। এছাড়া ছিল নবোদ্ভূত গণনাপদ্ধতির সম্পদ। বিদ্যার এই দুটি খাতের সম্মিলন ঘটতে কিছুটা সময় লেগেছিল। গোড়াতে বেশ ধীরলয়েই জ্ঞান ও ক্রিয়াকৌশলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রসার ঘটল। কিন্তু ঐ দ্বিবিধ উপাদানের সম্মিলন একবার ঘটে যাওয়ার পর তা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য—একেবারে বিস্ফোরক। এই বলে বলীয়ান হয়ে মননগত দিক থেকে প্রকৃতি এবং প্রয়োগনৈপুণ্যের ক্ষেত্রটিকে নতুন করে আয়ত্ত ও আবিষ্কার করাটাই হয়ে দাঁড়ায় রেনেসাঁসের বিশেষ কাজ।

বিশ্ববীক্ষণ

রেনেসাঁস যুগে একের পর এক অসাধারণ বর্ণনাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়। মানব-অভিজ্ঞতার কোনো ক্ষেত্রই বাদ পড়েনি তাদের আওতা থেকে। বিশ্বপ্রসারী এই আগ্রহের পাল্লাটি যে কতদূর বিস্তৃত ছিল তা সে যুগের একজন মানুষের কর্মকৃতির মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। তাঁর নাম লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। একাধারে এনজিনিয়ার, বিজ্ঞানী ও শিল্পী, এই মানুষটি ছিলেন সে যুগের আত্মার মূর্ত রূপ। রেনেসাঁস যুগের দুটি মহত্তম জয়স্তম্ভ হলো: সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণাটির সুস্পষ্ট উপস্থাপনা এবং মানবশরীরের গঠন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক চিত্রের প্রথম উপস্থাপনা। প্রথম কাজটি করেন কোপার্নিকাস—তাঁর *De Revolutionibus Orbium Coelestium* গ্রন্থে। দ্বিতীয়টি করেন ভেসালিয়াস—তাঁর *De Humani Corporis Fabrica* গ্রন্থে। দুটি বইই প্রকাশিত হয় 1543 সালে। যুগপ্রাচীন কর্তৃত্বের দোহাই না পেড়ে স্পষ্ট চোখে 'বিনা-চশমাতে' দেখলে বিশ্বপৃথিবী এবং মানবশরীরের চেহারাটা কেমন দেখায় তা এই প্রথম প্রকট হলো। ধর্মের নাগপাশ থেকে খানিকটা মুক্ত নব্য সমাজ প্রথমে এই চিত্র স্বীকার করে নিল, কেননা ঐ সমাজ নিজেই তখন স্বচক্ষে দেখতে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে শিখছে। বিরোধিতা জাগল পরে, যখন সমাজের শাসকরা এই নতুন বিশ্ববীক্ষণের রাজনৈতিক পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। তখন তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে এই বিশ্ববীক্ষণের চারপাশে অন্ধকারের প্রাচীর তুলতে চাইলেন। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

এই অসাধারণ গ্রন্থ দুটির পাশাপাশি প্রকৃতি এবং প্রয়োগনৈপুণ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে আরো অনেক গ্রন্থ রচিত হলো। এইসব ক্ষেত্রগুলিকে প্রাচীন যুগে অবহেলা করা হয়েছিল। বিরিংগুচ্চিও-র (Biringuccio, 1480-1539) *Pirotechnica* গ্রন্থে ধাতুকর্ম, কাচ-তৈরি এবং রসায়নশিল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে গেঅর্ক বৌআ বা এগ্রিকলা (Georg Bauer or Agricola, 1490-1555)-বিরচিত *De Re Metallica* নামক গ্রন্থটি সম্ভবত প্রকৌশল-বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বোত্তম; কেননা এতে কেবল যে বিভিন্ন আকরিক ও ধাতুর বর্ণনাই দেওয়া হয় তা নয়, আকরখননের পদ্ধতি, এমনকি অর্থনীতিটিও আলোচিত হয়। এর পরে প্রকাশিত হয় গেস্‌নার (Gesner, 1516-65), রোঁদ্‌লে (Rondelet, 1507-66), বেলোঁ (Belon, 1517-64) প্রমুখের গ্রন্থরাজি। প্রাচীনদের পরিচিত দুনিয়া এবং নবাবিষ্কৃত আমেরিকার প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে চমৎকার সব বর্ণনা পাওয়া গেল এই গ্রন্থগুলিতে। এছাড়াও ছিল নতুন নতুন দেশে অভিযানের বিবরণ-সংবলিত অজস্র গ্রন্থ—আমেরিগো ভেস্‌পুচি-র *Letters* (1504) যার অন্যতম। প্রায় যেন খেলাচ্ছলেই ঐ নবাবিষ্কৃত মহাদেশটির নামকরণ হয় তাঁর নামে। জলপথে ম্যাজেলান্-এর বিশ্বভ্রমণের প্রথম বিবরণ প্রকাশ করেন পিগাফেত্তা (Pigafetta), 1519 থেকে 1522 সালের মধ্যে।

বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের এই আদিপর্বটি ছিল বর্ণনার ও সমালোচনার পর্ব। গঠনমূলক চিন্তাভাবনার পর্বটি আসে এর পরে। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ নব নব দিগন্তের অনুসন্ধান এবং প্রাচীন কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার স্পর্ধা ব্যতীত গঠনমূলক চিন্তাভাবনার উদ্ভব সম্ভব ছিল না। নানারকম প্রয়োগনৈপুণ্য এবং প্রকৌশল নিয়ে চর্চা করার ফলে নব্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য যে প্রণোদনা এবং যে বস্তুগত প্রকরণ প্রয়োজন তা মানুষের আয়ত্তে আসে। ধর্মীয় বাগবিতণ্ডা ও সংঘর্ষ গোঁড়ামির অচলায়তনের মূলে আঘাত হানে। কিছু লোক স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে প্রয়াসী হন। যে তাড়নার বশে বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে, সেই একই তাড়না সক্রিয় ছিল ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ এবং তাৎক্ষণিক দায়িত্ব-সচেতনতার নতুন এক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মূলে। এগুলি ছিল পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির বিজয়লাভের অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

রেনেসাঁস যুগের জীবনযাত্রায় বিজ্ঞানের স্থান এবং প্রভাব নিয়ে আলোচনার আগে ঐ পর্বের যে ব্যাপারগুলি সে-জীবনযাত্রাকে সবচেয়ে বেশি করে প্রভাবিত করেছিল, সেগুলি নিয়ে দু কথা বলা দরকার। মূলত শিল্পকলা এবং প্রকৌশলের ব্যাপারগুলিই এখানে আলোচ্য, বিশেষ করে এনজিনিয়ারিং এবং নৌচালনের প্রকৌশলগুলি।

2. শিল্পকলা, প্রকৃতি, চিকিৎসাবিদ্যা

রেনেসাঁস যুগের শিল্পকলা

নিষ্ক্রিয় এবং নিরাসক্ত ধ্যানপ্রশান্তির বদলে দৃশ্য এবং কর্মিষ্ঠ শিল্পের বন্দনাই ছিল রেনেসাঁসের প্রথম বৈশিষ্ট্য। একথা অবশ্যই সত্য যে গোটা মধ্যযুগ ধরেই চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং সংগীত বিকাশ লাভ করেছিল। শুধু তাই নয়, ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান সভ্যতা থেকে আহরিত নানারকম প্রকৌশল এসবেরই মাধ্যমে সঞ্চালিত হতে পেরেছিল—বিশেষ করে রসায়ন ও ধাতুকর্মের নানারকম প্রকৌশল। সবই ঠিক; কিন্তু এসবই ছিল বিশেষ এক উদ্দেশ্যসাধনের পন্থা মাত্র। প্রধানত চার্চের সেবায় এবং গৌণত মধ্যযুগের 'নাইট'দের সেবায় নিয়োজিত দীনহীন কারিগরেরা বা সন্ন্যাসীরা এইসব কাজ করতেন।

কিন্তু রেনেসাঁস যুগে শিল্পকলা যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব লাভ করল, তার চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। শিল্পকলার পেছনে, বিশেষ করে চিত্রকলার পেছনে, আগের তুলনায় ঢের বেশি টাকা তো ঢালা হতে লাগলই; তার চেয়েও বড়ো কথা এই যে শিল্পকলাকে শিল্পকলা রূপেই মর্যাদা দেওয়া হতে লাগল। বণিক 'প্রিন্স'রা যেখানেই ফুলেফেঁপে উঠতেন, সেখানেই কলাবিদরা এসে ভিড় করতেন। প্রথমে ইতালিতে, তারপর বার্গাণ্ডিতে, তারপর ফ্ল্যান্ডার্স ও দক্ষিণ জার্মানিতে। ধনবানদের নতুন ধরনের জীবনযাত্রাকে আরো মনোমুগ্ধকর, আরো চমকপ্রদরূপে চিত্রিত করার চাহিদার কোনো শেষ ছিল না। এর ফলে শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা বেড়ে গেল। ইতালির বেশির ভাগ শহরেই তাঁদের স্টুডিও গড়ে উঠল। কার্যত এই স্টুডিওগুলি ছিল একাধারে বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরীক্ষাগার। পুরোনো ঐতিহ্যের আত্মীয়তা না কাটিয়েও শিল্পকলা হয়ে উঠল সচেতন এবং বিজ্ঞানসম্মত। শিল্পীরা নতুন নতুন সমস্যার মোকাবিলায় নতুন নতুন বস্তুগত এবং মননগত সমাধান বার করলেন। বস্তুত, ইতিহাসের আর কোনো পর্বে দৃশ্যশিল্প বিজ্ঞানের বিকাশে এত বড়ো ভূমিকা পালন করেনি। তাই, বিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের পর্বের একেবারেই শুরুতেই যে শিল্পকলার প্রতি এই আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, সে ব্যাপারটা মোটেই আকস্মিক নয়।

পরিপ্রেক্ষিত ও চাক্ষুষ দর্শন

বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করার কাজে শিল্পীরা প্রধানত যেসব দিক থেকে সাহায্য করেছিলেন সেগুলি হলো: চাক্ষুষ দর্শন (vision) এবং *পরিপ্রেক্ষিত* (perspective) রচনার বিকাশ ঘটিয়ে; প্রকৃতি সম্পর্কে, বিশেষত মানুষের শারীরস্থান (anatomy) সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে এবং বেসামরিক ও সামরিক এনজিনিয়ারিঙে এসব কিছুরই প্রয়োগ ঘটিয়ে। উল্লিখিত প্রত্যেকটি কাজেই লিওনার্দো দা ভিঞ্চির অবদান ছিল। নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতিভা ছিল মহত্তম শ্রেণীর; কিন্তু এসব কাজ কেবল তিনি একাই করেছিলেন এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

1434 সালে প্রকাশিত লেওনে বাতীস্তা আল্‌বার্তি-র (Leone Battista Alberti, 1404-72) *Trattato della Pittura*-ই হলো রেনেসাঁস যুগের শিল্পের প্রথম ইশতেহার। রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত ফ্লরেন্সের এক ধনী পরিবারের সন্তান আলবার্তি শ্রমজীবী মানুষের

কাছ থেকে শিক্ষা নিতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না . 'সকলের নিকট হইতেই তিনি শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। কর্মকার, রাজমিস্ত্রী, জাহাজ-সারাইওয়ালা, এমনকি চর্মকারগণকেও কেবলই প্রশ্ন করিতেন তিনি, যদি তাহাদের কাছ থেকে নূতন বা গোপন কোনো কৌশল শিখিয়া লওয়া যায়, এই আশায়। অন্যদের কর্মের উৎকর্ষ কোথায় নিহিত তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য অনেক সময় স্বয়ং আনাড়ি সাজিতেন।' পনেরো শতকের গোড়াতে ব্রুনেলেস্কি (Brunelleschi, 1377-1446) পরিপ্রেক্ষিত রচনার যে কৌশল আবিষ্কার করেন তার আদি প্রবক্তাদের মধ্যে আল্‌বার্তি ছিলেন অন্যতম। তাঁর মতে চিত্রাঙ্কনের প্রধান লক্ষ্য হলো ত্রি-মাত্রিক রূপকে দ্বি-মাত্রিক রূপে প্রকাশ করা। কাজেই তিনি বললেন, প্রতিটি শিল্পীকে ভালো করে জ্যামিতি জানতে হবে। তিনি ভূ-দৃশ্য আঁকার জন্য *camera obscura* (চাক্ষুষ দর্শনের পাল্লা স্থানাঙ্কিত করার জন্য আয়তাকার স্থানাঙ্ক-জালিকা) প্রভৃতি শিল্প-সহায়িকা ব্যবহার করতেন। মাজাচ্চিও (Masaccio, 1401-1428?), পিয়েরো দেলা ফ্রান্‌চেস্কা (Piero della Francesca, প্রায় 1420-1492) এবং মান্তেনিয়া (Mantegna, 1431-1506) প্রমুখ শিল্পীর হাতে এই কর্মসূচী বাস্তব রূপ ধারণ করে। তারই ফলে ত্রিমাত্রিক পরিসর সম্পর্কে মৌলিক মাপজোকের ধারণাটি ঐ যুগে এক অতি সাধারণ, প্রায় যেন সহজাত ধারণায় পরিণত হয়েছিল।

বস্তুত চিত্রকলাকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সে যুগের একটি প্রচলিত ধারণাকেই ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর *Paragone*-এর সঙ্গেই প্রকাশিত চিত্রকলা বিষয়ক গ্রন্থটিতে তিনি সুস্পষ্টভাবে লেখেন: ' বস্তুর উপরিতলের যাবতীয় রং এবং উপরিতলের দ্বারা পরিবেষ্টিত বস্তুর আকার; বস্তুসমূহের আপেক্ষিক সন্নিকটত্ব ও দূরত্ব; দূরত্ব ক্রমে ক্রমে বাড়িলে বস্তুর আকৃতি কী মাত্রায় ছোটো দেখাইতে থাকে,— এইসকলই চিত্রাঙ্কন-বিজ্ঞানের অধীন। তদুপরি এই বিজ্ঞানই হইতেছে পরিপ্রেক্ষিতের—অর্থাৎ দৃশ্যমান রশ্মিবিজ্ঞানের—জননী।'

যাঁরা এই চিত্রকলাকে আধা-যান্ত্রিক বলে নিন্দা করতেন তাঁদের উত্তরে প্লেটোর সরাসরি বিরোধিতা করে লিওনার্দো বলছেন: 'জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিজ্ঞানও প্রথমে রূপ লাভ করে মনের মধ্যে, তবু তাহাদের চর্চার জন্য যন্ত্র বা হস্ত-চালিত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। চিত্রকলা সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। ভাবুকের মনের মধ্যেই প্রথমে তাহার উদয় হয়, কিন্তু যন্ত্র বা হস্ত-চালিত প্রক্রিয়ার সহায়তা ব্যতীত তাহাকে বাস্তবে রূপ দান করা যায় না। চিত্রাঙ্কনের বৈজ্ঞানিক এবং অকৃত্রিম মূল সূত্রগুলি কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মুখাপেক্ষী নহে। এই সূত্রগুলিই চিত্রাঙ্কন-বিজ্ঞানকে গঠন করিয়াছে, যে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব থাকে ভাবুকের মনের মধ্যে। মনের ভিতরকার সেই বিজ্ঞানই সৃষ্ট শিল্পকর্মটির জননী। এবং রূপায়িত সেই সৃষ্টিকর্মটি তাহার পূর্বসূরী ভাবনাটির অপেক্ষা বা ঐ বিজ্ঞান অপেক্ষা বহুগুণে ঋদ্ধ।'

প্রকৃতি ও মানুষ

রেনেসাঁস যুগের শিল্প *বাস্তবতাবাদের* জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিল। ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান শিল্প, বিশেষত বাইজ্যান্‌টাইন শিল্প ভাবরূপকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, তাতে ঐতিহ্যবাহিত প্রতীক ব্যবহার করে মনের মধ্যে আলোড়ন জাগানো হতো। মধ্যযুগেই অবশ্য প্রকৃতি থেকে আহরিত নানাবিধ রূপ ছবির মধ্যে স্থান পাচ্ছিল। যেমন, ছবির ধারে ধারে গাছপালা, জীবজন্তুর দেখা মিলছিল। রেনেসাঁস যুগের শিল্পে এই বাস্তবতাই ছবির একেবারে কেন্দ্রভূমিতে স্থান করে নিল। এর জন্য প্রয়োজন হলো মুক্ত প্রকৃতির পাহাড়পর্বত, শিলাপাথর, গাছপালা, ফুল, জীবজন্তু, পাখি ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ। এর মাধ্যমে ভূবিদ্যা ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের এক বনেদ তৈরি হয়ে গেল। আগেকার মতো তা আর আপ্তগ্রন্থ আর ন্যায়শাস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল রইল না। তবে সবচেয়ে বেশি করে যা প্রয়োজন হয়ে পড়ল তা হলো মানুষের

নিজের শারীরসংস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান। ঐ জ্ঞান ছাড়া মানুষের অঙ্গভঙ্গি এবং প্রকাশভঙ্গির অন্তর্লীন প্রক্রিয়াটিকে বোঝা দুষ্কর। রেনেসাঁস যুগের শিল্প ছিল মূলত আকারনির্ভর (formal)—রূপাভাস-নির্ভর (impressionistic) নয়। শিল্পীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে আল্‌বার্তি বলেছিলেন, তাঁরা যেন সবার আগে অস্থি, তারপর যে-মাংস সেই অস্থিকে বেঁধে রেখেছে তাকে এবং সবশেষে দেহের আচরণকে গুরুত্ব দেন। নিজের কর্মে এবং আদর্শ-ঘোষণায় লিওনার্দো আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। স্থাণু রূপ ছেড়ে তিনি চলমান রূপের ছবি আঁকতে লাগলেন, চর্চা করতে লাগলেন শারীরবৃত্ত ও গতিবিজ্ঞান নিয়ে। চলন্ত মানুষ বা প্রাণীর চিত্রাঙ্কন তাঁর কাছে ছিল একটা উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা। যে-সত্তা বা আত্মা ঐ চলনকে প্রাণিত করে রেখেছে তাকেই তিনি প্রকাশ করতে চাইতেন চিত্রের মাধ্যমে। এর জন্য প্রয়োজন হলো মস্তিষ্ক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের গঠন নিয়ে নিবিড় অনুসন্ধান। এইসব অঙ্গের যে ছবি লিওনার্দো এঁকেছিলেন তার উৎকর্ষ আজও তুলনারহিত। বস্তুত নবোদ্ভূত এই শারীর স্থানবিদ্যাই পরে হার্ভের রক্ত-সংবহনের আবিষ্কারকে সম্ভব করে তোলে। এর কৃতিত্ব ডাক্তারদের যতটা, শিল্পীদেরও প্রায় ততটাই।

রেনেসাঁস যুগের চিকিৎসাবিদ্যা

চিকিৎসাবিদ্যাকে কেন্দ্র করে জীববিজ্ঞানের যে চর্চা দানা বেঁধেছিল, তার মূলে রেনেসাঁসের অসামান্য অবদান সম্পর্কে আলোচনা এখানেই করে নেওয়া ভালো। ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক বন্ধ্যদশা ও অন্ধত্বের পরিবেশে একটা আশ্চর্যবকমের ব্যতিক্রম ছিল সেখানকার চিকিৎসাবিদ্যার বিভাগগুলি। বিশেষ করে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিভাগটি ছিল অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী। সে যুগের সবচেয়ে প্রবুদ্ধ মস্তিষ্কগুলি সে বিভাগে সক্রিয় ছিল। তার দরুন ডাক্তারির যে খুব লক্ষণীয় কিছু উন্নতি ঘটেছিল তা নয়। সেটা তখন সম্ভবও ছিল না। কারণ রসায়ন ও জীববিজ্ঞান সম্পর্কে ন্যূনতম যেটুকু জ্ঞান সঞ্চিত হলে তবে তা রোগ সারানোর লড়াইতে বিজ্ঞানকে সাহায্য করতে পারে, সে জ্ঞান সঞ্চিত হতে তখনো কয়েক শতাব্দী বাকি। কিন্তু, চিকিৎসাবিদ্যা চর্চার মস্ত সুফল ফলেছিল প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞানের বিকাশে।

ইতালির ডাক্তাররা, এবং বিদেশ থেকে আগত বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতেন না। শিল্পী, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও এনজিনিয়ারদের সঙ্গে তাঁরা ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করতেন। এমনকি এই শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ ঐসব পেশাতে যোগও দিতেন; যেমন, কোপার্নিকাস ডাক্তার হিসেবে শিক্ষা নিয়েছিলেন, ডাক্তারি করতেনও। এছাড়াও তিনি ছিলেন প্রশাসনবিদ এবং অর্থনীতিবিদ। এই ধরনের মেলামেশার ফলেই ইউরোপীয়, বিশেষ করে ইতালীয় চিকিৎসাবিদ্যায় একটা সুনির্দিষ্ট বর্ণনাত্মক, শারীরস্থান-নির্ভর এবং যন্ত্র-নির্ভর ঝোঁক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে, অনুসন্ধান করে, মাপজোক করে তার ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হতো। মানবদেহকে ব্যাখ্যা করা হতো অতীব জটিল এক যন্ত্র রূপে। এসব ব্যাখ্যা ছিল অতিসরলীকৃত। শরীরের অঙ্গগুলি দীর্ঘ বিবর্তনের পথে কীভাবে তৈরি হয়ে উঠেছে, বা সেগুলো কী কাজ করে, এসব সম্পর্কে আজকের দিনে আমরা যা জানি তার অধিকাংশই তখন জানা বা আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না। তবু, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ভিত্তিতে নব্য *শারীরস্থানবিদ্যা* (anatomy) *শারীরতত্ত্ব* (physiology) এবং *বিকারতত্ত্ব* (pathology) গড়ে উঠল। এসব তত্ত্বের মৌলিক চরিত্রটি ছিল আধুনিক। এইভাবে সনাতনী শাস্ত্রের কর্তৃত্ব এবং জাদুবিশ্বাস-নির্ভর ঐতিহ্যের ফাঁস আলগা হতে লাগল। প্রসঙ্গত, 'physiology' এবং

'pathology' এই দুটি পারিভাষিক শব্দের জন্য আমরা বিখ্যাত ফরাসি ডাক্তার জঁ ফের্নেল্-এর (Jean Fernel, 1497-1558) কাছে ঋণী।

এই ধারার সারাৎসার রূপে প্রকাশিত হলো আন্দ্রিয়াজ ভেসালিয়াস্-এর *De Humani Corporis Fabrica.* মানবদেহের যাবতীয় অঙ্গের সম্পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া গেল এই বইতে। অথচ গ্যালেন-প্রবর্তিত সনাতনী চিত্রটির বিরুদ্ধে এই বইতে বিশেষ কোনো সমালোচনা ছিল না। বলা যায়, অতি উচ্চাঙ্গের শারীরস্থানবিদ্যা অতি নিম্নস্তরের শারীরতত্ত্বের অধীন হয়ে রইল। সে যাই হোক, 1537 সালে ভেসালিয়াস পাদুয়াতে শারীরস্থানবিদ্যার যে ঘরানা স্থাপন করেছিলেন, তারই পরম্পরাক্রমে অবশেষে হার্ভের উদ্ভব হয়েছিল। ভেসালিয়াস সম্রাট পঞ্চম চার্লসের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। পঞ্চম চার্লসের ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রথম ফ্রান্সিসের শল্যবিদ হিসেবে যিনি নিযুক্ত ছিলেন, সেই আঁব্রোআজ পারে (Ambroise Paré, 1510-90) আবার নানা দিক থেকেই ছিলেন ভেসালিয়াসের বিপরীত। পারে ছিলেন ওস্তাদ কারিগর। পুঁথিগত বিদ্যার প্রসাদবঞ্চিত এই মানুষটি স্বচক্ষে যা দেখতেন এবং স্বহস্তে যা করতেন তারই বিবরণ লিখতেন চলতি ফরাসি ভাষায়। ক্ষতচিকিৎসায়, বিশেষত তখনকার যুদ্ধবিগ্রহে গোলাগুলির মারাত্মক আঘাতজনিত ক্ষতের চিকিৎসায় তিনি যুগান্তর আনেন।

এনজিনিয়ার-কুল : লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

রেনেসাঁসের যুগে শিল্পী, স্থপতি আর এনজিনিয়ারের পেশাগুলি বিচ্ছিন্ন ছিল না। তখন শিল্পীকে ডেকে পৌরকর্তৃপক্ষ বা সেই শহরের 'প্রিন্স' মূর্তি নির্মাণের বা ক্যাথিড্রাল তৈরির বা জলাজমির জলনিকাশী ব্যবস্থা করার বা অন্য কোনো শহরকে অবরোধ করার পন্থা বাতলাবার ভার দিতেন। কখনো বা শিল্পী স্বয়ং সেই কাজের জন্য এগিয়ে আসতেন। নানান উপদানের ধর্ম কী এবং কীভাবে সেগুলোকে নিয়ে কাজ করতে হয় সে বিষয়ের জ্ঞান থাকা একজন ওস্তাদ কারিগরের পক্ষে আবশ্যিক ছিল। রেনেসাঁস যুগের শিল্পীকে এসব তো জানতেই হতো; উপরন্তু সুপ্রাচীন কালের সচেতন অনুকরণ ক'রে তাঁকে তাঁর সৃষ্টিকর্মে জ্যামিতি এবং বলবিজ্ঞানের জ্ঞানের পরিচয় রাখতে হতো। শিল্পী এবং প্রকৃতিবিদ-সার্বভৌম লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো নৈপুণ্যের প্রমাণ দিয়েছিলেন। মিলানের ডিউকের কাছে আত্ম-সুপারিশ করে তিনি তাঁর উদ্ভাবিত বেশ কয়েকটি সামরিক যন্ত্রকৌশলের কথা জানান, এবং সবশেষে খুব সংক্ষেপে লেখেন, 'আর পাঁচজনেরই মতো আমি ছবি আঁকাতেও পারদর্শী।' তাঁর নোটবইগুলো ঘাঁটলে দেখা যায় কত খুঁটিয়ে তিনি ধাতু-কর্মী এবং এনজিনিয়ারদের কাজকর্ম অনুধাবন করতেন। বোঝা যায়, এইজন্যই তিনি *বলবিজ্ঞান* (mechanics) এবং *জলবিজ্ঞানের* (hydraulics) প্রথম ধুরন্ধররূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর সবচেয়ে দুঃসাহসী প্রয়াস—যার ব্যর্থতা ছিল অবধারিত—হলো যন্ত্রবলের সাহায্যে উড়ে চলার প্রচেষ্টা। এনজিনিয়ারিঙে গবেষণার এ এক অতুলনীয় নিদর্শন। পাখিদের পর্যবেক্ষণ, মডেল নির্মাণ, গণনা এবং পুরো-মাত্রায় পরীক্ষণ—এই সবকিছুর সম্মিলন ঘটেছিল এ গবেষণায়।

লিওনার্দো অজস্র যন্ত্রকৌশলের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং ছবি এঁকেছিলেন। রোলিং মিল থেকে শুরু করে খাল-কাটার মেশিন পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়েনি। কিন্তু এইগুলি থেকেই তাঁর প্রতিভার অসহায় বিয়োগান্ত দিকটি পরিস্ফুট হয়ে *ওঠে*। প্রায় যে কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই তিনি যন্ত্র উদ্ভাবনে সক্ষম ছিলেন, সেগুলোর ছবিও আঁকতেন অনুপম কুশলতায়; কিন্তু সেগুলো সত্যি সত্যিই বানাবার মতো যথেষ্ট টাকাও যদি তিনি কখনো সংগ্রহ করতে পারতেন, তবু তার প্রায় কোনোটাই কার্যক্ষেত্রে সফল হতোনা—যেগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো

তো কোনোমতেই না। স্থিতিবিজ্ঞান (statics) এবং গতিবিজ্ঞান সম্পর্কে কোনোরকম পরিমাণাত্মক জ্ঞান বিনা, বাষ্পীয় এনজিনের মতো কোনো চালিকা-শক্তির সাহায্য বিনা রেনেসাঁস যুগের কোনো এনজিনিয়ারের পক্ষে কার্যক্ষেত্রে চিরাচরিত প্রথার সীমাবদ্ধতার আগল ভাঙা সম্ভবই ছিল না। তাই লিওনার্দো যন্ত্রের বিকাশকে যতটা না প্রভাবিত করেছিলেন তার থেকে বেশি করে সে যুগের বিদ্বজ্জনকে এ ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছিলেন যে প্রকৃতির ক্রিয়াকর্মকে যন্ত্রপাতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জীবন ও কর্মের মধ্যে দিয়ে রেনেসাঁস যুগের সম্ভাবনা ও ব্যর্থতার রূপটি ধরা পড়ে। চিত্রকর হিসেবে তালিম নিয়ে যৌবনকালেই তিনি ইতালীয় শিল্পকলার সবচেয়ে উজ্জ্বল যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মদত পেয়েছিলেন। কিন্তু কেবল ছবি এঁকে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। তিনি চাইলেন তাঁর ছবির বিষয়বস্তুর অন্তর্লীন গূঢ় চরিত্রটি বুঝতে; যে-আলোর মাধ্যমে তিনি বস্তুকে দর্শন করছেন সেই আলোর চরিত্রটি জানতে। যে কারণে তিনি যুগপৎ আলোকবিদ্যা, শারীরস্থানবিদ্যা, প্রাণীকুল, গাছপালা এবং শিলাপাথর নিয়ে চর্চায় মেতে ওঠেন। একই সঙ্গে আবার, চলন এবং বল—এই দুটি ব্যাপারের গুরুত্ব তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। তাঁর ভাবনাচিন্তাকে কার্যক্ষেত্রে রূপ দেবার মানসেই তিনি সে যুগের সবচেয়ে জবরদস্ত 'প্রিন্স', মিলান শহরের লুদোভিকো ইল মোরোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু যুদ্ধের কালো ছায়ায় আনাগোনায় লিওনার্দো সেখানে প্রায় কিছুই করতে পারলেন না। 1499 সালে মিলানের পতনের পর লিওনার্দো এক অস্থির জীবন যাপন করতে বাধ্য হলেন। কিছুকাল তিনি চেজারে বর্জিয়া-র (Cesare Borgia) যুদ্ধাভিযানের সঙ্গী হলেন। তারপর কিছুদিন ফ্লরেন্স শহরের, কিছুদিন পোপের অধীনে কাজ করলেন। অবশেষে নির্বাসিত হয়ে ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের ভাতাভোগী রূপে তাঁর মৃত্যু হয়।

সদাসর্বদাই তিনি প্রকৃতি ও সমাজের অন্তর্লীন গূঢ় অর্থটি অনুধাবন করবার কাজে নিয়োজিত থেকেছেন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষার অভাবটি এক্ষেত্রে শাপে বর হয়েছিল, কারণ অবান্তর শিক্ষার বোঝা ঝেড়ে ফেলবার কাজে বেশি সময় তাঁকে দিতে হয়নি। কিন্তু ঐ একই কারণে আবার, সুশৃঙ্খল দৃষ্টিভঙ্গির এবং উপযুক্ত গাণিতিক দক্ষতার অভাব ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। যার ফলে তিনি ভাবনাচিন্তাগুলিকে নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলতে বা অন্যদের কাছে সেগুলির অভ্রান্ততা প্রমাণ করতে পারেন নি। তিনি কোনো ঘরানা রেখে যেতে পারেননি। প্রেরণা হয়ে থেকেছেন, পথপ্রদর্শক হতে পারেননি।

রেনেসাঁস যুগের করণকৌশল

আকর-খনন, ধাতুবিদ্যা এবং রসায়ন—এই তিনটি পরস্পর-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রেই রেনেসাঁস যুগের করণকৌশলের প্রধানতম অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ধাতুর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় অতিদ্রুত একের পর এক আকর খনন করা হতে থাকে—প্রথমে মধ্য জার্মানিতে, তারপর আমেরিকাতে। জার্মানির এই খনিগুলো ছিল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের লালনক্ষেত্র। গোটা মধ্যযুগ ধরে আকরখননের কাজ প্রধানত একক প্রয়াসে বা অল্প কয়েকজন অংশিদারের প্রয়াসে পরিচালিত হয়ে আসছিল। যাঁরা এগুলো চালাতেন তাঁরা ছিলেন 'স্বাধীন খনক', নিজেদের আকর-অনুসন্ধানের কাজ তাঁরা নিজেরাই চালাতেন। এঁরা কর দিতেন 'প্রিন্স'দের, এবং 'প্রিন্স'রা এঁদের ছোটোখাটো সামন্ত হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতেন। কিন্তু এখন অনেক বড়ো আকারে আকর-খনন চালু হওয়ায় এইসব ছোটো ছোটো খনকরা *কম্প্যানি* গঠন করে সম্মিলিত হলেন। তাঁদের লভ্যাংশকে তাঁরা *শেয়ারে* পরিণত করলেন। সেই পনেরো শতকেই নিষ্ক্রিয় অংশিদারেরা শেয়ার কিনে এইসব উদ্যোগে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ক্রমবর্ধমান খরচ যোগাতে শুরু

করেছিলেন। খনিগর্ভ যত গভীর হতে লাগল, ততই পাম্প করার এবং আকরিক তুলে আনবার সরঞ্জামের প্রয়োজন বাড়ল। *De Re Metallica* গ্রন্থের রচয়িতা এগ্রিকলা আনুষ্ঠানিক পরিচয়ে স্যাক্সনির ব্লেইবার্গের ('সীসেপাহাড়') খনির একজন ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু তিনি সেযুগের কয়েকটি অতীব লাভজনক খনির শেয়ারমালিকও ছিলেন। এইক্ষেত্রে পাওয়ার সঞ্চালন ও পাম্পিঙের ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হলো তারই ফলে যান্ত্রিক এবং জলবৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ নিয়ে আগ্রহ নতুন করে জেগে উঠল। বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এবং শিল্পবিপ্লব উভয় ক্ষেত্রেই এর প্রভাব বহুভাবে পড়েছিল। ধর্ম নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পরিণামে জার্মানিতে আকর-খননে ভাঁটা পড়ে। তখন জার্মান খনক এবং ধাতুবিদরা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়লেন—স্পেনে, আমেরিকায়, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, ইংলন্ডে। শেষোক্ত দেশটির ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির প্রযুক্তিগত বনেদটি এঁরাই গড়ে দেন।

ধাতুবিদ্যা এবং রসায়ন

রসায়নের সত্যিকারের লালনক্ষেত্র ছিল ধাতু-বিগলন প্রক্রিয়া। ব্যাপক হারে আকর-খনন হতে থাকায় নতুন নতুন আকরিকের আবিষ্কার হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। শুধু নতুন আকরিক নয়, *দস্তা, বিস্মাথ* (স্বর্ণধাতু), *কোবাল্ট*'(Kobold কথাটির অর্থ খনির ভূত), Kupfer-*nickel* ('ঝুটা তামা') প্রভৃতি নতুন নতুন ধাতুও আবিষ্কৃত হলো। এগুলোকে আলাদা করে সংগ্রহ করার বা এগুলোকে নিয়ে কাজ করার বিভিন্ন পদ্ধতি পূর্বতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে, অনেক খেসারত দিয়ে রপ্ত করতে হয়েছিল। এই করতে গিয়ে জারণ ও বিজারণ, পাতন ও পারদ-সংকরায়ন (amalgamation) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে রসায়নের একটা সর্বজনীন তত্ত্ব দাঁড়িয়ে গেল। প্রথমে অবশ্য সে তত্ত্ব অপ্রকট রূপেই রয়ে গিয়েছিল। যাচাইকরণের (assaying) অর্থ হলো নির্দিষ্ট পরিমাণ আকর-পিছু কতটুকু মূল্যবান ধাতু পাওয়া যাবে তা হিসেব করা। অল্প কিন্তু সুনির্দিষ্ট মাত্রায় বিগলন ঘটানো ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। এটাই হয়ে দাঁড়ায় রসায়নিক *পরীক্ষণ* এবং রসায়নিক *বিশ্লেষণের* ভিত্তি।

এতসব নতুন নতুন ধাতব যৌগের সংস্পর্শে আসায় বেশ কিছু অবাঞ্ছিত এবং অল্প কিছু মঙ্গলজনক শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া যে দেখা দেবে এটাই স্বাভাবিক। যেমন, খনি এলাকায় মেয়েরা গায়ের রঙের জেল্লা বাড়াবার জন্য আর্সেনিক ব্যবহার করত। শরীরের ওপর এইসব ধাতুযৌগের তীব্র ক্রিয়া লক্ষ্য করে এগুলোকে ওষুধের মধ্যে মেশানো হতে লাগল। তাছাড়া মধ্যযুগীয় জড়িবুটি ও টোটকার ওপর নির্ভরতা কাটানোর জন্যও একাজ করা হলো। এক্ষেত্রে পারদের ব্যবহারটি চরম গুরুত্বপূর্ণ। কলম্বাসের নাবিকরা সিফিলিস নামে যে নতুন এবং ভয়ানক রোগটি সংগ্রহ করে এনেছিলেন, প্রাচীন জড়িবুটি তার কাছে হার মেনে গিয়েছিল। সেই রোগ সারাবার কাজেই পারদ ব্যবহার করা হলো।

প্যারাসেল্‌সস ও তাঁর সূক্ষ্মসত্তার তত্ত্ব

ফিলিপ'স্ অরিওল'স্ থিওফ্রাস্টুস বম্বাস্টুস ফন হোহেন্‌হাইম (1493-1541) নিজেকে প্যারাসেল্‌সস আখ্যা দিয়েছিলেন। অতিপ্রাচীন কালের বৈদ্য-চূড়ামণি সেল্‌সস-এর তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।উৎসাহে ভরপুর এই বদমেজাজী মানুষটি ছিলেন 'রসায়নিক ডাক্তারির' (iatro-chemists) নতুন এক ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা। Basle শহরের হাটের মাঝখানে তিনি প্রকাশ্যে গ্যালেন ও আভিসেন্নার বই পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। খাঁটি প্রোটেস্টান্ট মেজাজে তিনি যেকোনো রকম কর্তৃত্বের খবরদারির চেয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। আরবদের এবং রেমণ্ড লাল-এর মাধ্যমে পরিজ্ঞাত আলকেমির প্রাচীন

ঐতিহ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে আহরণ করেছিলেন প্যারাসেল্‌সস। কিন্তু তিনি সেগুলির রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন; সেগুলির মধ্যে নতুন এক দিশার সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। প্রাচীন যুগে *গন্ধক* আর *পারদ*—এই দুটিকে পরস্পর-বিপরীত উপাদান বলে গণ্য করা হতো। প্যারাসেল্‌সস এই দুটি উপাদানের সঙ্গে *লবণ*—এই তৃতীয় ও নিরপেক্ষ(neutral) উপাদানটির সন্নিবেশ ঘটালেন। অ্যারিস্টটল-কথিত 'চতুর্ভূত' (অগ্নি, বায়ু, জল ও মাটি) মতবাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াল প্যারাসেল্‌সস-প্রবর্তিত এই *ত্রিমৌল* (tria prima) উপাদানের মতবাদ। এরই ভিত্তিতে তিনি রসায়ন-চর্চার গতিপথ ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হলেন। ইতিপূর্বে রসায়ন নিকৃষ্ট পদার্থ থেকে সোনা তৈরির সাধনায় নিয়োজিত ছিল; এখন তার অন্বিষ্ট হয়ে দাঁড়াল সুস্বাস্থ্য।

প্যারাসেল্‌সস খুব স্পষ্টভাবেই জড়বস্তুর প্রাণাত্মক চরিত্রে বিশ্বাস করতেন। আসলে, যাবতীয় স্ব-চর বা জীবন-সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার পেছনেই কোনো না কোনো অদৃশ্য শক্তি যে ক্রিয়াশীল, এই মতবাদ বহু বহু পুরোনো। সম্ভবত পুরাপ্রস্তরযুগে এই ভাবনার উদ্ভব। জন্মমাত্রেই জীব নিঃশ্বাসবায়ু লাভ করে এবং মৃত্যুকালে তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়—এই ব্যাপারটির সঙ্গেই ঐ ভাবনা সংযুক্ত। Animal, afflatus, aspiration, ghost, inspiration, psyche, spirit, soul—প্রভৃতি বহু ইংরেজি শব্দের মূলে ঐ ভাবনারই নানা শাখা-প্রশাখা লক্ষণীয়। খোদ বায়ুই যে একধরনের আত্মা বা সূক্ষ্মসত্তা এবং তা যে বস্তুর মধ্যে সক্রিয়, তার প্রমাণ রূপে বুদবুদ ওঠার ও সন্ধানপ্রক্রিয়াকে (fermentation) গণ্য করা হতো। রসায়নের অতি-গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া পাতনকে ব্যাখ্যা করা হতো ফুটন্ত তরল থেকে নির্গত অদৃশ্য সব আত্মাকে বন্দী করার এক প্রণালী রূপে। আর এইসব সূক্ষ্মসত্তার শক্তি যে প্রচুর, তার প্রমাণ তো তাদের পান করলেই হাতেনাতে পাওয়া যেত!

গ্যালেনীয় শারীরতত্ত্ব অনুযায়ী, শরীরের প্রক্রিয়াগুলো নির্দিষ্ট কয়েকটি সূক্ষ্মসত্তা বা আত্মা দ্বারা পরিচালিত। যেমন, যকৃতে অধিষ্ঠিত উদ্ভিজ্জ বা প্রাকৃতিক সূক্ষ্মসত্তাটি খাদ্যের পাচনকে নিয়ন্ত্রণ করে। হৃৎপিণ্ডে প্রাণবায়ুর সংস্পর্শে এসে প্রাণসত্তায় (vital spirit) রূপান্তরিত হয়ে তা ধমনী বেয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রাণসত্তাটি আবার মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে পরিশোধিত হয়ে চলৎ-সত্তায় (animal spirit) রূপান্তরিত হয়, এবং স্নায়ুর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে শরীরকে চলনশীল করে। গ্যালেনকে প্রত্যাখ্যান করলে কী হবে, প্যারাসেল্‌সস এই সূক্ষ্মসত্তার ধারণাটিকে আরো উদারভাবে বরণ করে নিলেন। তিনি ধরে নিলেন যে পাকস্থলী, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের একেকটি অধিষ্ঠাতা সূক্ষ্মসত্তা আছে। এদের তিনি বললেন *archei;* খনিতে যেমন নানারকম ভূতের আনাগোনা, এরাও তেমনি। মজার ব্যাপার এই যে, যে-সময়ে প্যারাসেল্‌সস এই ভূতুড়ে তত্ত্বের আমদানি করলেন, ঠিক সেই সময়েই জ্যোতিষ্কমণ্ডলী থেকে নিয়ন্তা দেবদূতেরা নির্বাসিত হচ্ছিলেন! তবে, রসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহ স্বভাবতই এত জটিল যে এই অনুমান-নির্ভর, অতিকল্পনাদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিই তখন রসায়নের অগ্রগতিতে সার্থক ভূমিকা পালন করেছিল। বরং যুক্তিশাসিত, যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই তখন সে তুলনায় কম সাফল্য লাভ করেছিল। পরে আঠেরো শতকে যখন রসায়নের বিপ্লব ঘটবে, তখন অবশ্য ঘটনাটা উল্টে যাবে। সেইজন্যেই আধুনিক রসায়নের আদি প্রতিষ্ঠাতা রূপে প্যারাসেল্‌সসের স্থান অক্ষয় হয়ে আছে। এবং তাঁর সেই *archei*-রাই আজ বিপুল বংশবৃদ্ধি করে আধুনিক প্রাণরসায়নের আঙিনা আলো করে আছে—তবে এখন তাদের নাম দেওয়া হয়েছে উৎসেচক (enzyme)।

রেনেসাঁস যুগের রসায়নবিদরা কেবল ধাতু-আকরিক নিয়েই মাথা ঘামাতেন এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। অনেকেই, যেমন বার্নার্ড পালিসি (Palissy, 1510-প্রায় 1590)

মৃৎপাত্রের জেল্লা বাড়ানোর জন্য নানারকম মাটি নিয়ে গবেষণা করতেন। সে সময় ইউরোপের মৃৎশিল্পীরা পারসিক মৃৎশিল্পীদের অসামান্য মৃৎকৌশলকে সবে আয়ত্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। চৈনিক মৃৎশিল্পের বা চীনেমাটির কাজ নকল করতে তখন ঢের বাকি। তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ফটকিরি নিয়ে গবেষণা। ফটকিরি বস্ত্র এবং চর্মশিল্পের এক অপরিহার্য উপাদান। ফটকিরির খনি হাতে থাকায় পোপতন্ত্রের কাঁচা টাকার অভাব হতো না। তাঁরাই প্রথম 1462 সালে রসায়নিক বাণিজ্যসংঘ গঠন করেন, নাম দেন Societas Aluminium. পোপতান্ত্রিক ফটকিরির দাম ছিল চড়া। তাঁরা নরকাগ্নির ভয় দেখিয়ে একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। উত্তরের বস্ত্রশিল্পীরা যে রিফর্মেশন আন্দোলনকে মদত দিয়েছিল, এটা তার অন্যতম কারণ। সেন্ট পিটারের গির্জা বানানোর খরচ তোলবার জন্য পোপেরা অর্থের বিনিময়ে পাপের সাজা থেকে অব্যাহতি বিতরণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন (এরই পরিণামে লুথার রোমের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন)। কিন্তু কিছু কিছু পাপের সাজা থেকে কোনোমতেই অব্যাহতি দেওয়া হতো না : পোপতন্ত্রের প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ফটকিরি কেনা ছিল অমনই এক ভয়ানক পাপ!

ঐযুগের আরেকটি বড়ো রসায়নিক ঘটনা হলো পাতন বা সুরাকরণের উন্নতি। এই প্রক্রিয়া এত প্রসার ও উন্নতি লাভ করে যে একেবারে আঠেরো শতকের আগে তার আর বড়োসড়ো পরিবর্তন ঘটেনি। ইউরোপে সে সময় কড়া মদ খুব খাওয়া হতো। কিন্তু আরেকটা বড়ো ব্যাপার এই যে ভুলিয়েভালিয়ে অজ্ঞ অসভ্যদের কাছ থেকে জমির, এমনকি তাদের দেহের অধিকার বাগিয়ে নেবার কাজে মদের কার্যকারিতা ছিল বারুদের ঠিক পরেই। রেনেসাঁস যুগের শেষ নাগাদ রসায়নিক লেবরেটরি একটা নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে নিয়েছিল। চুল্লি, বকযন্ত্র, পাতনযন্ত্র আর দাঁড়িপাল্লা সংবলিত সেই রূপটি থেকেই, তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ছাড়াই, আজকের রসায়নিক লেবরেটরির উদ্ভব হয়েছে।

3. নৌচালন ও জ্যোতির্বিজ্ঞান

সাগরপাড়ি এবং নতুন দেশের আবিষ্কার

আকরখনন আর ধাতুবিদ্যার উন্নতির মূলে বিজ্ঞানের অবদান ছিল সামান্য। বরং বিজ্ঞানই সে উন্নতি থেকে লাভবান হয়েছিল। কিন্তু যেসব মস্ত মস্ত সাগরাভিযানের দৌলতে গোটা দুনিয়া ইউরোপীয় পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগের আওতায় চলে আসে, সেগুলোর মূলে বিজ্ঞানের অবদান ছিল সমধিক। গৌরব এবং মুনাফা অর্জনের কাজে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোলবিদ্যার সচেতন নিয়োগ সেই প্রথম ঘটল। ইতালি এবং জার্মানির শহরগুলো তখন বাণিজ্যজগতে অগ্রগণ্য। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ভেনিস, জেনোয়া, এমনকি ফ্লরেন্স ও নুর্নবার্গের মতো স্থলবেষ্টিত শহরও এ ব্যাপারে তত্ত্বগত দিক থেকে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কো পোলো, রুব্রিকুই (Rubriquis) প্রমুখ পুরোনো অভিযাত্রীদের হাতে এবং সমসাময়িক অভিযাত্রীদের সমুদ্র অভিযানের ফলস্বরূপ প্রাচীন গ্রীক ভূগোলবিদ্যা তখন নবজীবন লাভ করেছিল, তা হয়ে উঠেছিল সাম্প্রতিক তথ্যে সমৃদ্ধ ও ব্যাপকতর। তারই পাশাপাশি ইতালীয় ও জার্মানরা নৌচালনে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োগকে উন্নততর করে তুললেন। তাঁরা চাইলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান-নির্ভর এমন সব সারণী বানানো হোক যা হবে অভ্রান্ত এবং সরল—যাতে তা নাবিকদের ব্যবহারের উপযোগী হয়; তাঁরা চাইলেন এমন মানচিত্র যাতে সমগ্র যাত্রাপথটি স্থানাঙ্কিত করা যাবে।

পর্তুগীজ ও স্পেনীয় নাবিকরা মূলত এব কেজো দিকটি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। একদিকে ক্রুসেড-যুগের শেষ পর্যায়ের প্রয়াস, অন্যদিকে আখ-বাগিচা, ক্রীতদাস আর সোনার প্রতি ব্যবহারিক শ্যেণদৃষ্টি—এই দুইয়ের সম্মিলন ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে। তত্ত্ব ও প্রয়োগের মিলন ঘটেছিল সাগ্রেস্-এ (Sagres) সাগরাভিযাত্রী প্রিন্স হেনরির রাজসভায়। সেখানে মুরিশ, ইহুদি, জার্মান ও ইতালীয় বিশেষজ্ঞরা অ্যাটলান্টিক পাড়ি-দেওয়া দুঁদে কাপ্তেনদের সঙ্গে নতুন নতুন অভিযান সম্পর্কে আলোচনা কবতেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা আলফনসোর নির্দেশে জ্যোতিষ্কের অবস্থান-নির্দেশক যে সারণী তৈরি হয়েছিল, এবার তাতে বিবাট পরিবর্তন ঘটানো হলো। একাজটি করেন পয়েরবাখ (Peuerbach, 1423-61) ও তাঁর ছাত্র রেজিওমন্তানুস (1436-76)। রেজিওমন্তানুস কাজ করতেন নুর্নবার্গে। সেখানে পরে তাঁকে সাহায্য করেন আলব্রেখ্শ্ট ড়ুয়েরার (Albrecht Dürer)। একাজে তাঁরা পুরোনো টলেমীয় পদ্ধতিই ব্যবহার কবলেও, গণনাকার্যকে লেভি বেন গার্সঁ (1288-1344) ত্রিকোণমিতির প্রয়োগে সরল করে তোলেন। অর্থাৎ গোটা মধ্যযুগ ধরে যে গণিত-পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন আরবী গণিত-পদ্ধতির আশ্রয়ে। এইসব তালিকা ও পদ্ধতি তৎক্ষণাৎ সাগর-অভিযাত্রীদের কাজে লাগল। পনেরো শতকেব শেষে প্রাচ্য বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ছিল তুর্কিদেব। কাজেই লোহিত সাগরকে এড়িয়ে অন্য কোনো সমুদ্রপথ বেয়ে ভারত মহাসাগরে পৌঁছনোব জন্য অনেকেই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তাত্ত্বিকরা দুটি সম্ভাব্য বিকল্প-পথের কথা বললেন। যে পথটার কথা প্রথমেই মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল সেটা হলো: আফ্রিকা ঘুরে ভারত মহাসাগরে পৌঁছনো। এ কাজটা অবশ্য ধাপে ধাপে করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। পর্তুগীজরা এই পথটাই বেছে নিলেন। 1488 সালে তাঁরা এ কাজে সফল হন, যদিও 1497 সালের আগে ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষে পৌঁছতে পাবেননি। ভারতবর্ষে যে পৌঁছনো যাবেই সে ব্যাপারে আগে থেকে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ ঐ ভূখণ্ড যে কতদূর বিস্তৃত, এমনকি একেবারে মেরু অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত কিনা, সে খবব কেউ রাখত না। তবে, জনশ্রুতি ছিল যে কার্থেজীয়রা নাকি একদা সে দেশে পৌঁছেছিল, আর পথে নানারকম লোভনীয় প্রাপ্তিযোগেব সম্ভাবনাও ছিল।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস: আমেরিকা

ফ্লরেন্সের তাত্ত্বিক ভূগোলবিদ তস্কানেলি (1397-1482) আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীবা দ্বিতীয় যে-বিকল্প জলপথটির কথা বললেন, সেটি হলো: এ যাবৎ যে মহাসাগর কেউ পাড়ি দেয়নি, সেই মহাসাগর বেয়ে পশ্চিমমুখে পাড়ি দিয়ে গোলাকার এই পৃথিবীর অপরদিকে চীন দেশে গিয়ে পৌঁছনো। তবে এই সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা এক জিনিস, আর সত্যি সত্যিই সাগর পাড়ি দেওয়া আরেক জিনিস। তখনকার প্রচলিত ধাবণা অনুযায়ী, ঐ অভিযাত্রীদের ভাগ্যে নানারকম ঘটনা ঘটতে পারত: যেমন, তাঁরা হয়তো অনন্তকাল ধরে ভাসতেই থাকবেন; হয়তো পৃথিবীর কিনার টপকে পড়ে যাবেন! যে ব্যাপারটা কেউই ভাবতে পারেননি সেটা এই যে হয়তো মাঝপথে সম্পূর্ণ অজানা এক মহাদেশ থাকতে পারে। যে মানুষটি এই অভিযানে রাজি হলেন, তাঁকে নৌচালকদের শিরোমণি এবং অভিযাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যদিও তিনি নিজে এর জন্য কেবল ঝামেলাই পুইয়েছিলেন। বস্তুত, কলম্বাস নিজে বিজ্ঞান প্রায় কিছুই জানতেন না, কী তিনি করতে যাচ্ছেন সে ব্যাপারে কোনো পরিষ্কার ধারণাও তাঁর ছিল না। তাঁর ছিল রহস্যময় এক প্রেরণা। তিনি অনুভব করতেন যে ঐ মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তিনি নতুন নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করবেন, এমনকি গিয়ে পৌঁছবেন চীনে। তিনি মনে করতেন তিনি যিশুখ্রিস্টের এক 'দৈববৃত বার্তাবহ'— 'Christophoros';

'নূতন স্বর্গ, নূতন পৃথিবী'-র দৈব উন্মোচন ঘটানোর বিধিনির্দিষ্ট ভার বর্তেছে তাঁরই ওপর। আধা-ধর্মীয়, আধা-বৈজ্ঞানিক এই পরাদৃষ্টিই তাঁকে শক্তি যুগিয়েছিল। কপর্দকহীন এই মানুষটি তারই বলে বলীয়ান হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা আদায় করতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারটা আগে কল্পনাই করা যেত না; এবং উত্তাল, দুঃসাহসী সেই পঞ্চদশ শতাব্দীতেও কাজটা রীতিমতো দুরূহ ছিল। দশটি বছর ধরে কলম্বাস তাঁর ভাবনা নিয়ে একে একে পর্তুগাল, স্পেন, ইংলন্ড ও ফ্রান্সের দরবারে দরবারে ঘুরেছেন। একের পর এক বিশেষজ্ঞদল তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। অবশেষে খানিকটা বাঁকা পথে তিনি একটি 100 টনের জাহাজ ও দুটি সহযোগী নৌকা নিয়ে যাত্রা করার অনুমতি পান। চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে 'মহাসাগরের অ্যাডমিরাল' খেতাব, এবং নতুন দেশ সত্যিই আবিষ্কার করতে পারলে মোটা টাকা রয়্যালটির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। আফ্রিকা ঘুরে পর্তুগীজরা একের পর এক যেসব অভিযান চালায় আর একেবারে সোজা অ্যাটলান্টিকের বুক চিরে কলম্বাস যে অভিযান চালান, এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ আছে। প্রথমটির মধ্যে চিরাচরিত প্রকৌশলকে ধীরে সুস্থে উন্নত করার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে যুক্তিসহকারে ঐতিহ্যের পথ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন এক পথ অনুসরণ করার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ একটা কথা তো ঠিক, যতই কলম্বাস তাঁর অন্তরের প্রেরণার কথা বলুন, তাঁর অভিযানকে যে-মদত যোগানো হয়েছিল তার মূলে ছিল সম্পূর্ণ ব্যবহারিক একটা হিসেব: অনুমিত এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রকল্পের (hypothesis) সত্যতা প্রমাণিত হলে তার থেকে কতটুকু লাভ হবে।

কলম্বাস নিজে বুঝতে পারেননি যে তিনি একটা নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ঐ মহাদেশটির নামকরণ হয় লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বিদ্বান বন্ধু ফ্লরেন্স-নিবাসী আমেরিগো ভেস্‌পুচির নামে। নিজ আবিষ্কারগুলির সম্বন্ধে লেখালিখির কাজে ভেস্‌পুচি ছিলেন অধিকতর দক্ষ। তবে যে তত্ত্বপ্রকল্পটি প্রমাণ করার জন্য কলম্বাসের ঐ অভিযান, অবশেষে তার সততা প্রমাণ করেন জন্মসূত্রে পর্তুগীজ, কিন্তু স্পেনের হয়ে কর্মরত ম্যাজেলান। তিনি দেখিয়ে দিলেন, কীভাবে পৃথিবীকে জলপথে চক্কর দেওয়া যায়। ম্যাজেলান নিজে অবশ্য তাঁর জল-সফর শেষ করতে পারেননি, কারণ ফিলিপিন্‌সে তিনি নিহত হন। জলপথে দুনিয়া চক্কর দিয়ে যে মানুষটি প্রথম ঘরে ফিরে আসে সে হলো তাঁর মালয়-দেশীয় ক্রীতদাস।

অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক ফলাফল

এইসব বিপুল নৌ-অভিযানগুলির অর্থনৈতিক ফলাফল ছিল যুগপৎ তাৎক্ষণিক এবং স্থায়ী। এতদিন প্রধানত স্থলপথে এবং অংশত জলপথে বাণিজ্য ক'রে আরবরা এবং তুর্কীরা ফুলেফেঁপে উঠেছিল। কিন্তু এখন সোজাসুজি সমুদ্রপথে বাণিজ্য চালু হওয়ায় পর্তুগীজরা বিপুলভাবে লাভবান হলো। আর সর্বনাশ হয়ে গেল ভেনিসীয়দের। পরে আফ্রিকা থেকে ছিনিয়ে আনা দাসেদের শ্রমে আমেরিকা মহাদেশের খনি এবং আখ ও তামাক-বাগিচাগুলি উৎপাদনশীল হয়ে উঠল। ফলে স্পেন এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর অপেক্ষাকৃত মোটা ও স্থায়ী আয়ের পথ খুলে গেল। তবে স্পেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটির পশ্চাদপদতার দরুন এই বৈভব সে দেশের মধ্যে রইল না। কারণ খনি এবং বাণিজ্যের পরিচালনভার সবই ছিল বিদেশীদের হাতে। স্পেনের বৈভব হল্যান্ড ও ব্রিটেনের শিল্পোদ্যোগের পুঁজি হিসেবে খাটতে লাগল।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এইসব বড়ো বড়ো নৌ-অভিযানের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফল ফলে। প্রথম দিককার অভিযানগুলি সফল হওয়ায় জাহাজ-নির্মাণের এবং নৌ-চালনবিদ্যার চাহিদা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। জন্ম হয় নতুন এক বুদ্ধিমান, গণিত-পটু কারিগর শ্রেণীর। এঁরা কম্পাস,

মানচিত্র এবং নানারকম যন্ত্রপাতি বানাতে লাগলেন। এইভাবে এক বিজ্ঞানমনস্ক জনমন্ডলীর উদ্ভব হতে থাকে। সামাজিক শ্রেণী-নির্বিশেষে বুদ্ধিমান তরুণরা এরই মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হতে এবং জীবিকা অর্জন করতে থাকে। পর্তুগাল, স্পেন, ইংলন্ড, হল্যান্ড এবং ফ্রান্সে নৌ-শিক্ষালয় স্থাপিত হয়। আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের চলন এখন ভিন্ন অর্থে 'মূল্যবান' হয়ে উঠল। জ্যোতিষচর্চার রেওয়াজ কমে এলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চায় ভাঁটা পড়ার আর কোনো সম্ভাবনা রইল না।

একদিকে এশিয়ার প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সভ্যতা, অন্যদিকে আমেরিকার নতুন দুনিয়া— একই সঙ্গে এই দুটি আবিষ্কার ঘটল। এইসব দেশের বিচিত্র অজানা সব প্রথা এবং জিনিসপত্র দেখার পর ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান দুনিয়াকে যেন মফস্বল বলে মনে হলো। ইউরোপের মানুষ সাহসভরে ভাবল, আমরা এমনই নতুন এক সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি যা প্রাচীন যুগের ধনুর্ধররা কল্পনাও করতে পারতেন না। নতুন এই ক্ষেত্রের পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনার প্রয়োজনে বিশ্লেষণের নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হলো। বস্তুত, এই নৌ-অভিযানগুলি পৃথিবীর নতুন নতুন দিগন্ত যেমন খুলে দিল, তেমনি মননক্ষেত্রেরও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রবর্তকরা এক নবযুগ সৃষ্টির আশা করতেন এবং সেই কাজেই নিয়োজিত ছিলেন। ষোলো শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁরা অনুভব করলেন যে সে কাজে তাঁরা প্রকৃতই সফল হয়েছেন। ফ্রান্সের রাজার চিকিৎসক, মানবতাবাদী জঁ ফের্নেল, যিনি আধুনিক যুগে প্রথম অক্ষাংশের ডিগ্রি মাপেন, তাঁর 1530 সালে প্রকাশিত *Dialogue* গ্রন্থে এ যুগের এই নতুন মানসিকতাটি ব্যক্ত করেন। চিকিৎসাক্ষেত্রের নব-প্রবর্তিত পদ্ধতিগুলিকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বলেন: 'আমাদের পূর্বপুরুষরা, এবং তাঁদেরও পূর্বপুরুষরা যদি একই বাঁধা পথ অনুসরণ করে গিয়ে থাকেন, তাতে কী এসে যায়?... বরং, দার্শনিকদের উচিত নতুন পন্থা, নতুন প্রণালীর অনুসরণ করা। নিন্দুকদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে, সনাতনী সংস্কৃতির বোঝা ঝেড়ে ফেলে, কর্তৃত্বের ভারকে অগ্রাহ্য ক'রে তাঁদের নিজ নিজ মত ঘোষণা করতে হবে। এইভাবেই যুগে যুগে নতুন নতুন লেখকের, নতুন নতুন রূপকারের আবির্ভাব হয়েছে। দীর্ঘ বারোটি শতাব্দীর জড়িমার অবসান ঘটিয়ে আমাদের এই যুগে শিল্প ও বিজ্ঞান নবজীবন লাভ করেছে। এ যুগের শিল্প ও বিজ্ঞানের বৈভব সুপ্রাচীন যুগের থেকে কোনো অংশে ন্যূন তো নয়ই, বরং শ্রেষ্ঠতর। কোনো দিক থেকেই সুপ্রাচীন যুগের জ্ঞানগরিমার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই নিজেদের হীন ভাবার।... আজকের যুগে আমরা যে সব কাজ করছি তা প্রাচীন যুগে স্বপ্নেরও অতীত ছিল।... আমাদের নাবিকরা মহাবিক্রমে মহাসমুদ্র অতিক্রম করেছেন, আবিষ্কার করেছেন নব নব দ্বীপ। সুদূর ভারতবর্ষের সন্ধান আজ আমাদের অধিগত। পশ্চিমের তথাকথিত নব্য দুনিয়ার সন্ধান প্রায় পুরোপুরিই পেয়ে গেছি আমরা। প্রাচীন কালে এই দুনিয়া ছিল অজ্ঞাত। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই, এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং অন্যান্য প্রাচীন দার্শনিকরা যথেষ্টই ব্যুৎপন্ন ছিলেন; টলেমিও মহত্তর অবদান রেখেছিলেন। তবু, এঁদের যে কোনো একজন যদি আজকে ফিরে আসেন, তাহলে দেখতে পাবেন, ভূগোলের খোল-নলচে বদলে গেছে। এ যুগের নাবিকরা আমাদের একটি নতুন ভূ-গোলক উপহার দিয়েছেন।'

কোপার্নিকাসের বিপ্লব

ভূগোলের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকেই সমগ্র প্রাচীন চিন্তাপ্রণালীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো ধাক্কাটা এল। স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল ভাষায় কোপার্নিকাস দেখিয়ে দিলেন যে পৃথিবী নিজ অক্ষকে ঘিরে স্থির সূর্যের চারপাশে পাক খাচ্ছে। সে যুগে বর্ণনাত্মক জ্যোতির্বিজ্ঞানই ছিল একমাত্র বিজ্ঞান যাতে পর্যবেক্ষণজাত প্রচুর তথ্য সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, এবং সে বিজ্ঞানের গণিতীয় পদ্ধতিগুলিও

যথেষ্ট উন্নত ছিল। ফলে তত্ত্বপ্রকল্পগুলিকে (hypotheses) স্পষ্টভাবে বলা এবং আঙ্কিক গণনার মাধ্যমে যাচাই করে নেওয়া সম্ভব ছিল। তাছাড়া, পুরোনো জ্যোতিষশাস্ত্র এবং আধুনিক নৌচালন-বিদ্যা— উভয় দিক থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চায় নতুন করে আগ্রহ জেগেছিল। কিন্তু একটা আমূল নতুন অগ্রগতি ঘটার জন্য কেবল এটুকুই যথেষ্ট ছিল না। পয়েরবাখ বা রেজিওমন্তানুস্-এর মতো পেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পুরোনো পদ্ধতিসমূহের ছোটোখাটো উন্নতি সাধন করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তবু, তাঁদেরই কল্যাণে, এবং রেনেসাঁস যুগের মানসিকতার প্রসাদে, এই নতুন জ্যোতির্বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটল। কারণ তাঁরা মূল গ্রীক শাস্ত্র নিয়ে চর্চা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। পয়েরবাখ বাইজ্যান্‌টিয়ামের 'হিউম্যানিস্ট' কার্ডিনাল বেসারিয়নের কাছে কাজ করতেন। পোপ তাঁকে পঞ্জিকা সংস্কারের জন্য নিয়োগ করেছিলেন।

কোপার্নিকাস এসে কিন্তু একটা নতুন মাত্রা যোগ করলেন; সেটা হচ্ছে সমালোচনাত্মক মনোভাব। প্রাচীন গ্রীক শাস্ত্রের যেসব নব-সম্পাদিত গ্রন্থ তখন প্রকাশিত হচ্ছিল তার নান্দনিক রূপ এবং তার প্রেরণা তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। এইসব প্রাচীন গ্রন্থ-রচয়িতারা সকলেই ছিলেন স্বনামধন্য। তাই একজনের কর্তৃত্বের পাল্টা হিসেবে অন্যজনকে তুলে ধরা তখন সম্ভব ছিল। আমরা আগেই বলেছি, ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর ভাবনাটি মোটেই নতুন নয়। গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চার একেবারে আদিযুগেই এই ধারণা ব্যক্ত হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতেই অ্যারিস্টার্কাস প্রাঞ্জলভাবে এই কথা লিখে গিয়েছিলেন। একটা বিকল্প-ধারণা রূপে এটি বরাবরই বিদ্যমান ছিল। যদিও ধারণাটা মেনে নেওয়া শক্ত মনে হতো। কারণ, পৃথিবী যে ঘুরছে না, আর সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রেরা যে ঘুরছে, এটা তো স্পষ্টই দেখা যেত। দৈনন্দিন কাণ্ডজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত এই ধারণাটাকে উল্টে দেবার জন্য মনোবল আর বিজ্ঞান দুটোরই প্রয়োজন ছিল। শেষ পর্যন্ত একাজটি যিনি করলেন, সেই স্বভাব-লাজুক মানুষটির মনোবল ছিল অসামান্য। অতীতের সঙ্গে এই চির-বিচ্ছেদ ঘটাবার প্রণোদনা তিনি লাভ করেছিলেন রেনেসাঁস যুগের এক 'মানবতাবাদী' রূপে।

1473 সালে পোল্যান্ডের তোরুন (Torun) শহরে নিকোলাস কোপার্নিকাসের জন্ম। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা করেন বোলোনিয়াতে, ডাক্তারি শেখেন পাদুয়াতে, ফেরারাতে শেখেন আইন। জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি কাটিয়েছিলেন ফ্রাউএন্‌বার্গ্-এর চার্চ-কর্মকর্তা হিসেবে। এই শহরটি একদিকে টিউটনিক 'নাইট'-সম্প্রদায়, অন্যদিকে পোল্যান্ডের রাজার বিতর্কিত এলাকার মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় যুদ্ধ আর প্রশাসন নিয়ে তাঁকে প্রচুর মাথা ঘামাতে হয়েছিল। তবে সদাসর্বদাই তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয়টি ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান। জীবনের একান্ত নিজস্ব সময়ের সবটুকুই তিনি মহাকাশের একটা যুক্তিশাসিত ছবি আঁকবার কাজে ব্যয় করেছিলেন। সেই প্রয়াসেরই চূড়ান্ত রূপ তাঁর *জ্যোতিষ্কসমূহের কক্ষপথের আবর্তন* শীর্ষক গ্রন্থ। বইটি যে বছর ছাপা হয় সেই বছরেই তিনি মারা যান। এই গ্রন্থে তিনি দেখালেন, জ্যোতিষ্ক-গোলকসমূহ পৃথিবীকে নয়, সূর্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তনরত। পৃথিবী নিজেও সূর্যকেই প্রদক্ষিণ করে। বিস্তৃতভাবে তিনি দেখালেন যে এই ধারণাকে স্বীকার করে নিলে যাবতীয় জ্যোতিঃ-পর্যবেক্ষণকে সামঞ্জস্যপূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। এই যে বৈপ্লবিক ধারণা তিনি উপস্থাপিত করলেন, এর মূলে তাঁর যুক্তিগুলি ছিল মূলত দার্শনিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক। সৌর-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা এবং তারই যুক্তিসংগত বিস্তৃতিস্বরূপ নক্ষত্রসমূহের প্রায় অমেয় দূরত্বের কথা জানিয়ে তিনি বললেন: 'যাঁহারা মনে করেন যে পৃথিবীই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে বিরাজ করে, তাঁহারা বাধ্য হইয়াই বহুসংখ্যক গোলকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লন এবং তাহার ফলে সমুদয় ব্যাপারটি নিরতিশয় দুর্বোধ্য হইয়া উঠে। আমি মনে করি তদপেক্ষা বরং এই বিপুল

দূরত্বের ব্যাপারটি অবধারণ করা অনেক সহজ। কেননা এইভাবে আমরা প্রকৃতির নিজস্ব পথটিই অনুসরণ করিতেছি। প্রকৃতিতে কোনো কিছুই অতিরিক্ত বা নিষ্ফল নহে। প্রকৃতিতে সকল ক্ষেত্রেই একটি মাত্র কারণ অনেকগুলি কার্যের জননী।' অতঃপব , একে একে গ্রহগুলির কক্ষপথ নিয়ে আলোচনা করে অবশেষে তিনি লিখছেন: 'এই সমস্ত কিছুর মধ্যস্থলে সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন সূর্য। অপরূপ শোভাময় এই মন্দিরে শ্রেষ্ঠতর আর কোন পীঠে এই জ্যোতির্ময় রূপকে অধিষ্ঠিত করা যাইত? আর কোন স্থান হইতে যুগপৎ সমগ্র ক্ষেত্রটিকে'তিনি আলোকের ঝরণাধারায় বিধৌত করিতে পারিতেন? তাঁহাকে যথার্থই প্রভাকর বলিয়া, মন বলিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্তা বলিয়া অভিহিত করা হয়। হার্মিস ট্রিস্‌মেজিস্টুস্ তাঁহাকে দৃশ্যমান ঈশ্বর বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। সোফোক্লিস্-এর ইলেক্‌ট্রা তাঁহাকে সর্বদ্রষ্টা নাম দিয়াছেন। এই সূর্য যেন রাজ-সিংহাসনে আসীন, আর তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তনরত গ্রহগুলি যেন তাঁহার সন্তান। রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি এই সন্তানদের শাসন করেন। পৃথিবীর সেবায় নিয়োজিত রহিয়াছে চন্দ্র। অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, পৃথিবীর সঙ্গে চন্দ্রের সম্পর্কই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ। হইতে পারে; কিন্তু ইতিমধ্যে সূর্যের প্রসাদে পৃথিবী গর্ভবতী হইয়া উঠেন, তাঁহার গর্ভে বাৎসরিক পুনর্জন্ম ঘটে।' এখানেও আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে এক অতি প্রাচীন, প্রায় যেন জাদুবিশ্বাস-সমর্থিত ধারণাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারটি লক্ষ্য করি। আর তারই সঙ্গে খুব স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করি কেন্দ্রীভূত রাজশাসনের মহিমাকীর্তন।

সৌরকেন্দ্রিক ব্যবস্থার এই তত্ত্ব সাড়া জাগাতে বেশ কিছুটা সময় নিয়েছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী গণনার উন্নতিসাধনের উপায় হিসেবে এই তত্ত্বের মূল্য উপলব্ধি করেন। 1551 সালে এর ভিত্তিতে প্রাশিয়াতে নতুন পঞ্জিকা রচিত হয়। তা সত্ত্বেও কিন্তু খুব কম লোকই এ তত্ত্বকে সত্য বলে স্বীকার করতেন। কাবণ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে যে-কাণ্ডজ্ঞানের জন্ম হয়, এ তত্ত্ব তার বিরোধী। তাছাড়া বিদ্বান ব্যক্তিরা এই তত্ত্ব সম্পর্কে অনেক আপত্তি তুললেন। বিশেষত, তাঁরা বললেন পৃথিবী যদি ঘুরতেই থাকে তাহলে প্রচণ্ড বাত্যার বিক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে না কেন; কেনই বা নিক্ষিপ্ত গোলার গতিপথ বিচলিত হচ্ছে না। এইসব প্রশ্নের সদুত্তর পাবার জন্য মানুষকে গ্যালিলিও'র আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

তবু, ব্রহ্মাণ্ডটা যে অনাবদ্ধ (open), এই পৃথিবী যে তার একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, কেবল এই ধারণাটাই তো ছিল বিস্ফোরক। প্রাচীন স্বীকৃত ধারণাটি ছিল এই যে বহুসংখ্যক আবদ্ধ (closed) এককেন্দ্রিক স্ফটিক-গোলকের সাহায্যে এই ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হয়েছে। ঈশ্বরই তার সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বরই তাকে গতিশীল করে রেখেছেন। এখন প্রশ্ন জাগল, পৃথিবীতে যেমন নতুন নতুন দুনিয়ার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি আকাশেও কি তাহলে নতুন নতুন জগতের অস্তিত্ব আছে? খ্রিস্টীয় অর্থে কালাপাহাড়ী এই ভাবনারই খেসারত দিতে গিয়ে ব্রুনোকে মরতে হয়েছিল।

রেনেসাঁসের কীর্তিসমূহ

বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের এই প্রথম পর্বটি চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে মূলত ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করে। গঠনমূলক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে কেবল কোপার্নিকাসের অসামান্য তত্ত্বপ্রকল্পটিই এই পর্বটিকে আলোকিত করে রেখেছে। কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, শারীরস্থানবিদ্যা, রসায়ন প্রমুখ ক্ষেত্রেও প্রাচীন প্রচলিত ধ্যানধারণার সীমাবদ্ধতা, অসফলতা তখন ধরা পড়ে যাচ্ছিল। একথা ঠিক, রেনেসাঁস যুগের মানুষ যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, তার মধ্যে খুব অল্প কয়েকটিরই সমাধান করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে আগামী শতাব্দীতে ভাবধারার প্রচণ্ড সংঘাতের মধ্যে দিয়ে বাকি অসমাধিত প্রশ্নগুলির

সমাধানের রাস্তাটা তাঁরা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু এই পর্বে অতীব গুরুত্বপূর্ণ নানান সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। এর আগে, মধ্যযুগের গোড়ার দিককার বৈজ্ঞানিক প্রয়াস যে অবক্ষয়িত হয়ে গিয়েছিল তার প্রধান কারণ, সেসব প্রয়াসের কোনো কার্যকর প্রয়োগক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন রেনেসাঁস যুগের নৌ-চালকরা। তাঁরা বিজ্ঞানের প্রয়োগের এক সুনিশ্চিত ও বর্ধিষ্ণু ক্ষেত্র রচনা করে দিয়েছিলেন। এই প্রয়োগের জন্য বিজ্ঞানের যে দুটি শাখায় জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি— জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং নৌচালন— সৌভাগ্যবশত ঠিক সেই দুটি শাখাতেই ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান যুগ থেকে শুরু করে সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডারটি সবচেয়ে ভালোভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল। শুধু সংরক্ষিত নয়, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং পঞ্জিকা-প্রণয়নের স্বার্থে খুব সক্রিয়ভাবে এসবের চর্চা চলে আসছিল। এছাড়া, যন্ত্রনির্মাণের প্রয়োজনে গতিবিজ্ঞানকেও মদত দেওয়া হলো। এই সময় থেকে বিজ্ঞানের খুঁটিটা শক্ত হয়ে উঠল। যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সক্রিয় এবং লাভজনক উদ্যোগগুলির, অর্থাৎ বাণিজ্য এবং যুদ্ধের স্বার্থে বিজ্ঞানচর্চা আবশ্যিক হয়ে উঠল। পরে বিজ্ঞানের সহায়তার হাত ম্যানুফ্যাকচারে, কৃষিতে, এমনকি চিকিৎসাক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। সব মিলিয়ে রেনেসাঁস যুগের গুরুত্ব এইখানেই যে সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং ভাবধারার আগল সেই প্রথম ভাঙতে পেরেছিল মানুষ। গঠনমূলক কাজ প্রায় সবই তখন করা বাকি, কিন্তু সেসবকে আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। বিজ্ঞান অনপনেয় ছাপ রাখতে শুরু করেছিল ইতিহাসে।

4. দ্বিতীয় পর্ব: 1540-1650

ইতিহাসে মোটামুটি 1540 থেকে 1650 পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বটির তেমন জুতসই কোনো নাম নেই। কেউ কেউ এটিকে রেনেসাঁসের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার পর্ব বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার মাত্রা যতটা তীব্র হলে এ নাম খাপ খেয়ে যেত, কার্যত তা তেমন তীব্র ছিল না। রিফর্মেশন-বিরোধী আন্দোলন এই পর্বেরই অন্তর্গত। বারোক রীতির শিল্প ছিল এ যুগের দৃশ্য অভিব্যক্তি। ধর্ম নিয়ে তুমুল যুদ্ধ চলে এ যুগে— ফ্রান্সে (1560-98); হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গে (1572-1609); এবং জার্মানিতে (1618-48)। 1576 সালে হল্যান্ডে পার্লামেন্ট (States General) গঠিত হয়। ইংলন্ডে 1649 সালে গঠিত হয় কমন্‌ওয়েলথ। শেষোক্ত দুটি ঘটনার অভিঘাত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও দূরপ্রসারী হয়েছিল। বিশ্বের বাণিজ্য ও ম্যানুফ্যাকচার প্রধানত ঐ দুটি দেশেই সংহত রূপ ধারণ করেছিল, পার্লামেন্ট ও কমন্‌ওয়েলথ গঠনের মধ্যে দিয়ে নবোদিত বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক বিজয় ঘোষিত হলো।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পর্বে পর্যবেক্ষণমূলক ও পরীক্ষামূলক নতুন পদ্ধতির বিজয়তোরণ রচিত হয়। পূর্ববর্তী পর্বের শেষে কোপার্নিকাস সৌর-কেন্দ্রিক জগতের তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। তারই খেই ধরে এই নতুন পর্বের সূত্রপাত। আর চার্চের বিরোধিতা সত্ত্বেও গ্যালিলিও'র মাধ্যমে ঐ তত্ত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে এ পর্বের সমাপ্তি ঘটে। 1600 সালে গিল্‌বার্ট কর্তৃক পৃথিবীকে একটি চুম্বক রূপে বর্ণনা, এবং 1628 সালে হার্ভে কর্তৃক রক্ত সংবহনের আবিষ্কার এই পর্বেরই অন্তর্গত। যে দুটি যন্ত্র প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষমতাকে বহুদূরে প্রসারিত করে, তাদের প্রথম ব্যবহারও এ যুগেই হয়। যন্ত্র দুটি হলো দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ।

অর্থনীতির দিক থেকে, পূর্ববর্তী নৌ-অভিযানগুলির ক্রমসঞ্চিত ফলাফলই এই শতকের প্রধান ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। নৌ-বাণিজ্য ততদিনে ইউরোপের পুরোনো অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের

সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল। এই সময়ে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটে। মার্কিন রুপো বিপুল পরিমাণে আসতে থাকায় পণ্যসামগ্রীর মূল্যমান খুবই বেড়ে যায়। পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষত হল্যান্ডে আর ইংলন্ডে, জমিদারীগুলো ভেঙে পড়ায় বাজারে তখন ভূমিহীন লোকের ভিড় বাড়ে, আর একই সঙ্গে ভাড়াটে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি গুরুতর রূপে কমে যায়। এর ফলে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন-খরচা কমে গেল। অথচ তাদের মূল্যমান তখন খুব চড়া, এবং বাজারও ক্রমশ বর্ধমান। তার ওপর, ম্যানুফ্যাকচার-কারীদের জন্য শ্রমিকদের যোগান হয়ে উঠল অফুরন্ত। সুতরাং, যেসব বণিক ও ম্যানুফ্যাকচারকারী নতুন নতুন সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের সঙ্গে যুক্ত, আর সেই কারণে নতুন সম্পদ আহরণে ও নতুন নতুন বাজারের চাহিদা পূরণে সক্ষম, তাদের ঐশ্বর্য অভাবনীয়রকমে বেড়ে উঠল। একদিকে বাণিজ্যপথের এই পরিবর্তন, অন্যদিকে একের পর এক যুদ্ধ—এর সম্মিলিত ফলস্বরূপ জার্মানির অর্থনীতি একেবারে ভেঙে পড়ল। অথচ ষোড়শ শতকের গোড়াতে এই জার্মানি ছিল ইউরোপের সবচেয়ে অগ্রসর ভূখণ্ড।

অর্থনীতির এই প্রাচীন কেন্দ্রটি হারিয়ে যাওয়ার ক্ষতিকে ছাপিয়ে গেল প্রান্তবর্তী দেশগুলির কৃতিত্ব। ইউরোপের— শুধু ইউরোপ কেন, তামাম পৃথিবীর— নতুন অর্থনৈতিক কেন্দ্র রচিত হলো নর্থ সী-র চারপাশের দেশগুলোতে। প্রথমে হল্যান্ডে, তারপর ইংলন্ড ও উত্তর ফ্রান্সে। স্পেন বা পর্তুগাল প্রমুখ অন্যান্য সাগর-বাণিজ্য-পটু দেশগুলোতে তখনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। কিন্তু হল্যান্ড, ইংলন্ড এবং উত্তর ফ্রান্সের অবস্থাটা তখন বদলে গেছে, সেখানে ম্যানুফ্যাকচারের সঙ্গে বাণিজ্যের মেলবন্ধন রচনার পথে কোনো বাধা ছিল না। জার্মানি আর ইতালি থেকে দেশান্তরী কারিগররা উত্তরের এই বর্ধিষ্ণু দেশগুলোতে বাসা বাঁধলেন। তাঁদের মাধ্যমে রেনেসাঁস যুগের প্রকৌশলগত ও শৈল্পিক অগ্রগতি এইসব দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে, হল্যান্ড আর ইংলন্ডের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার উদরপূর্তির জন্য শস্যের চাহিদা বাড়ল। শুধু শস্য কেন, শণ, কাঠ, পিচ আর লোহার চাহিদাও বাড়ল; কারণ জাহাজে করে শস্য পরিবহনের জন্য ওগুলো অপরিহার্য। এই বাড়ন্ত চাহিদা মেটাতে গিয়ে বাল্টিক দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটল। একে একে ডেনমার্ক, সুইডেন, পোল্যান্ড এবং রাশিয়া স্বাধীন শক্তি হিসেবে মাথা চাড়া দিতে লাগল।

অর্থনৈতিক বিপ্লবের এই দ্বিতীয় পর্বের চালিকাশক্তি এবং সে-বিপ্লবের মুখ্য সুবিধা-ভোগী ছিলেন হল্যান্ড আর ইংলন্ডের বণিকরা। কৃষির এবং মেছো-ভেড়িগুলোব রমরমা অবস্থা তাঁদের সহায়ক হয়েছিল। ধনবান হয়ে ওঠার ফলে বুর্জোয়াদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা এল ঠিকই, কিন্তু খুব সহজে এল না। বছরের পর বছর এ নিয়ে সংঘাত চলেছে, সরাসরি যুদ্ধ হয়েছে। অবশেষে মহারাজেরা, প্রথমে স্পেন ও পরে ইংলন্ডের রাজারা, হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলেন যে তাঁদের এই ধনবান ওলন্দাজ বা ইংরেজ প্রজাদের আর আগেকার মতো সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় বেঁধে রাখা যাবে না— মুনাফার সাধনায় তাঁদের স্বাধীনতা দিতেই হবে। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য ধর্মীয় কারণেই এইসব সংঘর্ষ বাধত। তার একটা যৌক্তিকতাও ছিল। নবোদিত বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রত্যয়, তাদের কাজকর্ম, সবকিছুই ক্যাল্‌ভিনবাদী ভাবনার মধ্যে সহজেই আশ্রয় পেয়ে যেত। কিন্তু ক্যাথলিক, এমনকি লুথারীয় ভাবধারা সম্পর্কেও সে কথা খাটে না।

করণকৌশলের অগ্রগতি

করণকৌশলের ক্ষেত্রে আগের শতাব্দীতে বা পরের শতাব্দীসমূহে যেমন নানান বৈপ্লবিক উদভাবন ঘটেছিল, আলোচ্য শতাব্দীতে তেমনটি ঘটেনি। প্রচলিত কৌশলগুলোই আরো

ব্যাপক মাত্রায় প্রযুক্ত হতে থাকে, সেগুলোর কার্যকারিতাও বাড়ে। তখনো কৃষিক্ষেত্রই প্রধান কর্মক্ষেত্র। আর প্রধান শিল্প বলতে পশমী কাপড়-নির্মাণ। তবে পরিবর্তনের লক্ষণ চোখে পড়ছিল। অভিজ্ঞতা যত বাড়ল, জাহাজ-নির্মাণের কৌশলও তত উন্নত হলো। সেই সঙ্গে নৌচালনেও এল উন্নতি। বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়, এবং পরিবহনের খরচ কমায়, বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যাপকতর অংশের হাতে টাকা এল। রেশম বা কাচের মতো যেসব জিনিস আগে ছিল দুর্লভ বিলাস-সামগ্রী, সেসব এখন হয়ে উঠল নেহাৎ সাধারণ পণ্যসামগ্রী। সূতীবস্ত্র, চীনেমাটির জিনিসপত্র, কোকো, তামাক— পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিক থেকেই এইসব নব নব সামগ্রীর সম্ভার এসে পৌঁছতে লাগল ইউরোপের বাজারে। ফ্লেমিশ এবং ওলন্দাজ ঘরানার চিত্রকলা ধর্মের সেবা ও বনেদী-বন্দনা ছেড়ে এবার সাধারণ মানুষের খানাপিনা, হৈহুল্লোড়ের ছবি আঁকতে লাগল। এই সময়েই ওলন্দাজরা শহরে বা গ্রামের বাগানবাড়িতে বুর্জোয়াদের *আরামপ্রদ* জীবনযাত্রার সুরটি বেঁধে দেয়। উদ্যানে, বিনোদন-ক্ষেত্রে তারা প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করল।

ব্লাস্ট্ ফার্নেস ও ঢালাই লোহা

অপেক্ষাকৃত কম চটকদার মালপত্রের উৎপাদন-পদ্ধতিতে কিন্তু প্রায় সবার অগোচরেই নানারকম পরিবর্তন আসছিল। শেষ বিচারে এইগুলোর গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে লোহা উৎপাদন সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য। চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই লৌহধাতুবিদ্যায় পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়াটি পরিণত হয়ে উঠছিল, এতদিনে তার চূড়ান্ত ফললাভের লক্ষণ দেখা গেল। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতেই চীনে ঢালাই লোহার প্রচলন ছিল; কিন্তু ইউরোপে তার আবির্ভাব স্বাধীনভাবেই ঘটে বলে মনে হয়। নিছক উৎপাদনের বহর বেড়ে যাওয়ার দরুন উৎপাদনের পদ্ধতিতে কীভাবে পরিবর্তন আসে, তার এক নিখুঁত নিদর্শন ইউরোপে ঢালাই লোহার আবির্ভাব। তিন হাজার বছর ধরে ছোটো ছোটো চুল্লিতে অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রায় কাঠকয়লার সাহায্যে বিজারণ ঘটিয়ে লোহা বানানো হচ্ছিল। সে পদ্ধতিতে থকথকে মণ্ডরূপে লোহা পাওয়া যেত। গোটা মধ্যযুগ ধরেই এইসব চুল্লি ক্রমশ আকারে বড়ো হতে থাকে। লোহা তৈরির জন্য চুল্লির মধ্যে হাওয়ার যে ঝাপ্টা দিতে হয় তা দেওয়া হতো হাপরের সাহায্যে। উৎপাদনের মাত্রা বাড়তে থাকায় অবশেষে জলশক্তির সাহায্যে এই ঝাপ্টা পাঠানোর কাজটি সম্পন্ন করা হয়। কখনো কখনো চুল্লির তাপমাত্রা এত বেড়ে যেত যে লোহা একেবারে গলে যেত, ফলে নমনীয় লৌহমণ্ড পরে অনমনীয় দৃঢ় রূপ ধারণ করত। তারপর, চতুর্দশ শতকে রাইন নদী সংলগ্ন এলাকায় একটা নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটে। ঐ অঞ্চলের লৌহপ্রস্তুতকারীরা ভাবলেন, চুল্লির সামনের মেঝেতে একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ঐ গলিত লোহা ঢেলে ফেললে কেমন হয়? এই থেকেই 'pig iron'-এর সূত্রপাত। এই লোহাকে শোধন করা ছিল বেশ শক্ত কাজ। কাজেই উন্নতি ঘটল ধীরে ধীরে। এই পদ্ধতির কথা যত ছড়িয়ে পড়ল ততই ছোটো ছোটো লোহাশালের (bloomery) বদলে চালু হলো 'ব্লাস্ট্ ফার্নেস'। ষোলো শতকের শেষে গিয়ে দেখা গেল, আগে যেখানে 'পিটিয়ে পিটিয়ে' হন্দব-হন্দর লোহা তৈরি হতো, এখন সেখানে টন-টন লোহা অজস্রধারে 'ঢালা' হচ্ছে।

যে কোনো প্রকৌশলকে কাজে লাগাতে গেলেই লোহা অপরিহার্য। সেই লোহা এতদিন আক্রা থাকায় যে অসুবিধে হচ্ছিল, তা এখন আর রইল না। কিন্তু এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। অনেক বেশি পরিমাণে লোহা বিগলিত করার জন্য চাই অনেক বেশি পরিমাণ কাঠকয়লা। আর, এই কাঠকয়লার যোগানেই দেখা দিল ঘাটতি। সাসেক্স-এর ওএলড (Weald) প্রভৃতি যেসব জায়গা লৌহ-এলাকা বলে বহুদিন ধরে প্রসিদ্ধ ছিল, তাদের গুরুত্ব কমে গেল। কাষ্ঠসম্ভারের

অফুরন্ত সরবরাহের দৌলতে এখন গুরুত্ব লাভ করল সুইডেন আর রাশিয়া। বস্তুত, যুদ্ধ আর বাণিজ্য মারফত বহুলাংশে এই কাঠেরই কল্যাণে ঐ দুটি দেশ বিশ্ব-অর্থনীতির অঙ্গনে প্রবেশ লাভ করে। ঢালাই লোহা সবচেয়ে বেশি করে কাজে লাগল অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষত কামান নির্মাণে। ঢালাই-ব্রন্‌জের ঘণ্টা বানানোর বিদ্যা এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলো। ইংলন্ডের কামানের সুখ্যাতি খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এইসব কামান বিক্রী করা হতো পুরোপুরি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। কট্টর ক্যাথলিক স্পেনরাজের যুদ্ধজাহাজের কামানই হোক, আর আল্‌জিয়ার্সের ঘোর বিধর্মী বেই (Bey)-এর কামানই হোক— সবগুলোরই জন্ম খুব সম্ভব সাসেক্সের ঢালাইখানায়।

কয়লার ব্যবহার

হল্যান্ড ও ইংলন্ডে ষোড়শ শতকের শেষ দিকে কাঠের যে নিদারুণ ঘাটতি দেখা দেয়, তার অন্যতম কারণ ছিল লৌহ-বিগলনের জন্য কাঠের ব্যবহার। অন্যতম, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। সাধারণভাবে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ঘটায় এই সময়ে কাঠের চাহিদা প্রচণ্ড বেড়ে যায়। জাহাজ ও গৃহনির্মাণের কাজে, জ্বালানী হিসেবে, লবণ, সাবান, মল্ট প্রভৃতি প্রস্তুত করার কাজে, এমনকি গৃহস্থালীর প্রয়োজনেও এত বেশি কাঠ লাগত যে সে-চাহিদা মেটানো স্থানীয় অরণ্যের অসাধ্য ছিল। কিছু পরিমাণ কাঠ বাইরে থেকে আমদানি করা হলো ঠিকই, কিন্তু মুশকিল-আসানের আরেকটা পথ হাতের সামনেই খোলা ছিল। সেই রোমান যুগ থেকেই নর্দাম্‌ব্রিয়া এবং স্কটল্যান্ডের কয়লাখনির খোলা কয়লাস্তর থেকে কাঁচা কয়লা তোলা হয়ে আসছিল। দূর লন্ডনে, এমনকি মধ্যযুগের ইউরোপের অন্যান্য দেশেও সে কয়লা বিক্রী হতো। খুবই নোংরা ছিল জিনিসটা, এবং কয়লার ব্যবহার নিষিদ্ধ করে নানারকম আইনও বলবৎ ছিল। তা সত্ত্বেও দেশবাসী জ্বালানী হিসেবে কয়লা ব্যবহার করত।

ষোড়শ শতকে জ্বালানী কাঠের দাম প্রচণ্ড বেড়ে যাওয়ায় কয়লার ব্যবহার বাড়তে লাগল। তার উৎপাদন অতি দ্রুত বেড়ে গেল। 1564 থেকে 1634— এই সত্তর বছরে নিউকাস্‌ল থেকে পাঠানো কয়লার পরিমাণ চোদ্দো গুণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় পঁচিশ লক্ষ টনে। ফলে, খনির গভীর থেকে গভীরতর স্তর খুঁড়ে কয়লা তুলে আনার প্রয়াসে নতুন নতুন প্রকৌশলের প্রয়োগ ঘটতে থাকে। খনির স্তর যত গভীর হবে ততই সহজে তা জলপ্লাবিত হবে। এই সমস্যার মোকাবিলায় ইউরোপের অন্যত্র ধাতুখনিতে ব্যবহৃত প্রক্রিয়াগুলি কাজে লাগানো হলো, বসানো হলো উন্নত ধরনের পাম্প। কয়লা-বোঝাই মালগাড়ি খনি থেকে বার করে আনবার জন্য কাঠের *রেলপথ* বসানো হলো। অতীতে জ্বালানীর অভাব সভ্যতাকে বারংবার পীড়িত করেছে, বারেবারেই কাঠের সন্ধানে ফিরে যেতে হয়েছে কুমারী অরণ্যে। কয়লা এবার সত্যিই সে সমস্যার সমাধান করল। এই সময় থেকেই শিল্পোৎপাদনের— শুধু শিল্পোৎপাদন কেন, সভ্যতারই— কেন্দ্র সরে এল কয়লাখনি অঞ্চলে। এবং পরবর্তী চারশো বছরে সে কেন্দ্রের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এই একটি কারণেই ব্রিটেন শিল্পজগতে প্রধান দেশ রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। ইয়র্কশায়ারের ওয়েস্ট রাইডিং-এর বর্ণনা দিয়ে তীক্ষ্ণসন্ধানী ড্যানিয়েল ডিফো লিখেছিলেন: '...আর সব দিক থেকে যতই ভীতিপদ হোক এই দেশ, প্রকৃতিদেবী এখানে মুক্তহস্তে এমন দুটি জিনিস বিতরণ করেছেন যা না থাকলে ব্যবসাবাণিজ্য তো বটেই, মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যও অচল হয়ে পড়ত। ইংলন্ডের আর কোনো অঞ্চলে এমনটি দেখিনি আমি। শুধু ইংলন্ড কেন, সারা পৃথিবীর আর কোনো দেশে এমন মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেনি বলে আমার বিশ্বাস। আমি বলতে চাইছি উচ্চতম পর্বত থেকে প্রাপ্ত জলধারা এবং কয়লার কথা। মঙ্গলময় বিধাতার বিচক্ষণ হস্তই বুঝি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সে উদ্দেশ্য হলো ম্যানুফ্যাকচার। এই ব্যবস্থা না থাকলে ম্যানুফ্যাকচার

বন্ধ হয়ে যেত। শুধু তাই নয়, অধিবাসীবৃন্দের এক-পঞ্চমাংশের জীবনধারণই অসম্ভব হয়ে পড়ত, কারণ তাদের গ্রাসাচ্ছাদন যোগানো এদেশের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত।'

প্রকৌশলগত উদভাবন, কিংবা বিজ্ঞানের প্রয়োগ, কোনো দিক থেকেই শেষ-ষোড়শ এবং প্রথম-সপ্তদশ শতকের এই শিল্প-অভ্যুত্থান— কেউ কেউ যাকে 'প্রথম শিল্পবিপ্লব' বলে অভিহিত করেন— আঠেরো শতকের বিরাট শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কিন্তু, আজকের দিনে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ঐ শিল্প-অভ্যুত্থান ছিল পরবর্তী শিল্পবিপ্লবের অপরিহার্য উপক্রমণিকা। কাঠ এবং জলশক্তির ওপর নির্ভরতা ছেড়ে লোহা এবং কয়লা-শক্তি-নির্ভর করণকৌশলের কথা ভাবার বা তার উদ্ভব ঘটানোর আগে এ ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার ছিল যে এই পরিবর্তনটা সত্যিই প্রয়োজন। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির প্রয়োজন মেটাতে তখনকার সীমিত সম্পদই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু প্রথম শিল্পবিপ্লবের কালে সেই সীমিত সম্পদের চাহিদার ওপর যেই চাপ পড়ল, তখনই নতুন নতুন সম্পদের, নতুন নতুন প্রকৌশলের খোঁজ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

প্রযোজক-সম্প্রদায়: সাইমন স্টুর্টভান্ট

এই চাপের দরুনই নতুন উদ্ভাবন সম্পর্কে মনোভাবও বদলাল। একবার যখন বোঝা গেল যে মুনাফা কামানোর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই, এবং নতুন নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ মুনাফার সন্ধান দিতে পারে, তখনই নতুন উদভাবনকে আর ঠেলে সরিয়ে না দিয়ে সাগ্রহে বরণ করে নেওয়া হলো। অধ্যাপক বাটারফীল্ড মনে করেন, এই 'নতুন ভাবনার শিরোভূষণই' আধুনিক বিজ্ঞানের জনক। যদি তাই হয়, তাহলে ঐ পরিবর্তিত মনোভাবের বিপণিই সে শিরোভূষণের বিক্রেতা। শেষ-ষোড়শ এবং প্রথম-সপ্তদশ শতকেই আদি 'প্রযোজক'দের (projectors) দেখা মিলল। পরে এঁদের বলা হতো 'উদ্ভাবক' (inventor)। রজার বেকন-এর মতো এঁরা নতুন নতুন মেশিনের কথা কেবল বলেই ক্ষান্ত হতেন না, কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সেগুলো হাতে কলমে বানিয়ে দেবার প্রস্তাব দিতেন; কখনো কখনো বানিয়ে দিতেনও।

কর্নেলিয়াস ড্রেবেল (1572-1634) ছিলেন এমনই একজন মানুষ। একটা ডুবোজাহাজ বানিয়ে টেম্‌স নদীতে সেটা প্রদর্শন করেছিলেন তিনি। লাল-কমলা রঙ্গক-এর প্রচলন করে তিনি অনেক মুনাফা অর্জন করেছিলেন। অধুনাবিস্মৃত সাইমন স্টুর্টভান্টও ছিলেন অমনই একজন করুণ চরিত্র। ঈষৎ খ্যাপাটে এই পাদ্রীর নজর ছিল অনেক উঁচু। *The Treatise of Metallica* (1612)-শীর্ষক পেটেন্ট-পত্রের ভূমিকায় তিনি লেখেন যে তাঁর লক্ষ্য হলো: 'কয়লা বা কাঁচা কয়লা সহযোগে লৌহ, ইস্পাত এবং অপরাপর ধাতুর প্রকরণ, গলন এবং উৎপাদন। এই উদ্ভাবনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দেশের কাষ্ঠসম্ভার রক্ষা করা।' স্টুর্টভান্টের গোপন কথাটি কী ছিল, কীভাবেই বা তিনি তা আবিষ্কার করেছিলেন, তা গোপনেই রয়ে গেছে। যে সমস্যার সমাধানে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন, পরবর্তী একশো বছরেও তার সমাধান হয়নি। কিন্তু, নব শিল্পযুগের উন্মেষের আগে রচিত এই দলিলটিতে তিনি উদ্ভাবন-প্রক্রিয়ার প্রকৌশলগত ও অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়ে গেছেন তা অতীব মূল্যবান এবং বিভিন্ন দিক থেকে আজও অতুলনীয়। স্টুর্টভান্ট শুরু করেছেন এইভাবে: 'আবিষ্করণী (Heuretica)— উদ্ভাবন-বিদ্যা অর্থাৎ নবীনের আবিষ্কার এবং পুরাতনের পর্যালোচনার বিদ্যা।' এটিকে তিনি কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করেছেন— একটি হলো 'Organick', যার আলোচ্য বিষয় যন্ত্রে নিয়োজিত সংবদ্ধ পুঁজি; তারপর 'Technick', যাতে কারিগরদের (Artizands) কৌশল বর্ণিত হয়েছে। উদ্ভাবন-প্রক্রিয়ার এই বিশ্লেষণে তিনি স্বতন্ত্রভাবে

রেখাচিত্র, মডেল ('superficiall and real moddles'), কার্যকর মডেল, আদি ছাঁচ (the Protoplast) এবং সবশেষে 'Grand Mechanick' বা পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন-প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি লেখেন, 'আদি-ছাঁচের রূপ এবং ধরনটিকেই বর্ধিত করে নিয়ে, পরবর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে তার মধ্যে সুবিধাজনক সংযোজন ঘটিয়ে' পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন শুরু করা যাবে। উন্নয়নের খরচ এবং লাভজনকতা সম্বন্ধে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। পুঁজি সংগ্রহ করার উপায় সম্বন্ধেও তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। প্রশ্ন এই যে তাহলে তিনি এমন সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন কেন? এমন নয় যে তাঁর প্রকৌশলী দক্ষতার অভাব ছিল। কারণ, সঞ্চাপিত (pressed) মৃৎসামগ্রী উদ্‌ভাবন করে তিনি সে দক্ষতার প্রমাণ রেখেছিলেন (আজকের দিনেও আমরা এইসব জিনিস ব্যবহার করে চলেছি)। আসলে তাঁর ব্যর্থতার কারণগুলি নিহিত ছিল সে যুগের পরিস্থিতির মধ্যে। এক আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগের ভাবনা ভেবেছিলেন। কিন্তু সে যুগ ঐ ধরনের উদ্যোগের উপযোগী ছিল না।

স্টুর্টভান্ট হিসেব করে দেখেছিলেন, তাঁর প্রস্তাবিত ঐ একচেটিয়া লৌহ-প্রতিষ্ঠানটি থেকে বাৎসরিক আয় হবে 330,000 পাউন্ড। সেই হিসেবমতো তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানটির তেত্রিশটি শেয়ারের কথা ভাবেন। তার মধ্যে আঠেরোটি শেয়ার বণ্টিত হবে মহারাজ, প্রিন্সবর্গ এবং প্রিয়পাত্র কার্-এর মধ্যে। স্টুর্টভান্ট নিজে নেবেন একটি শেয়ার। বাকি চোদ্দোটি শেয়ার নেবেন তাঁরা 'যাঁরা ঝুঁকি নিতে আগ্রহী, যাঁরা এ কাজে যোগ দেবেন অথবা সহায়তা করবেন।' আদালতের হিস্যা নিয়ে গণ্ডগোল বাধায় অবাক হবার কিছু নেই যে সবকিছুই ভেস্তে যায়। 'যাঁরা ঝুঁকি নিতে আগ্রহী' তাঁদেরই দুজন তাঁর পেটেন্টটি চুরি করেন, তাঁর নামে হুলিয়া বার করেন। কিন্তু এই তস্করেরা তাঁর পেটেন্টটিকে কাজে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়। তার কারণ, খুঁটিনাটি বিবরণের দিক থেকে পেটেন্টটি ছিল খুবই অস্পষ্ট।

সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার মধ্যে আধুনিক শিল্পোদ্যোগ গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। রেনেসাঁস যুগের বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত এক দরাজহস্ত প্রিন্স, যিনি কেবলই অর্থকষ্টে ভুগতেন, আর যাঁকে কেবলই ঠকাতো লোকে, তাঁর পরম উৎসাহেও সে উদ্যোগ গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। এ ব্যাপারে সত্যিকারের অগ্রগতি ঘটে পরবর্তী শতকে, যখন সাধারণ কিছু লোক তাদের মুনাফা থেকে টাকা জমিয়ে পুঁজি সঞ্চয় করে। ততদিনে রাজামহারাজা, জমিদার আর 'কর্পোরেশন'গুলোর বিশেষ অধিকার ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে।

পরীক্ষারত নব্য দার্শনিক সম্প্রদায়

এইরকম এক বাতাবরণে ইউরোপের নবীন অর্ধজাগ্রত বিজ্ঞান পরিণতির পথে এগোতে থাকে। বিশেষ অধিকার এবং দুর্নীতির প্রকোপ যত ব্যাপকই হোক, সব মিলিয়ে সে বাতাবরণ খুব একটা প্রতিকূল ছিল না। রিফর্মেশনবিরোধী আন্দোলন ইউরোপে প্রোটেস্টান্ট মতবাদের অগ্রগতি রোধ করতে সমর্থ হলেও, বিজ্ঞানের ওপর তার অনুরূপ প্রভাব পড়েনি। রিফর্মেশন-বিরোধী আন্দোলনের যাঁরা পরিচালক সেই জেসুইট সম্প্রদায় ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে অন্ধভাবে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করার বদলে তাঁরা যদি বিজ্ঞানকে মদত দেন, তাহলে অনেক বেশি লোককে দলে পাওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং তাঁরা জোর কদমে বিজ্ঞান আন্দোলনে নেমে পড়লেন, বিশেষ করে নব্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চায়। তাঁরা এমনকি বিজ্ঞানের প্রসারেও সহায়তা করলেন। ভারতবর্ষে, চীনে ও জাপানে মানমন্দির স্থাপনে তাঁরা সহায়তা করেন। একই সঙ্গে, বিজ্ঞান যাতে প্রকৃত ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকারক কোনো প্রভাব না ফেলে সে ব্যাপারে তাঁরা সতর্ক নজর রাখতে লাগলেন। এর ফলে অবশ্য অজান্তে তাঁরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত প্রোটেস্টান্ট দেশসমূহের বিজ্ঞানীদেরই সুবিধে করে দিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্রীভূত ছিল ইতালিতে। আস্তে আস্তে তা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশ্য মননজগতে ইতালির প্রাধান্য তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পতনের পরেও বেশ কিছু কাল বজায় ছিল। পশ্চিম ইউরোপে ইতালিই প্রথম সামন্ত-পরম্পরা চূর্ণ করে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। তাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব কমে এলেও ইতালি বহুদিন ধরেই ইউরোপীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র রূপে বিরাজ করে। সে সংস্কৃতি ছিল সুসম। কারণ ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বহুলাংশে নব্যজ্ঞানচর্চার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিল। এ ব্যাপারে প্রথম দিকটা তাদের ভূমিকা ছিল তামাম ইউরোপে তুলনারহিত। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা কেবল অধ্যাপকই ছিলেন না, একই সঙ্গে সভাসদও ছিলেন। ফলে একদিকে যেমন মধ্যযুগীয় বিদ্যাচর্চার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তেমনি ব্যবহারিক জ্ঞানেরও অভাব ছিল না। পোল্যান্ড, ইংলন্ড, ফ্রান্স— নব্য বিজ্ঞানীরা যে দেশ থেকেই আসুন না কেন, তাঁরা বিদ্যাবত্তা লাভ করতেন ইতালিতে, ইতালিতেই তাঁদের শ্রেষ্ঠ কাজের বেশির ভাগটা করতেন।

নবীন এই পরীক্ষারত দার্শনিকরা— যাঁদের আমরা এখন থেকে 'বিজ্ঞানী' বলে অভিহিত করব— এখন আর রেনেসাঁস যুগের তীব্রমথিত নগর-জীবনের অঙ্গ ছিলেন না। তাঁরা এখন নবোদিত বুর্জোয়াশ্রেণীর একেকজন স্বতন্ত্র মানুষ রূপে প্রতিভাত হলেন। অনেকেই ছিলেন আইনজীবী— যথা ভিয়েতা, ফের্মা, বেকন; কেউ কেউ ছিলেন ডাক্তার— যথা কোপার্নিকাস, গিলবার্ট, হার্ভে; অল্প কয়েকজন ছিলেন ছোটোখাটো সম্ভ্রান্ত-বংশীয় লোক— যথা টাইকো ব্রাহে, দেকার্ত, ফন গেরিক, ভান হেলমন্ট; চার্চের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন কেউ কেউ— যথা মের্সেন (Mersenne) ও গাসঁদি; এমনকি নিম্নতর বর্গ থেকেও উঠে এসেছিলেন দু-একজন— যথা কেপ্‌লার। ইতিহাসে এঁদের স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। কার্যত কিন্তু এঁদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও দ্রুত যোগাযোগ রক্ষার কাজটা আজকের বিজ্ঞানীদের তুলনায় অনেক সহজ ছিল। কারণ এঁদের সংখ্যাটা ছিল খুব কম। আর আজকের দিনে বিজ্ঞানীদের সংখ্যাটাই শুধু বিপুল নয়, তাঁদের নানারকম চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়, ফলে কাজের বিবরণ প্রকাশ করতে দেরি হয়ে যায় তাঁদের। সামরিক ও রাজনৈতিক বিধিনিষেধও ক্রমশই বাড়ছে বিজ্ঞানীদের ওপর।

বিজ্ঞানশিক্ষা : গ্রেশাম কলেজ

হল্যান্ড আর ইংলন্ডে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানশিক্ষার সূত্রপাত ঘটেছিল। আদি পর্বের স্পেনীয় এবং পর্তুগীজ বিদ্যালয়গুলির অনুকরণে এইসব শিক্ষাপ্রাতিষ্ঠানের বিশেষ ঝোঁক ছিল নৌচালনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ওপর। জেমা ফ্রিসিয়াস ফ্রেমিং (1508-55) এবং জেরার্ড মার্সেটর ফ্রেমিং (1512-94) নির্ভুল নৌ-তালিকা বানাবার পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদেরই পথ অনুসরণ করে একের পর এক ইংরেজ ভূগোলবিদের আবির্ভাব ঘটে। প্রথমে এলেন জন ডী (1527-1608)। জ্যোতিষী হিসেবেই যদিও তাঁর খ্যাতি ছিল সমধিক, তবু তাঁকেই সেই নবযুগের প্রথম ব্রিটিশ বিজ্ঞানী বলে অভিহিত করা চলে। তিনি ছিলেন এলিজাবেথীয় যুগের বহু বড়ো বড়ো নাবিকের বন্ধু এবং পরামর্শদাতা। ইংলন্ডে নবযুগের বিজ্ঞান-শিক্ষাদানের প্রথম প্রতিষ্ঠান রূপে 1579 সালে গঠিত হয় গ্রেশাম কলেজ। সার টমাস গ্রেশামের (1519-79) ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সার টমাস ছিলেন লন্ডনের সবচেয়ে বড়ো বণিকদের অন্যতম। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ রাজসরকারের অর্থ-প্রতিভূ এবং রয়্যাল এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। বণিক-পুঁজি আর নব্য বিজ্ঞানের মিলন মূর্ত রূপ ধারণ করেছিল তাঁর মধ্যে। বিগত প্রজন্মের ফ্রান্সে স্থাপিত Collège de France-এর মতো গ্রেশাম কলেজ কিন্তু নিছক

মানবিকী বিদ্যার্চর্চার প্রতিষ্ঠান ছিল না। এখানে পড়ানোর মাধ্যম ছিল ইংরেজি আর লাতিন দুটোই। মোট সাতজন অধ্যাপকের মধ্যে দুজন পড়াতেন জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপককে নৌ-চালন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি বিষয়েও পড়াতে হতো— 'নাবিকদের সুবিধার্থে'। পরবর্তী এক শতক ধরে গ্রেশাম কলেজই ছিল ইংলন্ডের বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র। এই কলেজই ছিল রয়্যাল সোসাইটির ভবন, এইখানেই সোসাইটির প্রথম অধিবেশন বসে।

বিজ্ঞানের মূল কারবার যে প্রকৃতি এবং প্রয়োগবিদ্যা নিয়ে, তাকে যে ব্যবহারিক দিক থেকে উপযোগী হয়ে উঠতে হবে, এ ব্যাপারটা সে যুগের অধিকাংশ বিজ্ঞানীর কাছে স্বতঃসিদ্ধ ছিল। অথচ, ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান যুগে, কিংবা মধ্যযুগে এই ভাবনাটা ছিল বিধর্মিতারই সামিল। এই বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই কোনো না কোনো সময়ে সরকারি চাকরী করতেন। যুদ্ধের সময়ে কিংবা শান্তির সময়ে কিছু না কিছু ব্যবহারিক উদভাবন করে এঁরা নিজেদের নিয়োগকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন। তাঁদের মৌলিকতা এবং স্বাতন্ত্র্য ছিল সুস্পষ্ট। চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এঁরা প্রধানত একই ঐতিহ্যের পথ অনুসরণ করতেন, একই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, এবং একই ধরনের সমস্যার সমাধানে ব্রতী হতেন। পূর্ববর্তী রেনেসাঁস যুগের মতো তাঁদের আগ্রহ গুণাত্মক অর্থে বিশ্বগ্রাহী ছিল না। পরবর্তীকালের সংগঠিত বিজ্ঞানের মতো প্রকৃতিকে ধারাবাহিকরূপে অনুসন্ধান করার কাজটিও তাঁরা করেননি। তাঁরা অল্প কয়েকটি সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী ছিলেন। মূল যে প্রশ্নগুলি নিয়ে তাঁরা ভাবিত ছিলেন সেগুলি হলো: জ্যোতিষ্কসমূহের কর্মপ্রক্রিয়া (তৎসহ নৌচালনে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োগ); যন্ত্রপাতি এবং অভিক্ষিপ্ত বস্তুর (projectile) চলন; এবং মানবশরীরের কর্মপ্রক্রিয়া। রেনেসাঁস যুগের আদিপর্বের মতো তাঁদের কর্মসূচী এখন আর পুরোপুরি নেতিবাচক খাতে চালিত হতো না। অ্যারিস্টটল আর গ্যালেনের মতকে ধ্বংস করার চেয়ে তার কার্যকর বিকল্প চিন্তাপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁদের অভীষ্ট। একাজে তাঁদের সাফল্য সমস্ত প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এসব কাজের চূড়ান্ত সংশ্লেষণের জন্যে নিউটন-যুগের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

5. সৌরকেন্দ্রিক ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি

কোপার্নিকাস যে-বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তার তাৎপর্যটি অনুধাবন করতে বেশ কিছু সময় লাগে। তাঁর তত্ত্বপ্রকল্পকে সবার আগে স্বাগত জানান পেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। কারণ এর সরলতা, এবং জ্যোতিঃ-পঞ্জিকার উন্নয়নে এর উপযোগিতা (যদিও তখনো ঐ তত্ত্ব নিখুঁত গণনাকার্যের সহায় হয়ে ওঠেনি)। তারপরে অন্য একদল লোক এই তত্ত্ব নিয়ে খুব উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এঁরা এর মধ্যে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় অ্যারিস্টটলীয় বিশ্বভাবনার নির্বুদ্ধিতার অকাট্য সব নিদর্শন পেয়ে গেলেন। আরেকদল আবার এই তত্ত্বে প্রকল্পিত অনন্ত এক বিশ্বজগতের পরাদর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। এই শেষোক্তদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বিখ্যাত তাঁর নাম জিওর্দানো ব্রুনো (1548-1600)। নেপল্‌সের কাছে নোলায় তাঁর জন্ম। সুগভীর কল্পনাশক্তি এবং তেজোদ্দীপ্ত স্বভাবের এই মানুষটি যে মঠে যোগ দেন, তার কর্তাদের সঙ্গে অচিরেই তাঁর ঝগড়া বাধে। মঠ ছেড়ে দিয়ে সারা ইউরোপ চষে বেড়াতে থাকেন তিনি, একের পর এক বিতর্ক চালাতে থাকেন, একের পর এক বই ও পুস্তিকা প্রকাশ করতে থাকেন। ব্রুনো বিশ্বজগতের বহুত্বের ধারণাটির সঙ্গে রেমন্ড লাল্‌-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী ভাবধারার মিশ্রণ ঘটান। এমনই ছিল তাঁর গুণপনা যে ধনকুবের আর বিজ্ঞানী উভয়েই তাতে মুগ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু অতিরিক্ত ঠোঁটকাটা হওয়ায় তিনি বন্ধুর চেয়ে শত্রুই কুড়িয়েছিলেন বেশি। ফলে কোথাও তিনি থিতু হয়ে

বসতে পারেন নি। অবশেষে, এক অসতর্ক মুহূর্তে 1592 সালে ভেনিসে প্রবেশ করেন ব্রুনো। বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে রোমান ইনকুইজিশনের (ধর্ম-আদালতের) হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিধর্মিতার অভিযোগে ইনকুইজিশন আট বছর পরে তাঁকে পুড়িয়ে মারে। ব্রুনো এই শহিদত্ব বরণ করেছিলেন চিন্তার স্বাধীনতার সপক্ষে, বিজ্ঞানের সপক্ষে নয়। তিনি কোনো পরীক্ষা করেননি, কোনো পর্যবেক্ষণ করেননি, কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিজ্ঞানের তথ্যাবলী থেকে আপন পছন্দমতো সিদ্ধান্ত বেছে নেবার অধিকারের কথা ঘোষণা করেন গেছেন।

ব্রুনো মানুষকে কোপার্নিকাসের তত্ত্ব নিয়ে ভাবতে ও তর্ক করতে বাধ্য করেন। তাঁর প্রাণদণ্ডে যতজন ক্যাথলিক ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল, ততজনই প্রোটেস্টান্ট নিশ্চয়ই উৎসাহ পেয়েছিল। তবে কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে বা ফলপ্রদ করে তুলতে হলে প্রয়োজন ছিল আরো অকাট্য যুক্তির। প্রথম যে রূপে তত্ত্বটি প্রকাশিত হয় তাতে গ্রহকক্ষগুলির সুনির্দিষ্ট বর্ণনা ছিল না। কেন পৃথিবীর চলনকে আমরা বুঝতে পারি না তারও কোনো পরিষ্কার যুক্তি দেওয়া হয়নি সে তত্ত্বে। এইবার গ্রহকক্ষপথের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা; আর গতিবিজ্ঞান নামক নতুন শাখাটি এসে পৃথিবীর চলনকে ব্যাখ্যা করল।

উরানিবর্গ এবং টাইকো ব্রাহে

উপরোক্ত দুটি কাজের প্রথমটি সাধিত হয় অসামান্য দুজন মানুষের প্রয়াসে—টাইকো ব্রাহে (1546-1601) এবং তাঁর সহযোগী জোহানেস কেপ্‌লার (1571-1630)। টাইকো ছিলেন অভিজাতবংশীয় লোক। রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডেরিককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিনি ভেন্ (Hveen) দ্বীপে আধুনিক বিশ্বের প্রথম সত্যিকারের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান 'উরানিবর্গ' গড়ে তোলেন। ভেন্ দ্বীপটি সাউন্ড (The Sound) প্রণালীতে অবস্থিত। এই প্রণালী থেকে আহরিত শুল্কই ছিল ডেনমার্কের সম্পদের প্রধান উৎস।

এই উরানিবর্গে বিশেষভাবে নির্মিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রের প্রকৃত অবস্থান একাদিক্রমে পর্যবেক্ষণ করে নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ করেন টাইকো। এতকাল ধরে এ ক্ষেত্রে যা কিছু করা হয়ে এসেছিল, সেসবই তাঁর কাজের পাশে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রতিভাত হলো। কোপার্নিকাসের তত্ত্ব তাঁকে প্রভাবিত করলেও, তিনি নিজস্ব একটা তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী সূর্যই পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে, কিন্তু বাকি গ্রহগুলি ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। অর্থাৎ, চলনহীন পৃথিবীর সাপেক্ষে কোপার্নিকাস-বর্ণিত বিশ্বজগতের যা চেহারা দাঁড়াবে, তাই। আসলে, বাস্তবে সম্ভব-অসম্ভবের কথা না ভেবে টাইকো এমন একটা বিশ্বব্যবস্থা বেছে নিয়েছিলেন যেটা পর্যবেক্ষণ চালানোর পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। অথচ 1572-এর নবনক্ষত্র (New Star) যে স্থির তারকাক্ষেত্রের মধ্যেই অবস্থিত সেটা দেখিয়ে দিয়ে টাইকো কার্যত অ্যারিস্টটলীয় বিশ্বধারণাটিকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছিলেন। কারণ ঐ প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী জ্যোতিষ্কলোকে কোনো পরিবর্তন ঘটবার কথাই নয়। অথচ টাইকো নিজে কিন্তু এ নিয়ে কোনো হৈচৈ করেননি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর যুগ ছিল উত্তরণের যুগ। আগেকার দিনে জ্যোতির্বিজ্ঞান-সংক্রান্ত তথ্যের প্রয়োজন হতো জ্যোতিষীদের গণনার জন্য, প্রিন্সরাই তার খরচ যোগাতেন। পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আরো নিখুঁত তথ্যের চাহিদা বাড়ল নাবিকদের প্রয়োজনে। টাইকো ব্রাহের যুগেই এই পরিবর্তনের প্রথম লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়।

কেপলার

কেপলার যখন টাইকো ব্রাহের পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলগুলি নিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করলেন, তখন বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সেসব তথ্যের মূল্য অনন্তগুণে বেড়ে গেল। কেপলার ছিলেন দরিদ্র

পিতামাতার সন্তান। সংগ্রাম ও হতাশার দোলায় তাঁর জীবন নিরন্তর আন্দোলিত হয়েছে। তার জন্যে খানিকটা দায়ী অবশ্য তাঁর অদ্ভুত স্বভাব। ক্যাথলিক-শাসিত বিভিন্ন দেশেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটলে কী হবে, তিনিই ছিলেন প্রোটেস্টান্ট-পন্থী প্রথম বড়ো মাপের বিজ্ঞানী। সংখ্যা-জাদুতে গভীরভাবে বিশ্বাসী কেপলার বিচিত্র স্বপ্নরঞ্জিত কল্পনার সঙ্গে তুলনাহীন, গোঁজামিল-বর্জিত অতি নিখুঁত পরিমাপ ও গণনাকে আশ্চর্যভাবে মেলাতে পেরেছিলেন। তাঁর কর্মের অনুপ্রেরণা রূপে কাজ করেছিল ব্রহ্মাণ্ডের কূট রহস্য ভেদ করার এক অতীন্দ্রিয় তাড়না। তাঁর প্রথম বইয়ের নামটি থেকেই সে কথা স্পষ্ট হয়—*Mysterium Cosmographicum*. কিন্তু খেয়ে পরে বাঁচতেও তো হবে। তাই তাঁর নিজের ভাষায়, 'জীব দিয়েছেন যিনি সেই ঈশ্বরই প্রতিটি জীবের জীবনধারণের উপায়ও যোগান। জ্যোতির্বিদদের জীবনধারণের উপায় হিসেবে তিনি দিয়েছেন জ্যোতিষ।' জীবনের শেষ পর্বে টাইকো ব্রাহে সম্রাট দ্বিতীয় রুডল্‌ফ কর্তৃক প্রাগ-এ স্থাপিত এক উদ্ভট আল্‌কেমি-জ্যোতিষ প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হন; সেখানে তাঁর সহকারী রূপে কাজ করতে আসেন কেপলার। ষোড়শ শতাব্দীর পোল্যান্ড, ডেনমার্ক ও বোহেমিয়াতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে যেভাবে সরকারি সাহায্য দেওয়া হতো, তার থেকে বোঝা যায় সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের প্রান্তবর্তী এইসব দেশে নতুন এক অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটছিল।

প্রাগ-এ এসে কেপলার গ্রহসমূহের কক্ষপথকে একটিমাত্র বক্ররেখার সাহায্যে উপস্থাপন করার আপ্রাণ প্রয়াস করেন। কোপার্নিকাস নিজে বৃত্ত বা বৃত্তিকার (epicycle) ধারণাতেই অবিচল ছিলেন। এগুলো খুব অপরিচ্ছন্ন তো বটেই, উপরন্তু নবলব্ধ নিখুঁত পর্যবেক্ষণ-তথ্যের সঙ্গেও আর খাপ যাচ্ছিল না। বারংবার ব্যর্থ হবার পর কেপলার বুঝতে পারলেন, পর্যবেক্ষিত মঙ্গলগ্রহের চলনের ব্যাখ্যা একটাই—গ্রহটি আপন উপবৃত্তীয় (elliptic) কক্ষপথে সূর্যকে নাভি (focus) হিসেবে রেখে ঘুরে চলেছে। উপবৃত্তাকার কক্ষপথের ধারণাটি অবশ্য আনকোরা নতুন ছিল না। একাদশ শতাব্দীতে টলেডোর আর্জাচেল্‌ এর কথা বলেছিলেন। তবে তাঁর সংগৃহীত তথ্য ছিল নেহাৎই অপ্রতুল। কেপলার সফল হলেন এই কারণেই যে তাঁর হাতে যথেষ্ট পরিমাণ অকাট্য তথ্য ছিল; যে তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে বৃত্ত বা বৃত্তিকার সমাবেশ ঘটিয়ে গ্রহের কক্ষপথকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আরো অনেক অনেক পরে অবশ্য প্রমাণ হবে যে ঐ উপবৃত্তগুলোও আসলে নিখুঁত উপবৃত্ত নয়। আরো অনেক জটিল সেইসব বক্ররেখার সমস্যা সমাধান করবেন আইনস্টাইন।

উপবৃত্তাকার কক্ষপথের তত্ত্ব এবং অন্য দুটি সূত্রের ভিত্তিতে কেপলার কক্ষপথে পরিক্রমণরত গ্রহের গতির সার্থক ব্যাখ্যা দিলেন। এর ফলে কোপার্নিকাসের তত্ত্বের বিরুদ্ধে জ্যোতির্বিদরা মূল যে আপত্তি তুলতেন তা দূর হলো। শুধু তাই নয়, জ্যোতিষ্কসমূহ সর্বদাই নিখুঁত অর্থাৎ বৃত্তাকার পথে চলে, এই মর্মে পিথাগোরাস ও প্লেটোর যে ধারণা, যে ধারণাকে এমনকি কোপার্নিকাসও সমর্থন করেছিলেন, তা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তবে কেপলারের এই তত্ত্ব ছিল নিখাদ জোতির্বিজ্ঞানের গণনা থেকে উদ্ভূত। শুধু এরই জোরে মানুষের চিন্তাভাবনায় মহাবিপ্লব ঘটিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে একটা আমূল নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেওয়া সম্ভব ছিল না। অবশ্য পরে নিউটন যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক পরিমাণাত্মক ও গতিবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেন তখন এই এই গণনাগুলোই তাঁর পর্যবেক্ষণের ভিত্তি রচনা করে।

দূরবীক্ষণ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে গৃহীত হওয়ার মূলে যে পদক্ষেপটি চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করল, সেটি হচ্ছে দূরবীক্ষণের আবিষ্কার। বিশেষজ্ঞদের দুরূহ অঙ্ক নয়, এবার

এমন একটা বাস্তব, সহজলভ্য জিনিস মানুষের হাতে এল যা দিয়ে বহুদূর আকাশের সূর্যচন্দ্রনক্ষত্রকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব।

টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে বোধহয় ঠিক বিজ্ঞানের অবদান বলা চলে না। হল্যান্ডের চশমাশিল্পের উপজাত এই যন্ত্রটি যেন খানিকটা অগোচরেই বিজ্ঞানের আঙিনায় এসে পড়ে। কিংবদন্তী আছে, 1600 সাল নাগাদ একটি বাচ্চা ছেলে নাকি লিপার্শির দোকানে একটা লেন্সের মধ্যে দিয়ে জানলায় রাখা আরেকটি লেন্সের দিকে তাকায় এবং লক্ষ্য করে, বাইরের জিনিসগুলো অনেক বড়ো দেখাচ্ছে। দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের জন্য কোনো বৈজ্ঞানিক প্রতিভাধরের যে প্রয়োজন হয়নি, তা থেকেই বোঝা যায়, জিনিসটা অনেক আগেই আবিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এরকম একটা জিনিসের প্রয়োজন তো বরাবরই ছিল, কিন্তু এ নিয়ে কেউ কিছুই করেনি; কারণ সবারই ধারণা ছিল, এ ব্যাপারটা বাস্তবে সম্ভব নয়। অথচ দূরবীক্ষণ বানানোর মালমশলা অন্তত 300 বছর ধরে হাতের কাছেই মজুত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে লোকের হাতে টাকাপয়সা বেশি আসে, আর তারই ফলে চশমা তৈরির ব্যাপারটা অনেক বেড়ে যায়। এর পরিণতিতে নেহাৎ ঘটনাচক্রে তৈরি হয়ে যায় দূরবীক্ষণ।

গ্যালিলিও গ্যালিলেই

সে যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় এই দূরবীক্ষণ। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক এনজিনিয়ারিং ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক গ্যালিলিও গ্যালিলেই-এর (1564-1642) কানে এই আবিষ্কারের খবর পৌছনো মাত্র তিনি ঠিক করেন নিজে ঐরকম এক যন্ত্র বানাবেন। সেই যন্ত্র দিয়ে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আকাশের দিকে। গ্যালিলিও ইতিমধ্যেই কোপার্নিকাস-পন্থী হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়া পেন্ডুলামের দোলন এবং পতনশীল বস্তু সংক্রান্ত সমস্যা নিয়েও তিনি গভীরভাবে ভাবিত ছিলেন। এ হেন মানুষটি দূরবীণে চোখ লাগিয়ে প্রথম কয়েক রাত্তিরেই আকাশের যে চেহারা দেখতে পেলেন তা বিশ্বজগতের অ্যারিস্টটল-কথিত প্রশান্ত রূপটাকে ভেঙে তছনছ করে দিল। তিনি দেখতে পেলেন, চাঁদ মোটেই একটা নিটোল গোলক নয়, তার পৃষ্ঠে রয়েছে সমুদ্রগহ্বর আর পর্বত; শুক্রগ্রহেরও চাঁদের মতো কলা রয়েছে; আর শনিগ্রহটাকে মনে হলো তিন ভাগে বিভক্ত। সব চাইতে বড়ো কথা, তিনি দেখতে পেলেন বৃহস্পতিকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে তিনটি তারা বা চাঁদ—যেন কোপার্নিকাস-কথিত জগৎব্যবস্থারই একটি ছোটো প্রতিরূপ! দূরবীণে চোখ লাগলে যেকোনো লোকই তা দেখতে পাবে।

গ্যালিলিও প্রচারের মূল্য বুঝতেন। তাঁর এই আবিষ্কারের বাজারদরও তাঁর কাছে অজানা ছিল না। আবিষ্কারের যে বিশুদ্ধ আনন্দ তার সঙ্গে এসবের কোনো বিরোধ আছে বলে তিনি মনে করতেন না। সুতরাং অর্থের বিনিময়ে এইসব নবাবিষ্কৃত নক্ষত্রের নাম তিনি একে একে ফ্লরেন্সের ডিউক (যিনি ছিলেন মেদিচি-বংশীয়), ফ্রান্সের রাজা এবং পোপের কাছে বেচতে চাইলেন। কিন্তু যে টাকা তিনি চাইলেন তা এঁদের কাছে বড্ড বেশি বলে মনে হলো! পরে তিনি এর একটা ব্যবহারিক উপযোগিতার কথা উপলব্ধি করলেন। তিনি বুঝলেন, এইসব নক্ষত্রের চলনকে কাজে লাগিয়ে সমুদ্রে দ্রাঘিমাংশ মাপা যাবে। স্পেনের রাজা এবং হল্যান্ডের পার্লামেন্ট দ্রাঘিমাংশ মাপার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। গ্যালিলিও এঁদের কাছে তাঁর এই গোপন কৌশল বিক্রী করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু তবু কোনো খদ্দের জুটল না তাঁর!

তবে এসব তাঁর কাছে ছিল নেহাৎ ছেলেখেলা। তাঁর এইসব নতুন পর্যবেক্ষণের তাৎপর্য যে কতখানি বৈপ্লবিক, তা তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন। কোপার্নিকাস-কথিত জগৎব্যবস্থার একটা আস্ত মডেল যে একেবারে আকাশে সবার সামনেই বিরাজ করছে, এমন একটা খবর তো

চেপে রাখার জন্য নয়, প্রচার করে বেড়াবার জন্য। এক মাসের মধ্যে 1610 সালে বেরোলো তাঁর *Siderius Nuntis*—'তারকাজগতের দূত'। বেরোনো মাত্র হুড়হুড় করে বিক্রী হয়ে গেল এই বই। এতে খুব সরল ভাষায় সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন গ্যালিলিও। চারদিকে মস্ত আলোড়ন ফেলে দিলেও এই বই নিয়ে তখনই খুব প্রতিকূল কোনো প্রতিক্রিয়া জাগলনা। তাঁর সেই বিখ্যাত বিচার—সে তো চব্বিশ বছর পরের ঘটনা। 1618 সালে অবশ্য কোপার্নিকাসের তত্ত্ব সম্বন্ধে আংশিক ধিক্কার ঘোষণা করা হয়। তবু জ্যোতিষ্কসমূহের চলনের এক গাণিতিক রূপ হিসেবে তাকে মেনে নেওয়ার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করা হয়নি। গোঁড়া দুচারজন অ্যারিস্টটল-পন্থী অবশ্য দূরবীণে চোখ লাগাতে রাজি হলেন না। কারণ বিশুদ্ধ যুক্তি প্রয়োগ করেই তাঁরা নাকি জানতে পেরে গিয়েছিলেন আকাশের ছবিটা কেমন। যুক্তি আর পর্যবেক্ষণ—এ দুটোকে স্বতন্ত্র চর্চার বিষয় করে রাখতে পারলেই তো তাঁদের মতে মুশকিল আসান।

বস্তুর পতন : গতিবিজ্ঞান

নান্দনিক সুষ্ঠুতার নিরিখে কোপার্নিকাস যাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গ্যালিলিও তাকে অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করলেন। কিন্তু এটুকু করেই ক্ষান্ত হলেননা তিনি। তিনি এখন এই ব্যবস্থাটাকে যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করতে চইলেন; দেখাতে চাইলেন কেমন করে ঐরকম একটা ব্যবস্থার অস্তিত্ব বজায় থকে। অতীতে দার্শনিকদের এবং সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের তরফ থেকে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব আপত্তি উঠেছিল সেসবকে তিনি নির্মূল করতে চাইলেন। পৃথিবী যদি ঘুরতেই থাকে, তাহলে উল্টোমুখে বিরাট ঝড় উঠছেনা কেন; কেনই বা বাতাসে অভিক্ষিপ্ত বস্তু পেছনে পড়ে থাকছে না —এই সব ব্যাপারের ব্যাখ্যা দেওয়া জরুরি ছিল। এর উত্তর দিতে গেলে অবাধে চলনশীল বস্তু নিয়ে সনিষ্ঠ গবেষণা করা দরকার। তাছাড়া অভিক্ষিপ্ত গোলা ইত্যাদি তাগ করার ব্যাপারেও এই গবেষণা ব্যবহারিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

ততদিনে ফিলোপন'স্-এর অভিঘাত-তত্ত্ব আরবদের হাত ঘুরে পারি-র সংজ্ঞাবাদী দার্শনিকদের (Nominalists)* হাতে বিস্তৃততর রূপ ধারণ করেছে, এবং ক্রমশ স্বীকৃতিলাভ করছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, কামান থেকে নির্গত গোলা এমন এক অভিঘাত বা *vis viva* অর্জন করে যা কিনা তখনকার মতো তার স্বাভাবিক পতন-প্রবণতাকে বিনষ্ট করে। ষোড়শ শতকে তার্তালিয়া (Tartaglia, 1500-1557), বেনেদেত্তি (1530-90) প্রমুখ এই ব্যাখ্যাকে আরো প্রসারিত করেন। তাঁরা বললেন, সবেগে গোলাটির উত্থান আর তার স্বাভাবিক পতনের মধ্যে বৃত্তাকার মিশ্র চলন সংঘটিত হয়; যার ফলে গোলাটি একটি বিশেষ চলনপথ বেয়ে মাটিতে গিয়ে পড়ে। সেযুগের বিচারে মোটা-মুখ কামানের গোলার চলনপথের এই ব্যাখ্যা খুব নিন্দনীয় নয়। কিন্তু, এর কোনো ন্যায়শাস্ত্রসম্মত বা গাণিতিক যৌক্তিকতা ছিলনা।

পরীক্ষানির্ভর পদার্থবিদ্যা

অন্যেরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেইখানেই সফল হলেন গ্যালিলিও। বস্তুর চলনের এক গাণিতিক বর্ণনা দিতে সমর্থ হলেন তিনি। এটাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর জীবনের প্রধান কর্ম। দুই

* *Nominalism*—এক বিশেষ ধরনের মধ্যযুগীয় দর্শন। এই দর্শনের মূল কথা ছিল · স্বতন্ত্র ধর্মবিশিষ্ট স্বতন্ত্র বস্তু ছাড়া আর কিছুর বাস্তব অস্তিত্ব নেই। সামগ্রিক যেসব ধারণা আমাদের মনের মধ্যে গড়ে ওঠে তাদের বস্তুনিরপেক্ষ স্বাধীন কোনো অস্তিত্ব তো নেইই, উপরন্তু বস্তুসমূহের ধর্ম ও গুণ কিছুই সেইসব সামগ্রিক ধারণার মধ্যে প্রতিফলিত হয় না।— অনু·

প্রধান জগৎব্যবস্থা বিষয়ক কথোপকথন গ্রন্থেই তাঁর এই ধারণার আভাস ছিল, তবে *দুই নব্য বিজ্ঞানবিষয়ক কথোপকথন* গ্রন্থে তার পূর্ণ রূপটি প্রকাশিত হয়। তার আগেই তিনি চার্চের কর্তাদের দ্বারা নিগৃহীত হন। চার্চের সঙ্গে তাঁর গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয় পূর্বোল্লিখিত প্রথম বইটিকে ঘিরে। গ্যালিলিও যাবতীয় প্রচলিত ধারণাকেই যাচাই করতে শুরু করেন—এবং তা করেন পরীক্ষানির্ভর এক নতুন পদ্ধতির মানদণ্ডে। সত্যি সত্যিই তিনি পিসা'র মিনারের মাথা থেকে ভারি জিনিস মাটিতে ফেলেছিলেন কিনা, সেটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা এই যে বস্তুর পতনকে নিখুঁতভাবে পরিমাপ করবাব জন্য তিনি পেন্ডুলাম আর আনত তল ব্যবহার করেছিলেন।

এইগুলোকেই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম পরীক্ষানিরীক্ষা বলা যেতে পারে—সম্পূর্ণত না হলেও বহুলাংশে তো বটেই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও পরীক্ষানিরীক্ষা ঘটানো হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেগুলো ছিল মূলত প্রদর্শনমূলক। পক্ষান্তরে গ্যালিলিও-সংগঠিত এইসব পরীক্ষা ছিল অনুসন্ধানমূলক, এবং এদের চরিত্র ছিল পরিমাণাত্মক—সেগুলোকে গাণিতিক তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল। অবশ্য নিজের সংগঠিত এইসব পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পর্কে গ্যালিলিও'র মনোভাবটি ছিল দুই যুগের অন্তবর্তী পর্যায়েরই উপযোগী। একবার তিনি বলেছিলেন যে এসব পরীক্ষানিরীক্ষার লক্ষ্য হলো প্রত্যয় উৎপাদন করা—তবে অন্যদের মনে, তাঁর নিজের মনে নয়। নিছক যুক্তিবিচার প্রয়োগ করে প্রকৃতির ক্রিয়াকর্মকে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে তাঁর নিজের নৈপুণ্য সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিলনা। সেই অর্থে হয়তো বলা যেতে পারে যে তাঁর এই পরীক্ষাগুলোও মূলত প্রদর্শনাত্মকই ছিল। সে যাই হোক, ঘটনা এই যে তিনি সেই পরীক্ষাগুলো হাতেকলমে করেছিলেন। তার চেয়েও বড়ো কথা এই যে পরীক্ষায় কোনো অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেলে তাকে অস্বীকার করার বদলে তিনি বরং নিজের যুক্তিধারাটিকেই নতুন করে বিচার করতে বসতেন। পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞানের কুলচিহ্ন তো এইটাই—বাস্তব তথ্যকে মেনে নেওয়ার এই সবিনয় মনোভাব।

পতনশীল বস্তু সম্পর্কে গ্যালিলিও'র পরীক্ষাগুলো চালানো যত না কঠিন ছিল, দেখা গেল তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন কাজ সেগুলোর গাণিতিক ব্যাখ্যা দান। যে বস্তু ক্রমাগত গতি বদলাচ্ছে, কোনো একটা বিশেষ মুহূর্তে তার যে নির্দিষ্ট একটা গতি থাকবে—এই ধারণাটা সবার আগে পরিষ্কার করে বোঝা দরকার ছিল। বস্তুত, গোড়াতে গ্যালিলিও ভুল বুঝেছিলেন; তিনি ধরে নিয়েছিলেন, বস্তুর গতি বাড়ে অতিক্রান্ত দূরত্বের অনুপাতে। পরে অবশ্য তিনি সঠিকভাবেই বুঝলেন যে পতনশীল বস্তুর গতি বাড়ে পতনের কাল বা সময়ের অনুপাতে। বস্তুর পতনের ব্যাপারটা, আর সেই সঙ্গে বাতাসে কামান-গোলা কিংবা আকাশে চন্দ্রের চলনের ঘটনাগুলো অনুধাবন করতে গেলে সবার আগে একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে বস্তুর গতিবেগের অতি জটিল ভৌত ধারণাটি আয়ত্ত করা দরকার। এই ভৌত ধারণাটি differential বা dx/dt-রূপ গাণিতিক ধারণার অনুরূপ। dx/dt হচ্ছে পরিবর্তমান দুটি রাশির অনুপাত; রাশি দুটির মান কমতে কমতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হলেও অনুপাতটি থাকে অপরিবর্তিত। সুনির্দিষ্টভাবে সূত্রবদ্ধ না করলেও, এই ধারণাটিকেই কাজে লাগিয়েছিলেন গ্যালিলিও। নিখুঁতভাবে পরিমাপসাধ্য পরীক্ষানিরীক্ষার সঙ্গে গাণিতিক বিশ্লেষণের সংযোগ ঘটিয়ে তিনি বস্তুর পতনের অপেক্ষাকৃত সরল সমস্যাটির সার্থক সমাধান করলেন। তিনি দেখালেন বাতাসের বাধা না থাকলে বস্তুর পতনপথটি হবে অধিবৃত্তাকার (parabolic)। যে পদ্ধতিতে তিনি এই সমাধানে উপনীত হলেন, সেটাই ছিল আধুনিক পদার্থবিদ্যায় অনুসৃত পদ্ধতির প্রথম সুস্পষ্ট নিদর্শন। পরবর্তী শতাব্দীসমূহে এই পদ্ধতির অসামান্য সার্থকতার একের পর এক বিজয়তোরণ রচিত

হয়। বস্তুত, সম্পূর্ণ পরিমাপসাধ্য এই যে ভৌত পদ্ধতির প্রবর্তন করেন গ্যালিলিও, এই সেদিন পর্যন্ত সেটাই বিজ্ঞানের একেবারে বুনিয়াদী পদ্ধতি বলে গণ্য হতো।

গণিতের নবজাগরণ

গ্যালিলিও এবং কেপলারের এই সাফল্যের মূলে ছিল রেনেসাঁস যুগে নব-প্রস্ফুটিত *গণিতের* ওপর তাঁদের অসামান্য দখল। বীজগণিতের যাবতীয় যুক্তিপ্রয়োগকে *প্রতীকনির্ভর* করে তুলে ভিয়েতা (1540-1603) একটা মোক্ষম কাজ করেছিলেন। কেবল বীজগণিত নয়, ত্রিকোণমিতিতেও কী-জ্ঞাত কী-অজ্ঞাত উভয় রাশির জন্যই তিনি বর্ণ বা অক্ষর ব্যবহার করেন। এই একটা বিশুদ্ধ প্রকরণমূলক উদ্‌ভাবনের সাহায্যে তিনি গণনকার্যের গতি অভাবনীয়রকমে বাড়িয়ে দিলেন। কেননা, কথার সাহায্য নিলেই যেসব ভুলবোঝাবুঝি ঘটতে বাধ্য, সেসব থেকে এবার রেহাই পাওয়া গেল। ভিয়েতা, সেই সঙ্গে কার্দ্যাঁ (Cardan, 1501-76) ও তার্তালিয়ার কাজের সুবাদে বীজগণিতের পদ্ধতি এখন নানাক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা সম্ভব হলো। রাশিকে সংখ্যা দিয়ে বোঝানো গেলেই বীজগণিতের সাহায্যে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হলো। প্রাচীন গ্রীক জ্যামিতির মর্যাদা কিন্তু রয়েই গেল, বিশেষত আর্কিমিডিসের রচনাবলীর আবিষ্কারের পর। তার্তালিয়াই প্রথম সে রচনাবলী সম্পাদন করেন 1543 সালে। তা সত্ত্বেও স্পষ্টই দেখা গেল যে সংখ্যা-বিষয়ক গণনকার্যে বীজগণিতীয় পদ্ধতিই সহজতর।

1585 সালে দশমিক পদ্ধতির প্রবর্তন ক'রে সিমঁ স্তেভ্যাঁ (1548-1620) এবং 1614 সালে লগারিদ্‌ম পদ্ধতির প্রবর্তন করে নেপিয়ার (1550-1617) এ ব্যাপারে বিরাট বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। গণনকার্যের ভার হালকা হয়ে যাওয়ায় সক্রিয় জ্যোতির্বিদ আর পদার্থবিদের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে গেল।

গণিতের সঙ্গে বলবিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটাতে না পারলে গ্যালিলিও'র যুক্তিশৃঙ্খলটিকে সুসম্পূর্ণ রূপ দেওয়া যেত না। বিজ্ঞানচিন্তায় নিয়োজিত তাঁর জীবনের গোটা সময়টাই এ কাজে ব্যয়িত হয়েছিল। লিওনার্দোও বলবিজ্ঞান সম্পর্কে একটা পরিমাণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পথ হাতড়েছিলেন। সূক্ষ্মতর পরীক্ষানিরীক্ষা এবং অপেক্ষাকৃত প্রয়োগসিদ্ধ গণিতের সুবাদে গ্যালিলিও সেই দৃষ্টিভঙ্গিটিকে আয়ত্ত করে ফেললেন। তিনি হয়ে উঠলেন বিজ্ঞাননির্ভর এনজিনিয়ারিঙের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান বেলজিয়ামের অন্তর্গত ব্রুঝ (Bruges) শহরের সিমঁ স্তেভ্যাঁ, যাঁর কথা আমরা একটু আগেই বলেছি, ছিলেন এর অপর প্রতিষ্ঠাতা। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এই ব্যক্তি ছিলেন নব্য হল্যান্ডের প্রথম দিকপাল এনজিনিয়ার। বিভিন্ন বলের সমন্বয়-সূত্র প্রণয়ন এবং পরিমাণাত্মক জলবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনার জন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী।

স্থিতিবিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞান

ভরযুক্ত বস্তুর চলনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে গেলে বলসমূহকে প্রথমে সাম্যাবস্থায়, এবং পরে স্থিতিহীন বা গতিশীল অবস্থায় বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমটি *স্থিতিবিজ্ঞানের* (*statics*), দ্বিতীয়টি *গতিবিজ্ঞানের* (*dynamics*) আওতায় পড়ে। এরাই হলো গ্যালিলিও-কথিত 'দুই নব্য বিজ্ঞান'। এর মধ্যে দিয়ে গ্যালিলিও কেবল যে গতিসূত্রসমূহের ভিত্তি রচনা করলেন তাই নয়, পদার্থের দৃঢ়তা-সংক্রান্ত গাণিতিক তত্ত্বেরও বনেদ গড়ে দিলেন। এই দ্বিতীয় কাজটি তিনি করেন ওস্তাদ জাহাজ-সারাইকারীদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে।

গ্যালিলিও'র আগে আর কেউ এত স্পষ্ট করে বলেননি যে ব্যাপ্তিগুণ (extension), অবস্থান আর ঘনত্ব—এই তিনটিই হচ্ছে বস্তুর অপরিহার্য এবং নিজস্ব ধর্ম; কেবল এই তিনটি ধর্ম নিয়েই গাণিতিক বিচার সম্ভব। তার অর্থ এই যে কেবল এই তিনটি সম্বন্ধেই সুনির্দিষ্টভাবে

বিচার করা সম্ভব। বস্তুর মধ্যে বাকি যেসব ধর্ম পরিলক্ষিত হয়, যথা 'স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ—এসবই নিছক নাম বই আর কিছু নয়। এগুলির অস্তিত্ব থকে ইন্দ্রিয়-সংবেদী দেহে।' নব্য বিজ্ঞানের প্রবক্তারা এই বক্তব্যকে এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা বলে গণ্য করেননি। বরং তাঁরা এর মধ্যে খুঁজে পেলেন যাবতীয় পরীক্ষানিরীক্ষাকে বস্তুর মৌলিক ধর্মের অনুসন্ধানে নিয়োজিত করার এক কর্মসূচী। বস্তুর মৌলিক ধর্ম বলতে বোঝাল 'আকার, আকৃতি, পরিমাণ ও গতি'।

প্রাচীন মহাবিশ্ব-তত্ত্বের পতন

গণিত আর বলবিজ্ঞানের সমন্বয়ে উদ্ভূত এই নব্য বিজ্ঞানের স্বীকৃতি আদায় করার জন্য সবার আগে গ্যালিলিওকে টলেমির জ্যোতিষ্ক-তত্ত্বকে সিংহাসনচ্যুত করতে হলো। গ্যালিলিও ভালো করেই জানতেন যে তার অর্থ হলো খোদ অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের ভিতটা ধসিয়ে দেওয়া। পূর্ববর্তী দু হাজার বছর ধরে ঐ দর্শনই তো প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞানের—শুধু প্রকৃতি কেন সমাজ-বিষয়ক বিজ্ঞানেরও—বনেদ রচনা করে রেখেছিল। এ কাজের জন্য গ্যালিলিওই ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য। কেননা পাদুয়াতে অ্যারিস্টটলীয় দর্শনচর্চার সর্বোত্তম রূপটির সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অ্যারিস্টটলীয় দর্শন-পরিমণ্ডলের ভেতরকার লোক। গুরুর শেখানো বিদ্যা প্রয়োগ করেই গুরুর যুক্তি খণ্ডনে তিনি সমর্থ ছিলেন। ফলে পণ্ডিতেরা তাঁর যুক্তি স্বীকার করুন আর নাই করুন, তাঁদের পক্ষে সে-যুক্তি অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। বস্তুতপক্ষে তাঁর সব রচনাই তো কোনো না কোনোভাবে অ্যারিস্টটলীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তবে সে প্রতিবাদ প্রথম সুস্পষ্ট এবং বিস্ফোরক রূপ লাভ করে 1632-এ প্রকাশিত তাঁর বিতর্কাশ্রয়ী গ্রন্থ *টলেমীয় এবং কোপার্নিকীয়—এই দুই প্রধান জগৎব্যবস্থা বিষয়ক কথোপকথন*-এ। বইটি তিনি উৎসর্গ করেন পোপকে। পণ্ডিতি লাতিনে নয়, সর্বজনবোধ্য ইতালীয় ভাষায় রচিত এই গ্রন্থে তিনি এই চরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে স্বীকৃত ধারণাগুলোকে নির্মমভাবে তুলোধোনা করলেন, বিদ্রূপে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লেন। এই গ্রন্থটিই নব্য বিজ্ঞানের প্রথম সুমহান ঘোষণাপত্র।

গ্যালিলিওর বিচার

এত বড়ো এক চ্যালেঞ্জকে তো আর অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। তাই এরই পরিণামে ঘটল গ্যালিলিও'র সেই বিখ্যাত বিচার। বিজ্ঞানীদের মহলে এবং চার্চের মহলে ইতিমধ্যেই যথেষ্টসংখ্যক শত্রু সংগ্রহ করে ফেলেছিলেন গ্যালিলিও। তার ওপর এই *কথোপকথন* প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর শত্রুরা দ্বিগুণ উদ্যমে বিষোদ্‌গার করতে শুরু করে দিল। পৃথিবী আর গ্রহসমূহের চলনের মতো এমন একটা নিখাদ তাত্ত্বিক ব্যাপারকে ঘিরে সেদিন এমন ভয়ানক সংঘাত জেগে উঠেছিল কেন, সেটা আজকের দিনে বোঝা শক্ত। আসলে সেদিন অনেক কিছুরই ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল ঐ তত্ত্ব। পূর্ববর্তী বহু শতক ধরে, বহু তীব্র তর্কবিতর্কের মধ্যে দিয়ে, বহু বুদ্ধিগত কসরৎ করে খ্রিস্টানদের সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের একটা সমঝোতা বানিয়ে তোলা হয়েছিল। রিফর্মেশন আন্দোলনের সময়ে মতবাদ নিয়ে অত ঝগড়াঝাঁটি হওয়া সত্ত্বেও সে-সমঝোতা নাড়া খায়নি। কিন্তু, ব্রহ্মাণ্ডের গঠনের মতো এমন একটা কেন্দ্রীয় ব্যাপার সম্পর্কে এবার গ্যালিলিও যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন, তাকে যদি হজম করে নিতে হয়, তাহলে না জানি আরো কত কিছুর ওপর আঘাত আসবে, এই আশঙ্কা দেখা দিল। কেননা, এরই মধ্যে উদগ্র কোপার্নিকাস-পন্থীরা কেউ কেউ—যেমন ব্রুনো আর কাম্পানেলা (1568-1639)—নব্য জ্ঞানভাণ্ডার থেকে এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিলেন যা চার্চের, সরকারের, সাধারণ মানুষের নৈতিকতার, এমনকি সম্পত্তির স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করে তুলেছিল। ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা

হয়েছিল, কাম্পানেলাকে বহু বছর কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু গ্যালিলিও'র ক্ষেত্রে তো তা সম্ভব নয়। কারণ, বৈজ্ঞানিক মহলে গ্যালিলিওর প্রতিপত্তি ছিল; তাছাড়া ক্যাথলিক ধর্মে তাঁর বিশ্বাস নিয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না। আর, একমাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বাদ দিলে, তিনি কোনোমতেই বিপ্লবী ছিলেন না।

গ্যালিলিওকে বিচার করা হলো চার্চেরই নিজস্ব ধ্যানধারণা ও যুক্তিধারা অনুসারে, গ্যালিলিও'র ভাবনা অনুসারে নয়। কাজেই বিচারের ফলাফল যে কী হবে তা জানাই ছিল। কৌতূহলের ব্যাপার এইটুকুই যে বিচারের সাক্ষ্যপ্রমাণাদি প্রকাশ করা হলো না। কারণ সম্ভবত এই যে সেগুলো প্রকাশ পেলে বিচারকদের কঠোরতার বদলে নরম মনোভাবের ব্যাপারটাই জানাজানি হয়ে যাওয়ার বিপদ ছিল! পোপ এবং তাঁর অধীন প্রশাসকদের আসল আশঙ্কা ছিল চার্চের কট্টর ধর্মোন্মত্ত লোকেদের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তাই নিয়ে; বিজ্ঞানীদের প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা নিয়ে তাঁদের আশঙ্কা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। গ্যালিলিও বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন,* এবং তাঁর সেই বিখ্যাত প্রত্যাহার-বাক্য উচ্চারণ করেন। তবে তাঁকে নামমাত্র সাজা দেওয়া হয়; এক বন্ধুর প্রাসাদে অন্তরীণ হয়ে থাকতে হয় তাঁকে। এই অবসরকালেই তিনি গতিবিজ্ঞান ও স্থিতিবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থটি শেষ করেন—যা তাঁর জীবনের শেষ পর্বে প্রকাশিত হয়।

তবে এই বিচার ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ বিজ্ঞান আর ধর্মীয় আপ্তবাক্যের নাটকীয় সংঘাত চমকপ্রদ রূপে প্রকাশ পায় ঐ বিচারের মধ্যে। কার্যত এই বিচার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কারণ বিদ্বজ্জনেরা প্রায় সকলেই এই রায় সম্বন্ধে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন—এমনকি ক্যাথলিক দেশসমূহেও। ফলে, পরীক্ষানির্ভর বৈপ্লবিক নব্য বিজ্ঞানের মর্যাদা তুঙ্গে উঠে গেল, বিশেষত সেইসব দেশে যেখানে রোমের কর্তৃত্ব ইতিমধ্যেই অবসিত হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন মহাবিশ্ব-তত্ত্বের ওপর আঘাত হানার প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত রূপ পায় গ্যালিলিও'র কীর্তিতে। সেই সময় থেকে ঐ তত্ত্বকে নীরবে বিসর্জন দেওয়া হলো। ব্যবহারিক জ্যোতির্বিদরা সৌরজগতের কোপার্নিকাস-কেপলার প্রদত্ত মডেলটিকে স্বীকার করে নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কেপলার যে সূত্রগুলি আবিষ্কার করেছিলেন, তাকে গ্যালিলিও-ব্যাখ্যাত বলবিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে আরো চল্লিশ বছর পরে রচিত হবে নিউটনের অভিকর্ষ-তত্ত্ব।

নিউটনের ঐ তত্ত্বীয় সংশ্লেষণের কাজে আরো একটা ভৌত সূত্র খুব সহায়ক হয়েছিল। সেটি হলো চুম্বক-ক্রিয়া সংক্রান্ত পরীক্ষানির্ভর গবেষণা। 1600 সালে রাণী এলিজাবেথের ডাক্তার উইলিয়াম গিলবার্ট তাঁর *De Magnete* গ্রন্থ প্রকাশ করে বিশ্বকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন। সুসমভাবে স্থাপিত চুম্বকশলাকার আনতি (dip) সংক্রান্ত পরীক্ষানির্ভর আবিষ্কারের ভিত্তিতে ঐ গ্রন্থটি রচিত হয়। এর আগে হার্টম্যান (1489-1564) 1544 সালে এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিলেন। রবার্ট নর্মান ব্যাপারটাকে বিস্তৃতভাবে অনুধাবন করেছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যা এবং অভিজাত বংশপরিচয়ের প্রসাদবঞ্চিত প্রথম বিজ্ঞানীদের অন্যতম এই মানুষটি ছিলেন নাবিক এবং কম্পাস নির্মাতা। *The Newe Attractive* (1581) গ্রন্থের মুখবন্ধে নর্মান যা লেখেন তা থেকে বোঝা যায়, তিনি নিজ অধিকার সম্পর্কে কত সচেতন ছিলেন : 'পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বলিতে পারেন যে এই প্রসঙ্গে একজন কারিগর বা নাবিকের কোনো কথা বলিবার অধিকার নাই। যেমন দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের প্রসঙ্গেও তাহার সে অধিকার নাই। কেননা এইসকল ব্যাপার

অতি সূক্ষ্ম জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কন ও গণিতীয় হিসাবের মুখাপেক্ষী।… কিন্তু দেশে অনেকানেক কারিগর রহিয়াছেন যাঁহারা বিভিন্ন কর্মে ও পেশায় নিযুক্ত; তাঁহারা এবম্বিধ কর্মে নিরতিশয় পটু। যে সকল ব্যক্তি ইঁহাদের হীনচক্ষে দেখেন তাঁহাদের অপেক্ষা সমধিক দক্ষতায় ইঁহারা ফলপ্রদরূপে আপনাপন বিদ্যা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে সক্ষম।'

এ থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে নব্য কারিগরেরা প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের সামনে সাহসভরে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। গেবিয়েল হার্ভের (1545-1630) বিতর্ক-রচনাতেও এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এক দড়ি-প্রস্তুতকারকের পুত্র গেব্রিয়েল ছিলেন বিখ্যাত কবি এড্‌মন্ড স্পেন্সারের বন্ধু। সাহিত্যের অঙ্গনেও গেব্রিয়েল এই একই অধিকার দাবি করেছিলেন। এবং অচিরেই তাঁর আন্দোলন সার্থক হয়েছিল জনৈক দস্তানা-প্রস্তুতকারকের পুত্র উইলিয়াম শেক্‌সপীয়রের আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে।

তবে এই কারিগর-বিজ্ঞানীরা যতদিন পর্যন্ত স্বয়ম্ভর না হচ্ছেন, ততদিন যুগসঞ্চিত প্রাচীন জ্ঞান তাঁদের মধ্যে সঞ্চার করার কাজটি সম্পন্ন করার জন্য পুরোনো পণ্ডিতদের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া ধনবান ও ক্ষমতাবান মহলে পন্ডিতদের যোগাযোগ থাকায় নব্য বিজ্ঞানের পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি ও সহায়তা আদায় করার কাজেও তাঁদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত দুটি কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন গিলবার্ট। তাঁর *De Magnete* গ্রন্থটি লাতিনে লেখা হলেও তাতে প্রাচীন দার্শনিকদের অন্ধতা সম্বন্ধে যেসব কড়া কড়া মন্তব্য ছিল তা নর্মান বা গেব্রিয়েল হার্ভের মতো লেখকদের ঝাঁঝালো ইংরেজি কটুবাক্যের সঙ্গেই তুলনীয়। কিন্তু হলে হবে কী, গিলবার্ট তাঁর রচনাকে এমন দুর্ভেদ্য পণ্ডিতিয়ানায় মুড়ে পেশ করেছিলেন যে তাকে স্বীকৃতি না দিয়ে তামাম বিদ্বৎমণ্ডলীর কোনো উপায় ছিল না। নর্মানেব বইটি অবশ্য নিঃসন্দেহে নাবিকদের এবং কম্পাস-নির্মাতাদের পক্ষে ঢের বেশি উপযোগী ছিল।

De Magnete নিজগুণেই এক অসামান্য গ্রন্থ। নব্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি হিসেবেও তার গুরুত্ব সমধিক। কেবল পরীক্ষানিরীক্ষাব গন্ডির মধ্যেই নিজেকে সংবৃত না রেখে গিলবার্ট তা থেকে নতুন নতুন ধারণা আহরণ করেন। তাঁর যে ধাবণাটি সেযুগের কল্পনাকে সবচেয়ে বেশি করে নাড়া দিয়েছিল সেটা হলো : গ্রহগুলিকে নিজ নিজ কক্ষপথে ধরে রাখার মূলে যে-আকর্ষণশক্তি সক্রিয় তা চৌম্বক গুণসম্পন্ন। বিশ্বজগতের বিন্যাসব্যবস্থা সম্বন্ধে এই প্রথম একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল যা ভৌত বিচারে যুক্তিগ্রাহ্য এবং যা অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই ধারণাটাকে পরে নিউটন কাজে লাগিয়েছিলেন। যেসব 'বস্তুবাদী' বিজ্ঞানী মনে করতেন, একাধিক বস্তুর সংঘর্ষেই কেবল বল উৎপন্ন হয়, তাঁদের যুক্তি খণ্ডনের কাজে গিলবার্টের এই ধারণাটি নিউটনের সহায়ক হয়েছিল।

মানবশরীরের কর্মপ্রক্রিয়া

এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে নব্য মতবাদের আক্রমণে পুরাতনের এই পরাজয় কেবল সুদূর আকাশে আর মাটিপাথরের ক্ষেত্রেই ঘটছিল। একইরকম সাফল্যের সঙ্গে আঘাত হানা হচ্ছিল অন্তর্বিশ্বেও—অর্থাৎ মানুষের শারীরক্ষেত্রেও। পুরোনো অ্যারিস্টটলীয় বিশ্বছবিটি মূলত পৃথিবী আর মানুষকে কেন্দ্র করেই আঁকা হয়েছিল। সে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে ছিল মানুষ। গ্রহাদি থেকে উৎসারিত নানারকম সূক্ষ্ম প্রভাব-তরঙ্গ এবং সূক্ষ্মসত্তার মাধ্যমে মানুষ সে মহাবিশ্বের প্রতিটি অংশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। মানুষ নিজেই ছিল এক ক্ষুদ্র বিশ্ব—এক 'অণুবিশ্ব'। এহেন মানবদেহ কীভাবে কাজ করে তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছিলেন একের পর এক গ্রীক ডাক্তার, যাঁদের কুলচূড়ামণি হিসেবে অবশেষে আবির্ভূত হন গ্যালেন। টলেমির মহাকাশ-বর্ণনার

মতোই আপ্ত-মর্যাদা লাভ করেছিল মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের গ্যালেন-প্রদত্ত বর্ণনা। রেনেসাঁস যুগের নব্য শারীরস্থানবিদ্যা (anatomy), বিশেষত ভেসালিয়াসের কাজ, প্রমাণ করে দিয়েছিল যে গ্যালেন-অঙ্কিত ছবিটি ভুল। কিন্তু এর বিকল্প ব্যাখ্যাটি খুঁজে পাওয়ার জন্য একটা সম্পূর্ণ নতুন ভাবনার প্রয়োজন ছিল—এমন এক ভাবনা যার মধ্যে একদিকে শারীরস্থানবিদ্যা, অন্যদিকে রেনেসাঁস যুগে উদ্ভূত যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে নবজাগ্রত আগ্রহের মেলবন্ধন ঘটবে এবং হাপর, পাম্প, কপাটিকা (valve) ইত্যাদির ক্রিয়া থেকে আহরিত ধারণার প্রয়োগে নতুন এক পরীক্ষানির্ভর শারীরতত্ত্বের (physiology) উদ্ভব ঘটবে।

উইলিয়াম হার্ভে : রক্ত সংবহন

সেই কর্মটিই সম্পাদন করলেন উইলিয়াম হার্ভে (1587-1657)। এই অভিজাত ইংরেজ বিজ্ঞানী শিক্ষালাভ করেছিলেন পাদুয়াতে। ফলে শারীরস্থানবিদ্যার ইতালীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞান সম্পর্কে নবজাগ্রত আগ্রহের মিলন ঘটানো তাঁর পক্ষে সুসাধ্য হয়েছিল; কারণ ইংলন্ডে তখন পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটেছে। শরীরে রক্ত চলাচলের একটা বলবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। 1628 সালে প্রকাশিত তাঁর *Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus* গ্রন্থটি এক নতুন ধরনের শারীরস্থানবিদ্যা ও শারীরতত্ত্বের দলিল। নিছক দেহব্যবচ্ছেদ ও তার বিবরণ নয়, এই গ্রন্থ এক সক্রিয় অনুসন্ধানকার্যের দলিল। জলবৈজ্ঞানিক (hydraulic) এনজিনিয়ারিঙের ফলিত পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত গবেষণা এই গ্রন্থের উপজীব্য। হার্ভের কাজটি বড়োই কঠিন ছিল। কোপার্নিকাস-প্রণীত তত্ত্বের সপক্ষে চাক্ষুষ সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ ক'রে গ্যালিলিও সে তত্ত্বকে সত্য বলে প্রমাণ করেছিলেন। হার্ভের সপক্ষে কিন্তু অনুরূপ কোনো চাক্ষুষ সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল না। রক্ত যে 'চলাচল' করে, যুক্তি দিয়ে সেটা প্রমাণ করায় তাঁর কোনো অসুবিধে ছিল না; কারণ শরীরের পক্ষে যে পরিমাণ রক্ত ধারণ করা সম্ভব তার থেকে ঢের বেশি পরিমাণ রক্ত শরীরে থাকার ব্যাখ্যাটি এই যে একই পরিমাণ রক্ত বারবার হৃৎপিণ্ডের একদিক থেকে বেরিয়ে অন্যদিকে ফিরে আসছে। কিন্তু, মুশকিল হচ্ছে, সেটা *চাক্ষুষ করা* তখন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। চুলের মতো সূক্ষ্ম যেসব কৈশিক রক্তবাহ (capillary vessels) বেয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়, পরে সেগুলি দেখান মাল্‌পিগি (Malpighi, 1624-94)। ততদিনে 'অণুবীক্ষণ' নামক আরেকটি দর্শন-যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে গেছে (বলা বাহুল্য , 'অপর' দর্শন-যন্ত্রটি হলো দূরবীক্ষণ)।

গ্যালিলিও এবং কেপলারের আবিষ্কার প্লেটো-অ্যারিস্টটল অনুসারী জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। পরীক্ষানির্ভর নিশ্ছিদ্র যুক্তির মাধ্যমে হার্ভে যে আবিষ্কারটি ঘটালেন, তা প্রাচীন ও গ্যালেনীয় শারীরতত্ত্বের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিপ্লবই ঘটাল। তিনি দেখালেন, শরীরকে একটা জলবিজ্ঞান-সম্মত যন্ত্র বলে ধরা যেতে পারে; যেসব রহস্যময় আত্মা শরীরে অধিষ্ঠান করে বলে মনে করা হতো,আসলে তাদের কোনো স্থান নেই শরীরে। তাঁর নিজের চিন্তাভাবনার সঙ্গে অবশ্য গ্যালিলিও অপেক্ষা কোপার্নিকাস বা কেপলারেরই মিল ছিল বেশি। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠনবিন্যাসের সঙ্গে শরীরের গঠনবিন্যাসের সাদৃশ্যে বিশেষভাবে বিশ্বাস করতেন। যেমন, তিনি লিখছেন : 'সুতরাং হৃৎপিণ্ডেই জীবনের সূত্রপাত। হৃৎপিণ্ডই এই অণুবিশ্বের সূর্য। ঠিক যেমন, সূর্যকেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হৃৎপিণ্ড বলা যাইতে পারে। তাহারই প্রসাদে, তাহারই স্পন্দনে বিশ্বশরীরের রক্ত সচল থাকে, শুদ্ধ থাকে, জীবনময় থাকে; নষ্ট হইয়া যায় না, শুকাইয়া যায় না। সমগ্র শরীরে এই অতিপরিচিত গৃহদেবতাটি তাঁহার কর্তব্য করিয়া চলেন; পুষ্টি যোগান, লালন করেন, জীবনকে সচল রাখেন। তিনিই প্রাণের ভিত্তি রচনা করেন, তিনিই সমস্ত কিছুর

স্রষ্টা।' স্পষ্টতই, মহাবিশ্বের কেন্দ্রে সূর্যের যে রাজতুল্য অবস্থান, শরীরের মধ্যে হৃৎপিণ্ডকে তিনি সেই একই আসনে স্থাপন করেছেন। হার্ভে রক্ত সংবহন-প্রক্রিয়ার যে অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দেন তার ফলে এই ধারণাটি প্রবল হয়ে ওঠে যে জীব হচ্ছে এক ধরনের মেশিন। পরে অবশ্য আমরা জেনেছি, এই মেশিনটি যে কত বেশি জটিল তা ষোলো কিংবা সতেরো শতকের মানুষের কল্পনারও অতীত ছিল।

তবে চিকিৎসাক্ষেত্রে হার্ভের এই আবিষ্কারের তেমন কোনো তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়েনি। রক্ত বার হয়ে যাবার ফলে মানুষের যে মৃত্যু ঘটে তা রোধ করার উদ্দেশ্যে পারে প্রমুখ শল্যবিদ যেসব পদ্ধতি ইতিমধ্যেই প্রয়োগ করছিলেন, তাকে অবশ্য যুক্তিসংগত বলে প্রমাণ করল এ আবিষ্কার। কিন্তু এ তত্ত্বের আসল গুরুত্ব এই যে যুক্তিশাসিত শারীরতত্ত্বের সত্যিকারের একটা শক্তপোক্ত বনেদ তৈরি হয়ে গেল এর মাধ্যমে। এ আবিষ্কার ছাড়া যুক্তিশাসিত শারীরতত্ত্বের উদ্ভব সম্ভবই ছিল না। হার্ভের গবেষণা থেকে সপ্রাণ জীব সম্পর্কে যে ছবিটা ধীরে ধীরে গড়ে উঠল সেটা এইরকম : 'জলসেচিত ক্ষেত্রে'র মতো একগুচ্ছ অঙ্গের মধ্যে দিয়ে রক্ত সংবাহিত হচ্ছে, আর তারই ফলে রসায়নিক উপায়ে প্রতিটি অঙ্গ পুষ্টিলাভ করছে এবং বাকি অঙ্গসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।

রসায়ন

এই উপলব্ধিতে পৌঁছতে অবশ্য সময় লেগেছিল। কারণ, 1540 থেকে 1640—এই একশো বছরে রসায়ন খুব একটা এগোয়নি। প্রথম শ্রেণীর মেধা নিয়ে মাত্র একজন মানুষই এই পর্বে রসায়ন নিয়ে চর্চা করেছিলেন। তিনি হলেন ভান হেল্‌মন্ট (1577-1644)। চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এই অভিজাত মানুষটি ছিলেন প্যারাসেল্‌সসের অনুগামী। প্যারাসেল্‌সসের মতো অত বড়ো বড়ো কথা না বললেও, তাঁর রহস্যবাদী অতীন্দ্রিয় ধারণাগুলিকে ভান হেল্‌মন্ট গ্রহণ করেছিলেন। ভান হেল্‌মন্টের নিজের রসায়নিক ধারণাগুলি সুপ্রাচীন আয়োনীয় দার্শনিকদের কাছ থেকে আহরিত হয়েছিল। কেবল বায়ু আর জলকেই তিনি মৌল পদার্থ বলে মানতেন। তবে তাঁর এই ধারণাটি শুধু এক দার্শনিক তত্ত্বপ্রকল্প (hypothesis) ছিল না, এটি ছিল তাঁর পরীক্ষানির্ভর সিদ্ধান্ত : একটা পাত্রে শুধু জল রেখে তার মধ্যে একটি বীজ থেকে উইলো চারা জন্মিয়েছিলেন তিনি। গ্যাস (বা 'chaos') নিয়ে প্রথম চর্চা তিনিই করেন, এর নামকরণও করেন। পরবর্তীকালে রসায়নের যে জয়স্তম্ভ রচিত হবে তার সূত্রপাত এইভাবেই হয়। কিন্তু এটুকু বাদ দিলে সে যুগে রসায়ন অতি ধীরগতিতে একটু একটু করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার কাজেই নিয়োজিত ছিল। পরিমাপের ক্ষেত্রে আরো সূক্ষ্মতা আসছিল, অনেক ব্যাপক মাত্রায় রসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটছিল, বিশেষত সুরাকরণের কাজে। কিন্তু এর বেশি কিছু অগ্রগতি ঘটেনি।

6. নব্য দর্শন : বেকন ও দেকার্ত্

1642 সালে গ্যালিলিও'র মৃত্যু এবং নিউটনের জন্ম হয়। গ্রহসমূহের আবর্তন এবং রক্তের সংবহন—এই দুটি মহৎ এবং কষ্টার্জিত আবিষ্কার ততদিনে পাকাপাকিভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের প্রথম মননগত অভীষ্টটি সিদ্ধ হয়ে গেছে; প্রাচীন ধ্রুপদী বিশ্বছবিটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার বদলে নতুন যে বিশ্বছবিটি আঁকতে হবে তার কেবল রূপরেখাটুকুরই আভাস মিলেছিল সে সময়ে। সে আভাস রচনা করতে গিয়ে প্রকৃতিকে অনুধাবন ও আয়ত্ত করার নতুন নতুন উপায়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সাধারণ

ব্যবহারিক প্রয়োজনের উপযোগী বিশেষ কিছুই তখনো গড়ে ওঠেনি : দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে তো ঠিক বৈজ্ঞানিক উদভাবন বলা চলে না, ওটা ছিল প্রকৌশলগত এক উদভাবন। চিন্তাক্ষেত্রের এই বিপ্লবের ফলাফল কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার আগে নব্য বিজ্ঞানের সম্ভাবনা কতটা সেটা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার ছিল। কেবল পণ্ডিতমহলই নয়, উদ্যোগী মানুষদের যে নতুন শ্রেণীটি তখন নিজেদের রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটনে নিয়োজিত, সেইসব বণিক, নৌ-অভিযাত্রী, ম্যানুফাক্‌চারার, রাষ্ট্রনেতা, আদিযুগের সেইসব প্রগতিবাদী পুঁজিপতি—সকলেরই এ ব্যাপারটা আগে ভালো করে খতিয়ে দেখার দরকার ছিল। গ্যালিলিও এ কাজটা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এমন এক দেশে বাস করতেন যার প্রাণশক্তি ততদিনে স্তিমিত, রিফর্মেশনবিরোধী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াশীলতা তাকে গ্রাস করতে শুরু করেছে।

ভবিষ্যৎদ্রষ্টা : বেকন ও দেকার্ত

ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অসংস্কৃত কিন্তু ঢের বেশি কর্মচঞ্চল দেশগুলো থেকে দুজন মানুষ এগিয়ে এলেন এই কর্মভার সম্পন্ন করার জন্য। এঁরা হলেন বেকন ও দেকার্ত্। মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান থেকে আধুনিক বিজ্ঞানে উত্তরণের পথে বাঁক ফেরার সন্ধিলগ্নে এঁদের আবির্ভাব। এঁরা দুজনেই ছিলেন আগামী যুগের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং বার্তাবহ। জ্ঞান আহরণের সম্ভাবনা নিয়ে এঁদের দুজনেরই ছিল বিশেষ পরাদর্শন। সেই দর্শনটিকে জনসমাজে প্রচার করাটাকে তাঁরা তাঁদের ব্রত বলে মনে করতেন। এই দুটি পরাদর্শনেরই ব্যাপ্তি ছিল বিশ্বজনীন—যদিও জ্ঞান আহরণ সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আলাদা। স্বভাবের দিক থেকেও এই দুটি মানুষের মধ্যে কোনো মিল ছিল না। চতুর এবং স্বার্থসন্ধানী বেকন পরের দিকে এক বাগাড়ম্বরপ্রিয় উকিল হিসেবে নিজের পরিচয় তুলে ধরেন। সর্বদাই তিনি চারপাশের ঘটনাবর্তের একেবারে কেন্দ্রে বিরাজ করতেন। আর ধনী এবং প্রাক্তন সৈনিক দেকার্ত্ ছিলেন নিতান্তই অন্তর্মুখী ভাবনাপ্রবণ নিঃসঙ্গ এক মানুষ। উভয়ের মধ্যেই নিজ নিজ দেশের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের বিশেষ চরিত্রের স্পষ্ট ছায়াপাত লক্ষণীয়।

বেকন এই নতুন আন্দোলনের মূলগত ব্যবহারিক চরিত্রটির ওপর এবং বিভিন্ন ব্যবহারিক কৌশলের উন্নতিসাধনের কাজে এর প্রয়োগ ঘটানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। চারপাশের বাস্তব দুনিয়াটাকে সহজ কাণ্ডজ্ঞানের নিরিখে বুঝে নেওয়ার কাজে এই নতুন আন্দোলনের ভূমিকাটির ওপর জোর দিয়েছিলেন তিনি। এলিজাবেথীয় ও জ্যাকোবিয়ান ইংলন্ডে রাজসভার পুরোনো চিন্তাভাবনার অনড় অচলায়তনটা তখন খুব একটা বড়ো সমস্যা ছিল না; আসল সমস্যাটা ছিল এই যে সেখানে নব্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য এক দর্শনের কোনো শক্ত প্রাতিষ্ঠানিক বনেদ ছিল না। এই বনেদ রচনার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন বেকন। কেবল পুরোনো ধ্যানধারণার অবসান ঘটানোর জন্যই যে এর প্রয়োজন ছিল তা নয়; রিফর্মেশন আন্দোলন ইংলন্ডে নানারকম দূরকল্পনার যে বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্ম দিয়েছিল তাকে সুশৃঙ্খল রূপ দেওয়ার জন্যও এর প্রয়োজন ছিল। পক্ষান্তরে ফ্রান্সে তখন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসর জাঁকিয়ে বসেছিল মধ্যযুগীয় চিন্তাপ্রণালী। দেকার্ত্‌কে তারই বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। এ লড়াইয়ে জেতবার জন্য তিনি ব্যবহার করেছিলেন অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন এক যুক্তিপ্রণালীর অস্ত্র, যা মধ্যযুগীয় চিন্তাপ্রণালীর তুলনায় অনেক বেশি জোরালো।

Novum Organum এবং Discours de la Méthode

দুজনেই 'পদ্ধতি' ব্যাপারটা নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছিলেন। যদিও, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি কোনটা, তা নিয়ে এঁদের চিন্তাভাবনায় দুস্তর ফারাক ছিল। তথ্য সংগ্রহ করে, ব্যাপকমাত্রায়

পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে, সঞ্চিত বিপুলসংখ্যক তথ্যপ্রমাণ থেকে ফলাফল নির্ণয় করার পদ্ধতিতে, অর্থাৎ মূলত *আরোহী (inductive)* পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন বেকন। আর দেকার্ত্ বিশ্বাস করতেন বিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির বা স্বজ্ঞার (intution) অমিতশক্তিতে। তাঁর মতে, চিন্তাভাবনা যদি পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহলে বাস্তবে জ্ঞাতব্য যেকোনো বিষয়কেই জানা সম্ভব। তাঁর কাছে পরীক্ষানিরীক্ষার স্থান ছিল গৌণ, অবরোহী (deductive) চিন্তাভাবনার সহায়ক মাত্র। তবে এঁদের দুজনের মধ্যে প্রধান তফাৎটা ছিল এই যে দেকার্ত্ তাঁর বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জগৎপ্রক্রিয়াকে অনুধাবন করবার একটা নতুন চিন্তাপ্রণালী গঠন করেছিলেন। আজকের দিনে সে চিন্তাপ্রণালী প্রায় বিস্মৃত, কিন্তু সে যুগে মধ্যযুগীয় ধর্মশাস্ত্রীদের চিন্তাপ্রণালীকে তা সমূলে উৎখাত করতে পেরেছিল। বেকন কিন্তু ঐরকম·কোনো নতুন চিন্তাপ্রণালীর উদ্ভব ঘটাননি। তিনি একটা *সংস্থা* গঠনের প্রস্তাব রেখেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন—এমন এক সংস্থা যা কিনা নতুন নতুন চিন্তাপ্রণালীর যৌথ সংগঠক হিসেবে কাজ করবে। তিনি মনে করতেন এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ঐসব নতুন চিন্তাপ্রণালীর উদ্ভাবকদের হাতে একটা নতুন হাতিয়ার তুলে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। *Novum Organum* গ্রন্থে ব্যাখ্যাত তাঁর নতুন যুক্তিধারাই সেই নতুন হাতিয়ার।

এদিক থেকে বলা যেতে পারে, তাঁরা ছিলেন একে অন্যের পরিপূরক। বেকনের সংস্থা-বিষয়ক ধারণার সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ গঠিত হয় *রয়্যাল সোসাইটি*— যা ছিল প্রথম সত্যিকারের কার্যকর বিজ্ঞানসংস্থা। আর দেকার্ত্ প্রবর্তিত চিন্তাপ্রণালী অতীতের সঙ্গে সুনিশ্চিত বিচ্ছেদ ঘটিয়ে এমন কতকগুলি ধারণার উদ্ভব ঘটায় যার ভিত্তিতে বস্তুময় জগৎ সম্বন্ধে পুরোদস্তুর পরিমাণাত্মক ও জ্যামিতিক যুক্তিবিচার সম্ভব হয়ে ওঠে।

তবে উভয় দার্শনিকের চিন্তার মধ্যেই গভীরভাবে ছায়াপাত করেছিল মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা—দুজনের মধ্যে দুভাবে। ফ্রান্সিস বেকন বিশ্ববিদ্যাবাদীদের ঐতিহ্যের অনুসারী ছিলেন। পূর্বসুরী রজার বেকন এবং ভিন্সেন্ট অব বোভে (Beauvais), এমনকি সুদূর প্রাচীনকালের প্লিনি এবং অ্যারিস্টটলের প্রভাব তাঁর মধ্যে লক্ষণীয়। তাঁর সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান ক্ষেত্র ছিল প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞান। নবোদ্ভূত গণিতীয় দর্শন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান বা আগ্রহ ছিলনা। তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি ছিল বহুলাংশে নেতিবাচক। প্রাচীন দার্শনিকদের যা বিপথগামী করেছিল, সেই 'Idol' বা ভ্রমাত্মক ধারণার মায়াজাল ছিন্ন করাটাই ছিল তাঁর পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। *New Atlantis* গ্রন্থে যে কাল্পনিক 'House of Solomon'-এর কথা বলেছেন বেকন, সেটি ছিল এক ধরনের বিশ্বজনীন পরীক্ষাগার—উরানিবর্গে টাইকো ব্রাহের বাস্তব পরীক্ষাগারটিরই এক আদর্শায়িত রূপ। তাঁর এই House of Solomon আবার পরবর্তীকালের বিজ্ঞানসংস্থাগুলোর প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। বেকন পরীক্ষানিরীক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু নিজে কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা করেননি। তথ্যের বিমূর্তীকরণ (abstraction) ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সরলীকরণের (reduction) যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে জটিল ব্যাপারসমূহ থেকে সত্যে উপনীত হতে হয়, ইতিমধ্যেই যে-প্রক্রিয়ার অপরূপ প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন গ্যালিলিও, তা বেকন কোনোদিনই পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিল, প্রাচীনদের ক্ষতিকর ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে গতানুগতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলে আপনিই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। বেকনের বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসগুলো মৌলিক ছিল না। অন্যদের বই পড়ে, বিশেষত তেলেসিয়াস্-এর বই থেকে সেগুলো আহরণ করেছিলেন তিনি। তেলেসিয়াস্কে সমালোচনাও যেমন করেছেন বেকন, তেমনি 'প্রথমতম আধুনিক' আখ্যাও দিয়েছেন।

তেলেসিয়াস (1509-88) ছিলেন এক ইতালীয় পণ্ডিত। তিনিই প্রথম অ্যারিস্টটলের

চিন্তাভাবনার সঙ্গে পাকাপাকি বিচ্ছেদ ঘটিয়ে একটা পাল্টা চিন্তাপ্রণালীর উদ্ভব ঘটান। অ্যারিস্টটল-কথিত চারটি 'কারণে'র মধ্যে আকারগত এবং পরম কারণ দুটিকে খারিজ করে দিয়ে তিনি বস্তুর উপাদানগত এবং ক্রিয়াগত কারণ দুটিকে স্বীকৃতি দেন। এটি তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান। বিজ্ঞানের পরবর্তী বিকাশ এই পথেই ঘটে। তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণার সঙ্গে অ্যানাক্সিমিনিস্-এর চিন্তাভাবনার মিল আছে। তাপ এবং শীতলতা—এই দুটি অভ্যন্তরীণ শক্তির ক্রিয়ার সাহায্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সচল রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। এই ভাবনার মধ্যে পরবর্তীকালের শক্তিতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। শক্তির নিত্যতা তত্ত্বেরও কিছু পূর্বাভাস মেলে এর মধ্যে। তবে পরিমাণাত্মক দিক থেকে চৈনিক দর্শনের য়িন-ইয়াং তত্ত্বের চেয়ে খুব একটা অগ্রসর ছিল না এ ভাবনা।

কর্মজীবনের শুরু থেকেই বেকন এই মতবাদ প্রচার করতে উদ্যোগী হলেন যে, 'বিজ্ঞানের প্রকৃত এবং ন্যায্য উদ্দেশ্য হচ্ছে নবনব আবিষ্কার ও শক্তির সাহায্যে মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলা।' নিজেকে তিনি যতটা না বিজ্ঞানী এবং উদভাবক বলে মনে করতেন, তার থেকে বেশি করে বিজ্ঞানের এবং উদভাবনের প্রেরণাদাতা বলে মনে করতেন : 'আমার কাজ হলো অন্যান্যদের মস্তিষ্কসমূহকে একত্রিত করবার জন্য ঘণ্টা বাজানো।' প্রোফেসর বি· ফ্যারিংটন তাঁর *Francis Bacon, Philosopher of Industrial Science* (1951) শীর্ষক চমৎকার গ্রন্থটিতে বেকনের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন : 'মানবজাতির যত কিছু মঙ্গল সাধন করা যেতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে মঙ্গলজনক হচ্ছে নবনব প্রয়োগকৌশল, নবনব গুণাবলী এবং পণ্যসামগ্রীর উদভাবন ঘটিয়ে মানুষের জীবনযাত্রাকে উন্নততর করে তোলা। আদিম যুগের অসভ্য মানুষেরা উদভাবক এবং আবিষ্কারকদের পুণ্যাত্মা জ্ঞানে সম্মান করত, দেবতার আসনে বসাত।... তবে সবার চাইতে বড়ো উপকারটি সাধন করবেন তিনিই যিনি নিছক একটা কাজের জিনিস আবিষ্কার না করে প্রকৃতিতে একটা আলো জ্বেলে দিতে পারবেন। সেই আলোর স্পর্শে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের গণ্ডির পরপারে স্থিত অন্ধকার এলাকাগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, অচিরেই বিশ্বের লুকোনো গোপন রহস্যগুলি আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। যিনি এ কর্মটি সাধন করবেন তিনি সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলবিধাতা রূপে কীর্তিত হবেন, পূজিত হবেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের সাম্রাজ্যবিস্তারকারী রূপে, মানবমুক্তির হোতা রূপে, জীবনযাপনের উপকরণসমূহের বিজেতা বলে।' বেকনই ছিলেন প্রথম মহাপুরুষ যিনি বিজ্ঞানকে নতুন পথ দেখান, পুনরায় তাকে সুনিশ্চিতভাবে বস্তুগত উৎপাদনের অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত করেন।

বেকনের মনের প্রবণতাটি ছিল স্থূল অভিজ্ঞতাবাদী (empirical)। স্বভাবতই তিনি প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনোরকম পূর্ব-নির্দিষ্ট চিন্তাপ্রণালীর বিরোধী ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, সুসংগঠিত এবং উপযুক্ত সরঞ্জামে সজ্জিত একদল গবেষকের গবেষণাকর্ম থেকে যেসব তথ্য জানা যাবে, তার সাহায্যেই অবশেষে সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। অপরদিকে, দেকার্ত্-এর পদ্ধতিটি অনেকাংশে মধ্যযুগের ধর্মশাস্ত্রীদের ঘরানা থেকেই আহরিত হয়েছিল। দুটো পদ্ধতির মধ্যে প্রকাণ্ড তফাৎ এই যে দেকার্ত্ মধ্যযুগের শাস্ত্রীয় ঘরানার চিন্তাপ্রণালীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি, চেয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব চিন্তাপ্রণালীটিকে প্রতিষ্ঠা করতে। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি যে-ব্যক্তিগত ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেন, তা রেনেসাঁস যুগেরই এক প্রধান মুক্তিপ্রদায়ী লক্ষণ। ঠিক এই ঔদ্ধত্যেরই পরিচয় দিয়েছিলেন নৌ-অভিযাত্রীরা, দেশ-বিজেতারা। কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার এই বিদ্রোহী মনোভাবই ছিল সামন্ততান্ত্রিক যুগের অবসানের এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের এক নতুন যুগের উদয়ের লক্ষণ।

দেকার্ত যে-চিন্তাপ্রণালীকে ধ্বংস করতে চাইলেন, অজান্তে কিন্তু তার অনেকখানিই নিজের

চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাঁদেরই মতো তিনিও অবরোহী যুক্তিপ্রণালীর ওপর এবং স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাবাক্যের ওপর জোর দিলেন। কিন্তু এইগুলি দিয়ে শুরু করার পর তিনি প্রয়োগ করলেন গণিত। এবং এই গণিত-সিদ্ধ দার্শনিক গণিতের সহায়তায় এমন সব সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যা মধ্যযুগের শাস্ত্রীদের তো বটেই, এমনকি ধ্রুপদী যুগের আচার্যদেরও সাধ্যাতীত ছিল। গণিতের ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান অবদান ছিল স্থানাঙ্ক জ্যামিতির প্রয়োগ। এর সাহায্যে নির্দিষ্ট অক্ষসমূহের সাপেক্ষে কোনো একটা বক্ররেখার বিন্দুগুলির স্থানাঙ্কসমূহকে একটি সমীকরণের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত করা সম্ভব হলো। নিছক জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে একাজটা করা সম্ভব ছিল না। প্রাচীন গ্রীকদের সন্ততি (continuum) বিষয়ক বিজ্ঞান বা জ্যামিতির সঙ্গে প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় ভারতীয়-আরবী সংখ্যাবিজ্ঞানের বা বীজগণিতের মেলবন্ধন ঘটল এর ফলে। এই দুটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এতদিন আলাদা ছিল। এখন এই মেলবন্ধন ঘটার দরুন এদের সম্মিলিত শক্তি এমন সব সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত হলো যা নিয়ে আগে কখনো চেষ্টা করাও সম্ভব হয়নি।

প্রাচীন দর্শনের ওপর আঘাত হানার ব্যাপারে দেকার্ত্ যুগপৎ চাতুর্য এবং সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হবার কোনো বাসনা তাঁর ছিলনা। ঐরকম সংঘর্ষের পরিণতিতেই তো ক্যাথলিক রোমে ব্রুনোকে এবং ক্যাল্ভিনপন্থী জিনীভায় সার্ভেটসকে নিন্দিত হয়ে পুড়ে মরতে হয়েছিল। দেকার্ত্ আপস করতে রাজি ছিলেন। তিনি সমঝোতা করার একটা অতি চমৎকার পথ বার করলেন। এই সমঝোতাই একটানা কয়েক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানচর্চার পথ সুগম করে দেয়। তবে ঐ সমঝোতা করতে গিয়ে এমন কিছু মূল্য দিতে হয়েছিল যার ফল আমরা এতদিনে একটু একটু টের পাচ্ছি।

মৌলিক এবং গৌণ ধর্ম

আমাদের দৃষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডটাকে দেকার্ত্ সুনির্দিষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করলেন : একটি বস্তুময়, অন্যটি নৈতিক। তাঁর আগে অন্য কোনো দার্শনিক এত স্পষ্টভাবে এ বিভাগ করেননি; যদিও, নিছক ভক্তির মাধ্যমে উপলব্ধ বা প্রত্যাদেশ-লব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে এর আগে অনেক দার্শনিকই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। যেমন, মধ্যযুগের আরবী এবং স্কটপন্থী দার্শনিকরা, রজার বেকন, এমনকি ফ্রান্সিস বেকন। তবে তাঁদের এ সংশয় পুরোপুরি খাঁটি ছিল কিনা সন্দেহ। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে নয়, কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই কেবল তাঁদের সংশয় ব্যক্ত হয়েছিল। তখন আপত্তি উঠেছিল যে এ সংশয় প্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হওয়া। কিন্তু দেকার্ত্ যে বিভাজন-রেখাটি টানলেন তা দর্শনের একেবারে অবিচ্ছেদ্য এবং যুক্তিগ্রাহ্য অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকে তিনি প্রথমে বলবিজ্ঞানের (mechanics), পরে জ্যামিতির আওতায় টেনে আনলেন। তারই যুক্তিসংগত পরিণতিস্বরূপ তিনি দর্শনকে পূর্বোক্ত দুটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে ভাগ করে নিলেন। গ্যালিলিওর মতোই তিনি ব্যাপ্তিগুণ আর চলনকেই বস্তুর মৌলিক ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করলেন। বাস্তব অস্তিত্বের অন্যান্য যেসব দিক, যথা বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ, সেগুলোকে তিনি বস্তুর গৌণ ধর্ম রূপে চিহ্নিত করলেন। তাঁর মতে আবেগ, ইচ্ছাশক্তি, প্রেম এবং ভক্তির অঙ্গনটি এই গণ্ডির বাইরে অবস্থিত, পদার্থবিদ্যা দিয়ে তার নাগাল পাওয়া যায় না। দেকার্ত্ বললেন, এর মধ্যে ঐ প্রথম গোষ্ঠীর ধর্মগুলিকে নিয়েই প্রধানত বিজ্ঞানের কারবার—সেগুলো পরিমাপযোগ্য রাশি, সেগুলোই পদার্থবিদ্যার ভিত্তি রচনা করে। দ্বিতীয় এবং গৌণ গোষ্ঠীটি নিয়েও (অর্থাৎ বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ) বিজ্ঞান কিছুটা মাথা ঘামাতে পারে। কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রটি—অর্থাৎ আবেগ, ইচ্ছাশক্তি, প্রেম ও ভক্তি—একেবারেই বিজ্ঞানের আওতার বাইরে অবস্থিত। সেটি দিব্যজ্ঞানের আওতায় পড়ছে।

মানুষ সমেত যাবতীয় প্রাণীকেই দেকার্ত্ নিছক মেশিন বলে মনে করতেন। এই নির্ভেজাল যান্ত্রিক মানুষ ভৌতবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র অনুসারে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে। আবার এই মানুষের মধ্যেই এক চেতন সত্তা ও ইচ্ছাশক্তি অধিষ্ঠান করে। দেকার্ত্ বললেন, মনুষ্যরূপী যন্ত্রের দেহের কোথাও ঐ চেতন সত্তা ও ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ সাধনের একটা পথ নিশ্চয়ই আছে। আপাতদৃষ্টিতে গুরুগম্ভীর কিন্তু আসলে নিতান্ত কাঁচা এক ব্যাখ্যা দিলেন তিনি, বললেন, মানুষের খুলির ওপরে pineal body বলে যে গ্রন্থিটা আছে তারই মাধ্যমে নাকি এই যোগাযোগ সাধিত হয়। তিনি বললেন, ঐ গ্রন্থিটি অন্য কোনো কাজ করে বলে জানা যায় না, সুতরাং বিশ্ব-আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ সাধনটাই নিশ্চয়ই তার কাজ। আসলে কিন্তু ঐ pineal body হচ্ছে আমাদের সরীসৃপজাতীয় পূর্বপুরুষদের অধুনা-নিষ্ক্রিয় চক্ষুদ্বয়ের চিহ্নমাত্র।

ধর্ম আর বিজ্ঞানের বিচ্ছেদ

এই যে দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ গড়ে দিলেন দেকার্ত্, এরই ফলে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা নির্বিঘ্নে ধর্মের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে পারছেন। অবশ্য ধর্মের আঙিনায় অনধিকার প্রবেশ করলে তখন আলাদা কথা। বলা বাহুল্য, সবসময় সে অনধিকার প্রবেশ বাঁচিয়ে চলা শক্ত। যাই হোক, এরই ফলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চায় নিরত বিজ্ঞানীদের আবির্ভাব সম্ভব হলো। ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিতর্কের উদ্ভব হতে পারে এমন সকল ক্ষেত্র থেকে তাঁরা নিজেদের সরিয়ে রাখেন। দেকার্ত্ নিজেও খানিকটা তা-ই করেছিলেন। এরকম শোনা যায় যে তাঁর *বিশ্বব্যবস্থা গ্রন্থটি লেখা হয়ে যাবার পর তিনি গ্যালিলিও'র বিচারের খবর পান, এবং বুঝতে* পারেন, যেভাবে ঐ গ্রন্থটি তিনি লিখেছেন, হুবহু সেইভাবে প্রকাশ করলে সমূহ বিপদ। কারণ ভক্তিবাদ-আহরিত সত্যসমূহকে অনাহত রাখতে হলে জগৎব্যবস্থা সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল-অ্যাকুইনাসের মতবাদ যে অপরিহার্য সে ব্যাপারে চার্চের কর্তারা ছিলেন একেবারে নিঃসংশয়। সে সত্যসমূহের অভ্রান্ততা সম্পর্কে সংশয় জাগায় এমন কোনো চিন্তাভাবনাকে প্রশ্রয় না দিতে তাঁরা কৃতসংকল্প ছিলেন। কাজেই দেকার্ত্ তখন প্রবল উদ্যমে দেখাতে চাইলেন যে জগৎব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাবিত চিন্তাপ্রণালীর সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রাচীন দর্শনসমূহের মতোই, এমনকি তার থেকেও সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করা যায়। *Je pense donc je suis* (আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি)—এই বিখ্যাত প্রতিজ্ঞাবাক্যটি থেকে দেকার্ত্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে প্রতিটি মানুষই যেহেতু নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোনো একটা কিছুর ধারণা করতে সক্ষম, সুতরাং সর্বাঙ্গসুন্দর এক অনিন্দ্য সত্তার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে। এইভাবে ধর্মতাত্ত্বিকদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাঁর জগৎব্যবস্থাটিকে এক দুর্ভেদ্য প্রাকারের আড়ালে সযত্নে সুরক্ষিত রেখেছিলেন দেকার্ত্। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবৎকালেই ফ্রান্সের মতো উগ্র ক্যাথলিক দেশে সে চিন্তাপ্রণালী স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পরেও একশো বছর সে স্বীকৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল।

গণিতীয় এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ ঐশ্বর্যের এক বিপুল সম্ভারে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, দেকার্ত্-এর এই চিন্তাপ্রণালীটি কিন্তু মূলত নব্য বিজ্ঞান কেমন হওয়া উচিত তাই নিয়ে রচিত এক অপরূপ কবিতা বা অতিকথা। এটাই এর আকর্ষণ, আবার এর মধ্যেই এর বিপদের সম্ভাবনা নিহিত। একদিকে পরীক্ষাভিত্তিক নানান সিদ্ধান্ত; অন্যদিকে দেকার্ত্-এর বহুখ্যাত 'পদ্ধতি' অনুযায়ী নিছক 'পরিচ্ছন্নতার' নিরিখে নির্বাচিত কতকগুলি মূল প্রত্যয় থেকে আহরিত নানারকম সিদ্ধান্তের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ তাঁর এই জগৎব্যবস্থা। সেই সময় থেকে এই পরিচ্ছন্নতার অনুসন্ধানই ফরাসি বিজ্ঞানের যুগপৎ অলংকার এবং সীমাবদ্ধতা হয়ে ওঠে। জ্ঞানচর্চার যেসব ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে সত্যিই ঐ পরিচ্ছন্নতার অবকাশ আছে, সেসব ক্ষেত্রে এলোমেলো কিন্তু

নিখাদ জ্ঞানকে সুশৃঙ্খল রূপ দেওয়ার কাজে তা খুবই উপযোগী। যার প্রমাণ আঠেরো শতকের গতিবিজ্ঞান আব রসায়ন, কিংবা উনিশ শতকের জীবাণুবিদ্যা। কিন্তু যেখানে সে অবকাশ নেই, সেখানে তা বন্ধ্যা গতানুগতিকতায় আব ভ্রান্ত সরলীকরণে পর্যবসিত হয়।

সম্পূর্ণ একক প্রয়াসে কোনো দার্শনিক চিন্তাপ্রণালী গঠন করার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে দেকার্ত্ নিজেই খানিকটা অবহিত ছিলেন। তিনি বুঝতেন যে জগৎব্যবস্থা সম্পর্কে একটা চিন্তাপ্রণালী গঠন করতে হলে বহু মানুষের চিন্তাভাবনার সহযোগিতা চাই। *Discours de La Méthode (পদ্ধতিবিষয়ক আলোচনা)* গ্রন্থে পরীক্ষানিরীক্ষা প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন: 'আমি এটাও বুঝতে পারছি যে এত বিভিন্ন রকমের পরীক্ষানিরীক্ষা আছে যে আমার হাতের সংখ্যা আর সম্পদের পরিমাণ সহস্রগুণিত হলেও সেসব করা আমার আমার সাধ্যে কুলোবে না।··· আমার এই গ্রন্থে আমি সর্বসাধারণের পক্ষে এব উপযোগিতাটি বোঝাবার চেষ্টা করেছি। যাঁরা সত্যিই মনুষ্যসমাজের মঙ্গল কামনা করেন, অর্থাৎ যাঁরা সত্যিই সৎ, যাঁরা নিছক সততার ভান করেন না, তাঁদের সকলে যদি নিজ নিজ পরীক্ষালব্ধ ফলাফল আমাকে জানান, তাহলে এখনো যেসব গবেষণা করা বাকি রয়েছে সেগুলি করা আমার পক্ষে সম্ভব হতে পারে।'

নিজের সিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশ করাটা কেন উচিত কাজ হয়েছে তা নিয়ে বলতে গিয়ে দেকার্ত্ আরেক জায়গায় বলছেন: 'আমি বুঝতে পারলাম যে এগুলোর সাহায্যে জীবনের পক্ষে অতীব উপযোগী নানাবিধ জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব। শিক্ষায়তনসমূহে বর্তমানে দূরকল্পনাভিত্তিক যে দর্শন শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, তার বদলে একটা ব্যবহারিক দর্শনের প্রবর্তন করা যেতে পারে। এই ব্যবহারিক দর্শনের সাহায্যে অগ্নি, জল, বায়ু, নক্ষত্রাদি, মহাকাশ এবং আমাদের চতুষ্পার্শস্থ যাবতীয় বস্তুর শক্তি ও ক্রিয়া সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে—যেমন স্পষ্টভাবে আমরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত কারিগরদের কাজ সম্বন্ধে জানি, তেমনি স্পষ্টভাবে। এই জ্ঞানকে আমরা যাবতীয় উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পাবব, আর এমনি করে আমরা প্রকৃতির প্রভু এবং অধীশ্বর হয়ে উঠব। এই পৃথিবীর যাবতীয় ফসলকে নির্বিঘ্নে উপভোগ করতে হলে অসংখ্য যন্ত্রকৌশল উদ্‌ভাবন করা প্রয়োজন। কিন্তু সেটাই পূর্বোক্ত জ্ঞানলাভের সবচেয়ে বড়ো উপযোগিতা নয়, সুস্বাস্থ্য রক্ষা করাটাই হচ্ছে এর প্রধান উপযোগিতা।'

কাজেই, দেকার্ত্-এর চূড়ান্ত অভীষ্ট বেকনের চেয়ে খুব একটা আলাদা ছিল না। আর বেকনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম। বেকন এবং দেকার্ত্— এই দুজনে মিলে ভব্য মহলে পরীক্ষাভিত্তিক বিজ্ঞানের মর্যাদা বাড়িয়ে দিলেন। তার মর্যাদা সাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠল। সেই সময় থেকে শিক্ষায়তনসমূহে অধীত দর্শনের বদলে নব্য প্রাকৃতিক দর্শনই হয়ে উঠল আগ্রহ আর আলোচনার কেন্দ্র। বস্তুত, এর শদুয়েক বছর পরেই এই নব্য দর্শন প্রায় *ঠেলেঠুলেই* ইংলন্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্থান করে নেয়।

প্রকৃতি-বিষয়ক এই বিজ্ঞান এবং তার প্রথম ফসলগুলির বিপুল বিস্তার ঘটানোর সময় হয়ে গিয়েছিল। বেকন যে মহা-নির্মাণপ্রক্রিয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা অবশেষে 1650 থেকে 1690-এর মধ্যে বাস্তব রূপ ধারণ করে· 'এটা নিছক একটা অভিমত পোষণ করবার ব্যাপার নয়, এটা করণীয় একটা কর্ম — এই কথাটা বোঝবার জন্য সনির্বন্ধ আবেদন রাখছি আমি। আমি সুনিশ্চিতভাবে জানাতে চাই যে কোনো গোষ্ঠী বা মতবাদের পত্তন আমার অভীষ্ট নয়, আমি মানুষের উপযোগিতা ও শক্তির বনেদ তৈরির কাজে নিয়োজিত।'

7. বিজ্ঞানের সাবালকত্ব: 1650-90

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার পথে তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্বটির সূচনা হয় সতেরো শতকের শেষার্ধে। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে পূর্ববর্তী একশো বছরে সামন্ততান্ত্রিক ও ধ্রুপদী যুগের

তত্ত্বগুলিকে উৎখাত করার মধ্যে দিয়ে এর মননগত বনেদটি রচিত হয়েছিল। কোনো সন্দেহ নেই যে বিজ্ঞানের পরবর্তী অগ্রগতি এবং সংহতি সাধনের পথটি এরই ফলে সুগম হয়ে উঠেছিল! কিন্তু যে প্রচণ্ড কর্মতৎপরতার মধ্যে দিয়ে পঞ্চাশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান রূপ ধারণ করল, তার মূলে ওটিই একমাত্র, এমনকি প্রধান কারণ ছিল না। আগের বা পরের কোনো পর্বেই বিজ্ঞানের বিকাশে এমন ঘনীভূত তীব্রতা দেখা যায়নি। এই বিকাশের মুখ্য কেন্দ্রগুলি ছিল লন্ডন আর পারি! ইতালি আর হল্যান্ডে ঐরকম কোনো কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারেনি। আর মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপ তখনো সক্রিয় হয়ে ওঠেনি।

এই অতিদ্রুত বিকাশ এবং এই নিবিড় সংহতির মূলে সবচেয়ে বড়ো কারণটি ছিল তখনকার পরিস্থিতি। ব্রিটেন ও ফ্রান্সে তখন স্থিতিশীল সরকার গঠিত হয়েছে, আর দুটি সরকারেই উচ্চকোটির বুর্জোয়াদের ভূমিকা ছিল মুখ্য, অন্তত‌পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটেনে গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সত্যিকারের এক বিপ্লব সংঘটিত হয়। সে বিপ্লবে অপেক্ষাকৃত ধনবান বণিকরা শহরের লোকেদের এবং ছোটো ভূস্বামীদের সহায়তা নিয়ে রাজা এবং অভিজাত জমিদারদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পরেই এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। ছোটোখাটো লোকেদের মধ্যে গণতন্ত্র আর অর্থনৈতিক সমতার প্রতি একটা 'বিশ্রী' ঝোঁক মাথা চাড়া দিল। পথের কাঁটা ক্রমওয়েল উৎপাটিত হওয়া মাত্র বণিকদল জমিদারদের সঙ্গে হাত মেলাল। পরিণামে দ্বিতীয় চার্লসকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে প্রথম নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র গঠিত হলো। অর্থনীতিক্ষেত্রে তখনো বণিকদের ভূমিকাই প্রধান, কিন্তু নতুন এক মানুফ্যাক্‌চারার-শ্রেণী ইতিমধ্যেই রূপ ধারণ করছিল। কিছু সাধারণ বণিক, আর কিছু দক্ষ কারিগর মিলে এই নতুন শ্রেণীটি গঠিত হয়েছিল। গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ম্যানুফ্যাকচারে আর বাণিজ্যে জোয়ার আসে। তারই পাশাপাশি নৌচালনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সব মিলিয়ে, নতুন যান্ত্রিক উদভাবনের চাহিদা খুবই বেড়ে যায়। স্থান ও কালের এই সন্নিপাত সবদিক থেকে বিজ্ঞানের বিকাশের পক্ষে খুবই অনুকূল ছিল।

ধনসম্পদ প্রভূত পরিমাণে থাকলে কী হবে, শতাব্দীর মধ্যপর্বে হল্যান্ড তার শ্রেষ্ঠতম দিনগুলি পার হয়ে এসেছিল। যে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে হল্যান্ডের ওপর স্পেনের আধিপত্যের অবসান ঘটে, তার পর ষাট বছর কেটে গেছে; যে জনসমর্থনের জোয়ারে হল্যান্ডের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল, তা ততদিনে ভাঁটায় পর্যবসিত; দেশের শাসনভার তখন ধনী বণিক আর জমিদারদের হাতে; বাণিজ্যঘটিত যুদ্ধ আর অপ্রতুল উৎপাদনের ধকলে তখন সে দেশ পীড়িত। ফলে অচিরেই দেখা গেল, হল্যান্ড তার অগ্রণী অবস্থান বজায় রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। শতাব্দীর শেষভাগে সবচেয়ে গুণী ওলন্দাজরা অনেকেই বিদেশে কর্ম করতে চলে যান। বিশেষ করে ব্রিটেনের উইলিয়াম অব অরেঞ্জের অধীনে তাঁরা কাজ করতে থাকেন। হল্যান্ডের সবচেয়ে বড়ো বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্‌স পারি-র ফরাসি সারস্বতসভার সভ্য হিসেবেই তাঁর অধিকাংশ কাজ করেন।

ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটতে তখনো অনেক দেরি। ক্যাল্‌ভিনপন্থী ফরাসি প্রোটেস্টান্ট Huegenot-দের পরাজয় প্রমাণ করে দিয়েছিল সেদেশে সামন্ততন্ত্র আর চার্চের ক্ষমতা কতখানি। তবে এটাও ঠিক, তাঁদের এই পরাজয় একদিনে ঘটেনি। দীর্ঘ সংগ্রামের পর 1685 সালে নাঁত্ অনুশাসন (Edict of Nantes) খারিজ হয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁদের এই পরাজয় ঘটে। ইউরোপে ফ্রান্সই তখন সবচেয়ে বড়ো আর সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ। প্রাণচঞ্চল এবং প্রসারমান এহেন একটি দেশ চারপাশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে তাল মেলাবে না, এ তো হতে পারে না। তাই একটা আপসরফা হলো। কর মকুব, বিশেষ ভাতা এবং ভের্সাইয়ের

বিপুল সমারোহের বিনিময়ে অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের কিছুটা ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি হলো। শাসনক্ষমতার কেন্দ্রে রইলেন রাজা, কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রযন্ত্রটা পুরোপুরিই বুর্জোয়াদের হাতে চলে গেল। সে রাষ্ট্রযন্ত্র চালানোর প্রধান ভার নিলেন প্রবুদ্ধ আইনজীবীরা। পরে এঁদের মধ্যে থেকে বহু বিজ্ঞানীর উদ্ভব হয়েছিল। এই আপসরফাটা মোটামুটি কাজ দিয়েছিল চতুর্দশ লুইয়ের ব্যক্তিগত রাজত্বকালে (1661-83)। তখন রাজ্য পরিচালনা করতেন কল্‌বেয়ার (Colbert)। তিনি ছিলেন কাজের লোক। লক্ষণীয়, এই পর্বটিই ফরাসি বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ।

বিজ্ঞানমঞ্চে ইউরোপের বাকি দেশগুলোর ভূমিকা তখন গৌণ। ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (1618-48) ধকল সামলে জার্মানি আর অস্ট্রিয়া তখন সবে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। ওদিকে ধর্ম-আদালতের দাপটে স্পেন আর পর্তুগাল একেবারে হতোদ্যম। আর ইতালিতে গ্যালিলিও'র উত্তরসূরীরা তখন চার্চের ক্রমবর্ধমান দাপটের বিরুদ্ধে অসামান্য এক সংগ্রামে নিয়োজিত। সদ্য-আরোপিত ভূমিদাসব্যবস্থার নাগপাশে সুইডেন, পোল্যান্ড আর রাশিয়া তখন হাঁসফাঁস করছে। এরা ছিল মূলত কাঁচামাল-সরবরাহকারী দেশ; সামরিক দিক থেকে শক্তিমান হলেও এরা এই পর্বে বিজ্ঞানের অঙ্গনে সবে অবদান রাখতে শুরু করেছে মাত্র।

মহতী শতাব্দী

পূর্ববর্তী একশো বছরের তুমুল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অশান্তির পর, সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে খানিকটা শান্তি আসে। এই পর্বটি ছিল সক্রিয় সমৃদ্ধির যুগ। মহামারী আর যুদ্ধ চলতেই থাকল, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে বিজ্ঞানীদের কাজকর্মের ওপর এসবের প্রভাব ছিল যৎসামান্য। শুধু তাই নয়, দেশে দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারটিও তখনো পর্যন্ত চলাফেরার বা বার্তাবিনিময়ের ক্ষেত্রে তেমন প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেনি। এ ছিল সচেতনভাবে সভ্যতাকে গড়ে তোলার যুগ। সার্বভৌম এক বিদ্বৎসমাজের অঙ্গ রূপে বিজ্ঞানীদের তখন স্বীকৃতি দেওয়া হতো, সম্মান করা হতো। বাণিজ্য আর নৌচালনে তো বটেই, ম্যানুফ্যাকচার আর কৃষির উন্নতিতেও সবকটি অগ্রণী দেশের শাসকশ্রেণীর এবং সরকারের কতকগুলি অভিন্ন স্বার্থ ছিল। এইসব অভিন্ন স্বার্থের সুবাদেই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের এই তৃতীয় পর্বটির চূড়ান্ত কীর্তিগুলি নিষ্পন্ন হয়। এই পর্বেই বিজ্ঞানকে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করবার প্রথম সংগঠিত এবং সচেতন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

তিরিশ বছর আগে বেকন যে সোনার ফসলের 'আবাদ' করতে বলেছিলেন, এই সেই ফসল। এবং এই ফসল তোলার কাজে বেকন-নির্দেশিত পরীক্ষানির্ভর পদ্ধতি এবং গবেষণা-সংগঠনের পন্থাই অনুসরণ করা হয়। যাঁরা এ কাজ সম্পন্ন করলেন, তাঁরা ছিলেন নিজ নিজ যুগের এবং নিজ নিজ দেশের বৈশিষ্ট্যের যথার্থ প্রতিভূ। বিগত দুটি পর্বে বিজ্ঞানচর্চা করেছিলেন সভাসদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা, যাঁরা জীবিকানির্বাহ করতেন 'প্রিন্স'দের প্রসাদে। কিন্তু মধ্য-সতেরো শতকের এই গুণীরা ছিলেন স্ব-নির্ভর। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন বণিক, মাঝারি জমিদার, সফল ডাক্তার, উকিল ইত্যাদি। বেশ কয়েকজন পাদ্রীও এঁদের মধ্যে ছিলেন। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণার জন্য দরবার করলেও তাঁরা রাজকীয় সাহায্যের ওপর প্রায় কোনো ভরসাই করতেন না। রাজা দ্বিতীয় চার্লস তাঁর "রয়্যাল" সোসাইটিতে একটি ফুটো পয়সাও ঠেকাননি, একবার দেখতে পর্যন্ত যাননি! এই গুণীরা বিজ্ঞানচর্চার খরচ যোগাতেন নিজেদের 'গাঁটের' পয়সা দিয়ে। পয়সার অভাব অবশ্য তাঁদের ছিল না। বাণিজ্যের বহর প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাওয়ায় প্রচুর অর্থ তাঁরা উপার্জন করতেন। আর তখন বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ সেইসব দেশেই বর্ষিত হতো, যেখানে বিজ্ঞানচর্চায় জোয়ার এসেছিল। বিজ্ঞানীরা অনেকেই

পয়সা দিয়ে অন্য বিজ্ঞানীদের কাজে নিয়োগ করতেন। যেমন, এক গরিব সহকারী-যাজকের পুত্র হুক-কে নিয়োগ করেছিলেন মাননীয় রবার্ট বয়েল মহাশয়; যেমন, হল্যান্ডের জুলিকেম্-এর জমিদার ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স নিয়োগ করেছিলেন মধ্য ফ্রান্সের ব্লোআ শহরের দর্নি পাপ্যাঁ-কে।

এঁরা ছিলেন প্রতিপত্তিশালী লোক। নিজের মতো করে বিজ্ঞানচর্চা চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ এঁদের ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চাকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় স্বভাবতই তাঁরা আলোচনা ও জ্ঞানের আদানপ্রদানের জন্য পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে চাইলেন। তখনকার বাণিজ্যিক এবং ভেদ-বিলোপী আবহাওয়ায় এ কাজটা করা খুবই সহজ ছিল। কিন্তু এখানেই না থেমে বিজ্ঞানীরা আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তাঁরা বেকনের আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে যৌথ প্রয়াসে প্রকৃতির রহস্যসমূহ উন্মোচন করার সচেতন লক্ষ্যে চালিত একটি সদর্থক সংস্থা গঠনের কথা ভাবতে লাগলেন।

বিজ্ঞানসভার পত্তন

এই পর্বেই প্রথম দুটি সু-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভা গঠিত হয়— লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি আর পারি-র Académie Royale des Sciences। এ দুটি সভা সে যুগের প্রধান প্রধান প্রকৌশলগত সমস্যা নিয়ে চর্চা করার কাজে ব্রতী হলো— যথা পাম্পিং, জলবিজ্ঞান (hydraulics), কামানসজ্জা এবং নৌচালন। আর যাবতীয় দার্শনিক আলোচনাকে যেন ইচ্ছে করেই মুলতুবি রাখা হলো। এর মধ্যে নৌচালন-সংক্রান্ত সমস্যাগুলোই বিশেষ করে বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রণোদনা যোগাল। কারণ এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে গিয়েই পূর্ববর্তী যুগের বিজ্ঞানের দুটি প্রধান ক্ষেত্রকে— অর্থাৎ বলবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানকে— একত্রিত ক'রে নিউটনের সেই অসামান্য তত্ত্বীয় সংশ্লেষণ সম্ভব হয়। কী-কী পরীক্ষা ও যুক্তি-সূত্র ধরে এই তত্ত্ব-সংশ্লেষণ ঘটানো হয়, তা নিয়ে এই অধ্যায়ের শেষের দিকে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। তবে, ব্যবহারিক দিক থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফল পাওয়া গেল পাম্প-বিষয়ক চর্চা থেকে। এই চর্চা থেকে প্রথমে আবিষ্কৃত হলো শূন্যাবস্থা (vaccuum), অতঃপর গ্যাস-সংক্রান্ত নিয়মাবলী। এরই ফলে পরে উদ্ভব ঘটে বাষ্পীয় এঞ্জিনের। পরবর্তী শতাব্দীতে রসায়নের ক্ষেত্রে গ্যাস-বলবিজ্ঞান (pneumatics) যে বিপ্লব আনবে তারও সূত্রপাত এখানেই।

বিজ্ঞানসভাগুলি গঠিত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই বিজ্ঞান মানুষের সংস্কৃতির এক পূর্ণস্বীকৃত অঙ্গ রূপে পাকাপাকিভাবে স্থান করে নিল। আমরা জানি, বিজ্ঞানসভা গঠন করার ভাবনাটা বহুদিনের। প্লেটোর অ্যাকাডেমিতে, অ্যারিস্টটলের লাইসিয়ামে এবং অ্যালেক্জান্দ্রিয়ার সংগ্রহশালায় এই ভাবনার মূর্ত রূপ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ইসলামী এবং খ্রিস্টান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও বিজ্ঞানসভার একধরনের অপরিণত রূপ বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু সতেরো শতকে এ ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ঐ ধরনের বিজ্ঞানসভা যুগের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম, নতুন ধরনের একটা কিছুর দরকার। যথাসময়ে সেই নতুন ধরনের বিজ্ঞানসভার আবির্ভাব ঘটল। এর পেছনে ফ্রান্সিস বেকন প্রমুখ ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের প্রেরণা তো ছিলই, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কারণটা ছিল বিজ্ঞান-উৎসাহী ব্যক্তিবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত মেলামেশাকে একটা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার তাগিদ।

উক্ত ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের মধ্যে মোরাভিয়ান চার্চের শেষ বিশপ জন আমোস কমেনিয়াস (1592-1690) ছিলেন এক অসামান্য ব্যক্তি। তিনি মনে করতেন বিজ্ঞান মানুষের সার্বিক শিক্ষার এক অঙ্গ। এই সার্বিক শিক্ষা-সংগঠনের কাজে তাঁর সারা জীবন ব্যয়িত হয়েছিল। কমেনিয়াস এমন এক 'Pansophic College' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন, যেখানে পরীক্ষানির্ভর নব্য দর্শনের চর্চা ও পঠনপাঠন হবে। ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের দরুন বোহেমিয়া থেকে

বিতাড়িত হয়ে তিনি এক অস্থির জীবন যাপন করেন। তাঁর সার্থক শিক্ষাপ্রণালীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় উদারপন্থী বহু দেশের সরকার তাঁকে সাগ্রহে স্থান দিতে চায়। নবগঠিত জাতি-রাষ্ট্রগুলোর নেতারা তখন ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন যে প্রশাসন চালাতে হলে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। পার্লামেন্টের আহ্বানে কমেনিয়াস 1641 সালে ইংলন্ডে আসেন। তাঁর আশা ছিল, পরিকল্পনামাফিক একটি কলেজ তিনি ইংলন্ডে স্থাপন করবেন। সে যুগের নানারকম প্রতিবন্ধক ঠেলে সে কাজ অবশ্য তিনি করতে পারেন নি। তবে রয়্যাল সোসাইটি গঠনে তাঁর প্রভাব খানিকটা কাজ করেছিল।

আসলে রোমের Academia dei Lincei (1600-30) এবং ফ্লরেন্সের Cimento-ই (1651-67) হচ্ছে প্রথম গঠিত বিজ্ঞানসভা। অন্যত্র বিজ্ঞানসভা গড়ে ওঠে এ দুটিরই আদলে। কিন্তু, হলে হবে কী, ইতালিতে যে সময়ে এ দুটি সভা গঠিত হয় তখন সেদেশে বিজ্ঞান-বিরোধী শক্তিসমূহের দাপট এত বেড়ে উঠেছিল যে সে-বিরোধিতা সামলে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা এদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। ফলে অচিরেই সভা দুটি উঠে যায়। এদিক থেকে ইংলন্ডের রয়্যাল সোসাইটি (1662) আর ফ্রান্সের Académie Royale des Sciences-এর (1666) ভাগ্য ভালো ছিল। নব্য বিজ্ঞানে উৎসাহী বান্ধববর্গের ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার আসর থেকেই এ দুটি সভার সূত্রপাত ঘটেছিল।

ফরাসি বিজ্ঞানীরা 1620 সাল থেকেই অ্যার্জ'-প্রভঁস্-এ (Aix-en-Provence) পিয়েরেস্ক্ (Pieresc) নামক এক ধনী আইনজীবীর বাড়িতে আসর জমাতেন। আসরে যাঁরা আসতেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন গাসঁদি—যিনি পরমাণু-তত্ত্বের পুনঃপ্রবর্তন করেন। তবে ফরাসি বিজ্ঞানের সত্যিকারের কেন্দ্র ছিল যাজক মের্সেন্-এর (Mersenne) কুঠি। বিজ্ঞানী হিসেবে মের্সেন নিজেও খুব নগণ্য ছিলেন না। তিনি ছিলেন অক্লান্ত এক পত্রলেখক। বস্তুত, গ্যালিলিও থেকে শুরু করে হব্‌স পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের এক সাধারণ ডাকঘর হিসেবে তিনি কাজ করতেন। 1648 সালে তাঁর মৃত্যুর পরে মঁৎমর (Montmor) নামে আরেকজন আইনজীবীর বাড়িতে অধিবেশন বসতে থাকে। এইসব অধিবেশন থেকেই পরে ফরাসি বিজ্ঞান আকাদেমি গড়ে ওঠে।

অন্য এক ধরনের আরেকজন বিজ্ঞান-উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন রেনোদো (Renaudot, মৃত্যু 1679)। প্রাণচঞ্চল এবং সংগ্রামী চরিত্রের এই ডাক্তারটি পারিতে গরিবদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে অন্য ডাক্তারদের আতঙ্কিত করে তুলেছিলেন। ঐ ভবনটিরই একপাশে তিনি বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য একটি বক্তৃতাকক্ষ খোলেন। সেইসঙ্গে খোলেন একটি পুস্তক প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান এবং একটি চাকুরী-এজেন্সি—যা গোটা প্রতিষ্ঠানটার খরচ যোগাত। কার্ডিনাল মাজার্‍্যাঁ (Mazarin) ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। 1661 সালে মাজার্‍্যাঁর মৃত্যুর পর রেনোদোর শত্রুরা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেন। সেইসঙ্গে ফ্রান্সে তখনকার মতো জনবোধ্য বিজ্ঞান প্রচারেও ইতি ঘটে। শতাধিক বছর পরে আবার তা শুরু হবে।

ইংলন্ডে পরীক্ষাভিত্তিক নব্য বিজ্ঞানের চর্চাকারীদের একত্রিত হবার শুভলগ্নটি আসে 1645 সালে, গৃহযুদ্ধের অবসানে। এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন পার্লামেন্টপন্থীদের সমর্থক। কয়েকজন পিউরিটান সমর্থকও ছিলেন। তবে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে এঁরা কেউই জড়িত ছিলেন না। এ দলটির অধিনায়ক ছিলেন জন উইল্‌কিন্‌স্। চার্চের সঙ্গে যুক্ত এই মানুষটির রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা বেশ নমনীয় ছিল। ক্রম্‌ওয়েলের বোনকে বিয়ে করেন তিনি, এদিকে চেস্টারের বিশপ্‌ও হন। তবে নব্য দর্শনের সমর্থনে তিনি অবিচল ছিলেন। উইল্‌কিন্‌সের সহযোগী ছিলেন গণিতজ্ঞ ড· ওয়ালিস এবং জার্মানি থেকে আগত শরণার্থী ড· থিয়োডর হাক্। এই ড· হাক্‌ই প্রথম সাপ্তাহিক

অধিবেশন বসানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন ডাক্তার এই গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন। লন্ডনে প্রাথমিক কয়েকটি অধিবেশন বসার পর এঁরা 1646 সালে আস্তানা গাড়েন অক্সফর্ডে। পার্লামেন্টের এক কমিশন তখন সবে এই রাজানুগত বিশ্ববিদ্যালয়টির সংস্কার সাধন করেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের খালি অধ্যাপকের এবং বিভাগীয় প্রধানের পদগুলোতে এই 'অদৃশ্য কলেজে'র সভ্যদের বসানো হলো। খানিকটা অনিচ্ছাভরেই, 1660 সালের 'রেস্টোরেশন'-পর্বের আগে অব্দি অক্সফর্ডই হয়ে দাঁড়ায় অ্যারিস্টটল-বিরোধিতার ঘাঁটি। ব্যাপারটা একটু আশ্চর্যের। কারণ, তার আগে অক্সফর্ডই ছিল অ্যারিস্টটল-বন্দনার কেন্দ্রভূমি, এবং পরেও আবার তাই হয়ে উঠবে। অক্সফর্ডে যোগদানকারী নব্য বিজ্ঞানীদের দলটি আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে তিনজন প্রতিভাশালী তরুণের যোগদানে। এঁরা হলেন রবার্ট বয়েল, সার উইলিয়াম পেটি এবং ড· ক্রিস্টোফার রেন। এছাড়াও একটু নিচু পদে যোগ দিলেন রবার্ট হুক—রয়্যাল সোসাইটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার পেছনে যাঁর অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। এই দলের সদস্য, রচিস্টারের ভবিষ্যৎ বিশপ এবং রয়্যাল সোসাইটির ভবিষ্যৎ ইতিহাসরচয়িতা টমাস স্প্র্যাট সেই যুগ সম্বন্ধে লিখেছেন: 'তাঁদের প্রথম লক্ষ্য ছিল খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়ার মুক্তি উপভোগ করা; সেই ভয়ংকর যুগের উন্মত্ততায় না মেতে নিরিবিলিতে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করা।··· এমন এক খোলামেলা এবং অবিক্ষুব্ধ সমাবেশের পক্ষে, অমন এক বিষণ্ণ পরিবেশে আলোচনার জন্য প্রকৃতি-বিষয়ক দর্শনের চাইতে উপযোগী বিষয় আর কী-ই বা হতে পারত?··· সে আলোচনা মানুষকে কখনো হানাহানিতে উন্মত্ত দলে-উপদলে ভাগ করেনা; সে আলোচনায় মতান্তরের সুযোগ থাকে, বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপন করলে গৃহযুদ্ধ বাধবার বিপদ থাকে না।···

'নিজেদের কাজকর্ম সেরে যতগুলো পারা যায় ততগুলো বৈঠক বসত। সেখানে আলোচনা অপেক্ষা কর্মতৎপরতার স্থানই ছিল বড়ো। প্রধানত রসায়ন আর বলবিজ্ঞান নিয়েই পরীক্ষা সংঘটিত হতো। নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো না। সুসংগঠিত, নিরবচ্ছিন্ন ও সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান অপেক্ষা নিজনিজ আবিষ্কারকে অন্যদের সামনে পেশ করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। অবশ্য ঐ ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে যতটুকু পরীক্ষা চালানো সম্ভব ততটুকুই কাজ করতেন তাঁরা।'

প্রথম প্রথম এইসব অপেশাদার বিজ্ঞানীরা কেবল বৈঠক করতেন, আলোচনা করতেন, পরীক্ষানিরীক্ষা করে পরস্পরকে দেখাতেন, অনুপস্থিত বা বিদেশী সহকর্মীদের চিঠি লিখতেন। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ভাববিনিময়ের এবং রচনা প্রকাশের প্রক্রিয়াটির সূত্রপাত এইভাবেই ঘটে—প্রথমে নিতান্ত ঘরোয়াভাবে, তারপর অপেক্ষাকৃত নিয়মিত চিঠিপত্রের আদানপ্রদানের মাধ্যমে। পরে ইংলন্ড আর ফ্রান্স উভয় দেশের বিজ্ঞানীরাই অনুভব করলেন যে একটা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান না হলে কাজ চালাতে অসুবিধে হচ্ছে। কারণ, কাজ চালাতে চালাতে তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে এসব কাজের ব্যবহারিক গুরুত্ব সমধিক, এবং একাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আরো অর্থ এবং আরো স্বীকৃতি প্রয়োজন।

দুদেশের বিজ্ঞানসভা স্থাপনের প্রক্রিয়া দুদেশের অর্থনীতির চরিত্র অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করল। ফ্রান্সের সরকার ছিল নিরতিশয় কেন্দ্রীভূত, সুতরাং সে দেশের বিজ্ঞানসভা যে সরকার-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবে, এমনকি সরকারই যে তার ব্যয়ভার বহন করবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। কলবেয়ার জাতীয় উৎপাদন-শিল্প স্থাপনে নিরত ছিলেন, কাজেই মাজারাঁ্যা-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য ও চারুশিল্পের আকাদেমির পাশাপাশি একটি বিজ্ঞান আকাদেমি স্থাপন করার ব্যাপারে তাঁকে রাজি করাতে বেগ পেতে হলো না। তবে তখন ফ্রান্সে রাজগৌরব বজায় রাখার জন্য

রাজকীয় সমস্ত ব্যাপারেই চারুসৌকর্য আর আড়ম্বরের ওপর জোর দেওয়া হতো। কল্‌বেয়ার যেসব উৎপাদন-শিল্পকে মদত দিয়েছিলেন সেগুলো হলো: লিয়ঁ-র রেশম-বয়ন, সাভ্‌র্‌-এর মৃৎশিল্প এবং পারি-র পর্দাচিত্রণ-শিল্প (tapestry)। এগুলোর প্রত্যেকটিকেই ফরাসি নৌবাহিনীর জন্য জাহাজনির্মাণের মতোই গুরুত্ব দেওয়া হতো!

পক্ষান্তরে, রেস্টোরেশন যুগের ইংলন্ডে তখন পরিস্থিতিটি ছিল অন্যরকম। পূর্ববর্তী রিপাব্‌লিকান যুগের রেশ তখন রয়েছে, দেশের প্রকৃত সম্পদ তখন অভিজাত জমিদার এবং বণিকদের হাতে। সেদেশে প্রয়োজনীয় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণারই বরং অভাব ছিল। সদ্যোস্থাপিত রয়্যাল সোসাইটির 'ফেলো'রা নিজেদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার খরচ নিজেরাই দিতেন। সদস্য-পিছু সাপ্তাহিক চাঁদা ছিল এক শিলিং। সে চাঁদা সংগ্রহ করা বেশ কষ্টকর ছিল। আর ঐ টাকা থেকে সম্পাদকের এবং ভবন-অধ্যক্ষের (curator) মাইনে যোগাতেও বেশ অসুবিধা হতো : এঁরা 'দর্শনে এবং গণিতে সুপণ্ডিত হবেন, পর্যবেক্ষণকার্যে ও অনুসন্ধানকার্যে সুদক্ষ হবেন' এবং 'সোসাইটির প্রতি অধিবেশনে অন্তত তিন-চারটি উত্তম পরীক্ষানিরীক্ষা সংগঠন করার বন্দোবস্ত করবেন'; অথচ 'সোসাইটি যতদিন না উপযুক্ত তহবিল গঠন করতে পারছে, ততদিন তাঁরা কোনো পারিশ্রমিকের আশা করবেন না।'

বিজ্ঞানসভাগুলিকে সরকার স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে চিন্তাভাবনার মধ্যে একটা সুষমতা এল, এবং বিতর্কমূলক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রসঙ্গগুলোকে এড়িয়ে চলা হলো। ফ্রান্সে চার্চ মহল অ্যারিস্টটলবাদের ওপর গুরুত্বদানের ব্যাপারটা অনিচ্ছাভরে প্রত্যাহার করে নিয়ে. দেকার্ত-প্রস্তাবিত আপসরফাকে স্বীকার করে নিল। বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন শাখাকে স্বতন্ত্র করে তোলার এই ব্যাপারটি ব্রিটেনেও সংঘটিত হলো, কিন্তু ভিন্নপথে। সতেরো শতকের মধ্যপর্বে মহাবিদ্রোহের (the Great Rebellion) দরুন সেখানে নানারকম অসুবিধে দেখা দেয়। তাছাড়া ধর্মতত্ত্ব আর রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যেসব অন্তহীন বিতণ্ডা সে যুগের বুদ্ধিজীবীদের মনকে অধিকার করেছিল, আদিযুগের বিজ্ঞানীরা সেসবও এড়িয়ে চলতে চাইছিলেন। এই দুটি কারণবশত সেদেশে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রটি স্বতন্ত্র হয়ে যায়। 1663 সালে হুক রয়্যাল সোসাইটির সংবিধানের যে খসড়া প্রস্তাবনাটি লেখেন তাতে বলা হয়: 'রয়্যাল সোসাইটির কাজ হবে: পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ানো; যাবতীয় ব্যবহারিক প্রয়োগকৌশল, ম্যানুফ্যাকচার, যন্ত্রপ্রক্রিয়া, এনজিন এবং উদভাবনের উন্নতি ঘটানো। ঈশ্বর, অধিবিদ্যা (metaphysics), নৈতিকতা, রাজনীতি, ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামানো তার কাজ নয়' (ঐ)।

প্রতিশ্রুতি এবং কর্মকৃতিত্ব

লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, ফ্রান্স আর ইংলন্ড দুদেশেই বিজ্ঞানসভার সংগঠিত সক্রিয়তার পর্বটি খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। 1690 সাল নাগাদ দুটি সভাই রীতিমতো নড়বড়ে হয়ে ওঠে। পরে আঠেরো শতকে এদের যে পুনরুজ্জীবন ঘটে সেটাকে নবজীবন লাভ বলাই সংগত। তবে এ দুটি সভার প্রতিষ্ঠা, এবং সমাজে অরা যে-সার্বিক সমর্থন ও ব্যাপক আগ্রহ জাগাতে সক্ষম হয়েছিল, তা থেকে বোঝা যায় যে বিজ্ঞান সেসময়ে উদ্দীপনাকর, কৌতূহলজনক এবং সম্ভবত লাভজনক বলে গণ্য হচ্ছিল। এই লাভজনকতার ব্যাপারটা নিয়েই গুরুতর গোলমাল বাধে। চার শতাব্দী আগের রজার বেকনের মতো ফ্রান্সিস বেকনও পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষের সুবিধার্থে প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে হলে প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আহরণ করা ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে'। কিন্তু একটা চিন্তাধারা আর একটা বাস্তব অবদানের মধ্যে অনেক তফাত। কার্যত দেখা গেল, নব্য বিজ্ঞানচর্চার মাত্র একটি ক্ষেত্রই—জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নৌচালন—প্রকৃত অর্থে

মানুষের কাজে লাগল। সন্দেহ নেই, এই ক্ষেত্রটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মোটের ওপর পদার্থবিদ্যা আর গণিতের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। যেমন জলের গভীরতা কতটা হলে তবে জাহাজ ভাসবে (draught) তার হিসেব বার করেন সার অ্যান্টনি ডীন—জাহাজ জলে না ভাসিয়েই। কিন্তু তাতে করে জাহাজনির্মাণের বাস্তব প্রক্রিয়ায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। আদি রয়্যাল সোসাইটি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল. তার খুব কমই রাখতে পেরেছিল। তাই বিজ্ঞানক্ষেত্রের বহির্ভূত বুদ্ধিজীবীরা যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ তার প্রতি বর্ষণ করেছিলেন, সেটা একেবারে অমূলক ছিলনা। এই ব্যঙ্গবিদ্রূপের সবচেয়ে বিখ্যাত নিদর্শন হলো সুইফ্‌টের *Gulliver's Travels.*

পরিশেষে অবশ্য ফলাফল একেবারেই অন্যরকম হয়েছিল। 'নানাবিধ পেশাকর্মের প্রতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টিকে' জাগিয়ে তুলে রয়্যাল সোসাইটি চিরাচরিত প্রয়োগকৌশলসমূহের এবং ম্যানুফ্যাকচারের একটা যুক্তিশাসিত মূল্যায়নের ও পুনর্গঠনের ভিত্তি রচনা করেছিল। পরবর্তী শতাব্দীতে এই ভিত্তির ওপরেই গড়ে উঠবে শিল্পবিপ্লবের ইমারত। বস্তুত যে বাষ্পীয় এনজিনকে শিল্পবিপ্লবের কেন্দ্রীয় অঙ্গ বলা যেতে পারে, সেই বাষ্পীয় এনজিন খুব সরাসরিই এই প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়। বাষ্পীয় এনজিনকে অনায়াসেই এক *দর্শন-প্রসূত এনজিন* বলা যেতে পারে। একজন বা দুজন বিচ্ছিন্ন উদভাবকের প্রয়াসে এর উদ্ভব হয়নি; ইতালির Académia del Cimento, ইংলন্ডের রয়্যাল সোসাইটি এবং ফ্রান্সের বিজ্ঞান আকাদেমির বিজ্ঞানী-গোষ্ঠীগুলির অবদান এর পেছনে সক্রিয় ছিল।

বিজ্ঞান হয়ে উঠল প্রতিষ্ঠান

আদি বিজ্ঞানসভাগুলোর পত্তনের আরেকটা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ফল ফলল: বিজ্ঞান হয়ে উঠল এক প্রতিষ্ঠান। আইন বা চিকিৎসাশাস্ত্রের মতোই এই নতুন প্রতিষ্ঠানটিও নিজস্ব অভিজ্ঞানচিহ্নে, নিজস্ব গাম্ভীর্যে মণ্ডিত হলো। দুর্ভাগ্যবশত, সেই সঙ্গে, আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্রেরই মতো, খানিকটা জাঁকজমক আর পণ্ডিতয়ানার ভাবও তাকে পেয়ে বসল। এই বিজ্ঞানসভাগুলো বিজ্ঞানক্ষেত্রের বিচারকমণ্ডলীর ভূমিকা পালন করতে লাগল। সে সময় কিছু কিছু চালবাজ লোক. এমনকি কিছু কিছু উন্মাদও, বিজ্ঞানী বলে পার পেয়ে যেত; কে বিজ্ঞানী আর কে চালবাজ বা উন্মাদ, সেটা জনসাধারণের পক্ষে বুঝে ওঠা বেশ কষ্টকর ছিল। বিজ্ঞানসভাগুলোর কর্তৃত্ব প্রবল হয়ে ওঠায় সত্যিকারের বিজ্ঞানীদের আলাদা করে নিয়ে এইসব চালবাজ বা উন্মাদদের বিজ্ঞানের অঙ্গন দূর করা সম্ভব হলো। তবে এদের দূর করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত কিছু কিছু বিপ্লবী ধারণাকেও স্বীকৃত বিজ্ঞানের অঙ্গন থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছিল— অন্তত তখনকার মতো। সভার অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি ও বাস্তব জীবনের প্রায় যাবতীয় ব্যাপার নিয়েই চর্চা করতেন। তাঁদের *Philosophical Transactions* থেকে দেখা যায়, নক্ষত্রসমূহের দূরত্ব থেকে আরম্ভ করে লঙ্কা-জলের (pepper water) কীটাণু পর্যন্ত; রঙে ছোপানোর কৌশল থেকে আরম্ভ করে লন্ডন ও তার শহরতলীর সাপ্তাহিক মৃত্যু-তালিকা পর্যন্ত সব ব্যাপারেই তাঁদের অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত ছিল।

নব-সংগঠিত এই বিজ্ঞানের প্রথম ইশতেহার রূপে 1667 সালে লিখিত হলো *History of the Royal Society.* সোসাইটির বয়স তখন মাত্র পাঁচ। বিশপ স্প্র্যাটের লিখিত এই 'ইতিহাসটি' নিছক ইতিহাস নয়, বরং বলা যেতে পারে পরীক্ষাভিত্তিক দর্শনের এক কর্মসূচী এবং পক্ষসমর্থন। নানাবিধ আপ্তবাক্য-নির্ভর দর্শনের নিন্দা করে অবশেষে স্প্র্যাট অনুমোদনসূচক সুরে লিখছেন: 'তৃতীয় ধরনের নব্য দার্শনিক হলেন তাঁরা যাঁরা প্রাচীনদের সঙ্গে নিছক দ্বিমত পোষণ করেই ক্ষান্ত না হয়ে সময়সাপেক্ষ কিন্তু সুনিশ্চিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংগঠনের সঠিক পন্থাটি প্রণয়ন করেছেন। আয়ুর হ্রস্বতা, নানারকম কাজে ব্যাপৃত থাকা এবং

সম্পদের অপ্রতুলতা— এইসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে যতদূর সম্ভব পরীক্ষানিরীক্ষার কাজ তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন।' রয়্যাল সোসাইটিতে সকল দেশের ও সমাজের সর্বস্তরের এবং যে কোনো পেশায় নিযুক্ত লোকেদের অন্তর্ভুক্তিকে সমর্থন করেন স্প্র্যাট। অতঃপর তিনি লেখেন সোসাইটি যে মূল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, 'সেটি হচ্ছে আমাদের এই যুগের বিশেষ মানসিকতা। পরীক্ষানিরীক্ষার নিপুণতা এখন এত দূর ব্যাপ্ত হয়েছে যে এদেশে যদি আরো একটি বা দুটি অনুরূপ সোসাইটি থাকত, তাহলেও সেগুলো চালাবার জন্য পরীক্ষা-নিপুণ লোকের অভাব হতো না। চতুর্দিক এখন এই কাজ নিয়ে মুখরিত। প্রতিদিনই কোনো না কোনো দুর্লভ জিনিসের আবিষ্কার ঘটছে। কেবল যে কৃতবিদ্য এবং সুপরিচিত দার্শনিকরাই সে সব আবিষ্কার করছেন তা নয়; কারিগরদের কর্মশালা, বণিকদের দেশাভিযান, কৃষিজীবীদের লাঙল, শিকারীদের মৃগয়াক্ষেত্র, মাছের ভেড়ি, উদ্যান, অভিজাতদের নিজস্ব বাগান— সমস্ত কিছুই এ ব্যাপারে সক্রিয়। ভবিষ্যতে কী হবে তা নিয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে আমরা অবশ্যই আশাবাদী। আমরা বিশ্বাস করি ভবিষ্যতেও অনুসন্ধিৎসু মনের বিশেষ অভাব ঘটবে না। তাঁদের সামনে পথ তো তৈরিই থাকছে। আমাদের কাজের প্রথম ফসল তাঁরাই ভোগ করবেন, আর সেই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হবেন।'

স্প্র্যাট রয়্যাল সোসাইটি-কৃত পরীক্ষানিরীক্ষা এবং সোসাইটির ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করেছেন 'তাঁদের বক্তৃতার ধরন' বিষয়ে মন্তব্য করে। তিনি 'অপ্রয়োজনীয় বাড়তি বাগবিস্তার' পরিহার করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন। তিনি পরামর্শ দেন যে এই উদ্দেশ্যে 'যাবতীয় সম্প্রসারণ, প্রসঙ্গবিচ্যুতি এবং অলংকরণের বোঝা একেবারে ছেঁটে ফেলতে হবে। ফিরে যেতে হবে সেই আদিম বিশুদ্ধতার স্তরে, যখন মানুষ প্রায় একেকটি শব্দেই একেকটি বক্তব্য প্রকাশ করত। সোসাইটি তার সভ্যদের সুবদ্ধ, নিরলংকার, স্বাভাবিক ভাষায় কথা বলতে বাধ্য করেছে। দ্ব্যর্থহীন অভিব্যক্তি, পরিচ্ছন্ন অর্থ এবং সহজ সাবলীলতার সন্নিপাত ঘটায় তাঁদের ভাষা প্রায় যেন এক গাণিতিক সরলতায় উপনীত হয়েছে। বাকপটু লেখক কিংবা পণ্ডিতদের ভাষাভঙ্গি পরিহার করে তাঁরা কারিগর, গ্রামের লোক এবং বণিকদের ভাষাভঙ্গি রপ্ত করে নিয়েছেন।'

এটা ঘটনা যে সতেরো শতকের শেষের দিকে ইংরেজি ভাষা অদ্ভুতভাবে সরল হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে একশো বছর পরে স্যামুয়েল জনসন স্প্র্যাট সম্বন্ধে একটা বিচিত্র মন্তব্য করেছেন: 'নিতান্ত অনিয়ত এবং অচিরস্থায়ী একটি বিষয় নিয়ে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও এই বইটির মূল্য যে সময়ের সঙ্গে হ্রাস পায়নি তার কারণ হচ্ছে ভাবের নির্বাচন এবং ভাষার সৌকর্য। সোসাইটির সভ্যরা কী কাজকর্ম করেছিলেন তা জানবার জন্য কেউ আজ *History of the Royal Society* পড়ে না; পড়ে স্প্র্যাট তাঁদের কাজকর্মের বিবরণ কীভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তা জানবার জন্যে' *(Lives of English Poets)*।

প্রকৌশল-চর্চার প্রধান ক্ষেত্র

গোড়ার দিকে মনে হয়েছিল, দার্শনিক অনুসন্ধানের সাহায্যে তাবৎ জিনিসেরই উন্নতি ঘটানো যাবে। কিন্তু পরে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রের প্রতি গুণী ব্যক্তিদের মনোযোগ নিবদ্ধ হলো। প্রসারমান বাণিজ্য আর ম্যানুফ্যাকচারের সবচেয়ে আশু প্রয়োজনগুলো মেটানোর ব্যাপারে নব্য দর্শনের যেসব ভাবনা ফলপ্রদ বলে প্রমাণিত হলো, সেইগুলোই হয়ে উঠল চর্চার বিশেষ ক্ষেত্র। এর মধ্যে প্রধানতম ক্ষেত্রটি ছিল নৌচালনে উন্নতির প্রয়োজনে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন, বিশেষ করে দ্রাঘিমা-সমস্যার সমাধান। এই সমস্যাটি আবার সৌরব্যবস্থার প্রকৃত গঠন ও ক্রিয়ার সঙ্গেই ওতপ্রোত ছিল। সৌরব্যবস্থার ধারণাটি তত্ত্বগত স্তরে তখন স্বীকৃত, কিন্তু

তার ভৌত ব্যাখ্যা তখনো মেলেনি। তাছাড়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা *গাণিতিক* ব্যাখ্যা দেওয়ার পক্ষেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রটি ছিল প্রশস্ততম। সে সমাধান শেষ পর্যন্ত করেন নিউটন, এবং সংগত ভাবেই তা নব্য বিজ্ঞানের এক সুমহান বিজয়স্তম্ভ বলে গণ্য হয়েছিল।

কিন্তু এরই পাশাপাশি অন্য যেসব ক্ষেত্রে কাজকর্ম হচ্ছিল, পববর্তীকালে সেগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। তার মধ্যে একটি হলো আলোকবিদ্যা এবং আলোকতত্ত্ব। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সূত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে, আর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে জীববিজ্ঞানের সঙ্গে আলোকবিদ্যার আত্মীয়তা ছিল। আরেকটি ক্ষেত্র হলো গ্যাস-বলবিজ্ঞান (pneumatics)। এক্ষেত্রে শূন্যাবস্থা সংক্রান্ত প্রকৌশলে যে উন্নতি ঘটে, পরে তার গুরুত্ব শিল্পোৎপাদনে অপরিসীম বলে প্রমাণিত হয়। প্রাচীন গ্রীকদের আমল থেকেই এই শূন্যাবস্থাকে ঘিরে দার্শনিক বিতর্ক চলে আসছিল। সে অবস্থা যে বাস্তবে সত্যিই সৃষ্টি করা যায়, পরীক্ষার ভিত্তিতে তা প্রমাণ হওয়ায় ডিমক্রিটাসের কণিকাবাদী তত্ত্বপ্রকল্পকে আবার জাগিয়ে তোলা সম্ভব হলো। পুনরুজ্জীবিত এই কণিকাবাদী তত্ত্ব রসায়নের ক্ষেত্রে যুক্তিশাসিত এবং পরিমাণাত্মক ব্যাখ্যা দেওয়ার পথে প্রথম সূত্রটির সন্ধান দিল। তার আগে অব্দি রসায়ন ছিল কতকগুলো পদার্থের প্রস্তুতপ্রণালী আব কিছু অলৌকিক ব্যাখ্যার তালিকা মাত্র। এই রসায়ন আবার শারীরতত্ত্বের (physiology) সূচনাপর্বের সঙ্গে যুক্ত ছিল। রক্তেব চরিত্র, ফুসফুসেব কাজ, স্নায়ু ও পেশির ক্রিয়া, খাদ্য পবিপাকের প্রক্রিয়া— এইসব কিছু নিয়েই আলোচনা ও পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছিল নব্য বস্তুবাদী দর্শনের চেতনার আলোকে। নানান বিষয়ের এই যে বিচিত্র ব্যাপ্তি, এটা সে যুগের ব্যক্তিমানুষের নাগালের বাইরে ছিল না। তাঁদের জীবন ও কর্মের বিবরণ থেকে সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। এঁদেব মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন রবার্ট বয়েল এবং তাঁর একদা-সহকারী রবার্ট হুক।

রবার্ট বয়েল

রবার্ট বয়েলেব জন্ম 1627 সালে, লিস্‌মব-এ। কর্ক-এর প্রথম আর্ল রিচার্ড বয়েলের তিনি সপ্তম পুত্র এবং ত্রয়োদশতম সন্তান। বিচার্ড বয়েল ছিলেন এলিজাবেথীয় যুগের দুর্ধর্ষ এবং সফল জমি-দখলকারীদের অন্যতম। রবার্ট তাঁর জীবনের সবচেয়ে গঠনশীল দিনগুলি কাটিয়েছিলেন জিনীভায়— পিউরিটান বাতাবরণে। সেখানে তাঁর ধর্মান্তর ঘটে। সমসাময়িক বিজ্ঞানী পাস্কাল ও স্টেনো'ব জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। তবে পাস্কালের মতো বয়েল এর ফলে বিজ্ঞানবিমুখ হয়ে ওঠেননি। তিনি বরং বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েই দিব্যজ্ঞানের সমর্থন খুঁজতে উৎসাহী হন। খানিকটা এই কারণে, এবং খানিকটা তাঁর আজীবন অসুস্থতার কারণে, বয়েল ভোগবিমুখ জীবন যাপন করতেন। গৃহযুদ্ধের সময়ে তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। তাঁর প্রভূত ধনসম্পদ সবই নিয়োজিত হয়েছিল পরীক্ষাভিত্তিক নব্য দর্শনের চর্চায়। অক্সফর্ডের 'অদৃশ্য কলেজে' তিনি যোগ দেন। রয়্যাল সোসাইটির আদি সহায়কদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। রয়্যাল সোসাইটির প্রথম সভাপতির পদে বসবার জন্য তাঁকেই আহ্বান করা হয়েছিল, কিন্তু শপথবাক্য নিয়ে নৈতিক আপত্তি থাকায় তিনি সে পদ প্রত্যাখ্যান করেন। বস্তুত, রয়্যাল সোসাইটির আদিযুগে রয়েলই ছিলেন তার প্রাণপুরুষ (ঠিক যেমন, পরে সোসাইটির স্বর্ণযুগে নিউটন হবেন তার প্রাণপুরুষ)। ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তিনি প্রচুর লেখালিখি করতেন। *Spring of Air* গ্রন্থটি বাদ দিলে, তাঁর রচনাগুলির মধ্যে *Seraphick Lover, The Sceptical Chymist* এবং *Unsuccessfulness of Experiments* খুবই বিখ্যাত। কণিকাবাদী তত্ত্বে আগ্রহ থাকায় বয়েল অবশেষে শূন্যাবস্থা এবং গ্যাসের নিয়মাবলী সংক্রান্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলি করতে সমর্থ হন। তার পরে অবশ্য তিনি আর তেমন কোনো সাফল্য

অর্জন করেননি। তার অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথমত, তাঁর গাণিতিক পটুত্ব এবং পরীক্ষা সংগঠনের নৈপুণ্য যথোচিত ছিল না। তবে এর চেয়েও বড়ো কারণ হচ্ছে, তিনি বলবিজ্ঞানের সূত্র প্রয়োগ করে রসায়নের সমস্যার সমাধান করতে চাইতেন। ঐসব সূত্র রসায়নে প্রযুক্ত হবার মতো নয়, অথচ অন্য কোনো পদ্ধতিতে সেসব সমস্যার সমাধান করবার মতো যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য তখনো জমা হয়নি। তাঁর আগ্রহের ক্ষেত্র শারীরতত্ত্ব এবং চিকিৎসাবিদ্যাতেও প্রসার লাভ করেছিল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বড়ো কোনো সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা তখন সুদূরপরাহত ছিল। তাহলেও, তাঁর এই আগ্রহ এবং উদ্দীপনা অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, এবং পরবর্তী শতকের বৈজ্ঞানিক সাফল্য তাঁর এই প্রেরণার কাছে বহুলাংশে ঋণী। বয়েলের মধ্যে নব্য বিজ্ঞানের ধার্মিকতাপন্থী এবং পরহিতব্রতী দিকটি লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বরের যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ঐশী মহিমা কীভাবে ব্যক্ত হয়েছে তার পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছিলেন বয়েল। আর তারই সঙ্গে অন্যান্য মানুষকে সাহায্য করার ব্রতকে মেলাতে চেয়েছিলেন। পৌত্তলিকদের ধর্মান্তরিত করবার জন্য তাঁর যে পরিকল্পনা ছিল তাকে কার্যে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি বারমুডা ও ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্য পর্যন্ত হয়েছিলেন। তবে এইসব উদ্দেশ্যসাধনে তাঁর মনোভাব মধ্যযুগের ধার্মিকতাপন্থীদের তুলনায় একেবারে বিপরীত ছিল— তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রগাঢ়ভাবে ব্যবহারিক। *That the Goods of Mankind May be Increased by the Naturalist's Insight into Trades*-শীর্ষক পুস্তিকায় তিনি লেখেন: 'আমি আশা করি আপনারা সকলেই এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে বিভিন্ন পেশাকর্ম লইয়া অনুসন্ধান করিলে পরীক্ষাভিত্তিক দর্শনের অগ্রগতি তো ঘটিবেই, উপরন্তু পেশাগত কর্মগুলিরও উন্নতি হইবে। সুতরাং মানুষের সাম্রাজ্যবিস্তারে প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞানীরা যত প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন, তাহাদিগের মধ্যে বিভিন্ন পেশাকর্মগুলিকে সুষ্টুভাবে প্রভাবিত করার পন্থাটির গুরুত্বই সমধিক।'

রবার্ট হুক

নানা দিক থেকেই বয়েল তাঁর প্রধান সহকারী এবং আজীবন বন্ধু রবার্ট হুকের চেয়ে আলাদা ছিলেন। অভিজাত বয়েল যেন করুণা করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর দরিদ্র হুককে ঐ বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে দিয়েই নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করতে হতো। হুক ছিলেন আইল অব ওয়াইটের এক গির্জা-কর্মচারীর পুত্র। চাকরগিরির বিনিময়ে তিনি অরিয়ল্ কলেজে বিনা পয়সায় স্নাতকশ্রেণীতে পড়বার অনুমতি পেয়েছিলেন। সেই সময়েই বয়েল অক্সফর্ডে আসেন। হুকের সঙ্গে অচিরেই তাঁর যোগাযোগ হয়। খুব সম্ভব বয়েলের পরীক্ষানিরীক্ষার যাবতীয় যন্ত্রপাতি হুকই তৈরি করে দিতেন। শূন্যাবস্থা ও গ্যাস নিয়ে বয়েলের পরীক্ষানিরীক্ষাগুলোও সম্ভবত হুকই করে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে হুক চলে যাবার পর বয়েল পরীক্ষা-সংগঠক হিসেবে আর বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি। রয়্যাল সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার পর হুক তার পরীক্ষাধ্যক্ষ (curator of experiments) নিযুক্ত হন। এই অতি দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য তিনি অতি সামান্য বেতন পেতেন এবং সেটাও খুব নিয়মিতভাবে তাঁর হাতে আসত না। কাজেই বাড়তি রোজগার করার জন্য তিনি 1666-এর বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের পর লণ্ডননগরীর পুনর্গঠন-পরিকল্পনার কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন।

হুকের যদি খানিকটা সামাজিক প্রতিষ্ঠা থাকত, আর সারাজীবন যদি কুৎসিত চেহারা আর অসুস্থতার কারণে তাঁকে ভুগতে না হতো, তাহলে নিশ্চয়ই মানুষ হিসেবে তিনি অমন গোঁয়ার, সন্দেহপ্রবণ এবং ঝগড়াটে হয়ে উঠতেন না। এবং এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে ঐকারণেই বিজ্ঞান-ইতিহাসে তাঁর বিরাট ভূমিকা পূর্ণ স্বীকৃতি পায়নি। বয়েল যদি হন রয়্যাল সোসাইটির

প্রাণপুরুষ, তাহলে হুক হলেন তার চোখ আর হাত। ফ্যারাডের আগে হুকই ছিলেন পরীক্ষাভিত্তিক পদার্থবিদদের চূড়ামণি। তবে, ফ্যারাডেরই মতো, তাঁর গাণিতিক ব্যুৎপত্তি নিউটন বা ম্যাক্সওয়েলের তুলনায় ন্যূন ছিল। বলবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন আর জীববিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল তাঁর আগ্রহ। স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে গবেষণা ক'রে 'হুকের সূত্র' নামে প্রসিদ্ধ যে সূত্রটি তিনি আবিষ্কার করেন, সেটি পদার্থবিদ্যার হ্রস্বতম সূত্র: *ut tensio sic vis* (বলের সমানুপাতে বিস্তৃতি ঘটে)। ব্যালান্স চক্রের উদভাবনটিও তাঁরই, যার সাহায্যে সঠিক সময়নির্দেশক ঘড়ি এবং ক্রনোমিটার তৈরি করা সম্ভব হয়। *Micrographia* গ্রন্থে তিনি অনুবীক্ষণ-দৃষ্ট জগতের প্রথম সুবিন্যস্ত বিবরণ লেখেন। ঐ গ্রন্থেই কোষের (cell) আবিষ্কারের কথা জানা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞান-সংক্রান্ত নানারকম পরিমাপের কাজে দূরবীক্ষণের প্রয়োগ ঘটান তিনিই, তিনিই ছিলেন মাইক্রোমিটারের উদভাবক। বাষ্পীয় এনজিন নির্মাণের পথ প্রশস্ত করার কাজে দনি পাপ্যাঁর সঙ্গে তাঁর ভূমিকাও স্মরণীয়।

তবে বিজ্ঞানে তাঁর যে অবদানটি সম্ভবত মহত্তম, তার স্বীকৃতি এতদিনে মিলছে। বর্গের ব্যস্তানুপাত সূত্র (inverse square law) এবং সর্বব্যাপী অভিকর্ষের ধারণাটির আদি প্রবর্তকের সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। একটু পরেই অবশ্য আমরা দেখতে পাব, নিউটনের অতুলনীয় গণিতসিদ্ধি কীভাবে হুককে ম্লান করে দিয়েছিল। কিন্তু আজ এটা বোঝা যাচ্ছে যে এর মূল ভৌত ভাবনাটি ছিল হুকেরই, এবং সেই কৃতিত্ব থেকে তাঁকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। বস্তুত, সতেরো শতকে একজন গুণী পরীক্ষা-সংগঠক কী ধরনের সুযোগসুবিধা পেতেন এবং কী ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন তার নিদর্শন হুকের জীবন। শুধু তাই নয়, হাজার হাজার বছর ধরে সহজাত ক্ষমতাসম্পন্ন গুণী কারিগরদের হাতে ও মস্তিষ্কে কী বিপুল পরিমাণ উদভাবনশীলতা আর বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি যে লুক্কায়িত হয়ে ছিল, সেটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর জীবন থেকে।

৪. নতুন এক বিশ্বছবি

প্রকৃতি এবং প্রয়োগবিদ্যাসমূহের যাবতীয় ক্ষেত্র জুড়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো, আর যেসব ক্ষেত্রে গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব সেইসব ক্ষেত্রে গঠনমূলক তত্ত্ব প্রণয়ন করা—এই ছিল সেযুগের বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী যুগের মতো এখন আর অ্যারিস্টটলীয় পদার্থবিদ্যা এবং গ্যালেনীয় শারীরতত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করার জন্য কোমর বেঁধে লাগবার কোনো প্রয়োজন ছিলনা। নতুন যুগের গুণীরা প্রায় একবাক্যেই কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও এবং হার্ভের তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পূর্বসূরীদের তুলনায় নতুন যুগের এই গুণীদের স্বাতন্ত্র্য এইখানেই যে এঁরা এই সব তত্ত্বকে গভীরতর ভৌত (physical) এবং দার্শনিক তাৎপর্যে মণ্ডিত করতে প্রয়াসী হলেন। এই প্রয়াসে প্রথম ব্রতী হন দেকার্ত। তিনি যে বিশ্বব্যবস্থার কথা বললেন তাতে নিছক ব্যাপ্তির ওপর জোর পড়ল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাড়িত অতিসূক্ষ্ম বস্তু দ্বারা ক্রমাগত নিশ্ছিদ্ররূপে পূর্ণ হয়ে চলেছে—এই ছিল তাঁর *বস্তুনিবিড় বিশ্বের (plenum)* মতবাদ।

কণিকাবাদী দর্শন : গাসদি

তবে আরেকটি ধারণাও—এবং সে ধারণা অনেক পুরোনো—মাথাচাড়া দিচ্ছিল। অ্যারিস্টটল আক্রান্ত হওয়ায় ডিমক্রিটাসের পরমাণু-কণার তত্ত্বের পুনরাবির্ভাবের পথ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ফ্রান্সের প্রভঁস্ প্রদেশের এক

যাজক—সুপণ্ডিত, চিন্তাশীল, গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক গাসঁদি (1592-1655)। স্বভাবে যদি তিনি বিনম্র ও চুপচাপ না হতেন, তাহলে হয়তো গাসঁদি তাঁর সমসাময়িক দেকার্ত্-এর বিরাট ছায়ায় এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন না। কেননা, বিজ্ঞানের অঙ্গনে গাসঁদি-র অবদান ছিল মস্ত। জ্যোতির্বিদ হিসেবেও তিনি মোটেই উপেক্ষণীয় ছিলেন না। বুধগ্রহের পরিবৃত্তি (transit) প্রথম লক্ষ্য করেন তিনিই। তিনি ছিলেন আবহবিদ্যার (meteorology) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অপসূর (parhelia) এবং সুমেরুপ্রভা (Aurora Borealis) নিয়ে প্রথম গবেষণার কৃতিত্বও তাঁর। এহেন মানুষটি এপিকিউরাস ও লুক্রেশিয়াসের পুরোনো পরমাণু-তত্ত্বের নিছক পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েই ক্ষান্ত হলেন না; তিনি তার সঙ্গে রেনেসাঁস যুগের অগ্রসর পদার্থবিদ্যার সংযোগ ঘটিয়ে একটি ভাবধারার উদয় ঘটালেন। গাসঁদি-কথিত পরমাণুগুলি ভরযুক্ত এবং জাড্যযুক্ত (inertia) কণা। এরা শূন্যাবস্থায় (vacuum) চলাফেরা করে। গ্যালিলিও-র উত্তরসূরীরা ততদিনে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে শূন্যাবস্থা সৃষ্টি করা বাস্তবে সম্ভব। গাসঁদি পরমাণুর যে সংজ্ঞার্থ দিয়েছিলেন, পঞ্চাশ বছর পরে নিউটন-রচিত *Opticks* গ্রন্থে প্রায় আক্ষরিকভাবেই তাকে স্বীকার করা হয়। অকাট্য যুক্তিসহযোগে গাসঁদি তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন। ফলে যেসব প্রকৃতি-দার্শনিক দেকার্ত্-এর ঘূর্ণি-সংকুল বস্তুনিবিড় বিশ্বের তত্ত্বকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করে নেননি, তাঁরা যেন আপনা থেকেই, প্রায় যেন অজান্তেই, গাসঁদি-র ধারণাকে বরণ করে নিলেন।

সে যুগের গণিত-ও-বলবিজ্ঞান-নির্ভর মানসিকতায় এই কণিকাবাদী তত্ত্বপ্রকল্প অনায়াসেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলো। গ্যালিলিও এবং দেকার্ত্-এর গতিবিজ্ঞানের সুবাদে ছোটো ছোটো দানার মতো কণার চলনের হিসেব করাটা তখন একখণ্ড সমসত্ত্ব পরিসরের (homogeneous space) হিসেবের থেকে অনেক সহজসাধ্য হয়ে গিয়েছিল। আর গাসঁদি-র ধার্মিকতার খ্যাতি থাকায় এই কণাগুলোর ওপর নিরীশ্বরবাদী বিপজ্জনক প্রবণতার কলঙ্কও বর্তালনা। এই নব্য বলবিজ্ঞানের নিহিত তাৎপর্য সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবেই বললেন: ঈশ্বর এই বস্তুগঠিত বিশ্বকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন না; একেবারে সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর যাবতীয় কণাকে যে ঠেলা দিয়েছিলেন, তার জোরেই ঐশ্বরিক নিয়তির প্রসাদে কণাগুলোর তাবৎ ভবিষ্যৎ চলন ও সম্মিলন নির্ধারিত হয়ে চলেছে।

'দর্শন'-যন্ত্র

সে যুগের নব্য বিজ্ঞানে পরীক্ষানিরীক্ষার ওপর জোর দেওয়া হতো। তার জন্যে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত যন্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নব্য বিজ্ঞানীদের কাজের সরঞ্জাম তখনো নিতান্ত সাদাসিধে ছিল। বৃহদাকার এবং দামী সরঞ্জাম বলতে ছিল দূরবীক্ষণ। ইচ্ছে করলে তখন প্রায় যে-কোনো সাধারণ বাড়িতেই একটি *elaboratory* বা 'পরীক্ষামন্দির' তৈরি করা যেত। তাতে থাকত একটা চুল্লি, গোটাকতক বকযন্ত্র আর পাতনযন্ত্র, একটা তুলাযন্ত্র, একটা অণুবীক্ষণ, কয়েকটা ব্যবচ্ছেদ-হাতিয়ার, নবোদ্ভূত একটা হাওয়া-পাম্প, একটা থার্মোমিটার আর একটা ব্যারোমিটার। বাদবাকি সব কিছুই ছিল বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্মিত। এইসব যন্ত্রপাতির সাহায্যেই বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে মহত্তম আবিষ্কারগুলি সংঘটিত হয়েছিল। আপাতত আমরা আলোকবিদ্যা, গ্যাস-বলবিজ্ঞান, রসায়ন এবং শারীরতত্ত্বের আবিষ্কারগুলি নিয়ে আলোচনা করব। অতঃপর আমরা সে যুগের যা কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চলনপ্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব।

শতাব্দীর সূচনাপর্বেই ঘটনাচক্রে ব্যবহারিক দিক থেকে উপযোগী দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির

আবিষ্কার হয়। এর ফলে আলোকবিদ্যা সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহ জেগে ওঠে। কারণ একটা যন্ত্র একবার চালু হয়ে গেলে তার উন্নতি ঘটানোর তাগিদে তার কর্মপ্রক্রিয়াটি ভালো করে বোঝা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক সূত্রাদির আবিষ্কার ঘটে, এবং সেইসব সূত্রের প্রয়োগে নতুনতর যন্ত্রপাতি তৈরি করা সম্ভব হয়। সতেরো শতকের আলোকবিদ্যা বহুলাংশে গড়ে উঠেছিল প্রতিসরণের (refraction) ব্যাপারটিকে অনুধাবন করার এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ত্রুটিগুলি দূর করবার প্রয়াসে। প্রতিসরণের ঘটনাটির ওপরেই তো দাঁড়িয়ে আছে দূরবীক্ষণ।

আল্‌হাজেন এবং পরে তাঁর দুই মধ্যযুগীয় শিষ্য ভিটেলো (Witelo) ও ফ্রেইবুর্গ শহরের ডীট্রিশ্ চারশো বছর আগে প্রতিসরণ নিয়ে যে গবেষণা করেছিলেন, সেখান থেকেই কাজ শুরু করতে হলো। তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে অপেক্ষাকৃত ঘন কোনো মাধ্যমে আলোকরশ্মিগুলি বেঁকে বা ভেঙে যায়— অর্থাৎ প্রতিসরিত হয়। কিন্তু প্রতিসরণের নিয়মটি তাঁরা বার করতে পারেননি, ফলে লেন্সের ক্রিয়াও হিসেব করতে পারেননি। সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যান্ডের স্নেল্ (1591-1626) প্রতিসরণের সঠিক নিয়মটি বার করেন। দেকার্ত্ এই নিয়মটিকে কাজে লাগিয়ে প্রতিসরণের একটা ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, চলমান আলো-কণাগুলি বাতাসে যে গতিতে চলে, প্রতিসারক মাধ্যমে তার চেয়ে দ্রুতগতিতে চলতে বাধ্য। এ সিদ্ধান্তটি ছিল অস্বাভাবিক, এবং পরে এজন্য অনেক ভুগতে হয়েছিল। যাই হোক, স্নেল্-সূত্রের কল্যাণে আলোকবিদ্যা যেন জ্যামিতির এক অঙ্গ হয়ে উঠল। কিন্তু যা ভাবা গিয়েছিল তা হলো না: এই সূত্রের প্রয়োগে কার্যক্ষেত্রে নিখুঁত দূরবীক্ষণ বানানো সম্ভব হলো না। বিশ্রী সব খুঁত রয়েই গেল দূরবীক্ষণে। বিশেষ বিরক্তিকর ছিল জ্যোতিষ্কসমূহের বিম্বের চারপাশে রঙিন আলোর বলয়। স্বচ্ছ কোনো বস্তুর মধ্যে দিয়ে চালিত হলে আলো যে রামধনু-রঙে ভেঙে যায় সে ব্যাপারটা বহু আগে থেকেই জানা ছিল। রামধনু সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানবার জন্য মধ্যযুগের বিজ্ঞানীরা ত্রিশিরা কাচ (prism) নিয়ে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষাও চালিয়েছিলেন। তাঁরা এটুকু লক্ষ্য করেছিলেন যে লাল আলোর প্রতিসরণ হয় সবচেয়ে কম, আর নীল আলোর সবচেয়ে বেশি। এর বেশি কিছু তখন বোঝা যায়নি। রামধনু নিয়ে দেকার্ত্ যে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন তাতেও এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায়নি। এই বর্ণ-সমস্যার সমাধান অবশেষে করেন নিউটন। পদার্থবিদ্যার অঙ্গনে এটিই ছিল তাঁর প্রথম স্বীকৃত কীর্তি (নিউটনের সামগ্রিক কর্মকৃতি নিয়ে আলোচনা করব একটু পরে, অভিকর্ষ নিয়ে তাঁর কাজের আলোচনা প্রসঙ্গে)।

নিউটনের *Opticks*: বর্ণ-তত্ত্ব

দূরবীক্ষণের বর্ণরঞ্জিত বিম্বের সমস্যাটিকে নিউটন প্রথমে পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছিলেন প্রতিসরণের ব্যাপারটিকেই পাশ কাটিয়ে। এজন্য তিনি নতুন ধরনের 'প্রতিফলক দূরবীক্ষণ' নির্মাণ করেন। আজকের দিনের অতিকায় দূরবীক্ষণের এবং প্রতিফলক অণুবীক্ষণের পূর্বসূরী এই যন্ত্র। কিন্তু এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি অতঃপর সরাসরি বর্ণ-সমস্যাটিকেই আক্রমণ করলেন। ত্রিশিরা কাচ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে দেকার্ত্ যে জায়গায় পৌঁছে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেখান থেকেই হাল ধরলেন নিউটন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার কুশলতা এবং যুক্তির এক অসাধারণ সম্মিলন ঘটিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে ত্রিশিরা কাচের— বা রামধনুর—রংগুলি ঐ কাচের দ্বারা সৃষ্ট হয় না, সেগুলি সাধারণ সাদা আলোরই স্বাভাবিক উপাদান। কিন্তু এই গবেষণা তাঁর মূল সমস্যার সমাধান করতে পারল না। তিনি নিজেই সখেদে দেখিয়েছিলেন যে লেন্সের বর্ণ-বিচ্ছুরণকে (disperison) কিছুতেই শোধরানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাঁর ভুল হয়েছিল। এবং এক্ষেত্রে তাঁর অবিসংবাদী প্রাধান্য ব্যবহারিক দূরবীক্ষণের উন্নতি ঘটানোর কাজে প্রায় আশি বছর ধরে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত ক্লিন্‌জেস্তিয়ের্না (Klingestjerna,

1698-1765) নামে জনৈক সুইডিশ গণিতজ্ঞই প্রথম যথোপযুক্ত সাবধানতা সহকারে নিউটনের পরীক্ষানিরীক্ষাগুলি আবার করে দেখেন এবং নিউটনের ভুলটি ধরিয়ে দেন। ক্লিনজেন্তিয়েৰ্না'র এই কাজের খবর পেয়ে যন্ত্র-নির্মাতা ডলনড্ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিসরণ-ক্ষমতা ও বর্ণবিচ্ছুরণ-ক্ষমতাযুক্ত দুটি লেন্সকে পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে একটা বর্ণগত ভারসাম্যে উপনীত হওয়ার ধারণাটিকে কাজে লাগাতে সমর্থ হলেন। এইভাবেই 1758 সালে তৈরি হয় প্রথম অবার্ণ (achromatic) লেন্স—যা কিনা যাবতীয় আধুনিক অক্ষি-যন্ত্রের ভিত্তি।

আলোক : কণা না তরঙ্গ? হাইগেন্স

নিউটন রামধনুর রং ছাড়া অন্যান্য বর্ণ নিয়েও, বিশেষত তেল বা জলের পাতলা উপরিতল থেকে প্রতিফলিত রং নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। সেই গবেষণা থেকেই তিনি বস্তু এবং আলোক উভয়েরই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বা 'দানাদার' চরিত্রের প্রথম আভাস পান। আগে থেকেই দর্শনচর্চা এবং গাণিতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সুবাদে তিনি কণিকাবাদী তত্ত্বের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। এখন এই গবেষণা তাঁর প্রত্যয়কে আরো দৃঢ় করল। তিনি সুনিশ্চিতভাবে বললেন, বস্তু মাত্রেই কণাগঠিত। কিন্তু এই একই প্রত্যয় দ্বারা চালিত হয়ে তিনি দেকার্ত্-এর পথ অনুসরণ করে আলোককেও কণা হিসেবে গণ্য করলেন; বললেন, দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে বল যেভাবে লাফিয়ে ওঠে ঠিক সেইভাবে প্রতিফলিত হয়ে আলোকের কণাগুলি যে পথ ধরে চলে সেটিই আলোকরশ্মি রূপে উদ্ভাসিত হয়। বর্ণ-উৎপাদনকারী অন্যান্য কিছু কিছু ঘটনা কিন্তু অন্য এক সিদ্ধান্তের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছিল। ছায়ার একেবারে প্রান্তদেশে, কিংবা অতিসূক্ষ্ম রন্ধ্র বা চুলের প্রান্তে যে রং লক্ষ্য করা যায়, তা নিয়ে নিউটনের বহু আগেই গবেষণা করেছিলেন গ্রিম্যাল্ডি (1618-83)। তিনি এ-ও লক্ষ্য করেছিলেন যে আলোকরশ্মি একেবারে সোজা পথে চলে না, কোনো বস্তুর কাছ ঘেঁষে চলবার সময় তা ঈষৎ বক্র বা অববর্তিত (diffracted) হয়ে যায়। এই দুটি ঘটনা অনুধাবন ক'রে গ্রিম্যাল্ডি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে আলোক তরঙ্গপ্রকৃতি। জলের মৃদু ঢেউ, ধ্বনির ওঠা-পড়া— এইসব পরিচিত ঘটনার সঙ্গেই তা তুলনীয়। সংগীতের স্বরগুলির মতো বিভিন্ন বর্ণেরও রয়েছে স্বতন্ত্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য।

হাইগেন্স এই ধারণাটিকে গাণিতিক রূপ দেন, দেখান যে *আলোকের তরঙ্গ-তত্ত্বের* সাহায্যে অববর্তন এবং পাতলা স্তরের উপরিতল থেকে নির্গত রঙের ঘটনা দুটিকে যুগপৎ ব্যাখ্যা করা যায়। তাছাড়া ক্যালসিয়াম কার্বনেটের এক বিশেষ ধরনের কেলাস বা Iceland spar-এর মধ্যে দিয়ে কোনো বস্তুকে দেখলে তার দুটি বিম্ব ফুটে ওঠে কেন, তার ব্যাখ্যাও হাইগেন্স নিউটনের চেয়ে অনেক সুষ্ঠুভাবে দিতে সমর্থ হলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, নিউটনের অবিসংবাদী প্রাধান্যই সেদিন জয়ী হয়েছিল। ফলে পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে আলোকের তরঙ্গ-তত্ত্ব তার ন্যায্য স্থান অধিকার করতে পারেনি।

অণুবীক্ষণ : অতিক্ষুদ্রের জগৎ

গ্যালিলিও'র হাতের দূরবীক্ষণ যেমন জ্যোতিষ্কজগতের রহস্য ভেদ করেছিল, তেমনি সতেরো শতকের বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের হাতের অণুবীক্ষণ যন্ত্রও নতুন এক অতিক্ষুদ্র জগতের দুয়ার খুলে দিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন মাল্পিগি (Malpighi), হুক, সোঅ্যাম্যার্ডাম (Swammerdam, 1637-80) এবং সর্বোপরি হল্যাণ্ডের সেই তুলনারহিত বস্ত্রবিক্রেতা যাঁর নাম ছিল লেভেন্‌হুক (Leeuwenhoek, 1632-1732)। কীট, উদ্ভিদের অঙ্গ, জলজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু, জননশক্তি-বিশিষ্ট শুক্রাণু— এসবই চলে এল পর্যবেক্ষণের আওতায়, জাগাল বিস্ময়,

জল্পনাকল্পনা আর যুক্তিতর্ক। বড়ো বড়ো প্রাণীর শারীরস্থান সম্বন্ধেও আরো খুঁটিয়ে জানা সম্ভব হলো। হার্ভের রক্ত-সংবহন-তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণিত হলো। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই হোক আর নৌচালনেই হোক, দূরবীক্ষণ জিনিসটা যেমন প্রথম থেকেই হাতেকলমে ব্যবহারিক কাজে লেগেছিল, অণুবীক্ষণের ক্ষেত্রে তা হয়নি। সে যন্ত্রের ব্যবহারিক উপযোগিতা প্রমাণিত হতে হতে আরো দুশো বছর পার হয়ে যায়—অবশেষে কখ্ আর পাস্তুর তার সাহায্যে জীবাণুজনিত অসুখ সারানোর যুদ্ধে নামেন। এই কারণেই অণুবীক্ষণের সাহায্যে কৃত প্রথম যুগের এইসব গবেষণা তখনই অণুবীক্ষণবিদ্যা বা জীববিজ্ঞানে কোনো মহৎ আবিষ্কার ঘটাতে পারেনি। অণুবীক্ষণে চোখ লাগিয়ে যা দেখা যাচ্ছিল তা খুবই মজাদার আর দার্শনিক অর্থে শিক্ষাপ্রদ হলেও সেকালে তার বৈজ্ঞানিক বা ব্যবহারিক মূল্য ছিল অকিঞ্চিৎকর।

ব্যারোমিটার

পদার্থবিদ্যার অঙ্গনে প্রথম যে বড়ো পদক্ষেপটা জ্যোতির্বিজ্ঞান বা নৌচালনের কাজে না লেগে সরাসরি উৎপাদনশিল্পের কাজে লাগল সেটা হলো গ্যাস-বলবিজ্ঞানের (pneumatics) উদ্ভব। প্রাচীন গ্রীকরা যতদূর এগিয়েছিল তাকে ছাড়িয়ে বহুদূরে এগিয়ে গেল এই গ্যাস-বলবিজ্ঞান। এ ব্যাপারে যে আবিষ্কারটির গুরুত্ব চরম, সেটি হলো বাস্তবে শূন্যাবস্থার সৃষ্টি। ব্যবহারিক জলবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে সরাসরি এ আবিষ্কার ঘটে। এতকাল যাবৎ শূন্যাবস্থার ব্যাপারটা ছিল নিছক এক দার্শনিক প্রশ্ন—বিশুদ্ধ যুক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমেই তার নিষ্পত্তি করা হতো। 1643 সালের পর থেকে কিন্তু এটা বাস্তব পরীক্ষানিরীক্ষার অধীন এক প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়। সাধারণ চোষক (suction) পাম্প দিয়ে জলকে কেন বত্রিশ ফুটের বেশি উচ্চতায় তোলা যায় না, এ প্রশ্নটা নিয়ে গ্যালিলিও তাঁর জীবনের শেষ দিকে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেছিলেন। ঘটনাটা যদিও আকর-খনক আর কূপ-খনকদের অনেকদিন ধরেই জানা ছিল, তবু বিদ্বজ্জনেরা কেউই এতদিন এ নিয়ে মাথা ঘামাননি। গ্যালিলিও এই ব্যাখ্যা দিলেন যে ঐ উচ্চতায় পৌঁছে জলস্তম্ভ তার নিজের ভার আর বইতে পারে না বলে আর উঁচুতে ওঠে না। কিন্তু তাই যদি হবে তা হলে ঐ জলস্তম্ভ ভেঙে পড়ে না কেন— এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর গ্যালিলিও দেননি।

গ্যালিলিও'র মৃত্যুর পরের বছর তাঁর ছাত্র তরিচেল্লি (Torricelli, 1608-47) একটা চমৎকার বুদ্ধি বার করলেন। তিনি জলের বদলে ব্যবহার করলেন পারদ। উল্টোনো কাচনলের মধ্যে পারদস্তম্ভ মাত্র তিরিশ ইঞ্চির ওপরে ওঠেনা, সুতরাং এই অল্প উচ্চতা নিয়ে কাজ করতে অনেক সুবিধে হলো। দেখা গেল বত্রিশ ফুট উঁচু জলস্তম্ভের মতো তিরিশ ইঞ্চি উঁচু পারদস্তম্ভও প্রতি বর্গইঞ্চি পিছু পনেরো পাউণ্ড চাপ দেয়। বস্তুত বায়ুচাপই যে পারদের স্তম্ভটাকে ধরে রেখেছে—এই ব্যাখ্যাটাকে স্বীকার করে নেবার মতো মননগত সৎসাহস তরিচেল্লির ছিল। পারদস্তম্ভের ঐ উল্টোনো নলটাই হচ্ছে *ব্যারোমিটার*—যা কিনা বায়ুমণ্ডলের ওজন মাপবার একটা উপায়। আর পারদস্তম্ভের ওপরে নলের খালি অংশটাই হচ্ছে খাঁটি শূন্যস্থান—যাকে নাকি প্রকৃতি 'পরিহার' ক'রে চলে বলে এতদিন ভাবা হতো। অ্যারিস্টটল 'প্রমাণ' করে গিয়েছিলেন যে বাস্তবে শূন্যাবস্থা থাকা সম্ভবই নয়, যেহেতু বিক্ষুব্ধগতির জন্য প্রয়োজন বাতাস—যা সর্বদাই নাকি সম্মুখভাগে বিদীর্ণ হয়ে পথ করে দেয় আর পশ্চাদভাগের ফাঁক ভরাট করে দেয়। কিন্তু এবার শূন্যাবস্থার এই আবিষ্কার অ্যারিস্টটলীয় বলবিজ্ঞানের শেষ ইঁটটিকেও খসিয়ে দিল। অবশ্য এ আবিষ্কারকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টার কসুর হয়নি। কিন্তু অচিরেই পাস্কালের পরীক্ষায় এর সত্যতা আবার প্রমাণিত হয়। পাস্কাল একটি ব্যারোমিটার নিয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠে চাপ কতটা নেমে গেছে তা পর্যবেক্ষণ করেন।

ফন গেরিক-এর বায়ু-পাম্প

এই ব্যাপারে পরবর্তী অগ্রগতির নায়ক হলেন অটো ফন গেরিক (1602-86)। অসাধারণ চরিত্রের এই মানুষটি যেন আজকের দিনের অমিত-ক্ষমতাশালী বিজ্ঞানীদেরই এক আদি প্রতিরূপ। রীতিমতো ধনবান এবং খুবই উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন এই ফন গেরিক। সুইডেনের রাজা গস্টেভস অ্যাডল্‌ফসের সেনাবাহিনীর একদা-ব্যবস্থাপক (Quartermaster) ফন গেরিক ছিলেন ম্যাগ্‌ডিবার্গ শহরের মেয়র। তাঁর কাজগুলি ছিল বিপুলায়তন। পরীক্ষানিরীক্ষার পেছনে তিনি চার হাজার পাউণ্ড খরচ করেছিলেন—যা সেযুগে একটা বিরাট অঙ্ক। শূন্যাবস্থা সৃষ্টি করার জন্য প্রথমে তিনি একটা জলভরা বদ্ধ পিপের মধ্যে থেকে সব জল পাম্প করে বার করে দেওয়ার সরল পদ্ধতিটি অবলম্বন করেন, কিন্তু তা করতে গিয়ে পিপেটা ফেটে যায়। তখন তিনি অপেক্ষাকৃত শক্তপোক্ত পেতলের পিপে ব্যবহার করেন। পরে তিনি বায়ু-পাম্প বানান এবং তার সাহায্যে বড়ো বড়ো পাত্রে শূন্যাবস্থা সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। তাঁর সেই বিখ্যাত 'ম্যাগ্‌ডিবার্গ অর্ধগোলক' পরীক্ষায় তিনি সম্রাট ও সভাসদবর্গের উপস্থিতিতে ঐরকমেরই একটি বৃহৎ গোলক-পাত্র ব্যবহার করেন, এবং দেখান যে এক একদিকে ষোলোটি করে ঘোড়া জুতে তবে ঐ বায়ুশূন্য গোলকটিকে দুটি অর্ধে ভাগ করা সম্ভব। এই 'ম্যাগ্‌ডিবার্গ অর্ধগোলক' পরীক্ষা নব্য বিজ্ঞানের বিপুল বাস্তব শক্তিমত্তার প্রমাণ দিল। উপরন্তু তা দেখিয়ে দিল, বায়ুচাপের শক্তি কী প্রচণ্ড, এবং একটু বুদ্ধি খরচ করলেই এই শক্তিকে মানুষের কাজে লাগানো সম্ভব। ফন গেরিক নিজেই বায়ুশূন্য নলের মধ্যে দিয়ে পাওয়ার পরিচালন করার কৌশলের কথা ভেবেছিলেন। অনেক পরে এই কৌশলেই রেলগাড়ির হাওয়া-ব্রেক তৈরি হয়েছিল।

ফন গেরিক-এর তৈরি বায়ুপাম্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন বয়েল—অথবা, খুব সম্ভব, হুক, যিনি তখন বয়েলের বেতনভোগী কর্মচারী। এই উন্নত পাম্পের সাহায্যে বয়েল নানারকম নতুন নতুন অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। যেমন, তিনি দেখালেন, বায়ু না থাকলে ধ্বনির পরিবহন ঘটেনা; কিন্তু আলো এবং চুম্বকক্রিয়ার ওপর বায়ুশূন্যতার কোনো প্রভাব পড়েনা। তিনি আরো দেখান যে বায়ুশূন্য অবস্থায় জীবন ও দহন, দুটো প্রক্রিয়াই অসম্ভব। এ ব্যাপারটা হয়তো প্রত্যাশিতই ছিল, তবু তখন তা খুবই চমকপ্রদ বলে প্রতিভাত হয়েছিল। পরবর্তী শতকে রসায়নে আর শারীরতত্ত্বে (physiology) যে বিপ্লব আসবে তার সূত্রপাত এইভাবেই ঘটে।

বায়ু-পাম্প নিয়ে কাজ করতে গিয়ে, বিশেষত পাম্প করার জন্য যে প্রয়াস প্রয়োজন হয় তা নিয়ে ভাবতে গিয়ে বয়েলকে বায়ুর আচরণ নিয়ে গবেষণা করতে হলো—সঙ্কোপিত (compressed) এবং প্রসারিত (expanded) উভয় রূপেই। এই গবেষণার পরিণতিতেই তিনি আবিষ্কার করেন এক সূত্র, যাকে সরল বলবিজ্ঞানের ক্ষেত্রের বাইরে প্রথম বৈজ্ঞানিক সূত্র বলা যায়। তিনি এর নাম দেন 'Spring of Air'—যা আজকে 'বয়েল-সূত্র' নামে বিখ্যাত। এই সূত্র অনুযায়ী, নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুর আয়তন ও চাপের গুণফলটি নিত্য। পরে জানা যায়, ঐ গুণফলটি তাপমাত্রার সমানুপাতিকও বটে।

নতুন নতুন প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের প্রয়োজনে কাজে লাগানোর ভাবনাটা কোনোদিনই বিনষ্ট হয়নি। কাজেই সপ্তদশ শতাব্দীর মতো বৈজ্ঞানিক উদ্যমশীলতার যুগে সে ভাবনা যে মাথা চাড়া দেবে তা ছিল অবধারিত। বিশেষত খনিগুলোতে পাম্প চালিয়ে বর্ধিষ্ণু উৎপাদন-শিল্পের চাকা সচল রাখবার জন্য প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজনটা তখন একান্তভাবেই অনুভূত হচ্ছিল। স্বভাবতই যে শক্তির কথাটা প্রথমেই মনে হল, সেটা হচ্ছে আগুন। কেননা, কামানের মধ্যে আগুনের শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। খুব মোটাদাগের একরকম অন্তর্দহন (internal combustion) এনজিনের কথা ভাবা হয়েছিল যাতে আজকের দিনের পেট্রোলের

জায়গায় বারুদ ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এরপর উদ্ভাবকদের মনোযোগ নিবদ্ধ হলো বাষ্পশক্তির প্রসারণক্ষমতার প্রতি। কিন্তু তখন এইসব প্রত্যক্ষ পদ্ধতির ব্যর্থতা অবধারিত ছিল—এজন্যে নয় যে মূল চিন্তাভাবনার মধ্যে কোনো গলদ ছিল; কিন্তু তখনকার প্রকৌশলের যে মান হাতে ঐ বিপুল চাপকে সহ্য করবার মতো শক্তপোক্ত আধার বানানো সম্ভব ছিলনা। হাইগেন্‌সের সহকারী দনি পাপ্যাঁ (1647-1712)—যিনি পরে কিছুদিন বয়েলের সঙ্গেও কাজ করেছিলেন—এমন একটা *পরিপাচন* যন্ত্র (digester) বানিয়েছিলেন যা মাংসের হাড়কে সেদ্ধ করে ঝোলে পরিণত করতে পারত! অথচ তাঁর সৃষ্ট এই 'প্রেসার কুকার' আমাদের এই যুগের আগে চালু হয়নি। পাপ্যাঁ একটা কার্যকর বাষ্পীয় এনজিন তৈরির পথেও খানিকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। শূন্যাবস্থা সংক্রান্ত গবেষণার সূত্র ধরেই বাষ্পশক্তি ব্যবহারের পথটি উন্মুক্ত হয়; পরের অধ্যায়ে আমরা তা নিয়ে আলোচনা করব।

যুক্তিশাসিত রসায়ন : উষা-মরীচিকা

বায়ুশূন্য অবস্থার আবিষ্কার হওয়ায় এমন একটা সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল যার খেই ধরে যুক্তিশাসিত রসায়নের বিকাশ ঘটতে পারত ঐ সতেরো শতকেই। কিন্তু তা হয়নি; হয়েছিল আরো একশো বছর পরে। ভ্যাকুয়াম পাম্প দেখিয়ে দিয়েছিল যে দহন আর শ্বসন—এই দুটো ক্রিয়াই বায়ুর ওপর নির্ভরশীল। ফলে অগ্নিশিখা আর জীবন, এই পরস্পর-সম্পর্কিত প্রশ্ন দুটিকে ঘিরে আগ্রহ জেগে ওঠে। প্যারাসেল্‌সসের দেওয়া একটা ইঙ্গিতের খেই ছরে বয়েল, হুক আর মেয়ো প্রায় প্রমাণ করেই ফেলেছিলেন যে বায়ুর মধ্যে এমন একটা কোনো পদার্থ আছে যা জ্বলনের পক্ষে অপরিহার্য এবং যা শরীরের রক্তকে লাল করে। বয়েল এ-কে বলেছিলেন, 'ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রাণের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক সারসত্তা (যদি এইরকম বলা চলে) যা আমাদের প্রাণের মূল উপাদানসমূহকে চাঙ্গা করে তোলে এবং শক্তি ফিরিয়ে দেয়।' মেয়ো (Mayow) এ-কে 'Nitro aerial spirit' বা নাইট্রো-বায়ব সূক্ষ্মসত্তা বলে অভিহিত করেছিলেন। স্পষ্টতই তিনি এর সঙ্গে বারুদের যোগ লক্ষ্য করেছিলেন (বারুদ তৈরিতে নাইট্রেট লাগে)। এই 'Nitro aerial spirit'-কেই পরে লাভোয়াসিএ 'অক্সিজেন' নাম দেন। কিন্তু সতেরো শতকে এর বেশি এগোনো সম্ভব হয় নি। তার মূল কারণ দুটো : এক, উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অভাব; দুই, উপযুক্ত প্রকৌশল এবং মালমশলার অভাব।

ধ্রুপদী গ্রীক-রোমান যুগের বিদ্যাচর্চায় রসায়নের স্থান কোনো দিনই ছিল না। অ্যারিস্টটল-কথিত ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ এবং অগ্নি—এই চারটি 'মৌল পদার্থ'কে বরাবরই আবহবিদ্যাব দিক থেকে এবং ভৌতবিদ্যার দিক থেকে বিবেচনা করা হতো; রসায়ন—রসায়ন না বলে অপরসায়ন বা আল্‌কেমি বলাই ভালো—জ্যোতিষচর্চার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। সে-জ্যোতিষে ধাতুগুলোকে গ্রহদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করা হতো। কিন্তু অ্যারিস্টটল-প্লেটো-অঙ্কিত বিশ্বছবিটা ভেঙে পড়বার পর রসায়নে এইসব বায়ুশক্তি কিংবা গ্রহশক্তির আর কোনো স্থান রইল না। *সংশয়াপন্ন রসায়নবিদ (The Skeptical Chymist)* গ্রন্থে বয়েল এ ব্যাপারটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেন। শুধু তাই নয়, আরবী সূত্রে আহরিত প্যারাসেল্‌সসের 'ত্রিমৌল' তত্ত্বও মুক্তির কোনো দিশা দেখাতে পারল না। পারদ, গন্ধক আর লবণ—এই তিনটি 'মৌল' উপাদানের প্যারাসেল্‌সসীয় তত্ত্ব অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং অসংবদ্ধ ছিল। ফলে সতেরো শতকের কণিকাবাদী দর্শন—যার উদ্ভবই হয়েছিল *অজ্ঞেয় গুণাবলীকে* পরিহার করবার জন্য—তার সঙ্গে ঐ তত্ত্ব মিশ খেলোনা। নেতিবাচক হলেও, মৌলিক পদার্থের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ বয়েল্‌ই দিয়েছিলেন: 'কোনো বস্তু যদি সর্বতোভাবে সমসত্ত্ব (homogeneous) না

হয়, তাকে যদি ক্ষুদ্রতর এমনকি ক্ষুদ্রতম কোনো স্বতন্ত্র পদার্থে ভাঙা যায়…তাহলে সে বস্তুকে খাঁটি মৌলিক উপাদান বা মৌল বলা চলেনা।' কিন্তু তখনকার রসায়নের প্রকৌশলগত মান এমনই যে গুটিকতক ধাতু ছাড়া আর কোনো পদার্থ সম্বন্ধেই মৌলিকত্বের নিশ্চিতি দেওয়া তার সাধ্যের বাইরে ছিল। ফলে বয়েল-প্রদত্ত এই মানদণ্ড পরবর্তী একশো বছর ধরে অপ্রযুক্ত হয়ে রইল। এ ব্যাপারটা সম্পর্কে বয়েল নিজে যে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর *পরীক্ষাদির অসার্থকতা প্রসঙ্গে*(On the Unsuccessfulness of Experiments) প্রবন্ধে

নিউটন—যিনি পদার্থবিদ্যার চেয়ে রসায়ন নিয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় করেছিলেন—তিনিও এ ব্যাপারে কার্যক্ষেত্রে বিশেষ এগোতে পারেননি। এস·আই· ভাভিলভ তাঁর *Isaac Newton* গ্রন্থে (ভিয়েনা, 1948) দেখিয়েছেন যে নিউটন তত্ত্বগতভাবে পরমাণুর গঠনের যে ছবি এঁকেছিলেন তার সঙ্গে ইলেকট্রন ও কেন্দ্রক-সংবলিত আধুনিক পরমাণুর সাদৃশ্যটি চমকপ্রদ। বস্তুতই, এ এক অসাধারণ যুক্তিনিষ্ঠ পূর্বানুমানের দৃষ্টান্ত। নিউটন-অঙ্কিত পরমাণু-চিত্রটি ছিল এইরকম : পরমাণু কণাটি একের পর এক অন্তবর্তী বলয়ে (shell) বিভক্ত; এই অংশগুলি কেন্দ্রমুখে উত্তরোত্তর দৃঢ়তর বলে একে অপরকে ধরে রাখে। নিউটনের এই আশ্চর্য অবদান প্রায় তিনশো বছর ধরে বিস্মৃতির গহ্বরে পড়েছিল। কাবণ সেই সতেরো শতকে রসায়নের যা অবস্থা তাতে এই কণা-বিশ্লেষণের সুযোগ ছিল না। তার জন্য প্রয়োজন ছিল তথ্যের নিয়মিত সঞ্চয়—যা পরবর্তী শতাব্দীতে ঘটেছে। পদার্থবিদ্যার সঙ্গে রসায়নের তফাৎ হচ্ছে, বসায়ন বহুবিধ অভিজ্ঞতার মুখাপেক্ষী এবং তাতে স্বতঃসিদ্ধ সূত্র বলে কিছু থাকে না। অথচ কোনো নীতিসূত্র না থাকলে রসায়ন একটা 'অজ্ঞেয়' বিদ্যাই হয়ে পড়ে—যার কারবার বাস্তব কিন্তু ব্যাখ্যাতীত বহস্যকে নিয়ে।

প্রাচীন যুগে যেসব পদার্থ পরিচিত ছিল, কেবল সেইগুলোর মধ্যেই যতদিন রসায়নের চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন তা বাঁধা ছকের বাইরে বেরোতে পারেনি। কিন্তু পনেরো শতকের পর রসায়নের জগৎ অতি দ্রুত প্রসারিত হয়। আশ্চর্য সব ধর্মযুক্ত নতুন নতুন পদার্থ (যথা ফসফরাস) ঘটনাচক্রে তৈরি হতে থাকে। ইউরোপে এবং নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় বিসমাথ, প্ল্যাটিনাম প্রমুখ নতুন ধাতুর সন্ধান পাওয়া যায়। এইসব নতুন পদার্থের নতুন নতুন ধর্মের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নতুন নতুন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। অভিজ্ঞতার আলোকে এসব তত্ত্বকে ক্রমাগত যাচাই করা হতে লাগল। প্রথম দিকে এসব তত্ত্ব অবধারিতভাবেই গুণাত্মক এবং অস্পষ্ট ছিল। তবু এগুলিই পরবর্তী যুগের অপেক্ষাকৃত সুনির্দিষ্ট তত্ত্বের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল। এই গোটা পর্বটা জুড়ে বাণিজ্য আর উৎপাদন-শিল্প উত্তরোত্তর বিশেষীভূত হয়ে উঠতে থাকে। ফলে, বিশেষ কতকগুলো রসায়নিক পদার্থের চাহিদা বাড়তে থাকে, যেমন সোরা, ফটকিরি, আয়রণ সালফেট, সালফিউরিক অ্যাসিড। এই চাহিদা মেটাতে গিয়ে রসায়নশিল্পের উদ্ভব ঘটে। আর এই রসায়নশিল্পের অভিজ্ঞতা ও সমস্যাবলীই পরবর্তী যুগের যুক্তিশাসিত রসায়নের জন্ম দেয়।

সপ্তদশ শতকে জীববিজ্ঞান

জীবজগতের জটিলতা অনন্তগুণে বেশি হওয়ায়, তার ব্যাখ্যা দেওয়ার কাজটা যে রসায়নিক রূপান্তরের ব্যাখ্যার চাইতে ঢের বেশি দুরূহ হবে তার মধ্যে আর আশ্চর্যের কী আছে। তাই, নবোদ্ভূত বলবৈজ্ঞানিক বা কণিকাবাদী দর্শন অন্যান্য ক্ষেত্রে যত কৃতিত্বই দেখাক, জীববিজ্ঞানের অঙ্গনে তা বিশেষ কিছুই করতে পারেনি। খাবার সময় এবং ঘুমোবার সময় স্যাংকটোরিয়াস (1561-1636) একটা ওজনদাঁড়িতে নিজের ওজন নিয়েছিলেন, কিন্তু পর্যবেক্ষিত পরিবর্তনগুলোর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পাবেননি। দেকার্ত প্রাণীকে যন্ত্র বলে মনে করেছিলেন।

তাঁর মতে, মানুষ-যন্ত্রটির একটি বাড়তি বৈশিষ্ট্য এই যে চেতন আত্মা খুলির পিনিয়াল গ্রন্থির মধ্যে দিয়ে ক্রিয়া ক'রে মানুষকে চালনা করে। এই ভাবনা শারীরতত্ত্বের অগ্রগতির সহায়ক হয়নি। দেহপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যন্ত্রের সাদৃশ্য-সন্ধানকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান বরেল্লি (1608-78)। বলবিজ্ঞানের সূত্রের সাহায্যে তিনি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর অঙ্গের নড়াচড়ার ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু জলবিজ্ঞানের সূত্র হৃৎপিণ্ড আর রক্তের ক্ষেত্রে চমৎকার খেটে গেলেও, মস্তিষ্ক আর স্নায়ু-প্রবাহী তরলের ক্ষেত্রে সে সূত্র দিয়ে কিছু বোঝা যায়নি।

তবে সতেরো শতকে জীববিজ্ঞানের একটা ক্ষেত্রেই সত্যিকারের অগ্রগতি ঘটেছিল, সেটা হলো পর্যবেক্ষণ, বিশেষ করে অণুবীক্ষণ-সহযোগে পর্যবেক্ষণ। এই পর্যবেক্ষণেই প্রথম ধরা পড়ে শুক্রাণুর অস্তিত্ব,যা কিনা প্রাণসৃষ্টির মূলে সক্রিয়। তবে তাৎক্ষণিক বিচারে যাঁদের কাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিভাত হলো, তাঁরা হলেন: নেহেমায়া গ্রু (Nehemiah Grew, 1641-1712)—যিনি উদ্ভিদের শারীরতত্ত্বের ভিত্তি রচনা করেন; এবং কামার-পুত্র জন রে (1627-1705)—যিনি উদ্ভিদের বর্গীকরণের (classification) পথে প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন। জন রে প্রাণীকুলের বর্গীকরণেরও প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রয়াস তেমন সফল হয়নি।

শেষ-সতেরো শতকের জীববৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলি কৃষিক্ষেত্রে তখনই যে খুব কাজে লেগেছিল তা নয়। উদ্যানবিদ্যায় (horticulture) তখন মস্ত যেসব পরিবর্তন ঘটেছিল সেগুলো সবই ছিল চিরাচরিত পুরোনো প্রথারই সুচিন্তিত প্রয়োগের ফসল। অত্যন্ত ধীরগতিতে সংঘটিত এইসব পরিবর্তন তখনকার অতীব অনুকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিকাশ লাভ করে। ঐ সময় ফ্ল্যান্ডার্স এবং হল্যান্ডে একদল ধনবান ব্যক্তি তাঁদের খামারে যন্ত্রপাতি আর পশুমলসারের মাধ্যমে পুঁজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী ও সক্ষম হয়ে ওঠেন। বিনিয়োজিত সেই পুঁজির দরুন উৎপাদনে যে উন্নতি ঘটল তার বাজারটিও তখন যথেষ্ট বড়ো এবং বর্ধিষ্ণু। হল্যান্ড তখন এইসব নতুন নতুন পন্থাপদ্ধতির লালনক্ষেত্র। সেখান থেকেই জন ইভ্‌লীনের (1620-1706) মতো শৌখীন চর্চাকারীদের কল্যাণে ঐসব পন্থাপদ্ধতি ইংলণ্ডে প্রবর্তিত হয়।

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের প্রত্যক্ষ পদ্ধতিটি হাতেনাতে অনেক বেশি সুফল ফলায় চিকিৎসাক্ষেত্রে, যদিও অস্বাভাবিক ধীরগতিতে সে অগ্রগতি ঘটে। রোগীদের পর্যবেক্ষণ ক'রে সেই পর্যবেক্ষণ থেকেই যে চিকিৎসাবিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে হবে; চিকিৎসাশাস্ত্র যে রোগীদের ওপর পূর্ব-নির্ধারিত একটা বাঁধামতের প্রয়োগের ব্যাপার নয়—সেকথা বহু যুগ আগেই হিপক্রেটিস বলেগিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই সুবচন লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। আলোচ্য সময়পর্বে সিডনহ্যামের (1624-89) মতো কয়েকজন ডাক্তার সেই প্রাচীন সত্যকে নতুন করে জাগিয়ে তুললেন। সিডনহ্যাম কেবল যে এক মস্ত ডাক্তার ছিলেন তাই নয়, তিনি সেযুগের বিজ্ঞানের সব কটি শাখা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

9. জ্যোতিষ্কলোকের চলনপ্রক্রিয়া : নিউটনীয় সংশ্লেষণ

এতক্ষণ ধরে যা বর্ণিত হলো তা থেকে বোঝা যায় যে সপ্তদশ শতকে বিজ্ঞান বিভিন্ন ক্ষেত্রেই উচ্ছ্বসিতভাবে মুকুলিত হয়ে উঠছিল। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে যে ব্যাপারটি সে যুগের মূল আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং প্রকৃত অর্থে যেটি সপ্তদশ দশকের মহত্তম কীর্তি, সেটি হলো : এই পৃথিবীর বস্তুসমূহের আচরণ পর্যবেক্ষণ ক'রে সেই পর্যবেক্ষণ থেকে আহরিত নিয়মাবলীর সাহায্যে জ্যোতিষ্কসমূহের চলনকে ব্যাখ্যা করবার উপযোগী এক সুসম্পূর্ণ সাধারণ

বলবিজ্ঞানের প্রণয়ন। বস্তুত এই ক্ষেত্রেই প্রাচীন গ্রীকদের সঙ্গে আধুনিক যুগের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যায়।

জ্যোতিষ্কলোক নিয়ে চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীকরাও যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। কিন্তু সে চর্চায় আধুনিকদের আগ্রহটি ছিল অপেক্ষাকৃত ব্যবহারিক চরিত্রের, নিছক দার্শনিক চরিত্রের নয়। সুতরাং তাঁরা প্রশ্নের যে উত্তর খুঁজলেন তারও চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সেই সুসম্পূর্ণ এবং সন্তোষজনক সমাধান বার করার কাজে পরম্পরাক্রমে ব্রতী হয়েছিলেন সে যুগের প্রায় সব বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ; যথা গ্যালিলিও, কেপলার, দেকার্ত্, বরেল্লি, হুক, হাইগেন্স, হ্যালি, রেন। এঁদের সকলের কাজের ধারা পরিচ্ছন্ন ও ঐক্যবদ্ধ বলবিজ্ঞানের এক মহাসংগমে এসে মিলিত হলো নিউটনের *De Philosophie Naturalis Principia Mathematica* গ্রন্থে। এই গ্রন্থেই নিউটন তাঁর সর্বব্যাপী অভিকর্ষের তত্ত্ব লিপিবদ্ধ ও প্রমাণ করেন।

প্রাচীন দার্শনিকদের মহাবিশ্বতত্ত্ব আগেই ভেঙে পড়ায় সৌর জগতের চলনের দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক তাৎপর্য নিয়ে তখন আর কারো কোনো আগ্রহ ছিল না। বস্তুতপক্ষে, গ্যালিলিও'র বিচারই ছিল চার্চের মুমূর্ষু অ্যারিস্টটলবাদের অন্তিম আস্ফালন। কিন্তু সৌর জগতের চলনের অন্তর্নিহিত সমস্যাটি নিয়ে আগ্রহ তখন প্রবল ছিল। কোপার্নিকাস আর কেপলার-প্রবর্তিত জগৎব্যবস্থার একটা ভৌত ব্যাখ্যা খুঁজে না পাওয়া গেলে অ্যারিস্টটলবাদের পাল্টা তত্ত্ব-ইমারতটির নির্মাণ সম্পূর্ণ করা যাচ্ছিল না। এই ব্যাখ্যাটির সন্ধানে তাই সে যুগের প্রতিটি বিজ্ঞানী নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। নানারকম অনুমান, নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা, নানারকম গণনকার্য তাঁরা করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে। কেউ কেউ সে ব্যাখ্যা প্রায় পেয়েও গিয়েছিলেন, বিশেষত হুক। অবশেষে নিউটন এসে এই অনুসন্ধানের সার্থক সমাপ্তি ঘটালেন।

দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়

সৌরজগতের গতিসূত্র আবিষ্কার করার আরেকটা অত্যন্ত গুরুতর তাগিদ ছিল। আগেকার যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করা হতো প্রধানত জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োজনে। মোটামুটি কাজ চলার মতো পঞ্জিকা হলেই তখন প্রয়োজন মিটে যেত। কিন্তু এখন নৌচালনের প্রয়োজনে অনেক নিখুঁত জ্যোতিষ্ক-তালিকার দরকার হয়ে পড়ল। সমুদ্রে জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করার ব্যাপারটা, বিশেষ করে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করার কঠিন কাজটা, খুবই বেগ দিচ্ছিল। অথচ সে সমস্যার সমাধান উত্তরোত্তর জরুরি হয়ে উঠছিল। কারণ বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক ও সামরিক কাজকর্ম ক্রমশ বেশি মাত্রায় সমুদ্রবক্ষেই সংঘটিত হচ্ছিল, বিশেষ করে ইংলন্ড, ফ্রান্স ও হল্যান্ডের মতো দেশের—যারা নিজেরাই ছিল বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। বহু দশক, এমনকি বহু শতক ধরে এই দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কৃতবিদ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং নৌচালনে নিযুক্ত নাবিকরা বিব্রত হয়ে ছিলেন। এই ব্যবহারিক সমস্যাটির সমাধানের জন্যই বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রীয় অর্থপুষ্ট বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান দুটি স্থাপিত হয়—পারি-র *Observatoire Royale* (1672) এবং গ্রীনিচের রয়্যাল অবজার্ভেটরি (1675)।

দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করার সমস্যাটা হচ্ছে মূলত কোনো স্থানের অনাপেক্ষিক (absolute) সময় নির্ণয় করার সমস্যা। এই অনাপেক্ষিক সময়কেই আমরা আজ বলি 'গ্রীনিচ সময়মান'। স্থানীয় সময়ের সঙ্গে এই গ্রীনিচ সময়মানের ফারাক কতটা তার হিসেব থেকে সরাসরি দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করে নেওয়া যায়। রেডিও আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত কোনো স্থানের গ্রীনিচ সময়মান নির্ণয় করার কেবল দুটো উপায় ছিল। এক হলো, আকাশে জ্যোতিষ্কসমূহের সাপেক্ষে চাঁদের চলন পর্যবেক্ষণ করা—যা কিনা আকাশে বসানো এক ঘড়ি। দ্বিতীয়টি হলো, গ্রীনিচ

সময়মানের সঙ্গে মেলানো অভ্রান্ত সময়-নির্দেশক কোনো ঘড়ি সঙ্গে রাখা। প্রথমটির জন্য প্রয়োজন ছিল জ্যোতিষ্কসমূহের অবস্থানের ভবিষ্যদ্বাণী, এবং তার জন্য প্রয়োজন ছিল একেবারে নিখুঁত জ্যোতিষ্ক-তালিকা। আর দ্বিতীয়টির জন্য প্রয়োজন ছিল সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ঘড়িকল। গোটা সতেরো শতক জুড়ে, এমনকি আঠেরো শতকেরও কিয়দংশ জুড়ে এই দুটি পথেই অনুসন্ধান চলে। কিন্তু কোনো পথেই নির্দিষ্ট কোনো সুফল পাওয়া যায়নি। তবে উভয় পক্ষেই চিন্তাভাবনায়, পর্যবেক্ষণে ও পরীক্ষণে এর ফলে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল। এই প্রেরণার পেছনে অনেকটাই ছিল আর্থিক লাভের হাতছানি; তবে জাতীয় এবং ব্যক্তিগত মর্যাদারও একটা বড়ো ভূমিকা ছিল।

ক্রনোমিটার

আপাতদৃষ্টিতে এ দুটি পথ পরস্পরের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। একটি পথ বস্তু-নিয়ন্ত্রক কলের চলন নিয়ে ব্যস্ত, অন্যটি মহাকাশে জ্যোতিষ্কের চলন নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু অনুসন্ধান করতে করতে ক্রমশ দেখা গেল এ দুয়ের এক অভিন্ন ভিত্তি রয়েছে গতিবিজ্ঞানে। স্বয়ং গ্যালিলিওই আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন যে *পেন্ডুলামই* হচ্ছে আদর্শ সময়-নিয়ন্ত্রক, কেননা তা সুনির্দিষ্ট লয়ে আন্দোলিত হয়। অতঃপর হুক ব্যবহারিক দিক থেকে উপযোগী এক উদ্‌ভাবন করেন পেন্ডুলামের বদলে স্প্রিং-নিয়ন্ত্রিত ব্যালান্স-চক্রের প্রবর্তন ঘটিয়ে; জাহাজের নড়াচড়া এই ব্যালান্স-চক্রকে বিচলিত করতে পারেনা। উভয়ক্ষেত্রেই অভ্রান্ত সময়-নির্দেশের ব্যাপারটি নির্ভর করছিল দোলনশীল পদার্থের গতিসূত্রাবলী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার ওপর। আর ঠিক এই ক্ষেত্রেই হাইগেন্‌স এসে সমাধানটি বাতলে দিলেন। তার ফলে ক্রনোমিটার তৈরির পথ প্রশস্ত হলো। হাইগেন্‌সের *Horologium Oscillatorium* (1673) গ্রন্থে এই সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ হয়। তবু উন্নত কলাকৌশলের সাহায্যে এইসব সূত্রকে হাতেকলমে কাজে লাগাতে বহু দিন পার হয়ে যায়। অনেক পরে, 1765 সালে হ্যারিসনের তৈরি ক্রনোমিটার দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের কাজে সফল হয়ে নৌবাহিনী-ঘোষিত পুরস্কারটি লাভ করে।

গ্রহের চলন: আকর্ষণ-তত্ত্ব

তবে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ বিকাশের দিক থেকে যা অনেক বেশি মূল্যবান বলে প্রমাণিত হলো তা হচ্ছে বিশুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা। ব্যবহারিক দিক থেকে উপযোগী কোনো সমাধান বার করতে তা হয়তো ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু গ্রহের চলনের একটা গাণিতিক এবং বলবিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা খুঁজে বার করার ব্যাপারে তা যে-প্রণোদনা জাগিয়েছিল তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। গ্রহেরা সূর্যকে কেপলার-প্রমাণিত উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে কেন, তা নিয়ে অনেকেই জল্পনাকল্পনা করেছিলেন। পরিক্রমণরত গ্রহগুলো যে একধরনের আকর্ষণ-বলের টানেই নিজ নিজ নির্দিষ্ট কক্ষপথে সীমাবদ্ধ থাকে, এ ব্যাপারটাও অনেকে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। বস্তুত, গিলবার্টের চুম্বক-সংক্রান্ত গবেষণার পর থেকেই—এমনকি তার আগেও— এই আকর্ষণের ব্যাপারটা নিয়ে অনেকেই ভাবনাচিন্তা করছিলেন। চুম্বক জিনিসটা দেখিয়ে দিয়েছিল যে দূর থেকেও আকর্ষণ-বল প্রযুক্ত হতে পারে। গিলবার্ট নিজেই বলেছিলেন যে হয়তো নিছক চৌম্বক বলের টানেই গ্রহেরা নিজ নিজ অবস্থান বজায় রাখে বা নিজ নিজ কক্ষপথে ঘোরে।

বরেল্লি 1666 সালে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা উত্থাপন করেন। তিনি বললেন, একটা দড়ির প্রান্তে বাঁধা ঢিলকে ঘোরালে তার কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) বলকে সুষম (balance) করার জন্য একটা পাল্টা বলের প্রয়োজন হয়। তেমনি, গ্রহদের চলনের মধ্যেও নিশ্চয়ই এমন

কোনো পাল্টা বল ক্রিয়া করে যা তাদের কেন্দ্রাতিগ বলকে সুষম করে তোলে। এই পাল্টা বলকে তিনি 'অভিকর্ষ-বল' বলে চিহ্নিত করলেন। এই অভিকর্ষ-বল পৃথিবী-গ্রহের নিকট-পরিবেশ থেকে সুদূরে ব্যাপ্ত হয়ে চন্দ্র পর্যন্ত, এবং সূর্য থেকে গ্রহাদি পর্যন্ত ক্রিয়াশীল। গ্রহের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হওয়ার অর্থ হচ্ছে, গ্রহ সূর্যের যত কাছাকাছি আসে ততই তার গতি বাড়ে। অর্থাৎ, তখন তার বর্ধিত কেন্দ্রাতিগ বলকে সুষম করার প্রয়োজনে অভিকর্ষ-বলও নিশ্চয়ই বাড়ে। সুতরাং এই অভিকর্ষ-বল নিশ্চয়ই দূরত্বের ঘাতের (power) সঙ্গে কোনো একটা আনুপাতিক সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রশ্ন উঠল: সেই সম্পর্কটা কী? হুক ইতিমধ্যে আন্দাজ করেছিলেন যে দূরত্ব বাড়লে অভিকর্ষ-বল কমে। তিনি এই ভাবনার সত্যতা প্রমাণের জন্য একটা বস্তুকে তিন জায়গায় রেখে তার ওজনের হেরফের মাপার চেষ্টা করলেন: মাটিতে, খনিগর্ভে আর গির্জার চূড়ায়। কিন্তু এ পরীক্ষা সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হলো।

অভিকর্ষ সম্বন্ধে তখন দেকার্ত্-এর মতটাই স্বীকৃত। সেই মত অনুযায়ী, প্রতিটি ভারি বস্তু ঈথরে ঘূর্ণাবর্ত জাগিয়ে তোলে এবং নিজ নিজ ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্র অভিমুখে তাড়িত হয়। আপন কেন্দ্রমুখে আকৃষ্ট হওয়ার এই ব্যাপারটাকে নিউটন 'এক রহস্যময় আত্মকেন্দ্রিক নীতি' বলে অভিহিত করেছিলেন। নিউটন নিজে এই মত 1679 সাল পর্যন্ত স্বীকার করতেন।

যতক্ষণ না এইসব নির্বিশেষ ধারণাকে গাণিতিক রূপ দিয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা যাচ্ছে, ততক্ষণ আর এগোনো সম্ভব হচ্ছিল না। এই ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করলেন হাইগেন্স, 1673 সালে। পেন্ডুলামঘড়ি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি কেন্দ্রাতিগ বলের সূত্র প্রণয়ন করলেন। তিনি দেখালেন, ঐ বল ব্যাসার্ধের সমানুপাতে এবং পর্যায়কালের (period) বর্গের বিপরীত বা ব্যস্তানুপাতে (inversely) পরিবর্তিত হয়। এদিকে, কেপলারের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী পর্যায়কালের বর্গ আবার ব্যাসার্ধের ঘনফলের (cube) সমানুপাতিক। সুতরাং কেন্দ্রাতিগ বলের পাল্টা যে কেন্দ্রাভিগ (centripetal) বল বা অভিকর্ষ-টান ক্রিয়া করে তা নিশ্চয়ই নির্ভর করবে ঐ ব্যাসার্ধ (r) আর তার ঘনফলের (r^3) ভাগফলের (r/r^3) ওপরে, অর্থাৎ ব্যাসার্ধের বর্গের ব্যস্তফলের (inverse square of the radius, $1/r^2$) ওপরে। হুক, হ্যালি আর রেন 1679 সালের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তবু দুটো সমস্যা রয়েই গিয়েছিল: এক, উপবৃত্তাকার কক্ষপথের ব্যাখ্যা, এবং দুই, আকর্ষণশীল বৃহদাকার বস্তুর ক্রিয়াপদ্ধতির ব্যাখ্যা। এই দুটি সমস্যা নিয়ে হুক নিউটনকে চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু কোনো উত্তর পাননি। 1684 সালে হ্যালি এ দুটি প্রশ্নের সমাধানের জন্য এক মস্ত পুরস্কার ঘোষণা করেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে সে-সমাধান প্রায় করায়ত্ত। অনেকেই সে সমাধান বার করার পথে অনেকদূর এগিয়েওছিলেন; কিন্তু সে সমাধান বার করার উপযুক্ত গাণিতিক নৈপুণ্য, এবং সে সমাধানের পরিণতিতে যেসব বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে উঠবে সেসবকে স্বীকার করে নেবার সাহস, কেবল একজন মানুষেরই ছিল।

আইজ্যাক নিউটন

সেই মানুষটির নাম আইজ্যাক নিউটন। রয়্যাল সোসাইটির তরুণতর প্রজন্মের 'ফেলো'দের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কিন্তু বয়সে তরুণ হলেও গণিত ও আলোকবিদ্যায় গবেষণার কল্যাণে তিনি রীতিমতো খ্যাতি লাভ করেছিলেন ইতিমধ্যেই। তাঁর জন্ম 1642 সালে, যে বছর গ্যালিলিও'র মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন নবোদ্ভূত গ্রামীন মধ্যবিত্তশ্রেণীর সন্তান—যে শ্রেণী ক্রমওয়েল এবং সংসদীয় অফিসারদের জনক। নিউটনের জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা মারা যান।

পিতা ছিলেন লিংকনশায়ারের এক ছোটো কৃষক। পিতার সামাজিক যোগাযোগ বেশ ভালো থাকায় তারই সুবাদে নিউটন কেমব্রিজে পড়বার সুযোগ পান। সেখানে ছাত্র হিসেবে তিনি অসাধারণ কোনো কৃতিত্বের পরিচয় দেননি। 1663 সালে গণিতের নবাগত লুকাসিয়ান অধ্যাপক আইজ্যাক ব্যারো'র (1630-77) সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। সুপণ্ডিত, এবং বহু দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই মানুষটি নিউটনের গুণের কদর করেন। তার ফলে 1669 সালে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে নিউটন ঐ অধ্যাপকের স্থলাভিষিক্ত হন। তখনো কিন্তু তাঁর কোনো রচনা প্রকাশিত হয়নি, তিনি নামও করেননি। নিউটন সুদীর্ঘকাল কেমব্রিজে ছিলেন। 1679 সালে, যখন তাঁর খ্যাতি তুঙ্গে, তখন তাঁকে কেমব্রিজের সভাপতির (Warden) পদে নিয়োগ করা হয়। পরে তিনি সরকারি টাঁকশালের তত্ত্বাবধায়ক পদ পান, বেতন বছরে চারশো পাউন্ড। এই চাকরী পাওয়ায় তিনি নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলে মনে করতেন। খুব যত্নসহকারে চাকরির কর্তব্যভার পালন করতেন নিউটন।

কেমব্রিজে তিনি নানা বিষয় নিয়ে চর্চা করতেন, যথা আলোকবিদ্যা, পদার্থবিদ্যার আরো অনেক শাখা, রসায়ন, বাইবেলের কাল-পরম্পরা। অ্যালেক্‌জান্ড্রিয়ার আরিয়াসের অনুসরণে খানিকটা উদারপন্থী ধর্মতত্ত্ব নিয়েও তিনি চর্চা করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর খুব একটা প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না, তিনি কোনো ঘরানাও তৈরি করেননি। হেনরি মুরের নেতৃত্বাধীন গভীরভাবে ধার্মিক এক প্লেটোপন্থী গোষ্ঠী তাঁকে প্রভাবিত করে। এইভাবেই প্লেটো-দর্শনের বিভিন্ন উপাদান তাঁর দার্শনিক ভাবনার মধ্যে চারিয়ে যায় আর তাঁর দার্শনিক ভাবনার মাধ্যমে গোটা আধুনিক বিজ্ঞানকেই প্রভাবিত করে। মোটের ওপর তিনি নিজ শ্রেণীর মতামতই পোষণ করতেন। পার্লামেন্টে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন হুইগ্-দলীয় আপসপন্থার সমর্থক। এর ফলে তাঁর ভাবনাচিন্তা প্রথম দিকে বেশ সম্ভ্রান্ত বলে গণ্য হয়েছিল। সেসব ভাবনাচিন্তা যে আসলে কতখানি বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পূর্ণ তা বোঝা গিয়েছিল পরে। নিউটন মানুষটি ছিলেন ভারি অদ্ভুত ধরনের। চুপচাপ থাকতেন, বিশেষ মেলামেশা করতেন না কারো সঙ্গে, নিজেকে গুটিয়ে রাখতে ভালোবাসতেন। বিয়ে করেননি, ট্রিনিটি* নিয়ে সংশয় থাকায় যাজক হিসেবে দীক্ষা গ্রহণ করেননি। তাঁর জ্ঞান তাঁকে যেমন আত্মসমালোচনা-প্রবণ করে তুলেছিল, তেমনি একই সঙ্গে তাঁর প্রতি অন্যদের সমালোচনা সম্পর্কে ঢের বেশি অসহিষ্ণুও করে তুলেছিল।

মহাকর্ষ-বিষয়ক আলোচনায় নিউটন প্রকাশ্যে যোগ দেন বেশ পরে। কিন্তু কিছুকাল আগে আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি থেকে প্রমাণিত হয়েছে, 1665 সালেই তিনি গ্যালিলিও'র তত্ত্বের খেই ধরে মহাকর্ষের বর্গের ব্যস্তানুপাত-সূত্রের মূল নীতিটি আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে নিউটন নিজে সেই দাবিই করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রাতিগ বলের যে সূত্রটি হাইগেন্সের নামে প্রচলিত, সেটিও নিউটন অন্তত তার দশ বছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন। মহাকর্ষ-তত্ত্ব প্রকাশ না করে কেন যে তিনি বিশ বছর ধরে ফেলে রেখে দিয়েছিলেন, সে-ও এক রহস্য। আসলে নিউটন বরাবরই ছিলেন নিরঙ্কুশ ত্রুটিহীনতার সাধক। এমন হতেই পারে যে

* Trinity-র তত্ত্বটি মোটামুটি এইরকম—ঈশ্বর এক ও একমেবাদ্বিতীয়ম; কিন্তু তাঁর তিনটি রূপ আছে: পিতা, পুত্র এবং পূতাত্মা (The Holy Ghost)। 'পিতা' 'পুত্র'কে মর্ত্যে পাঠান; মর্ত্যে 'পূতাত্মা'র সঙ্গে একজন নারীর মিলনে 'পুত্রে'র জন্ম হয়। মর্ত্যজাত 'পুত্র' এই বার্তা প্রচার করেন যে তিনি কেবল 'পিতা'র ইচ্ছা পূর্ণ করছেন মাত্র, তাঁর নিজের ইচ্ছা নয়। তিনি 'পিতা'র কাছে তাঁর ভয়ানক মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করবার শক্তি প্রার্থনা করেন। অথচ, 'পিতা', 'পুত্র' এবং 'পূতাত্মা'—এঁরা সকলেই সেই একই ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন।—অনু·

অন্যদের কৃত ত্রুটিপূর্ণ মাপজোকের ভিত্তিতে যেসব গণনা তিনি করেছিলেন তার মধ্যে ভুলচুক থাকায় তিনি তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করেননি। গ্রহের উপবৃত্তাকার কক্ষপথ সম্পর্কে গণনার কাজটি তিনি ঠিক কখন সমাধা করেন, তা জানবার মতো কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে নেই। থাকলে হয়তো প্রকৃত সন্ধিক্ষণটি যথাযথভাবে নিরূপণ করা যেত।

বন্ধু হ্যালির প্ররোচনায় হুকের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে প'ড়ে অবশেষে নিউটন যখন তাঁর তত্ত্ব সর্বসমক্ষে প্রকাশ করলেন, তখনই তাঁর সে-অবদান একেবারে অবিসংবাদী বলে গণ্য হলো। ভৌত সূত্রগুলিকে পরিমাণগতভাবে পরিমাপযোগ্য ফলাফলে রূপান্তরিত করার গাণিতিক পদ্ধতিটি বার করলেন নিউটন। এই ফলাফলগুলিকে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে যাচাই করে নেওয়া সম্ভব ছিল। পক্ষান্তরে, ঐ পর্যবেক্ষণের সূত্র ধরেই আবার বিভিন্ন ভৌত সূত্র প্রণয়ন করা সম্ভব ছিল। *Principia*-র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন : 'এই গ্রন্থে আমি দর্শনের গাণিতিক সূত্রগুলি উপস্থাপিত করিয়াছি। আমার মনে হয় দর্শনের মূল কাজ একটিই : চলন বা গতি ব্যাপারটিকে অনুধাবন করিয়া তাহার সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তি-বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো, এবং অতঃপর সেইসব শক্তিগুলিকে অনুধাবন করিয়া তাহার সাহায্যে অন্যান্য ব্যাপারগুলিকে ব্যাখ্যা করা।...এই একই ধরনের বলবিজ্ঞান-সম্মত নীতিসূত্রের প্রয়োগ ঘটাইয়া প্রকৃতির অপরাপর ব্যাপারগুলি সম্বন্ধেও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলে বড়ো ভালো হয়। কেননা, বিভিন্ন দিক বিচার করিয়া আমার মনে এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূলে রহিয়াছে কতকগুলি বলের ক্রিয়া। বস্তুসমূহের কণাগুলি এখনো-অজ্ঞাত কিছু কারণবশত ঐ বলের সাহায্যে হয় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সুসংবদ্ধ রূপ ধারণ করে, নতুবা পরস্পরের প্রতি বিকর্ষণ-বশত একে অপরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। এই বলগুলি সম্বন্ধে এতদিন কিছু জ্ঞাত ছিল না। ফলে দার্শনিকেরা প্রকৃতিকে অনুসন্ধান করার কাজে এতদিন ব্যর্থ হইয়াছিলেন। আমার মনে হয় এই গ্রন্থে আমি যে সকল নীতিসূত্র প্রণয়ন করিয়াছি তাহা এই নব্য দার্শনিক পদ্ধতিটি সম্পর্কে অথবা শ্রেষ্ঠতর কোনো পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করিবে।'

ক্যালকুলাস

এই কাজে তিনি যে অস্ত্রটি ব্যবহার করলেন সেটি হলো ক্যালকুলাস। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'method of fluxions', অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে অবিচ্ছিন্ন কোনো অপেক্ষক (function) স্বচ্ছন্দভাবে প্রবাহিত হয়ে চলে। ব্যাবিলোনীয় পূর্বসূরীদের থেকে শুরু করে ইউডক্সাস্ এবং আর্কিমিডিসের হাত ধরে একের পর প্রজন্মের গণিতজ্ঞরা যে কাজ চালিয়ে আসছিলেন, তা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করল এর মধ্যে। সতেরো শতকে ফের্মা (Fermat) এবং দেকার্ত-এর হাতেও তা অতিদ্রুত অনেকদূর বিকাশ লাভ করেছিল। ক্যালকুলাসকে আমরা যে রূপে চিনি, সেই বিশেষ রূপটি অবশ্য দেন লাইব্‌নিৎস (1646-1716)। এর মূলে নিউটনের কৃতিত্ব বেশি না লাইব্‌নিৎসের, তা নিয়ে সেকালে তুমুল বাদবিতণ্ডা হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির নিরিখে সে বিতর্ক মূল্যহীন। আসল কথাটা হলো, এই ক্যালকুলাস ব্যবহার করেই নিউটন পদার্থবিদ্যার অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিলেন এবং অন্যদেরও তা করতে শিখিয়েছিলেন।

এই ক্যালকুলাস-পদ্ধতির প্রয়োগে যে কোনো একটি মুহূর্তে একটি বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে উঠল। তা করার জন্য বস্তুর ঐ অবস্থানের সঙ্গে অন্য যেকোনো মুহূর্তে তার গতির বা গতি-পরিবর্তনের হারের সম্পর্কটি জানা দরকার। এককথায়, বলের সূত্রটি যদি জানা থাকে তাহলে বস্তুর গতিপথটি বার করা সম্ভব। অর্থাৎ বিপরীতক্রমে প্রয়োগ করলে, কেপলারের গতি-সূত্র থেকেই নিউটনের মহাকর্ষ-বলের সূত্রটি বেরিয়ে আসে। এ দুটি সূত্র বস্তুত একই

ব্যাপারের দুটি ভিন্ন গাণিতিক রূপ মাত্র। কিন্তু তফাৎ এই যে গ্রহসমূহের গতির সূত্রগুলিকে মনে হয় বিমূর্ত; আর একটা কোনো শক্তিশালী আকর্ষণে গ্রহ তার নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে—এই ধারণাটাকে যেন মনশ্চক্ষে দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এই মহাকর্ষ-বলটি যে কী তা আজও রহস্যাবৃত।

নিউটনের উদ্ভাবিত এই ক্যালকুলাস-পদ্ধতির প্রয়োগে বলবিজ্ঞান (mechanics) ও জলগতিবিজ্ঞানের (hydrodynamics) সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ছিল, এবং নিউটন তা করেও ছিলেন। যাবতীয় চলরাশি (variables) এবং গতিকে অনুধাবনের, ও সেই সুবাদে যান্ত্রিক এনজিনিয়ারিঙের যাবতীয় সমস্যা অনুধাবনের গাণিতিক হাতিয়ার হয়ে উঠল এই ক্যালকুলাস। এই সেদিন পর্যন্ত ক্যাল্‌কুলাসই ছিল যাবতীয় অনুসন্ধানের প্রায় একমাত্র গাণিতিক হাতিয়ার। যদি বলা যায়, দূরবীক্ষণের মতো ক্যালকুলাসও নব্য বিজ্ঞানের এক অতীব বাস্তবোপযোগী হাতিয়ার, তাহলে একটুও ভুল হয় না।

'প্রিন্সিপিয়া'

গ্রহগতি-সমস্যার সমাধানটি নিউটন 1685 থেকে 1686 সালের মধ্যে তাঁর *De Philosophie Naturalis Principia Mathematica* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। হ্যালির অক্লান্ত প্রয়াস ছাড়া তিনি একাজে রাজি হতেন কিনা সন্দেহ। গ্রন্থটি প্রকাশ করে রয়্যাল সোসাইটি। সোসাইটির সভাপতি স্যামুয়েল পেপিস্-এর নামই প্রকাশক হিসেবে মুদ্রিত হয়। অথচ সোসাইটির তহবিলে তখন ঘাটতি চলছে। বইটি ছাপার খরচ দেন হ্যালি। সুবিকশিত ভৌত যুক্তিধারার নিদর্শনরূপে এই গ্রন্থটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে তুলনারহিত। গাণিতিক সিদ্ধির দিক থেকে এর সঙ্গে কেবল ইউক্লিডের *Elements*-এর তুলনা চলতে পারে। আর ভৌত অন্তর্দৃষ্টি এবং মানুষের ভাবধারাকে প্রভাবিত করার দিক থেকে এর একমাত্র তুলনা ডারউইনের *Origin of Species*. বেরোনো মাত্রই *প্রিন্সিপিয়া* নব্য বিজ্ঞানের বাইবেল হয়ে ওঠে—কর্তকগুলি আপ্তবাক্যের সমষ্টিরূপে নয়, ঐ গ্রন্থে ব্যাখ্যাত পদ্ধতিসমূহের ভিত্তিতে পরবর্তী বিকাশসাধনের উৎসরূপে। তবে আপ্তবাক্য হয়ে ওঠার বিপদ যে একেবারে ছিলনা তা নয়—বিশেষ করে ইংলণ্ডে।

প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থে নিউটন কেবল যে গ্রহসমূহের গতিসূত্রই প্রণয়ন ও প্রমাণ করলেন তা নয়। তাঁর লক্ষ্য ছিল আরো অনেক বড়ো। সর্বময় অভিকর্ষ কীভাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চালনা করছে সেটা দেখানোই ছিল তাঁর অভীষ্ট। কিন্তু পুরোনো দার্শনিক ধরনে এটা তিনি দেখাতে চান নি। তিনি পরিমাণাত্মক, ভৌত, নব্য ধরনে এটা দেখাতে চাইলেন। একাজটা করতে গিয়ে তাঁকে আরো দুটো কাজ করতে হলো : এক, প্রাচীন এবং নব্য উভয় ধরনের প্রচলিত দার্শনিক ধারণাকে নির্মূল করা; দুই, তাঁর নিজের দার্শনিক ধারণাটিকে কেবল নির্ভুল বলে নয়, জগৎব্যাপারের ব্যাখ্যা দেওয়ার সবচেয়ে নিখুঁত উপায় বলে প্রতিষ্ঠিত করা।

তখন দেকার্ত-প্রবর্তিত বিশ্বদর্শনই সর্বাধিক প্রচলিত। সে মত অনুযায়ী ঘূর্ণাবর্তসমূহের একেকটি সমষ্টি একেকটি গ্রহকে তার কক্ষে ধরে রাখে। নিউটন নিজেও একসময় এ মত পোষণ করতেন। *প্রিন্সিপিয়ার* অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই মতকে পরিমাণাত্মক যুক্তি দিয়ে সযত্নে খণ্ডন করেছেন নিউটন। দেকার্ত-এর ঐ মধুর ভাবনাটার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু নিউটন দেখালেন যে ঐ মত অনুযায়ী চললে নিখুঁত পরিমাণাত্মক ফল মেলেনা। এরই মধ্যে দিয়ে তিনি জলগতিবিজ্ঞানের পত্তন করেন, সান্দ্রতা (viscosity) এবং বাতাসের প্রতিরোধ-বল নিয়ে আলোচনা ক'রে ঐ বিষয়গুলোকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। বস্তুত, প্রবাহী পদার্থ (fluids) সংক্রান্ত বলবিজ্ঞানের যে ভিত্তি তিনি সেদিন রচনা ক'রে দিয়েছিলেন,

তা পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করে এরোপ্লেনের যুগে।

ক্যাল্‌কুলাস পদ্ধতির প্রয়োগেই নিউটন তাঁর সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু বই লেখবার সময় তাঁর গণনার যাবতীয় ফল তিনি ধ্রুপদী গ্রীক জ্যামিতিক রূপেই প্রকাশ করেছিলেন, যাতে তা অন্যান্য গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বোধগম্য হয়। ব্যবহারিক দিক থেকে এর তাৎক্ষণিক তাৎপর্য ছিল এই যে অঙ্ক কষে চন্দ্র এবং গ্রহসমূহের অবস্থান অনেক নিখুঁতভাবে নির্ণয় করার একটা পদ্ধতি চালু হয়ে গেল। ন্যূনতম পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এখন জ্যোতিষ্কের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হলো। যেমন, মাত্র তিনটি পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কোনো জ্যোতিষ্কের অবস্থান অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থির করে নেওয়া সম্ভব হলো। আগে নিছক অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সে অবস্থান নির্ণয় করতে হলে একাদিক্রমে অনেকগুলি পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হতো।

নিউটনের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাঁর তত্ত্বের অভ্রান্ততার প্রমাণ দেন তাঁর বন্ধু হ্যালি। একটি ধূমকেতুর ভবিষ্যৎ প্রত্যাবর্তনের ঠিক সময়টি নিউটনের তত্ত্বের ভিত্তিতে নিখুঁতভাবে গণনা ক'রে তিনি বলে দেন। ধূমকেতুটি সেই সময় থেকে তাঁরই নামে পরিচিত। নিউটনের তত্ত্ব ব্যবহারের কল্যাণে নৌসারণীও এখন আগের তুলনায় অনেক নিখুঁত হয়ে উঠল। দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের কাজে যে জ্যোতিষ্কটির পর্যবেক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী, সেই চন্দ্রের চলন গোটা সৌরব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে জটিল। চন্দ্রের চলন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণকে আগে কিছুতেই ঠিকমতো বাগে আনা সম্ভব হতো না। ফলে ঐ পর্যবেক্ষণ থেকে নাবিকদের উপযোগী নির্ভরযোগ্য কোনো পথনির্দেশ বার করাও সম্ভব হয়নি। কাজেই শেষ পর্যন্ত দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের জন্য ঘোষিত পুরস্কারটি বলবিজ্ঞান-মনস্ক জ্যোতির্বিদরা পাননি—পেয়েছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক ঘড়িনির্মাতারা। অবশ্য নৌবাহিনীর কর্তাদের কাছ থেকে সে পুরস্কারের যেটুকু তাঁরা আদায় করে নিতে পেরেছিলেন সেটুকু নিয়েই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

অ্যারিস্টটলের সিংহাসনে নিউটন

অ্যারিস্টটল-অঙ্কিত বিশ্বছবিটিকে বদলে নেওয়ার যে কাজ শুরু করেছিলেন কোপার্নিকাস, নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদান সেই রূপান্তর-প্রক্রিয়ারই চূড়ান্ত ধাপ। বহু গোলকের দ্বারা পূর্ণ, আদি একজন পরিচালকের দ্বারা, কিংবা ঈশ্বরের আদেশে দেবদূতমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত বিশ্বলোকের অ্যারিস্টটলীয় বিশ্বছবির বদলে নিউটন যে বিশ্বপ্রক্রিয়ার ছবি আঁকলেন তা একটি সরল প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত, যাতে প্রতিনিয়ত বল প্রয়োগ কবার দরকার হয়না, যাতে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় কেবল সৃষ্টির সময় এবং সমগ্র ব্যবস্থাটিকে চালু করার সময়।

এই শেষোক্ত ব্যাপারটি নিয়ে নিউটন নিজে খুব একটা নিশ্চিত ছিলেন না। সেইজন্য তাঁর এই বিশ্বব্যবস্থার স্থিতিশীলতার মুখ চেয়ে তিনি ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের একটি পথ খোলা রেখে দিয়েছিলেন। পরে লাপ্লাস সেই পথটিও বন্ধ করে দেন—ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের আর কোনো প্রয়োজন থাকেনা। নিউটনের তত্ত্বের মধ্যেই চাঁদ এবং গ্রহসমূহের অবস্থান সম্বন্ধে কার্যকর ভবিষ্যদ্বাণী করবার সমস্তবকম উপাদান মজুত ছিল। তা সত্ত্বেও বিশ্বলোকের ঐশ্বরিক ছকের যৌক্তিকতা নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন তোলার ঠিক আগের ধাপে পৌঁছে সে তত্ত্ব থমকে দাঁড়ায়। বস্তুত নিউটন মনে করতেন তিনি ঐ ঐশ্বরিক ছকটিরই সন্ধান দিয়েছেন; সুতরাং এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন তোলা তাঁর অভিপ্রেত ছিলনা।

পরম বা অন্যনিরপেক্ষ গতির অস্তিত্ব সম্পর্কে যে অস্বস্তিকর অনুমানটি তিনি করেছিলেন

তাকে সামাল দেবার জন্য নিউটন তাঁর প্লেটোপন্থী বন্ধুদের অনুসরণে বলতেন যে পরিসর বা দেশ (space) হচ্ছে ঈশ্বরের চেতনাপীঠ (sensorium), তাঁর চৈতন্য, তাঁর মস্তিষ্ক; সুতরাং তা পরম বা অন্যনিরপেক্ষ তো বটেই। এইভাবে তিনি আপেক্ষিকতাবাদী তত্ত্বের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার বিপত্তি থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছিলেন। গ্রহেরা সকলেই মোটামুটি একই তলে থাকে কেন, কেনই বা তারা একই ভাবে ঘোরে, তার কোনো সদুত্তর নিউটনের নিজের তত্ত্ব থেকে পাওয়া যায়না। ঘূর্ণাবর্তের কথা বলে দেকার্ত্ এর একটা অত্যন্ত অগভীর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। আদিতে কী ছিল, সে সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতাকে নিউটন কিন্তু অত্যন্ত সৎভাবেই চাপা দিয়েছিলেন এই কথা ব'লে যে সৃজনের আদিলগ্নে ঈশ্বর নিশ্চয়ই ঐরকমই ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে রেনেসাঁস আর রিফর্মেশনের ধ্বংসাত্মক পর্বটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। রাজতন্ত্র আর প্রজাতন্ত্র, উচ্চবর্গের বুর্জোয়া আর অভিজাত—এদের মধ্যে যেমন আপসরফা হয়ে গিয়েছিল, তেমনি ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যেও একটা আপসরফার প্রয়োজন ছিল। নিউটনের বিশ্বব্যবস্থায় জ্যোতিষ্কলোকের বা মর্ত্যলোকের প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনে ঈশ্বরের হাত আর প্রত্যক্ষ রইল না। ঈশ্বরের হাত কেবল সৃষ্টির আদি মুহূর্তে এবং গোটা ব্যবস্থাটার সার্বিক সংগঠনের মধ্যে সক্রিয় বলে গণ্য হলো। সন্দেহ নেই, এ ব্যাপারটাকে মেনে নিয়ে গোঁড়া ধর্মধ্বজীরা একটা বড়ো রকমের আপস করেছিলেন। মর্ত্যলোকের ঐশ্বরিক আশীর্বাদধন্য রাজাদের মতোই, ঈশ্বরও যেন নিছক এক নিয়মতান্ত্রিক মহারাজে পরিণত হলেন। প্রতিদানে বিজ্ঞানীরাও ধর্মের নিজস্ব অঙ্গনে প্রবেশ না করার শর্ত মেনে নিলেন। মানুষের জীবনের আশাআকাঙ্ক্ষা, দায়দায়িত্ব—এসবই বিজ্ঞানের আওতার বাইরে রইল। বিচক্ষণ বিশপ স্প্র্যাট এই পরামর্শ দেন, এবং জাঁদরেল ড· বেন্ট্‌লি এই মর্মে প্রচার চালান তাঁর 1692 সালের 'বয়েল-উপদেশমালা'য়। উনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইন এসে ভেঙেচুরে দেওয়ার আগে পর্যন্ত এই আপসরফা কার্যকর ছিল।

সর্বময় মহাকর্ষ-ব্যবস্থার তত্ত্বটিই সেকালে নিউটনের সর্বোত্তম অবদান বলে স্বীকৃত হয়েছিল, এবং আজও স্বীকৃত। কিন্তু বিজ্ঞানে, এবং বিজ্ঞান-বহির্ভূত ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব আরো কার্যকর হয়েছিল তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিসমূহের দৌলতে। তাঁর উদ্ভাবিত ক্যালকুলাসের মধ্যে রাশিসমূহের পরিবর্তন থেকে শুরু করে খোদ রাশি নিয়েই চর্চা করার একটা সর্বজনীন পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। এবং তার বিপরীতটাও সত্যি। পরবর্তী দুশো বছর ধরে ভৌত সমস্যাবলীর সমাধানের উপযোগী এই গাণিতিক হাতিয়ারটি তিনিই সরবরাহ করেন। তাঁর প্রণীত গতিসূত্রগুলি বলকে গতির সঙ্গে নয়, গতির *পরিবর্তনের* সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে। আগে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের নিরিখে মনে করা হতো যে বল প্রয়োগ না করলে গতি বজায় রাখা যায় না; এই পুরোনো ধারণার সঙ্গে পাকাপাকি বিচ্ছেদ ঘটালেন নিউটন। বলপ্রয়োগ না করলে গতি বজায় রাখা যায়না, আপাতদৃষ্টিতে একথা ঠিকই; কিন্তু তার কারণ হচ্ছে ঘর্ষণবলের (friction) অস্তিত্ব; যেকারণে পটু এনজিনিয়ার মাত্রেই এই ঘর্ষণবলকে দূর করতে চান। নিউটনের গতিসূত্রে এই ঘর্ষণবলের ভূমিকা গৌণ বলে পরিগণিত হলো। এককথায় বলতে গেলে, প্রাচীনকালের দার্শনিকদের প্রিয় *স্থিতিশীল* বিশ্বের ছবি চিরদিনের মতো মুছে দিয়ে তার পরিবর্তে নিউটন এক *গতিময়* বিশ্বলোকের প্রতিষ্ঠা করলেন।

একদিকে এই রূপান্তর, অন্যদিকে তাঁর কণিকাবাদী দর্শন—এ দুয়ে মিলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নিজের অজ্ঞাতেই নিউটন তাঁর যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিলেন। ধ্রুপদী যুগের শেষভাগে, কিংবা সামন্ততান্ত্রিক যুগে সমাজ ছিল স্থায়ী ক্রমিক স্তরে বিন্যস্ত, সেখানে প্রতিটি মানুষের সামাজিক স্থান পাকাপাকিভাবে সুনির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু নিউটনের

যুগে সেই অনড় সামাজিক স্তরবিন্যাসের স্থান ক্রমশ দখল করে নিচ্ছিল মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগ—যে উদ্যোগে ব্যক্তিমানুষ তার নিজের স্থান নিজেই খুঁজে নেয়।

পূর্ববর্তী একশো বছরের পরীক্ষানিরীক্ষা আর গণনাকার্য নিউটনের কীর্তির মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধি লাভ করে। তাঁর প্রত্যক্ষ সাফল্যগুলি ছাড়াও, পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানীদের ব্যবহারের উপযোগী এক সুনির্ভরযোগ্য পদ্ধতি তিনি রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর কাজ বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী নির্বিশেষে সকলকেই বোঝাতে পেরেছিল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কতকগুলি সরল গাণিতিক নিয়ম মেনে চলে। পরে আমরা দেখতে পাব, তড়িৎ ও চুম্বকের নিয়মাবলী নিউটনীয় মডেলের অনুসরণেই আবিষ্কৃত হয়; এবং রসায়নের পরমাণু-তত্ত্ব নিউটনের পরমাণু-বিষয়ক ভাবনাচিন্তারই সাক্ষাৎ পরিণতি।

নিউটনের গৌরব ও প্রভাব

নিউটনের এই বিপুল সাফল্যের মধ্যেই কিন্তু একটা বিপদের সম্ভাবনা নিহিত ছিল। অপরিমিত ছিল তাঁর ক্ষমতা, আপাতবিচারে তাঁর বিশ্বব্যবস্থাটিও ছিল নিটোল, নিখুঁত। তাঁর এই অতুলনীয় সিদ্ধিই পরবর্তী শতকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেবল যেসব ক্ষেত্র তাঁর 'পরশে পবিত্র' হয়নি, সেইসব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে। ব্রিটিশ গণিত-গবেষণার জগতে তো এই বাধা এমনকি মধ্য-উনিশ শতক পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। তাঁর জগৎব্যবস্থা সম্বন্ধে সংশয় জাগার পরেও তাঁর প্রভাব বজায় ছিল। বিজ্ঞানচর্চার যে সুরটি তিনি বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন তা যেন স্বতঃসিদ্ধের মর্যাদা লাভ করে। ফলে এর মধ্যে যে গুরুতর সীমাবদ্ধতা ছিল, যা কিনা বহুলাংশে তাঁর ধর্মীয় ধ্যানধারণার অবদান, তার স্বরূপটি আইনস্টাইন-যুগের আগে বোঝা যায়নি। এমনকি আজও এই সীমাবদ্ধতা পুরোপুরি স্বীকৃত হয়নি।

সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, দর্শনকে গাণিতিক রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও নিউটনের ভাবধারার সবচেয়ে প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিক ফল ফলেছিল অর্থনীতি আর রাজনীতির ক্ষেত্রে। প্রথমে বন্ধু লক, এবং পরে লকের উত্তরসূরী হিউমের দর্শনের মধ্যে দিয়ে পরিস্রাবিত হয়ে নিউটনের ভাবধারা যেকোনো নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা জাগায় এবং অবাধ বাণিজ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে। তারই পরিণামে ধর্মের এবং ঈশ্বর-নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থার গৌরবহানি ঘটে। মনে রাখতে হবে, নিউটনকে ফ্রান্সে পরিচিত করান স্বয়ং ভল্‌তেয়ার। ভলতেয়ারের মাধ্যমে নিউটনের ভাবধারা সেখানে মননমুক্তির (Enlightenment), এবং সেই সূত্রে ফরাসি বিপ্লবের ভাবধারার সহায়ক হয়। আজও পর্যন্ত নিউটনের ভাবধারাই বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের দার্শনিক ভিত্তি।

10. পর্যালোচনা : পুঁজিতন্ত্র এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব

পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে নব্য বিজ্ঞানের এই মহাকাব্যপ্রতিম আন্দোলনের দিকে ফিরে তাকালে এবার আমরা অনেকটা পরিষ্কার করে বুঝতে পারি, কেন ঐ কালে এবং ঐ স্থানে বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছিল। পনেরো এবং ষোলো শতকে বুর্জোয়াশ্রেণীর উত্থান ঘটে, বাণিজ্য ও শিল্প পুনরুজ্জীবিত হয়। অতঃপর সতেরো শতকে ইংলন্ডে ও হল্যান্ডে ঐ শ্রেণী রাজনৈতিকভাবে জয়যুক্ত হয়। বিজ্ঞানের উদ্ভবও প্রায় ঐ সঙ্গেই ঘটে। পুঁজিতন্ত্রের জন্মের অল্পকাল পরেই বিজ্ঞানের জন্ম। যে মানসিকতা সামন্ততন্ত্র আর চার্চের ধরাবাঁধা রূপগুলোকে ভেঙে দিয়েছিল, সেই একই মানসিকতা প্রাচীনতর ধ্রুপদী দুনিয়ার রক্ষণশীল দাস-প্রভু সমাজের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়। যেমন রাজনীতিতে, তেমনি বিজ্ঞানেও, এই ঐতিহ্যের

নিগড় ভেঙে বেরিয়ে আসার ফলে মানুষের উদ্যমশীলতার বাঁধ ভেঙে যায়, তখনো পর্যন্ত রুদ্ধ নানা ক্ষেত্রে তা শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। নব্য বিজ্ঞানীদের আগ্রহ এতদূর প্রসারিত ছিল যে ব্রহ্মাণ্ডের কোনো স্থানই অতিদূর বলে, কোনো কাজই অতি হীন বলে মনে হতো না তাঁদের কাছে।

সপ্তদশ শতকে বিজ্ঞানের সংহতি

সতেরো শতকের বিজ্ঞানচর্চার শত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তার গভীরে একটি অন্তর্লীন ঐক্য জাগ্রত ছিল। তিনটি স্তম্ভের ওপর সে ঐক্য নির্মিত হয়েছিল : ব্যক্তি, ভাবধারা এবং প্রয়োগ। প্রথমত, সতেরো শতকের বিজ্ঞানীরা তখনকার যাবতীয় বিজ্ঞানক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে এবং মৌলিক অবদান রাখতে সক্ষম ছিলেন। নিউটন যে কেবল একজন গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, আলোকবিদ এবং যন্ত্রকুশলী ছিলেন তাই নয়, বহু বছর ধরে তিনি রসায়ন নিয়েও চর্চা করেছিলেন। তাঁর রসায়ন-গবেষণার ফলাফল প্রায় কিছুই তিনি তখন প্রকাশ করেননি, কিন্তু আজকের দিনে আমাদের মনে হয় রসায়নে তাঁর ব্যুৎপত্তি সেকালে সবার চাইতে বেশি ছিল. গণিতে হুকের বুৎপত্তি প্রথম শ্রেণীর ছিল না। তবু, আমরা দেখেছি, তিনি উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে তো কাজ করেই ছিলেন, উপরন্তু শারীরতত্ত্ব (physiology) নিয়েও চর্চা করেছিলেন। এখানেই শেষ নয়, তিনি ছিলেন অণুবীক্ষণবিদ্যারও অন্যতম পুরোধা। রেন্-কে আমরা চিনি স্থপতি হিসেবে; কিন্তু তিনি সেকালের বিজ্ঞান-আন্দোলনের মধ্যমণি ছিলেন। এই বিশ্বজনীনতা থাকার দরুন সেকালের বিজ্ঞানীরা—'গুণী'রা (virtuosi)—সমগ্র বিজ্ঞানক্ষেত্রের এক সংহত বা ঐক্যবদ্ধ রূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে সেটা ঐ পরিমাণে আর সম্ভব হয়নি।

গণিতনির্ভর দর্শন

দ্বিতীয়ত, যে ভাবধারা ও কর্মপন্থা সেযুগের বিজ্ঞানকে পরিচালিত করেছিল, তা ছিল মূলত গণিতনির্ভর। সুতরাং সেই সূত্রেও বিজ্ঞানের এক অন্তর্লীন ঐক্য গড়ে উঠেছিল। যে-গণিত তার ভিত্তি তা সরাসরি গ্রীকদের কাছ থেকে আহরিত হলেও, তার মধ্যে আরবী, ভারতীয় এবং সম্ভবত চৈনিক গণিতেরও অবদান ছিল। এর ফল যে অবিমিশ্রভাবে লাভজনক হয়েছিল তা কিন্তু নয়; কারণ গণিত নিয়ে এত বেশি মগ্ন হয়ে থাকার দরুন সতেরো শতকের বিজ্ঞানে অলক্ষিতে এক ধরনের সীমাবদ্ধতা এসে পড়েছিল। যেসব অভিজ্ঞতাকে গাণিতিক রূপ দেওয়া যায়না সেগুলোকে অগ্রাহ্য করার একটা প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়েছিল এর ফলে। শুধু তাই নয়, যেসব অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে গণিতের প্রয়োগ সম্ভব নয়, সেসব ক্ষেত্রেও জোর করে গণিত প্রয়োগ করার প্রয়াস দেখা দেয়; পরিণামে বিচিত্র সব হাস্যকর ফলাফল বেরিয়ে আসে। যেমন হার্ভের এক শিষ্য বলেন, শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থির (glands) ক্রিয়া নির্ভর করে তাদের কণাসমূহের আপেক্ষিক ভরবেগের (relative momentum) ওপর, যা কিনা নির্ধারিত হয় গ্রন্থিনালীগুলো থেকে যে-কোণে রসধারা নির্গত হয় তার দ্বারা। এর চরম উদাহরণটির দেখা মেলে সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে : সপ্তদশ শতাব্দীর মহত্তম দার্শনিক স্পিনোজা (1632-77) নীতিশাস্ত্রকে গণিতসূত্রে রূপ দেওয়ার প্রয়াস পান। গণিতের ওপর এইভাবে অস্বাভাবিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে সতেরো শতকের বিজ্ঞানীরা কেবল সেইসব ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করেছিলেন যেখানে পূর্বসূরী গ্রীকরাও সফল হয়েছিলেন—যেমন বলবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান। পক্ষান্তরে রসায়ন ও জীববিজ্ঞানে এযুগের বিজ্ঞানীদের সাফল্য তেমন লক্ষণীয় নয়।

বিজ্ঞান ও প্রকৌশল-সমস্যা

নব্য বিজ্ঞানের ঐক্যসাধনের মূলে যে তিনটি কারণ সক্রিয় ছিল তার মধ্যে তৃতীয়টি হলো, সে যুগের প্রধান প্রধান প্রকৌশল-সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানের প্রয়াস। এই কারণটিই সবচেয়ে লক্ষণীয়। আমরা আগেই দেখেছি, চতুর্দশ শতাব্দী, এমনকি তার আগে থেকেই প্রকৌশলের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হতে থাকে। এইসব অগ্রগতির মূলে ছিল ঐতিহ্যের নিগড় থেকে মুক্তি। তখনকার ইউরোপের পরিস্থিতি ছিল অনুকূল। তখন সম্পদ অঢেল, কিন্তু তা কাজে লাগাবার মতো লোকের সংখ্যা সীমিত। স্বভাবতই উদভাবনশীলতার গুরুত্ব খুবই বেড়ে ওঠে। আকর-খনন আর ধাতুবিদ্যায়, পরিবহন আর বস্ত্রশিল্পে নানান নতুন নতুন প্রকৌশল চালু হয়। এই সব প্রকৌশলের উদ্ভব ঘটাতে গিয়ে ঐতিহ্যের বাঁধন কাটাতে হয়েছিল। নতুন প্রকৌশল যেসব নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটায় তার সমাধানকল্পেই আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে। এইসব নতুন সমস্যাবলীর অনেকগুলোরই তাৎক্ষণিক কার্যকর সমাধান পুরোনো গ্রীক বিদ্যাচর্চার আওতার মধ্যে থেকেই করা সম্ভব ছিল—যেমন নৌচালন, কামান-নির্মাণ (gunnery) এবং বলবিজ্ঞান। যাদের সমাধান ঐভাবে করা সম্ভব ছিল না, সেইগুলোই পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা লাভ

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীরা সাফল্যের যে বিরাট দাবি করেছিলেন তা সেযুগের পরিস্থিতির তুলনায় অবাস্তব ছিল। বস্তুত, আঠেরো শতকের শেষপর্বের আগে পর্যন্ত উৎপাদন-শিল্পের কাছ থেকে বিজ্ঞান যতভাবে উপকৃত হয়েছিল, উৎপাদন-শিল্পকে সে তুলনায় কিছুই ফিরিয়ে দিতে পারেনি। রসায়ন আর জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিরাচরিত পদ্ধতিগুলোকে বদলানোর বা উন্নত করে তোলার ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের প্রস্তাবসমূহ কার্যকর হতে হতে অন্তত একশো বছর কেটে যায়—চিকিৎসাশাস্ত্রে তো আরো বেশি সময় লাগে। এমনকি বলবিজ্ঞান আর কামান-নির্মাণের মতো যেসব ক্ষেত্রে ভৌত বিজ্ঞান অনেকদূরে অগ্রসর হয়েছিল, সেখানেও হাতে-কলমে কাজ-করা লোকেদেরই কর্তৃত্ব ছিল প্রধান। যন্ত্রপাতির উন্নতিসাধনের ভার বহুকাল ধরেই কলসারাইকারীদের (millwrights) ওপর ন্যস্ত থাকে; কামানের উন্নতিসাধনের ভারও আরো বহুকাল কামান-ঢালাইকরের ওপরে ন্যস্ত থাকে। কাঠ নিয়ে, কিংবা কোনোরকমে ঢালাই-করা ধাতু নিয়ে কাজ করলে নব্য গণিত আর বলবিজ্ঞান-নির্দেশিত উন্নত প্রকরণের প্রয়োগ করা কি সম্ভব? যেমন ধরা যাক, বাতাসের প্রতিরোধ কতটা সেই হিসেব ক'রে নিউটন কামান-নিক্ষিপ্ত গোলার গতিপথটি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই পদ্ধতি এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তাঁর নিজের যুগে তার ব্যবহার একেবারেই অসম্ভব ছিল। কারণ তখনকার কামানের নল ছিল অসমান, তাতে গোলা ঠিকমতো বসত না; তাতে ঠাসা বারুদের পরিমাণ একেকবারে একেকরকম হতো; দড়িদড়া আর গোঁজ বসিয়ে কামানকে হাতে করে ঘুরিয়ে কোনোরকমে লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাগ করতে হতো। সুতরাং যে লোক হাতেকলমে কামান নির্মাণ করত তার কাছে ঐ ক্ষেপণ-বিদ্যার (ballistics) কোনো মূল্যই ছিল না। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ঘড়ি-প্রস্তুতকারীর বিদ্যা। নৌ-ক্রনোমিটারের মধ্যে ঘড়ি-প্রস্তুতকৌশলের যে উচ্চশ্রেণীর নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, গতিবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান না থাকলে তা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

তবে নব্য বিজ্ঞানের আসল সাফল্যটি অর্জিত হয় নৌচালনের ক্ষেত্রে। এই একটা সাফল্যেই বাজিমাত হয়ে যায়। কারণ সেযুগে জাতীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্ববিধ সাফল্যের

চাবিকাঠিটা নিহিত ছিল সমুদ্রপথে নিয়ন্ত্রণ-প্রতিষ্ঠা এবং নবাবিষ্কৃত মার্কিন দুনিয়ায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে। ঠিক সেই ক্ষেত্রেই নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে বিজ্ঞান নিজেকে নবীন প্রভাবশালী পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠা করল। এইভাবে নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানচর্চার যে ধারার সূত্রপাত হলো, যে মর্যাদা লাভ করল বিজ্ঞান, তাতে কখনো কোনো চিড় ধরেনি। আপেক্ষিক এবং পরম, উভয় অর্থেই বিজ্ঞান বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। কারণ ক্রমশই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রাচীন মুসলিম, ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতার তুলনায় ইউরোপীয় সভ্যতার সামরিক ও অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের মূলে আছে তার প্রকৌশল-সিদ্ধি। আর প্রকৌশলের উন্নতি ঘটাতে গেলে বিজ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োগ ও বিকাশসাধন ছাড়া গত্যন্তর নেই।

প্রাচীন ও নবীন

এই প্রকৌশলের ক্ষেত্রেই আধুনিকেরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ করে অনুভব করতেন। সাম্প্রতিক অতীতের রেনেসাঁস যুগ বা বর্বর মধ্যযুগের তুলনায় তো বটেই, এমনকি কিংবদন্তী-প্রতিম প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের চেয়েও তাঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন, আধুনিক মানুষ প্রাচীন যুগের মানুষের চেয়ে মহৎ বা প্রাজ্ঞ না হতে পারে, কিন্তু সে এমন সব কাজ করতে পারে যা প্রাচীনদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল— যেমন কামান থেকে গোলা ছোঁড়া বা সাগরপাড়ি দিয়ে আমেরিকা পৌঁছনো। আর, অর্জিত বাস্তব কীর্তিগুলোর সাফল্যের চেয়েও বড়ো ছিল তাঁদের একটা বিশেষ প্রত্যয়; তাঁরা অনুভব করতেন যে এই সবে শুরু, এ পথে সম্ভাব্য অগ্রগতির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। কমেনিয়াসের শিক্ষক যোহান ভ্যালেন্তিন আনদ্রি সেই 1619 সালেই বলেছিলেন, 'প্রগতির প্রতি আশা হারানো পাপ।' এই ভাবনাটা মধ্যযুগীয় মানসের কাছে— শুধু মধ্যযুগীয় কেন, সম্ভবত ধ্রুপদী মানসের কাছেও— ছিল অস্বাভাবিক। কিন্তু আধুনিকেরা ঐ ভাবনারই জয়ধ্বজা উড়িয়ে চললেন।

বস্তুত এই পর্বের শেষের দিকেই প্রাচীন আর আধুনিকের লড়াইটা সবচেয়ে সচেতন রূপ ধারণ করে। জ্ঞানজগতের সকল ক্ষেত্র জুড়ে সে লড়াই চলে। তাতে কখনো জেতেন প্রাচীনরা, কখনো আধুনিকেরা। এ লড়াইয়ের সবচেয়ে বিখ্যাত অভিব্যক্তি হলো সুইফ্টের *Battle of the Books*. যেমন *Gulliver's Travels*-এ, তেমনি এই রচনাতেও সুইফ্ট কিন্তু স্রোতের উজানে চলেছিলেন। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের 'মেহগনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার' চিরায়ত গ্রন্থের বাস্তব প্রয়োজন সত্যিই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ধ্বনি-ঝংকারে পূর্ণ গদ্যরচনার আদর্শ রূপে হয়তো সেসবের গুরুত্ব তখনো ছিল, কিন্তু দর্শন বলতে আঠেরো শতক যা বুঝত তাতে ঐসব গ্রন্থের আর কোনো অবদান রাখার ক্ষমতা ছিলনা।

প্রগতি তখনো বাস্তবে অর্জিত হয়নি, তখনো তা একটা আদর্শ। পনেরো, যোলো আর সতেরো শতকের যে বিরাট উত্তরণ-প্রক্রিয়া, তা কিন্তু বাস্তব জীবনযাত্রায় কোনো বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে পারেনি। যা ঘটেছিল তা হচ্ছে সম্পদ আর দারিদ্র্যের একটা পুনর্বন্টন। আলোচ্য পর্বের শুরুতে ইংলন্ডে এবং 'লো কান্ট্রিজে' (অর্থাৎ বেলজিয়াম, হল্যান্ড আর লুক্সেমবুর্গে) সচ্ছল লোকের সংখ্যা যা ছিল, সে পর্বের অন্তে তা অনেক বেড়ে যায়; যদিও ইতালিতে সে সংখ্যাটা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। সবচেয়ে বড়ো ঘটনাটা এই যে সম্পদ বহুগুণিত করার জন্য তাকে পুঁজিতে পরিণত করার প্রক্রিয়াটি চালু হয়ে গিয়েছিল, সামন্ততান্ত্রিক বাধানিষেধ আর তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। ঐ নতুন প্রক্রিয়ার দূরপ্রসারী বিকাশের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। পুঁজিতন্ত্রের সেই প্রথম অধ্যায়ে মুনাফার তাড়নাই প্রকৌশলের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করছিল। কিন্তু তখনকার অর্থনৈতিক কাঠামোটা ছিল মাথা-ভারি। প্রথম থেকেই তা ছিল

অ-স্থিতিশীল। সতেরো শতকের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আর বণিকদের ঐশ্বর্য যথেষ্ট ছিল, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁদের মোটামুটি আগ্রহও ছিল; তবু একথা অনস্বীকার্য যে নতুন সম্ভাবনার যে-দিগন্ত সেদিন খুলে গিয়েছিল তাকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা তাঁদের ছিলনা। তবে তাঁরা পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন : সেইপথ ধরেই পরে আসে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের ম্যানুফ্যাকচারারের দল, তারাই বিজ্ঞানের আশীর্বাদে পুষ্ট হয়ে মানবসভ্যতার চিরাচরিত প্রকৌশলগুলোকে কাজে লাগায়, সেগুলোর খোল নলচে বদলে দেয়।

মনন-বিপ্লব

তবে, নিছক ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করেছিল, এ কথা ভাবলে ভুল হবে। প্রাচীন যুগের দর্শনের যে রাজনৈতিক ও নৈতিক মর্যাদা ছিল, যা রেনেসাঁস যুগে অনেক বেড়ে উঠেছিল, এ যুগের বিজ্ঞানও বহুলাংশে সে-মর্যাদার অধিকারী ছিল। 'প্রাকৃতিক দর্শনে'র (বিজ্ঞান তখন ঐ নামেই অভিহিত) চর্চা তখন একটা সম্ভ্রমসূচক, এমনকি মহৎ কর্ম বলে বিবেচিত হতো। সেই চর্চাকে উৎসাহিত ক'রে পৃষ্ঠপোষকরা রাষ্ট্রের গৌরব বৃদ্ধি করছেন বলে মনে করতেন। নবীন পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞানের সাধকরা মনে করতেন, প্রাচীন সাধকদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তাঁরাই—মধ্যযুগের ধর্মশাস্ত্রীরা নন। এবং এটা লক্ষণীয়, এই নবীন পরীক্ষানির্ভর পদ্ধতি বহির্জগতের সেইসব ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করেছিল যা নিয়ে গ্রীকরা ইতিমধ্যেই চর্চা করে গিয়েছিল। তবে, গ্রীক গণিত ছিল নবীন এই বিজ্ঞান-পদ্ধতির মাত্র একটা হাতিয়ার; বিজ্ঞানের যে সামগ্রিক মননগত আন্দোলন, তা কিন্তু গড়ে উঠেছিল গ্রীক দর্শনের সঙ্গে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। কারণ, মধ্যযুগে গ্রীক দর্শন এমন এক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সেবায় নিয়োজিত ছিল যা আলোচ্য পর্বে অকেজো হয়ে পড়েছিল। গোড়ার দিকে এই নতুন পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞানের পক্ষে সমালোচনাপ্রবণ এবং ধ্বংসাত্মক না হয়ে উপায় ছিলনা। পরের দিকে অবশ্য তা অপেক্ষাকৃত যুগোপযোগী এক দর্শনের ভিত্তি রচনার লক্ষ্যে নিয়োজিত হয়। তবে, প্রাচীন-নবীনের পুরোপুরি বিচ্ছেদ কখনোই ঘটেনি। কেননা অভ্যন্তরীণ বাধা এবং সমাজ-আরোপিত বাধা—দুটোই অত্যন্ত প্রবল ছিল। ক্যাথলিক হোক আর প্রোটেস্টান্ট হোক, বাইবেল-কথিত সৃজন ও মুক্তিলাভের সাধারণ খ্রিস্টীয় ছকটাতে সবারই বিশ্বাস অটুট ছিল। সেই ছক থেকে খুব একটা দূরে সরে যাওয়া তখন সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও বেকন আর দেকার্ত্-এর রচনায় সোচ্চারে, এবং গ্যালিলিও আর নিউটনের রচনায় সাবধানে, অনুক্তভাবে বিশ্বের দৈব পরিচালনার ছকটি সম্বন্ধে বড়োরকমের প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। ধর্মের সামগ্রিক কাঠামো নিয়ে পরবর্তী শতকে যে প্রশ্ন ওঠে, এইগুলিই তার ভিত্তি।

এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের একটা অদ্ভুত স্ববিরোধিতা এই যে কোপার্নিকাস থেকে আরম্ভ ক'রে নিউটন পর্যন্ত যাঁদের অবদান এই বিপ্লবের মূলে সবচেয়ে বেশি, তাঁদের ধর্মীয় এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সবচেয়ে রক্ষণশীল। তাঁরা কট্টরপন্থী ছিলেন না কেবল এই কারণে যে তাঁরা মনে করতেন, কট্টরপন্থা যুক্তির পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। অ্যাকুইনাস্-প্রদর্শিত পথে তাঁরা ভক্তি আর যুক্তির মিলনকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অথচ অ্যাকুইনাস্-এর সিদ্ধান্তগুলিকে অস্বীকার না করে তাঁদের উপায় ছিল না। কারণ অ্যাকুইনাস বিশ্বজগতের যে ছকের কথা ভেবে যুক্তি আর ভক্তির ঐ মিলনের কথা বলেছিলেন সে ছক স্পষ্টতই অবাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এই বিজ্ঞানীরা নিজেরা যুক্তি আর ভক্তির সমঝোতার যেসব পথ বার করেছিলেন, সেগুলো অবশ্য আরো ঠুনকো বলে প্রমাণিত হয়। আসলে বিজ্ঞানের ওপর ধর্মতত্ত্বের খবরদারির দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে বিকৃত বা শ্লথ করে তোলার ক্ষমতা তার তখনো ছিল, কিন্তু

থামিয়ে রাখবার ক্ষমতা আর ছিল না। তখন ধরেই নেওয়া হলো যে নৈতিক আর আধ্যাত্মিক গণ্ডির মধ্যেই ধর্মের বিচরণ সীমাবদ্ধ। আর বস্তুময় জগতে বাঞ্ছিত হোক আর অবাঞ্ছিত হোক, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব একটা অনস্বীকার্য ঘটনা বলে গৃহীত হলো।

বিজ্ঞানের পত্তন

1690 সাল নাগাদ বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তার মর্যাদা বিপুলভাবে বেড়ে যায়—অন্তত সে যুগের সমাজের উচ্চবর্গের মধ্যে। ইংলন্ডের রয়্যাল সোসাইটি আর ফ্রান্সের Académie Royale des Sciences , এই দুটি বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়। দুদেশের শাসকশক্তির সঙ্গে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংযোগও গড়ে ওঠে— ইংলন্ডে পার্লামেন্ট এবং বিখ্যাত হুইগ গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে, আর ফ্রান্সে রাজসভার সঙ্গে। বিজ্ঞান অন্যান্য দেশেও প্রসার লাভ করে। বিজ্ঞানচর্চার পরীক্ষণ আর গণন-ভিত্তিক এক সুসংহত পদ্ধতি গড়ে ওঠে, যার সাহায্যে আজ হোক কাল হোক যে কোনো সমস্যারই মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল। বিজ্ঞানের এই ভিত্তিমূল পরবর্তীকালে আরো শক্তিশালী হয়, এমনকি বদলেও যায়, তবু সে ভিত্তির ওপর নির্মিত অট্টালিকাটিতে কখনো চিড় ধরেনি। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, এই অট্টালিকা নির্মাণের পদ্ধতিটি মোটের ওপর জানা হয়ে গিয়েছিল; পরে কখনো তা ভুলে যাবার সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত।

তবে গোড়ার দিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এই সাফল্যের মধ্যেই বিপদের কিছু সম্ভাবনাও নিহিত ছিল। এই পদ্ধতির মধ্যেও প্রাচীন ভাবধারার রীতিমতো ছায়াপাত ঘটেছিল, যা অবধারিতরূপে প্রথম যুগের সেই বিজ্ঞানীদের মনকে প্রভাবিত করেছিল। ফলে নব্য বিজ্ঞানের দর্শনের মধ্যে পরীক্ষা-আহরিত নতুন নতুন ধ্যানধারণার পাশাপাশি ঐসব প্রাচীন ভাবধারার পূতভস্মও স্থান লাভ করে। আজকের যুগে ভাববাদী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যে উত্থান দেখা যাচ্ছে তার মূলে অনেকটাই রয়েছে অতীতের ঐ গতায়ু ধ্বংসাবশেষের অসচেতন উপস্থিতি। সতেরো শতকের বিজ্ঞান যেমন অ্যারিস্টটলের বিশ্বব্যবস্থাটিকে ভেঙে দেবার কাজে ব্রতী হয়েছিল, তেমনি বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকে হয়তো নিউটনের বিশ্বব্যবস্থাকে ভাঙবার কাজে ব্রতী হতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়

বিজ্ঞান ও উৎপাদন-শিল্প

ভূমিকা

আঠেরো আর উনিশ—এই দুটি শতক ছিল আধুনিক জগতের মহান গঠনশীল পর্ব। সে যুগের মানুষের মনে হয়েছিল, মানুষের অগ্রগতির পথে সব বাধা বুঝি চিরকালের মতো অপসারিত হয়ে গেছে, সমৃদ্ধির আর অবাধ প্রগতির পথটির সন্ধান অবশেষে সত্যিই পাওয়া গেছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর নানান বিক্ষোভ আর পরিবর্তনের আলোকে বিচার করে দেখলে আজকে আমাদের মনে হয় আঠেরো এবং উনিশ শতক আসলে ছিল এক প্রস্তুতিপর্ব। সে পর্বে মানুষের অনেক দুঃখকষ্টের মূল্যে অনেক মহৎ কীর্তি অর্জিত হয়েছিল, আর সেইসব সাফল্যের মধ্যে দিয়ে এক জমকালো কিন্তু অস্থির সংস্কৃতি রূপ ধারণ করেছিল। ঐ পর্বেই নব্য শিল্প-সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বিজ্ঞান। সতেরো শতকের বিপ্লবে পরীক্ষানির্ভর নতুন যেসব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছিল, এবার মানব-অভিজ্ঞতার যাবতীয় ক্ষেত্রে সেগুলোর প্রয়োগ ঘটল। একই সঙ্গে, উৎপাদন-উপকরণেব বিরাট যে রূপান্তর ঘটছিল তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে ঐসব পদ্ধতির প্রয়োগ, তাকে অনুপ্রাণিত করে। উৎপাদন-উপকরণের ঐ বিরাট রূপান্তরকেই আমরা বলি *শিল্পবিপ্লব।*

শিল্পবিপ্লবকে মূলত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফসল বলা চলে না, সে বিপ্লবের প্রথম পর্বে তো একেবারেই না। তবে একথা ঠিক যে বিজ্ঞানের কিছু অবদান শিল্পবিপ্লবের মূলে সক্রিয় উপাদান রূপে কাজ করেছিল, বিশেষ করে বাষ্পীয় এনজিন। শিল্পবিপ্লবের গোটা আন্দোলনটা *পুঁজিতান্ত্রিক* অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশেব এবং অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের প্রক্রিয়াটির সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রূপান্তরের ঐ প্রক্রিয়ায় বণিক ও ছোটো ম্যানুফ্যাক্‌চারারদের হাত থেকে লগ্নীকার (financiers) ও ভারি শিল্পের হাতে চলে যায় আধিপত্য।

মনন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে আহরিত বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ; শিল্পক্ষেত্রের প্রকৌশলগত পরিবর্তনসমূহ; এবং পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য — এসব যে একই সঙ্গে, একই কালে, একই স্থানে বিকশিত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, সেটা নিছক কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। তাই বলে এদের পারস্পরিক সম্পর্কের জট ছাড়ানোর কাজটা অবশ্য আদৌ সহজসাধ্য নয়। কারণ প্রকৌশল, অর্থনৈতিক রূপ আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান—এ সবই এ পর্বে অতি দ্রুত বিকশিত ও পরিবর্তিত হতে থাকে; কখনো একটি, কখনো বা অন্যটি এগিয়ে থাকে। এই বিশেষ অধ্যায়ে আমরা প্রকৌশল এবং অর্থনীতির পরিবর্তনের মূলে বিজ্ঞানের ভূমিকাটি বোঝবার চেষ্টা করব; আর সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের বিকাশ ও চরিত্রকে এইসব পরিবর্তন কীভাবে প্রভাবিত করেছে তার রূপটিও বোঝবার চেষ্টা করব। এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করার পরেই সে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে; তখন, এই অধ্যায়ের শেষভাগে, সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

প্রথমে অবশ্য এই পর্বের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলির একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া দরকার, যাতে বিজ্ঞানক্ষেত্রের পরিবর্তনগুলিকে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে রেখে অনুধাবন

করা যায়। সতেরো শতকের শেষ দিকেই আসন্ন নতুন, অর্থাৎ পুঁজিতান্ত্রিক, উৎপাদনপদ্ধতির বিকাশসাধনের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। ইংলন্ড, উত্তর ফ্রান্স, 'লো কান্ট্রিজ (হল্যান্ড, বেলজিয়াম আর লুক্সেমবুর্গ) নিয়ে গঠিত ইউরোপের এক ছোট্ট কোণে শহুরে মধ্যশ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক বিধিনিষেধের বেড়া ভেঙে কমবেশি বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন চালানোর জন্যে টাকা লগ্নী করার সাধ্য তাদের ছিল। আব নব্য নৌ-চালকদের কল্যাণে দুনিয়া-জোড়া বাজারের সিংহদ্বার তাদের সামনে খুলে গিয়েছিল। উৎপাদিত পণ্যেব সে বাজাব তখন নিয়ত-বর্ধিষ্ণু। উৎপাদন তখনো হস্তশিল্প এবং কুটিরশিল্প-নির্ভর হলেও বণিক আর পুঁজিমালিক ম্যানুফ্যাক্চারাররা উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায় সে উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। হস্তশিল্পী আর কৃষকরা হয়ে পড়ছিল মজুর। তিনটি কারণের সন্নিপাত ঘটায় নতুন নতুন প্রকৌশলগত উদ্ভাবনের ওপর (যেমন বস্ত্র-শিল্পযন্ত্রের) এবং বাষ্পীয় এনজিনের মতো বৈপ্লবিক আবিষ্কারের ওপর বিশেষ জোর পড়ে—যা কিনা উৎপাদনের খরচ কমিয়ে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়িয়ে তোলে। প্রথমত, বাজার ক্রমাগতই বড়ো হতে থাকে। দ্বিতীয়ত, শহর-কেন্দ্রিক বাণিজ্যসংঘগুলো ভেঙে যাওয়ায় পণ্য-উৎপাদনের ওপর বিধিনিষেধ ক্রমশই শিথিল হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, লাভজনক উদ্যোগে টাকা লগ্নী করার একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে ওঠে। সুষ্ঠুতর শ্রম-সংগঠন, কর্মভারের বণ্টন ও বিশেষীভবন (specialization), ফ্যাক্টরি প্রথা, এবং অবশেষে শক্তি-চালিত যন্ত্রপাতি—এসবেরই লক্ষ্য ছিল উৎপাদন ও মুনাফার বৃদ্ধি। এই লক্ষ্যই পুরোনো উৎপাদন-প্রথাকে বিনষ্ট করার তাগিদ যুগিয়েছিল। আঠেরো শতকের উত্তরার্ধে এই প্রক্রিয়াটি চালু হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি সফল হওয়ায় নতুন যে পুঁজি জমা হয় তারই দৃঢ় বনেদের ওপর এই প্রক্রিয়াটি উত্তরোত্তর বলশালী হয়ে ওঠে, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ে। মধ্য-উনিশ শতক নাগাদ পুঁজিতন্ত্রেব বিশ্বব্যাপী আধিপত্য হয়ে ওঠে প্রশ্নাতীত। কিন্তু সেই আধিপত্যই আবার তার পরবর্তী প্রসারণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে এমন একটা মূলগত অস্থিরতা প্রকট হয়ে ওঠে যার থেকে তার যেন কোনো নিস্তার নেই বলে মনে হলো। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। স্বভাবতই, নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধি বজায় রাখতে হলে পুঁজিতন্ত্র-সৃষ্ট বিপুলসংখ্যক মজুরদের যথেষ্ট পরিমাণ সামগ্রী ও সুযোগসুবিধার ভাগ দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে রমরমার পর্বের পরেই দেখা দেয় মন্দার পর্ব, আর সে মন্দার তীব্রতা ক্রমশই বাড়তে থাকে। সীমিত বাজারের দখল নেবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়তে থাকে, ফলে জেগে ওঠে আন্তর্জাতিক রেষারেষি। তবে, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা সরাসরি ভেঙে-পড়বার প্রক্রিয়াটি বিশ শতকের আগে শুরু হয়নি। আমাদের আলোচ্য পর্বের বেশির ভাগ অংশ জুড়েই শিল্প-পুঁজিতন্ত্র টানা বিস্তার লাভ করেছিল। আর সেই পটভূমিতেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে; কারণ প্রসারমান ঐ শিল্প-পুঁজিতন্ত্র বিজ্ঞানের কাছে তার দাবি ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে থাকে।

প্রকৌশল ও বিজ্ঞান

প্রথম দিকটা বিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়াই নিছক অর্থনৈতিক তাগিদে প্রকৌশলের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব ছিল, আর হয়েও ছিল তাই। কিন্তু অনেক সময়েই চোখ বুঁজে প্রচলিত পন্থা অনুসরণ করতে গিয়ে অভাবিতপূর্ব বিপত্তি ঘটত; আর তখন তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। যেমন, বস্ত্রের উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় উদ্ভিজ্জ রঙ্গকের (dye) যোগান প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হয়ে ওঠে; তখন এর একটা কৃত্রিম বিকল্পের সন্ধান জরুরি হয়ে ওঠে। এর জন্য বিজ্ঞানের সহায়তা অপরিহার্য ছিল। আরো একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মদ্য-শিল্প আগে ছিল কুটির-শিল্প। যখনই বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানে

বিপুল পরিমাণে মদ্য চোলাই হতে লাগল তখনই মারাত্মক সব ঘটনা ঘটতে থাকে এবং সেসবের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মুশকিল-আসান হিসেবে ডাক পড়ে বিজ্ঞানের।

উৎপাদন-শিল্পের অঙ্গনে তখন বিজ্ঞানের ভূমিকা ছিল কেবল আনুষঙ্গিক, বলা যেতে পারে ঐ মুশকিল-আসানের। উনিশ শতকের শেষের দিকে বিজ্ঞানের এই ভূমিকা বদলে যায়, বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত ইতিবাচক ভূমিকা নিতে থাকে। বিজ্ঞানের অঙ্গনে যেসব ভাবধারার সূত্রপাত ঘটে, সেগুলি থেকেই সবাসরি গড়ে ওঠে উৎপাদন-শিল্পের নবনব ক্ষেত্র। এর সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হলো বাষ্পীয় এনজিন—আদি আঠেরো শতকের সেই 'দর্শন-উদ্ভূত এনজিন।' এব মূলসূত্রগুলি আয়ত্ত হওয়া মাত্রই এ-এনজিন ব্যবহারিক এনজিনিয়ারিঙের অঙ্গনে প্রযুক্ত হতে থাকে। যেসব শিল্পের জন্মই বিজ্ঞানের ক্রোড়ে, এবং যারা আগাগোড়াই বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত থেকেছে, সেরকম শিল্পের দেখা অবশ্য উনিশ শতকের শেষদিকের আগে মেলেনি। পুরোপুরি বিজ্ঞান-নির্ভর শিল্পের পূর্ণ বিকাশ বিংশ শতাব্দীর আগে ঘটেনি।

হস্তচালিত উৎপাদন থেকে মেশিনচালিত উৎপাদনেব প্রক্রিয়ায় যে বিরাট উত্তরণ ঘটে আঠেরো শতকের শেষ পাদে, তার মূলে বাষ্পীয় এনজিনের মস্ত অবদান থাকলেও, ঐ উত্তরণের পিছনে বিজ্ঞানের ভূমিকাটিকে প্রধান বলা চলে না। বরং একথা বলাই সংগত যে উৎপাদনের ঐ নতুন প্রক্রিয়াটিই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণকে বিপুলভাবে ত্বরান্বিত করে। এই পরিস্থিতিটা বদলায় উনিশ শতকে। তখন বিজ্ঞানই হয়ে ওঠে প্রকৌশলগত পরিবর্তন সাধনের প্রধান শক্তি। অতঃপর বিশ শতকে বিজ্ঞান উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে একেবারে ওতপ্রোত হয়ে ওঠে।

এমন মনে করার অবশ্য কোনো কারণ নেই যে এই পর্বের ইতিহাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্কটি কেবল উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানের ভূমিকা-পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মধ্যযুগের সমাজে মানুষের মর্যাদা ও দায়িত্ব ছিল পূর্বনির্দিষ্ট। পক্ষান্তবে নতুন যে সমাজ রূপ ধাবণ করছিল তার ভিত্তি ছিল টাকার লেনদেন, সেখানে স্বাধীনতা আর ব্যক্তিগত উদ্যোগেব ওপরেই গুরুত্ব আরোপিত হচ্ছিল। এই সমাজব্যবস্থার সুযোগসুবিধেগুলো বিভিন্ন শ্রেণী ও দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞানের নবোদ্ভূত বিভিন্ন শাখায় যেসব পদ্ধতি অনুসরণ কবা হচ্ছিল, যেসব ফল অর্জিত হচ্ছিল, তার মধ্যেই এই সমাজব্যবস্থা বহুলাংশে ঐসব সুযোগসুবিধেব সন্ধান পেয়ে গেল। অপরদিকে, অজ্ঞাতসারে হলেও, নবোদ্ভূত বিজ্ঞানেব নানান সূত্রের ওপর প্রচলিত সামাজিক ধ্যানধারণার প্রবল প্রভাব পড়ল।

বিজ্ঞান-বিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব

সতেরো শতকের বৈজ্ঞানিক বিপ্লব আব আদি-আঠেরো শতকের শিল্পবিপ্লব—এ দুটিকে আলাদা আলাদা করে বিবেচনা করার ব্যাপারটা একটু বিসদৃশ মনে হতে পারে। এ দুয়ের মধ্যে ছেদহীন ধারাবাহিকতার কোনো প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে না। তবু হয়তো একটাই মস্ত রূপান্তর-প্রক্রিয়ার দুটি ক্রমিক অধ্যায় রূপে এদের গণ্য করাই সংগত হতো। তবু যে আমি এ দুটি নিয়ে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করেছি, সেটা কেবল আলোচনার সুবিধের জন্যেই নয়। সতেরো শতকের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবটা ঘটেছিল মূলত মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধির জগতে। আর আঠেরো শতকের শিল্পবিপ্লবটা ঘটেছিল ব্যবহারিক জগতে। এর প্রথমটিকে কারণ এবং পরেরটিকে কার্য বলে অভিহিত করার একটা প্রবণতা আসে। কিন্তু মনে হয় আমি প্রমাণ করতে পারব যে কার্যত এ-দুটির সম্পর্ক অনেক বেশি জটিল। জ্ঞান ও ক্ষমতার এই বিকাশ অনেকটা সমান্তরাল পথে ঘটেছে, এবং তাদের পেছনে ভিন্ন ভিন্ন প্রণোদনা কাজ করেছে। কিন্তু আগাগোড়াই তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটেছে, অগ্রগতির অতিদ্রুত পর্বগুলিতে তো

বটেই। সতেরো শতকের শেষের দিকে উক্ত দুটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয় তৃতীয় একটি ব্যাপার। সেটি অর্থনৈতিক ম্যানুফ্যাকচারে পুঁজিতন্ত্রের রূপ ক্রমশ প্রবলভাবে প্রকট হতে থাকে। সতেরো শতকের গণিত-জ্যোতির্বিজ্ঞান-চিকিৎসাবিদ্যা-নির্ভর বিজ্ঞান যে আঠেরো শতকে রসায়ন, তাপ এবং বিদ্যুৎ-নির্ভব বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হলো. তার কারণটি এইখানেই নিহিত বলে মনে হয়। বিজ্ঞান, উৎপাদন-শিল্প আর সমাজের এই জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চরিত্র ও ইতিহাসটি পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে প্রদত্ত বাস্তব উদাহবণগুলি থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে বলে আশা কবি।

বিভিন্ন পর্ব ও দিক

এই সমগ্র সময়কালটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং অত্যন্ত জটিল। সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিযার অন্তর্লীন ঐক্য ও নিরবচ্ছিন্নতার সূত্রটিকে বজায় রেখে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করার যে পন্থাটি আমি প্রশস্ততম বলে মনে কবি সেটি হলো: একদিকে কাল, অন্যদিকে বিষয়—এই দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করা। এর মধ্যে দিয়ে একধরনের পারস্পবিক বর্গীকরণও ঘটানো সম্ভব। প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায় দুটিতে যথাক্রমে কালগত ও বিষযগত দুটি আলোচনা পাওয়া যাবে। তারপর একটা সামগ্রিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়েছে।

সমগ্র সময়কালটিকে আমি চারটি প্রধান পর্বে ভাগ করে নিয়েছি। *প্রথমটি* হলো উত্তরণপর্ব, যা পরিণতি লাভ করে শিল্পবিপ্লবে, অর্থাৎ 1690-1760। ফরাসি বিপ্লবের গোটা প্রক্রিয়াটি *দ্বিতীয়* পর্বের অন্তর্গত, অর্থাৎ 1760-1830। *তৃতীয়* পর্বটি হলো মধ্য-উনিশ শতক, অর্থাৎ 1830-1870। এই পর্বটিকেই বলা হয় পুঁজিতন্ত্রের পূর্ণ যৌবনের কাল। *চতুর্থ* পর্বটি খুবই সংক্ষিপ্ত, 1870-1895।

পরবর্তী অধ্যায়ে আঠেরো ও উনিশ শতকে প্রকৌশলে ও বিজ্ঞানে অগ্রগতির পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্রের বিকাশধারা অনুসরণ করাব প্রয়াস পেয়েছি। এগুলি হলো: 1. তাপ ও শক্তি (বাষ্পীয় এনজিনের ইতিহাস-সমেত); 2. এনজিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা (লোহা ও ইস্পাত সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা-সহ), 3. তড়িৎ ও চুম্বক; 4. রসায়ন এবং 5. জীববিজ্ঞান।

শিল্পবিপ্লব : পটভূমি ও পরিণতি

1. আঠারো শতকের গোড়া : থমকে দাঁড়ানোর পর্ব (1690-1760)

যে বিপুল প্রেরণার বশে রেনেসাঁস যুগে বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছিল, যে প্রেরণার বশে মধ্য সতেরো শতকে বিজ্ঞান উচ্ছ্বসিতভাবে বিকাশ লাভ করেছিল, তা যেন সতেরো শতকের শেষ নাগাদ ঝিমিয়ে এল। 1687-এ নিউটনের *Principia* প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই, এমনকি তার কয়েক বছর আগে থেকেই, বেশ অনুভব করা যাচ্ছিল যে বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ শিথিল হয়ে পড়ছে, উৎসাহে ভাঁটা পড়ছে। কেবল যে ইংলন্ডেই এটা ঘটছিল তা নয়, ঘটছিল সর্বত্রই। তবে রয়্যাল সোসাইটির আদিযুগে ইংলন্ড বিজ্ঞানে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে এখন এই পিছিয়ে-পড়াটা সেদেশেই সবচেয়ে বেশি ক'রে চোখে পড়ছিল।

নিউটনের নিজের কাজের নিটোল, সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র, তাঁর বিপুল মর্যাদা এবং সমকালীন বিজ্ঞানীদের থেকে তাঁর বিরাট গুণগত দূরত্ব এই থমকে-দাঁড়ানোর একটা কারণ। তবে আরো অনেক বড়ো কারণ হলো তখনকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। সতেরো শতকে যে শ্রেণীর উৎসাহে বিজ্ঞানের অগ্রগতি শুরু হয়েছিল তাঁরা ছিলেন সম্ভ্রান্ত বণিক। নৌ-পরিবহনে, বাণিজ্যে, ম্যানুফ্যাকচারে তাঁরা বিজ্ঞাননির্ভর পদ্ধতি প্রয়োগ করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সতেরো শতকের শেষে এই শ্রেণীর জায়গা নিল নতুন এক প্রজন্ম। এরা অপেক্ষাকৃত ধনী, কিন্তু এদের উদ্যোগ ও অনুসন্ধিৎসা ছিল কম, আত্মতুষ্টি ছিল অনেক বেশি। এরা দেখল, জমিতে বিনিয়োগ করাই সবচেয়ে নিরাপদ। ফাটকাবাজিতেও এদের উৎসাহ ছিল খুব। পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর বদলে যারা ক্ষমতায় আসবে তারাই ঘটাবে শিল্পবিপ্লব। কিন্তু সে-সময় (অর্থাৎ সতেরো শতকের শেষ থেকে আঠারো শতকের গোড়ায়) সেই উঠতি কিন্তু তখনো-অপরিণত কারখানা-মালিকরা বিজ্ঞানের বিরাট সম্ভাবনা সম্পর্কে, এমনকি বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্পর্কেই অচেতন ছিল। তারা তখন নানারকম উন্নত কিন্তু হস্তচালিত কৌশলের সাহায্যে বস্ত্র এবং পণ্যসামগ্রীর বর্ধিত চাহিদা মেটানোর কাজে ব্যস্ত।

বিজ্ঞানের অলকাপুরী রয়্যাল সোসাইটিতে এসব পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। ব্যবসাবাণিজ্যের কাজে লাগবার প্রণোদনা তখন হারিয়ে ফেলেছে বিজ্ঞান। সোসাইটির হতদরিদ্র অবস্থা। 1710-এ কন্‌রাড ফন উফেন্‌বাখ গিয়েছিলেন গ্রেশাম কলেজে, রয়্যাল সোসাইটি পরিদর্শনে। সেখানকার যন্ত্রপাতির সংগ্রহ দেখে তাঁর মন্তব্য : 'কোনোরকম যত্ন বা পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই; ধুলো, কাদা আর কয়লার ধোঁয়ায় ঢেকে আছে যন্ত্রগুলো। অনেকগুলোই একেবারে ভাঙাচোরা; শেষ অবস্থা সেগুলোর।' তিনি আরো লেখেন : 'যে ব্যক্তি বহিরাগতদের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখায় তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে সচরাচর এই উত্তর মিলবে যে 'একটা দুর্বৃত্ত ওটা চুরি করে পালিয়েছে'; কিংবা সে হয়তো আপনাকে দু চারটে ভাঙা টুকরো দেখিয়ে বলবে, 'জিনিসটা বিগড়ে (কিংবা ভেঙে) গেছে।' যন্ত্রপাতির পরিচর্যা যে কতটুকু হয় এ থেকেই তা টের পাওয়া যায়।' সোসাইটি গুরুতর আর্থিক সংকটে পড়ায় 1740-এ এক তদন্ত হয়। তাতে দেখা যায়, বহুসংখ্যক 'ফেলো' চাঁদা দেওয়াই বন্ধ করে দিয়েছেন।

তবে বিজ্ঞান খানিকটা থমকে দাঁড়ালেও প্রয়োগগত পরিবর্তন কিন্তু একেবারে থেমে থাকে নি। এই অবস্থার মধ্যেই কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগগত উন্নতি ঘটে। সতেরো শতকে ওলন্দাজদের কাছ থেকে রপ্ত করে নেওয়ার পর এই উন্নত প্রক্রিয়াগুলো খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটেনে। এর ফলে বাণিজ্যমুখী কৃষি বেশ লাভজনক হয়ে ওঠে। এর কারণ দুটি : জমিতে

বিনিয়োজিত হবার মতো পর্যাপ্ত পুঁজি পাওয়া—যা গোড়ার দিকে এসেছিল বণিকদের কাছ থেকে; এবং শহরগুলির, বিশেষত লণ্ডনের দ্রুত বিকাশের ফলে শস্য, মাংস এবং শাকসব্জীর নির্ভরযোগ্য একটা বাজার পাওয়া। প্রয়োগগত দিক থেকে বাণিজ্যমুখী কৃষি অগ্রগতির চিহ্ন হলেও সামাজিক দিক থেকে এটা ছিল নিষ্ঠুর, অন্যায়। 'বেড়া আইন' (Enclosure Act) প্রয়োগ ক'রে কৃষকদের জমি থেকে ব্যাপকভাবে উৎখাত করা হয়েছিল তখনই, যদিও সে-জমির ওপর তাদের অধিকার ছিল বহুযুগ ধরে স্বীকৃত।

এই সময়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো, কয়লা-নির্ভর নতুন ভারি শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং লোহা ও ইস্পাত তৈরির সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন। নতুন এই ভারি-শিল্পে উন্নত আকর-খনন ও পরিবহন-পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটেছিল। এক্ষেত্রে যে বৈজ্ঞানিক ঘটনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো বাষ্পীয় এনজিনের ব্যবহার; এর আগে শুধু খনি থেকে জল বার করে আনার জন্যই বাষ্পীয় এনজিনের ব্যবহার হতো। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, লোহা প্রস্তুত করার জন্য স্মরণাতীত কাল থেকে চলে-আসা কাঠকয়লার পরিবর্তে কাঁচা কয়লাকে 'কোক' ক'রে নিয়ে ব্যবহার করা। খুবই সাদামাটাভাবে এই পদ্ধতিটির প্রয়োগ ঘটান এব্রাহাম ডার্বি, 1709 খ্রিস্টাব্দে। এই ঘটনাগুলো ছিল শিল্পবিপ্লবের নিশ্চিত পূর্বসূরী।

এই সন্ধিক্ষণেই দুটো পর্বের মধ্যে বিচ্ছেদটা পাকাপাকি হয়ে গেল : যুগপ্রাচীন গ্রামভিত্তিক অর্থনীতির বদলে এখন চলে এল কয়লাখনি-ভিত্তিক অর্থনীতি। আগে ছিল খাদ্য-কেন্দ্রিক অর্থনীতি; এখন এল পাওয়ার-কেন্দ্রিক অর্থনীতি। প্যাট্রিক গেডিসের ভাষায়, অর্থনীতি *eotechnics*-এর পর্ব ছেড়ে *paleotechnics*-এর পর্বে প্রবেশ করল। একথা অবশ্য প্রকৌশলের সবচেয়ে অগ্রসর ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কেই কেবল প্রযোজ্য। আমূল পরিবর্তন যা কিছু, তা মূলত ব্রিটেনেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে লৌহ-নির্মাণকারী দেশগুলোতেও কিছু কিছু পরিবর্তন আসছিল, স্বাধীনভাবেই। যেমন সুইডেনের পলহ্যামার-এর রোলিং ও স্লিটিং মিল, কিংবা উরাল অঞ্চলের লোহাশালে বাষ্পীয় এনজিনের ব্যবহার।

কয়লা-ভিত্তিক অর্থনীতির অভ্যুদয়ের ফলে উত্তর আর দক্ষিণ ইংলন্ডের মধ্যে ভারসাম্য বদলে গেল। উপরন্তু, বহুলাংশে ঐ একই কারণে প্রথম শ্রেণীর এক শিল্পশক্তি ও মননকেন্দ্র রূপে উত্থিত হলো স্কটল্যান্ড। প্রাচীন ও সমৃদ্ধ এক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যালভিনবাদী আন্দোলনে সামিল হওয়া সত্ত্বেও, স্কটল্যান্ড সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলন্ডের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। কারণ শিল্পবিপ্লব ঘটানোর জন্য যে মালমশলা প্রয়োজন, তার ঘাটতি ছিল সেখানে। কিন্তু কয়লার সুবাদে সেইসব সুবিধা একবার হাতে পাওয়া মাত্রই পরিস্থিতিটি বদলে গেল। স্কটল্যান্ড ছিল এক দরিদ্র দেশ। অথচ সেখানকার সাক্ষরতা-হার ছিল উচ্চ। তার ওপর ছিল পিউরিটান ঐতিহ্য। কাজেই একবার উন্নতির ধারণাটা স্কটল্যান্ডবাসীদের মাথায় ঢোকার পর কোনোকিছুই আর তাদের দাবিয়ে রাখতে পারেনি। অথচ ইংলন্ডে কিন্তু আত্মতুষ্টতা আর অজ্ঞতার দৌলতে ঠিক সেটাই ঘটেছিল।

তাছাড়া, ঐ ক্যালভিনবাদী ঐতিহ্যেরই কল্যাণে স্কটল্যান্ডের সঙ্গে হল্যান্ডের একটা মননগত যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল, বিশেষ ক'রে লাইডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। ফলে উত্তম প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, বিশেষত চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্কটল্যান্ডে নিয়তই আসতেন। তখন রসায়নশাস্ত্র চিকিৎসাশাস্ত্রের অঙ্গ রূপেই গণ্য হতো। তামাম ইউরোপের রসায়নবিদদের মধ্যে অন্তত অর্ধেক ব্যক্তি যাঁর ছাত্র ছিলেন, সেই প্রসিদ্ধ বুয়রহাভ্ (1668-1738) স্কটল্যান্ডকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। ইনি নিজে আবার ভান হেল্‌মন্ট-এর শিষ্য ছিলেন। স্কটল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রবর্তনে বুয়রহাভ্-এর ছাত্রদের মস্ত ভূমিকা

ছিল। আঠেরো শতকের এই স্কটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চবিত্র ইংলন্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় একেবারেই অন্যরকম ছিল। স্কটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সক্রিয় কেন্দ্র হয়ে ওঠে, তারা সর্বপ্রযত্নে তত্ত্বের সঙ্গে অনুশীলনের সংযোগ সাধনে ব্রতী হয়।

ইংলণ্ডের বাইরে বিজ্ঞানের প্রসার

স্কটল্যাণ্ড আর ইংলণ্ড যখন শিল্পবিপ্লবের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলছিল তখন কিন্তু ফ্রান্সের মতো অগ্রসর দেশও পুরোনো পথ আঁকড়ে ছিল। ফ্রান্সে খুব উঁচুমানের হস্তশিল্প গড়ে উঠেছিল, তাতে বীতিমতো শ্রমবিভাজনও ছিল, উৎপাদনের পরিমাণও ছিল ইংলণ্ডের চেয়ে বেশি। কিন্তু, একমাত্র সরকারি জলবিভাগের কাজ বাদ দিলে, বড়ো আকাবের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের তেমন কোনো উদ্‌যোগ সেখানে ছিল না।

এই পর্বে কিন্তু ফ্রান্সেও বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড হঠাৎই বেশ বেড়ে উঠল, তবে তার চরিত্র ছিল ইংলণ্ডের বিজ্ঞানের থেকে একেবারে আলাদা। ফ্রান্সের অভিজাতশ্রেণী ইংলণ্ডের অভিজাতদের মতো কেবল জমিদারী নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন না; বাজসভায় বদ্ধ থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে উঠে সময় কাটানোর জন্য তাঁবা বিজ্ঞানচর্চা শুরু করে দেন। অপরদিকে ফ্রান্সের উঠতি মধ্যশ্রেণী, যাঁরা প্রধানত প্রশাসনে ও আইনব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁবা তখনকার অবস্থা সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। এঁরাও বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। সুতরাং বলা চলে, ফ্রান্সে বিজ্ঞানের চরিত্র তখন একাধাবে শৌখীন ও বিপ্লবী। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে ফ্রান্সকে নিউটনীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত করান ভলতেযার (1694-1778)।

অপেশাদার বিজ্ঞানকর্মীদের তখন বলা হতো 'প্রকৃতিবাদী দার্শনিক' *(philosophes)*। তাঁদের প্রধান কাজ তখন ছিল সমাজের বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলির সমালোচনা করা। কারণ, ঐসব প্রতিষ্ঠান দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে বলে মনে করা হতো। উৎপাদন-শিল্প (industry) নিয়ে আগ্রহ অবশ্য বেড়েই চলেছিল, কিন্তু সেই আগ্রহের চবিত্র ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনীয় ছিল না। আগ্রহটা ছিল ওপরতলায় সীমাবদ্ধ, যেমন ছিল সতেরো শতকে। উদাহরণত, ধবা যাক রেওমূর (1683-1757)-এর কথা। যেমন ছিল তাঁর বুদ্ধিমত্তা, তেমনি ব্যাপক ছিল অনুসন্ধিৎসা। 1710 থেকে 1720 পর্যন্ত ইস্পাত-নির্মাণ সম্পর্কে দীর্ঘ গবেষণা চালিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ফ্রান্সের শিল্পক্ষেত্র তখন বাঁধাপথ ছাড়তে রাজি নয়, কাজেই ফ্রান্সে তখন ইস্পাতশিল্প গডে উঠল না। একশো বছরেরও পরে রেওমূব-এর গবেষণার ফসল কাজে লাগিয়েছিল ইংরেজ ইস্পাতনির্মাতারা।

সতেরো শতকে বিজ্ঞানচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল ফ্রান্স, ইংলণ্ড আর হল্যাণ্ডে। এবার তা অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অ্যাকাডেমিগুলির অনুসরণে লাইবনিৎস্-এর উদ্‌যোগে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন রাজত্বে গড়ে উঠতে লাগল বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমি। পরে এগুলি প্রাশিয়ার খ্যাপাটে, বিজ্ঞানমনস্ক ও কবি-কবি ভাবের সম্রাট 'মহান ফ্রেডেরিক'-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় নাগাদ ইউরোপের কোনো রাজসভায় যদি একটি শিল্প ও বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি না থাকত, তাহলে সে সভা অপূর্ণ বলে গণ্য হতো। সেসব অ্যাকাডেমিতে বিদ্বজ্জনেরা প্রশস্তিগাথা রচনা করে কিংবা মজাদার পরীক্ষা দেখিয়ে রাজকীয় আনুকূল্য আদায়ের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার রত হতেন। সচরাচর তাঁদের টাকাপয়সা খুব নিয়মিত দেওয়া হতোনা।

উত্তরে সুইডেন ও রাশিয়াতেও স্থাপিত হয় বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমি। তবে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের পরিশীলিত বিজ্ঞানসভাগুলির তুলনায় এ দুটি দেশের বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমির কাজ ছিল

গোড়া থেকেই আলাদা গোত্রের। দেশের প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাচাই ক'রে নেওয়াই ছিল এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। পিটার দ গ্রেট রাশিয়াতে বিজ্ঞানচর্চার প্রবর্তন করেছিলেন রাশিয়াকে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে স্বনির্ভর ক'রে তোলার পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে। গোড়াতে অবশ্য বিদেশীদের সাহায্য নিতেই হয়েছিল এবং এঁদের মধ্যে ছিলেন মহান সুইস গণিতজ্ঞ অয়লার (Euler, 1707-84)। পিটার দ গ্রেট জীবৎকালে দেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর রাশিয়াতে জন্ম নিয়েছিলেন একের পর এক বড়ো বড়ো বিজ্ঞানী। এঁদের আদিপুরুষ অমিতক্ষমতাবান মিখাইল লোমোনোসভ (1711-65) ছিলেন একাধারে কবি, প্রয়োগকুশলী ও পদার্থবিদ।

বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা : নিউটনের প্রভাব

এইসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, সতেরো শতকের তুলনায় আঠারো শতকের বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক ছিলনা। পূর্ববর্তী যুগটি ছিল অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত; সে যুগে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটির ওপর কম গুরুত্ব দেওয়া হতো, যদিও তা কখনোই একেবারে শূন্য ছিলনা—রেওমূর আর হেলিস-এর গবেষণা তার প্রমাণ। শতাব্দীর শেষে কিন্তু ব্যবহারিক দিকটির প্রতি প্রচন্ড গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রথম দিকে বিজ্ঞানের বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক দিকটিই প্রধান ছিল। চার্চের সঙ্গে বিজ্ঞানের লড়াই বন্ধ হয়েছিল। প্রোটেস্টান্টই হোক আর ক্যাথলিকই হোক, উভয় চার্চই সহনশীল ঔদাসীন্যে বিজ্ঞানকে স্বীকার করে নেয়। ততদিনে বিজ্ঞানের নিজস্ব একটা ঐতিহ্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল, বিজ্ঞান একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

নিউটনের কল্যাণে, গাণিতিক জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞানের এক প্রবীণ শাখা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং গোটা শতক জুড়েই তার চর্চা ছিল অব্যাহত। তবে ফ্রান্সেই বেশি, ইংলণ্ডে কম। ইংলণ্ড তখনো নিউটনের ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে আচ্ছন্ন। নিউটনীয় তত্ত্বের এমন কোনো বিকাশ অবশ্য ঘটেনি যা ভৌত বিচারে গুরুত্বপূর্ণ। তবে ঐ তত্ত্বের বলবৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি সাধারণীকৃত হয়ে এক নতুন ধরনের গণিতের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এটা ঘটেছিল প্রধানত লাইব্‌নিৎস্-এর প্রয়াসে। পরবর্তীকালে পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখায়, বিশেষ করে তড়িৎ ও তাপবিদ্যায় যেসব জটিলতর সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলির সমাধানে ঐ নব্য গণিত খুবই কাজে লেগেছিল। অয়লার, দলাঁবেয়ার (d'Alembert), মোপের্তুই (Maupertuis), লাগ্রাঝ্ ও লাপ্লাস বলবিদ্যার যে আশ্চর্য সাধারণীকরণ ঘটিয়েছিলেন, সেটাই পরে বিশ শতকের গণিতে ও পদার্থবিদ্যায় বিপ্লবের ভিত্তি হয়ে ওঠে।

নতুন ক্ষেত্র : তড়িৎ ও উদ্ভিদবিদ্যা

আঠারো শতকের গোড়ায় এবং মাঝামাঝি সময়ে বিজ্ঞানের প্রধান অবদানগুলি এসেছিল *তড়িৎ* ও *উদ্ভিদবিদ্যা*-র ক্ষেত্র থেকে। এর মধ্যে প্রথমটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক সংযোজন। আর দ্বিতীয়টি ছিল বিজ্ঞানের এক প্রাচীনতম শাখারই পুনর্জন্ম, তবে নতুন রূপে। সতেরো শতকে বিজ্ঞানচর্চার প্রধান ঝোঁকটা ছিল যান্ত্রিক ও গাণিতিক বিদ্যার ওপর। তড়িৎ ও উদ্ভিদবিদ্যার চর্চার ওপরে জোর পড়ার ফলে সেই ঝোঁকটা খানিকটা বদলে গেল।

তড়িৎ-চর্চা প্রথম দিকটায় একধরনের শৌখীন খেলা হিসেবেই শুরু হয়েছিল। তারপর বেন্‌জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বাজকাঠি তৈরি ক'রে আক্ষরিক অর্থেই বিদ্যুৎকে পৃথিবীর মাটিতে টেনে নামালেন, বললেন এর ভবিষ্যৎ গুরুত্বের কথা। আগে বৈদ্যরা যেসব ওষধি-উদ্যান থেকে গাছগাছড়া সংগ্রহ করতেন, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা। এবার লীনেয়াস্-এর অনুপ্রেরণায় সে চর্চা মাঠে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। একদিকে ভোগক্লান্ত ও বিরক্ত

অভিজাতশ্রেণী, অন্যদিকে বাধাপ্রাপ্ত বুর্জোয়াশ্রেণী—উভয়েই প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে ঔৎসুক্য দেখাল।

উদ্ভিদবিদ্যার চর্চার পাশাপাশি নানারকম জিনিস সংগ্রহের ব্যাপারে আগ্রহ জাগল। মুদ্রা, খনিজ, জীবাশ্ম ইত্যাদির সংগ্রহে পূর্ণ হয়ে উঠল অভিজাতদের গৃহের আলমারি। এইগুলিই পরে নতুন নতুন মিউজিয়াম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এইসব সংগ্রহশালার অধ্যক্ষরা ক্রমে এক বিশেষ বর্গের বিজ্ঞানীরূপে পরিচিত হন। ধনবান এবং অতি বিশিষ্ট সার হান্‌স স্লোন্-এর (1660-1753) অসামান্য সংগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে পরে ব্রিটিশ মিউজিয়াম গড়ে ওঠে। অপরদিকে জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলার ব্যাপারে রাস্‌প্ (Raspe, 1737-94) ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ইনি বিখ্যাত দুটি কারণে : প্রথমত এঁকে রয়্যাল সোসাইটি থেকে বার করে দেওয়া হয়; দ্বিতীয়ত ইনিই ব্যারন মুংখ্‌হাউসেন্-এর গল্পগুলো লিখে দেন।

নব্য দর্শন-চিন্তা

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিশ্বের এক ধর্মকেন্দ্রিক চিত্র আঁকা হয়েছিল। সতেরো শতকের দার্শনিকদের কাজ ছিল সেই মধ্যযুগীয় চিত্রটির বদলে নতুন কোনো চিত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করা। বেকন ও দেকার্ত-এর লেখায় তাঁরা বিশ্বের সেই নতুন চিত্রটির সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন।

আঠারো শতকের দার্শনিকদের কাজটি ছিল অন্যরকম। নিউটন যে বৈজ্ঞানিক বিশ্বছবিটি এঁকে দিয়েছিলেন তা তখন সর্বজনস্বীকৃত, তাকে আর প্রমাণ করার দরকার ছিল না। তাই আঠারো শতকের দার্শনিকদের কাজ হয়ে দাঁড়াল নিউটনের কাছ থেকে পাওয়া ঐ ছবিটিকে—শুধু ছবিটিকে নয়, তার অন্তর্নিহিত মনোভঙ্গিটিকে—সে-যুগের উদীয়মান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

গোড়ার দিকটায় তাঁরা এক নতুন ও যুক্তিশাসিত ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার উপযোগী মানসিকতাকে সমর্থন করেছিলেন। লক নিজে ছিলেন বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক, অলৌকিক কোনো কিছুকে স্বীকার করার দায় তাঁর ছিল না। তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন নিয়মের শাসনকে—একদিকে নিউটনের বৈজ্ঞানিক নিয়ম, অপরদিকে 1688-এর সাংবিধানিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত দেওয়ানী আইনের (civil law) নিয়ম। অন্যদিকে, গণিতে ও দর্শনে যতই ব্যুৎপত্তি থাকুক, লাইব্‌নিৎস কিন্তু এক মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি 'পূর্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা'-র তত্ত্ব প্রণয়ন করলেন। চার্চের লোকেরা যে 'নিয়তি'র কথা বলতেন, তার সঙ্গে এ তত্ত্বের বস্তুত কোনো তফাৎ ছিল না।

তবে, জগৎ তো আর এখানেই থেমে ছিল না। পরবর্তীকালের দার্শনিকরা বুঝতে পারছিলেন যে নিখুঁতভাবে সাজানো এই ছবিটির মধ্যে কিছু একটা গলদ আছে। আইরিশ ভাববাদী দার্শনিক বার্কলি কায়েমী ধর্মের স্বার্থে প্রমাণ করতে চাইলেন যে বিশ্বের এবং বিজ্ঞানের বাস্তব অস্তিত্ব যদি কোথাও থাকে তো সে কেবল ঈশ্বরের চোখে, আর কোথাও নয়। সেকালে এ-তত্ত্বের তেমন কোনো প্রভাব না পড়লেও, পরে, বিশ শতকে, এই তত্ত্ব হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীলতার ভিত্তি। সন্দেহবাদী হিউম অবশ্য অনেক বেশি সাফল্যের সঙ্গে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে আমরা আসলে কোনো কিছুকেই নিশ্চিতভাবে জানতে পারিনা—ধর্মীয় সত্যকে তো নয়ই। ভল্‌তেয়ার আরো এগিয়ে গিয়ে যুক্তিবাদ ও মানবমঙ্গলের ধারণার দ্বারা চালিত হয়ে সরাসরি আক্রমণ করলেন চার্চকে। দিন যত এগোতে লাগল, দর্শন ততই বেশি ক'রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর এইভাবেই তৈরি হতে লাগল ফরাসি বিপ্লবের রাস্তা।

2. বিপ্লবের যুগে বিজ্ঞান (1760-1830)

আমাদের আলোচ্য যুগের দ্বিতীয় পর্বটি বিজ্ঞান ও রাজনীতি দু'-দিক থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব এবং আমেরিকা ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিপ্লব এই পর্বেরই অন্তর্গত। *প্রথম* চল্লিশ বছরে (1760-1800) উক্ত ঘটনাগুলি ছাড়াও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবের সূত্রপাত ও পরিণতি ঘটেছিল—তা হলো গ্যাস-বলবিজ্ঞানে (pneumatics) বিপ্লব। পরে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করার কৌশল আবিষ্কৃত হলে পর কার্যত এ দুটিতে মিলে গড়ে ওঠে নতুন জাতের এক যুক্তিশাসিত রসায়নশাস্ত্র।

এই পর্বের দ্বিতীয় অংশে (1800-1830) বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে খুব নতুন কিছু যে জন্ম নিয়েছিল তা নয়, তবে মানুষের ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি শাখায় লক্ষ্য করা গিয়েছিল বিরাট উন্মাদনা ও ব্যাপক বিস্তৃতি।

সামাজিক পরিবর্তনের এইসব বিভিন্ন দিকের মধ্যে একটি যোগসূত্র ছিল; সে-যোগসূত্রটিকে নিছক কাকতালীয় বলে উপেক্ষা করা যায় না। বাস্তবিক, খুঁটিয়ে বিচার করলে এ ব্যাপারটা ক্রমশই স্পষ্ট হতে থাকে যে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, অর্থনীতি আর রাজনীতির বিচিত্র জটিল সূত্রগুলি সমন্বিত হয়ে এ যুগে সাংস্কৃতিক রূপান্তরের একটা নকশা গড়ে তোলে। মানবজাতির বিকাশের ইতিহাসে এই পর্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতিকে আয়ত্ত করার পথে মানুষের চূড়ান্ত পদক্ষেপটি এই পর্বেই গৃহীত হয়। এর আগে অব্দি মানুষ হাতে করে যেসব প্রক্রিয়া সম্পাদন করত সেগুলো এবার বহুমাত্রিক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হতে লাগল। মানুষ ও পশুর, এবং বায়ু ও জলের অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অনির্ভরযোগ্য ও স্থানীয় স্তরে সীমাবদ্ধ শক্তির বদলে এই পর্বে বাষ্প-শক্তির প্রয়োগ ঘটল। ষোলো এবং সতেরো শতকে সংঘটিত দুটি মৌলিক রূপান্তর আঠেরো শতকের এই পরিবর্তনগুলোকে সম্ভব করে তোলে। এগুলি হলো : পরীক্ষাভিত্তিক পরিমাণাত্মক বিজ্ঞানের এবং পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনপ্রথার জন্ম। জন্মকালে অবশ্য এ দুটি পরস্পরের থেকে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন ছিল। তখন যে ক্ষেত্রটিতে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটেছিল, এবং যে ক্ষেত্রটি বিজ্ঞানকে উদ্দীপনা যুগিয়েছিল, সেটি হলো নৌচালন। বাণিজ্যের এক অপরিহার্য অঙ্গ হলেও, উৎপাদনের সঙ্গে এই নৌচালনের সম্পর্ক ছিল পরোক্ষ। সতেরো শতকের সদ্যগঠিত বিজ্ঞানসভার সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীদের সুগভীর প্রয়াস সত্ত্বেও ম্যানুফ্যাকচারে বা কৃষিপ্রক্রিয়ায় উন্নতি ঘটানোর কাজে বিজ্ঞান প্রায় কিছুই ব্যবহারিক অবদান রাখতে পারেনি। কিন্তু আঠেরো শতকের শেষের দিকে বিজ্ঞানের উদ্‌ভাবনশীলতা আর পুঁজিতন্ত্রের উদ্যোগের মেলবন্ধন ঘটে। আর তারই ফলে পরবর্তীকালে পুঁজিতন্ত্র ও বিজ্ঞান উভয়েরই চরিত্র বদলায়। পরিণামে গোটা পৃথিবীর তাবৎ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে।

আঠেরো শতকের রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, প্রকৌশলে এবং বিজ্ঞানে যেসব পরিবর্তন ঘটে তার বস্তুগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক ভালো ভালো বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব আলোচনা সবই প্রধানত এককেটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ; সুসমন্বিত ও সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ এখনো করা হয়নি। এখানে সে কাজে হাত দেওয়ার সুযোগ নেই। তার বদলে যেটা করা সম্ভব তা হলো, অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে স্থাপন ক'রে বিজ্ঞানের বিকাশ-ধারাটি অনুসরণ করা; সমসাময়িক সমাজের বিজ্ঞান-বহির্ভূত বিভিন্ন ক্ষেত্র বিজ্ঞানকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে এবং বিজ্ঞান নিজে কীভাবে সেগুলোকে প্রভাবিত করেছে তা দেখা।

শিল্পবিপ্লব

'শিল্পবিপ্লব' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন এংগেল্স, 1844 সালে; পরে টইন্‌বি কথাটিকে জাতে তোলেন। বস্তুত এ সময় উৎপাদনের কয়েকটি শাখায় যে বিপুল পরিবর্তন আসে, তাকে বিপ্লব ছাড়া আব কিছুই বলা যায় না। 1766 থেকে 1787 সালের মধ্যে তুলাজাত পণ্যের উৎপাদন পাঁচগুণ বাড়ে। ফলে বাণিজ্য, কৃষি এবং জনসংখ্যাতেও প্রায় অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। যে দেশেই শিল্পবিপ্লবের প্রভাব পড়ে, সেদেশেই পূর্বতন উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় মস্ত পরিবর্তন আসে।

শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল একটা সীমিত এলাকার মধ্যে, মূলত মধ্য ও উত্তর ব্রিটেনে। প্রধানত বার্মিংহ্যাম, ম্যান্‌চেস্টার, লীড্‌স, নিউকাস্‌ল এবং গ্ল্যাসগোর কাছাকাছি অঞ্চলে তা সীমাবদ্ধ ছিল। আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে বিশেষ কতকগুলো পরিস্থিতির আকস্মিক সম্মিলনেই বিশেষ দেশে ও কালে এই বিস্ফোরক প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয়েছিল, আসলে কিন্তু পূর্ববর্তী সত্তরাধিক বছর ধরে উৎপাদনে যে বৃদ্ধি ঘটে আসছিল তারই চূড়ান্ত পর্ব রূপে শিল্পবিপ্লব ফেটে পড়ে। অর্থনৈতিক দিক থেকে এ বিপ্লবকে শক্তি যুগিয়েছিল পণ্যদ্রব্যের, বিশেষত বস্ত্রপণ্যের বাজারের একটানা বৃদ্ধি। অপরদিকে বাজারের এই বৃদ্ধি ছিল সতেরো শতকের নৌচালনের উন্নতির এবং ঔপনিবেশিক বিস্তারের পরিণতি।

ফ্রান্স অপেক্ষা ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন শিল্পবিপ্লব ঘটার অনুকূল ছিল। সেখানে সামন্ততান্ত্রিক ও রাজতন্ত্রী বাধানিষেধ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল সতেরো শতকের বিপ্লবে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপারও ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবের সহায়ক হয়। পূর্ববর্তী সকল সভ্যতাতে কাঠই ছিল প্রধান জ্বালানী। শুধু জ্বালানী হিসেবে কেন, যেকোনো নির্মাণকার্যে কাঠ ছিল অপরিহার্য। অথচ এই কাঠের প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয় ব্রিটেনে। ফলে জ্বালানী হিসেবে নিকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও শস্তা কয়লা, এবং নির্মাণ-কার্যে মহার্ঘ কিন্তু উৎকৃষ্ট ঢালাই লোহা ব্যবহার করতে বাধ্য হলো ব্রিটেন। ফলে আঠেরো শতকের শেষ দিকে এগুলোর উৎপাদন বেড়ে গেল; সেইসঙ্গে আকরখনন এবং ধাতুবিদ্যারও বিরাট উন্নতি হলো। রোবাক, ব্ল্যাক, স্মীটন এবং ওয়াট-এর অবদান এই উন্নতির মূলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে পরিবহনব্যবস্থারও উন্নতি ঘটে—বিশেষ করে খালপথে জলপরিবহনের।

বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রীকরণ

সেসময়ে ব্রিটেনের—যেকোনো দেশেরই—প্রধান শিল্প বলতে বস্ত্রশিল্পকেই বোঝাত। স্বভাবতই শিল্পবিপ্লবের সূচনা ঘটে ঐ বস্ত্রশিল্প থেকেই। দেশে বিদেশে বস্ত্রের চাহিদা দ্রুত বাড়ছিল, কিন্তু দক্ষিণ ইংলণ্ডে কেন্দ্রীভূত পুরোনো বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না। তখন সে শিল্প দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর ইংলণ্ডে সরে এল, কারণ সেখানে বাধানিষেধ এবং শ্রমিকদের মজুরি, দুটোই ছিল কম। প্রথমে ইয়র্কশায়ারে, পরে ল্যাঙ্কাশায়ারে একটা নতুন সুবিধে পাওয়া গেল— জলশক্তির সাহায্যে বস্ত্রশিল্পের অনেকগুলো প্রক্রিয়া অনেক সহজে সম্পন্ন করা গেল। তাছাড়া কয়লাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ধোওয়া ও রং করার কাজও সহজ হয়ে গেল।

1750 সাল নাগাদ ইংলণ্ডের উৎপাদন-শিল্প কার্পাস তুলো নামক নতুন এক তন্তু নিয়ে কাজকারবার করতে বাধ্য হলো। সূতীবস্ত্র আগে ভারত থেকে আসত। সে আমদানি নিষিদ্ধ হয়ে যায় ইংলণ্ডের বস্ত্রনির্মাতাদের চাপে। তখন দেশের মধ্যেই সূতীর জিনিস তৈরি করার প্রবল তাগিদ আসে। সে তাগিদে আমেরিকার বাগিচাগুলোয় কার্পাস চাষ শুরু হয়। কিন্তু তুলো থেকে

সূতীর জিনিস বানানোর জন্য সম্পূর্ণ নতুন প্রকৌশল প্রয়োজন হলো—যা চিরাচরিত পশম-প্রকৌশলের থেকে একেবারেই আলাদা। সূতীর জিনিস বানানোর প্রথম কেন্দ্র গড়ে ওঠে ল্যাঙ্কাশায়ারে, যার স্যাঁৎসেতে আবহাওয়া এর পক্ষে সবিশেষ উপযোগী। সেখানে সুতোর চাহিদা এত বেড়ে ওঠে যে পুরোনো কায়দায় তকলি দিয়ে হাতে সুতো কেটে আর সে চাহিদা সামাল দেওয়া সম্ভব হলো না।

বস্ত্রশিল্পে এর আগেও যে শক্তি-চালিত যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া হয়নি তা নয়। 1719-এ 'স্টকিং ফ্রেম' বা লোম্-এর রেশম-মিল তার উদাহরণ। তবে সফল হলেও এগুলো বেশি দূর ছড়াতে পারেনি, কারণ তখনো বাজার ছিল ছোটো। কিন্তু এবার বাজার বড়ো হয়ে যাওয়ায় হাতের বদলে যন্ত্র দিয়ে কাজ করবার অফুরন্ত সুযোগ এসে গিয়েছিল। হারগ্রীভ্স-এর 'স্পিনিং জেনি' (1764), আর্করাইট-এর 'ওয়াটার ফ্রেম' (1769) এবং ক্রম্টন-এর 'মিউল' (1779) বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন-পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। পুরোনো, হাতে-চালানো পদ্ধতি একেবারে বদলে গেল। বদলে গেল দুভাবে—প্রথমত, হাতের কাজটাকে বহুগুণে পরিবর্ধিত করে নেওয়া হলো, এবং দ্বিতীয়ত সুতো-কাটার প্রক্রিয়ার একেবারে প্রাথমিক স্তরেই শক্তির ব্যবহার হলো। এই সব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে গেল। তখন ছোটো ছোটো জলধারার শক্তিকে শেষবিন্দু পর্যন্ত কাজে লাগানো হলো। এবং অবশেষে ওয়াটের তৈরি বাষ্পীয় এনজিন কাজে লাগানো হলো মেশিন চালাবার জন্যে (1785)।

শিল্পভিত্তিক পুঁজিতন্ত্র

বস্ত্রশিল্পে এই যে বিপ্লব ঘটে গেল, এটাকে কিন্তু নিছক প্রযুক্তিগত বিপ্লব বলা যাবে না। উৎপাদনে এই বিপ্লব ঘটবার প্রাথমিক শর্ত ছিল : *পুঁজি* এবং *শ্রম* দুটোরই প্রচুর যোগান। এই যুগে পুঁজির যোগান এসেছিল প্রথমত সতেরো শতকের বণিকদের বিপুল মুনাফা থেকে (নতুন-আবিষ্কৃত দেশসমূহের খনি ও বাগিচা থেকে, ক্রীতদাসদের খাটিয়ে এই মুনাফা তারা অর্জন করেছিল); অন্যদিকে ভারতবর্ষকে নির্লজ্জভাবে লুঠ ক'রে। আর, শ্রমের যোগান দিয়েছিল 'বেড়া-আইনে'র দ্বারা উৎখাত হওয়া কৃষকরা। প্রথম প্রথম শ্রমের যোগান খুব যে বেশি ছিল তা নয়; সে কারণে শ্রম-হারক যন্ত্র আবিষ্কারের এত তাগিদ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পরে, 'বেড়া-আইন' যখন আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হলো, এবং গরিব আইরিশম্যানরা যখন আসতে শুরু করল, তখন প্রচুর শ্রমের যোগান মিলল। তখন নতুন যন্ত্র-উদ্ভাবনের তাগিদটা কমে এল। তার বদলে, ইতিমধ্যেই যেসব যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছিল সেগুলোরই উন্নতিসাধন ক'রে, সেগুলোকেই আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতে লাগল।

শিল্পের কেন্দ্রীভবন

বস্ত্রশিল্পের বাজার এইভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে ব্রিটেনে, একমাত্র ব্রিটেনেই, এমন এক অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে ওঠে যার দরুন শিল্পবিপ্লব ঘটে। বস্ত্রনির্মাণের যন্ত্রপাতি এবং বস্ত্রনির্মাণের নানাবিধ প্রক্রিয়াকর্মের বাজার বেড়ে ওঠায় একচোটে লৌহ এবং রসায়নশিল্পে প্রবল প্রণোদনা জাগে। আর এই সব কিছুর জন্যই যা প্রয়োজন সেই কয়লার সরবরাহ উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। তার দৌলতে আবার আকরখননে এবং পরিবহনে নতুন নতুন উন্নতি ঘটে। শতাব্দীর মধ্যলগ্নে ডার্বির উদ্ভাবনের সুবাদে ঢালাই লোহা অনেক পরিমাণে সুলভ হয়ে ওঠে। অভাব দেখা দেয় পেটা লোহার । 1784 সালে কর্ট্ কর্তৃক প্রবর্তিত 'puddling' প্রক্রিয়া সে অভাব তখনকার মতো মেটায়। এইসব নবনব প্রবর্তনের বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত

দিক নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব। এক্ষেত্রে এইটুকু বলা দরকার যে এইসব প্রবর্তনের ফলে কাঁচা মাল হিসেবে কাঠের ওপর যুগবাহিত নির্ভরতার অবসান ঘটল এবং লৌহশিল্পের অঙ্গন অরণ্য থেকে কয়লাখনি অঞ্চলে স্থানান্তরিত হলো। অন্যান্য বহু শিল্প আগেই কয়লাখনিতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

বাস্তবিক, এই কেন্দ্রীভবন ছিল শিল্পবিপ্লবের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। সামন্ত আমলে শিল্প, এমনকি শহুরে কারুসংঘসমূহের উৎপাদনও বহু 'কাউন্টি' জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু নব্য যান্ত্রিক শিল্প প্রথম থেকেই কয়লাখনি অঞ্চলের আশেপাশে গড়ে উঠল। নতুন পণ্যদ্রব্যসমূহের প্রায় সমস্তটাই উৎপাদিত হচ্ছিল ম্যান্‌চেস্টার, বার্মিংহ্যাম, নিউকাস্‌ল এবং গ্লাসগো-তে। এইসব বড়ো বড়ো শহর অতি দ্রুত বেড়ে উঠছিল। দূরে দূরান্তরে এদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছিল—কেবল শস্তা শ্রমের দৌলতেই নয়, শ্রম ও খাদ্যের চাহিদার দৌলতেও।

কৃষিবিপ্লব

এই চাহিদার কল্যাণেই কৃষিক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। আগে কৃষি-উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল নিছক জীবনধারণের প্রয়োজন মেটানো। কিন্তু এখন তা হয়ে উঠল বাজার-মুখী। কৃষি-পণ্যের এই বর্ধিত চাহিদা মেটাতে গিয়ে নতুন ধরনের কৃষি-উৎপাদকদের আবির্ভাব ঘটল। কৃষিক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটল তার অঙ্গ ছিল : পশু-প্রজনন, মরশুমী চাষ এবং ড্রিল লাঙল, ঘোড়ায় টানা 'হ্যারো' (লোহার ফ্রেমে কাঁটা-লাগানো 'মই' জাতীয় কৃষিযন্ত্র) প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবহার। আঠারো শতকের গোড়াতেই ওলন্দাজদের দেখাদেখি এইসব পদ্ধতির ব্যবহার চালু হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু শস্য ও মাংসের শিল্পজাত চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত এগুলি ব্যাপ্তি লাভ করেনি। তাছাড়া ঐ শিল্পই সেসব নতুন নতুন প্রক্রিয়া চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় নির্মাণযন্ত্র এবং শক্তির যোগান দেয়। মানুষের প্রয়োজনের দিক থেকে কৃষিকার্যের এই বিপ্লবের গুরুত্ব ঠিক শিল্পবিপ্লবের মতোই মৌলিক। এ বিপ্লব যত অগ্রসর হলো ততই কৃষিক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদনের জন্য কর্মীর প্রয়োজন কমতে লাগল, ফলে জনসংখ্যার ব্যাপক অংশের শহরে চলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি আরো জোরালো হয়ে উঠল। ইংলণ্ড থেকে আমেরিকাতে এবং তার অনেক পরে ইউরোপের অপেক্ষাকৃত জনবহুল কৃষি-এলাকাসমূহে ছড়িয়ে যায় এই যন্ত্রচালিত কৃষি। কৃষিকার্যে এই উৎসাহ কেবল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উষ্ণমণ্ডলীয় সামগ্রীর সন্ধানে এবং সম্ভাব্য উপনিবেশের সন্ধানে অনেক নৌ-অভিযান চলে। সতেরো শতকের মতো প্রায় জলদস্যু-ধরনে এসব অভিযান চালানো হতো না (যেমন ড্যাম্পিয়ার চালিয়েছিলেন)। এগুলি ছিল উপযুক্ত সরঞ্জামে সজ্জিত বৈজ্ঞানিক অভিযান, যাতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে এক ধরনের ভদ্রোচিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব বজায় থাকত। কুক (1728-78), বুগাঁ্যাভিল্ (1729-1811) এবং লা পেরুজ্ -এর (1741-88) পরিচালিত অভিযানগুলি এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এমনকি 1789 সালের অভিশপ্ত 'বাউন্টি' অভিযানও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল থেকে ব্রেড-ফ্রুট গাছ এনে ওয়েস্ট ইন্ডিজে চালু করার অভিপ্রায়ে সংঘটিত হয়েছিল।

শিল্পবিপ্লবে বিজ্ঞানের ভূমিকা

শিল্পবিপ্লবের প্রথম পর্বে বিজ্ঞানের কোনো ভূমিকা ছিল না। শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল হস্তশিল্পীদের উদ্‌ভাবনশীলতার কল্যাণে। আশ্চর্যরকমের অনুকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই ছিল তাঁদের সাফল্যের কারণ। শিল্পবিপ্লবের আসল তাৎপর্য ছিল এই যে এক নবীন সামাজিক শক্তি এর

মধ্যে দিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ছোটো ছোটো হস্তশিল্পীদের উৎপাদনের ওপর এতদিন কর্তৃত্ব করত বণিকরা—দাদন প্রথার (putting-out system) মাধ্যমে। কিন্তু এখন, এই প্রথম শ্রমজীবী মানুষ স্বয়ং তার জমানো বা ধার-করা সামান্য পুঁজি নিয়ে উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। এটাই ছিল, মার্ক্সের ভাষায়, 'সত্যিকারের বিপ্লবী পন্থা'।

বাষ্পশক্তি

একথা অবশ্য সত্যি যে বাষ্পীয় এনজিন ও তার অফুরন্ত শক্তি না পাওয়া গেলে শিল্পবিপ্লবকে থমকে দাঁড়াতে হতো : যেসব অঞ্চলে জলশক্তির প্রাচুর্য, সেইসব অঞ্চলে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ঘটিয়েই তা ক্ষান্ত হতো। আর সেক্ষেত্রে অবস্থাটা দাঁড়াত এই যে বহু শতাব্দী আগেই চীনে যে-ধরনের প্রযুক্তিগত উন্নতি হয়েছিল, শিল্পবিপ্লব মাত্র সেই স্তরে এসে থেমে থাকত। এই বাষ্পীয় এনজিন বৈজ্ঞানিক ভাবনারই এক সচেতন প্রয়োগ; সুতরাং সেই অর্থে বলা যেতে পারে যে শিল্পবিপ্লবে বিজ্ঞান মৌলিক ভূমিকাই পালন করেছিল।

অপরদিকে, শিল্পবিপ্লবের কল্যাণে বিজ্ঞানচর্চায় নতুন জোয়ার এসে যায়। শুধু ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড বা ফ্রান্সেই নয়, ক্রমশ রাশিয়া, ইতালি এবং জার্মানিতেও নবজাত বুর্জোয়াশ্রেণী বিজ্ঞানকে সচেতনভাবে কাজে লাগাতে চাইছিল। কোথাও কোথাও অভিজাতদের একাংশও, এমনকি অস্ট্রিয়ার 'মহান' ক্যাথারিন ও দ্বিতীয় জোসেফের মতো 'সহৃদয় স্বৈরতন্ত্রী'রাও বিজ্ঞানচর্চাকে মদত দিচ্ছিলেন। বিজ্ঞানচর্চায় এই উৎসাহের চরিত্র কিন্তু গত শতকের চেয়ে আলাদা; এখন উৎপাদন বাড়ানোর বাস্তব তাগিদই ছিল এ উৎসাহের ভিত্তি, এবং এর চরিত্র ছিল বিপ্লবী।

একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে আঠারো শতকের শেষদিকে যখন ব্রিটেনে বিজ্ঞানচর্চা আবার পুরোদমে শুরু হলো, তখন অক্সফর্ড, কেমব্রিজ বা লণ্ডন থেকে বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র সরে এল লীড্সে, গ্ল্যাসগোয়, এডিনবরায়, ম্যানচেস্টারে এবং বিশেষভাবে বার্মিংহ্যামে। বার্মিংহ্যাম হয়ে উঠল বিজ্ঞানচর্চার সবচেয়ে বিখ্যাত কেন্দ্র।

ফ্রান্সেও তুলনীয় ঘটনা ঘটছিল, কিন্তু সেখানে বিজ্ঞানচর্চার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অকেজো রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। ফ্রান্সের অগ্রণী চিন্তাবিদরা ঐ ব্যবস্থাটার কোনোরকম উন্নতি ঘটানোর আশা ছেড়ে দিয়ে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন সে ব্যবস্থাটাকে শেষ ক'রে দেওয়ার প্রয়াসে। ফরাসি বিপ্লবের মূলে তাঁদের এই প্রয়াসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই পর্বে তাঁদের সর্বোত্তম কীর্তি : *Encyclopédie des Sciences, Arts et Métiers.* 1751 থেকে 1772-এর মধ্যে আটাশ খণ্ডে প্রকাশিত এই মহাগ্রন্থটি (পরে আরো সাতটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল) প্রধানত দিদ্রো (1713-84) ও দলাঁবেয়ার (1717-83)-এর পরিশ্রমে রচিত হয়, যদিও প্রায় সমস্ত প্রকৃতিবাদী দার্শনিকই এই প্রয়াসে যোগ দিয়েছিলেন। মুক্ত মননের সঙ্গে বিজ্ঞান, ম্যানুফ্যাক্চার ও অবাধ বাণিজ্যের ভাবনার মিলন ঘটল এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি হয়ে দাঁড়াল নবীন উদারপন্থীদের বাইবেল।

বেন্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন

নতুন যুগের এই আন্দোলনের উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ও পূর্বসূরী ছিলেন বেন্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। 1706 সালে বস্টনে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন চর্বিবাতির এক দরিদ্র বিক্রেতা। বারো বছর বয়সে বেন্জামিনকে এক মুদ্রাকর-প্রকাশকের কাছে শিক্ষানবীশ হিসেবে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়। সতেরো বছর বয়সে তিনি পালিয়ে চলে যান ফিলাডেলফিয়াতে, সেখানে স্বাধীনভাবে জীবিকা

উপার্জন করতে থাকেন। অতঃপর তাঁকে পাঠানো হয় ইংলণ্ডে, যদিও কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নয়। সেখানে সমসাময়িক বিজ্ঞান ও রাজনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন তিনি। 1726-এ ফিরে আসেন ফিলাডেলফিয়াতে, তড়িৎ-তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন, আবিষ্কার করেন বাজকাঠি, rocking চেয়ার এবং লোহার স্টোভ। 1743-এ বেন্‌জামিন American Philosophical Society প্রতিষ্ঠা করেন। উপনিবেশসমূহের পোস্টমাস্টাব-জেনারেল নিযুক্ত হন তিনি।

পরে ফ্র্যাঙ্কলিন ইংলণ্ডে ফিরে আসেন পেন্‌সিলভ্যানিয়া'র প্রতিভূ হিসেবে, বুঝতে পারেন, উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার জন্য কাজ তাঁকে করতেই হবে। ফ্র্যাঙ্কলিনই প্রথম 'নতুন দুনিয়া'র সুপ্ত শক্তি উপলব্ধি করেন, ভাবতে থাকেন তার ভবিষ্যৎ নিয়ে। মার্কিন 'স্বাধীনতার ঘোষণা' এবং 'সংবিধান' নিয়ে যে কাজ তিনি করেছিলেন, তা থেকেই এ কথা প্রমাণ হয়। 'স্বাধীনতা-যুদ্ধে'র সময় বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি; কিন্তু ফ্রান্সে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হিসেবে যে ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন, স্বদেশের প্রতি সেটাই ছিল তাঁর শেষতম এবং মহত্তম কর্তব্য। রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমেরিকার প্রতি ফ্রান্সের যে সমর্থন আদায় করেছিলেন তিনি, স্বাধীনতা-সংগ্রামে তার গুরুত্ব ছিল চূড়ান্ত। পারিতে এবং ভের্সাইতে থাকাকালীন রাজনীতি ও বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতির ওপর তাঁর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। 'প্রকৃতিবাদী দার্শনিক'দের কর্মকাণ্ডে সোৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন। গণতান্ত্রিকতা ও ব্যবহারিক সহজবুদ্ধির অভাব ছিল ঐ দার্শনিকদের—বেন্‌জামিন ঐ দুটি মাত্রা যোগ করেছিলেন তাঁদের কাজে।

প্রতিবাদী অ্যাকাডেমি এবং 'চান্দ্রসভা'

ব্রিটেনে ফ্র্যাঙ্কলিনের তরুণ সহযোগীরা তাঁর চিন্তাভাবনাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। উত্তর ইংলণ্ডের কারখানা-মালিক ও তাঁদের বন্ধুরা বিজ্ঞানের গুরুত্ব সঠিকভাবেই বুঝতে পারছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন, এর আগে বিজ্ঞান যে উপযুক্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি তার কারণ হলো বিজ্ঞান-চর্চাকারীদের ব্যবহাবিক বোধের অভাব। পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিজ্ঞানকে অবহেলা করলেও, এখন 'প্রতিবাদী অ্যাকাডেমি'গুলিতে (যথা ওয়ারিংটন এবং ড্যাভেন্‌ট্রি'র প্রতিবাদী অ্যাকাডেমি) বিজ্ঞানচর্চা স্থান পেল। নৌ-শিক্ষার বিদ্যালয়গুলির বাইরে এই প্রথম সুসংবদ্ধভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিরা সকলেই ছিলেন প্রতিবাদী, তাই পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দরজা তাঁদের জন্য বন্ধ ছিল। এই ধরনের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থাপনা থেকে বোঝা যায় যে বিজ্ঞানের প্রয়োজনটা তখন কী প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হচ্ছিল। স্কটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা বাদ দিলে, আঠারো শতকে এগুলিই ছিল বিশ্বে বিজ্ঞানশিক্ষার সর্বোত্তম প্রতিষ্ঠান।

এই পর্বে কারখানা-মালিক, বিজ্ঞানী ও নবোদ্ভূত পেশাদার এনজিনিয়াররা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে অবাধে মেলামেশা করতেন। এই যুগেই বার্মিংহ্যামে ও Black Country* নামে অভিহিত শিল্পাঞ্চলে চান্দ্রসভা বা Lunar Society স্থাপিত হয়েছিল।

* প্রধানত স্ট্যাফোর্ডশায়ার এবং অংশত পশ্চিম ও মধ্য ইংলন্ডের উরস্টারশায়ার ও ওয়ারউইকশায়ার অঞ্চলকে এই নামে চিহ্নিত করা হতো। মধ্য-আঠারো থেকে মধ্য-উনিশ শতক পর্যন্ত এই অঞ্চলে লোহা ও লৌহজাত পণ্যই মূলত উৎপাদিত হতো। অজস্র কারখানার চিমনি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ার জন্যই অঞ্চলটি এই নামে পরিচিত হয়েছিল।—অনুবাদক

সভার এক একজন সদস্যের বাড়িতে এক-এক পূর্ণিমা রাত্রিতে আড্ডা বসত। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন : *জন উইল্‌কিনসন* (1728-1808)—যিনি লোহা নিয়েই জীবন কাটিয়েছিলেন, স্বপ্ন দেখতেন লোহার এবং সমাধিস্থ হয়েছিলেন একটি লোহার কফিনে; ছিলেন *ওয়েজ্‌উড* (1744-1817)—মৃৎশিল্পী; আসতেন *এজ্‌ওয়ার্থ*—সহৃদয় এই আইরিশম্যানটির মনটি ছিল সমাজ-উন্নয়নের উদ্ভট কিন্তু মহৎ পরিকল্পনায় পরিপূর্ণ; কবিভাবাপন্ন অথচ ব্যবহারিক বোধসম্পন্ন *ডঃ ইর‍্যাস্‌মাস ডারউইন্‌ও* (1731-1802) আসতেন; ছিলেন *জোসেফ প্রিস্ট্‌লী* (1733-1804)—এঁর প্রসঙ্গে আমরা একটু পরেই আসছি; বিষণ্ণ কিন্তু ক্লান্তিহীন স্কট্‌সম্যান *জেম্‌স ওয়াট* (1736-1819) আসতেন তাঁর তরুণতর সহযোগী *মার্ডক* (1754-1839)-এর সঙ্গে—যে মার্ডক ছিলেন কোল-গ্যাসের সাহায্যে আলো জ্বালানোর আবিষ্কারক। আর এই সমস্ত কিছুর মধ্যমণি ছিলেন ধনী, উদ্যোগী, আমুদে ও অতিথিপরায়ণ *ম্যাথু বোল্‌টন*(1728-1809)।বোল্‌টন প্রথমে ছিলেন বার্মিংহ্যামের এক বোতাম-নির্মাতা। পরে তিনিই প্রথম বাষ্পীয় এনজিন ম্যানুফ্যাকচার করেন। বলা যায়, আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন শিল্পবিপ্লবের চালিকাশক্তি। সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিনকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন ম্যাথু: 'সারা পৃথিবী যে জিনিসের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে, সেটিই আমি বিক্রী করি—শক্তি।'

আঠারো শতকে স্কটল্যান্ডের নবজাগরণের সঙ্গে যুক্ত দলটিও ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার সূত্রে জড়িত ছিলেন এঁদের সঙ্গে। স্কটিশ দলটির মধ্যে ছিলেন : দার্শনিক *হিউম* (1711-76), যাঁর মাধ্যমে ফ্রান্সের প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় থাকত; *অ্যাডাম স্মিথ* (1723-90), *Wealth of Nations*-এর রচয়িতা, অবাধ পুঁজিতন্ত্রের উদ্‌গাতা; *ডঃ ব্ল্যাক* (1728-99), গ্যাস-বলবিজ্ঞানে (pneumatics) যিনি বিপ্লব এনেছিলেন; *ডঃ হাটন* (1726-97), আধুনিক ভূবিজ্ঞানের যিনি প্রণেতা। এছাড়াও ছিলেন *ডঃ রোবাক* (1718-94), ডাক্তারি ছেড়ে যিনি রসায়নিক পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এসেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ক্যারন ওয়ার্কস'—যা কিনা প্রথম সচেতনভাবে-পরিকল্পিত লোহা-তৈরির কারখানা। টমাস জেফারসনের শিক্ষক *ডঃ স্মল* (1734-75)-ও ছিলেন এই দলে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে কারখানা-মালিকদের এই যে মণিকাঞ্চন যোগ, এটা একমাত্র আঠারো শতকের শেষে ব্রিটেনেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই সংযোগটা একদিকে করণকৌশল, অন্যদিকে বিজ্ঞানের মধ্যে একটা গতিশীল ভারসাম্য বজায় রেখেছিল। একটা যুগে শিল্পকে বিজ্ঞানের যত না শেখাবার ছিল, সে তুলনায় শিল্পের কাছ থেকে বিজ্ঞানের শেখবার ছিল অনেক বেশি; পরে আবার প্রায় সমস্ত শিল্পই বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে ওঠে। আমাদের আলোচ্য সময়টি এই দুই যুগের মধ্যবর্তী উত্তরণের কাল। এই কালে ব্রিটেন অন্যান্য দেশের শিল্পজগতের কাছে এক তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল। যেকারণে ব্রিটিশ শিল্প সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো বিবরণ বুদ্ধিমান বহিরাগত ব্যক্তিদের লেখা থেকেই পাওয়া যায়। এঁদেরই একজন হলেন গেব্রিয়েল জার(1732-69), ফ্রান্সের ভারি শিল্পের অনাতম প্রতিষ্ঠাতা। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে 1782 সালে ফ্রান্সের ল ক্রোসো-তে আধুনিক লৌহ-কারখানা নির্মাণের সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয় তখন সে উদ্যোগের প্রকৌশলগত দিকটির মোকাবিলা করবার জন্য ব্রিটেন থেকে ডব্লিউ উইলকিনসন-কে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ইনি ছিলেন পূর্বোল্লিখিত লৌহনির্মাতা জন উইলকিনসনের ভাই। ল ক্রোসোতে স্থাপিত এই কারখানাটিই ছিল ব্রিটেনের বাইরে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বড়ো লৌহ-কারখানা। শুধু ফ্রান্সেরই নয়, জার্মানির ইস্পাত-শিল্পও এই কারখানাটি থেকে বিকাশ লাভ করে।

যুক্তিশাসিত রসায়ন

আধুনিক অর্থাৎ যুক্তিশাসিত এবং পরিমাণাত্মক রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা শিল্পবিপ্লবের যুগের এক মস্ত বৈজ্ঞানিক অবদান। এর এক শতাব্দী আগে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বলবিজ্ঞানের যে মহান সংশ্লেষণ ঘটেছিল, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তারই সঙ্গে তুলনীয় এ ঘটনা। যুক্তিশাসিত রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা যে এ যুগে ঘটতে পেরেছিল তার কারণ হচ্ছে রসায়ননির্ভর শিল্পের অতিদ্রুত অগ্রগতি। এই অগ্রগতির কারণ আবার : বৃহদায়তন, যন্ত্রনির্ভর, নতুন বস্ত্রশিল্পের প্রসার। এরই ফলে বস্তু এবং তার রূপান্তরণের সমস্যাগুলি নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন বিজ্ঞানীরা।

নতুন নতুন গ্যাসের ধর্ম নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েই পাওয়া গিয়েছিল রসায়নশাস্ত্রের নানান জটিল সমস্যার সরল ব্যাখ্যার সূত্র। গ্যাসের ধর্ম নিয়ে এইসব গবেষণা একদিকে যেমন সতেরো শতকের বায়ু এবং বায়ুশূন্য অবস্থা (vacuum) সম্পর্কিত গবেষণার সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে তেমনি সমসময়ের বাষ্পীয় এনজিনের বিকাশের সঙ্গেও যুক্ত। বস্তুত, রসায়নশাস্ত্রের এই উদ্ভবকে অনায়াসেই গ্যাস-বলবিজ্ঞানের বিপ্লবের ফসল বলা যেতে পারে। স্কটল্যান্ডের ব্ল্যাক, ইংলন্ডের প্রিস্ট্‌লী, সুইডেনের শেইল (Scheele) প্রমুখ অগ্রণী গবেষকদের কাজ আলোকিত করে তুলেছিল লাভোয়াসিএ'র যুক্তিবাদী মনটিকে। পুরোনো আর নতুন অজস্র তথ্যের ধোঁয়াশা কাটিয়ে তিনিই প্রথম এসবের মধ্যে শৃঙ্খলা আনেন। তার কুড়ি বছর পরে ড্যাল্টন পরমাণু-তত্ত্বের ভিত্তিতে এর ব্যাখ্যা দেন। এর ফলে রসায়নশাস্ত্রের সঙ্গে একটা পাকাপাকি সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল নিউটনীয় বস্তুগত ও বলবৈজ্ঞানিক ছকের।

ন্যায়যুগ : জোসেফ প্রিস্ট্‌লী (1733-1804)

বিজ্ঞানের প্রভাব কেবল উৎপাদনশিল্পের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। আঠেরো শতকের শেষ দিকে ফ্র্যাঙ্কলিন থেকে শুরু করে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা অধিকাংশই বিপ্লবাত্মক ও উদারপন্থী ভাবনায় সিঞ্চিত হয়েছিলেন। জোসেফ প্রিস্ট্‌লীর মধ্যে এ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলো মূর্ত রূপ ধারণ করেছিল। বিজ্ঞানসাধনা, মানবহিতৈষণা এবং বিপ্লবাত্মক রাজনীতির সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বাবা যাজকদের পোশাক-নির্মাতা ছিলেন। তাঁরা ছিলেন ইয়র্কশায়ারের লোক। ড্যাভেন্‌ট্রি'র প্রতিবাদী অ্যাকাডেমিতে লেখাপড়া করেছিলেন জোসেফ, লক্ষ্য ছিল যাজক হওয়া। নতুন আলোকিত যুগের প্রাণরস আকণ্ঠ পান করেছিলেন তিনি। দেশটা ইংলন্ড না হয়ে ফ্রান্স হলে তিনি হয়ে উঠতেন নাস্তিক। তবে নাস্তিক না হলেও তিনি হয়ে উঠলেন একধরনের যুক্তিশাসিত খ্রিস্টধর্মের প্রবক্তা। তাঁর পড়াশুনা এবং প্রবণতা তাঁকে টেনে নিয়ে গেল বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের কাছে। ফ্র্যাঙ্কলিনের প্রেরণায় তিনি লিখলেন *History of Electricity*। সেই তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের শুরু। 1767-তে পাদ্রী হয়ে তিনি আসেন লীড্‌সে। সেখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। সেই সময় থেকে কারখানা-মালিকরা ও কয়েকজন উদারপন্থী অভিজাত তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। জীবনের সব থেকে ফলপ্রসূ দিনগুলিতে, অর্থাৎ 1773 থেকে 1780 পর্যন্ত, লর্ড শেল্‌বার্ন তাঁকে আশ্রয় ও লেবরেটরি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এই লেবরেটরিতেই অক্সিজেন তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করে জগদ্বিখ্যাত হন প্রিস্ট্‌লী।

তবু, বিজ্ঞানচর্চা তাঁর কাছে ছিল অপেক্ষাকৃত গৌণ। তাঁর প্রধান আগ্রহ ছিল উদারপন্থী ধর্মের পক্ষ নিয়ে বাদবিতণ্ডা চালানো। তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞানচর্চার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। দেকার্ত্‌ চেয়েছিলেন বস্তু আর আত্মাকে, যুক্তি আর বিশ্বাসকে আলাদা করতে। আর

প্রিস্টলী সন্ধান করতে লাগলেন এমন এক অন্তর্লব্ধ দিব্যজ্ঞানের যা ঐ সবকিছুকে মিলিয়ে দেবে। তাঁর যুক্তিতে, বৈদ্যুতিক ক্রিয়া এটাই প্রমাণ করে যে বস্তু জড় নয়, সুতরাং তা সংবেদনহীন না-ও হতে পারে। প্রিস্টলী কিন্তু পুরোনো খ্রিস্টীয় ধ্যানধারণা-বিশ্বাসকে, এমনকি আত্মার অস্তিত্বকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছিলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফরাসিরা ভেবেই পেত না, কী করে একজন দার্শনিকের পক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা সম্ভব; ওদিকে, ইংরেজরা বুঝতে পারত না, নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে প্রিস্টলীর ধর্মের তফাৎটা কী! অথচ প্রিস্টলী গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন খ্রিস্টান নৈতিকতার ধারণায়, যার মূল কথা ছিল : 'জীবনের যেসব সাধারণ কর্তব্যগুলির কথা সকলেই জানে, সেগুলি পালন করা; ঈশ্বরের প্রতি আরো বেশি ভক্তি প্রদর্শন করা এবং মানুষের আরো বেশি মঙ্গলসাধন করা।' 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন' করার যেকোনো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর সায় ছিল।

কখনো সরাসরি রাজনীতি করেননি প্রিস্টলী। কিন্তু ইংলণ্ডে তখন ফরাসি বিপ্লবের প্রবণতার বিরুদ্ধে মনোভাব কঠিন হচ্ছিল। তাই, যে ডঃ প্রিস্টলী এতদিন ছিলেন 'নম্র এবং জনদরদী', তিনিই একদিন রাতারাতি হয়ে উঠলেন উগ্র বিপ্লবী 'রিপাব্লিকান'—যেহেতু তাঁর বক্তব্য ছিল চার্চবিরোধী। চার্চ কর্তৃপক্ষ আর রাজার উস্কানিতে একদল লোক পুড়িয়ে দিল তাঁর বাড়ি, তাঁর গ্রন্থাগার, তাঁর লেবরেটরি। রাজনৈতিক মতামতের কারণে তাঁর সহযোগীরাও মুখ ফিরিয়ে রইলেন। দেশ ছেড়ে আমেরিকা চলে গেলেন প্রিস্টলী। সেখানেই 1804-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

আঁতোয়ান লোরাঁ লাভোয়াসিএ (1743-94)

বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রিস্টলীর নামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে লাভোয়াসিএ-র নাম। প্রিস্টলীর দেখানো পথ ধরেই তিনি তাঁর বৈপ্লবিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন—যে তত্ত্ব রসায়নশাস্ত্রকে পাকাপাকিভাবে এক যুক্তিশাসিত ও পরিমাণাত্মক বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রান্সে আঠেরো শতকের শেষ দিকের বিজ্ঞানচর্চায় লাভোয়াসিএ ছিলেন প্রধান পুরুষ। ব্যক্তি হিসেবে প্রিস্টলীর সঙ্গে তাঁর অনেক তফাৎ ছিল। উভয়ের জীবনেই বিজ্ঞান ছিল একমাত্র নাহোক অন্তত প্রধান সাধনা, একথা ঠিক। কিন্তু প্রিস্টলীর মতো মানবমঙ্গলের ভাসাভাসা ধর্মীয়, বিপ্লবাত্মক ধারণা লাভোয়াসিএ আদৌ পোষণ করতেন না। তিনি সুষ্ঠু সরকারি সেবাব্যবস্থা ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের সাহায্যে 'পুরানা জমানা'কে *(ancien régime)* যুগোপযোগী করে নিতে চাইতেন। অল্পবয়স থেকেই তাঁর নিরতিশয় কর্মপটু ও প্রত্যয়বান চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তার একটা কারণ এই যে তিনি জন্মেছিলেন ধনী পরিবারে—এমন এক পরিবারে যা ধাপে ধাপে সযত্ন পরিচর্যা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে সমাজের সুউচ্চ স্তরে আরোহন করেছিল, পারি-র *পার্লমঁ*-র *(Parlement)* সদস্যও হয়েছিল। লাভোয়াসিএ নিজে জমিদার না হলেও ঠিক তার নিম্নবর্তী স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন *ফের্ম্ জেনেরাল্* *(Ferme Générale)* নামক সংস্থার সদস্যপদ লাভের মাধ্যমে। ফের্ম্ জেনেরাল্ নামক এই ক্ষুদ্র কিন্তু অতীব সমৃদ্ধ নিগমটির কাজ ছিল রাজার হয়ে কর সংগ্রহ করা। এই নিগমের সদস্য হওয়ার সময় অবশ্য লাভোয়াসিএ ভাবতেও পারেননি যে এরই জন্য একদিন তাঁকে প্রাণ বলি দিতে হবে।

লাভোয়াসিএ সে যুগের সর্বোত্তম শিক্ষা লাভ করেছিলেন। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরস্থানবিদ্যা, ভূবিদ্যা এবং সর্বোপরি রসায়নশাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন তিনি। তাঁর গুরু ছিলেন ফ্রান্সের জার্দ্যাঁ দু রোয়া বা রাজোদ্যানের (Jardin du Roi) অমায়িক প্রদর্শক-শিক্ষক রুয়েল্ (Rouelle, 1703-90)। যুবক লাভোয়াসিএ-র হাতে ছিল বিত্ত, মস্তিষ্কে সঞ্চিত ছিল বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার আর হৃদয়ে ছিল এক মহতী উচ্চাশা— বিজ্ঞান আর সমাজ উভয়কেই এক যুক্তিসম্মত পরিচ্ছন্ন রূপ দেবার বাসনা পোষণ করতেন তিনি। 1767-তে

চব্বিশ বছর বয়সে ফ্রান্সের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র আঁকার প্রয়াসে এবং আকরিক সম্পদের খতিয়ান নেবার জন্য সারা ফ্রান্স ভ্রমণ করেন তিনি। সেই তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ। পরে তিনি আরো অনেকরকম সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন, যেমন রাস্তার আলোর ব্যবস্থা, পরীক্ষামূলক খামার-কৃষি এবং সার্বিক উন্নয়নের আরো অনেক প্রকল্প। কী ফ্রান্স আর কী ব্রিটেন উভয় দেশেই আঠেরো শতকের বিশেষ চরিত্রের ছাপ ছিল এইসব প্রকল্পের ওপর। 1775 সালে 'বারুদ কমিটি'তে তাঁর নিয়োগ এবং ফ্রান্সের অস্ত্রাগারে তাঁর বসবাসের ঘটনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই অস্ত্রাগারে যে লেবরেটরি তিনি বানিয়েছিলেন তার চেয়ে ভালো লেবরেটরি তখন সম্ভবত দুনিয়াতে আর কোথাও ছিল না। প্রিস্টলীর লেবরেটরি তো একটা ট্রে-র মধ্যেই এঁটে যেত!

ল্যাভোয়াসিএ-র বৈজ্ঞানিক কৃতি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। এখানে আমরা কেবল এটুকু দেখাতে চাইছি যে বিজ্ঞানকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ব্যাপারে তাঁর একটা প্রভাব ছিল। এ ব্যাপারে তিনি যে-নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছিলেন তা বহু বছর ধরে তুলনারহিত ছিল। তাঁর প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে এক নিরতিশয় পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল এবং প্রভাবশালী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। দর্শনের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল না। রসায়নের সুবিশাল ক্ষেত্রকে তিনিই ভৌত ও গাণিতিক সূত্রসমূহের আওতায় আনেন। তবে তাঁর যে অবদানটি সবচেয়ে স্থায়ী হয়েছে সে হলো তাঁর আনীত জ্ঞানালোক, তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি নয়। ফের্ম্ জেনেরাল্-এর অন্যান্য সদস্যের মতো তাঁকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে মৃত্যুদণ্ড কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশত দেওয়া হয়নি—বিজ্ঞানের প্রতি বিদ্বেষবশত তো নয়ই। আসলে ঐ সংস্থার সদস্য হওয়ায় লোকচক্ষে তিনি খুব স্পষ্টভাবেই ঐ প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাটার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। তারই মূল্য তাঁকে দিতে হলো জীবন দিয়ে। কী নির্মম পরিহাস ইতিহাসের! যে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি এত কিছু করেছিলেন, সেই বিপ্লবই তাঁর প্রাণ হরণ করল।

বিজ্ঞান ও উৎপাদনশিল্পের অতিদ্রুত বিকাশ প্রগতির যে আশা জাগিয়ে তুলেছিল, প্রিস্টলী আর লাভোয়াসিএ—এই দুই ব্যক্তির মধ্যে তা মূর্ত রূপ ধারণ করেছিল। আঠারো শতকের শেষ দিকটাতে অনেকেই—তাঁদের মধ্যে অনেকেই মহিলা (মহিলাদের প্রবেশ এ অঙ্গনে ইতিহাসে সেই প্রথম)—এমন এক ভবিষ্যৎ বিশ্বের কথা ভাবতে শুরু করেন যেখানে ন্যায় আর সাম্যের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে পক্ষপাত আর বিশেষাধিকারের স্থান থাকবে না। ইতালি, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া, এমনকি স্পেন প্রমুখ ইউরোপীয় দেশে এবং আমেরিকাতে এই আন্দোলনের প্রসার ঘটে। এটাও লক্ষণীয় যে বহুকাল সুপ্ত থাকার পর ইতালির বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এই সময়ে আবার সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। গাল্ভানি, ভল্টা ও আভোগাদ্রো-র বৈজ্ঞানিক অবদান তার পরিচয়বাহী। এঁরা যে কেবল নিজেদের অভিজ্ঞতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত তত্ত্বের দ্বারাই (যেমন রুসোর তত্ত্ব) প্রভাবিত হয়েছিলেন তা নয়। চীনের অতীব ন্যায়পরায়ণ সমাজ; ভারতবর্ষের সুনীতিনিষ্ঠ সমাজ; রেড ইন্ডিয়ানদের উন্নত সমাজ; বৈজ্ঞানিক অভিযান চালিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবালদ্বীপের মানুষের সরল সুখী জীবন নিয়ে যেসব তথ্য জানা যাচ্ছিল—এসবই তাঁদের প্রভাবিত করেছিল। দার্শনিকদের ভাবনা অনুযায়ী বিচক্ষণরূপে সুবিন্যস্ত, এবং প্রথাগত জীবনযাত্রার অত্যাচার থেকে মুক্ত এক সমাজ তাঁদের আদর্শ হয়ে উঠল, প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়াই একমাত্র পথ বলে প্রতিভাত হলো।

'আলোকিত স্বৈরাচারে'র যুগের অন্যতম প্রধান প্রেরণা ছিল বিজ্ঞান। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে বিজ্ঞান 'পুরানা জমানা'কে সমালোচনা ও ধ্বংস করার এক নতুন মননগত অস্ত্রের সন্ধানও দিয়েছিল। যন্ত্রচালিত শিল্পের মধ্যে দিয়ে তা মানবজাতির পুনর্জন্ম ঘটানোর এক প্রক্রিয়া সৃষ্টি

করেছিল। এর ফলে বিজ্ঞানে ও প্রকৌশলে সুবিপুল অগ্রগতির দুয়ার খুলে যায়। তার তীব্রতা, তার আত্ম-সচেতনতা, তার উচ্চ মান সমাজের ওপর যে প্রভাব ফেলে তা পৃথিবীর ইতিহাসে আক্ষরিক অর্থেই অভূতপূর্ব ছিল।

3. ফরাসি বিপ্লব ও বিজ্ঞান

ফরাসি রাজতন্ত্রের অন্তিম দিনগুলিতে ফরাসি বিজ্ঞানীরা 'প্রকৃতিবাদী দার্শনিক'দের *(philosophes)* চিন্তাধারায় গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ফরাসি বিপ্লবজাত 'নয়া জমানা' তাঁদের সামনে মস্ত সুযোগ এনে দিল। সামন্ততান্ত্রিক আবর্জনা ঝেঁটিয়ে সাফ করার কাজে নবীন বিজ্ঞান অগ্রণী ভূমিকা পালন করল। বিপ্লবী সরকারগুলি আনুষ্ঠানিকভাবেই স্বীকৃতি দিয়েছিল নবীন বিজ্ঞানের এই গুরুত্বকে। বিজ্ঞানকে তারা সাহায্য যেমন করল, তেমনি বিজ্ঞানের কাছ থেকে আশাও করল অনেক। বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ—যেমন মঁঝ্ (Monge, 1746-1818) এবং লাজার্ কার্নো (Lazare Carnot, 1753-1823)—ছিলেন উদগ্র রিপাব্লিকান; বিপ্লব হওয়া মাত্রই তাঁরা অর্থনৈতিক, এমনকি প্রশাসনিক দায়িত্ব বরণ করে নিয়েছিলেন। অনেকে আবার—যেমন বায়ি (Bailly, 1736-93), কঁদর্সে (Condorcet, 1743-94), মহান লাভোয়াসিএ—প্রথম দিকটা বিপ্লবের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত 'পুরানা জমানা'-র সঙ্গে নিজেদের সংস্রব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, যার খেসারত দিতে হয়েছিল তাঁদের। বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই তখন ক্ষয়ে-যাওয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের সংস্কার নিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

করণীয় প্রথম কাজটি ছিল : ওজন ও পরিমাপনের সংস্কার এবং মেট্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। 1799 সালে এই কাজ চূড়ান্তরূপে সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় কাজটি ছিল বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের আধুনিক ব্যবস্থা চালু করা। রেনেসাঁসের পর শিক্ষাক্ষেত্রে সত্যিকারের পরিবর্তন এই প্রথম ঘটল। ইংলন্ডের বিক্ষুব্ধ অ্যাকাডেমিগুলিতে এবং ফ্রান্সের সামরিক বিদ্যালয়গুলিতে ইতিমধ্যেই এর ভিত্তি রচিত হয়েছিল—তারই উপর সুশৃঙ্খলভাবে এক বিরাট আয়তন গড়ে তুললেন বিপ্লবীরা। *École Normale Supérieure, École de Médecine* এবং সবার উপরে *École Polytechnique*—এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ছিল ভবিষ্যতের বিজ্ঞানশিক্ষার ও বিজ্ঞানগবেষণার কেন্দ্রগুলির মডেল। এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের জন্য বেছে নেওয়া হতো শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের। এইভাবেই তৈরি হয় বেতনভুক বিজ্ঞানী-অধ্যাপকের এক সামাজিক বর্গ—উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা শৌখিন বা ধনী-পরিপোষিত বিজ্ঞানীদের জায়গা অধিকার করে নেন।

নতুন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে প্রথম যাঁরা উত্তীর্ণ হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শার্ল (Charles, 1746-1823), গে-লুসাক (Gay-Lussac, 1778-1850), তেনার (Thenard, 1777-1853), মালু (Malus, 1775-1812) এবং ফ্রেনেল (Fresnel, 1788-1827)-প্রমুখ বিজ্ঞানী। এঁরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের বহু শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। সামাজিক শ্রেণীনির্বিশেষে যেকোনো মেধাবী ছাত্রই এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের সুযোগ পেত। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কল্যাণেই ফ্রান্স বহুদিন ধরে তার বৈজ্ঞানিক আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিল—যে-আধিপত্য উনিশ শতকেও বেশ কিছুদিন টিকে ছিল।

নাপোলেয়ঁ : বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক

বিপ্লবের পরেই এল নাপোলেয়ঁ-র বা নেপোলিয়নের যুগ। এই যুগে বিজ্ঞানের খুব দ্রুত বিকাশ ঘটে। নেপোলিয়ন ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রায়ই তিনি

স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন আকাদেমি'র অধিবেশনগুলিতে। মিশর-অভিযানের সময় বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীদের একটি দলকে তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেলাসবিদ্যার যিনি জনক সেই আবে আউয়ি-কে (Abbé Haüy, 1743-1822) পদার্থবিদ্যার পাঠ্যবই লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন নেপোলিয়ন। আসলে, নেপোলিয়নই ছিলেন প্রথম বিজ্ঞান-শিক্ষাপ্রাপ্ত শাসক। তিনি ছিলেন ফরাসি সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। বিজ্ঞানের উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁর খানিকটা ধারণা ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, বিজ্ঞান তাঁর শাসনের এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীর কাজে লাগুক।

বিজ্ঞানের বিকাশে নেপোলিয়ন-যুগের যুদ্ধগুলির পরোক্ষ ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবের ঢেউ উনিশ শতকের গোড়ায় সবে গিয়ে পৌঁছতে শুরু করে ফ্রান্সে। অথচ সেসময় ফ্রান্সের মোট শিল্প-উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ব্রিটেনের চেয়ে বেশি। ফ্রান্সের জনসংখ্যাও ছিল ব্রিটেনের চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই তামাম ইউরোপ জুড়ে সৈন্য মোতায়েন রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার যে অভূতপূর্ব ধকল তা সহ্য করবার ক্ষমতা ফ্রান্সের ছিল। কিন্তু নৌ-প্রযুক্তির দিক থেকে ব্রিটেন তখন অনেক এগিয়ে। তারা ফ্রান্স ঘিরে নৌ-অবরোধ রচনা করল। সে-অবরোধ ফ্রান্সকে তৎক্ষণাৎ খুব একটা কাবু করতে না পারলেও তার সুদূরপ্রসারী পরিণাম হিসেবে ফ্রান্সের বৈদেশিক বাজারটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ব্রিটিশদের তৈরি এই নৌ-অবরোধের একটা তাৎক্ষণিক ফল হলো এই যে ফ্রান্সে সোডা আর চিনির আমদানি বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এতে শাপে বর হলো; ফ্রান্সের রসায়নিক শিল্প এর ফলে দ্রুত বিকাশ লাভ করল। তিরিশ বছর ধরে এই ক্ষেত্রে ফ্রান্স তার অগ্রগতি বজায় রাখতে পেরেছিল।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে নেপোলিয়ন-যুগের একটা পার্থক্য এই যে সেযুগে যুদ্ধটা বিজ্ঞানের নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রসারিত হতো না। বরং বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা যোগসূত্রই রচনা করত যুদ্ধ। 1803 সালে তড়িৎ-রসায়নিক আবিষ্কারের জন্য ডেভিকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন নেপোলিয়ন, এবং পারিতে গিয়ে সে-পুরস্কার নিতে দ্বিধা বোধ করেন নি ডেভি। শুধু তাই নয়, দুই দেশের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলছে তখন এ পুরস্কার নিতে যাওয়ায় যাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, সেইসব ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তিদের ডেভি তিরস্কার করেছিলেন।

ফরাসি বিপ্লবের যুগে ব্রিটেনের ঘটনাবলী কিন্তু একেবারেই অন্যরকম বাঁক নিয়েছিল। নতুন, প্রাণবন্ত উদ্‌ভাবনশীলতার বদলে সেখানে দেখা দেয় চার্চ ও রাষ্ট্রের পুরোনো রূপগুলিকে প্রায় মরিয়া হয়ে আঁকড়ে থাকার এক প্রবণতা। 'হুইগ্'-দলভুক্ত ব্যক্তিদের উদারপন্থী প্রবণতাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ধর্মীয় অসন্তোষও যুক্তিসঞ্জাত ঈশ্বরবাদের বদলে ভাবালু 'মেথডিজমে'র মধ্যে আশ্রয় খুঁজল। তাই বলে শিল্পের অগ্রগতি যে এতটুকু বাধা পেল তা নয়। কারণ, অবরোধ সৃষ্টি ক'রে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখার ফলে, এবং স্বদেশের ও অন্যান্য মিত্র-দেশের যুদ্ধ-সামগ্রী তৈরি করার তাগিদে ব্রিটেনের বাজার তখন অনেক বেড়ে উঠেছিল।

রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশন : কাউন্ট রাম্‌ফোর্ড

ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেসব নতুন ধরনের বিজ্ঞান-শিক্ষালয় স্থাপিত হচ্ছিল, 1799-এ তার সঙ্গে তুলনীয় একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান ব্রিটেনে স্থাপিত হলো—রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশন। সার বেনজামিন টমসনের (ওরফে কাউন্ট রাম্‌ফোর্ড, 1753-1814) উদ্‌যোগেই এর প্রতিষ্ঠা। সার বেনজামিন ছিলেন রক্ষণশীল 'টোরি' দলভুক্ত এক মার্কিন। ফ্র্যাঙ্কলিনের মতোই প্রখর ব্যবহারিক বুদ্ধি ছিল তাঁর। গণতন্ত্র-বিরোধী কাউন্ট রাম্‌ফোর্ড বুঝতে পেরেছিলেন যে 'পুরানা জমানা'কে যদি টিকিয়ে রাখতে হয়, তাহলে পথ একটাই : সরকারি সেবা-ব্যবস্থাকে দক্ষ করে

তোলা। কীভাবে একাজ করা যায় তার নিদর্শনও রেখেছিলেন তিনি—বাভেরিয়াতে। তখনো বাভেরিয়া ফ্রান্সের অধীনে চলে যায়নি। সেখানকার সমস্ত ভিখিরিকে তিনি চালান করে দিয়েছিলেন আতুরভবনে এবং কী করে শস্তায় তাদের খাওয়ানো যায় তা নিয়ে দস্তুরমতো ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। একাজে তিনি এতই সফল হয়েছিলেন যে দিনে মাত্র তিন ফার্দিং খরচে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। সেনাবাহিনীর বাজেটকেও তিনি লোকসান থেকে লাভের মুখ দেখিয়েছিলেন—সৈন্যদের জন্য শিল্প গড়ে তুলে। এই কাজ করতে গিয়েই তিনি আবিষ্কার করেন তাপ-পরিবহনের নিয়মাবলী, এবং পরীক্ষা ক'রে দেখান কী ক'রে কার্য (work) থেকে তাপ সৃষ্টি হতে পারে। ইংলণ্ডে ফেরা মাত্র তিনি বুঝতে পারলেন যে নতুন ধরনের এক শ্রেণীর কারিগর গড়ে তুলতে না পারলে শিল্পবিপ্লবের সাফল্য দূরপরাহত। নতুন ধরনের এই কারিগরেরা অন্ধভাবে ঐতিহ্যকে অনুসরণ ক'রে চলার বদলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করবেন। এই উদ্দেশ্যে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণায় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ধনীদের রাজি করালেন কাউন্ট রাম্‌ফোর্ড।

কাউন্ট রাম্‌ফোর্ডের উদ্দেশ্য কিন্তু বেশিদূর সফল হয়নি। এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম পরিচালক হন হাম্‌ফ্রি ডেভি (1778-1829)। যত বড়ো বিজ্ঞানী, তার থেকেও বড়ো মাপের উন্নাসিক অভিজাত ছিলেন তিনি। 1815-এ উদ্ভাবিত 'safety lamp'-এর জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। প্রত্যক্ষভাবে শিল্প-সংশ্লিষ্ট এই গবেষণাটি তিনি করেছিলেন সম্পূর্ণ বিনা-পারিশ্রমিকে। 1802 সালে, মাত্র তেইশ বছর বয়সে বিজ্ঞানের উপযোগিতা সম্পর্কে ডেভি যে প্রাথমিক আলোচনাটি করেন, তাতে নতুন যুগের মর্মকথাটি চমৎকার ব্যক্ত হয় : 'সম্পত্তি এবং শ্রমের যে অসম বিভাজন, মানুষে মানুষে মর্যাদা এবং অবস্থার যে ভেদ, সেগুলিই হচ্ছে সভ্য সমাজের শক্তির উৎস, তার চালনাশক্তি, এমনকি তার প্রাণ।' বিজ্ঞান, উপযোগবাদ আর রক্ষণশীল নিখাদ 'টোরি' মনোভাবের সমন্বয়ে রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশন অভিজাতদের এবং ভদ্রলোকদের কাছে অপেরার মতোই এক শৌখীন ও জনপ্রিয় ব্যসন হয়ে উঠেছিল। ইন্‌স্টিটিউশন-ভবনের খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকতে হতো কারিগরদের, যাতে অভিজাত সভ্যদের চোখকে আহত না ক'রে তাঁরা গ্যালারিতে আসন করে নিতে পারেন। এতেও যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য বজায় রইল না বিবেচনা ক'রে অচিরেই খিড়কি দরজাটা ইটের গাঁথনি দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হলো। ইন্‌স্টিটিউশনের অবশ্য উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বহু মৌলিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই প্রতিষ্ঠানেরই অনন্য, অনুদানপ্রাপ্ত লেবরেটরিতে হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের কর্মসূচী কিন্তু সীমাবদ্ধ থাকে সর্বসাধারণের জন্য প্রদত্ত গুটিকতক বক্তৃতার মধ্যে। একথা সত্য যে এইরকমের এক বক্তৃতাই আকৃষ্ট করেছিল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এক বিজ্ঞানীকে, যিনি সেসময় এক দপ্তরীর বাঁধাইখানায় শিক্ষানবিশি করতেন—তাঁর নাম *মাইকেল ফ্যারাডে।* ডেভি'র সহকারী পদে বহাল হন ফ্যারাডে এবং রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনেই বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। কিন্তু সেযুগের আরো শত শত সম্ভাব্য ফ্যারাডের সামনে ইন্‌স্টিটিউশনের দরজা ছিল বন্ধ। তা না হলে ইংলণ্ডও ফ্রান্সেরই মতো বিপুল সংখ্যায় বিজ্ঞানী তৈরি করতে পারত।

নেপোলিয়ন-উত্তর যুগ : প্রতিক্রিয়া

নেপোলিয়নের যুদ্ধ-অভিযানগুলির দৌলতে মননমুক্তির (Enlightenment) মহান আন্দোলন তামাম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর যে-প্রতিক্রিয়ার যুগ এল তাতে এই আন্দোলন বেশ একটা ধাক্কা খেল। এর আরো একটা কারণ ছিল 1820-র গুরুতর অর্থনৈতিক মন্দা। শিল্পবিপ্লবের সবচেয়ে কুৎসিত দিকগুলো এবার দগদগ করতে লাগল, দেখা দিল বেকারী, অপরিসীম দারিদ্র্য। আরেকটা বিপ্লবের আশঙ্কায় ভীত

শাসকশ্রেণীগুলি তখন আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ ক'রে জনতাকে সামাল দেবার চেষ্টা করল। যুক্তিশাসিত যে-বস্তুবাদ এতদিন ধর্মনিরপেক্ষ ও বিপ্লবী চিন্তার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষের মন এবার আকৃষ্ট হয়ে পড়ল একধরনের কৃত্রিম 'মধ্যযুগে'র প্রতি, ভাবালু রোম্যান্টিকতার প্রতি। একমাত্র জার্মানি ছাড়া সব দেশেই বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তখনকার মতো কমে এল। যুদ্ধকালীন অর্ডার আর না-আসায় শিল্পগুলিও ঝিমিয়ে পড়ল, ফলে শিল্পের দিক থেকেও বিজ্ঞানের তেমন প্রয়োজন আর হচ্ছিল না।

তবু, সব কিছু যে একেবারে থেমে গিয়েছিল তা নয়। আসলে আঠারো শতকের শেষ দুই দশকে বিজ্ঞানের এমন বিরাট অগ্রগতি হয়েছিল যে তারপর আর বিজ্ঞানকে পুরোপুরি বা অনেকদিন ধরে নবোদ্ভূত শিল্পক্ষেত্রগুলি থেকে সরিয়ে রাখা সম্ভবই ছিল না। বিজ্ঞানচেতনাও যে একেবারে দমিত হয়ে গিয়েছিল তা নয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানিতে প্রতিক্রিয়ার দাপট সত্ত্বেও বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-অনুরাগী ব্যক্তিরা হয়ে দাঁড়ালেন নতুন এক উদারপন্থী সংস্কার-আন্দোলনের অগ্রবাহিনী।

4. শিল্পবিপ্লবযুগে বিজ্ঞানের চরিত্র

1760 থেকে 1830, তার মধ্যে বিশেষ ক'রে 1770 থেকে 1800—এই তিরিশটা বছর, বিশ্ব ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায়। নবীন পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-কাঠামোর মধ্যে মেশিনের নবার্জিত শক্তির ব্যবহারিক সম্ভাবনাগুলি এই পর্বেই প্রথম বাস্তব রূপ ধারণ করে। এইসব পদক্ষেপ একবার গ্রহণ করা মাত্রই উনিশ শতকে উৎপাদন-শিল্প ও বিজ্ঞানের অমিত বিস্তার অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। পুরোনো উৎপাদনব্যবস্থার তুলনায় নতুনটির কর্মদক্ষতা এতই বেশি, খরচ এতই কম, যে দুয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই চলেনা। সেই সময় থেকে পিছু ফিরে তাকাবার আর কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। আজ হোক আর কাল হোক, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের জীবনপ্রণালীতে আমূল পরিবর্তন ঘটা অবধারিত ছিল। করণকৌশলে এবং অর্থনীতিতে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহের চরম পরিণতিস্বরূপ এই ক্রান্তিকারী উত্তরণপর্বের অভ্যুদয় ঘটে। আমরা দেখেছি যে সেইসব পরিবর্তনের ফলে ব্রিটেনে প্রকৌশলগত দিক থেকে নবযুগের সূচনা হয় 1760 সাল নাগাদ; আর তার তিরিশ বছর পরে ফ্রান্সে অর্থনীতিতে ও রাজনীতিতে যুগান্তর ঘটে। এইসব পরিবর্তন খুব অনায়াসে ঘটেনি; এই পর্বটি যে অভূতপূর্ব বিপ্লব আর যুদ্ধে মথিত তা নেহাৎ অকারণে নয়।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আঠারো শতকের পরিবর্তনগুলি বৈপ্লবিক। প্রচলিত ইতিহাসে দেখানো হয়ে থাকে, এই পরিবর্তনগুলি কোপার্নিকাস-গ্যালিলিও-নিউটনের প্রাচীন চিন্তা-বিরোধী নব্য বৈজ্ঞানিক চিন্তারই পরিশিষ্ট। এ থেকে এটুকুই প্রমাণ হয় যে ইতিহাসবিদেরা নিজেরা কীভাবে ধ্রুপদী যুগের মোহে নিজেদের আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন। সতেরো শতকে নতুন গণিতের ও পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা গ্রীকদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলির সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু আঠারো শতকে বিজ্ঞানীরা এই সব পদ্ধতির সাহায্যে যেসব প্রশ্নের সমাধান করলেন সেই প্রশ্নগুলিই ছিল গ্রীকদের কল্পনারও অতীত। শুধু তাই নয়, তাঁরা উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিজ্ঞানকে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করে নিলেন। সেই থেকে বিজ্ঞান উৎপাদন-শিল্পের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল। এটাই তো একটা মস্ত কাজ। একথা ঠিকই যে নৌবিদ্যায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে সতেরো শতকেই শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানের এই যোগাযোগের সূত্রপাত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সতেরো শতকে বিজ্ঞানের স্থান ছিল বহুলাংশে ধ্রুপদী বিজ্ঞানেরই সমগোত্রীয়। অর্থাৎ তা শাসকশ্রেণীগুলির স্বার্থে নির্মিত বিশ্বাসের একটা

কাঠামো হয়ে ছিল, তখনো তা ছিল মতাদর্শগত উপরিকাঠামোর এক অঙ্গ। কার্যকরভাবে শিল্পক্ষেত্রে তার কিছুই অবদান ছিল না। কিন্তু এখন, উনিশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসে, উৎপাদনশক্তির এক প্রধান উপাদান হয়ে উঠল বিজ্ঞান, অথচ এর জন্য তার সারস্বত চরিত্র এতটুকু খোয়াতে হলো না। এই ঘটনাটা অসীম গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের ফলেই এই ঘটনাটি ঘটতে পেরেছিল।

শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা প্রয়োগগত উদ্ভাবন যতটা হয়েছে, সেই তুলনায় চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেনি। 1760 থেকে 1830-এর মধ্যে একের পর এক যেসব ঘটনা ঘটছিল, যেসব রূপান্তর ঘটছিল, সেগুলোর তাৎপর্যকে হজম করার জন্য সময়ের দরকার ছিল। চিন্তার জগতে এই যুগ যেন দুটি ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী জায়গায় দাঁড়িয়ে। যাঁদের ভাবনা বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁরা হলেন ফরাসি 'প্রকৃতিবাদী দার্শনিক' ভল্‌তেয়ার আর রুসো। এঁরা আবার নিউটন আর লক-এর দার্শনিক উত্তরাধিকারী, যে-দর্শনের ভিত্তি ছিল মানুষের প্রতি আবেগদীপ্ত বিশ্বাস। তাঁদের বিশ্বাস ছিল: চার্চ এবং রাজার দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত করতে পারলে অবাধ সংগঠন ও সুষ্ঠু শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে নিখুঁতভাবে গড়ে তোলা যাবে। জার্মানিতে এঁদের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল কান্ট (1724-1804)-এর সুগভীর অনুধ্যানের মধ্যে। কান্ট চেষ্টা করেছিলেন বৈজ্ঞানিক সাফল্যগুলিকে বিবেকের নিজস্ব আলোর সঙ্গে মিলিয়ে একটাই অভিন্ন দার্শনিক কাঠামো গড়ে তুলতে।

একদিকে শিল্পবিপ্লবের কঠিন অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে 'মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের' বাণীকে আক্ষরিকভাবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে সংস্কৃতিবান ও ধনবান ব্যক্তিদের অনীহাই উনিশ শতকের নানারকম ভাবনাচিন্তার জন্ম দিয়েছিল। সমাজদর্শনকে ফরাসি বিপ্লবে প্রয়োগ করতে গিয়ে তার গুরুতর খামতিগুলো ধরা পড়ে গিয়েছিল। বোঝা গিয়েছিল, কৃষক ও গরিব শ্রমজীবী মানুষের জীবনের সঙ্গে ঐ চিন্তার সম্পর্ক কত ক্ষীণ। অথচ কৃষক ও গরিব শ্রমজীবীরাই হলেন জনসংখ্যার ব্যাপকতম অংশ, তাঁরাই তো জনগণ, তাঁরাই তো ফরাসি বিপ্লবকে শক্তি যুগিয়েছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য পূরণ হওয়া মাত্র—অর্থাৎ ব্যক্তিগত অর্থ-উপার্জনের ওপর থেকে সামন্ততান্ত্রিক বিধিনিষেধ দূর হওয়া মাত্র—সম্পত্তিবানদের চোখে এই জনগণ হয়ে উঠলেন উচ্ছৃঙ্খল *জনতা।* বিজ্ঞানচর্চা, শিক্ষা, উদারপন্থী ধর্মচিন্তা—এতদিন এগুলো ছিল শৌখীন ব্যাপার; এখন, উনিশ শতকে, এগুলো হয়ে উঠল বিপজ্জনক ভাবনা। গডউইন-এর (1756-1836) আশাবাদের সঙ্গে ম্যাল্‌থস-অঙ্কিত মানবিক অস্তিত্বের ভীতিপ্রদ, হতাশ্বাস চিত্রটির তুলনা করলেই এই উত্তরণের চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে একটাই মৌলিক অগ্রগতি ঘটেছিল এই পর্বে, ঘটেছিল যুগের বিরাট পরিবর্তনগুলির সাক্ষাৎ ফল হিসেবে। স্বীকৃত নিউটনীয় উদারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এতদিন পর্যন্ত ধরে নেওয়া হতো যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি কালনিরপেক্ষভাবে একইভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলবে। অতএব, এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, যা করণীয় তা হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করা এবং সেই অনুযায়ী শিল্প, কৃষি ও সমাজকে একচোটে *স্থায়ীভাবে* সাজিয়ে নেওয়া। কিন্তু 'ন্যায়যুগ' (age of reason) প্রতিষ্ঠায় ফরাসি বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় এখন পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প হিসেবে মাথা চাড়া দিল বিবর্তনের মাধমে ক্রমবিকাশের দৃষ্টিভঙ্গি। আঠারো শতকের গোড়াতেই ভিকো (Vico, 1688-1744) মানবসমাজ সম্পর্কে এইরকম একটা কথা ভেবেছিলেন। পরে বুফঁ (Buffon, 1707-88) এবং ইর‍্যাসমাস ডারউইন (1731-1802)-ও এই নিয়ে জল্পনা করেছিলেন যে সমস্ত প্রাণী এবং খোদ পৃথিবীই বিবর্তনের মাধ্যমে বিকাশ লাভ

করেছে। এইসব ভাবনাচিন্তাকে একটা দার্শনিক কাঠামোয় রূপ দিলেন হেগেল (1770-1831)। পরে চার্লস ডারউইন (1809-1882) এবং কার্ল মার্ক্স (1818-1883) প্রকৃতিতে ও সমাজে বিবর্তনজনিত সংঘাতের ফলাফল ঘোষণা করলেন।

5. মধ্য-উনিশ শতক

যন্ত্রনির্ভর শিল্প আঠারো শতকেই চালু হয়ে গিয়েছিল। মধ্য উনিশ শতক নাগাদ তার যে বিরাট প্রসার ঘটল তার ফলে কোটি কোটি মানুষের জীবনধারায় এল আমূল পরিবর্তন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শহর গড়ে উঠল, সেগুলো অতি দ্রুত ভরে গেল মানুষে। শিল্পের বিকাশ যেমন ঘটল, তেমনি তারই পাশাপাশি পরিবহন-ব্যবস্থাতেও আমূল রূপান্তর দেখা গেল। রেলপথের মাধ্যমে শিল্পকেন্দ্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হলো, আর বাষ্পচালিত জাহাজের মাধ্যমে সংগৃহীত হতে লাগল কাঁচামাল, শিল্পজাত পণ্যগুলি দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। বস্তুত, আঠারো শতক যদি *উৎপাদনের* চাবিকাঠি খুঁজে পেয়ে থাকে, তাহলে উনিশ শতক পেয়ে গেল *যোগাযোগের* চাবিকাঠি। যেখানেই ঘটল শিল্পায়ন, সেখানেই ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল সমস্ত পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক। জনসাধারণের ব্যাপক অংশ হয়ে গেলেন মজুর, আর যাবতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্‌যোগের মূলে রইল নতুন পুঁজিপতিশ্রেণী। ফ্রান্সের 1830-এর বিপ্লব এবং ব্রিটেনে 1832-এর Reform Bill-এর সাফল্য রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে দিয়েছিল। মার্ক্সের কথায়, রাষ্ট্র হয়ে উঠল 'শাসকশ্রেণীর কার্যনির্বাহী সমিতি'। বিশেষ অধিকারকে আর বিশেষ আইন সহযোগে সুরক্ষিত করার প্রয়োজন রইল না: সম্পত্তির অধিকার যদি নিরঙ্কুশ থাকে, তাহলে আর্থব্যবস্থার নিজস্ব গতিপ্রকৃতিই এ ব্যাপারটাকে সুনিশ্চিত করে তুলবে যে যার যতটুকু না পেলে নয় সে ঠিক ততটুকুই পাবে।

এর আগে কখনো সম্পদ এত দ্রুত জমে ওঠেনি; এর আগে কখনো দুর্দশা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। এনজিনিয়ারিঙে একের পর এক সাফল্য যেমন দেখা গেল, তেমনি একই সঙ্গে দেখা দিল একটা ধোঁয়ায় ঢাকা, নোংরা, কুৎসিত বিষণ্ণতা—যা পূর্বতন কোনো সভ্যতায় দেখা দেয়নি, দেওয়া সম্ভব ছিল না। আমরা দেখেছি যে ইতিমধ্যেই, উনিশ শতকের গোড়াতেই, বিজ্ঞান এই নতুন ধরনের শিল্প চালনার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। দিন যত এগোল, বিজ্ঞান তত বেশি ক'রে শিল্পের কাজে লাগল, তার কাজের ক্ষেত্র ক্রমশ বেড়ে উঠল। বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটল প্রচণ্ডভাবে, আর যতই বিকাশ ঘটল ততই তা পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের গতিপ্রকৃতির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হতে লাগল।

1830 নাগাদ এ ব্যাপারটা স্বীকৃত হয়ে গেল যে ক্ষমতার একটা হস্তান্তর ঘটে গেছে—সামাজিক কৌলীন্য নয়, সম্পদের অধিকারই এখন ক্ষমতার মাপকাঠি। মনোভাবটা এইরকম দাঁড়াল যে এ রূপান্তরটা ঘটাতে গিয়ে ফরাসি বিপ্লবের সময় খানিকটা বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এখন সংবিধানসম্মত গণতন্ত্রের একটা আদর্শ রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, সুতরাং আর কোনো মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, বরং সে-পরিবর্তনকে প্রতিহত করাই প্রয়োজন; এমনকি সমাজের খারাপ দিকগুলো নিয়ে বিপ্লবাত্মক সমালোচনাকেও প্রতিহত করা প্রয়োজন। অতীতে কিন্তু ঐ ধরনের সমালোচনাকে জোর মদত যুগিয়েছিল বিজ্ঞানই। আর এখন কী-বিজ্ঞানী, কী-অবিজ্ঞানী সকলেরই মনে হতে লাগল যে বিজ্ঞান এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, কাজেই তার সমালোচনামূলক, বিদ্রোহী ভূমিকার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

উপযোগবাদ

বিজ্ঞানের বিদ্রোহী চরিত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় আবার সেই মধ্য-সতেরো শতকের মতোই বিজ্ঞানের তত্ত্বকে তার সামাজিক তাৎপর্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলার প্রয়োজন দেখা দিল; প্রয়োজন হয়ে পড়ল 'বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের' তত্ত্ব খাড়া করার। ভাবখানা এই যে বিজ্ঞানকে জাতে তুলে নেওয়ার ফলে এইবার বিজ্ঞানের দ্রুত স্ফূর্তি ঘটবে, এবং তার থেকেও বড়ো কথা, বিজ্ঞান হয়ে উঠবে মুনাফাজনক। এই রূপান্তরটা প্রধানত ঘটালেন 'উপযোগবাদী'রা (utilitarians)। এঁরা আঠারো শতকের 'প্রকৃতিবাদী দার্শনিক'দের হীনবীর্য উত্তরসূরী। অ্যাডাম স্মিথ আর জেরেমি বেন্থামের দেখানো পথ ধরে তাঁরা স্রেফ আইন প্রণয়নের দ্বারাই সমাজের বহুদিনকার অন্যায়গুলো দূর করবার জন্য সচেতনভাবে প্রয়াসী হলেন। অথচ এমনই সে আইন যা পুঁজিপতিদের কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না। তাঁরা মনে করতেন, একমাত্র এই পথেই নাকি রিকার্ডো (1772-1823) আর জন স্টুয়ার্ট মিল (1806-73) কর্তৃক ব্যাখ্যাত অর্থনীতির বজ্রকঠিন নিয়মগুলির নিগড়ে 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন' সম্ভব হয়ে উঠবে। তাঁরা পরম নিশ্চিত হয়েছিলেন যে বিজ্ঞান অবশেষে সমাজের শাশ্বত নিয়মগুলি আবিষ্কার করে ফেলেছে—যে নিয়ম অনুযায়ী সমাজ নাকি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অবাধে সম্পাদিত চুক্তির এক সমষ্টি। পুঁজিতন্ত্রের সেই সুবর্ণযুগের উদ্যোগী বিনিয়োগকারীরা উঠে পড়ে লাগলেন সে যুগের নব্য ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের প্রতিটি কথার অভ্রান্ততাকে প্রমাণ করার জন্যে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। ছোটোখাটো বিপত্তির কথা বাদ দিলে, 1830 থেকে 1870-এর মধ্যে উৎপাদন বেড়েই চলল একটানা। এই পর্বে বিজ্ঞানের ভূমিকা ছিল সামান্য, কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্রমবর্ধমান।

এই ছিল পুঁজিতন্ত্রের রমরমার যুগ: একদিকে অমিত সম্পদ, অন্যদিকে অসহ্য দারিদ্র্য; একদিকে চার্টিস্ট আন্দোলন আর 'বুভুক্ষু চল্লিশ-দশক', অন্যদিকে 1851-এর 'মহা প্রদর্শনী'। মার্ক্সের 1848-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য ক'রে তুলে ইতিমধ্যেই সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল পুঁজিতন্ত্র। উন্নততর জীবনযাত্রার দাবিতে শ্রমিকদের লড়াই যেমন কখনোই থেমে থাকেনি, তেমনি বর্ধিত উৎপাদন আর প্রসারমান বাজারের দৌলতে পুঁজিপতিরাও শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সময় বুঝে কিছু কিছু সুযোগসুবিধা দিতে পেরেছিল।

মধ্য-উনিশ শতকে করণকৌশলের দিক থেকে এমন কোনো আমূল পরিবর্তন ঘটেনি যা আঠারো শতকের সঙ্গে তুলনীয়। উৎপাদনের যেসব পদ্ধতি ইতিমধ্যে চালু হয়ে গিয়েছিল সে গুলিকেই আরো উন্নত ক'রে তুলে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ ঘটানো হয় এ সময়ে। ব্রিটেনের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ইতিমধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, তবে শিল্পবিপ্লব পার-হয়ে-আসা ব্রিটেন তাদের তুলনায় তখন অনেক এগিয়ে। এগিয়ে থাকার এই মাত্রাকে ব্রিটেন শুধু যে বজায় রাখতে পেরেছিল তাই নয়, বরং তাকে ক্রমাগত বাড়িয়েই তুলেছিল। পণ্যসামগ্রীর, বিশেষত নতুন নতুন যন্ত্রে প্রস্তুত বস্ত্রাদির দাম কমে যাওয়ায় সেসবের বাজার বেড়ে গেল হুহু ক'রে। কয়েক দশক ধরে মনে হচ্ছিল সে-বাজারের বুঝি কোনো অন্ত নেই, সীমা নেই। ইতিমধ্যেই যেসব যন্ত্র চালু হয়ে গিয়েছিল, সেগুলোর সংখ্যা বাড়িয়ে বা উন্নতিসাধন ক'রেই এই বিশাল বাজারের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছিল। তাই উৎপাদনের নতুন কৌশল আবিষ্কারের প্রয়োজনটা তেমন তীব্রভাবে অনুভূত হয়নি। অপরদিকে, *যোগাযোগ* ও *পরিবহনকে* দ্রুততর ক'রে তোলার প্রয়োজনটা তখন বিশেষভাবেই অনুভূত হচ্ছিল। নবীন তড়িৎ-বিজ্ঞানের প্রথম ব্যবহারিক ও ব্যাপক প্রয়োগ ঘটল *টেলিগ্রাফের* মধ্যে। *পরিবহনে—রেলওয়ে* ও *বাষ্পীয় জাহাজে*-শক্তির

প্রয়োগ অবশ্য বস্তুগত দিক থেকে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ; যদিও এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ভূমিকা ছিল কেবল সহযোগীর।

এনজিনিয়ারদের উদ্ভব

উপরিউক্ত দুটি প্রয়োগই নবোদ্ভূত পেশাদার মেক্যানিক্যাল এনজিনিয়ারদের প্রত্যক্ষ অবদান। শস্তায় লোহা পাওয়া যাচ্ছিল বলেই অবশ্য এগুলো সম্ভব হয়েছিল (লোহা এখন গলানো হচ্ছিল কয়লার সাহায্যে)। আধুনিক এনজিনিয়ারদের আবির্ভাব একটা নতুন সামাজিক ঘটনা। আগেকার দিনের সামরিক এনজিনিয়ারদের সাক্ষাৎ উত্তরসূরী এঁরা নন; বরং বলা যায় এঁরা হস্তশিল্পের যুগের millwright (হাওয়াকল ও জলকল তৈরি ও মেরামত করার মিস্ত্রী) ও ধাতু-কর্মীদের সাক্ষাৎ উত্তরসূরী। ব্রামা (1748-1814), মড্‌স্‌লে (1771-1831), মুর (1806-88), হুইট্‌ওয়ার্থ (1803-87) এবং মহান জর্জ স্টিফেন্‌সন (1781-1848)—এঁরা সকলেই ছিলেন ঐ ধাতের মানুষ। মধ্য-উনিশ শতকে বিজ্ঞানের নিজস্ব বিকাশ যতটা না হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছিল বিজ্ঞানের প্রয়োগের উন্নতি; তারই ফলে এই সমস্ত প্রয়োগের ভার এবং এগুলির আরো উন্নতি ঘটানোর দায়িত্ব গিয়ে পড়ে এই ধরনের ব্যবহারিক বোধসম্পন্ন মানুষদের হাতে। রিচার্ড ট্রেভিথিক (1711-1833), জর্জ স্টিফেন্‌সন এবং আই· কে· ব্রুনেল (1806-59)-এর মতো মহাগুণীদের কথা বাদ দিলে, এঁরা প্রায় সকলেই পূর্বসূরীদের অনুসৃত পথেই এগিয়ে চলেছিলেন—অর্থাৎ *ঠেকে-শেখার* রাস্তায়। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে যেসব বৈপ্লবিক উদ্‌ভাবন চালু হয়ে গিয়েছিল, তারই ওপর এঁরা চাপিয়ে দিতেন পরম্পরাক্রমে বিকশিত করণকৌশলগুলিকে। এই জন্যেই আমরা দেখতে পাই যে বোল্টন আর ওয়াটের কারখানায় তৈরি reciprocating বাষ্পীয় এনজিনের ধাঁচেই আজও, 200 বছর পরে, এনজিন তৈরি হয় (reciprocating এনজিনে চোঙের মধ্যে পিস্টন আগুপিছু করে)।

রেলওয়ে ও বাষ্পচালিত জাহাজ

রেলওয়ের আদি উৎপত্তি কয়লাখনিতে। চাকার ওপর এনজিন বসিয়ে সেটাকে *লোকোমোটিভে* পরিণত করাটা ছিল এক মস্ত উদ্‌ভাবন। এটাকে প্রথম সফলভাবে কাজে লাগানো হয় খনিতে। তারপর উনিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে ব্রিটেনকে ছেয়ে ফেলে রেলপথ। অতঃপর গোটা উনিশ শতক জুড়ে রেলপথ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তারই ফলে সিভিল এনজিনিয়ারিং, যা ইতিমধ্যেই বেশ ব্যাপ্ত হয়েছিল, তা ম্যাকাডাম আর রেনি প্রমুখের প্রদর্শিত পথে দ্রুত বিকশিত হয়ে ওঠে। রবার্ট স্টিফেন্‌সন ও আই কে· ব্রুনেলের কীর্তি আজও দেখবার মতো। এদিকে খাল ও রেলপথ বানাতে গিয়ে ভূবিদ্যা সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহ জাগল। কারণ পাথর-কাটা এবং সুড়ঙ্গনির্মাণের সময় পাথরের গঠন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেল। একই সঙ্গে, সার্ভেয়র-এর পেশা সৃষ্ট হলো। অর্থাৎ ভূগোল ও ভূ-বিদ্যার বিজ্ঞানে অর্থাগমের এক নতুন উৎস খুলে গেল।

টেলিগ্রাফ

রেলওয়ে ও বাষ্পচালিত জাহাজ পরিবহনব্যবস্থায় যে উন্নতি ঘটাল তার ফলে দ্রুত যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়ল। দ্রুত খবর পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা মানুষ আদ্যিকাল থেকেই করে আসছে। তবে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এমনকি যুদ্ধের

প্রয়োজনেও relay semaphore-টেলিগ্রাফের * চাইতে উন্নত কিছু তৈরি করা যায়নি। অথচ একটা কিছু করবার উপায় কিন্তু হাতের কাছেই ছিল। 1787-এই বেশ কয়েক মাইল দূরত্বে সংবাদ পাঠানোর জন্য তড়িতের ব্যবহার হয়েছিল। কিন্তু স্থিতীয় (static) তড়িৎকে কাজে লাগানো শক্ত, এবং তা নির্ভরযোগ্য নয়। এবার রেলওয়ের আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অয়রস্টিদ আবিষ্কার করেন কম্পাসের ওপর বিদ্যুৎ-তরঙ্গের অভিঘাত। দুটি ঘটনার এই আকস্মিক সমাপতনের ফলেই অল্প খরচে নিখুঁত একটা পদ্ধতি বার করা সম্ভব হয়ে উঠল। উঠল এমন একটা সময়ে যখন তার প্রয়োজনটা ছিল সবচেয়ে বেশি। এরই ফলে তড়িৎ-চুম্বকীয় টেলিগ্রাফের আবিষ্কার সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

মর্স, হুইট্‌স্টোন প্রমুখ বেশ কয়েকজন আবিষ্কারক যে একই সঙ্গে এ নিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিলেন তার কারণ এ নয় যে তাঁরা সামাজিক যোগাযোগের সর্বজনীন চাহিদা মেটাতে চাইলেন। আসলে যে-তাড়নার বশে তাঁরা এ নিয়ে উৎসাহী হয়ে উঠলেন তা হলো: খবর জিনিসটার আর্থিক মূল্য— পণ্যসামগ্রীর বা শেয়ারের দাম সংক্রান্ত খবর বা যেসব ঘটনা শেয়ারের দামকে প্রভাবিত করতে পারে সেই সংক্রান্ত খবর। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ সেই খবরকে অতিদ্রুত এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে।

স্বল্প-দূরত্বের টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা তড়িতের সাক্ষাৎ প্রয়োগে গড়ে উঠেছিল। নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের অক্ষর-সংকেত-ব্যবস্থাই এর জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আরো দূরে তাড়াতাড়ি খবর পৌঁছে দেওয়ার তাগিদ পদার্থবিদদের উদ্‌ভাবনশীলতাকে ক্রমাগতই সক্রিয় করে রাখে—একেবারে আমাদের এই বর্তমান কাল পর্যন্ত। এর ফলে অনেক মৌলিক জ্ঞান আহরণ ও সূক্ষ্ম যন্ত্র উদ্‌ভাবন করা সম্ভব হয়। 1866-তে Atlantic Cable পাতার প্রয়াস (যা ব্রিটেনকে আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত করে) সফল হয়। যাঁর অসামান্য কৃতিত্বে এটি সম্ভব হয়, তিনি হলেন সমকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ উইলিয়ম টমসন ওরফে লর্ড কেল্‌ভিন (1824-1907)। টেলিগ্রাফের প্রবর্তন সাধারণভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিদ্যুৎকর্মীর প্রয়োজন হয়ে পড়ল, এবং তারই ফলে করণকৌশল শেখানোর বিদ্যালয় ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা বিভাগ খোলা অপরিহার্য হয়ে উঠল। উনিশ শতকের শেষের দিকে যে-অগ্রগতি হয়েছিল তার অধিকাংশেরই মূলে এইসব বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়-বিভাগের অবদান ছিল।

পঞ্চাশের দশক থেকেই বিজ্ঞানের ব্যবহারিক সুফল বেশ ভালোরকম পাওয়া যাচ্ছিল। সোডা এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের চাহিদা প্রসারমান বস্ত্রশিল্পের কল্যাণে বাড়তেই থাকে। মূলত এই চাহিদার ভিত্তিতেই নতুন এক রসায়ন-নির্ভর শিল্প গড়ে ওঠে। তাছাড়া, অ্যানিলিন-ভিত্তিক রঞ্জক আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে জৈব রসায়নের ভবিষ্যৎও হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। কৃত্রিম সার প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানকে, বিশেষত রসায়নবিজ্ঞানকে, কৃষির উন্নতি সাধনের কাজে লাগানোর সূত্রপাত হয় এই সময়েই। জীববিদ্যা এতদিন কেবল কৃষিক্ষেত্রেই কাজে লেগে এসেছে; এবার সেই প্রথাসিদ্ধ ক্ষেত্রের বাইরেও তার প্রয়োগ ঘটতে থাকে। রসায়নবিদ লুই

* *semaphore*—চাক্ষুষ সংবাদ প্রেরণের কৌশল। দিনের বেলা এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে কিংবা জাহাজ থেকে তীরে সংবাদ প্রেরণের জন্য নৌ-semaphore ব্যবস্থা কাজে লাগানো হয়। রেলপথেও কোথাও কোথাও semaphore ব্যবহার করা হয়। একটা খুঁটির ওপর অনুভূমিকভাবে বসানো বাহুর নড়াচড়া ও নানারকম অবস্থান দিয়ে বিভিন্ন সংকেত বোঝানো হয়। —অনুবাদক।

পাস্তুর (1822-95) সুরাশিল্পের উন্নতিসাধনের পথ বার করেছিলেন এই সময়েই। শুধু তাই নয়, পাস্তুর এই সময়েই সফল আঘাত হেনেছিলেন একধরনের রোগের ওপর। লক্ষণীয়, রোগটি মানুষের নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকে মূল্যবান গুটিপোকাদের।

জীবনপ্রক্রিয়াসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার এতদিনকার প্রথাসিদ্ধ পথের বদলে বিজ্ঞানসম্মত পথে নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শুরু করেছিল। খুব প্রসন্ন মনে না হলেও নবীন রসায়নবিজ্ঞানের বাড়ানো হাত থেকে উপহার গ্রহণ করেছিল চিকিৎসাশাস্ত্র। অবেদনিক পদার্থগুলি (anaesthetics) তার নিদর্শন।

দারিদ্র্য, জনসংখ্যার চাপ এবং সাধারণভাবে অবাধ বাণিজ্যের অর্থনীতি—এই সবকিছু মিলে তখন শিল্পোন্নত দেশগুলোর জনগণের স্বাস্থ্য এত খারাপ হয়ে পড়েছিল যে আগেকার কোনো যুগের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। পরিবহনের উন্নতি ঘটায় কলেরার মহামারী বারবার দেখা দিতে থাকে। এর প্রকোপ এতই প্রবল হয়ে ওঠে, এবং মধ্যশ্রেণীকে তা এতই শঙ্কিত ক'রে তোলে যে অবশেষে স্বাস্থ্যবিধান (sanitation)-এর প্রয়োজন সম্পর্কে চৈতন্যোদয় হয় এবং বস্তিমালিকদের কাজকর্মের ওপর খানিকটা কড়াকড়ি আরোপিত হয়।

বিজ্ঞানের সংগঠন

জাতির অর্থনৈতিক জীবনে বিজ্ঞান ইতিমধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছিল। অথচ সে তুলনায় বিজ্ঞান-অনুশীলন এবং বিজ্ঞান-শিক্ষার সুযোগসুবিধা ছিল খুবই অপ্রতুল। কথাটা বিশেষ করে প্রযোজ্য ইংলন্ডের ক্ষেত্রে—যে-ইংলন্ডে তখন বিজ্ঞানের প্রয়োগ হচ্ছিল সবচেয়ে ব্যাপকভাবে। সরকার, এবং বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিভূ রয়্যাল সোসাইটি যে নতুন নতুন চাহিদার প্রতি নজর দিচ্ছেন না, সে ব্যাপারে 1830 নাগাদ চার্লস ব্যাবেজ (1792-1871)-এর নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ বিজ্ঞানী খুবই সোচ্চার হয়ে ওঠেন। Reflections on the Decline of Science in England (ইংলন্ডে বিজ্ঞানের অধঃপতন বিষয়ে বক্তব্য) গ্রন্থে ব্যাবেজ দেখান যে কার্যত রয়্যাল সোসাইটি হয়ে দাঁড়িয়েছে কতকগুলি অফিসারের এক বদ্ধ গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী যে-সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের বেশির ভাগেরই বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা খুবই ভাসা-ভাসা, এবং তাঁরা এমনকি রয়্যাল সোসাইটির উৎসাহী পৃষ্ঠপোষকও নন।

সংস্কারের জমি প্রস্তুতই ছিল, তবু রয়্যাল সোসাইটি খুব ধীরে-সুস্থে এগোতে লাগল। ব্যাবেজ যে-অবস্থা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে রয়্যাল সোসাইটি খুব সহজ একটি পদ্ধতিতে—অর্থাৎ নতুন সদস্যভুক্তিকে সীমিত ক'রে তুলে—সেই অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তার আগেই অধৈর্য হয়ে উঠে—তার সংগত কারণও ছিল—ব্যাবেজ বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে 1831-এ প্রতিষ্ঠা করেন The British Association for the Advancement of Science (BAAS). রয়্যাল সোসাইটির বিকল্প হিসেবে এই সংস্থা বিজ্ঞানের সপক্ষে কাজ করুক ও বিজ্ঞানের হয়ে কথা বলুক, এই ছিল উদ্দেশ্য। 1882 সালে জার্মানিতে লোরেন্‌জ ওকেন (1779-1851) Deutsche Naturforscher-Versammlung (ডয়েট্‌শে নাটুরফোর্‌শ্যার-ফেয়ারসামলুং—জার্মান প্রকৃতিবিশারদ সংগঠন) নামক যে-সংস্থা গঠন করেন, তারই আদলে ব্যাবেজ গড়ে তোলেন BAAS. *Naturphilosophen*-দের * মধ্যে সবথেকে উদগ্র, সবথেকে উদ্ভট কল্পনাপ্রবণ, এই ওকেন

* উনিশ শতকের গোড়ায় জার্মানিতে জীববিদ্যায় Naturphilosophie নামক রহস্যবাদী অতীন্দ্রিয় (mystical) দর্শন মাথা চাড়া দেয়। এই মতের অনুসারীদের বলা হতো Naturphilosophen। দার্শনিক হ্যার্ডার ও শেলিং এবং কবি গয়টে-র প্রভাবে এই মতবাদ দানা বাঁধে। অতিপ্রাকৃত প্রবণতা সত্ত্বেও এই মতবাদের অনুসারীরা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সদর্থক ভূমিকা রেখেছিলেন। —অনুবাদক

ছিলেন একই সঙ্গে দৃঢ়চেতা এক উদারপন্থীও বটে। *Isis* নামে যে-কাগজ বার করতেন তিনি, সেন্সর-কর্তৃপক্ষ তাতে হস্তক্ষেপ করতে চাইলে সে-হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়ার বদলে তিনি জেনা'র অধ্যাপক পদ ত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করেন। যে আন্দোলন তিনি শুরু করেন কার্যত তারই ফলে মধ্য-উনিশ শতকে জার্মানিতে বৈজ্ঞানিক নবজাগরণের এক মহান পর্ব সূচিত হয়।

BAAS-ও তার নিজস্ব ধরনে অনুরূপ সাফল্য অর্জন করেছিল। খুব শিগগিরই এই অ্যাসোসিয়েশন রয়্যাল সোসাইটির চেয়ে অনেক বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে (যদিও তা রয়্যাল সোসাইটির মতো সম্ভ্রান্ত ছিল না)। যুক্তরাজ্যের প্রত্যেকটি শহরে, এমনকি উপনিবেশগুলিতেও তার সভা অনুষ্ঠিত হতো। সে যুগের প্রত্যেকটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিতর্ক এই অ্যাসোসিয়েশনের সভাক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছিল। এই বিতর্কগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সংঘাত (যার চূড়ান্ত পরিণতিতে 1860 সালে অক্সফর্ডে বিশপ উইলবারফোর্সকে পাল্টা জবাব দেন টি· এইচ· হাক্সলি); টিন্ড্যালের বেলফাস্ট বক্তৃতা (1874), যাতে তিনি এই ধারণা ব্যক্ত করেন যে হীনপ্রাণ জড়পদার্থ থেকেই হয়তো প্রাণের উদ্ভব হয়েছে। একদিকে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা, অন্যদিকে জাতীয় স্বার্থে গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া ও গবেষণার খরচ যোগানো—এই দুটি কাজই করত BAAS. ভূকম্পবিদ্যা, জোয়ার-ভাঁটা নিয়ে গবেষণা, আবহবিদ্যা, চুম্বকক্রিয়া, বৈদ্যুতিক মান (electrical standards), ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যার চর্চা বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে তা উদ্‌যোগ নিয়েছিল। কার্যত, বেসরকারি উদ্‌যোগে এই সংস্থা যা করেছিল তা আসলে করার কথা সরকারের। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ BAAS-এর কাজের চাপ এত বেড়ে যায় যে আলাদা আলাদা শাখা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ছাড়া উপায় থাকে না। 'ন্যাশনাল ফিজ়িক্যাল লেবরেটরি' এমনই এক প্রতিষ্ঠান। BAAS-এর যে-কাজটির ফলাফল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো: ইয়ুস্টুস ফন লীবিখ (Justus Von Liebig, 1803-73)-কে কৃষি-রসায়ন সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য অনুরোধ করে সংস্থা; এ কাজ করতে গিয়েই ঐ মহান রসায়নবিদ খাদ্য উৎপাদনের ব্যবহারিক সমস্যাগুলি নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়েন এবং তারই ফলে মৃত্তিকা-রসায়ন ও পুষ্টি-বিজ্ঞানের সূচনা হয়।

নবীন শিল্পমালিক-বুর্জোয়াশ্রেণী চাইছিল বিজ্ঞানকে নিজেদের বশে রাখতে। উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে বিজ্ঞানচর্চা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল 'কুলীন' উচ্চশ্রেণীর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে। নবীন শিল্পমালিক বুর্জোয়াশ্রেণী সেই কৌলীন্যের বেড়া ভাঙতে চাইল। BAAS-এর কাজকর্ম এসবেরই প্রতিফলন। শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় নাগাদ, শিল্পমালিক-বুর্জোয়াশ্রেণীর এই অভিলাষ অনেকটাই পূর্ণ হয়, বিজ্ঞানের নবার্জিত গুরুত্ব প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে।

সতেরো ও আঠারো শতকে কার্যসিদ্ধির জন্য সাধারণ সভাগুলিই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু এখন প্রবল বেগে বিশেষীকৃত জ্ঞান সঞ্চিত হতে থাকায় বিজ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্রের সৃষ্টি হচ্ছিল। ফলে সাধারণ সভা দিয়ে আর কাজ চলছিল না। ফ্রান্স, ইংলন্ড, স্কটল্যান্ড, জার্মানি ও অন্যান্য দেশে রসায়ন, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অন্যান্য শাখায় আলাদা আলাদা সভা স্থাপিত হলো, প্রত্যেকটি সভারই থাকল নিজস্ব একটি করে মুখপত্র। এই সময়ে এনজিনিয়াররাও নিজেদের সংস্থায় সংগঠিত হতে শুরু করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান

মধ্য-উনিশ শতকে আরো একটা ঘটনা লক্ষ্য করা গেল। গত দুশো বছর ধরে ইংলন্ডে ও ফ্রান্সে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নবীন বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে আসছিল। সেই বিরোধিতা এবার ভাঙতে

শুরু করল। ইংলন্ডে তার প্রমাণ মিলল একদিকে নতুন নতুন কলেজ স্থাপনার মধ্যে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন নতুন বিভাগ খোলার মধ্যে। প্রথমে লন্ডনে, পরে অন্যান্য শিল্পনগরীতে স্থাপিত নতুন কলেজগুলি ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। উনিশ শতকের গোড়ায় ইংলন্ডের অধিকাংশ না হোক অনেক বড়ো বিজ্ঞানীই ছিলেন হয় অপেশাদার, না হয় কোনো শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত নবীশ—যেমন ডেভি এবং ফ্যারাডে। মধ্য উনিশ শতকেব ইংলন্ডে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাই হয়ে উঠলেন বিজ্ঞানী। ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা ইতিমধ্যেই বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন। 1851-এর Great Exhibition ছিল বিজ্ঞান, নতুন আবিষ্কার এবং ম্যানুফ্যাকচার—এই তিনের সম্মিলনের প্রতীক। এই প্রদর্শনীর লভ্যাংশের খানিকটা ব্যয়িত হয়েছিল Royal College of Science প্রতিষ্ঠার জন্য। ফ্রান্সে অবশ্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা অনেক আগেই নেওয়া হয়েছিল, স্থাপিত হয়েছিল École Polytechnique এবং École Normale Supérieure.

নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার অঙ্গনে বিজ্ঞানকে টেনে নেওয়ার ব্যাপারে জার্মানিই সবচেয়ে এগিয়ে গেল। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংস্কারের কাজ অবশ্য শুরু হয়ে গিয়েছিল আঠারো শতকের মননমুক্তির যুগেই। এক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা নেয় গয়টিঙ্গেন। দ্বিতীয় জর্জ তাঁর অধীন হানোভার-স্থ প্রদেশে এটি স্থাপন করেন 1736 সালে। 1830-এর পর থেকে বিভিন্ন জার্মান প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিজ্ঞান বিভাগ খুলতে থাকে। অপেক্ষাকৃত ধীরলয়ে হলেও একে একে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট লেবরেটরিও স্থাপিত হতে থাকে। গীসেন-এ লীবিখের লেবরেটরিটি ছিল এদের আদর্শ। বিজ্ঞানের আন্দোলনে জার্মানির প্রবেশ অপেক্ষাকৃত দেরিতে। ফ্রান্স বা ব্রিটেনের তুলনায় জামানির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা ছিল অনেক বেশি সুশৃঙ্খল এবং অনেক কম স্বাধীন। ব্যক্তিগত উদ্যোগের দিক থেকে জার্মানির খামতি পুষিয়ে দিয়েছিল সংগঠিত কর্মকাণ্ড। মধ্য-উনিশ শতক থেকে জার্মানি তৈরি করতে লাগল প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের পাঠ্য বই এবং যন্ত্রপাতি। নিজের দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে অন্যান্য দেশের চাহিদারও যোগান দিতে লাগল জার্মানি।

এই সব পরিবর্তনের ফলে বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের পরিমাণ ও মর্যাদা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল। বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম উত্তরোত্তর নির্দিষ্ট সাংগঠনিক রূপ ধারণ করতে লাগল। আইন-ব্যবসায় বা ডাক্তারির মতো বিজ্ঞানচর্চাও হয়ে উঠল একটা পেশা। আগে তার যে স্বাধীন অপেশাদার চরিত্র ছিল তার অনেকটাই বিসর্জন দিতে হলো। বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যতটা না বদলে দিল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তার থেকে বিজ্ঞানকে বদলে দিল বেশি। বিদ্রোহী দ্রষ্টার ভূমিকা ত্যাগ করে বিজ্ঞানী এখন ক্রমশ যেন হয়ে উঠলেন পণ্ডিতমশাই, যাঁর কাজ মহান এক ঐতিহ্যকে সঞ্চারিত করে দেওয়া। যে-জার্মানিতে বিজ্ঞানীরা এক সময় উদাবপন্থী আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, 1848-এর ব্যর্থ বিদ্রোহের পরে সেখানেই বিজ্ঞানীরা সরকারি রাষ্ট্রযন্ত্রের সবচেয়ে কট্টর সমর্থক হয়ে দাঁড়ালেন।

মধ্যবিত্তশ্রেণী ও জনবোধ্য বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের ওপর মধ্যশ্রেণীগুলির নির্বাচিত একটি অংশের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপে এঁদের বলা হতো উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী। স্বভাবতই বিজ্ঞানচর্চা এঁদেব বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত ও রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। মধ্য-উনিশ শতকে এঁরা উপযোগিতাব গুরুত্বকে ছোটো করে দেখেননি। নিজ যুগের মহান স্বতন্ত্র আন্দোলনগুলির প্রতি এঁরা আগ্রহী ছিলেন, এঁরা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে প্রগতি অনিবার্যতই ঘটবে—কিন্তু তার অস্বস্তিকর ও বিপজ্জনক কোনো পরিণামের দায়িত্ব তাঁরা স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। সম্পদে এবং

কর্তৃত্বে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদার পতন ঘটেছিল। শিল্প এবং লগ্নীকার মহলের দাপট বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আঠারো শতকে বড়ো বড়ো শিল্পমালিকদের সঙ্গে অগ্রণী বিজ্ঞানীদের খানাপিনার ও কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল; কিন্তু আলোচ্য সময়পর্বে সম্পদ ও ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করার শক্তি—এবং ইচ্ছা—খুব কম বিজ্ঞানীরই ছিল।

বস্তুত, উনিশ শতকে বিজ্ঞানের এমন বিকাশ ও ব্যাপ্তি ঘটা সত্ত্বেও মধ্যশ্রেণীগুলির সীমিত পরিমণ্ডলের বাইরে বিজ্ঞান সামান্যই ছড়াতে পেরেছিল। শতকের গোড়ায় কাউন্ট রাম্‌ফোর্ড চেয়েছিলেন কারিগরদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে। কার্যত, কয়েক বছর পর তৈরি হয়েছিল একটি রাজকীয়—'Royal'—প্রতিষ্ঠান, যেখানে ভদ্রলোক এবং অভিজাতরা বৈজ্ঞানিক বিনোদন লাভ করবেন। একই সঙ্গে অবশ্য অসামান্য এক গবেষণাগারও তৈরি হয়ে গিয়েছিল, তবে সেটা নেহাৎই ঘটনাচক্রে। কারিগরদের জন্য স্থাপিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর দশা অবশ্য এতটা শোচনীয় ছিল না। বিশেষ ক'রে 1823-এ লন্ডনে যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল, যা থেকে পরে বার্কবেক কলেজ উদ্ভূত হয়, সেটি খুবই উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া, টমাস হেনরি হাক্সলির মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতেন। তবে, শিল্পবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যে-বিশাল শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম হয়েছিল, তার এক অতি ক্ষুদ্র অংশকেই স্পর্শ করতে পেরেছিল এইসব প্রয়াস। আর, করণকৌশলগত শিক্ষার কোনো অস্তিত্বই ব্রিটেনে ছিল না বিশ শতকের আগে—যে-ব্রিটেন ছিল যন্ত্রশিল্পের পীঠস্থান! 'নিজ উদ্যোগে' মধ্যশ্রেণীগুলির মধ্যে আসন করে নেবার কোনো একটা রাস্তা বার করতে যারা ছিল অক্ষম, তাদের কাছে বিজ্ঞান ও করণকৌশলগত উন্নতির অর্থ ছিল মজুরি কাটা যাওয়া এবং বেকারী বৃদ্ধি।

বিজ্ঞানের নবার্জিত ক্ষমতাকে আয়ত্ত ক'রেই যে শ্রমিকশ্রেণী একদিন এই শ্বাসরোধকারী পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটাবে—এই ভবিষ্যৎ-দর্শনের প্রথম আভাস মিলেছিল রবার্ট ওয়েন-এর পরীক্ষার মধ্যে; তবে এ কথা প্রথম স্পষ্ট করে বলেন কার্ল মার্ক্স—1848-এ প্রকাশিত *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এ। পরে *পুঁজি* গ্রন্থে এই ধারণাকে তিনি বিস্তারিত করেন। মার্ক্সের এই তত্ত্বের পূর্ণ অভিঘাত অবশ্য বিশ শতকের আগে অনুভূত হয়নি।

6. উনিশ শতকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি

মধ্য-উনিশ শতকে এমন বিরাট ক্ষেত্র জুড়ে বিজ্ঞানেব অগ্রগতি হয়েছিল যে মাত্র কয়েকটি পাতার মধ্যে তার সমস্তটা বলা সম্ভব নয়; কেবল প্রধান প্রধান সাফল্যগুলির কথাই এখানে বলব। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যা—এই তিনটি ক্ষেত্রই এযুগে প্রসারিত হয় এবং বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত হয়। প্রকৃতি এবং করণকৌশলের প্রতিটি ক্ষেত্র জুড়ে চলে ব্যাপক গবেষণা। সতেরো এবং আঠারো শতকের রেখে-যাওয়া 'পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা-গণনা'র ঐতিহ্যে শিক্ষিত উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক মানস অক্লান্ত গবেষণা চালাতে থাকে। বিজ্ঞানের যেসব ক্ষেত্র আগেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল সেসব ক্ষেত্রেও বিশ্লেষণ হয়ে ওঠে গভীরতর, প্রয়োগেরও নতুন নতুন পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

রসায়নের জয়যাত্রা

উনিশ শতকে বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল রসায়নে। কারণ বস্ত্রশিল্প ছিল ঐ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, এবং বিজ্ঞান হিসেবে রসায়ন ছিল বস্ত্রশিল্পের সবচেয়ে বড়ো

সহযোগী। দিন যত এগোল, রসায়ন আক্ষরিক এবং আলংকারিক উভয় অর্থেই প্রতিটি পণ্যদ্রব্যকে রঞ্জিত করে তুলল। পণ্যদ্রব্যের উন্নতি-সাধক খাদ (adulterant), সুগন্ধী, রঞ্জক (প্রধানত আলকাতরা থেকে তৈরি) ইত্যাদি জিনিস কৃত্রিম পদ্ধতিতে তৈরি হতে লাগল, কারণ প্রাকৃতিক উৎস থেকে যা পাওয়া যাচ্ছিল তার পরিমাণ এত কম ও খরচা এত বেশি যে তা দিয়ে নতুন বাজারের চাহিদাকে সামাল দেওয়া আর সম্ভব ছিল না। এই যে পরিবর্তন ঘটল, এরই ফলে রসায়নিক গবেষণার কেন্দ্র ব্রিটেন থেকে সরে গেল। অথচ আঠারো শতকে ব্রিটেনেই এর জন্ম। প্রথমে তা সরে গেল ফ্রান্সে। সেখানে সূত্রবদ্ধ ও সম্প্রসারিত হওয়ার পর ফ্রান্স থেকে রসায়ন-গবেষণার কেন্দ্র আবার সরে গেল জার্মানিতে। জার্মানিই প্রথম দেশ যেখানে এর বহুবিচিত্র উপযোগিতার দিকগুলিকে কাজে লাগানো হয়। রসায়ন-গবেষণার এই কেন্দ্র-পরিবর্তনের পরিণাম হয়েছিল বড়ো মারাত্মক, যার প্রমাণ পাওয়া যাবে বিশ শতকে।

শক্তির নিত্যতা

প্রাচীন ও নবোদ্ভূত—উভয় ধরনের বিজ্ঞানের এই সক্রিয় অগ্রগতির মধ্যে দুটি অসামান্য তত্ত্ব উনিশ শতকের প্রধান অবদান হিসেবে স্মরণীয়। একটি পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে—*শক্তির নিত্যতার তত্ত্ব*; অন্যটি জীববিদ্যার ক্ষেত্রে—*বিবর্তন*-তত্ত্ব।

যথাসময়ে আমরা দেখাব যে কার্নো থেকে শুরু করে হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এক মহাজাগতিক মূলনীতি হিসেবে শক্তির বিভিন্ন রূপের এই পরস্পর-পরিবর্তনশীলতার গুরুত্ব কতখানি। এই উপলব্ধিরই পরিচয় বহন করছে শক্তির নিত্যতা তত্ত্ব। কার্যত এ-তত্ত্বকে প্রেরণা যুগিয়েছিল কয়লাকে শক্তিতে পরিণত করার ব্যাপারটি। শিল্পবিপ্লবের ঊষাকাল থেকেই তো বাষ্পীয় এনজিন ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে এ ঘটনা বাস্তবে ঘটে আসছিল। এই তত্ত্ব উত্তরোত্তর গণিতীয় রূপ পায় এবং *তাপগতিবিদ্যা* (thermodynamics) রূপে এর বিকাশ ঘটে। তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রই হচ্ছে শক্তির নিত্যতা; প্রথম সূত্রের সঙ্গে যুক্ত এর দ্বিতীয় সূত্রটি, যার দ্বারা নির্ধারিত হয় শক্তির সীমিত প্রাপ্যতা। দ্বিতীয় সূত্রটিই কিন্তু আবিষ্কৃত হয় আগে, 1824 সালে। আবিষ্কার করেন সাদি কার্নো। প্রথমটার বদলে দ্বিতীয়টা যে আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল, তার কারণ সেটাই ছিল যুগের দাবি। প্রতি টন কয়লা-পিছু একটা নির্দিষ্ট গড়নের এনজিন থেকে কতটা কার্য পাওয়া যাবে তার সীমা নির্ধারণ করে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটিই, প্রথমটি নয়। সেকালে এনজিনের এই *কার্যদক্ষতা* খুব বেশি হলে হতো পাঁচ শতাংশ।

তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি সমন্বয়-সাধনের একটা নীতি হাজির করল। বোঝা গেল, এতদিন যেসব প্রাকৃতিক শক্তিকে স্বতন্ত্র বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, যথা, জড়গতি, শব্দ, তাপ, আলোক, তড়িৎ, চুম্বকক্রিয়া, সেগুলিকে একই একক দিয়ে মাপা যায়—সে একক হলো শক্তি। এবং ব্রহ্মাণ্ডে শক্তির মোট পরিমাণ বাড়েও না কমেও না। এই সূত্রের মধ্যে যেন বহু যুগের ওপার থেকে শোনা গেল হেরাক্লিটাসের কণ্ঠ। পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'যেমন সোনার বদলে জিনিস পাওয়া যায়, জিনিসের বদলে সোনা'। বস্তুত, অবাধ বাণিজ্যের যে-নীতি তখন চালু, শক্তির নিত্যতার তত্ত্ব ছিল তারই এক ভৌত বহিঃপ্রকাশ। গতির নিত্যতা সম্পর্কে নিউটনের সূত্রই অপরূপভাবে বিস্তৃত হলো শক্তির নিত্যতা-সূত্রে। কিন্তু, নিউটনের সূত্রেরই মতো, এই সূত্রের মধ্যে বর্ধমান পরিবর্তনের কোনো ধারণার অস্তিত্ব ছিল না। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী অবশ্য পরিবর্তনের কথা এসেই পড়ে, তবে সে-পরিবর্তন বর্ধনমূলক নয়, অবক্ষয়ী। কারণ, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রে দেখানো হয়, যেকোনো বদ্ধ সিস্টেমে তাপ এবং শীতলতা অবশেষে একটা ঈষদুষ্ণ সমতায় এসে পৌঁছতে বাধ্য, এবং সে অবস্থায় আর কোনো শক্তি তা থেকে পাওয়া যাবে না।

বিবর্তনবাদ

এহেন ধারণা উনিশ শতকের বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রগতিবাদী ও আশাবাদী ধরনধারনের সঙ্গে খাপ খেলো না। *বিবর্তন*-তত্ত্বের মধ্যে এই শ্রেণী একটা প্রসন্ন বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়ে গেল। পৃথিবীর যে একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে এ ভাবনাটা নতুন নয়। আঠারো শতকেই এ ভাবনা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। তা সত্ত্বেও উনিশ শতকের গোড়াতে তা হালে পানি পায় নি পাদ্রী-সম্প্রদায়ের বিরোধিতায়। ঐ ভাবনার পাশাপাশি এই উপলব্ধিও এসেছিল যে প্রাণী ও উদ্ভিদদের চেহারা একদা তাদের বর্তমান চেহারা থেকে খুবই অন্যরকম ছিল, এবং এই ধারণাটা স্বভাবতই জন্ম নিয়েছিল যে তা যদি হয় তাহলে বর্তমানের চেহারাটা হয়তো আগেকার চেহারা থেকেই বিকশিত হয়েছে। গোটা উনিশ শতক জুড়ে খাল খনন করতে গিয়ে আর রেললাইন বসাতে গিয়ে হাতে যে-বিপুল পরিমাণ সাক্ষ্যপ্রমাণ জমা হয়েছিল, তার পর আর এ-ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা মেনে নেওয়ার পথ প্রায় ছিলই না। একই সময়ে, জীবিত প্রাণী ও উদ্ভিদের বিস্তারণ (distribution) ও বর্গীকরণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারায় 'বিশেষ সৃষ্টি'র তত্ত্বকে ক্রমশই কপোলকল্পিত বলে মনে হচ্ছিল। তৎসত্ত্বেও, লোকচক্ষুর অন্তরালে কয়েক প্রজন্ম ধরে অসীম ধৈর্য নিয়ে বছরের পর বছর কাজ করার পর তবেই ভূবিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানীরা প্রকাশ্যে তাঁদের বক্তব্য হাজির করতে পারলেন এবং জৈব বিবর্তনের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন। জৈব বিবর্তনের তত্ত্বের অতীব যন্ত্রণাদায়ক অনুসিদ্ধান্ত এই যে মানুষ জন্তুদেরই বংশধর। 1859-এ *Origin of Species*-এ যে আমূল নতুন ধারণা ব্যক্ত হলো তাতে কর্ণপাত করতে রাজি করানোর জন্য চার্লস ডারউইনের অন্তর্দৃষ্টি, দক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক খ্যাতি অপরিহার্য ছিল।

প্রণীত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই বিবর্তনতত্ত্ব হয়ে দাঁড়াল বৈজ্ঞানিক, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। প্রায় অজান্তেই ডারউইন প্রাণীজগৎ-সম্পর্কিত প্লেটোর 'আদর্শ রূপে'র (ideal forms) তত্ত্বকে যে-আঘাত হানলেন তা জড়জগতের ক্ষেত্রে গ্যালিলিও'র বৈপ্লবিক আঘাতের সঙ্গেই তুলনীয়। এবং ডারউইন কেবল বিবর্তনের কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি বিবর্তনের একটা প্রক্রিয়াও ব্যাখ্যা করলেন—যার নাম *প্রাকৃতিক নির্বাচন।* এর ফলে অ্যারিস্টটলীয় 'পরম কারণে'র (final cause) যে দার্শনিক সূত্র তার শেষতম যৌক্তিকতাটিও ধ্বংস হয়ে গেল। ধর্মতাত্ত্বিকরা বিশ্বকে এই পরম কারণের তত্ত্ব দিয়েই বুঝতেন, কাজেই ডারউইনের তত্ত্বকে তাঁরা যে প্রত্যাখ্যান করবেন এতে আর আশ্চর্যের কী আছে। তবে যে ব্যাপারটাতে তাঁরা একেবারে শিউরে উঠেছিলেন তা এই যে এতদিন ঈশ্বরের অনন্য সৃষ্টি বলে পরিগণিত মানুষকে ঐ তত্ত্ব এক অতীব পটু বনমানুষ বলে প্রমাণ করে ছাড়ল! কেবল ধর্মতত্ত্ব নয়, যুক্তিশাসিত দর্শনের শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধগুলোকেও যেন ধ্বংস করতে চাইল এই তত্ত্ব। তবে ধর্মতত্ত্ব আর যুক্তিশাসিত দর্শন উভয়েই এই ধাক্কা সামলে নিয়ে পেরেছিল অনায়াসেই।

সে সময় প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার লড়াইয়ের কেন্দ্রে ছিল এই বিবর্তন-তত্ত্ব। এ তত্ত্বের সমর্থক যেমন পাওয়া গেল, তেমনি শত্রুও মিলল অনেক। বিষয়ী শিল্পমালিকরা এর মধ্যে দিয়ে পেয়ে গেল একদিকে ভাবালু 'টোরি'দের, অন্যদিকে আদর্শবাদী সমাজতন্ত্রীদের ঘায়েল করবার উপযোগী এক অস্ত্র। অবাধ প্রতিযোগিতাকে যেন বিজ্ঞানসম্মত আশীর্বাদ জানাল বিবর্তন-তত্ত্ব। শুধু তাই নয়, *যোগ্যতমের উদ্বর্তনের* (survival of the fittest) ধারণাটি যেন ধনী ব্যক্তিদের বৈভবকে ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন করল। ডারউইনের মতামতের সত্যতা ক্রমেই অনস্বীকার্য হয়ে উঠল, এবং বিজ্ঞানীদের এক নতুন প্রজন্ম সোৎসাহ সমর্থন নিয়ে এর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

এই সময় থেকে বিজ্ঞানচর্চায় আবার খানিকটা বিদ্রোহী সুর শোনা যায়, তবে তখনো তা সমাজতান্ত্রিক চারিত্র্য থেকে বহুদূরে।

জন স্টুয়ার্ট মিল, ওগুস্ত্ কঁৎ (1798-1857) এবং হার্বার্ট স্পেন্সার (1860-1903)-এর মতানুসারী চিন্তাবিদরা যুক্তি ও বিজ্ঞানের কথা ব'লে ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক উদ্যোগকে ন্যায্য প্রমাণ করতে লাগলেন। তাঁরা এই বলে উনিশ শতকের গুণগান করতে লাগলেন যে এ-যুগেই মানুষ অবশেষে খুঁজে পেয়ে গেছে সঠিক রাস্তাটা; এখনো অবশ্য সর্ব বিষয়ে আদর্শ নয় এ-যুগ, অতীতের কিছু কিছু আবর্জনা এখনো রয়ে গেছে, তবে প্রগতি অবশ্যম্ভাবী। প্রগতি বলতে তাঁরা বিদ্যমান অবস্থাটারই বিস্তৃতিকে বোঝাতেন, অর্থাৎ আরো যন্ত্রপাতি, আরো আবিষ্কার, আরো সম্পদ এবং 'নিজ-উদ্যোগে' যোগ্য দরিদ্রের সৎভাবে উপার্জিত স্বাচ্ছন্দ্য—এরই নাম প্রগতি। 'নিজ-উদ্যোগ' (Self-help) কথাটা প্রথম যিনি বলেন সেই স্যামুয়েল স্মাইল্স (1812-1904) কিন্তু জীবনের শেষ দিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, নিছক 'নিজ-উদ্যোগ' দিয়ে চলবে না, আরো কিছুর প্রয়োজন আছে। স্মাইল্স তাই শ্রমিকদের করণকৌশল-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এক অগ্রণী পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন।

সমাজতন্ত্রের উদ্ভব

গরিবরা এ প্রগতির সুফল সম্পর্কে কী ভাবত, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল মধ্য-উনিশ শতকের চার্টিস্ট আন্দোলন এবং অন্যান্য বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে ও 1871-এ পারি কমিউনের অভ্যুত্থানের মধ্যে। গরিবদের দার্শনিক কার্ল মার্ক্সকে অবশ্য সে-যুগের আত্মতুষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রেণীগুলি নিজেদের চেতনাবলয়ের বাইরে সরিয়ে রেখেছিল। তবু, এঁদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত সৎ তাঁরা চোখকান খোলা রেখে বুঝতে পারছিলেন যে উনিশ শতকের এই সমৃদ্ধির একেবারে গোড়ায় রয়েছে মস্ত গলদ। শিল্পনগরীগুলির বীভৎসতার বিরুদ্ধে, সুন্দরের যে-সার্বিক বিকৃতি ঘটছিল তার বিরুদ্ধে, বড়োলোকিয়ানার অশ্লীলতার বিরুদ্ধে শিল্পী, কবি ও লেখকরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। এইসবের বিরোধিতা করতে গিয়ে বুদ্ধিজীবীরা সমর্থন খুঁজলেন 'আদর্শায়িত' এক মধ্যযুগের মধ্যে। কেবল্ (1792-1866) এবং অক্সফর্ড আন্দোলনের মধ্যে, ও রাস্কিন (1819-1900) এবং pre-raphaelite* দের মধ্যে যে-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল, পরে সেটাই উইলিয়ম মরিসের পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিকতার রূপ নেয়।

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি

শিল্পায়নকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে সাহিত্য ও চারুশিল্প -আন্দোলন বিজ্ঞানকেও বহুল পরিমাণে বর্জন করল। শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনে হয়েছিল যন্ত্র-উৎপাদনের সঙ্গে, এবং যা কিছু

* *অক্সফর্ড আন্দোলন*—1833-এ অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অ্যাংলিকান' পাদ্রীরা কতকগুলি প্রাচীন রোমান ক্যাথলিক মত ও উপাসনারীতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। পুরোধাদের অন্যতম ছিলেন জন কেবল্। পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের প্রবক্তারা সমাজজীবনে খ্রিস্টানদের দায়িত্বের ওপর এবং সামাজিক সমস্যার ওপর উত্তরোত্তর বেশি জোর দেন।

pre-raphaelite—ব্রিটিশ শিল্পকলার নিম্ন মানের প্রতিবাদে 1848-এ ইংরেজ শিল্পী ও কবিরা ঐ নামে এক আন্দোলন শুরু করেন। কবিতার প্রতীক ও চিত্রকল্পের আশ্রয় নিয়ে এবং চিত্রে প্রাক্-রাফায়েলযুগের সুখী নিশ্চিন্ততার অনুকরণ ক'রে তাঁরা শিল্পোন্নত ইংলন্ডের কুশ্রীতাকে পরিত্যাগ ক'রে আশ্রয় নিতে চান মধ্যযুগীয় 'সরলতা'য়। 1850-এর দশকের গোড়ায় চার্লস ডিকেন্স এঁদের স্থূল এবং কুৎসিত বলে আক্রমণ করেন। জন রাস্কিন তখন এঁদের পক্ষ নেন। উইলিয়ম মরিসও এই দলে যোগ দেন। এ-আন্দোলন দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

—অনুবাদক

যন্ত্র-উৎপাদনের পরিণাম সেসবের সঙ্গেই বিজ্ঞানের সম্পর্ক ওতপ্রোত। এ ধারণা যে একেবারেই ভুল, তা বলা যায় না। মধ্য-উনিশ শতকের এই সময় থেকেই বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মানবিকবিদ্যার চর্চাকারীদের বিচ্ছেদটা গুরুতর হয়ে ওঠে। এ-বিচ্ছেদ আমাদের যুগেরই এক বিশিষ্ট লক্ষণ। এর ফলে বুদ্ধিজীবীদের দুই দলের মধ্যে সহযোগিতা ব্যাহত হলো। অথচ সে-সহযোগিতা না থাকলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার কোনো গঠনমূলক সমালোচনা সম্ভব হয় না। ফলে হলো কী, মানবিকবিদ্যার চর্চাকারীরা বিজ্ঞানের কর্মধারা সম্পর্কে যথেষ্ট না জেনে নিষ্ফল আবেগের দ্বারা চালিত হলেন; অপরদিকে বিজ্ঞানীরা শিল্প, সৌন্দর্য, সামাজিক ন্যায়, অর্থাৎ যা কিছু তাঁদের অতিবিশেষীভূত কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়, তা থেকে সচেতনভাবেই নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তাঁদের অনুভূতি হয়ে উঠল ভোঁতা।

7. উনিশ শতকের অন্তিম পর্ব

উনিশ শতকের ষাট দশকের শেষের দিক থেকেই পুঁজিতন্ত্রের একমুখী, আশাবাদী প্রথম পর্বের শেষ ঘনিয়ে আসছিল। সত্তর দশকে দেখা দিল প্রবল মন্দা। পুঁজিতন্ত্রের অবাধ-বাণিজ্য যুগ আর লগ্নী-পুঁজির যুগের মধ্যবর্তী এক উত্তরণের পর্ব ছিল এই মন্দার কাল। অবাধ বাণিজ্যের যুগে ব্রিটেনই ছিল সারা পৃথিবীর কর্মশালা। কিন্তু লগ্নী-পুঁজির ভিত্তি ছিল অনেক বিস্তৃত। সংরক্ষিত বাজারের সুযোগ নিয়ে ফ্রান্স, জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করেছিল। শিল্পবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে উৎপাদিকা শক্তির যে প্রকাণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে, ততদিনে মালিকদের সামনে তা একটা সমস্যা হাজির করেছিল—হস্তান্তরযোগ্য উদ্বৃত্ত (disposable surplus) ক্রমাগত জমে ওঠার সমস্যা। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই উদ্বৃত্ত যে উৎপাদকের—অর্থাৎ শ্রমিকদের—হাতে ফিরে যাবে সেটা সম্ভব নয়। কাজেই ঐ উদ্বৃত্ত বিনিয়োজিত হলো উৎপাদনেই, ফলে উৎপাদন আরো বেড়ে গেল। এবার বর্ধিত উৎপাদনের জন্য হন্যে হয়ে সারা পৃথিবীতে চলল বাজারের সন্ধান। শিগগিরই যখন সব বাজার দখল করা হয়ে গেল, তখন শুরু হলো ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ। চলল ছোটোখাটো যুদ্ধবিগ্রহ। বড়ো আকারের যুদ্ধ, যা দেখা দেবে বিশ শতকে, তার জন্য চলল প্রস্তুতি।

উত্তরণের পর্ব হিসেবে এই সময়কালকে আলাদা করে চিহ্নিত করা শক্ত, বিশেষত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। আজকে অবশ্য পিছন ফিরে তাকিয়ে সে কাজটা করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ সেই সময়ে পরিবর্তন ঘটেছে ধীরগতিতে, একটানা; তার মধ্যে তেমন কোনো ছেদ পড়েনি। সেই যুগে যাঁরা জীবন কাটিয়েছিলেন তাঁদের মনে হয়েছিল, বিজ্ঞান উত্তরোত্তর দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তবে তাঁদের মনে সন্দেহ জেগেছিল: বিজ্ঞানের প্রয়োগ মানুষকে অপ্রতিহত মঙ্গল ও প্রগতির পথেই নিয়ে চলেছে কি? আজকে ফিরে তাকিয়ে আমাদের মনে হয়, শেষ-উনিশ শতক ছিল একই সঙ্গে সমাপ্তির এবং আরম্ভের কাল। একদিকে নিউটনীয় যুগের বিপুল বৈজ্ঞানিক প্রণোদনার এক শান্ত পরিণতি; অন্যদিকে বিশ শতকের উত্তাল বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবগুলির প্রস্তুতি—এ দুটোই সে সময়ের বৈশিষ্ট্য।

শিল্পের ক্ষেত্রেও এই পর্বটি উত্তরণের। পুরোনো শিল্পগুলো ব্রিটেনে অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে এবং জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতি দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করছিল। কিন্তু তাদের প্রকৃতিতে এসেছিল একটা পরিবর্তন। পারিবারিক মালিকানাধীন ছোটো ছোটো সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে তৈরি হয় বড়ো বড়ো জয়েন্ট-স্টক কম্প্যানি। পরে বিশ শতকে এইগুলোই পরিণতি লাভ করে দানবাকৃতি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহে। এই উত্তরণটা বিশেষ করে লক্ষ্য করা গেল ধাতু ও এনজিনিয়ারিং শিল্পে, এবং আরো বেশি করে রসায়ন-নির্ভর ও

তড়িৎ-নির্ভর নতুন নতুন শিল্পে। নতুন এই শিল্পগুলির উদ্ভব ছিল সম্পূর্ণতই বিজ্ঞান-নির্ভর। এইসব শিল্পের বিকাশ ঘটায় এই প্রথম দেখা পাওয়া গেল কেলভিন, এডিসন, সীমেন্‌স, ব্রুনার-এর মতো মানুষদের—যাঁরা কেউই ব্যবসাজগৎ থেকে বিজ্ঞানের জগতে আসেন নি, বিজ্ঞানজগৎ থেকেই ব্যবসার জগতে গেছেন।

এবং এই প্রথম বিজ্ঞানকে বড়ো আকারে যুদ্ধের কাজে লাগানো হলো। তৈরি হলো ডুবোজাহাজ, টর্পেডো, শক্তিশালী বিস্ফোরক, বড়ো বড়ো কামান। যুদ্ধপ্রক্রিয়া যন্ত্রনির্ভর হয়ে উঠতে শুরু করল। এই সময়ের, অর্থাৎ শেষ-উনিশ শতকের প্রধান শিল্পগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: শস্তায় ইস্পাত উৎপাদন এবং বিদ্যুৎক্ষমতার প্রবর্তন। যে 'অন্তর্দহন এনজিন' বিশ শতকে পরিবহনের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দেবে, তারও সূত্রপাত এই সময়েই। আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো বিজ্ঞানসম্মত ঔষধের প্রবর্তন। এরই কল্যাণে ছোঁয়াচে রোগগুলোকে ঠেকানো গেল এবং তার ফলে প্রাচ্য দেশগুলির সম্পদ কাজে লাগানো সম্ভব হয়ে উঠল। এর চূড়ান্ত পরিণাম অবশ্য খুবই গুরুতর হয়েছিল।

ইস্পাত-যুগ

বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে প্রচলিত লৌহ-শিল্পকে পরিবর্তিত করে নেওয়ার প্রথম পদক্ষেপটি অনেক আগেই গ্রহণ করেছিলেন *বেসেমার* (1813-98)। তিনি স্বয়ং ছিলেন এক বিজ্ঞানমনস্ক প্রস্তুতকারক, যদিও তিনি মোটেই লৌহ-শিল্পজগতের মানুষ ছিলেন না। 1854 সালেই বেসেমার দেখিয়েছিলেন যে তাঁর প্রবর্তিত 'কনভার্টার' ব্যবহার করে শস্তায় প্রচুর পরিমাণ ইস্পাত তৈরি করা যায়। তা সত্ত্বেও যে ঐ 'কনভার্টার' খুব বেশি ব্যবহার করা হয়নি তার কারণ উচ্চমানের আকরিক ছাড়া ওটা ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। 1879-তে গিলক্রাইস্ট টমাস ক্ষারীয় প্রলেপযুক্ত 'ওপ্‌ন-হার্থ চুল্লি'র প্রবর্তন করেন। এই চুল্লিতে নিম্ন মানের আকরিক ব্যবহার করেও ইস্পাত তৈরি করা যায়। এই সময় থেকে ইস্পাতের উৎপাদন হু হু করে বেড়ে চলে। তবে ইতিহাসের দিক থেকে আরো তাৎপর্যময় ঘটনা এই যে, এর ফলে ভারি শিল্পের ভৌগোলিক ভরকেন্দ্র বদলে গেল। ক্ষারীয় ওপ্‌ন-হার্থ পদ্ধতি চালু হওয়ায় এখন লরেন* অঞ্চলের ফসফেট-সমৃদ্ধ আকরিকের অবক্ষেপগুলি (deposits) ইস্পাত-উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হতে লাগল। 1870-এ ফ্রান্সের সঙ্গে সদ্য-শিল্পায়িত প্রাশিয়ার যে যুদ্ধ হয় তাতে জয়লাভ করে প্রাশিয়া; সেই সফল যুদ্ধপ্রয়াসের মধ্যে দিয়েই লরেন-এর আকরিক অবক্ষেপগুলি সংযুক্ত হয়ে যায় রূঢ় (Ruhr) অঞ্চলের কয়লার সঙ্গে।

জার্মান শিল্পের অভ্যুদয়

এই সময় থেকে ইউরোপে ইস্পাত উৎপাদনের এমন এক কেন্দ্র তৈরি হয়ে গেল যা দ্রুত ব্রিটেনের সমকক্ষ হয়ে উঠবে, এমনকি ব্রিটেনের চেয়েও উন্নত হয়ে উঠবে। এই ইস্পাত-শিল্পের ভিত্তিতেই আবার গড়ে উঠল নতুন এক শিল্প, যা ব্রিটেনের তুলনায় বেশি সুসংগঠিত এবং যার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঢের বেশি ঘনিষ্ঠ। বিচিত্রমুখী ও প্রতিযোগিতায়-অগ্রসর শিল্পসমূহের কল্যাণে, বিশেষত পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলগুলির ওপর আধিপত্যের দৌলতে বিশ্ববাজারে

* 1871-এর আগে প· জার্মানির সীমান্তবর্তী লরেন ছিল ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত। ফ্রান্স-প্রাশিয়া যুদ্ধের পর লরেন-এর পূর্ব অংশ জার্মানির দখলে চলে আসে। আলসাস-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আল্‌সাস-লরেন 'সাম্রাজ্যের অধীন এলাকা' বলে গণ্য হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আল্‌সাস-লরেন ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানি আবার তা দখল করে নেয়। 1945-এর জানুয়ারীতে ফরাসি ও মার্কিন সেনাবাহিনী আল্‌সাস-লরেনকে মুক্ত করে। দুটি মহাযুদ্ধেই এই অঞ্চলটি প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

—অনুবাদক

ব্রিটেনের প্রাধান্য বজায় রইল ঠিকই, কিন্তু সে-প্রাধান্যের মাত্রা ক্রমশ কমে আসছিল।

এ অবস্থায় দ্বন্দ্ব বাধা ছিল অবধারিত। বিশ শতকের যুদ্ধগুলোর মূলে ছিল এই দ্বন্দ্ব। শস্তায় যেহেতু ইস্পাত তৈরি হচ্ছিল, অতএব দ্বন্দ্ব বাধল রেললাইন, লোকোমোটিভ, কৃষি ও আকরখনন-যন্ত্র (যা নতুন এলাকা দখলের জন্য প্রয়োজন) প্রভৃতি মূলধনী সামগ্রীর রপ্তানী নিয়ে। মধ্য-উনিশ শতকে উপনিবেশবাদ নির্ভর করত বস্ত্র, টুকিটাকি শৌখীন জিনিসপত্র, ছোটো অস্ত্র ও লোহা-লক্কড়ের ওপর। এখন, শেষ-উনিশ শতকে এর সঙ্গে যুক্ত হলো এইসব মূলধনী সামগ্রী। রপ্তানী করার পর ইস্পাতের, বিশেষত নব-প্রবর্তিত সংকর-ইস্পাতের যেটুকু পড়ে থাকত তাই দিয়ে তৈরি হতো যুদ্ধজাহাজ আর বড়ো বড়ো কামান। আমরা আগেই দেখেছি, মধ্য-উনিশ শতকে যোগাযোগ-ব্যবস্থায় যে-বিপ্লব এসেছিল তার মূলে বিদ্যুতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফ্যারাডে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের ঘটনাটি আবিষ্কার করেন এবং 1831-এ বৈদ্যুতিক 'ডাইনা-মোটরে'র ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। যান্ত্রিক বল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা, এবং তার মাধ্যমে ক্ষমতা সঞ্চালন করা যে সম্ভব, ঐ আবিষ্কারের পর সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কিন্তু পঞ্চাশ বছর ধরে এটাকে কাজে লাগানো হয়নি। তার কারণটা যতটা না প্রযুক্তিগত, তার থেকে বেশি অর্থনৈতিক। একটু পরেই আমরা আলোচনা করব এ নিয়ে। মধ্য-উনিশ শতকে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো অপেক্ষাকৃত বড়ো আকারের কেন্দ্রীভূত power-ইউনিট, যথা কারখানার জন্য স্থায়ীভাবে-বসানো বাষ্পীয় এনজিন কিংবা যান চালনার জন্য লোকোমোটিভ বা নৌ-এনজিন। বহু দূরবর্তী কোনো জায়গায় পাওয়ার প্রেরণের একমাত্র উপায় ছিল জলপথে কয়লা পাঠানো। কিন্তু পরে, গৌণ শিল্পগুলো যখন উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায় যন্ত্রনির্ভর হয়ে উঠতে লাগল, ততই চাপ এল অপেক্ষাকৃত ছোটো আকারের power-ইউনিট উদ্ভাবনের জন্য। বাষ্পক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সহজে ছোটো ইউনিট তৈরি করা সম্ভব ছিল না। সমাধান হিসেবে প্রথমে এল গ্যাস-এনজিন। এটাই ছিল প্রথম কার্যকর ইন্টার্নাল কম্‌বাস্‌শন এনজিন। বিশ শতকে তৈল ও পেট্রল-এনজিনের যে ব্যবহার পরিবহনব্যবস্থাকে আমূল বদলে দেবে, এই এনজিন ছিল তার অগ্রদূত।

শিল্পোৎপাদনের জন্য স্থায়ীভাবে বসানো ছোটো আকারের power-ইউনিটের প্রয়োজন অনেক সুষ্ঠুভাবে মিটিয়ে দিল বৈদ্যুতিক মোটর। তবে এর প্রকৃত উপযোগিতা নির্ভর করছিল বিদ্যুৎ-সরবরাহব্যবস্থার ব্যাপ্তির ওপর। এই ব্যাপ্তির জন্য শুধু শিল্পোৎপাদনের চাহিদাই যথেষ্ট ছিল না, প্রয়োজন ছিল আরো ব্যাপক এবং সর্বজনীন চাহিদার। গার্হস্থ্য প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ ছিল এমনই এক সর্বজনীন চাহিদা। উনিশ শতকে একে একে জল ও গ্যাস-সরবরাহ এবং পরে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন-ব্যবস্থা চালু হয়। তারপর টেলিগ্রাফ-সংস্থাতেই কর্মরত এক উদ্যোগী কেরানী অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের বহু পিছনে ফেলে রেখে এইরকমের আরেকটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার পথ দেখালেন—বিজলী আলো। উদ্যোগী কেরানীটির নাম টমাস আলভা এডিসন (1847-1931)।

আলোর জন্য বিদ্যুৎ 'তৈরি' ও 'বণ্টন' একবার শুরু হয়ে যাওয়ার পর, পাওয়ারের প্রয়োজন মেটাবার জন্যও বিদ্যুৎকে ব্যবহার না-করার আর কোনো কারণ রইল না। শিল্প ও পরিবহনের জন্য পাওয়ার বণ্টনের এক নতুন সর্বজনীন ও শস্তা উপায় এইভাবে খুঁজে পাওয়া গেল। বিশ শতকের আগে অবশ্য এই উপায়টিকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়নি। এইসবের ফলে জন্ম হলো ভারি বৈদ্যুতিক শিল্পের। সাবেকী শিল্পগুলোর সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে একেবারে গোড়া থেকেই এই শিল্প ছিল একচেটিয়া মালিকানাধীন ও বিজ্ঞাননির্ভর। বিকাশমান অন্যান্য একচেটিয়া শিল্পক্ষেত্রগুলির, যথা ভারি এনজিনিয়ারিং ও টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন-শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল বৈদ্যুতিক ভারি শিল্প। বিজ্ঞানের দিক থেকে এর আরেকটি মুখ্য

তাৎপর্য ছিল: শিল্প-সংশ্লিষ্ট গবেষণাগার সৃষ্টি। এডিসন-এর মেন্‌লো পার্ক গোড়াতে ছিল তাঁর উদ্‌ভাবনগুলি পরীক্ষা করে দেখবার অঙ্গন। এই মেন্‌লো পার্ক-ই বুঝিয়ে দিল, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পরীক্ষানিরীক্ষা ক্রমাগত চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন কতখানি।

বিজ্ঞাননির্ভর ওষুধ

এইসব অগ্রগতি মানুষের নিয়ন্ত্রণযোগ্য বাস্তব পরিবেশটাকে বদলে দিচ্ছিল। কিন্তু এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনাটা ঘটতে চলেছিল সেটা হচ্ছে বিজ্ঞাননির্ভর ভেষজের সূত্রপাত। এর জন্যে এতটা যে দেরি হলো তার কারণ, যন্ত্র বা রসায়নিক প্রক্রিয়া যতই কেন জটিল হোক, জীবিত প্রাণীর গঠন তার থেকে বহু বহু গুণে জটিল; আর সেই অতি জটিল গঠনকে আগে বুঝতে না পারলে রোগভোগের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো সম্ভব নয়।

একটা রহস্য এবং একটা পেশারূপে ভেষজবিদ্যার অস্তিত্ব সভ্যতার উষাকাল থেকেই রয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে শারীরস্থান (anatomy) ও শারীরবৃত্ত (physiology) সম্পর্কে জ্ঞান অনেক বাড়লেও, রোগীর যন্ত্রণা ও উৎকণ্ঠা খানিকটা কমানো কিংবা মোটামুটি সঠিকভাবে রোগের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা ছাড়া চিকিৎসকের বিশেষ কিছুই করবার ছিল না। মানুষের অধিকাংশ রোগ যেহেতু আপনিই সেরে যায়, কাজেই চিকিৎসকের যত্নই অবশ্য সাধারণত ফলপ্রসূ হতো। Pharmacopoeia (ঔষধ-তালিকা)-তে যে বিশাল সংখ্যক ওষুধের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি সংগৃহীত হয়েছিল একদিকে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত মূল ওষধিগুলি থেকে (যার ভিত্তি ছিল টোটকা ওষুধ এবং মন্ত্রতন্ত্র); অন্যদিকে রেনেসাঁস যুগে প্যারাসেল্‌সস কর্তৃক প্রবর্তিত যন্ত্রণাদায়ক ধাতব ওষুধগুলি থেকে। এর বেশির ভাগই ছিল অকেজো।

কখনো-সখনো, রোগ প্রতিষেধের দুটো-একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেহাৎই সৌভাগ্যক্রমে জানা হয়ে গিয়েছিল। যেমন, ম্যালেরিয়ায় কুইনিন ব্যবহার, বা গুটিবসন্তে টিকা দেওয়া। কিন্তু যথাযোগ্য পরীক্ষানিরীক্ষার বা তত্ত্বের অভাবে এগুলির সাধারণীকরণ সম্ভব হয় নি। পরে আমরা দেখব, অ্যানথ্রাক্স, জলাতঙ্ক, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি কালরোগ যে শরীরের ওপর বহিরাগত সজীব 'প্রাণী'-দের আক্রমণেরই পরিণাম, সেটা গাঁজানোর এবং সুরাকরণের প্রাচীন জীববৈজ্ঞানিক শিল্পে রসায়নের প্রয়োগ ঘটল বলেই জানা সম্ভব হয়েছিল। এটা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সংক্রমণ রোধের পদ্ধতিটাও জানা হয়ে যায়। এবং তার থেকেও বড়ো কথা, রোগ হবার আগেই রোগ-প্রতিষেধের পদ্ধতিটাও জানা হয়ে গেল।

এই সময় থেকে, অন্তত তত্ত্বগতভাবে, অসুখকে দমন করার রাস্তাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। একেবারে প্রাথমিক স্তরেও এটুকু বোঝা গেল যে মানুষ এতদিন যাকে নিয়ন্ত্রণের অতীত বলে হাল ছেড়ে দিয়েছিল, 'কপালের মার', 'অদৃষ্ট', 'ভাগ্য' বলে মেনে নিয়েছিল, বিজ্ঞানের সহায়তায় সে অবশ্যই তাকে জয় করতে পারে। আর সব কিছু যদি ছেড়েও দিই, কেবল এইটুকুর মধ্যেই তো বিজ্ঞান আপন যৌক্তিকতার প্রমাণ রেখেছিল। নবীন চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই অগ্রগতিই আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল শিল্পজ বা ঔপনিবেশিক দারিদ্র্যের চেহারাটা—যে-দারিদ্র্যের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আপাত-সমৃদ্ধ, আপাত-শক্তিশালী এই সভ্যতা। অসুখের আসল কারণ তো রোগজীবাণু নয়; যে-অবস্থার মধ্যে ঐ জীবাণুরা জন্মায় ও ছড়িয়ে পড়ে সেই অবস্থাটাই অসুখের জন্য দায়ী। কোনো টিকা, কোনো প্রতিষেধকের সাধ্য নেই এই অমঙ্গলকে দূর করতে পারে, কারণ খোদ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটার মধ্যেই রয়ে গেছে এর মূল।

উপনিবেশ দখলের প্রতিযোগিতা

উনিশ শতকের শেষে শিল্পোন্নত ইউরোপের জনসংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছিল যে তা আর স্বয়ংভর ছিল না। পূর্ব ইউরোপ, বিশেষত রাশিয়া থেকে, এবং আমেরিকা থেকে ক্রমশই বেশি পরিমাণে খাদ্য ও কাঁচামাল আমদানি করতে হচ্ছিল। এই চাহিদার ফলেই কৃষিকাজ, খাদ্য-সংরক্ষণ ও খাদ্য পরিবহনের পদ্ধতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটল। কৃষি-যন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে একর-পিছু না হোক, মাথা-পিছু কৃষি-উৎপাদন প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল। এটা বিশেষ করে প্রযোজ্য ছিল অল্প-জনবসতিপূর্ণ খোলা এলাকার ক্ষেত্রে। স্বভাবতই এর প্রয়োগ ঘটল আমেরিকায়; কিন্তু পূর্ব ইউরোপের বা এশিয়ার তখনো-সামন্ততান্ত্রিক গ্রামজীবনে এর প্রয়োগ ঘটল না।

কৃষি-যন্ত্রের প্রবর্তন এবং আনুষঙ্গিক রেল ও জাহাজ-পরিবহনব্যবস্থা মানুষের সঙ্গে খাদ্য-সরবরাহের সম্পর্কটাকে আমূল বদলে দিল। তার আগে, আঠারো শতকে নানা উন্নতি ঘটা সত্ত্বেও, উৎপাদিত খাদ্যের শতকরা আশি থেকে পঁচানব্বই ভাগই উৎপাদনের এলাকাতেই ব্যবহার করা হতো। শহরের শ্রমিকরা এবং নিষ্কর্মা ধনীরা বরাবরই ছিল নিতান্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ; খাদ্যের বাকি পাঁচ থেকে কুড়ি শতাংশতেই তাদের প্রয়োজন মিটে যেত। সতেরো শতকের হল্যান্ডের মতো বাণিজ্যনির্ভর দেশ, কিংবা উনিশ শতকের ব্রিটেনের মতো ম্যানুফ্যাকচার-নির্ভর দেশের শহরগুলোর বিপুল সংখ্যক লোকের খাদ্য বরাবরই আসত সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের কোটি কোটি কৃষি-উৎপাদকদের সামান্য সামান্য উদ্বৃত্ত থেকে। কিন্তু এখন ভূমি-শ্রমিকরা সংখ্যায় অনেক কমে যাওয়া সত্ত্বেও কৃষি-যন্ত্রাদি ব্যবহার করার দরুন তাদের কাছ থেকে শহরের জন্য যে-পরিমাণ উদ্বৃত্ত পাওয়া যেতে লাগল সেটা এতদিন ছিল অকল্পনীয়। প্রথমে এ-ব্যাপারটা ঘটল কেবল দানাশস্যের ক্ষেত্রে। মাংস বা মাছ শহরে বেশি করে মজুত করার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ল হিমায়নের (refrigeration) এবং টিনবন্দী করে রাখার কৌশল। ব্যাপক মাত্রায় ভৌত, রসায়নিক ও জীববৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নতি ছাড়া এই সব কৌশল উদ্‌ভাবন করা সম্ভব ছিল না।

প্রধানত অনাবাদী জমিতেই যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতে লাগল। এর সঙ্গে তখনকার ব্যাপক আকরখননের উদ্যোগের যথেষ্ট মিল ছিল। অবশ্য আকরখননের চেয়ে অনেক বড়ো এলাকা জুড়ে একাজ করা হতো, এবং তার ফলে এর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াও ছিল অনেক ব্যাপক। জমির অতিব্যবহারের কুফলকে তখনকার মতো কোনোরকমে ঠেকানো গেল কৃত্রিম সার ব্যবহার করে। কিন্তু পরবর্তী শতকে জমির সাংঘাতিক ক্ষয়ীভবনের রাস্তা খোলা রইল।

মূলত কৃষি-যন্ত্রাদি এবং পরিবহনের জন্য ইস্পাত ব্যবহার করার ফলেই প্রথমে কৃষিতে এবং পরে শিল্পক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের ও প্রাচ্যের জমি কাজে লাগানো সম্ভব হয়। এই উদ্‌যোগেই বনেদী দেশগুলোর লগ্নী-পুঁজি সবচেয়ে লাভজনকভাবে বিনিয়োজিত হলো। তবে এইসব বিনিয়োগের পরিণাম প্রাচ্যে হয়েছিল একরকম, পাশ্চাত্যে আরেকরকম। গোড়া থেকেই উত্তর আমেরিকা ছিল বুর্জোয়াদের উপনিবেশ, এবং গৃহযুদ্ধের আগে থেকেই সেখানে জন্ম নিচ্ছিল স্থানীয় পুঁজিপতিরা। আমেরিকার যে-সম্পদ আগে কাজে লাগানো হয় নি তাকে, এবং ইউরোপ থেকে আগত কোটি কোটি গরিব উদ্বাস্তুদের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় পুঁজিপতিরা ধনী হয়ে উঠছিল। দুপঁ, অ্যাস্টর, রকিফেলার, মর্গ্যান-দের দল অচিরেই তাঁদের ইউরোপীয় পূর্বসূরীদের তুলনায় অনেক বেশি সম্পদ ও ক্ষমতা আহরণ ক'রে যুক্তরাষ্ট্রকে পুঁজিতন্ত্রের দুর্গে পরিণত করেছিলেন।

অপরদিকে স্বৈরতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্টাংশ এবং ব্রিটিশ, ফরাসি ও জার্মান পুঁজিপতিদের

তীব্র শোষণ—এই সব কিছু মিলে রাশিয়ার অগ্রগতিকে কিছুকালের মতো ঠেকিয়ে রাখল। তারপর অবশ্য বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এসব ভেসে যাওয়া মাত্র পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তনের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রাচ্যে ভারত রইল সরাসরি শোষণের, এবং চীন রইল পরোক্ষ শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে। কিন্তু জাপানকে—একমাত্র জাপানকেই—গড়ে উঠতে দেওয়া হলো স্থানীয় পুঁজিতন্ত্রের সুসভ্য আদর্শ হিসেবে। জাপানে দেখা গেল নব্য 'পাশ্চাত্য' সংস্কৃতির সমস্ত বাহ্য লক্ষণ—বিজ্ঞানসমেত। কিন্তু সেগুলিকে কাজে লাগানো হলো সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির ওপর এক অপ্রতিহত, লুণ্ঠনকারী, যুদ্ধবাজ রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য।

৪. শেষ-উনিশ শতকে বিজ্ঞান

সময়ের পরিসর হিসেবে শেষ-উনিশ শতক এত ছোটো, এবং এইটুকু সময়ের মধ্যে ব্যবহারিক সাফল্য এত বেশি অর্জিত হয়েছে যে এই সময়ে খুব বড়ো কোনো তত্ত্বীয় অগ্রগতি হওয়াটা তেমন প্রত্যাশিত নয়। ভৌত বিজ্ঞানের দিক থেকে এটি ছিল প্রধানত এক উত্তরণের কাল। ভৌত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যে বিরাট অগ্রগতি হয়েছিল তা এই সময়ে পরিণতি পায়; আবার একই সঙ্গে এই সময়ে এমন কতকগুলি নতুন অনুসন্ধান শুরু হয় যা পরে বিশ শতকে প্রচণ্ড বিস্ফোরক অগ্রগতি নিয়ে আসে। অপরদিকে, জীবাণুবিদ্যার চর্চা ও শারীরবৃত্ত সম্পর্কে ভৌত-রসায়নিক জ্ঞানলাভের প্রয়াস এই সময়ে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন পথ খুলে দেয়।

আলোকের তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব

পদার্থবিদ্যায় এই পর্বের প্রধান কীর্তি হলো, ম্যাক্সওয়েল-প্রণীত *আলোকের তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব*। পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যথা তড়িৎ, চুম্বকক্রিয়া এবং আলোকবিদ্যায়, আগের দুটি প্রজন্ম ধরে যেসব পরীক্ষা হয়েছে, যেসব তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে, তাদের ফলসমূহ একত্রিত হলো এই সুসংহত তত্ত্বের মধ্যে; একটি সরল গাণিতিক সূত্রে এগুলিকে প্রকাশ করা গেল। যদিও এ তত্ত্ব গণিতীয় পদার্থবিদ্যারই এক বিজয়কেতন, তবু এ-কে যাচাই করে নেবার জন্য অপরিহার্য ছিল তড়িতের নিখুঁত এককের উদ্ভব—যা বৈদ্যুতিক শিল্পবিকাশের প্রয়োজনেই চালু হয়েছিল। অপর দিকে, ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলির তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপরেই পরে গড়ে ওঠে বৈদ্যুতিক এনজিনিয়ারিং। তত্ত্ব ও প্রয়োগের কী বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া!

তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব মানুষের এক গৌরবময় বিজয়মুকুট। ফ্যারাডের স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠল এ-তত্ত্বের মধ্যে। ফ্যারাডে মনে করতেন, এটা প্রমাণ করা সম্ভব যে প্রকৃতির সব কটি শক্তিই পরস্পর-সম্পর্কিত। তিনি একথাও মনে করতেন যে তাপগতিবিদ্যার সূত্রগুলিকে এগুলির সঙ্গে মেলালে পদার্থবিদ্যার এক চূড়ান্ত সম্পূর্ণতার পর্যায়ে উপনীত হওয়া যাবে (তাঁর এই ধারণাটিকে অবশ্য একেবারে তছনছ করে দেবে বিশ শতক)। তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব এক নতুন দিক খুলে দিল। কারণ তত্ত্বগত দিক থেকে তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গের অস্তিত্ব যে নিশ্চিত, এই ভাবনাটাই ছিল এর কেন্দ্রীয় ধারণা। আর এই কেন্দ্রীয় ধারণাটির দ্বারা চালিত হয়েই হার্ৎজ 1888-তে পরীক্ষার মাধ্যমে তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখান। তারই ফলে এর বাস্তব প্রয়োগ ঘটে বেতার টেলিগ্রাফে, এবং তার মাধ্যমে আরো অনেক কিছুতে।

'পীরিয়ডিক টেব্‌ল'

রসায়নে এই পর্বের অন্যতম প্রধান অবদান হলো মেন্‌ডেলীয়েভ্‌-এর পর্যায়সারনী (*পীরিয়ডিক টেব্‌ল*)। 1869-এ প্রণীত এই ধারণাটিও সেকালে মূলগতভাবে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন

জড়পদার্থের সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ প্রতিপন্ন করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু এর সত্যিকারের তাৎপর্য বোঝা গেল পরে, যখন জানা গেল যে জড়পদার্থ কতকগুলি অক্ষয় পরমাণু কণা দিয়ে তৈরি নয়, তা তৈরি হয় কয়েকটি মৌল কণার অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী সমাবেশের দ্বারা, এবং ঐ মৌল কণাগুলি নিজেরাই পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হতে পারে। মেন্‌ডেলীয়েভ ছিলেন পরমাণু জগতের কোপার্নিকাস; সে-জগতের গ্যালিলিও আর নিউটন তখনো অনাগত।

জৈব রসায়ন প্রথমে পরমাণু-তত্ত্বকে স্বীকার করতে চায়নি, ফলে কিছু বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল। সে বিভ্রান্তি কেটে যাওয়ার পর জৈব-রসায়নে দেখা গেল অসামান্য এবং সুসংবদ্ধ অগ্রগতি। প্রাকৃতিক পদার্থের গঠনকে ব্যাখ্যা করার কাজে, বিশেষত নতুন নতুন পদার্থ কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষ করার কাজে এই সময়ের জৈব রসায়নের সাফল্য চমকপ্রদ। এই শতকের শেষে রসায়ন-গবেষণার সঙ্গে রসায়ন-নির্ভর নব্য শিল্পের গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। রসায়ন-নির্ভর শিল্প এবার কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষিত রঞ্জকের ক্ষেত্র থেকে কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষিত ভেষজের ক্ষেত্রে তার জয়পতাকা উড়িয়ে দিল। রসায়নবিদদের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে বিজ্ঞানকর্মীদের মোট সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি ছিলেন রসায়নবিদ।

গবেষণাগার

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের উপযোগিতা এইভাবে বেড়ে যাওয়ায় বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞান-সংগঠনেরও ব্যাপক বিস্তার ঘটানোর প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য একমাত্র যে নতুন উদ্‌ভাবনটি ঘটল তা হলো শিল্পসংশ্লিষ্ট গবেষণামূলক পরীক্ষাগার। তবে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়-গবেষণাগারগুলিরও বিস্তৃতি ঘটতে থাকায় চাকরি পাবার সুযোগ অনেক বেড়ে যায় এবং ছাত্ররা অনেক বেশি সংখ্যায় বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। কাজেই যতই বলা হোক যে এ পর্বের সারস্বত বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে শিল্পে-প্রযুক্ত বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই, ঘটনা এই যে সারস্বত বিজ্ঞানচর্চা শেষ পর্যন্ত শিল্পে-প্রযুক্ত বিজ্ঞানের সাফল্যের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। তবে যতদিন পর্যন্ত সারস্বত বিজ্ঞান রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রচলিত সংস্কারের গণ্ডিকে খাতির করে চলল, ততদিন তার স্বাধীনতায় তেমন বাধা আসেনি।

জার্মান বিজ্ঞানের প্রাধান্য

জার্মানিতেই এর সবচেয়ে ব্যাপক বিস্তার ঘটল। বিশ্ববিদ্যালযেব সদ্য-স্থাপিত *Technische Hochschulen*(টেকনিক্যাল হাইস্কুল)-এর সংখ্যা এবং অসংখ্য *Zeitschriften* (পত্রপত্রিকা) ও *Handbucher* (হ্যান্ডবুক)-এর দৌলতে জার্মানি শেষ-উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাধান্য বিস্তার করল। নিজ নিজ গৌরবময় ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর ক'রে ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই প্রবণতাকে রুখবার চেষ্টা করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্মান ভাষাই বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক ভাষা হয়ে উঠল, জার্মান অধ্যাপকরা এক ধরনের বৈজ্ঞানিক সাম্রাজ্য স্থাপন করে ফেললেন। তামাম উত্তর, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ সে সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। এবং রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের বিজ্ঞানচর্চার ওপরেও এর ভালোরকম প্রভাব ছিল। জার্মান অধ্যাপকরা হয়ে উঠেছিলেন সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের আদর্শ। অন্যান্য জার্মান বুদ্ধিজীবীদের মতো, জার্মান বিজ্ঞানীরাও আপস করে নিয়েছিলেন সামরিক সামন্ততন্ত্র আর বৃহৎ বাণিজ্যের জোটের সঙ্গে, যে জোট তখন সদ্য-শিল্পায়িত এবং সম্প্রসারমান জার্মান রাষ্ট্রকে শাসন করছে। এই আপস থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, বিজ্ঞানের বিকাশের পরবর্তী ধাপটি কী হবে। এর পরের ধাপেই রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রধানত সামরিক প্রয়োজনসাধনের কাজে নিয়োজিত হয় বিজ্ঞান।

মহাসংকট

উনিশ শতকের গোড়ায় যেমন, তেমনি শেষেও দেখা গেল দার্শনিক প্রতিক্রিয়া, যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ও তাৎপর্যকে প্রচণ্ডভাবে সীমাবদ্ধ করে দিতে চাইল। তবে শতকের গোড়ায় যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তার লক্ষ্য ছিল ফরাসি বিপ্লবের ফলাফলের বিরোধিতা করা; আর শতকের শেষে যে প্রতিক্রিয়া এল তার মূলে ছিল আসন্ন সমাজবিপ্লব সম্পর্কে এক সশঙ্ক সচেতনতা। শিল্পগুলো বিপুল পরিমাণে নতুন সম্পদ উৎপাদন করছিল, হয়ে উঠছিল উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায় বিজ্ঞাননির্ভর; তবু সমাজের ভিতরকার চাপ কমছিল না, বরং বেড়ে চলছিল। একথা অস্বীকার করার কোনো রাস্তা নেই যে সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীরা এক সর্বনাশা হতাশায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, ভুগছিলেন অবক্ষয়ী চিন্তার প্রকোপে। তাঁদের এই চিন্তা যে অযৌক্তিক ছিলনা তা অল্পকাল পরেই প্রমাণিত হয়েছিল। শিল্পে-নিযুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর কাছে, বিশেষত ইউরোপে (ব্রিটেন বাদে) মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্র এই হতাশ্বাস পরিস্থিতির এক আশাময় বিকল্প হিসেবে উপস্থিত হলো। কাজেই, ঐসব দেশে দার্শনিক চিন্তাধারায় খুব সরাসরিভাবেই এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তবে দর্শনচিন্তার প্রতি বরাবরই যারা উদাসীন, সেই ব্রিটেন ও আমেরিকাও এর থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকেনি।

মধ্য-উনিশ শতকের অন্তর্নিহিত আশাবাদী বস্তুবাদের বদলে এখন দেখা দিল মাখ (1836-1916) ও অস্‌ওয়ল্ড (1853-1932)-এর নব্য-প্রত্যক্ষবাদী দর্শন (neo-positivism)। বিজ্ঞান থেকে যাবতীয় মানস-প্রতীত তত্ত্বকে দূর করতে চাইলেন এঁরা। তা করতে গিয়ে এঁরা বস্তু নামক ধারণাটিকেই বিদায় করে দিলেন। তাঁরা বললেন, ওসব কেবল কতকগুলো 'সংবেদনের সমষ্টি', কিংবা ঐ জাতীয় কিছু অলীক পছন্দসই কথা। ঐ দর্শন, এবং অনুরূপ আরো কিছু দর্শন বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক ধার ভোঁতা করে দিতে চাইল। যেমন, বের্গসঁ-র (Bergson, 1852-1941) প্রাণশক্তির (*elan vital*) তত্ত্ব বা উইলিয়ম জেম্‌স-এর (1842-1910) কার্যকারিতাবাদী দর্শন।* এই সব দর্শন মানুষের দুর্দশা দূর করার কাজে বিজ্ঞানের কোনোরকম ভূমিকা আছে বলে মনে করে না। এইভাবে তারা বিজ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ও রাষ্ট্রের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চাইল।

আসলে প্রযুক্তিগত দিক থেকে বিজ্ঞান এই সময় এমনই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল যে পুঁজিতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটির সঙ্গে বিজ্ঞানকে একাত্ম করে না নিলে আর চলছিল না। এই একাত্মীকরণ-প্রক্রিয়ারই লক্ষণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল ঐসব দর্শন। সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার ক'রে বিজ্ঞানীরা তখন ঝুঁকেছিলেন 'বিশুদ্ধ' বিজ্ঞানের দিকে। বেশিমাত্রায় অনুদান পাওয়া, উত্তরোত্তর বিশেষীভূত হয়ে ওঠা, এবং নানাবিধ সম্মান ও পৃষ্ঠপোষণা লাভের ফলে বিজ্ঞানীদের এই প্রবণতা আরো বেড়ে উঠতে থাকে। আর বিজ্ঞানীদের সংখ্যাও এত বেড়ে

* *আঁরি বের্গসঁ*—স্বজ্ঞাবাদের প্রবক্তা। তাঁর ভাববাদী দর্শনের মূল কথা হলো "বিশুদ্ধ" অর্থাৎ নির্বস্তুক কালব্যাপ্তি (duration), যা কিনা যাবতীয় বস্তুর ভিত্তি ও উৎস। বস্তু, সময় এবং গতি হচ্ছে এই কালব্যাপ্তিকে আমরা যেভাবে ধারণা করি তারই একেকটি রূপ। এই কালব্যাপ্তির জ্ঞান কেবল স্বজ্ঞার সাহায্যেই লভ্য। দ্বন্দ্বপ্রক্রিয়ার পাল্টা তত্ত্ব হিসেবে বের্গসঁ 'সৃজনশীল বিবর্তনে'র ধারণা উপস্থিত করেছিলেন।
উইলিয়ম জেম্‌স—মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ ও দার্শনিক। তিনি মানবচিত্তকে (psyche) চেতনাপ্রবাহ বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর কার্যকারিতাবাদী দর্শনে সত্যের বিষয়গত উপলব্ধির স্থান নেয় উপযোগিতা বা কার্যকারিতা। যা প্রমাণাতীত বা যুক্তির অতীত, তাতে বিশ্বাস করার অধিকার থাকা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর নিরপেক্ষ অদ্বৈতবাদ এই কথা বলে যে আধিভৌতিক আর আধ্যাত্মিক জগৎ একই "অভিজ্ঞতার" দুই ভিন্ন রূপ মাত্র।—অনুবাদক

গিয়েছিল যে দায়িত্ব এড়িয়ে কেবলই মেনে-নেওয়ার এই প্রবণতাও যেন তার ফলে বেড়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর অন্তে দেখা গেল, স্বাধীন বিজ্ঞানীদের সংখ্যা নিতান্তই কম; বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের না হয় সরকারের বেতনভোগী। এই সময় শাসকশ্রেণীর মনোভাব তাঁরা যেভাবে আয়ত্ত করে নিলেন, এমনটি আগে কখনো দেখা যায় নি।

বিজ্ঞানীদের এই বশ্যতা স্বীকারের প্রবণতা বিজ্ঞানের বিকাশকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তা বলা মুশকিল। কারণ যে অভাবনীয় মাত্রায় বিজ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটেছিল, সে তুলনায় ইতিহাসে এঁদের প্রভাব অনেক কম। কিন্তু খানিকটা ক্ষতিকর প্রভাব যে পড়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিশেষ বিশেষ বিভাগের অগ্রগতির ইতিহাস খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করলে। বক্তব্য এ নয় যে গুরুত্বপূর্ণ ভৌত ব্যাপারগুলি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল কিংবা সেগুলি থেকে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তাঁদের ভুল হয়েছিল। বক্তব্য এই যে উনিশ শতকের সমাজব্যবস্থায় অগ্রগতির কোনো নির্দিষ্ট দিশা ছিল না; বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কোনটির তাৎপর্য কী, সেই আপেক্ষিক গুরুত্বের বোধটি ছিল না। তা যদি থাকত, তাহলে অনেক বড়ো বড়ো আবিষ্কার অন্তত কুড়ি বছর আগেই ঘটতে পারত। সাবেকী তত্ত্বকে ঘষেমেজে নেওয়ার পেছনে যে পরিমাণ নিরর্থক শ্রম ব্যয় করা হয়েছিল, তার সাহায্যেই নতুন তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটানো সম্ভব ছিল। মধ্য-সতেরো শতকে বা শেষ-আঠারো শতকে, এমনকি মধ্য-উনিশ শতকেও যে সর্বতোমুখী, সুসংগঠিত বৈজ্ঞানিক প্রণোদনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা যেন শেষ-উনিশ শতকে এসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সেই প্রণোদনা পূর্ণ শক্তিতে আবার দেখা দেবে বিক্ষুব্ধ বিশ শতকে।

আঠেরো এবং উনিশ শতকে বিজ্ঞানের সামগ্রিক বিকাশ কীভাবে হয়েছিল, তার বিবরণ এখানেই শেষ করছি। পরের অধ্যায়ে বিজ্ঞানের একেকটি শাখায় ঐ পর্বে কী ধরণের অগ্রগতি ঘটেছে তা নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করব।

নবম অধ্যায়

আঠারো ও উনিশ শতকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিকাশ

ভূমিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৌঁছে বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের নানাবিধ সম্পর্ককে আর সরল কাল-পরম্পরায় স্থাপন করা যায় না। তবু বিগত অধ্যায়ে সে কাজটিই আমরা করেছি। করা প্রয়োজন ছিল; কারণ তা নাহলে বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের ইতিহাস নিছক এক বিবরণে পর্যবসিত হয়ে পড়ত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ঐ কাল-পরম্পরায় স্থাপন করতে গেলেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যেকার পারস্পরিক যোগসূত্রগুলি, যা গোটা পর্ব জুড়েই সক্রিয় ছিল, তা চাপা পড়ে যায়। বিজ্ঞানের যে কোনো শাখাতেই জ্ঞান অর্জন করার এবং তার সাহায্যে প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার সমান্তরাল প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় কারণের ওপর। 'অভ্যন্তরীণ' কারণগুলো হলো : অকাট্য প্রাকৃতিক তথ্যাবলী, যথা জড়বস্তুর কাঠামো, বিবর্তনের ঘটনাবলী ও তার চরিত্র। আর 'বাহ্যিক' কারণগুলি হলো : করণকৌশল, সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষমতা এবং তাগিদ, যা ইতিহাসের সাধারণ গতির সঙ্গে যুক্ত। নির্দিষ্ট আবিষ্কারগুলি যদিও এর দ্বারা নির্ধারিত নয়, তবু কখন ও কীভাবে নতুন নতুন তথ্যাদি বিজ্ঞানের ক্রমবিকশিত ঐতিহ্যের মধ্যে গ্রথিত হয়ে যাবে, সে ব্যাপারে এগুলির ভূমিকাই চূড়ান্ত। কী ক'রে এই ব্যাপারটা ঘটে তার সম্যক উপলব্ধির জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসকে খুঁটিয়ে জানা প্রয়োজন; প্রয়োজন ব্যাপকতর জ্ঞান ও সমালোচনার ক্ষমতা। এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে যা করা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। এখানে আমি সেই কাজটি করছি, এমন কোনো দাবি আমার নেই; আমি কেবল চেষ্টা করব পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার কয়েকটি মূলনীতিকে ব্যাখ্যা করতে। এর জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কয়েকটি ক্ষেত্র নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে দেখাব, কীভাবে এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে দিয়ে আঠারো ও উনিশ শতকে অগ্রগতির সাধারণ চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

যে ক্ষেত্রগুলি আমি বেছে নিয়েছি সেগুলি হলো : 1. তাপ ও শক্তি; 2. এনজিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা; 3. তড়িৎ ও চুম্বকক্রিয়া; 4. রসায়ন ও 5. জীববিজ্ঞান। এই অধ্যায়ের শেষ অংশে (6) আমি বর্তমান ও গত অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়গুলিকে একজায়গায় আনবার এবং সময় ও বিষয়-পরম্পরার দিক থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

এই পর্বের প্রধান বৈজ্ঞানিক ও করণকৌশলগত অগ্রগতির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে বিষয়গুলির খানিকটা অতিসরলীকরণ করতে বাধ্য হয়েছি আমি; এমন অনেক বিষয়-পরম্পরা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি, সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য যার প্রয়োজন ছিল। তবে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে এসব বিষয়ে আলোচনা করলে সামগ্রিক ছবিটা বদলে যেত। যেমন আলোকবিজ্ঞান নিয়ে আমি প্রায় কিছুই আলোচনা করিনি। আলোকবিজ্ঞানের ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়—এমনকি উনিশ শতকেও, যখন চলচ্চিত্রের উদ্ভব হয়নি। কিন্তু এত কথা বলার জায়গা নেই এখানে। তবে, নিচের বিভাগগুলিতে যে আলোচনা থাকছে তা থেকেই অনুল্লেখিত ক্ষেত্রগুলিতে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ধরনটি পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত।

1. তাপ ও শক্তি

তাপ ও তার বিবিধ রূপান্তরণ নিয়ে চর্চার গুরুত্ব আধুনিক সভ্যতার বিকাশে খুবই বেশি—মননগত দিক থেকে তো বটেই, করণকৌশল ও অর্থনীতির দিক থেকে আরো বেশি। গোড়াতে এ চর্চা ছিল প্রকৃতি পর্যবেক্ষণেরই এক বিস্তৃতি—গরম ও ঠাণ্ডার অনুভূতি, রান্নাবান্নার প্রক্রিয়া, আবহাওয়ার পরিবর্তন ইত্যাদির পর্যবেক্ষণ। তাপ সম্পর্কে জল্পনাকল্পনা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল, জীবন ও আগুন—উভয়ের সঙ্গেই তাপের সম্পর্ক আছে, যেমন আছে বিধ্বংসী ক্রিয়ার সঙ্গে।

প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসরণ ক'রে প্রাচীন গ্রীসের আয়োনীয় দার্শনিকেরা ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভবের কারণ হিসেবে তাপ ও তার বিপরীত শীতলতাকে নির্দেশ করেছিলেন : তাপ প্রসারণ ঘটায়, বাষ্পীভবন ঘটায়; আর শীতলতা আনে সংকোচন, আনে কঠিনতা। অতঃপর অ্যারিস্টটল তাপ ও শীতলতা-গুণের মতবাদকে নির্দিষ্ট করে দেন, বিশেষ করে তাঁর আবহবিদ্যায়। এর সঙ্গে অপর দুটি গুণের—সিক্ততা ও শুষ্কতা—সমন্বয়ে চার মৌল উপাদানের ধর্মনীতি-সমর্থিত মতবাদের উদ্ভব হয়: অগ্নি (তপ্ত, শুষ্ক), অপ্ (শীতল, সিক্ত), মরুৎ (তপ্ত, সিক্ত) ও ক্ষিতি (শীতল, শুষ্ক)।

এ মতবাদ ছিল রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার এক সংমিশ্রণ। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মনের ওপর কর্তৃত্ব করেছে এ মতবাদ—কী ইউরোপে, কী চীনে, কী ভারতবর্ষে। পরস্পর-বিপরীত গুণসম্পন্ন পদার্থের মতবাদের গুরুত্ব বিশেষ করে অনুভূত হয় ভেষজবিদ্যার ক্ষেত্রে। শীত করে জ্বর হওয়ার অভিজ্ঞতা আপাতদৃষ্টিতে এই মতবাদকে সমর্থন যুগিয়েছিল। বস্তুত, ভেষজবিদ্যা থেকেই তাপ-পরিমাপনের ভাবনার সূত্রপাত হয়। তাপ ও শীতলতা—উভয়কেই চারটি মাত্রা বা ধাপে বিভক্ত বলে ধরে নেওয়া হতো। প্রথমটি অতি ক্ষীণ, চতুর্থটি প্রাণঘাতী। প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাত্রার ওষুধকে গরম বা ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্য ছিল তার বিপরীতকে সংশোধন করা বা প্রশমিত (temper) করা—তার থেকেই temperature বা তাপমাত্রার ভাবনাটির উদয় হয়।

চিকিৎসাশাস্ত্রের এই দার্শনিক তত্ত্ব টিকে যায় এবং রেনেসাঁসের যুগে নবজীবন লাভ করে। তেলেসিয়াস (1509-88)-এর অনুসরণে বেকন তাপ ও শীতলতার বৈপরীত্যকে তাঁর দর্শনের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করেন। একেবারে আদিকাল থেকেই তাপকে বায়ু ও বাষ্প-সঞ্চরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেখা হতো। গুণাত্মক দার্শনিক চিন্তার আওতা থেকে মুক্ত করে তাকে পরিমাপযোগ্য পরিমাণাত্মক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার জন্য প্রধানত দায়ী সতেরো শতকের গ্যাস-বলবিজ্ঞান-সংক্রান্ত (pneumatic) আবিষ্কারগুলি। গ্যালিলিও'র তৈরি বায়ুপ্রসারণ থার্মোমিটার এবং তরিচেল্লির ব্যারোমিটার আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল।

বাষ্পীয় এনজিনের ক্রমবিকাশ

তবে ঐ ধরনের অনুসন্ধানের পথ ধরে তাপসংক্রান্ত পরিমাণাত্মক চর্চার অগ্রগতি ঘটেনি। প্রসারণের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তাপ থেকে ব্যবহারিক সুবিধা আদায় করতে গিয়েই এ বিষয়ে অগ্রগতি ঘটে। গোটা সতেরো শতক জুড়ে 'আগুনের সাহায্যে জলকে ওপরে তোলা'র ভাবনাটা মুগ্ধ করে রেখেছিল উদভাবনপটু পরিকল্পনাকারদের। দুটো ধারণাকে—দুটোই পুরোনো—সম্মিলিত করে কীভাবে একটা কার্যকর এনজিন তৈরি করা যায় সেটাই ছিল সমস্যা: শোষণের বা শূন্যাবস্থার সাহায্যে একটা খালি জায়গাকে প্রথমে জলে ভর্তি করতে হবে এবং তারপর প্রসারমান বায়ু, বাষ্প বা গ্যাসের দ্বারা প্রযুক্ত চাপের সাহায্যে পাত্রের ভিতরকার

পদার্থকে ঠেলে বার করে দিতে হবে। বায়ুশূন্য অবস্থার ব্যাপারটা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই এ সমস্যার সমাধান করে ফেলেছিলেন দ কো (De Caus, 1576-1626)। ইনি ছিলেন ষোলো শতকের জনপ্রিয় শৌখিন উদ্যানজলব্যবস্থাগুলির নকশাকার। নলের দ্বারা কুয়োর সঙ্গে যুক্ত একটা প্রায়-শূন্য জলপাত্রের তলায় আগুন জ্বালালেন তিনি; সমস্ত জলটা যখন ফুটে উঠে পাত্রটাকে বাষ্পে পূর্ণ করে তুলল, তখন আগুনটাকে সরিয়ে বাষ্প-ছিদ্রটা বন্ধ করে দিলেন দ কো; তখন কুয়ো থেকে জল শোষিত হয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করল। খুব একটা কাজের জিনিস না হলেও এর মধ্যেই ছিল ভ্যাকুয়াম এনজিনের মূল নীতির প্রয়োগ। তবে ফন গেরিক (von Guerike, 1602-86)-এর কাজের আগে এর ক্রিয়া পুরোপুরি বুঝতে পারা যায় নি। শূন্যাবস্থা নিয়ে যেসব বিজ্ঞানী কাজ করছিলেন তাঁদের অধিকাংশেরই মাথায় ছিল একটা কার্যকর এনজিনের কথা, কিন্তু কার্যোপযোগী একটা এনজিন তৈরি করার মতো যন্ত্রকৌশল তাঁদের আয়ত্তে ছিল না। এ ব্যাপারে যিনি সবচেয়ে বেশি দূর এগিয়েছিলেন তিনি হলেন দনি পাপ্যাঁ (Denis Papin, 1647-1712?)—যিনি প্রথমে হাইগেন্স ও পরে বয়েল-এর সহকারীরূপে কাজ করেছিলেন। একটা মেশিনের নকশা ছকে ফেলেছিলেন পাপ্যাঁ, কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করে উঠতে পারেন নি। দারিদ্র্যের মধ্যে লন্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়। 1708-এ রয়্যাল সোসাইটির সম্পাদককে এক মর্মস্পর্শী চিঠি লেখেন তিনি—'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' এক পরীক্ষার জন্য পনেরো পাউন্ডের অনুদান চেয়ে। রয়্যাল সোসাইটি জানায় যে সাফল্যের অগ্রিম নিশ্চিতি না পেলে সোসাইটি'র পক্ষে টাকা ধার দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রথম যিনি একটা কার্যকর, অগ্নি-চালিত পাম্পের নকশা আঁকতে ও অর্থ জোগাড় করতে সমর্থ হলেন, তিনি হলেন 'রয়্যাল এনজিনিয়ার্স'-এর *ক্যাপ্টেন সেভারি* (1650-1715)। তিনি দুটো পাত্র ব্যবহার করলেন; একবার সেগুলোকে বাষ্পে পূর্ণ ক'রে জল বার ক'রে দিলেন, তারপর ঠাণ্ডা করে দিলেন; তখন বেশি পরিমাণ জল ভিতরে ঢুকে পড়ল। এখনো এই পদ্ধতির ব্যবহার হয় 'পাল্সোমিটার' পাম্পে। সেভারি একজন যেমন-তেমন পরিকল্পনাকার ছিলেন না; *The Miner's Friend* শিরোনামে পেটেন্টের জন্য যে আবেদনপত্র তিনি লেখেন তার থেকেই বোঝা যায় যে বাষ্পীয় এনজিনের সম্ভাব্য গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন—বিশেষ করে খনি থেকে জল নিষ্কাশনের কাজে। সেভারি লিখছেন:

'ইংলন্ডের খনিসমূহের সম্ভ্রান্ত অভিযাত্রীগণ সমীপেষু—

আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত আছি যে অগ্নির উৎক্ষেপ-শক্তির সহায়তায় জলোত্তোলনের যে যন্ত্রকৌশল আমি উদ্ভাবন করিয়াছি, আপনাদের অধিকাংশের মতে তাহা এক নিরর্থক কর্মোদ্যোগ মাত্র, তাহা কদাচ আমার দাবি এবং পরিকল্পনাকে সার্থক করিবে না। আপনাদের ধারণা, ইত্যাকার যন্ত্র কোনোমতেই ভূমিগর্ভে স্থাপন করা সম্ভব নহে, ইহার সাহায্যে জল উত্তোলন করিয়া আপনাদের খনিগর্ভকে জলমুক্ত করাও সম্ভব নহে। এই বিবেচনা করিয়া আপনারা আমার এই পরিকল্পনার সাহায্যার্থে অগ্রসর হন নাই। আমি একজন সাধারণ প্রযোজকসুলভ অপযশের বোঝা মস্তকে বহন করিতে আদৌ সম্মত নহি; সুতরাং আপনাদের সম্মুখে আমার উদ্ভাবিত যন্ত্রটির একটি নকশা পেশ করিলাম, ইহার নানাবিধ উপযোগিতাসকলও বিবৃত করিলাম। এক্ষণে ইহা ব্যবহার করিলে আপনাদের সুবিধা হইবে কিনা, সে-বিবেচনা আপনাদের উপরেই ন্যস্ত রহিল।...

খনিগহ্বরকে এবং কয়লা-কোটরকে জলমুক্ত করার কার্যে এই এনজিনের উপযোগিতা সমধিক, যেহেতু ইহা অতি সহজে স্বল্প ব্যয়ে জল উত্তোলন করিতে সক্ষম। এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই যে ইহার ফলে দুই এক বৎসরের মধ্যেই আমাদিগের খনি-ব্যবসায়ের

পরিমাণ দ্বিগুণিত—হয়তো বা ত্রিগুণিত—হইবে। আমাদিগের এই রাজ্যের সম্পদের প্রধান অংশ এই খনি-ব্যবসায়ের প্রসাদেই অর্জিত হইয়া থাকে. ইহা সর্বজনজ্ঞাত। বর্তমানে সুবিপুল পরিশ্রম ও ক্লেশ সহকারে খনিকর্মীগণ জল উত্তোলন করে; তৎসত্ত্বেও আমরা প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে সীসা, টিন এবং কয়লা রপ্তানী করিয়া থাকি। সুতরাং খনিতে ব্যবহারের জন্য সর্বতোভাবে উপযোগী এই এনজিনের সহায়তায় তাহাদের শ্রমভার বিপুলাংশে লাঘব করিয়া দিলে উক্ত রপ্তানীর পরিমাণ না জানি কতগুণে বৃদ্ধি পাইবে।'

অবশ্য সেভারি'র এনজিনের বেশ কয়েকটা গুরুতর ব্যবহারিক অসুবিধা ছিল। তবে এর প্রধান গুরুত্ব ছিল এই যে সমস্যাটা যে সমাধানযোগ্য তা প্রমাণ করা। এরপর অপেক্ষাকৃত সফল ও কার্যকর এক এনজিন তৈরি হলো 1712 সালে। ডার্টমাউথের টমাস নিউকোমেন নামক একজন কামার এ এনজিন বানালেন। নিম্নচাপের এক বয়লারের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত একটি চোঙের ভিতরকার ঘনীভূত বাষ্পচাপে নমিত (depressed) একটি পিস্টন ছিল তাঁর এনজিনের বৈশিষ্ট্য। সেভারি'র এনজিনের মতো এটিকে খনির তলায় বসাবার দরকার হতো না, অত বেশি নজর রাখতে হতো না, এবং উচ্চমাত্রার বাষ্পচাপের ওপর নির্ভরশীল না হওয়ায় এটি অনেক নিরাপদও ছিল। বায়ুচাপের বৈজ্ঞানিক নীতিটিকে যন্ত্রে প্রয়োগ করার ব্যাপারে এই এনজিনের উদ্ভবকে বলা যায় প্রথম পর্ব—এমন এক যন্ত্র যা হাতেকলমে কর্মরত লোকেদের তৈরি, যা শুধু যে কাজেই লাগে তা নয়, অর্থকরীও বটে।

যতদূর জানা যায়, নিউকোমেন-এর বিজ্ঞানশিক্ষার কোনো অভিজ্ঞতা বা বিজ্ঞানজগতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। সেইজন্যে 1824 সালে আর· এস· মেইক্‌লহ্যাম স্বীকার করতে চাননি যে বাষ্পীয় এনজিন হচ্ছে 'মানুষকে দেওয়া বিজ্ঞানের মহত্তম উপহারগুলির অন্যতম'। তিনি বলেছিলেন, 'অন্য যেকোনো মেশিন বা যন্ত্র-প্রক্রিয়ার তুলনায় এইটির ক্ষেত্রে তত্ত্ববিদদের ভূমিকা অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। এর আবির্ভাব, এর বিকাশ ও এর উন্নতি—সবটাই হয়েছে মিস্তিরিদের হাতে।' বাষ্পীয় এনজিনের জন্মের মূলে বিজ্ঞানের অবদান কতটুকু তা নিয়ে এই দুই চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিকে যে মেলানো যায় না তা নয়। ভ্যাকুয়াম পাম্পিঙের সম্পূর্ণ নতুন ভাবনাটি কোনো কারিগরের মাথায় আসা আদৌ সম্ভব ছিল কিনা সন্দেহ; অন্তত বিজ্ঞানীর মাথায় আসবার আগে কারিগরের মাথায় তা আসেনি। অপরদিকে, কার্যকর একটি এনজিন তৈরি করার পথে যেসব সমান গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক সমস্যা ছিল সেগুলির সমাধান করার ক্ষমতা বা দক্ষতা কোনো বিজ্ঞানীর ছিল না। এই ঘটনাটা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সম্পূর্ণ নতুন বৈজ্ঞানিক ভাবনা এবং অভিজ্ঞ কর্মদক্ষতার একটানা সমন্বয় ছাড়া বাষ্পীয় এনজিনের বিকাশ ও উন্নতি ঘটা সম্ভব ছিল না।

পরবর্তী প্রায় সত্তর বছরে নিউকোমেনের এনজিনে যে মূলগত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, এবং কিছু কিছু এনজিন যে একশো বছরেরও বেশি কাল কাজ করেছিল, সেটা তাঁর উদভাবনী কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু পাম্প করা ও ফুৎকার দেওয়া ছাড়া অন্য যে কোনো কাজের পক্ষেই এর ক্রিয়া ছিল অনিয়মিত, ব্যবহার ছিল সীমিত। তাছাড়া বিপুল পরিমাণ কয়লা খেতো এই এনজিন। এর পরবর্তী বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল বিজ্ঞানের দিক থেকে নতুন ভাবনার সিঞ্চন, বিশেষ ক'রে তাপ-সংক্রান্ত পরিমাণাত্মক বিজ্ঞানের দিক থেকে।

আপেক্ষিক তাপ ও লীন তাপ : জোসেফ ব্ল্যাক

শিল্প-সংক্রান্ত সক্রিয়তা যত ব্যাপক হয়ে উঠতে লাগল, ততই ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হতে লাগল তাপের, এবং তখনই তাপ-চর্চা একটা পরিমাণাত্মক বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠতে লাগল। প্রথমে সুরাকারদের অভিজ্ঞতাকে (যারা ব্যাপক মাত্রায় তরলের বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন ঘটানোয়

অভ্যস্ত ছিল), এবং তারপর আদি বাষ্পীয় এনজিনের প্রস্তুতকারক ও ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুঝবার প্রয়াস থেকেই গড়ে ওঠে তাপ-সংক্রান্ত পরিমাণাত্মক বিজ্ঞান।

ডাক্তার ব্ল্যাক, যিনি গ্যাস-বলবিজ্ঞানে (pneumatics) বিপ্লবের সূত্রপাত করেছিলেন, তিনি তাপ সম্পর্কেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্‌গাতা ছিলেন। তিনি প্রথমত চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার দিক থেকে অগ্রসর হলেন। আগুন বা তাপ নামক যে 'পদার্থ'টি পাত্রের মধ্যে দিয়ে বহে যায় এবং পাত্রের ভিতরকার দ্রব্যগুলিকে প্রভাবিত করে, সেটির চরিত্র কী, এটাই ছিল তাঁর আলোচ্য। ব্ল্যাক দেখলেন, তিনি যার নাম দিয়েছেন 'তাপ-বস্তু', তার একই পরিমাণ এক-এক পদার্থকে এক-একরকম মাত্রায় গরম করে। এর থেকে তিনি এক-একটি পদার্থের তাপ-ক্ষমতা বা *আপেক্ষিক তাপ* নিরূপণ করলেন। আর এই সময়েই এই ঘটনাটা তাঁকে ভাবিত করল যে তুষার ও বরফ গলতে খানিকটা সময় নেয়—অর্থাৎ তা তাপ শোষণ করে কিন্তু গরম হয় না, যার অর্থ, ঐ তাপ নিশ্চয়ই গলা জলের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে—*লীন* হয়ে থাকে। এর পর তিনি বাষ্পের লীন তাপ (latent heat) মাপলেন—যা খুবই বেশি। মদ্যশিল্পে এ ব্যাপারটা বহুকাল থেকেই জানা ছিল যে জলকে গরম ক'রে স্ফুটনাঙ্কে নিয়ে যেতে যতটা তাপ লাগে, তার থেকে অনেক বেশি তাপ লাগে অতঃপর সেই জলকে বাষ্পে পরিণত করতে। শুধু তাই নয়, ফোটাবার সময় যে-পরিমাণ তাপ শোষিত হয়, বাষ্পের ঘনীভবনের সময় তা অবার ফেরৎ পাওয়া যায়—পাতনযন্ত্রের ঘনীভবন-পাত্রে (worm) প্রচুর ঠাণ্ডা জল ঢাললে তবেই বাষ্প ঘনীভূত হয়।

জেম্‌স ওয়াট : স্বতন্ত্র শীতক

লীন তাপের এই আবিষ্কারকে প্রথম ব্যবহারিক কাজে লাগালেন গ্ল্যাসগোর এক তরুণ যন্ত্রনির্মাতা—নাম জেমস ওয়াট। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিউকোমেন-এনজিন সারাবার ভার দেওয়া হয় ওয়াটের ওপর (করণকৌশল ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখানেও লক্ষণীয়)। তিনি দেখলেন প্রতিটি ঘাতের (stroke) সঙ্গে ঠাণ্ডা চোঙ্‌টিতে ঘনীভবনের দরুন যে বাষ্প নষ্ট হচ্ছে, তারই ফলে দেখা দিচ্ছে অসুবিধা। এর ব্যাখ্যা দিলেন ব্ল্যাক, তাঁর সদ্য-আবিষ্কৃত লীন তাপের তত্ত্ব দিয়ে। এবং অল্পদিন পরেই ওয়াটের মাথায় এসে গেল বাষ্পকে আলাদা ক'রে ঘনীভূত করার ভাবনাটি। 1765 সালে তিনি তৈরি করলেন স্বতন্ত্র শীতক (condenser)। বাষ্পীয়-এনজিনের বিকাশে এর গুরুত্ব অপরিসীম, কেননা এর ফলে তার কর্মদক্ষতা বেড়ে গেল প্রচণ্ডভাবে। ওয়াট এরপর বাষ্পীয় এনজিনের একের পর এক উন্নতি সাধন করেন।

ম্যাথু বোল্‌টন : দি সোহো এনজিন ওয়ার্ক্‌স

বাজারে বিক্রয়যোগ্য এনজিন তৈরি করার আগে ওয়াটকে বার্মিংহ্যামের বিখ্যাত ম্যানুফ্যাকচারার ম্যাথু বোল্‌টনের অংশীদার হিসেবে যোগ দিতে হলো। এর আগে তিনি রোবাক-এর ক্যারন ওয়ার্ক্‌স-এ যোগ দিয়েছিলেন, তবে সেখানে তেমন সুবিধে হয়নি। ম্যাথু বোল্‌টনের অংশীদার হয়ে ওয়াট The Black Country নামে অভিহিত অঞ্চলের বিকাশমান ধাতুশিল্পের সুযোগসুবিধাকে কাজে লাগাতে পারলেন। এই সব সুযোগসুবিধা পাওয়ার পরেই তাঁর বাষ্পীয় এনজিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। অথচ, আজকে প্রায় রসিকতার মতো শোনায়, ওয়াট মনে করতেন, 'স্কট্‌রা স্বভাবগতভাবেই এনজিনিয়ার হবার অযোগ্য'। জন উইল্‌কিনসনের কামান-নল বানানোর শিল্প বিশেষ ক'রে কাজে লাগল ওয়াটের, কারণ এর ফলে নিখুঁত মাপের

চোঙ্ পাওয়া গেল। ফ্লাইহুইল, থ্রট্‌ল ও কেন্দ্রাতিগ 'নিয়ন্ত্রক' *(governor)*-এর সম্মিলন ঘটিয়ে ওয়াট এমন এক এনজিন বানালেন যা পরিবর্তনশীল ভার থাকা সত্ত্বেও সমগতিতে যন্ত্র চালাতে সক্ষম। এই কৌশলটি শিল্পের ইতিহাসে সাইবার্নেটিক *(cybernetic)*নিয়ন্ত্রণের প্রথম নিদর্শন। শিল্পবিপ্লবের একেবারে শুরুতেই আবির্ভূত এই এনজিন যেন বিশ শতকের দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের যা বৈশিষ্ট্য সেই যান্ত্রিক স্বয়ংচালনার (automatism) অগ্রদূত।

ওয়াটের আগে বাষ্পীয় এনজিন কয়লাখনি থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের অন্যান্য খনিতে কদাচিৎ ব্যবহৃত হতো। স্মীটন (1724-92) নিউকোমেন-এনজিনের উন্নতি সাধন করার পরেও সে এনজিনের ব্যবহার একমাত্র কয়লাখনির ভিতরে ছাড়া আর কোথাও লাভজনক ছিল না—কারণ একমাত্র কয়লাখনির মধ্যেই খুব শস্তায় কয়লা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এখন ওয়াটের অধিকতর কর্মদক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য এনজিন এসে যাওয়ায় কর্নওয়াল্-এর ভারি-ধাতুর খনন-জাত পণ্যদ্রব্য, এবং পরে বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পাওয়ার অনেক সহজলভ্য ও শস্তা হয়ে উঠল। বস্ত্রশিল্প এ-সময় সারা দেশেই ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছিল।

অর্থনৈতিক ও করণকৌশলগত বহু বাধা পার হয়ে, তীব্র সংগ্রামের পর অবশেষে বাষ্পীয় এনজিন ব্রিটেনের প্রত্যেকটি খনিতে ও শিল্পাঞ্চলে তার বিজয়কেতন উড়িয়ে দিল। শুধু ব্রিটেনে নয়—ম্যাথু বোল্টন সারা পৃথিবীর জন্য এনজিন বানানোয় বিশ্বাসী ছিলেন; ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, জার্মানিতে বাষ্পীয় এনজিন বসানো হতে লাগল। প্রায়ই ব্রিটেন থেকে এনজিনিয়াররা গিয়ে এনজিন বসিয়ে দিয়ে আসতেন।

লোকোমোটিভ এবং নৌ-এনজিন

বাষ্পীয় এনজিনের পরবর্তী বিকাশ নির্ভর করছিল কী ধরনের করণকৌশলগত ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন তাকে মেটাতে হবে তার ওপর। বেশির ভাগ খনি ও কারখানার প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে ওয়াটের এনজিনই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সে এনজিনের দাম ছিল বেশি, আর যে পরিমাণ পাওয়ার তা থেকে পাওয়া যেত সে-তুলনায় এনজিনগুলো ছিল বেশ ভারি। লোকোমোটিভের এনজিনের জন্য প্রয়োজন ছিল কম ওজন অথচ উচ্চ পাওয়ার। অনেক কাল আগেই 1801 সালে ট্রেভিথিক দেখিয়েছিলেন যে এর জন্য যা দরকার তা হলো উচ্চচাপের এনজিন। এই এনজিনে শীতকের কোনো বালাই নেই, নিষ্ক্রান্ত বাষ্পকে স্রেফ হাওয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

লোকোমোটিভের যাত্রা শুরু হয় নড়বড় ক'রে। স্বভাবতই এর বিকাশ ঘটে কয়লাখনিতে, রেলপথের ওপর। কিন্তু এটি লাভজনক হয়ে ওঠবার আগে অসংখ্য সমস্যার সমাধান করা দরকার ছিল, যথা যন্ত্রের মধ্যে পাওয়ার সঞ্চালনের পদ্ধতি (drive), অবলম্বন (suspension), রেললাইন,স্থায়ী পথ ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে বিজ্ঞানের খুব একটা ভূমিকা ছিল না, এবং এই সমস্যাগুলির প্রত্যেকটির সমাধানের ব্যাপারে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি ছিলেন কয়লাখনির এক ফায়ারম্যানের স্ব-শিক্ষিত পুত্র—জর্জ স্টিফন্‌সন। প্রায় আচমকাই তিনি এক চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্‌ভাবন ক'রে ফেলেছিলেন। নিষ্ক্রান্ত বাষ্পকে একটা ফানেলের মধ্যে চালিয়ে দেন তিনি, ফলে আগুনকে উসকে তুলে যথেষ্ট পাওয়ার পাওয়া সম্ভব হয়। ঘণ্টা পিছু কুড়ি মাইল— এই 'প্রচণ্ড' গতির সঞ্চার ক'রে তিনি ঘোড়াদের 'রেসে' হারিয়ে দেন। 1829 সালে নবনির্মিত লিভারপুল-ম্যান্‌চেস্টার রেলপথে 'রেন্‌হিল প্রতিযোগিতা'য় তাঁর তৈরি 'রকেট' প্রথম পুরস্কার পায়। এরই ফলে লোকোমোটিভের চূড়ান্ত বিজয় সর্বস্বীকৃত হয়ে যায়।

জল-পরিবহনের ক্ষেত্রে কিন্তু বাষ্পীয় এনজিনকে কাজে লাগানোর সমস্যাটা ছিল অন্য ধরনের। সেক্ষেত্রে, ওজন আর আয়তনটা কোনো সমস্যা ছিল না, কিন্তু জ্বালানি খরচটা ছিল

খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জাহাজকে তার নিজের কয়লা বহন করতে হতো। বস্তুত, এর ফলে প্রায় গোটা উনিশ শতক জুড়ে বাষ্পচালিত জাহাজের চলাফেরা সীমাবদ্ধ ছিল কেবল নদীপথে এবং তীরের কাছাকাছি বাণিজ্য অঞ্চলে। 1781 সালে হর্নব্লোয়ার (1743-1815) কর্তৃক প্রবর্তিত বহুমুখী প্রসারণব্যবস্থার ব্যবহার অবশ্য এ সমস্যার এক সমাধান উপস্থিত করেছিল; তবে এ পদ্ধতির বিকাশ ঘটে শ্লথগতিতে। প্যাডেলের বদলে স্ক্রু চালু করা ছাড়া 1884-এর আগে এক্ষেত্রে কোনো আমূল পরিবর্তন ঘটেনি। 1884 সালে টার্‌বাইন প্রবর্তন ক'রে পার্সন্‌স পাওয়ার উৎপাদনে বিপ্লব ঘটিয়ে দেন।

অর্থনীতি ও করণকৌশলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

বাষ্পীয় এনজিনের এই ইতিহাস থেকে দেখতে পাই যে শিল্পবিপ্লব সংঘটনের জন্য অর্থনীতি ও করণকৌশল—এ দুটোই ছিল অপরিহার্য শর্ত। ক্রমপ্রসারমান বাজারে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করার তাগিদ থেকে বিকাশ লাভ করেছিল বস্ত্রশিল্প—এটা ছিল অর্থনৈতিক শর্ত। অপরদিকে নব-উদ্ভাবিত এনজিনগুলোই ছিল কয়লা ও চালন-ক্ষমতার এবং শেষ বিচারে পরিবহনেরও একমাত্র যোগানদার; এগুলি না থাকলে বস্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ সম্ভবই হতো না—এটা ছিল করণকৌশলগত শর্ত।

বিজ্ঞানের তরফ থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো সাহায্য ছাড়াই, প্রধানত হাতেকলমে কর্মরত এনজিনিয়ারদের প্রয়াসেই বাষ্পীয় এনজিনের উন্নতি ঘটে। তবে এর ক্রিয়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে অনেক বিজ্ঞানীই এ-কে বুঝতে চেষ্টা করেন, এমনকি এর উন্নতিও ঘটাতে চান। ফলে, গ্যাস ও বিভিন্ন প্রকারের বাষ্পের আচরণ কী কী নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (এর প্রয়োজন ছিল 'বাষ্প-সারণী' প্রস্তুত করার জন্য), সে সম্পর্কে অনেক গভীর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়। এ থেকেই জন্ম নেয় পদার্থবিদ্যার এক নতুন সাধারণ ধারণা—যান্ত্রিক বল ও তাপের সমীকরণ-তত্ত্ব, যা ব্যক্ত হলো *শক্তি* নামক সর্বজনীন শব্দটির মধ্যে দিয়ে। বাষ্পীয় এনজিনে এ তত্ত্বের প্রয়োগ ইতিমধ্যেই ঘটে আসছিল।

ক্যাল'রিক্-এর প্রতিষ্ঠা

বাষ্পীয় এনজিনের জন্ম হয় ব্রিটেনে এবং সেখান থেকেই তা ফ্রান্সে প্রবেশ করে। অথচ, বিচিত্র ব্যাপার এই যে বাষ্পীয় এনজিন কীভাবে তাপকে কার্যে রূপান্তরিত করে তা নিয়ে রীতিমতো বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম শুরু হয় ফ্রান্সেই, ব্রিটেনে নয়। তাপ বলতে কী বোঝায়, তা নিয়ে যেসব ধারণা প্রচলিত ছিল, প্রথমদিকে সেগুলোই ছিল সঠিক ধারণা গঠনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। আমরা আগেই দেখেছি, তাপকে আগুনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হতো; এমনকি, প্রাণীদেহের অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাপকেও অদৃশ্য এক আগুনের ক্রিয়া বলে ভাবা হতো। আঠারো শতকে মনে করা হতো, তাপ হচ্ছে এক বস্তুময় পদার্থ, যাকে ব্ল্যাক বলেছিলেন 'তাপবস্তু', এবং পরে লাভোয়াসিএ যার নামকরণ করেছিলেন *'ক্যাল'রিক'*। এই পদার্থটিকে ওজন করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়; তবে সেই ব্যর্থতা থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে তড়িৎ বা আলোকের মতো তাপও হচ্ছে অধরা এক প্রবাহী (fluid)। লাভোয়াসিএ দেখালেন যে এই ধারণা তাঁর রসায়নিক সম্মিলন-জাত তাপের তত্ত্বের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে যায়, বিশেষ ক'রে আগুনে বা প্রাণীদেহে অক্সিজেনের সম্মিলনের সঙ্গে।

তবে তাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবনার একটা ঐতিহ্যও বহু প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। সে ভাবনা অনুযায়ী, তাপ কোনো পদার্থ নয়, তা হচ্ছে গতিরই একটা রূপ। বহু শতাব্দী ধরে কাঠে কাঠ ঘষে আগুন জ্বালানোর আর কামারশালের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছিল, বলকে তাপে

রূপান্তরিত করা যায়; এখন বাষ্পীয় এনজিন দেখিয়ে দিল, তাপকেও বলে রূপান্তরিত করা যায়। তাপ ও কার্যের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্কটি কী, সেটা জানার জন্যও প্রয়োজন ছিল বাষ্পীয় এনজিনের—যা 'আগুনের সাহায্যে জলকে ওপরে তোলে'।

প্রথম দিককার নিউকোমেন এনজিন প্রায় ব্যর্থ হয়েছিল এইজন্যে যে তার দ্বারা কৃত কার্য থেকে ব্যবহৃত কয়লার দাম উঠত না বললেই চলে। বরং তার থেকে ঘোড়া ব্যবহার করাই ছিল লাভজনক। ওয়াট তাঁর এনজিন ব্যবহারের জন্য কী হারে অর্থ দাবি করবেন তার হিসেব করতে গিয়ে প্রথমে হিসেব করেন, একটা ঘোড়া মিনিট-পিছু কত ফুট-পাউন্ড কার্য করতে পারে, এবং সেই অনুপাতে তিনি এনজিনের ক্ষমতাকে *অশ্ব-শক্তি* নামক এক নতুন সর্বজনীন এককে প্রকাশ করলেন। এনজিনগুলো বিক্রীর জন্য বোল্টন ও ওয়াটের সংস্থা এক চমকপ্রদ উপায় উদ্‌ভাবন করেছিলেন। তাঁরা জানাতেন যে বিনা পারিশ্রমিকে এনজিন বসিয়ে দিয়ে আসা হবে ও তার পরিচর্যা করা হবে; এবং নিউকোমেন এনজিনের জ্বালানি-খরচ বা ঘোড়ায়-টানা যন্ত্রের (horse-gin) খাইখরচের থেকে তাঁদের এনজিনের জ্বালানি-খরচ যত টাকা কম, তার এক-তৃতীয়াংশ তাঁরা দাবি করতেন রয়্যালটি বাবদ।

অশ্বশক্তিকে তাপে রূপান্তরিত করার উল্টো প্রক্রিয়াটির প্রথম প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিয়েছিলেন কাউন্ট রামফোর্ড—মিউনিখে, 1798 সালে। তাপ নিয়ে, বিশেষত কী ক'রে তাপের প্রয়োগ লাভজনক হয়ে উঠতে পারে সে-সম্পর্কে বরাবরই তাঁর উৎসাহ ছিল। কামানের নল তৈরি করার সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে তাপ নির্গত হচ্ছে, পরে সেই তাপ তিনি পরিমাপও করেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্তু থেকে যে অনির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ উৎপাদন করা যায়, এটা প্রমাণ ক'রে দিয়ে তিনি তাপের 'বস্তুময়তার তত্ত্ব'কে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করলেন। তবে বিকল্প তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট ছিল না।

কার্নো : প্রতীপগামী তাপ-এনজিন

এনজিনের বয়লারের মধ্যেকার তাপকে ফ্লাইহুইলে পাওয়ারে রূপান্তরিত ক'রে নেওয়ার প্রক্রিয়াটি যথেষ্টই ব্যবহৃত হচ্ছিল। কিন্তু বহুকাল ধরেই এ ব্যাপারটিকে পুরোপুরি বিজ্ঞানের আওতায় আনা যাচ্ছিল না। কতটা কার্য পেতে হলে কতটা কয়লা পোড়াতে হবে সে ব্যাপারে একেকটি এনজিনের ছিল একেক রকম রূপান্তরণ-মাত্রা(conversion factor)। এনজিনের যত উন্নতি হতে লাগল, ততই কমতে লাগল এই মাত্রা, অর্থাৎ ততই কম কয়লার প্রয়োজন হতে লাগল। এনজিনের কার্যদক্ষতার যেন কোনো সীমা নেই, এরকমই মনে হতে লাগল। অথচ সীমা তো একটা থাকতেই হবে, কারণ তা নাহলে যে অনন্ত গতিশীলতা সম্ভব হয়ে উঠবে ! এইসব ভাবনাচিন্তাই সাদি কার্নো-কে (Sadi Carnot, 1796-1824) প্রণোদিত করল *আগুনের চালনাশক্তি প্রসঙ্গে* বা *Réflexions sur la Puissance Motrice du Feu* (1824) লিখতে। উনিশ শতকের মহান কিন্তু অস্বীকৃত প্রতিভাধরদের মধ্যে অন্যতম এই সাদি কার্নো ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের 'বিজয়ের সংগঠক' লাজার কার্নোর পুত্র। নবীন École Polytechnique থেকে এনজিনিয়ারিং শিক্ষা করেছিলেন তিনি। নতুন নতুন যন্ত্রাদিতে যাঁরা প্রথম গণিতীয় ও ভৌত তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটান, সাদি কার্নো ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

কার্নো ধরে নিলেন, বাষ্পীয় এনজিন হচ্ছে পরস্পর-সম্পর্কিত এক যন্ত্রসমষ্টি (mill); উচ্চ তাপমাত্রার 'ক্যাল'রিক' এনজিনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং তারপর তা নিম্ন তাপমাত্রার শীতকে প্রবেশ করছে; এই প্রক্রিয়ায় একটুও 'ক্যাল'রিক' যদি নষ্ট না হয় তাহলে নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ পরিমাণ কার্য করা সম্ভব। সত্যিই তাই হয় কিনা তা যাচাই করার জন্য তিনি এক বিপরীতগামী (reversible) এনজিনের কল্পনা করলেন। বিপরীত মুখে একই পরিমাণ শক্তি

ব্যয় ক'রে সমপরিমাণ 'ক্যাল'রিক'কে নিম্নথেকে আবার পূর্বতন উচ্চ তাপমাত্রায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারা' উচিত সে এনজিনের। কিন্তু, কার্নো দেখলেন, বিপরীতগতির ঐ আদর্শ পরিস্থিতিতেও প্রদত্ত তাপের অতি সামান্য এক ভগ্নাংশকেই প্রয়োজনীয় কার্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব। অর্থাৎ, এক তাপমাত্রা থেকে অন্য তাপমাত্রায় তাপের যে-পরিবৃত্তি (transfer) ঘটে, একমাত্র তা থেকেই কার্য পাওয়া সম্ভব। পরে এই তত্ত্বই *তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র* বলে অভিহিত হয়েছিল।

এখানেই না থেমে কার্নো আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে এনজিনের মধ্যেই খানিকটা তাপ কার্যে পরিণত হয়; তার পরিমাণ কতটা তাও তিনি হিসেব ক'রে বার করেছিলেন। কিন্তু এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করবার আগেই কলেরায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্কের এই মহৎ আবিষ্কার পঞ্চাশ বছর ধরে চাপা পড়ে থাকে তাঁর নোটবইয়ের পাতায়। ইতিমধ্যে তাঁর প্রকাশিত কাজকর্মের কথাও লোকে ভুলতে বসেছিল। অবশেষে 1832 সালে ক্লাপ্রিয়ঁ (Claperyon) সেগুলিকে উদ্ধার করেন। পরে, ঐটিই হয়ে দাঁড়িয়েছিল নবোদ্ভূত তাপগতিবিদ্যার মূল বনেদ। তাপের সঙ্গে কার্যের সম্পর্ক কী, তার বিস্তৃত অনুসন্ধানের জন্য আরো পঁচিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তার অনেক আগেই এর আবিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

শক্তির নিত্যতা

1842 সালে প্রথম যিনি হিসেব ক'রে *তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক (mechanical equivalent of heat)* বার করেন তিনি হলেন রবার্ট মেয়ার (1814-87)—এক জাহাজের ডাক্তার। অল্পকাল পরেই একই প্রস্তাব করেন এক ধনী মদ্যপ্রস্তুতকারকের পুত্র, অপেশাদার বিজ্ঞানী জুল (1818-89); এবং শারীরতত্ত্ববিদ ও পদার্থবিদ ফন হেল্ম্‌হোল্‌ৎজ(1821-94)। আরো অন্তত পাঁচজন পদার্থবিদ বা এনজিনিয়ার আলাদা আলাদাভাবে মোটের ওপর এই একই ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন বলে মনে হয়—যদিও তা এত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়নি। মুখ্য ঐ তিন আবিষ্কারক তিন বিভিন্ন দিক থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন। মেয়ার ঐ ধারণায় উপনীত হন বিশ্বজগৎ সম্পর্কে সাধারণ দার্শনিক ভাবনাচিন্তা থেকে। অভিকর্ষের টানে পতনরত বস্তু যে *vis viva* (শক্তি) অর্জন করে, আর সংকোচনশীল গ্যাস যে-তাপ ছাড়ে, এ দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন তিনি। ওদিকে জুল ঐ ধারণায় উপনীত হন সদ্যোদ্ভূত বৈদ্যুতিক মোটর নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে গিয়ে। বৈদ্যুতিক মোটরের পক্ষে কখনোই নাকি পাওয়ারের কার্যকর উৎস হয়ে ওঠা সম্ভব হবে না, কারণ চালকব্যাটারির অতি মূল্যবান দস্তা পুড়িয়ে তা পাওয়ারের যোগান দেয়—এই ছিল জুল্-এর প্রতিপাদ্য! এটা প্রমাণ করতে গিয়ে কার্য ও তাপের পরিমাণগত তুল্যতার কথা তাঁর মাথায় আসে। 1843-এ কর্ক-এ ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনকে এ কথা জানান জুল্, কিন্তু বিশেষ পাত্তা পাননি। রয়্যাল সোসাইটিও তাঁর বক্তব্য পুরোপুরি ছাপতে রাজি হয়নি। অতঃপর আরো নিখুঁত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি স্বীকৃতি আদায় করে নেন।

1847-এ নিউটনীয় গতি-তত্ত্বের সাধারণীকরণ ঘটাবার চেষ্টা করেন হেল্ম্‌হোলৎজ। পারস্পরিক আকর্ষণের মধ্যে ক্রিয়াশীল বহুসংখ্যক বস্তুর ওপর নিউটনের গতি-তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটাতে চান তিনি। তিনি দেখান, এক্ষেত্রে বল ও টানের (tension)—আজকাল আমরা যাকে বলি গতীয় শক্তি ও স্থৈতিক (potential) শক্তি, তাদের—যোগফল একই থাকে। এইটিই *শক্তির নিত্যতা-তত্ত্বের* সবচেয়ে গাণিতিক রূপ। এর গুরুত্ব এইখানেই যে তাপ-সম্পর্কিত নব্য মতবাদগুলি এর দ্বারা বলবিদ্যার পুরোনো মতবাদগুলির সঙ্গে সম্মিলিত হলো। সম্মিলনের এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার মূলে উইলিয়ম টমসনের (পরবর্তীকালে লর্ড কেল্‌ভিন নামে প্রসিদ্ধ)

অবদান সমধিক। *The Dynamic Equivalent of Heat* (1851) শীর্ষক রচনায় তিনি একাজ অনেকটাই সমাধা করেন। টমসন ছিলেন জুল ও হেল্‌ম্‌হোলৎজ্‌ উভয়েরই বন্ধু।

তবে যতই বিভিন্ন দিক থেকে দেখে থাকুন, তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্কের আবিষ্কারকেরা প্রত্যেকেই বাষ্পীয় যুগের পরিমণ্ডল দ্বারা, বিশেষত লোকোমোটিভের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মেয়ারের ভাষায় : 'বয়লারের ভিতর থেকে পাতিত হয়ে বেরিয়ে আসে তাপ; ঘুরন্ত চাকাগুলোতে তা রূপান্তরিত হয় যান্ত্রিক কার্যে; এবং ঘনীভূত হয়ে অ্যাক্সল, টায়ার ও রেললাইনে তা পুনরায় পরিণত হয় তাপে;—এসব ঘটনা ঘটে লোকোমোটিভেই।' যান্ত্রিক কার্য, তড়িৎ ও তাপ—এ সবই শক্তির বিভিন্ন রূপ মাত্র। শক্তির নিত্যতা-তত্ত্ব মধ্য-উনিশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভৌত আবিষ্কার। বিজ্ঞানের নানা শাখাকে এক জায়গায় টেনে আনল যুগোপযোগী এই তত্ত্ব। শক্তি হয়ে দাঁড়াল পদার্থবিদ্যার সর্বজনীন মান—যেন তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পরিবর্তনের 'স্বর্ণমান' হয়ে উঠল। তাপের ক্যালরি, কার্যের ফুট-পাউণ্ড, বিদ্যুতের কিলোওয়াট-ঘণ্টা—এইসব বিভিন্ন শক্তি-এককের মধ্যে নির্দিষ্ট বিনিময়-হার এবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড—শিল্প, পরিবহন, আলো জ্বালানো, এমনকি খাদ্য ও জীবন স্বয়ং ঐ একটি সর্বজনীন শব্দের ওপর নির্ভরশীল বলে প্রতিভাত হলো : *শক্তি*।

শক্তির প্রাপ্যতা

যে-শক্তিবাদের ভবিষ্যৎ এমন আশাময় বলে মনে হয়েছিল, ঐ শতাব্দীর পরবর্তী অধ্যায়ে কিন্তু তাকে গুরুতররূপে সীমিত বলে মনে হলো। কেন না, বোঝা গেল যে তাপগতিবিদ্যার (thermodynamics) দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শক্তির পরিমাণ কতটা সেটা বড়ো কথা নয়, আসল কথা হলো শক্তির প্রাপ্যতা কতটুকু—এবং শক্তির সেই প্রাপ্যতা নিয়তই কমছে। ম্যাক্সওয়েলের আণবিক পরিভাষায়, দ্রুতগতিসম্পন্ন (তপ্ত) আর শ্লথগতিসম্পন্ন (শীতল) অণু-সংবলিত যে-কোনো সিস্টেমে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে অধিকাংশ অণুই মাঝামাঝি গতিতে (কবোষ্ণ) চলছে। কিংবা গিব্‌স-এর (1839-1903) ভাষায় বলা যায়, যে-কোনো সিস্টেমেই এলোমেলো অবস্থা (এনট্রপি) সর্বদাই বাড়তির দিকে থাকে।

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাপের উৎসগুলি ক্রমশ ক্ষয় পেতে পেতে অবশেষে একটা কবোষ্ণ মাত্রায় গিয়ে পৌঁছবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তথাকথিত 'তাপমৃত্যু' ঘটবে; এই পরিণতি অনিবার্য বলে মনে হলো। কেলভিন ছিলেন এই ধারণার সোৎসাহী প্রচারক। সমস্ত দিক থেকে মাঝারিয়ানার এই সম্ভাবনা তাঁকে যেন উল্লসিতই করেছিল। সুদূর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা ছেড়ে ঘরের কথায় এসে তিনি প্রমাণ করে ছাড়লেন যে সূর্য মোটেই অনির্দিষ্টকাল ধরে জ্বলছে না, ফলত পৃথিবীর বয়স কয়েকশো মিলিয়ন বছরের বেশি কিছুতেই নয়। অথচ বিবর্তন-তত্ত্বের আলোকে যাঁরা ব্যাখ্যা করছিলেন, সেই সব ভূবিদদের মতে সময়টা এর চেয়ে অনেক বেশি। শেষ পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞানীর বিপুল মর্যাদাই সেদিন পাল্লাভারি করেছিল।

পদার্থবিজ্ঞানীরা কিন্তু ভুল করেছিলেন। আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর মতো 'শেষের সেদিন ভয়ংকর'-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীকেও একেবারে তছনছ করে দেয় ক্ষমতার নতুন উৎসের আবিষ্কার : সে উৎস পরমাণুর মধ্যে নিহিত, এবং তা বহু বহুগুণে শক্তিশালী। এ কথা না বললে অবশ্য সত্যের অপলাপ হবে যে শেষের সেই ভয়ংকর দিনের ভবিষ্যদ্বাণী করবার সময় সাবধানী কেলভিন একটা 'যদি'-র কথা বলেছিলেন : 'যদি না সৃষ্টির বিপুল ভাণ্ডারে শক্তির এমন সব উৎস থাকে যা এখন আমাদের অজানা।'

শক্তির দর্শন

এই একই পর্বে তাপগতিবিদ্যার জ্ঞান প্রসারিত হয় রসায়নে, এমনকি জীববিদ্যাতেও। এর কৃতিত্ব ল শাতলিয়ে (Le Chatelier, 1850-1936) ও গিব্‌স-এর (1839-1903)। কিছুকালের জন্য মনে হয়েছিল বুঝি যান্ত্রিক শক্তি ও তাপের মতো সরল ও পর্যবেক্ষণযোগ্য ব্যাপারগুলির সাহায্যেই যাবতীয় প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মাখ্-প্রমুখ দার্শনিক এবং অস্‌ওয়ল্ড-প্রমুখ রসায়নবিদ এই ভাবনার মধ্যে পরমাণু-তত্ত্বের অস্বস্তিকর বস্তুবাদ ও আমূল পরিবর্তনশীলতার হাত থেকে মুক্তির একটা রাস্তা পেয়ে গেলেন।

জন্ম নিল নব্য এক প্রত্যক্ষবাদী দর্শন। এই মত অনুযায়ী বস্তুর ও ভৌত তত্ত্ব-প্রকল্পসমূহের (যথা পরমাণু) আর কোনো প্রয়োজন নেই, নিছক বুনিয়াদী পর্যবেক্ষণ থেকেই সরাসরিভাবে সমগ্র বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটানো সম্ভব। 1866-তে ম্যাক্সওয়েল-প্রণীত তাপের গতীয় তত্ত্বে কিন্তু পরমাণুব অস্তিত্বকে ধরে নেওয়া হয়েছিল। এই তত্ত্ব নব্য-প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের উক্ত প্রবণতার বিরোধী। ম্যাক্সওয়েল পুরোপুরি প্রকল্পভিত্তিক অনুমানের ওপর নির্ভর করেই পরমাণুর কথা বলেছিলেন। পরমাণু যে পরিমাপযোগ্য ও গণনযোগ্য এক বাস্তব পদার্থ সেটা সত্য বলে গৃহীত হবার জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণের।

2. এনজিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা

আঠারো ও উনিশ শতকের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মেশিনের জয়যাত্রা। কিন্তু সে অগ্রগতির পিছনে বিজ্ঞানের ভূমিকা তখনো গৌণ। এনজিনিয়ারিং আর ধাতুবিদ্যা, উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৌশল আর অর্থনীতির ভূমিকা তখন মুখ্য। চিরাচরিত হস্তকর্ম-ভিত্তিক প্রকৌশল আর অর্থনৈতিক লাভজনকতাই তার প্রধান চালিকা-শক্তি। তবে বিজ্ঞান ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠছিল, তার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছিল। এইভাবেই পরবর্তী অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর এনজিনিয়ারিং আর ধাতুবিদ্যায় বিজ্ঞানের বর্ধিত গুরুত্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল।

আঠারো ও উনিশ শতকে এনজিনিয়ারিং আর ধাতুবিদ্যায় সৃজনশীলতার জোয়ার এসেছিল। একদিকে বাণিজ্য আর শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, অন্যদিকে নানাবিধ নতুন ক্রিয়া-উপকরণ—এ দুয়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এই পর্বের ইতিহাসে বিশেষ লক্ষণীয়। নতুন যন্ত্রপাতি, নতুন এনজিন, নতুন মালমশলা লাভজনকভাবে ব্যবসা করার নতুন সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে। সুতো আর কাপড়ের চাহিদা বাড়ল বলেই বস্ত্রশিল্পে যন্ত্রপাতির প্রবর্তন ঘটল; কয়লার চাহিদা বাড়ল বলেই বাষ্পীয় এনজিনের প্রয়োগ ঘটল; অজস্র পরিমাণে উৎপাদিত পণ্যকে শস্তায় দূরে দূরান্তরে পৌঁছে দেবার তাগিদেই বন্দর, খাল, রাস্তা আর সেতুর উন্নতি ঘটল, প্রবর্তিত হলো রেল-পরিবহনের মতো সম্পূর্ণ নতুন এক পদ্ধতি। কিন্তু নতুন কোনো কৌশল বা পদার্থের প্রবর্তন হতে না হতে নতুনতর ক্ষেত্রে নতুনতর প্রয়োগ ঘটে তাদের; আগে যা অসম্ভব বা অভাবনীয় ছিল তা সম্ভব হয়ে ওঠে। যেমন, বাষ্পীয় এনজিন তৈরী হয়েছিল পাম্প করার জন্যে; কিন্তু তা চুল্লিতে হাওয়া পাঠানোর জন্যে, লোহা পেটানোর জন্যে এবং শেষ পর্যন্ত মেশিন চালানোর জলচক্রের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। শুধু তাই নয়, আরো পরে জলযানে বা শকটে অধিষ্ঠিত হয়ে তা স্বয়ংচলনকে সম্ভব করে তুলল, জন্ম দিল বাষ্পীয় জাহাজ আর রেলগাড়ির। ঠিক তেমনি, মেশিন-নির্মাণের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে যে-শস্তা লোহা আর ইস্পাত তৈরি হলো তা এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিল, তার সাহায্যে তৈরি হলো বহু মেশিন, বহু গাড়ি, বহু ঘরবাড়ি।

এনজিনিয়ার-বর্গ

যন্ত্রপাতি ও ধাতুবিদ্যার উন্নতির প্রত্যেকটি স্তরে কারিগরেরা নতুন নতুন কৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে থাকতেন এবং যতটুকু বিজ্ঞান তাঁদের পক্ষে কাজে লাগানো সম্ভব তা আয়ত্ত করে নিতেন। অপরদিকে বিজ্ঞানীরা বাধ্য হতেন বিভিন্ন পেশাকর্ম শিখে নিতে, যাতে ক'রে কোন কোন মূলনীতি অনুযায়ী ঐসব কাজ হয় সেগুলি বুঝতে পারেন তাঁরা। 1750 থেকে 1850 পর্যন্ত বিস্তৃত যে মহান পর্ব, সেই সময়কার এনজিনিয়ারদের জীবনী পড়লে এই প্রক্রিয়াটা অনুধাবন করা যায়। সুখের বিষয়, শিল্পযুগের ব্রিটেনের বিখ্যাত ইতিহাসলেখক স্যামুয়েল স্মাইল্‌স-এর রচনা থেকে এ ব্যাপারে প্রচুর মালমশলা পাওয়া যায়। শুধু স্মাইলস নন, পরের প্রজন্মের ডিকিন্‌সন প্রমুখ পণ্ডিত ইতিহাসবিদ এবং 'নিউকোমেন সোসাইটি'র অন্যান্য সদস্যদের রচনাও এ ব্যাপারে সাহায্য করে। ব্রিটেনে এনজিনিয়ারদের অধিকাংশই জীবন শুরু করেছিলেন সাধারণ শ্রমিক হিসেবে; তাঁরা ছিলেন দক্ষ ও উচ্চাশী, কিন্তু সাধারণত নিরক্ষর বা স্ব-শিক্ষিত। যেমন ব্রামা ছিলেন জলকল ও হাওয়া কলের কারিগর; মার্ডক ও জর্জ স্টিফেন্‌সন ছিলেন মিস্ত্রী; নিউকোমেন ও মডস্‌লে ছিলেন কামার। স্মীটন বা ওয়াট-এর মতো যন্ত্রনির্মাতা, ন্যাসমাইথ-এর মতো খনি-এনজিনিয়ারদের সঙ্গে এঁদের তফাৎ এই যে বিজ্ঞানের সঙ্গে শেষোক্তদের যোগাযোগটা ছিল অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ। ফ্রান্সে যেহেতু কর্মশালার চেয়ে রাষ্ট্রের ও সামরিক বিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা ছিল অনেক বড়ো, তাই সেখানে বিদ্যালয়-শিক্ষিত এনজিনিয়ারদের প্রাধান্য বেশি লক্ষিত হয় : জার (Jars), মঁঝ, পঁস্‌লে (Poncelet), ফুর্নিরঁ (Fourneyron), সাদি কার্নো এবং মার্ক ব্রুনেল-এর (1769-1849) মতো মানুষকে ব্রিটেন উপহার হিসেবে পেয়েছিল ফরাসি এনজিনিয়ারিঙের ক্ষেত্র থেকে। 1850-এর পরবর্তী পর্বে বৈজ্ঞানিক প্রাধান্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। প্রধান প্রধান ঘটনাবলীতে জার্মানির ভূমিকা উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে; এই পর্বে জার্মানির সীমেন্‌স পরিবার, অটো এবং ডিসেল-এর পাশে ব্রিটেনের মাত্র একজনেরই নাম করা যায়—পার্সন্‌স।

শিল্পবিপ্লবের গোটা পর্ব জুড়েই ঝোঁকটা ছিল নিত্যনতুন সূক্ষ্মতর যন্ত্রকৌশল উদ্‌ভাবনের দিকে, এবং যন্ত্র ও কাঠামোর কার্যকারিতা বাড়িয়ে তোলার দিকে। এর জন্যে বিজ্ঞানের খুব একটা কিছু করার ছিল না। অবশ্য তাপ-এনজিন বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মতো যেসব ক্ষেত্রে নতুন কোনো ভৌত মূলনীতির প্রথম প্রয়োগ হচ্ছিল, সেগুলোর কথা আলাদা। যন্ত্রকৌশলগুলি তৈরি করা হতো মূলত শ্রমিকের কাজকর্মেরই অনুকরণে। এর জন্য এক ধরনের ব্যবহারিক যান্ত্রিক গণিত অভ্যাস করার দরকার হতো। সে গণিত এত জটিল যে বিদ্যালয়ে তা শেখানো সম্ভব ছিল না; তা ছিল ঘড়ি-নির্মাতা বা তালা-নির্মাতাদের পুরুষানুক্রমিক দক্ষতারই ফসল। এই সব যন্ত্রকৌশলের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ছিল বুদ্ধি ক'রে যুগের শিল্পগত প্রয়োজনগুলি উপলব্ধি করা এবং শ্রম-বাঁচানো কোথায় সম্ভব ও লাভজনক তা জানা। এতরকমের বিচক্ষণতা সবার মধ্যে ছিল না। কাজেই নতুন নতুন উদ্ভাবনকে যাঁরা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখতেন, তাঁরা ক্রমশ নিছক-উদ্ভাবকদের হটিয়ে দিয়ে জায়গা করে নিতে লাগলেন; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সর্বনাশ হতো নিছক-উদ্ভাবকের। মেশিন কিন্তু ঠিকই তৈরি হয়ে যেত। নতুন নতুন উদ্ভাবনকে কাজে প্রয়োগ করার ক্ষমতা যাঁদের ছিল, আর্করাইট তাঁদের অন্যতম। 1750 থেকে উদ্ভাবক-প্রয়োজকেরা হয়ে উঠলেন অপরাজেয়। মানুষের হাতের বদলি হিসেবে নতুন নতুন কৌশল-সংবলিত যন্ত্র প্রথমে বস্ত্রশিল্পে, তারপর শয়ে শয়ে অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হতে লাগল, এমনকি ভোগ্যপণ্য-শিল্পে এবং খোদ ধাতু ও যন্ত্র-নির্মাণ শিল্পেও। কৃষিতে ও খাদ্যের ক্রিয়াকরণ শিল্পেও তাদের অনুপ্রবেশ ঘটল—বিশেষ ক'রে আমেরিকায়; সেখানে দাসপ্রথা বহাল থাকা সত্ত্বেও ভালো জমি যত ছিল, জমি চষবার লোক তত ছিল না। আঠারো ও উনিশ শতকের

এইসব যন্ত্রকৌশলগুলি ছিল বহুবিচিত্র, সভ্যতার অগ্রগতিতে এদের অবদানও প্রচুর; তবু একথা অনস্বীকার্য যে এগুলো ছিল প্রধানত পুরোনো কতকগুলো মূলনীতিবই সমষ্টিগত প্রয়োগ, নতুন নতুন মূলনীতির প্রয়োগ বিশেষ ঘটেনি (যেমনটি ঘটবে বিশ শতকে); কাজেই বিজ্ঞানের কাছে এরা তেমন ঋণী নয়, বিজ্ঞানও এদের কাছে তেমন ঋণী নয়।

কার্যদক্ষতা ও উপযোগিতা

যন্ত্রপাতি ও এনজিনেব (প্রধানত বাষ্পীয এনজিনের) কার্যদক্ষতাকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তোলেন এনজিনিয়াবদের একের পর এক প্রজন্ম। এনজিনকে কীভাবে অধিকতর কার্যোপযোগী কবা যায়, কীভাবে নানান খুঁটিনাটিব উন্নতিসাধন ক'রে এবং উন্নততব নকশা প্রবর্তন ক'রে একক ওজনের জ্বালানি-পিছু এনজিনেব পাওযার বা ক্ষমতা-উৎপাদনের হারকে বাড়িয়ে তোলা যায়—সেটাই ছিল এ পর্বে মূল প্রশ্ন। কার্নোর চিন্তাধাবা, এবং তারই ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা তাপগতিবিদ্যা আস্তে আস্তে এনজিনিয়ারিঙের গোটা ক্ষেত্র জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয উনিশ শতকের শেষার্ধে। তবে এই চিন্তাধারা প্রচলিত এনজিনেব উন্নতিসাধন অপেক্ষা নতুন নতুন বৈপ্লবিক উদভাবনের প্রবর্তনেই বেশি সহায়ক হয়েছিল—টার্বাইন, অন্তর্দহন এনজিন, হিমযন্ত্র বা রেফ্রিজাবেটব ইত্যাদি তারই নিদর্শন।

নতুন এইসব ঘটনাবলীর পরিণতিতে পাওয়াব উৎপাদনের ক্ষেত্রটি বিভক্ত হযে যায় অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রণসাধ্য ও উপযোগী দুটি ভাগে। একদিকে অন্তর্দহন বা *ইন্টার্নাল কম্‌বাস্‌শন এনজিন* থেকে উদ্ভব হয় হালকা পাওয়ার-ইউনিটের; অন্যদিকে বাষ্পীয় *টার্বাইন* প্রকাণ্ড জাহাজ-চালনাকে এবং বন্টনযোগ্য বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদনকে সম্ভব করে তোলে। এ দুটির উদ্ভব উনিশ শতকেই; তবে এরা প্রকৃত অর্থে কার্যকর হয়ে ওঠে বিশ শতকে।

মেশিন টুল

যন্ত্রাদিব ব্যবহার মুনাফাজনক হওয়ায় আবির্ভাব হলো যন্ত্র-নির্মাণ শিল্পের। এই শিল্পের আবির্ভাব হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়, কারণ এবার যন্ত্রের সাহায্যেই তৈরি হতে থাকে যন্ত্র। ফলে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এক ধাপ এগিয়ে যায়। প্রথম যেসব নতুন ধরনের যন্ত্রের উদ্ভব হয়, এবং যেগুলির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, তার মধ্যে ছিল মড্‌স্‌লে-র slide-rest এবং স্ক্রু কাটবার লেদ মেশিন। এই বিপ্লবের মূলে বিজ্ঞানেব অবদান ছিল এইটুকুই যে নিছক চোখে-দেখে মাপজোক স্থির করার বদলে জ্যামিতিক সূত্রের অপেক্ষাকৃত যথাযথ প্রয়োগ ঘটানো হয়—যার নিদর্শন মিলবে মড্‌স্‌লে-র 'প্লেন' ও 'মাইক্রোমিটারে' এবং হুইট্‌ওয়ার্থের প্রমাণ মাপের স্ক্রু-তে। কল-সারাইয়েব মিস্ত্রী আর ঘড়ি-নির্মাতাদের পুরোনো কর্ম-ঐতিহ্য এক্ষেত্রে মিলেমিশে এক হয়ে গেল, জন্ম হলো যন্ত্রবিদ এনজিনিয়ারের। ধাতু এবং ধাতুকে কাজে লাগানোর মতো যান্ত্রিক ক্ষমতা, দুটোই সুলভ হয়ে ওঠায় এ ঘটনাটা সম্ভব হতে পেরেছিল। প্রথমে লোহা ও পরে ইস্পাত সহজলভ্য হয়ে ওঠে—এবং এ দুটিকেই প্রয়োজনমতো সুনির্দিষ্ট আকৃতি দেওয়া সম্ভব। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ এনজিনিয়ারিঙের কাজকর্ম অবশেষে প্রাচীনদেব আওতা ভেঙে বেরিয়ে আসতে থাকে। ন্যাস্‌মাইথ-এর বাষ্পচালিত হাতুড়ি ভাল্‌কান-দেবতার কামারশালের সঙ্গে সম্পর্ক চিরকালের মতো ভেঙে চুরমার করে দেয়। মানুষের হাতের কব্জি ছেড়ে যন্ত্রের কব্জায় চলে যায় যন্ত্র-নির্মাণশিল্প।

নিখুঁতভাবে তৈরি ধাতব যন্ত্রাংশের উৎপাদনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ছিল সামান্যই, কারণ যন্ত্রের সুষ্ঠু কার্যসম্পাদনের ওপরেই তা ছিল নির্ভরশীল। কিন্তু এরই মধ্যে দিয়ে যন্ত্র-এনজিনিয়ারিং হয়ে ওঠে বিজ্ঞান-নির্ভর। আঠারো শতকে নিউটনীয় বলবিদ্যার যেসব

সুবিস্তৃত গণিতীয় প্রয়োগ ঘটেছিল, হাতেকলমে কর্মরত এনজিনিয়ারদের কাছে তার উপযোগিতা ছিল সামান্যই; কেননা, একেবারে শ্রেষ্ঠতম মানের করণকুশলতা ছাড়া কিংবা দু-একটি বিশেষ ধরনের ক্ষেত্র (যথা ঘড়ি) ছাড়া এতদিন যন্ত্রাদি যথেষ্ট নিখুঁতভাবে তৈরি করা যেত না। এমন কি যুদ্ধের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটাবার তাগিদেও যথেষ্ট মসৃণ ও সমান মাপের নলওয়ালা কামান তৈরি করা যায়নি, যার ফলে ক্ষেপণ-বিদ্যা (ballistics)-সংক্রান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলিকেও ঠিকমতো কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু এবার নিখুঁত ধাতু-কর্তনের কল্যাণে, অবস্থাটা বদলে গেল। যান্ত্রিক কৌশলগুলো কীভাবে কাজ করবে তার হিসেব এখন একেবারে নকশা-আঁকার টেবিল থেকেই করা সম্ভব হলো, অর্থাৎ একটা যন্ত্র কীভাবে কাজ করবে তার ভবিষ্যদ্বাণী করা খানিকটা সম্ভব হয়ে উঠল। বদলযোগ্য যন্ত্রাংশের প্রচলনও এখান থেকেই শুরু হয়, এবং তার ফলেই বিশ শতকে ছাঁচে-ঢালা উৎপাদনের প্রক্রিয়া চালু হয়। এর প্রথম আভাস পাওয়া গিয়েছিল 1800 সালে এলি হুইট্‌নি'র (1765-1825) গাদা বন্দুকের কারখানায়, এবং 1784-তে রাশিয়ায় স্থাপিত সার স্যামুয়েল বেন্থামের (জেরেমি বেন্থামের ভাই) নৌবাহিনীর সরঞ্জাম উৎপাদনের কারখানায়। সার স্যামুয়েলের এই কারখানা থেকেই পরে ব্রিটিশ-দপ্তরের কারখানাটি উদ্ভূত হয়, যে-কারখানায় যন্ত্র নির্মাণ করতেন মড্‌স্‌লে। লক্ষণীয় ব্যাপার, এই সমস্ত করণকৌশলই যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাত।

ধাতু-বিপ্লব

নতুন নতুন যন্ত্রের, বিশেষত খনির ও পরে রেলওয়ে, জাহাজ ও গৃহনির্মাণের জন্য ভারি যন্ত্রের চাহিদা ক্রমাগতই বেড়ে চলে, সামরিক চাহিদার তো কথাই নেই। এই পরিমাণ যন্ত্রের চাহিদা মেটাতে হলে প্রয়োজন বেশি বেশি ক'রে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতর মানের ধাতুর সরবরাহ। শিল্পবিপ্লবের মূলে বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রাদি ও বাষ্পীয় এনজিনের আবিষ্কারের গুরুত্ব ছিল সমধিক। লোহা ও ইস্পাতের সহজলভ্যতা, এবং তারই ফলে ধাতুবিদ্যায় যে বিপ্লব ঘটে সেটাও তুলনীয় গুরুত্বসম্পন্ন। যেমন যন্ত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে, তেমনি এক্ষেত্রেও, প্রধানত হাতেকলমে কর্মরত ব্যক্তিদের কৃতিত্বেই বিপ্লব ঘটে, বিজ্ঞানের অবদান বেশ কমই। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে উনিশ শতকের শেষাশেষি, যখন বিপুল মাত্রায় ইস্পাত-উৎপাদন হতে থাকে।

লোহা ও ইস্পাত-সংক্রান্ত ধাতুকৌশল অন্তত তিন হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মধ্যযুগের কামারদের পটুতা ছিল সর্বোচ্চ মানের। কিন্তু তাঁদের অতি যত্নে হাতে-তৈরি জিনিসগুলি ছিল দামী এবং তাঁদের উৎপাদন সীমাবদ্ধ ছিল কুড়ুল, ঘোড়ার নাল, লাঙলের ফলা, অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম—মোটামুটি ধরাবাঁধা এই কয়েকটি চাহিদার মধ্যেই। ষোলো শতকে গোলন্দাজ বাহিনীর নতুন নতুন চাহিদা মেটাতে গিয়ে পশ্চিম ইউরোপের উৎপাদনক্ষমতা তার প্রান্তসীমায় গিয়ে পৌঁছায়, এমনকি ঢালাই লোহার অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সত্ত্বেও। লোহার উৎপাদন তখনো কাঠকয়লার ওপর নির্ভরশীল, এবং তার যোগান ক্রমশ কমতে থাকায় লৌহ-শিল্প সুইডেন, রাশিয়া ও আমেরিকার বনাঞ্চলে হানা দিতে বাধ্য হয়।

লৌহযুগ

বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার ঘটায় লোহার চাহিদা ক্রমাগতই বাড়তে থাকে। লোহা উৎপাদনের পূর্বোক্ত সীমাবদ্ধতা কাটাবার জন্য বাধ্য হয়ে আঠারো শতকের গোড়ায় কাঠকয়লার বদলে '*কোক*' কয়লার ব্যবহার চালু হয়। এই পরিবর্তন ছিল বৈপ্লবিক। এর আগেই গার্হস্থ্য ও শিল্পগত জ্বালানি হিসেবে কাঠের জায়গা নিয়েছিল কয়লা। ফলে এখন বনাঞ্চলের ওপর কয়লাখনির

আধিপত্য সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। কয়লার সাহায্যে লোহা উৎপাদনের সম্ভাবনা নিয়ে বহুকাল ধরেই জল্পনাকল্পনা হয়েছে, কিন্তু সাফল্য অর্জন করার জন্য প্রয়োজন ছিল অনেকগুলো ভৌত ও রসায়নিক সমস্যার সমাধান করা। এবং সেগুলোর সমাধান ছিল পূর্বকালীন বিজ্ঞানের সাধ্যের বাইরে। সমাধানগুলো হওয়া চাই কার্যকর, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, লোহা বিক্রী করতে পারা চাই লাভজনক দামে। আদি পরিকল্পনাকারদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল অতি-উচ্চাশী অর্থবিনিয়োগ এবং একচেটিয়া ব্যবসা করার প্রয়াস। স্টুর্টভান্ট এর উদাহরণ।

কোল্‌ব্রুকডেল-এর ডার্বি-পরিবার অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতা সহকারে এই সব সমস্যার সমাধান করেন। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে তাঁরা শস্তা ঢালা লোহার যুগের উদ্বোধন করেন। ঢালা লোহার (pig iorn) দাম 1728 সালে ছিল টন-পিছু 12 পাউন্ড; 1802 সালে তা হয়ে দাঁড়াল 6 পাউন্ড; কিন্তু ঢালা লোহারও সীমাবদ্ধতা ছিল। একথা ঠিকই, রেললাইন, স্তম্ভ, সেতু, চাকা, এনজিনের চোঙ সবই ঢালা লোহা দিয়ে তৈরি করা যায়। কিন্তু নির্মাণযন্ত্র বা এনজিনের সক্রিয় অংশগুলো তা দিয়ে তৈরি করা যায় না। যেখানে প্রয়োজন টান (tension) বা দৃঢ়তা, সেখানে পেটা লোহা (wrought iron) ছাড়া গতি নেই; যেখানে তদুপরি কাঠিন্য ও নমনীয়তাও দরকার, সেখানে ব্যবহার করতে হবে ইস্পাত। হান্টসম্যান (1740) ও কর্ট (1784)-এর পদ্ধতিগুলিতে এ সমস্যার আংশিক সমাধান মিলেছিল। এই দুটি পদ্ধতিতেই যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় থাকলেও, প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের কোনো অবদানই এগুলির মধ্যে ছিল না। এর আগে রেওমূর-এর *L'Art de Convertir le Fer Forgé en Acier* (1722) থেকে সেযুগের বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা দুটোই বোঝা গিয়েছিল। সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে রেওমূর ইস্পাত-নির্মাতাদের গুপ্ত রহস্য ভেদ করতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন যে ইস্পাত হচ্ছে এমন লোহা যাতে না-কম না-বেশি পরিমাণ কার্বন থাকে। তিনি এ-ও দেখেছিলেন যে ঢালাই লোহা আর পেটা লোহা একত্রে গলিয়ে ইস্পাত তৈরি করা যায়। তাঁর পরীক্ষার ফলাফল তিনি প্রকাশও করেছিলেন। স্বাধীন বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার অধিকারের সপক্ষে এটি একটি বিরাট ঘটনা। কিন্তু তাঁর কাজের সুযোগ নিতে সেদিন কেউই এগিয়ে আসেনি। লৌহনির্মাতারা হয় ছিল নিরক্ষর, না হয় রেওমূরের বাতলানো পদ্ধতি তাদের মতে ছিল অবাস্তব।

শেষ-আঠারো এবং প্রথম-উনিশ শতকে লোহার উৎপাদন চলে পুরো দমে, তুলনায় ইস্পাত-উৎপাদন অনেক পিছিয়ে থাকে। গ্যাস কারখানায় কর্মরত নীল্‌সন (1792-1865) নামক এক রসায়নবিদ প্রথমে সংকুচিত ও পরে উত্তপ্ত গ্যাসের ঝাপটা দেওয়ার পদ্ধতির প্রচলন করেন। এই পথেই উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার জন্য নানারকম উন্নতি ঘটানোর প্রয়াস দেখা যায়। এসবই ছিল নতুন যান্ত্রিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে যুগপ্রাচীন এক পদ্ধতিকে বদলে নেবার প্রয়াস।

ইস্পাত-যুগ

ঢালাই ইস্পাত ব্যাপকভাবে উৎপাদনের জন্য বেসেমারের উদ্‌ভাবিত সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিটি ছিল এ ব্যাপারে এক চূড়ান্ত পদক্ষেপ। তাঁর কনভার্টারের ভিতরে গলিত ঢালা লোহার মধ্যে দিয়ে বাতাস চালানো হয়; এই বাতাস কার্বন জ্বালিয়ে যথেষ্ট তাপের সঞ্চার ক'রে উৎপন্ন ইস্পাতকে গলিত অবস্থায় রাখে। এই উদ্‌ভাবনকে বলা যেতে পারে এক আধা-বৈজ্ঞানিক ফল। কারণ যদিও এর কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল না, তবু এই ফল পাওয়া গিয়েছিল পরীক্ষার মাধ্যমেই। বেসেমার বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন নির্ভেজাল এক উদ্‌ভাবক। যেটুকু বিজ্ঞান জানলে কাজ চলে, সেটুকুই তিনি জানতেন, তার বেশি নয়। নানারকম ধাতু সম্পর্কে

তাঁর খানিকটা অভিজ্ঞতা থাকলেও, লৌহশিল্প সম্পর্কে কিছুই অভিজ্ঞতা ছিল না। এটা লক্ষণীয় যে কোনো লৌহনির্মাতা কিংবা ধাতুবিদ্যার কোনো অধ্যাপকের পক্ষে ঐরকম প্রস্তাব করা সম্ভবই ছিল না; উভয় মহলই এ ব্যাপারে এত বেশি জানতেন যে ঐ ধরনের পদ্ধতির ব্যর্থতা সম্পর্কে তাঁদের মনে এতটুকুও সন্দেহ জাগত না!

1856 সালে বেসেমার-ইস্পাতের আবির্ভাব হয়। তার অল্পকাল পরেই পুরোনো একটা পদ্ধতি নবজীবন লাভ করে। ওপ্‌ন-হার্থ বা রিভার্বারেটরি চুল্লিতে সীমেন্‌স-এর তাপ-পুনরুৎপাদনের নীতির প্রয়োগ ঘটানো হয়। এই নীতি অনুযায়ী, পরিত্যক্ত তপ্ত গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে প্রবেশকারী বাতাসের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলা যায়। এইভাবে অনেক পরিমাণ ইস্পাতের মশলাকে গলানো যায় এবং ঢালা লোহা, পরিত্যক্ত লোহা ও লৌহ-আকরিক দিয়ে রেওমূর-পদ্ধতিতে কাজ শুরু করা যায়। 1867 থেকে এই ওপ্‌ন-হার্থ পদ্ধতি বেসেমার কনভার্টারের সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিতে শুরু করে।

কিন্তু দুটি পদ্ধতিরই ছিল এক মস্ত সীমাবদ্ধতা: সুইডেন, স্পেন ও লেক সুপিরিয়র অঞ্চলের মোটামুটি বিশুদ্ধ লৌহ-আকরিক ছাড়া এগুলির প্রয়োগ করা যেত না। অথচ বিশুদ্ধ লৌহ-আকবিক খুব সুলভ ছিল না। ক্লীভল্যাণ্ড বা লরেন-এব অবক্ষেপগুলি থেকে অনেক বেশি পরিমাণ আকরিক পাওয়া যেত ঠিকই, কিন্তু সেই অবক্ষিপ্ত আকরিককে ব্যবহার করবার আগে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় আরেকটা চূড়ান্ত উন্নতিসাধনের প্রয়োজন হলো। সেটি হচ্ছে, ক্ষতিকারক ফসফরাসকে টেনে নেবার জন্য ক্ষারীয় প্রলেপেব প্রবর্তন। এই আবিষ্কারটি করেন গিল্‌ক্রাইস্ট টমাস, 1879 সালে। এটি ছিল পুরোদস্তুর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। জীবিকানির্বাহের জন্য টমাসকে স্টেপনি'র এক পুলিশ-আদালতে কেরানীর চাকরি করতে হতো বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন ধাতুবিদ্যাতত্ত্বে ওস্তাদ। কী তিনি করতে চাইছেন সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল পরিষ্কার। লন্ডনের ভূগর্ভস্থ এক কক্ষে যেসব পরীক্ষা তিনি করেন, তিন বছরের মধ্যেই তাকে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন-পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তী শতকে শিল্পসংশ্লিষ্ট গবেষণার যে ধারা চালু হয়, টমাসের কাজ ছিল তারই পূর্বাভাস।

এই তিনটি পদ্ধতি মিলে সূত্রপাত হয় ইস্পাতযুগের। প্রথমে ইস্পাত খুব দ্রুত এনজিনিয়ারিঙের নির্মাণ-দ্রব্য হিসেবে কাঠের জায়গা কেড়ে নেয়, তারপর রেললাইন, জাহাজ ও কামানের ক্ষেত্রে ঢালাই লোহার জায়গা নেয়। শস্তা ইস্পাতই ছিল শেষ-উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি। ইস্পাতের ওপর নির্ভর ক'রেই তা সমুদ্রবাহিত বাণিজ্যকে বাড়িয়ে তোলে, প্রাচ্য উপনিবেশগুলিকে রেলওয়ে ও বন্দর-ব্যবস্থার সাহায্যে কাজে লাগায়, এবং ইস্পাতের ওপর নির্ভর ক'রেই তা নৌযুদ্ধ ও ভূমিযুদ্ধের উত্তরোত্তর ব্যয়বহুল প্রস্তুতি নিতে থাকে।

3. তড়িৎ ও চুম্বকক্রিয়া

নিউটনীয় যুগের অবসানের পর বিজ্ঞানের প্রথম যে নতুন শাখাটির উদ্ভব হয় সেটি হলো তড়িৎ। তার একটা কারণ এই যে ভৌত বিজ্ঞানের এই একটি দিকই নিউটনের মনোযোগ এড়িয়ে গিয়েছিল, কাজেই অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে নিউটনের বিশাল মর্যাদার কথা ভেবে ক্ষুদ্রতর গবেষকদের ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার কারণ ছিল না। তড়িৎ নিয়ে মানুষের আগ্রহ বহুকালের এবং সে আগ্রহ প্রবাদপ্রতিম। একেবারে আদি কাল থেকেই মানুষ তৈলস্ফটিককে (amber) মহামূল্যবান বলে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সম্ভবত এটাও লক্ষ্য করেছে যে ঘষে নিলে তৈলস্ফটিক ছোটো ছোটো বস্তুকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা অর্জন করে। স্বাভাবিকভাবেই এর

সঙ্গে চুম্বকের আরো শক্তিশালী আকর্ষণ-ক্ষমতার তুলনা এসে পড়ে। এই দুটিকে মিলিয়ে প্রাচীন কালের সাধারণ· চুম্বক সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার বিকাশ ঘটেছিল। তৈলস্ফটিক এবং বিশেষ করে চুম্বক যেন জাদুস্পর্শে নিজের গুণকে অন্য পদার্থে সঞ্চারিত করে—এই ভাবনা থেকেই জন্ম নিয়েছিল আসক্তি ও আকর্ষণেব মতবাদ; জন্ম নিয়েছিল এই বিশ্বাস যে বিশেষ ধরনের পদার্থ বিশেষ বিশেষ গুণের আধার এবং উপযুক্ত সাধনপ্রক্রিয়ার দ্বারা ঐ বিশেষ গুণকে আবাহন করা সম্ভব।

চুম্বকবিজ্ঞানের জন্ম হয় তখনই, যখন একটা ভালো কাজে ঐ গুণকে ব্যবহার করা হলো—নৌ-কম্পাস প্রবর্তনে। কম্পাসবিদ্যা পিটার দ পিল্‌গ্রিম এবং রবার্ট নর্মানের মাধ্যমে গিলবার্টের কাছে গিযে পৌঁছয় এবং সেখান থেকেই চুম্বক সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুধাবনের শুরু।

গিলবার্ট রচিত *De Magnete* (1600)-এর বিষয়বস্তু কেবল চুম্বকই নয়; আকর্ষণ-নীতি সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছিল এ গ্রন্থে। তৈলস্ফটিক ও স্থিতিসাম্যযুক্ত কাঁটা বা ভেসোরিয়াম-এর আবিষ্কারও এর অন্তর্গত ছিল। এই ভেসোরিয়াম্‌ই ছিল পৃথিবীর প্রথম বৈদ্যুতিক যন্ত্র। পরবর্তীকালের ইলেকট্রোস্কোপ, গ্যালভানোমিটার ইত্যাদি যন্ত্র এই ভেসোরিয়ামেরই উত্তরসূরী।

তড়িৎ : আদিপর্ব

গিলবার্টের চুম্বকচর্চা মহাকর্ষ-তত্ত্বের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল; কিন্তু তাঁর তড়িৎ-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার আর প্রায় কোনোই বিকাশ ঘটেনি সতেরো শতকে। তিনি যতদূর এগিয়েছিলেন, প্রায় সেইখানেই থেমে থাকে তড়িৎচর্চা। অথচ সতেরো শতক ছিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক মহান পর্ব। প্রথমে মনে হয়েছিল, তড়িৎচর্চা থেকে লাভজনক কিছু পাওয়া যাবে না, এ এক ধরনের দার্শনিক খেলনা। আর যেহেতু সেই সময়ে বিজ্ঞানের মূল গতি ছিল বলবিদ্যা ও শূন্যাবস্থা সংক্রান্ত চর্চার দিকে, তাই এদিকটা বিশেষ আগ্রহ জাগায়নি। তবে শূন্যাবস্থা সংক্রান্ত কিছু কিছু পরীক্ষা পরবর্তীকালের বিরাট ঘটনাগুলির সঙ্গে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছিল। 1665 সাল নাগাদ ভ্যাকুয়াম পাম্পের উদ্‌ভাবক ফন গেরিক একটি ঘুরন্ত গোলক তৈরি করেন। ঐ ঘুরন্ত গোলক থেকে ঘর্ষণের দ্বারা স্ফুলিঙ্গ বার হতো। পরবর্তী একশো বছর ধরে যত বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্মিত হয়, ঐ ঘুরন্ত গোলক ছিল সেসবের মডেল। কিন্তু ফন গেরিকের নিজের কাছে ওটি ছিল তাঁর মহাজাগতিক তত্ত্ব প্রমাণের মডেল! 1675 সালে পিকার (Picard, 1620-82) লক্ষ্য করেন, অন্ধকারে ব্যারোমিটার ঝাঁকালে সবুজ আলো বেরোয়—যাকে বলা হয় অস্থির ফসফরাস (mercurial phosphorus)। এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে নিউটনের সহকারী হক্‌স্‌বি আঠারো শতকের গোড়াতে দেখান যে ঘর্ষণ থেকে কেবল যে তড়িৎই উৎপন্ন হয় তা নয়, শূন্যতার মধ্যে আলোকদীপ্তিও উৎপন্ন হয়। এটাই আমাদের কালের যাবতীয় 'ফ্লুওরেসেন্ট' আলোর অগ্রদূত। তবে কী ক'রে এ ঘটনা ঘটে সে-বিষয়ে তিনি কোনো গবেষণা করেন নি।

গ্রে : পরিবাহী ও অপরিবাহী

নিউটনের আরেক অনুগামী, স্টিফ্‌ন গ্রে (1666-1736) অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যান এবং 1739 সালে এক চমকপ্রদ আবিষ্কার করেন—সেটি হলো তড়িৎপ্রবাহ। শুরুতে প্রায় ঘটনাচক্রে, কিন্তু তারপর একের পর এক যুক্তিসংগত ধাপে, তিনি এই ধারণায় উপনীত হন যে কাচের নল ঘষে যে-তড়িৎ উৎপন্ন হয় তা বহুদূর অবধি বার্তা বহন করতে পারে। একেবারে প্রথমে তিনি লক্ষ্য করেন একটি নলের এক প্রান্তে রাখা কতকগুলো কর্ক ছোটো ছোটো কাগজের বা ধাতুর টুকরোকে আকর্ষণ করছে। তখন তিনি কর্ক্‌গুলোর প্রান্তে দণ্ড লাগানোর

কথা ভাবলেন; তারপর ভাবলেন দণ্ডের প্রান্তে বোতাম লাগাবার কথা; এবং তারপর সুতোয়-বাঁধা গোলক লাগাবার কথা। দেখা গেল এর প্রত্যেকটিই একইভাবে আকর্ষণ করছে। শেষ পর্যন্ত তিনি তড়িৎকে রেশমের গিঁট-বাঁধা দড়িতে চড়িয়ে তাঁর ঘরের ভিতর থেকে সারা বাগান ঘুরিয়ে আনলেন। ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের এই ছিল প্রথম কার্যকর নিদর্শন। গ্রে যে মৌলিক আবিষ্কারটি করেন সেটি হলো, তড়িৎ হচ্ছে এমন একটা কিছু যা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বহে যায়, কিন্তু বস্তুর চলনের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না—তড়িৎ হচ্ছে এক *ভারহীন অধরা প্রবাহী (imponedrable fluid)*। কাচ বা সিল্কজাতীয় পদার্থের মধ্যে তড়িৎ উৎপন্ন করা যায় ও এদের মধ্যে তড়িৎকে ধরে রাখা যায়। তিনি এগুলির নাম দেন '*ইলেকট্রিক*'; আজ আমরা যাকে বলি অপরিবাহী বা '*ডাই ইলেকট্রিক*'। এদেব মধ্যে দিয়ে তড়িৎ পরিবাহিত হতে পরে না। অপরদিকে, ধাতু বা ভিজে সুতোর মধ্যে তড়িৎ উৎপন্ন করা যায় না। এগুলিকে বলা হয়েছিল '*নন-ইলেকট্রিক*' বা পরিবাহী।

দুফে : দ্বিবিধ তড়িৎ

সহজ অথচ কৌতূহলোদ্দীপক এইসব পরীক্ষার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং তড়িৎচর্চা ক্রমশ শৌখীন ও মজাদার একটা ব্যাপার হয়ে উঠতে থাকে। শৌখীন ব্যক্তিরা এ নিয়ে মেতে ওঠেন। ফ্রান্সে দুফে 1733-এ দেখলেন, তড়িৎ দু ধরনেব হয় : কাচ-জাতীয ও লাক্ষা-জাতীয়। কাচ ঘ'ষে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয় তা কাচ-জাতীয়; তৈলস্ফটিক ঘ'ষে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয় তা লাক্ষা-জাতীয়। বহু লোকে বৈদ্যুতিক যন্ত্র বানাতে শুরু কবে দিল, এবং পয়সা নিয়ে খেলা দেখাতে লাগল।

লাইডন জার ও বৈদ্যুতিক শক

বৈদ্যুতিক প্রবাহীকে বোতলে পুরে রাখাব ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই মাথা চাড়া দিল। 1745-এ ফন ক্লীস্ট (মৃত্যু 1748) নামক এক পোমেরানীয় পাদ্রী একটা পেরেকের মাধ্যমে তড়িৎ পাঠাবার চেষ্টা করেন। একহাতে বোতলটা ধ'রে অন্যহাতে পেরেকটা ছোঁয়া মাত্র তাঁর যে-অভিজ্ঞতা হয়, নিঃসন্দেহে সেটাই হচ্ছে প্রথম কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক। এর মাস কয়েক পরে, মনে হয় স্বতন্ত্রভাবেই, হল্যান্ড থেকে মাস্‌চেনব্রুক (Muschenbroek, 1692-1761) অনুরূপ পরীক্ষার খবর দেন। যেহেতু তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-নির্মাতা, এবং পণ্ডিতমহলে তাঁর প্রচুর জানাশোনা ছিল, তাই লাইডন জার (Leyden Jar) নামে অভিহিত জিনিসটির সঙ্গে তাঁর নামই জড়িত।*

এই আবিষ্কারের ফল হয়েছিল আক্ষরিক অর্থেই বিস্ফোরক। সকলেই চাইল শক নিয়ে পরীক্ষা করতে, অন্যের ওপর শক-এর প্রভাব পরীক্ষা করতে। রাজসভাগুলোতে তড়িৎ হয়ে উঠল সবচেয়ে শৌখীন ব্যসন। ফ্রান্সের রাজা তাঁর গোটা রক্ষীবাহিনী-ব্রিগেডের বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা করেন : লাইডন জারের সারি থেকে পাঠানো শক তাদের একসঙ্গে লাফাতে বাধ্য করত।

* 1575 সালে স্থাপিত লাইডন বিশ্ববিদ্যালয় নেদারল্যান্ডের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো আঠারো শতকে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই উদ্‌ভাবিত হয় **লাইডন জার**। তড়িৎ আধানকে মজুত করে রাখা ও উচ্চতর ভোল্টেজ পাওয়া সম্ভব হয় এর ফলে। এই বয়াম (জার) গুলির ভিতরে থাকত ধাতুর পাত, এবং বাইরের দিকটা হতো কাচ-নির্মিত। ভিতরের ধাতুপাতগুলির একটিতে ধনাত্মক ও অন্যটিতে ঋণাত্মক তড়িৎ-আধান সঞ্চিত থাকত। লাইডন জাব থেকেই পবে বৈদ্যুতিক কনডেনসারের উদ্‌ভব হয়, যা তড়িৎবর্তনীর অঙ্গ হয়ে ওঠে। —অনুবাদক

ফ্র্যাঙ্কলিন : ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ

তড়িৎ নিয়ে এত বেশি হৈ হৈ হতে লাগল যে সুদূর ফিলাডেল্‌ফিয়ায় বেন্‌জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের কানে এর খবর পৌঁছল এবং তিনি কয়েকটি যন্ত্রপাতি চেয়ে পাঠালেন। পোক্ত কাণ্ডজ্ঞান এবং নিজের নকশা অনুযায়ী তৈরি যন্ত্রপাতির সাহায্যে তিনি বুঝতে পারলেন এতদিন তড়িৎ-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার গোলমালটা কোথায় হচ্ছিল। তিনি যে ব্যাখ্যা দিলেন, তা আজও পর্যন্ত গ্রাহ্য। তিনি বললেন, তড়িৎ দু-ধরনের হয় না, এক ধরনেরই হয়। তিনি কল্পনা করলেন যে তড়িৎ হচ্ছে এক ধরনের নির্বস্তুক প্রবাহী যা সকল বস্তুর মধ্যে উপস্থিত। যতক্ষণ কোনো বস্তু ঐ প্রবাহী দ্বারা সম্পৃক্ত থাকে ততক্ষণ তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। যদি আরো কিছু প্রবাহী যোগ করা হয়, তাহলে বস্তুটি ধনাত্মকভাবে আহিত হয়; যদি কিছু প্রবাহী বার করে নেওয়া হয় তাহলে আহিত হয় ঋণাত্মকভাবে। বৈদ্যুতিক প্রবাহী তার ঈপ্সিত মাত্রায় ফিরে যেতে চায়, সেইকারণেই বৈদ্যুতিক আকর্ষণ দেখা যায়। ঈপ্সিত মাত্রায় ফিরে যাওয়ার এই প্রবণতা যখন খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন দেখা যায় স্ফুলিঙ্গ ও শক। এই 'প্রবাহী' কথাটির বদলে যদি বসাই ইলেকট্রন (যা কার্যত ভারহীন) এবং + চিহ্নের বদলে যদি বসাই - চিহ্ন (কারণ ঋণাত্মকভাবে আহিত বস্তুতেই ইলেকট্রনের আধিক্য থাকে), তাহলে ফ্র্যাঙ্কলিনের এই ব্যাখ্যাই হয়ে দাঁড়ায় তড়িৎ-আধানের আধুনিক তত্ত্ব।

বাজকাঠি

লাইডন জার-এর ক্রিয়ার ব্যাখ্যা এবং এই সরলীকরণ—এইগুলিই হচ্ছে তড়িৎবিদ্যার ক্ষেত্রে ফ্র্যাঙ্কলিনের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক অবদান। এর ফলে তাঁর বৈজ্ঞানিক খ্যাতি অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সাধারণভাবে গোটা পৃথিবীকে যা অবাক করে দিয়েছিল তা হলো লেবরেটরির ভিতরের বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ আর আকাশের বজ্রের মধ্যে তাঁর সাদৃশ্য-সন্ধান। ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশ থেকে বজ্র টেনে এনে তিনি দেখালেন যে ওটা হচ্ছে বিদ্যুৎ। তাঁর প্রখর ব্যবহারিক বুদ্ধি তাঁকে তৎক্ষণাৎ বোঝালো যে বজ্রপাতের দরুন যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, যার প্রকোপ আমেরিকাতে বিশেষ ক'রে প্রবল, তা বোধহয় *ঠেকানো* সম্ভব। 1753-এ তিনি তাঁর *বাজকাঠি* পরীক্ষা করে দেখলেন। এই উদ্‌ভাবনের মধ্যে দিয়েই তড়িৎ-বিজ্ঞান প্রথম ব্যবহারিক কাজে লাগল। ফ্র্যাঙ্কলিনের দেশাত্মবোধ, বরং বিদ্রোহী মনোভাব বলাই ভালো, ইংলন্ডে বিচিত্র সব প্রতিক্রিয়া জাগাল। 1780 সালে রাজা তৃতীয় জর্জ হুকুম দিলেন, কিউ প্রাসাদের বাজকাঠিগুলোর মাথা ছুঁচলো হবে না, হবে গোল। ফ্র্যাঙ্কলিনের প্রস্তাবমতো ওগুলো হবার কথা ছুঁচলো। রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি সার জন প্রিঙ্গল (1707-82) রাজার হুকুম মানতে না পারায় তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। সমসাময়িক এক রসিক পদ্যকারের ছড়ায় এই বিবাদের ছবি ধরা রয়েছে :

রাজা জর্জ চাইলে কি বাঁচাতে ও বাঁচতে,
খোঁচামুখো বাজকাঠি বোঁচা ক'রে চাঁচতে?
প্রজাকুল পড়ে গেল বিকলে,
ভাবে—তবে, তাহলে?
পাকামাথা ফ্র্যাঙ্কলিন কানে কথা তোলে না
একমনে গড়ে চলে বাজধরা খেলেনা,
খোঁচাটা খুঁচিয়ে তোলে কোনো কিছু না বলে।

While you, great George, for safety hunt,
And sharp conductors change for blunt,

The nation's out of joint.
Franklin a wiser course pursues,
And all your thunder fearless views,
By keeping to the point. (লিমেরিকটির অনুবাদ . সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়)

কুলম্‌ ও আকর্ষণ-সূত্র

এইসব অগ্রগতি সত্ত্বেও তড়িৎ ও চুম্বকক্রিয়া কিন্তু রহস্যময় এক অধরা প্রবাহীই রয়ে গেল। যতদিন না তাদের মাপবার কোনো পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন তাদের নিয়ে পরিমাণগত চর্চা শুরু হওয়া সম্ভব ছিল না। ঠিক এই কাজটিই করলেন কুলম্‌ (1738-1806), 1785 সালে। লক্ষণীয়, তাঁর আশু উদ্দেশ্য ছিল নাবিকদের কম্পাস যন্ত্রের উন্নতিসাধন। সূক্ষ্ম তন্তুতে করে একটি শলাকাকে ঝুলিয়ে রাখবার এক পদ্ধতি বার করেন তিনি। সেই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে কুলম্‌ প্রথমে চৌম্বক মেরুদ্বয়ের মধ্যে, পরে তড়িৎ-আধানসমূহের মধ্যে ক্রিয়ারত বলগুলিকে পরিমাপ করলেন। এইটিই হলো torsion balance—আজকের দিনের অতি সূক্ষ্ম সংবেদী বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আদিরূপ। স্বতন্ত্রভাবে যন্ত্রটি মিশেল-ও (Michell, 1724-93) আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেটি ব্যবহার করেছিলেন ক্যাভেণ্ডিশ (1731-1810)। এতদিন ধরে যা কেবল অনুমান করা হচ্ছিল, কুলম্‌ তাঁর যন্ত্রের সাহায্যে এবার তাকে প্রমাণ করলেন। তিনি দেখালেন, চৌম্বক মেরুসমূহের মধ্যে, এবং তড়িৎ আধানসমূহের মধ্যে যে বল ক্রিয়া করে তা অভিকর্ষের নিয়মই মেনে চলে, অর্থাৎ সেই বল দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত-অনুপাতিক (inversely proportional)। এর আগেই 1766-তে প্রিস্টলী এবং বিশেষ করে 1771-এ ক্যাভেণ্ডিশ লক্ষ্য করেছিলেন যে আহিত কোনো পরিবাহীর *ভিতরে* কোনো আধান পাওয়া যায় না; তাঁদের পর্যবেক্ষণও ঐ একই সিদ্ধান্তের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিল। এইসব পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে নিউটনীয় বলবিদ্যার যাবতীয় সূত্রাদি তড়িতের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হলো। পার্থক্য কেবল একটাই—তড়িতের ক্ষেত্রে শুধু আকর্ষণকারী বল নয়, বিকর্ষণকারী বলেরও অস্তিত্ব আছে।

প্রাণিজ তড়িৎ : গাল্‌ভানি

তীক্ষ্নদৃষ্টি পর্যবেক্ষকরা আগেই লক্ষ্য করেছিলেন যে লাইডন জার যে শক দেয় আর বিবিধ *বৈদ্যুতিক মৎস্য*, বিশেষ করে *বৈদ্যুতিক 'রে'* মাছ (যার আরেক নাম 'টর্পেডো'—ঘুমপাড়ানি)* যে শক দেয় তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। 1776 সালে ক্যাভেণ্ডিশ তো চামড়াকে লাইডন জারের সঙ্গে যুক্ত ক'রে 'টর্পেডো' মাছের একটা কার্যকর মডেলই বানিয়ে ফেলেছিলেন। এর থেকে জন্ম নেয় প্রাণিজ তড়িতের ধারণা। বিভ্রান্তিকর এবং ব্যর্থ নানা প্রয়াস চলে এ-কে আবিষ্কারের জন্য। 1780 সালে বোলোনিয়া (Bologna)বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরস্থানবিদ্যার অধ্যাপক গাল্‌ভানি (1737-98) ঘটনাচক্রে এমন সব পরীক্ষা করেন যাতে প্রাণিঘটিত মিশ্রণাদি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে যায়। তিনি দেখেন যে যখনই কোনো স্ফুলিঙ্গের উদ্ভব হয় তখনই কয়েক জোড়া ব্যাঙের পা সংকুচিত হচ্ছে। ঐ ঘটনার জন্য কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রের

* এদের পাখনায় বৈদ্যুতিক অঙ্গ থাকে। তা থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহের দ্বারা এরা শিকারকে অবশ করে ফেলে অথবা আত্মরক্ষা করে। এই বিদ্যুৎপ্রবাহ যথেষ্ট কড়া, মানুষকে পর্যন্ত কাবু করে ফেলে। শোনা যায়, প্রাচীন গ্রীকরা নাকি এই মাছগুলিকে 'শক্‌ থেরাপি'র প্রয়োজনে ব্যবহার করত।

—অনুবাদক

উপস্থিতি যে মোটেই অপরিহার্য নয় সেটা বুঝতে তাঁর ছ বছর সময় লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখেন, দুটি স্বতন্ত্র ধাতু ব্যাঙের পায়ের স্নায়ুতে ও পেশিতে ঠেকালেই পা সংকুচিত হবে।

বিদ্যুৎপ্রবাহ ও ব্যাটারি : ভল্টা

গাল্‌ভানি আসলে বিদ্যুৎপ্রবাহের ঘটনাটিই আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন, কিন্তু বুঝতে পারেন নি। স্নায়ুসংক্রান্ত শারীরতত্ত্বে আগ্রহ থাকায় ঐ পরীক্ষা থেকে তিনি বরং প্রাণিজ তড়িতের প্রমাণ সংগ্রহ করলেন। গাল্‌ভানিরই স্বদেশীয়, পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আলেসান্দ্রো ভল্টা'র (1745-1827) মনটি ছিল অপেক্ষাকৃত যুক্তিশাসিত। গাল্‌ভানির পরীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য ভল্টাই উপলব্ধি করলেন। 1795 সালে তিনি দেখালেন যে তড়িৎ উৎপন্ন করার জন্য আদৌ কোনো প্রাণীর প্রয়োজন নেই, দুটি স্বতন্ত্র ধাতুর খণ্ডকে একসঙ্গে তরলের মধ্যে ডোবালে বা ভিজে কাপড় দিয়ে তাদের যুক্ত করলে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। এইভাবে ভল্টা প্রথম তড়িৎকোষ তৈরি করলেন, যা 'ভল্টাইক সেল' নামে পরিচিত।

আঠারো শতকের শেষের দশকগুলিতে তড়িৎ-চর্চার যে অগ্রগতি ঘটল তা বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার সম্মিলনেরই ফসল। শুধু তাই নয়, যা কিছু একই সঙ্গে অভিনব এবং কার্যকর তারই প্রতি সেযুগে যে বিশেষ মদত দেওয়া হতো, তড়িৎ-চর্চার এই অগ্রগতি তারও এক স্পষ্ট নিদর্শন। তড়িতের শারীরবৃত্তীয় কার্যকারিতা লক্ষ্য ক'রে ডাক্তার ও হাতুড়েরা এ নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁরা চিকিৎসার নতুন নতুন পদ্ধতির সন্ধানে ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ডাক্তার জন গ্রাহাম। তাঁর 'চিকিৎসা-মন্দির'-এর সভানেত্রী ছিলেন কুমারী এমা লায়ন্‌স—পরবর্তীকালের 'লেডি হ্যামিল্টন'।* একই সঙ্গে, খানিকটা ডাক্তারদেরই সহায়তায়, রসায়নের গ্যাস-বলবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিপ্লবের কাজে লাগে তড়িৎ। সে-বিজ্ঞান তখন তার বিকাশের তুঙ্গে। 1800 সালে ডাক্তার কার্লাইল (1748-1810) নামে লন্ডনের এক শল্যচিকিৎসক, এবং তাঁরই বন্ধু উইলিয়ম নিকল্‌সন (1753-1816) নামে এক এনজিনিয়ার তথা সেল্‌সম্যান তথা বিজ্ঞান পুস্তক-প্রকাশক সদ্য-উদ্ভাবিত ব্যাটারিকে কাজে লাগিয়ে জলকে বিশ্লিষ্ট করেন তার দুই মৌলিক উপাদানে—হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনে। এর দ্বারা তাঁরা রসায়নের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করেন এবং বিজ্ঞানের এক নতুন উপ-শাখার সূত্রপাত করেন—যার নাম তড়িৎ-রসায়ন।

গাল্‌ভানিক ব্যাটারি সেসময়কার যেকোনো উঁচু দরের লেবরেটেরির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠল; যেমন অপরিহার্য ছিল পঞ্চাশ বছর আগে লাইডন জার। কিন্তু গোড়ার দিকে ঐ ব্যাটারির দাম এত অস্বাভাবিক রকমের বেশি ছিল যে ধনকুবের ছাড়া বড়ো ব্যাটারি তৈরি করার সাধ্য ছিল না কারো। 1802 সালে রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে স্থাপিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ব্যাটারিটিকে কাজে লাগিয়ে দুটি নতুন ধাতু উৎপন্ন করলেন ডেভি—সোডিয়াম ও পটাসিয়াম। এতদিন তড়িৎ ছিল বিচিত্র কতকগুলো ব্যাপারের সমষ্টি, এক বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র ক্ষেত্র। এখন এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তড়িৎ তার বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানের সামগ্রিক ধারার সঙ্গে যুক্ত হলো। তড়িৎ-চর্চা কেবল কৌতূহলোদ্দীপক নয়, ব্যবহারিক দিক থেকেও কার্যকর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিল। তবে যতদিন না তড়িৎ আর চুম্বকক্রিয়ার সম্পর্কটি বোঝা যাচ্ছে, ততদিন সে-সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব ছিল না; তাই উক্ত সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতে হতে কেটে গেল কয়েক দশক।

---

* *Lady Emma Hamilton* (1765?-1815) সার উইলিয়ম হ্যামিল্টনের পত্নী এবং প্রসিদ্ধ নৌ-বীর নেলসনের সঙ্গিনী। সেকালে বহু চিত্রকর এই বর্ণময় চরিত্রের ছবি এঁকেছিলেন।

—অনুবাদক

গাল্‌ভানিক কোষ থেকে উৎপন্ন তড়িৎ, আর ঘর্ষণ-যন্ত্র থেকে উৎপন্ন তড়িৎ যে একই প্রকারের—যদিও পরিমাণ ও তীব্রতার দিক থেকে তাদের মধ্যে মস্ত ফারাক—এটা আবিষ্কৃত হলো। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রকৃতি আরো কুড়ি বছর ধরে রহস্যাবৃত হয়ে রইল। ব্যাটারি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহের মাত্রা ছিল পরিবর্তনশীল, অনিশ্চিত। বিদ্যুৎপ্রবাহের সম্পূর্ণ নতুন কোনো ফল আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহকে মাপাও সম্ভব ছিল না।

তড়িৎচুম্বকত্ব

তড়িতের সঙ্গে চুম্বকক্রিয়ার নানাবিধ সাদৃশ্য দেখে পদার্থবিদরা এটুকু বুঝলেন যে এ-দুয়ের মধ্যে একটা কোনো সম্পর্ক থাকতে বাধ্য। কিন্তু সে-সম্পর্কটা যে কী, তা বোঝা যাচ্ছিল না। অবশেষে 1820 সালে আবার মোড় ঘোরাল একটি আকস্মিক ঘটনা। কোপেনহেগেনে পড়াতে পড়াতে অয়র্‌স্টিদ্ (Oersted, 1757-1851) একদিন হঠাৎ দেখতে পেলেন, বিদ্যুৎপ্রবাহ কম্পাসের কাঁটাকে বিচলিত করছে। এরপর তিনি চিরকালের মতো অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে দিলেন তড়িৎ আর চুম্বক-বিদ্যাকে। এর অব্যবহিত পরেই স্টার্জন্ (1743-1850) 1823 সালে উদ্ভাবন করলেন তড়িৎচুম্বক, এবং 1831 সালে তার উন্নতিসাধন করলেন হেনরি (1799-1878)। এখান থেকে এক ধাক্কায় এসে পড়ল বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আর বৈদ্যুতিক মোটর।

বিদ্যুৎপ্রবাহের দ্বারা কম্পাস-কাঁটার বিচলনের ঘটনাটি তাত্ত্বিক দিক থেকেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অঁপ্যার বা অ্যাম্‌পিয়ার (1775-1836), গাউস (Gauss, 1777-1855) এবং ওম (Ohm, 1787-1854) ঐ ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করেন। বিদ্যুৎপ্রবাহ কর্তৃক উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র, এবং কীভাবে তা পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে বহে যায়, সে ব্যাপারগুলি বোঝা সম্ভব হয় এর ফলে। প্রবাহ-বিদ্যুৎ পরিমাণাত্মক বিজ্ঞান হয়ে উঠবার পথে এখন আর কোনো বাধা রইল না। বলবিদ্যার যাবতীয় গাণিতিক সূত্র এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলো। কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে নতুন সূত্রগুলি নিউটনীয় সূত্রের থেকে অদ্ভুতভাবে ভিন্ন বলে প্রতিভাত হলো। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল যে বলগুলি সম্পর্কে নিউটন চিন্তাভাবনা করেছিলেন, সেগুলি সবই ঐসব বস্তুর কেন্দ্র-যোজক রেখা বরাবর ক্রিয়া করে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল, চৌম্বক মেরুর সঙ্গে বিদ্যুৎবাহী তারের সংযোজক রেখার *সমকোণে* চালিত হচ্ছে চৌম্বক মেরু। সরল *scalar* ক্ষেত্র-তত্ত্বের সঙ্গে এই প্রথম ছেদ ঘটল। অপেক্ষাকৃত ব্যাপ্ত *vector* তত্ত্বের রাস্তা প্রস্তুত হলো। কেবল দূরত্ব নয়, দিশা বা অভিমুখ ব্যাপারটিও বিবেচিত হলো vector তত্ত্বে। এইসব ভৌত আবিষ্কারের ফলেই গণিত চর্চায় এক নতুন সাড়া জাগল। নিউটনীয় ঐতিহ্য এতদিনে বন্ধ্যা হয়ে উঠেছিল; এবার তার আওতা ছেড়ে বেরিয়ে আসবার প্রেরণা পেল গণিত।

আকস্মিক আবিষ্কার?

যে আবিষ্কারগুলির কল্যাণে জ্ঞানের এই স্তরে পৌঁছনো সম্ভব হলো, তার অনেকগুলিই ঘটেছিল আকস্মিকভাবে। এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভেবে দেখলে মন্দ হয় না। আবিষ্কারগুলির পরম্পরাটিকে ওপর থেকে দেখলে প্রথমটা এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে সম্পূর্ণ অনিশ্চিতভাবে, তা পুরোপুরিই নির্ভর করে হঠাৎ-ঘটে-যাওয়া আবিষ্কারের ওপর। কিন্তু প্রকৃতির বিভিন্ন দিকের পারস্পরিক সম্পর্কগুলি কেমন সেবিষয়ে আজ যেহেতু আমরা খানিকটা জানতে পেরেছি, তাই আজ আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে কোনো না কোনোভাবে ঐ আবিষ্কারগুলি না হয়ে উপায় ছিল না। বস্তুত, *Naturphilosophie*-র ঐক্যমূলক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত অয়র্‌স্টিদ্ দীর্ঘ তেরো বছর ধরে তড়িৎ আর চুম্বকক্রিয়ার সম্পর্কটি খুঁজে বার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। একথা অবশ্য ঠিক যে তাঁর আবিষ্কারের সুনির্দিষ্ট ঘটনাটি কোনো

সচেতন পরিকল্পনার পরিণাম হিসেবে দেখা দেয়নি। কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ আর কম্পাসের কাঁটা নিয়ে এত বেশি লোক সেসময় নাড়াচাড়া করছিল যে আজ হোক আর কাল হোক, এ দুয়ের আন্তঃসম্পর্কটি কারো না কারো চোখে পড়তই। খুব সম্ভবত অনেকের তা চোখে পড়েও ছিল, কিন্তু তাঁরা এর গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই আবিষ্কার করার চাইতেও বড়ো ব্যাপার হলো, আবিষ্কার যে হয়েছে সেটা ধরতে পারা। যেকোনো পরীক্ষা থেকেই নানারকম বাহ্য কারণবশত অনেকগুলি ফল পাওয়া যায়, তার মধ্যে কোনগুলো অবান্তর আর কোনটি সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ তা বোঝবার জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের বুদ্ধি বা অন্তর্দৃষ্টি। বিশেষ ক'রে যেক্ষেত্রে স্বীকৃত তত্ত্ব অনুযায়ী ঐ রকম কোনো ঘটনা ঘটা প্রত্যাশিত নয়, বরং ঐ রকম ঘটনা না-ঘটাই প্রত্যাশিত, সেক্ষেত্রে তো অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপারটার গুরুত্ব খুবই বেশি। তবে যথেষ্ট সংখ্যক লোক যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে মনোযোগী হয়, তাহলে আজ হোক আর কাল হোক, এমন কাউকে না কাউকে ঠিকই পাওয়া যাবে যাঁর পর্যবেক্ষণ হবে যথোচিত পরিমাণে তীক্ষ্ণ, যাঁর মন হবে যথোচিত পরিমাণে সংস্কারমুক্ত, এবং কট্টর তত্ত্বগুলি সম্পর্কে যিনি যথোচিত পরিমাণে সংশয়াপন্ন অথবা অজ্ঞ হবেন; তিনিই করবেন আবিষ্কার।

মাইকেল ফ্যারাডে : তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ

তড়িৎ আর চুম্বকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে পুরোপুরি বোঝবার আগে আরো একটা চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ বাকী ছিল। বিদ্যুৎপ্রবাহ যে চুম্বকক্রিয়াও সৃষ্টি করে, এটা প্রমাণিত হয়েছিল; এখন প্রমাণ করা বাকী ছিল যে চুম্বকক্রিয়াও বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে। এই আবিষ্কারটির জন্য অপেক্ষা করতে হলো দশ বছর। অয়রস্টিদের আবিষ্কারের মতো এটি কিন্তু আকস্মিক ছিল না। এ ছিল ফ্যারাডের সচেতনভাবে পরিকল্পিত গবেষণার ফল। সেটি ছিল 1831 সাল—ফ্যারাডের জীবনের চল্লিশতম বছর। ঈষৎ ঈর্ষাপরায়ণ ডেভি ফ্যারাডের কাজের ক্ষেত্রে এতদিন যে-বাধা সৃষ্টি করে আসছিলেন তা থেকে মুক্ত ফ্যারাডে দেখলেন, চুম্বকক্রিয়ার সঙ্গে তড়িতের সম্পর্কটা স্থৈতিক নয়, গতিশীল—তড়িৎ-পরিবাহীর কাছে চুম্বক সরিয়ে আনলে তবেই উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎপ্রবাহ। এই পর্যবেক্ষণটি ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকে বোঝা গেল, চলমান বিদ্যুৎ-ই যে কেবল চুম্বকক্রিয়ার সমতুল্য তা নয়; উল্টোদিকে, চলমান চুম্বকক্রিয়াও বিদ্যুতের সমতুল্য। অতএব উদ্ভব হলো *তড়িৎচুম্বকবিদ্যা* নামে বিজ্ঞানের এক নতুন যৌথ শাখার। ঐ দুটি ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা উক্ত একটি শাখারই অন্তর্গত।

অয়রস্টিদের তুলনায় ফ্যারাডের আবিষ্কারের ব্যবহারিক গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। কারণ এর ফলে বোঝা গেল, যান্ত্রিক ক্রিয়া দ্বারা বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপাদন করা সম্ভব; অপরদিকে, বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা যন্ত্রাদি চালানো সম্ভব। বলা যেতে পারে, সমগ্র ভারিবিদ্যুৎ-শিল্পের অন্তঃসার ফ্যারাডের ঐ আবিষ্কারের মধ্যে নিহিত ছিল। তবু ঐ আবিষ্কারের পুরো ফসল তুলে নিতে প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লেগে গিয়েছিল। ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে ফ্যারাডের নিজের তেমন উৎসাহ ছিল না। এমন নয় যে তিনি ছিলেন তুরীয় মার্গের মানুষ। আসলে ব্যবসার জগৎ আর সরকারি মহল সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল; তিনি জানতেন, তাঁর কোনো ভাবনাকে লাভজনকভাবে প্রয়োগ করতে গেলে কী পরিমাণ সময় নষ্ট আর হয়রানি হবে। সেই সময়টাকে তিনি শ্রেষ্ঠতর কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র : ম্যাক্সওয়েল

ফ্যারাডে ছিলেন সেই অতি বিরলশ্রেণীর পদার্থবিদদের একজন, যাঁরা বিবেচনাধীন বলগুলিকে যেন চোখ দিয়ে দেখতে পান, ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন উপলব্ধি করতে পারেন। প্রখর কল্পনাশক্তির

সাহায্যে তিনি তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের ছবি আঁকেন। তার মধ্যে বলের রেখা (line) ও নালিকা (tube) আছে। তিনি দেখালেন, যখনই চৌম্বক বলের কোনো নালিকা কোনো তড়িৎ-পরিবাহীকে ছেদ করে, তখনই বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়; অপরদিকে, বৈদ্যুতিক বলের নালিকার চলন থেকে উদ্ভূত হয়ে চৌম্বক ক্ষেত্র। এইদিক থেকে বলা যায়, ফ্যারাডের কাজ নিউটনের মহান গণিতীয় সংশ্লেষেণেরই পরিপূরক। জ্যামিতিক বিন্দুসমূহের মধ্যে আকর্ষণের বদলে এখানে এল ক্ষেত্র আর বিভব (potential)। ফ্যারাডে বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির কল্যাণে যে গুণাত্মক ব্যাখ্যা দিলেন, সেগুলিকে নিখুঁত পরিমাণাত্মক গণিতীয় সূত্রে রূপান্তরিত করলেন ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (1831-78)। গোটা তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের নির্যাসকে তিনি সুসংহত রূপ দিলেন।

তাঁর আওতার বাইরে রইল কেবল বস্তুর ওপর তড়িতের আপাত-বিশৃঙ্খল কতকগুলি ক্রিয়া যা তড়িৎ ক্ষরণের (electrical discharges) মধ্যে দেখা যায়, এবং যা থেকে পরে ইলেকট্রনের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়।

তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ

ম্যাক্সওয়েলের সূত্রাবলী আরো অনেক দূরে এগিয়ে গেল। সূত্রগুলির রূপ থেকে এ ব্যাপারটা বোঝা গেল যে সম্ভবত আলোর কাছাকাছি গতিতে চলমান তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রেও ওগুলি প্রযোজ্য হবে। উনিশ শতকে ইতিমধ্যেই আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে বিরাট উথালপাথাল ঘটে গিয়েছিল। নিউটন প্রমাণ করে গিয়েছিলেন যে আলো অতি দ্রুতগতিতে ধাবমান অগ্নিময় কণা দ্বারা গঠিত। পরবর্তী 100 বছরে কেউ তাঁর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে ভরসা পায়নি। তারপর 1801 সালে ইংলণ্ডের ডাক্তার টমাস ইয়ং (1773-1829) এবং ফ্রান্সের পদার্থবিদ ফ্রেনেল (1788-1827) আলোর ব্যতিচার (interference) ও সমবর্তন (polarization)-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বাধ্য হলেন হাইগেন্স-এর তরঙ্গতত্ত্বকে ফিরিয়ে আনতে। নিউটন-ভক্তদের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর তাঁরা জয়যুক্ত হন। পরবর্তী 100 বছরে আলোর তরঙ্গ-প্রকৃতি নিয়ে আর কোনো সন্দেহ জাগেনি। অগ্নিময় কণাদের প্রয়োজন না হয় ফুরোল, কিন্তু তরঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একটা মাধ্যমের তো দরকার, এমন এক মাধ্যম যা মহাশূন্যের সুবিশাল বিস্তারকে ছেয়ে থাকবে। এ সমস্যার সমাধানে 'লুমিনিফেরাস ঈথর'-এর অস্তিত্ব কল্পনা করা হলো। এই ঈথর-মাধ্যম একই সঙ্গে অসীম কাঠিন্যসম্পন্ন ও অসীম নমনীয়তাসম্পন্ন। কিন্তু তড়িৎ ও চুম্বকও তো শূন্য দেশের মধ্যে ক্রিয়া করে ব'লে বহুদিন ধরে জানা আছে। কাজেই এদের জন্যও সৃষ্ট হলো ক্ষেত্র—যা ঈথরেরই মতো ধরাছোঁয়ার বাইরে। ম্যাক্সওয়েল কার্যত দেখালেন যে এই তিনটির জন্যে একটিমাত্র, কিন্তু আরো রহস্যময়, ঈথর কল্পনা করে নিলেই কাজ চলে। এইভাবে তিনি পদার্থবিদ্যাকে প্রচণ্ডভাবে সংহত ও সরল ক'রে তুললেন। অচিরেই এর নানান গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল দেখা যায়।

তার মধ্যে একটা হলো বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এক নব-প্রতিষ্ঠিত ঐক্য : আলোক ব্যাপারটাই একটা তড়িৎ-চুম্বকীয় ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হলো। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, তড়িৎ-চুম্বকীয় দোলন (oscillation) থেকে ঈথরে এমন সব তরঙ্গের উদ্ভব হওয়া উচিত যা আলোরই সদৃশ কিন্তু তার থেকে অনেক কম কম্পাঙ্কযুক্ত। 1888 সালে হার্ৎজ (1857-94) লেবরেটরিতে এগুলির নিদর্শন দেখালেন। এইগুলিই পরে রেডিও-যোগাযোগের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ম্যাক্সওয়েলের সূত্রাবলী তড়িৎ-তত্ত্বকে এমন একটা প্রায়-নিখুঁত, নিটোল, সর্বাঙ্গীণ চেহারা দিল যে মনে হলো পদার্থবিদ্যার ভবিষ্যৎ কেবল ঐ তত্ত্বের বিস্তৃতি ঘটানো ও উৎকর্ষ সাধনেই সীমাবদ্ধ। আসলে কিন্তু ঐ তত্ত্ব তড়িৎ ব্যাপারটির অতি ক্ষুদ্র এক অংশকেই ব্যাখ্যা করেছিল। তড়িৎ-কণা বা ইলেকট্রনের ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণরূপেই ঐ সূত্রাবলীর আওতার বাইরে।

বিদ্যুৎ: ব্যবহারিক প্রয়োগে খামতি

তড়িৎচুম্বক তত্ত্বের বিকাশ কীভাবে ঘটল—সেটা গুছিয়ে বলবার জন্য এতক্ষণ গোটা উনিশ শতক ধরে সংঘটিত একটানা এক যুক্তিচালিত ঘটনা-পরম্পরা হিসেবে তার বিবরণ দেওয়া হলো। কিন্তু ঐ সময়পর্বে তড়িৎচর্চার বিকাশে আর-একটা দিক ছিল ব্যবহারিক দিক। তত্ত্বগত বিকাশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল এই ব্যবহারিক বিকাশ। মোটামুটি 1830-এর সময় থেকেই অর্থনৈতিক জীবনে বিদ্যুৎশক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ঘটতে থাকে। প্রথমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে, তারপর তড়িৎবিলেপন বা ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং, আলো এবং পাওয়ারের ক্ষেত্রে। শতাব্দীর শেষে যোগাযোগের দুটি নতুন রূপ চালু হলো—টেলিফোন এবং বেতার। বস্তুত, কোনো ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর না ক'রে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা শিল্পক্ষেত্র গড়ে তোলা—এই ঘটনাটা প্রথম দেখা গেল তড়িৎ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই।

তবে এই প্রক্রিয়াটা ছিল মন্থর। নতুন কোনো ভাবনার সন্ধান পাওয়া মাত্রই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের আগেই সেটাকে কাজে লাগিয়ে বাজারে হাজির করা—উদ্‌যোগী পুঁজিপতিদের এটাই নাকি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে, যে-জিনিসকে পাওয়া মাত্রই বাজারে ছাড়া যায় না; যে জিনিসের আরো কিছু বিকাশ ঘটালে তবেই সেটা হয়ে উঠবে মুনাফাজনক; সে-জিনিসের প্রবর্তন করতে গেলে প্রচণ্ড ব্যবহারিক সমস্যার উদ্ভব হয়। সারস্বত বিজ্ঞানী ও স্বাধীন উদ্‌ভাবক—এই দুই মহলই ঐসব বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যেতেন। এর পথ ছিল একটাই—এমন কিছু তৈরি করা যা চটপট বাজারে বিকোবে, এবং একটা জিনিসের মুনাফা থেকে অন্য একটা নতুন কিছুর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা যাবে। কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে খুব অল্প লোকই এতরকমের ঝক্কি সামলে উঠতে পারত। বেশির ভাগই হয় নিঃস্ব, না-হয় নিরাশ হয়ে পড়ত। শুরু করতে না করতেই সারা হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল অজস্র।

লেবরেটরির আবিষ্কারকে লাভজনক শিল্পে রূপান্তরিত করে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় চারটে প্রধান ধাপ লক্ষ্য করা যায়। তার প্রত্যেকটাই নব-আবিষ্কৃত তড়িৎ-সূত্রগুলির একেকটি ভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এগুলি হলো: টেলিগ্রাফ, ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং, আর্ক্‌লাইটিং এবং ফিলামেন্ট-লাগানো বিজলী বাতি। এর মধ্যে, টেলিগ্রাফে যেহেতু সামান্য বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রয়োজন হয় তাই এর ফল হিসেবে প্রধানত ব্যাটারি ও গ্রাহকযন্ত্রের উন্নতি হলো এবং বহুলাংশে তারই ফলে ঘটল বৈদ্যুতিক তত্ত্বের বিকাশ।

অপরদিকে, তড়িৎবিলেপন বা ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিঙের জন্য অনেক বেশি মাত্রায় বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রয়োজন হওয়ায় যান্ত্রিকভাবে কীভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে তা নিয়ে জোর গবেষণা চলে। এর থেকেই দেখা দিল ফ্যারাডে-সূত্রের প্রথম ব্যবহারিক প্রয়োগ। কিন্তু এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেবল স্থায়ী চুম্বকই (পিক্সি'র যন্ত্র) ব্যবহৃত হয়। ফলে এটি ছিল দুর্বল এবং অদক্ষ। তাছাড়া, ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং শিল্পের চাহিদা কখনোই খুব ব্যাপক হওয়া সম্ভব ছিল না।

আর্ক্‌লাইট ও ডাইনামো

সে-তুলনায় আর্ক্‌লাইটিঙের ক্ষেত্র ছিল বিশাল। নিপুণ জেনারেটরের প্রয়োজনও অনুভূত হচ্ছিল। 1867 সালে ওয়াইল্ড (1833-1919) ও সার উইলিয়ম সীমেন্‌স (1823-83) দেখালেন, একটা যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ে অন্য একটা যন্ত্রের ক্ষেত্রীয় তড়িৎচুম্বককে (field electromagnet) উত্তেজিত করা যায়। এই আবিষ্কার থেকেই উদ্ভব হয় প্রথম *ডাইনামোর।* নবযুগের প্রতীক হয়ে ওঠে এই ডাইনামো। অপেক্ষাকৃত শস্তায় বিদ্যুৎ লভ্য হওয়ায়

এবার নজরটা গিয়ে পড়ল কী ক'রে তাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যায় তার দিকে। দেখা গেল, এর সবচেয়ে বড়ো ক্ষেত্র হচ্ছে গৃহস্থালির আলো এবং দোকানপাটের আলো। কারণ এসব ক্ষেত্রে আর্কলাইটের আলো প্রয়োজনের তুলনায় বড়ো বেশি তীব্র।

'বিজলী আলোর ক্ষেত্র বিভাগে'র এই সমস্যার সমাধান হিসেবে এল বায়ুশূন্য বাল্‌বের মধ্যে ফিলামেন্ট-লাগানো ভাস্বর দীপ। প্রথমে ছিল কার্বনের, তারপরে এল ধাতুর ফিলামেন্ট। শস্তা ও টেঁকসই দীপ বানানোর প্রযুক্তিগত সমস্যা নেহাৎ কম ছিল না। কিন্তু অগ্রগতির পথে সেটাই যে ছিল বাধা তা নয়। 1872 সালেই রাশিয়াতে লডিগিন (1847-1923) ও তার অল্পকাল পরে ইংলন্ডে সোয়ান (1828-1914) এক ধরনের ভাস্বর দীপ বানিয়েছিলেন। উন্নত মানের ভ্যাকুয়াম পাম্পিং ব্যবস্থার উদ্ভব হলেই এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু ক'রে দেওয়া যেত। এবং ঐ ব্যবস্থার উদ্‌ভাবক যে ভালোভাবেই পুরস্কৃত হতেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই শতাব্দীর যে-কোনো সময়েই সেটা উদ্ভাবিত হতে পারত। কিন্তু হয়নি; কারণ আসল অসুবিধেটা ছিল অন্য জায়গায়—বণ্টন ও বিক্রীর দিকে। এ সমস্যার সমাধানে এডিসন এগিয়ে এলেন বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের পরিকল্পনা নিয়ে। এ ছিল তাঁর এক শ্রেষ্ঠ অবদান। এর ফলে গ্যাস বা জলের মতো বিদ্যুৎকেও এবার mains-এর network-এর মাধ্যমে বণ্টন করা সম্ভব হলো।

ফ্যারাডের আবিষ্কার এবং এডিসন কর্তৃক তার প্রয়োগের মাঝখানে পঞ্চাশ বছরের ফাঁক। কোনো বৈজ্ঞানিক বা করণকৌশলগত খামতি এর মূল কারণ নয়। মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণেই এই দেরিটা হলো। একটা বৈজ্ঞানিক ভাবনাকে সংগঠিতভাবে কাজে লাগিয়ে একটা লাভজনক স্তরে নিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা সেই মধ্য-উনিশ শতকে ছিল না। কিন্তু একবার সেই স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পর আর কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াল না। বিজলী আলো ও পাওয়ার একবার করায়ত্ত হয়ে যাওয়ার পর পরের শতকে তার অগ্রগতি হয় বাষ্পশক্তির চেয়েও অনেক দ্রুত গতিতে।

পরিবহন, যন্ত্রচালন, তাপ ও আলোর জন্য পাওয়ার বণ্টনের ক্ষেত্রে, এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ভূমিকা নির্ভর করছিল অয়র্‌স্টিদ ও ফ্যাবাডের সেই মূল তড়িৎচুম্বকীয় পরীক্ষাগুলির বিস্তৃতি ঘটানোর ওপর। তত্ত্বীয় পদার্থবিদদের একটা প্রজন্ম ঐ পরীক্ষাগুলি থেকে আহরিত সিদ্ধান্তসমূহকে সরল গাণিতিক সূত্রে প্রকাশ করেছিলেন—যার চরম রূপ ম্যাক্সওয়েলের সূত্র। সত্যি কথা বলতে, আমূল নতুন কোনো ভৌত ধারণা 1831-এর পর আর আসেনি। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর এক শিল্প অল্প কয়েকটি মূলসূত্রকে দক্ষতা ও উদ্‌ভাবনশীলতার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে কীভাবে বিপুলসংখ্যক ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান করতে পারে, তার এক আদর্শ উদাহরণ উনিশ শতকের—বিশ শতকেরও (ইলেক্ট্রনিক প্রয়োগগুলির কথা স্বতন্ত্র)—বৈদ্যুতিক শিল্প।

নিখাদ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও তত্ত্বের সমষ্টি কেমন ক'রে বৃহদাকার শিল্পে রূপান্তরিত হয়, তড়িৎ ও চুম্বকক্রিয়ার এই কাহিনীতে তার প্রথম উদাহরণ মেলে। বৈদ্যুতিক শিল্প ছিল সম্পূর্ণত বিজ্ঞাননির্ভর। অথচ, এখানেই দেখতে পাই এক ঝটকায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা রূপান্তরিত হলো এনজিনিয়ারিঙের অনুশীলনে। টেলিগ্রাফ যাঁরা বসালেন, তাঁদের টেলিগ্রাফ-উদ্‌ভাবকদের মতো বৈজ্ঞানিক গুণসম্পন্ন হওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং এঁদের জন্য উদ্ভূত হলো টেলিগ্রাফ-এনজিনিয়ারদের পেশা। 1871-এ এঁরা একটি সংস্থায় সংগঠিত হলেন, এবং 1889 সালে সংস্থার নাম বদলে রাখলেন ইনস্টিটিউশন অব ইলেকট্রিক্যাল এনজিনিয়ার্‌স। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে 'ইলেকট্রিক্যাল এনজিনিয়ারিঙে'র একটা নিজস্ব ঐতিহ্য, একটা স্বতন্ত্র অনুশীলনবিধি তৈরি হয়ে গেল। নকশা ও উৎপাদনের সমস্যা, কাজের পরিমিতি ও সহজে সারাই করার সমস্যা—এ সবই আরোপিত হলো তড়িৎচুম্বকীয়

আবেশের মূল বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলির ভিত্তির ওপর। ঘটনার চাকা ঘুরতে ঘুরতে একেবারে বিপরীত মেরুতে গিয়ে পৌঁছবে যখন এই পেশাতেই অল্পকালের জন্য যুক্ত দুই তরুণ পদার্থবিদ্যায় বিপ্লব এনে দেবেন—তাঁদের নাম অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও পল ডির‍্যাক।

4. রসায়ন

আঠারো ও উনিশ শতকে বিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য ছিল: যুক্তিশাসিত ভাবনা ও প্রয়োগের একটি স্বতন্ত্র বিভাগরূপে রসায়নের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা। ব্যবহারিক অর্থে রসায়নবিদ্যা অন্য যেকোনো বিজ্ঞানের চেয়ে পুরোনো। কিন্তু তার পক্ষে যুক্তিচালিত বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে ওঠা সম্ভব হয় নি, কারণ যে অপরিহার্য পূর্বশর্তগুলি পূরণ হলে সেটা সম্ভব হতে পারত, সেগুলি পূর্ণ হয়েছিল অনেক পরে। সবার আগে প্রয়োজন ছিল নানাবিধ পদার্থের ধর্ম ও রূপান্তর সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। প্রাচীনকালে বা রেনেসাঁসের যুগে এ বাবদে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল তা যথেষ্ট ছিল না। বিজ্ঞান-অনির্ভর ও প্রধানত প্রয়োগমূলক আকর-খননশিল্প ও রসায়নিক শিল্পের দ্রুত ব্যাপক বিকাশ ছাড়া কোনো কার্যকর রসায়নিক তত্ত্ব গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। শুধু তাই নয়, এর জন্য আরো যা প্রয়োজন ছিল তা হলো, এমন কিছু সামগ্রিক চিন্তাভাবনা যা ঐ বিচিত্র ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষাকে একীভূত ক'রে তা থেকে একটা সুসংহত ছবি তৈরি করবে; সেই সুসংহত ছবিটিকে আয়ত্ত করা হলে তা থেকে আবার দেখা দেবে নতুন নতুন আবিষ্কার।

আল্‌কেমির ইতি

রসায়ন সম্পর্কে যেকোনোরকম যুক্তিশাসিত দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভবের অন্যতম প্রাথমিক শর্ত ছিল জাদুবিশ্বাসগুলোকে দূর করা। বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে-আসা এইসব বিশ্বাস হাতেকলমে কর্মরত রসায়নবিদদের পথরোধ করে রেখেছিল। এর মধ্যে যেগুলো সবথেকে ক্ষতিকর ও সবথেকে দৃঢ়মূল সেগুলো ছিল আল্‌কেমির জ্যোতিষ-সংক্রান্ত ও রহস্যবাদী দিক এবং সোনা তৈরির অর্থহীন প্রয়াস নিয়ে মাতামাতি। সতেরোর শতকে রসায়নকে যুক্তিশাসিত ভিত্তিতে স্থাপন করার যে-চেষ্টা করেছিলেন বয়েল, হুক ও মেয়ো, তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। যতদিন না রসায়নের গুণাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরো খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো, ততদিন কণা-তত্ত্বের দর্শন ও তার একেবারে মাপাজোকা, গণিতীয়-যান্ত্রিক ছক রসায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়নি।

রসায়নিক সূত্রের সন্ধান

আঠারো শতকের বেশির ভাগ সময় জুড়ে রসায়নের অগ্রগতি হয়েছিল একেবারেই ভিন্ন পথে। যান্ত্রিক মডেলের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যুক্তিশাসিত সূত্রগুলি দিয়ে রসায়নিক তথ্যের বিপুল বৈচিত্র্যকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না। তার বদলে, জাদুবিশ্বাসসম্মত ও সর্বপ্রাণবাদী ভাবনাকেই ক্রমশ যুক্তিশাসিত ক'রে নেওয়ার প্রয়াস চলল, এবং এই পথেই বিকাশ লাভ করল জ্ঞান। প্রথম প্রথম এগুলো অবধারিতভাবেই বেশ অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু এগুলোর মধ্যে এমন একটা নমনীয়তা ছিল যে অল্প কয়েকটা সাধারণ মৌলিক সূত্রের মধ্যে দিয়েই রসায়নবিদেরা তাঁদের বহুবিচিত্র ক্রিয়াকলাপকে সুশৃঙ্খল ক'রে তুলতে ও উপলব্ধি করতে পারছিলেন। এই ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার পর তবেই পরিমাপ ও গণনার ভৌত পদ্ধতিগুলিকে লক্ষণীয়ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হলো। আঠারো শতকের একটা বিরাট কৃতিত্ব এই যে রসায়নের সমস্যাগুলিকে তা একটিমাত্র কেন্দ্রীয় প্রশ্নে নামিয়ে আনতে পেরেছিল—দহনের সমস্যা, অগ্নি-আত্মার কার্যকলাপের সমস্যা। প্রশ্নটা ছিল এই: দাহ্য পদার্থসমূহ যখন বাতাসে পোড়ে তখন তাদের কী হয়? যে উত্তরটা দেওয়া বাহুল্য তা এই যে তাপ আগুনের শিখা ও ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যায়,

ফেলে যায় ছাই। কাঠ আর তেলের ক্ষেত্রে এ উত্তর খাটে। কিন্তু ধাতুজাতীয় যেসব পদার্থ বাতাসে নষ্ট হয়ে যায় বা যেগুলোতে মরচে ধরে, তাদের ক্ষেত্রে তো এ উত্তর খাটবে না। এদের মধ্যে কোনো মিল কি আছে? বাতাসেরই বা ভূমিকা কী?

এসব প্রশ্নের কিছু উত্তর সতেরো শতকেই পাওয়া গিয়েছিল। 1630 সালে জঁা রেই (Jean Rey) এবং 1674 সালে মেয়ো এই অকাট্য তথ্যটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে বাতাসে গরম করলে ধাতুর ওজন বাড়ে; এবং বাতাসের মধ্যে 'নাইট্রোবায়বীয় আত্মা' বলে একটা কিছু আছে যা আগুন ও প্রাণবায়ু উভয়কেই টিকিয়ে রাখে। তবে পূর্বসূরীদের মধ্যে এঁরা ছিলেন ব্যতিক্রম, রসায়নিক ভাবনার মূল স্রোতকে এঁরা প্রভাবিত করতে পারেননি।

ফ্লজিস্টনের মতবাদ

বস্তুত সেই স্রোত বয়ে চলেছিল উল্টোদিকে, এই ভাবনার দিকে যে, সকল দাহ্য বস্তুর মধ্যে থাকে এমন একটি পদার্থ যা দহনের সময় নষ্ট হয়ে যায়। আরবদের এবং প্যারাসেল্সসের 'গন্ধক'-তত্ত্বই এই রূপে প্রকাশ পেল। এ তত্ত্ব নবজীবন লাভ করল বেকার (Becher, 1635-82) এবং তাঁর শিষ্য শ্‌তাল (Stahl, 1660-1734)-এর হাতে। তাঁরা এর নাম দিলেন *ফ্লজিস্টন*—'ফ্লক্স' বা শিখার তত্ত্ব। ফ্লজিস্টন-তত্ত্ব আঠারো শতকে সর্ববাদীসম্মত রূপে না হলেও মোটের ওপর স্বীকৃত হয়েছিল। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, যেসব পদার্থে বেশি ফ্লজিস্টন থাকে তারা ভালোভাবে পোড়ে; যেসব পদার্থ পোড়ে না তারা ফ্লজিস্টন-মুক্ত। বেশি ফ্লজিস্টন-যুক্ত কোনো পদার্থ (যথা কয়লা) কম ফ্লজিস্টন-যুক্ত কোনো পদার্থে (যথা লৌহ-আকরিকে) ফ্লজিস্টন চালান ক'রে দেয়, এবং ফ্লজিস্টন দ্বারা সংক্রামিত হয়ে তা চকচকে ধাতব লোহায় পরিণত হয়। প্রথম থেকেই এ তত্ত্ব সম্পর্কে অনেক আপত্তি উঠতে থাকে। যেমন, বলা হলো যে ফ্লজিস্টন কোনো পদার্থ নয়, বরং পদার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত, কেননা এর কোনো ভর নেই। কিন্তু, আমরা আগেই দেখেছি, অধরা প্রবাহীর ভাবনার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই—তড়িৎ, চুম্বকক্রিয়া, তাপ সবই তো নিশ্চিতভাবে বাস্তব, কিন্তু তারাও তো এই একই চরিত্রের। এমনকি যখন প্রমাণিত হলো যে ফ্লজিস্টন হারিয়ে কিছু কিছু বস্তু প্রকৃতপক্ষে আরো ভারি হয়ে ওঠে, তখন এর কারণ হিসেবে বলা হলো, হয় বাতাস থেকে কোনো কিছু ঐ বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, না হয় ফ্লজিস্টন জিনিসটাই এমন যে তার একটা নিজস্ব লঘুতা (levity) আছে।

ফ্লজিস্টন-তত্ত্বের ঠিক পরেই আসে এই তত্ত্ব যে দহন হচ্ছে জারণ, এবং জারণ-তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে আমাদের এরকম মনে হতে পারে যে ফ্লজিস্টন-তত্ত্ব ছিল একেবারেই উদ্ভট। কিন্তু আসলে এ-তত্ত্ব ছিল অতীব মূল্যবান। বহুবিচিত্র রসায়নিক ঘটনাকে তা সমন্বিত করতে পেরেছিল, এবং মধ্য-আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদদের জন্য সুন্দর একটা কাজ চলার মতো তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল। এঁদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন—এমনকি যাঁর পরীক্ষানিরীক্ষা অবশেষে ফ্লজিস্টন-তত্ত্বের পতন ঘটাল, সেই প্রিস্ট্‌লীও।

ফ্লজিস্টন-তত্ত্বের যুক্তিধারা

এই তত্ত্বের মূল ধারণাটির ভিত্তি ছিল *ফ্লজিস্টন-যুক্ত হওয়া* এবং *ফ্লজিস্টন-মুক্ত হওয়া*—এই দুই পরস্পর-বিপরীত প্রক্রিয়ার সর্বজনীনতা। এর দ্বারা এই তত্ত্ব একই ধরনের প্রক্রিয়াসমূহকে এক শ্রেণীতে আনল, এবং বিচ্ছিন্ন করল সেইসব প্রক্রিয়াসমূহকে যেগুলি এক ধরনের নয়। ফ্লজিস্টন-তত্ত্বের বিরোধীরা দেখালেন যে ফ্লজিস্টন-মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে আদৌ ফ্লজিস্টন নামক এক আধিদৈবিক পদার্থের বিয়োজন বলা যায় না; বরং সেটি হলো অক্সিজেন নামক এক

বাস্তব পদার্থের সংযোজন—*জারণ।* পক্ষান্তরে, ফ্লজিস্টন-যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি আসলে অক্সিজেনের বিজারণ ছাড়া আর কিছু নয়। আজকে বিংশ শতাব্দীতে আমরা এই ভাবনাকে আবার উল্টে দিয়ে বলতে পারি, ফ্লজিস্টন হচ্ছে অতিশয় হালকা এক পদার্থ, যার আধুনিক নাম 'ইলেকট্রন'। যেসব বস্তুতে সহজে সরণযোগ্য ইলেকট্রনের আধিক্য থাকে (যেমন হাইড্রোজেন, ধাতু বা কয়লা) সেগুলিকেই সেকালে ফ্লজিস্টন-সমৃদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। যেসব বস্তুতে ইলেকট্রনের নিখুঁত সৌষম্য রয়েছে, যথা লবণসমূহ বা অক্সাইডসমূহ, সেগুলিকে ফ্লজিস্টন-মুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। আর যেসব বস্তু অতি সহজে ইলেকট্রন টেনে নেয়, যথা অক্সিজেন, ধরে নেওয়া হয়েছিল সেগুলি অতিমাত্রায় ফ্লজিস্টন-মুক্ত। অন্তর্নিহিত অযৌক্তিকতার জন্যই যে ফ্লজিস্টন-তত্ত্ব ব্যর্থ হয়েছিল তা নয়, আসলে যে তাত্ত্বিক অবস্থানে তা দাঁড়িয়েছিল সে-অবস্থান থেকে বাস্তব তথ্যাবলীর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্ভব ছিল না। প্রয়োজন ছিল তাকে উল্টে দাঁড় করানো—ফ্লজিস্টন-যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বিজারণ (reduction) এবং ফ্লজিস্টন-মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে জারণ (oxidation) রূপে চিহ্নিত করা। উল্টে দেওয়ার এই প্রেরণা ঐতিহ্যবাহিত রসায়নের চর্চা থেকে আসে নি, এসেছিল অন্য ক্ষেত্র থেকে—গ্যাস সম্পর্কিত চর্চা থেকে।

গ্যাস-বলবিজ্ঞানে বিপ্লব

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পাতন ব্যাপারটার মধ্যে আর নতুনত্ব কিছু ছিল না। তখন আগ্রহটা গিয়ে পড়ল রসায়নিক প্রক্রিয়ার উপজাত সেইসব পদার্থের প্রতি—শীতকের (condenser) ভিতর থেকে যাদের সংগ্রহ করা যাচ্ছিল না, অর্থাৎ ভান হেল্‌মন্ট-কথিত সেইসব 'দুর্দমনীয়, অশান্ত আত্মাসমূহে'র প্রতি। সেইসব আত্মা, ভূত বা গ্যাসের *(chaos)*—এই বলেই তিনি তাদের অভিহিত করেছিলেন—সঙ্গে অনেকেই, বিশেষত খনিশ্রমিকরা, কার্যক্ষেত্রে পরিচিত ছিলেন। বিজ্ঞানীরাও এগুলির সম্পর্কে মনোযোগী হয়ে উঠছিলেন। খনি বা জলাজমির প্রতারক মিথেন গ্যাস বা আলেয়া হচ্ছে এগুলির উদাহরণ। রবারের থলিতে এদের ভরে এনে জ্বালানো যেত। এছাড়াও, গুহাতলের ফাটল থেকে যে প্রাণঘাতী গ্যাস নির্গত হতো (mofette), খনিতে বিস্ফোরণ ঘটার পর যে 'afterdamp' নির্গত হতো তা-ও ছিল অতিপরিচিত। এ-ও জানা ছিল যে ঐ গ্যাস মদ্যপ্রস্তুতকারকদের বড়ো বড়ো গামলায় পাওয়া যেত এবং ঐসব গামলায় পড়ে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটত। এই সব গ্যাস নিয়ে চর্চা করতে করতেই রসায়নিক ব্যাখ্যার সূত্রটির হদিশ পাওয়া গেল। পাদ্রী স্টিফ্‌ন হেল্‌স (1677-1761) তাঁর *Vegetable Staticks* গ্রন্থে আঠারো শতকের গোড়াতেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন, কীভাবে জলের ওপর গ্যাস সংগ্রহ করতে হয় এবং কীভাবে তাদের আয়তন মাপা যায়। পরে প্রিস্টলী ও ক্যাভেন্ডিশ আরো কার্যকর উপায়ে পারদের ওপর গ্যাস সংগ্রহ করেন। এরপর প্রয়োজন ছিল এই ব্যাপারটা উপলব্ধি করা যে এই গ্যাসগুলো নিছক বায়ু নয়, এদের মধ্যে গুণগত প্রভেদ রয়েছে, এবং বস্তুর রূপান্তরণ সম্পর্কে বয়েল ইতিপূর্বেই যে পরিমাণাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন, এই বিভিন্ন ধরনের গ্যাসের ক্ষেত্রেও তা প্রযুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। রূপান্তরণশীল রসায়নিক পদার্থের যাচাইয়ের (assay) সময় এতদিন শুধু মূল আকরিকটুকুই ওজন করা হতো। এবার রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় উপজাত *যাবতীয়* পদার্থকেই ওজন করার ধারণা চালু হলো। এ ছিল এক মৌলিক অগ্রগতি। রসায়নিক বিক্রিয়ার শুরুতে যেসব গ্যাস কাজে লাগে বা অন্তে যেসব গ্যাস নির্গত হয় সেগুলিকে ওজন বা পরিমাপ না করলে রসায়নিক হিসেব মেলানো কিছুতেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারটা 1748 সালে স্পষ্ট ক'রে প্রথম বলেন লোমোনোসভ, শক্তির নিত্যতা সূত্রের ব্যাখ্যা

হিসেবে। কিন্তু তাঁর কাজ লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। অতঃপর 1785 সালে লাভোয়াসিএ এটিকে এক মৌলিক সূত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সন্ধানের বা গাঁজানোর (fermentation) প্রক্রিয়া সম্বন্ধে চর্চা করতে গিয়েই তিনি এই কাজটি করেন।

জোসেফ ব্ল্যাক: সংবন্ধিত বায়ু

নবোদ্ভূত এই পরিমাণাত্মক গ্যাস-রসায়ন চর্চায় প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন জোসেফ ব্ল্যাক। গ্ল্যাস্‌গোতে ডঃ কালেন-এর রসায়ন-বিষয়ক প্রথম দফার বক্তৃতাগুলি শুনে এই স্কটিশ ডাক্তারটির কৌতূহল জাগ্রত হয়। 1754 সালে ব্ল্যাক তাঁর M.D. পরীক্ষার গবেষণাপত্র লেখেন। বিষয় ছিল : 'ম্যাগ্‌নেসিয়া অ্যাল্‌বা,কলিচুন ও অন্যান্য ক্ষারীয় পদার্থ সম্পর্কিত পরীক্ষানিরীক্ষা।' উদ্দেশ্য ছিল পেটে পাথর জমার একটা নতুন, কম কষ্টদায়ক ওষুধ তৈরি করা। আঠারো শতকের কড়া মদ্যপায়ীদের মধ্যে ঐ রোগটি ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। হাউস অব কমন্‌স জোনা স্টিফন্‌স-কে ঐ রোগের দাওয়াই তৈরি করার পুরস্কার হিসেবে 5000 পাউন্ড মঞ্জুর করেছিল। স্টিফন্‌স শামুক খোলার ভস্ম মধুতে মেড়ে সেই দাওয়াই বানিয়েছিলেন।

চুনাপাথর বা ম্যাগনেসিয়া প্রমুখ কার্বনেটকে গরম করলে তা থেকে যে গ্যাস বেরিয়ে যায়, ব্ল্যাক তাকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করলেন এবং তার ওজন মাপলেন। তিনি এর নাম দিলেন 'সংবন্ধিত বায়ু' (fixed air)। চুনজলের মধ্যে ঐ গ্যাসকে বিশোষিত করে তিনি পুনরায় সেই আগের কার্বনেট তৈবি করতে সক্ষম হলেন এবং দেখালেন. গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ায় যতটুকু ওজন কমেছিল, গ্যাস বিশোষিত হওয়ায় ঠিক ততটুকুই ওজন বাড়ল। এই ভাবে তিনি প্রমাণ করে দিলেন, গ্যাসও কঠিন পদার্থের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে পারে এবং গ্যাস অবশ্যই বস্তুময় পদার্থ, তার মধ্যে আধিদৈবিক কিছু নেই।

জোসেফ প্রিস্ট্‌লী: অক্সিজেন আবিষ্কার

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিটা ঘটালেন জোসেফ প্রিস্ট্‌লী। ফ্র্যাঙ্কলিনের পরামর্শে তড়িতের এক ইতিহাস রচনা করেন প্রিস্ট্‌লী। এই কাজ করতে গিয়ে বায়ুতে বিদ্যুৎক্ষরণ (discharge) সম্পর্কে তিনি কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষাই তাঁকে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্র থেকে বার করে নিয়ে যায় রসায়নের ক্ষেত্রে। রসায়নের সেই প্রথম যুগের বৈশিষ্ট্যই ছিল এই যে মৌলিক আবিষ্কারগুলি যাঁরা করেছিলেন তাঁরা রসায়নবিদ ছিলেন না। রসায়নবিদেরা তখন বড্ড বেশি জেনে ফেলেছিলেন। এমন সব তত্ত্ব তাঁদের জানা ছিল যা দিয়ে সব কিছুই 'ব্যাখ্যা' করা যাচ্ছিল। পদার্থবিদরা এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না, তাই সাদামাটা কাণ্ডজ্ঞাননির্ভর ব্যাখ্যা হাজির করার ভার তাঁদেরই ওপর পড়েছিল।

বায়ু যে নানা ধরনের হয় এই ভাবনাটা প্রিস্ট্‌লীর মনকে অধিকার করেছিল। তিনি একধার থেকে যত বেশি সম্ভব গ্যাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। অনেকগুলি গ্যাস নিজে বানালেনও। সংবন্ধিত বায়ু-সংবলিত 'সোডা-ওয়াটার' দ্রবণ তৈরি ছিল তাঁর প্রথম সাফল্য। এর জন্য তিনি রয়্যাল সোসাইটির সর্বোচ্চ সম্মান 'কপ্‌লি পদক' অর্জন করেন। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার দুর্বিষহ পরিণাম স্কার্ভি রোগ সারানো যাবে, এই আশায় তিনি উক্ত আবিষ্কারটি করেন। সে আশা ব্যর্থ হলেও আবিষ্কারটি তার নিজ গুণেই টিকে গেল—গ্যাস-বলবিজ্ঞান সংক্রান্ত রসায়ন চর্চার প্রথম নতুন বাণিজ্যিক উৎপাদন রূপে।

পারদের লাল অক্সাইডকে গরম করে প্রিস্ট্‌লী যে গ্যাসটি সংগ্রহ করেন, তার নাম দেন 'ফ্লজিস্টন-মুক্ত বায়ু'। কারণ, সাধারণ বায়ুর চাইতে এই গ্যাসটির ফ্লজিস্টন-আসক্তি ছিল বেশি, অর্থাৎ কোনো পদার্থ এই গ্যাসটির মধ্যে বেশি করে জ্বলে। গ্যাসটিকে আজ আমরা বলি অক্সিজেন। যাকে অনায়াসেই বলা যেতে পারে রসায়নের গ্যাস-বলবৈজ্ঞানিক (pneumatric)

বিপ্লব, তার সূচনা হয় 1774 সালের এই আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে। সুইডেনে শেইল্‌-ও (Scheele) প্রায় একই সময়ে অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। শেইল প্রিস্ট্‌লীর চাইতে অনেক উঁচুদরের রসায়নবিদ ছিলেন। কিন্তু রসায়নের তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান অপেক্ষা রসায়নিক বিশ্লেষণের দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। কাজেই কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলি সমাধানের ব্যাপারে শেইলের আবিষ্কার থেকে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়নি। প্রিস্ট্‌লী দেখালেন, কী দহনে এবং কী শ্বসনে ঐ একই ফ্লজিস্টন-মুক্ত বায়ু (অর্থাৎ অক্সিজেন) কাজে লাগে। তিনি এও দেখালেন যে 'সংবদ্ধিত বায়ু' অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইড বিশোষণ ক'রে সবুজ উদ্ভিদ তা থেকে রৌদ্রালোকে বস্তুত অক্সিজেনই উৎপন্ন করে। এইভাবে তিনি তত্ত্বগতভাবে কার্বন-চক্রের মূল সমস্যাটির সমাধান করলেন: বায়ুমন্ডল থেকে উদ্ভিদের ও প্রাণীদের দ্বারা বিশোষিত হয়ে পুনরায় বায়ুমন্ডলে প্রত্যাবর্তন। প্রিস্ট্‌লী নিজে অবশ্য পুরোপুরি বোঝেন নি, তাঁর এই আবিষ্কারগুলির গুরুত্ব কতখানি। এই খামতি দূর করবার জন্য এলেন লাভোয়াসিএ, যাঁর মনটি ছিল অনেক বেশি যুক্তমার্জিত ও সুশৃঙ্খল।

ফ্লজিস্টন-তত্ত্বের পতন

প্রিস্ট্‌লীর মতো লাভোয়াসিএও পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্র থেকে রসায়নে এসেছিলেন। তবে প্রিস্ট্‌লীর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে প্রিস্ট্‌লীর মতো বহুবিচিত্র গুণাত্মক পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে তিনি নিজেকে ছড়িয়ে ফেলেন নি; সীমিত এবং নির্দিষ্ট একটি কাজের প্রতিই লাভোয়াসিএ তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছিলেন: সেটি হলো, বায়ুতে দহনের প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করা। তাঁর কাছে এটি ছিল রসায়ন-তত্ত্বের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তাঁর কাজ আগাগোড়া ছিল সুনির্দিষ্ট, সুশৃঙ্খল এবং *পরিমাণাত্মক।* তিনি রসায়নের ক্ষেত্রে গ্যাস-বলবিজ্ঞান-চর্চার, বিশেষ ক'রে বায়ু-সংবন্ধনের বাস্তব ঘটনাটির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সেই সচেতন মন নিয়ে তিনি 'পদার্থবিদ্যায় ও রসায়নে' বিপ্লব ঘটানোর কাজে ব্রতী হন 1773 সালে। পরে প্রিস্ট্‌লীর অক্সিজেন আবিষ্কারের ঘটনাটি শুনেই তিনি তার তাৎপর্য বুঝতে পারেন। তিনি দেখান যে ঐ পদার্থটিই দহনের জন্য দায়ী, এবং দহন বলতে বোঝায় অক্সিজেনের সংযোজন—তার বেশিও নয়, কমও নয়। প্রথমে তিনি এর নাম দেন *le principe oxygine*—অম্ল-উৎপাদক। এ তত্ত্ব ফ্লজিস্টন-তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু, ফ্লজিস্টন-তত্ত্বকে আক্রমণ করার ব্যাপারে সামান্যতম দ্বিধাও ছিল না লাভোয়াসিএ'র। ঐ তত্ত্বের সমস্ত যুক্তিকে উল্টে দিয়ে তাকে আবার পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন তিনি—যেমনটা মার্ক্স করেছিলেন হেগেলের তত্ত্বকে।

রসায়নিক মৌলসমূহ

লাভোয়াসিএ দেখলেন যে রসায়নের এতদিনকার আপাত বিশৃঙ্খল ব্যাপারগুলোকে পুরোনো ও নতুন মৌলসমূহের সম্মিলনের এক তত্ত্ব দ্বারা সুশৃঙ্খলভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এতদিন বয়েল-এর (অ্যারিস্টটলের নয়) ধারণা অনুযায়ী মৌলিক পদার্থের তালিকায় ছিল কার্বন, সালফার, ফসফরাস এবং যাবতীয় ধাতু। এই তালিকায় লাভোয়াসিএ যোগ করলেন সদ্য-আবিষ্কৃত অক্সিজেন। *হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশে এই অক্সিজেনই* তৈরি করে জল যা কিনা প্রাচীনকালে স্বীকৃত '*মৌলিক পদার্থ*'গুলোর অন্যতম। এর সঙ্গে তিনি যোগ করলেন বায়ুর একটি উপাদান—নিষ্প্রাণ 'অ্যাজোট', যাকে আমরা বলি *নাইট্রোজেন।* নতুন এই প্রণালী অনুযায়ী, রসায়নিক যৌগসমূহকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় : অক্সিজেন এবং অ-ধাতুর সম্মিলনজাত যৌগ বা *অম্ল;* এবং অম্ল ও ক্ষারের সম্মিলনজাত যৌগ বা *ক্ষার* (base); এবং অম্ল ও ক্ষারের সম্মিলনজাত *লবণ।* কল্পিত সাদৃশ্যের ওপর অথবা প্রস্তুত-প্রণালীর ওপর নির্ভর ক'রে রসায়নিক পদার্থের নামকরণ করার যে পদ্ধতি বহু যুগ ধরে

চলে আসছিল, তাকে একদম পরোয়া না ক'রে লাভোয়াসিএ এক সম্পূর্ণ নতুন নামকরণ-পদ্ধতি চালু করলেন: 'অয়েল অব টার্টারে'র বদলে পটাসিয়াম কার্বনেট, 'শুগার অব লেড'-এর বদলে লেড অ্যাসিটেট ইত্যাদি। সতেরো শতকের গোড়াতে পদার্থবিদ্যাকে যুক্তিশাসিত করার যে প্রক্রিয়া চালু হয়েছিল, সেই একই প্রক্রিয়া এবার রসায়নের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হলো। তাছাড়া উদ্ভিদবিদ্যার শ্রেণীবিভাজনের ক্ষেত্রে লীনেয়াস যে-সরলীকৃত নামকরণ-পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন, তারও সাহায্য নিয়েছিলেন লাভোয়াসিএ।

এই প্রক্রিয়াকে তিনি আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। বিবিধ কঠিন পদার্থ কী পরিমাণে একে অপরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়, সে সম্পর্কে তখন প্রচুর তথ্য জমা হচ্ছিল। এইসব তথ্যকে কাজে লাগিয়ে তিনি সদ্য-আবিষ্কৃত গ্যাসগুলিকে ঐ একই প্রক্রিয়ার আওতায় আনলেন। তাঁর 'ভরের নিত্যতা' (conservation of mass) সূত্রের কল্যাণে রসায়নশাস্ত্র এবার হয়ে উঠল যেন এক হিসাবশাস্ত্র, যাতে কেবল মৌলিক পদার্থেরই হিসেব রাখা হয়। এতদিন রসায়ন ছিল আলাদা আলাদা কতকগুলি নির্মাণকৌশলের সমষ্টি, যাদের একটি একটি ক'রে শিখতে হতো। এবার লাভোয়াসিএ'র হাতে তা পরিণত হলো একটি সর্বজনীন তত্ত্বে। সেই তত্ত্বের দ্বারা কেবল যে আগেকার ব্যাপারগুলোকেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো তা নয়, নতুন ব্যাপার সম্পর্কেও পরিমাণাত্মক ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হলো। লাভোয়াসিএ যতটা না সুশৃঙ্খল রসায়নবিদ ছিলেন, তার থেকে বেশি ছিলেন রসায়নের আইনপ্রণেতা। তিনি ব্যাখ্যা করতেন মূল বিষয়গুলি। আর রসায়নিক আসক্তির প্রকৃতি নির্ধারণ বা ঠিক কোন অনুপাতে রসায়নিক পদার্থগুলো কার্যত সম্মিলিত হবে —এসব পরীক্ষার দায়িত্ব তিনি ছেড়ে দিলেন অন্যদের ওপর, যথা বের্তোলে (Berthollet, 1748-1821) ও রিখ্‌টর (Richter, 1762-1807)।

রসায়নের আধিপত্য

রসায়নে লাভোয়াসিএ সফল বিপ্লব ঘটানোয় চারিদিকে প্রবল উৎসাহ জাগল। তখনকার হাওয়াতেই ছিল বিপ্লব। নবজাত রসায়নশাস্ত্র, যা তখন পদার্থবিদ্যার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ, অচিরেই যুগের বেশ কয়েকটি শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ককে আকর্ষণ করল। তার ফলে ফ্রান্স প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে বিজ্ঞানজগতের শীর্ষে বিরাজ করতে পেরেছিল।

রসায়নের প্রতি এই আগ্রহের প্রতিফলন দেখা গেল শিল্পক্ষেত্রেও। এবং শিল্পক্ষেত্র রসায়নকে যোগাল নতুন নতুন পদার্থ ও নতুন নতুন সমস্যা। কাচ-রঞ্জক পদার্থ বা ম্যাঙ্গানীজ নিয়ে শেইল যে গবেষণা করেন, তা থেকেই 1774 সালে উদ্ভূত হয় ক্লোরিন। 1784-এ বের্তোলে দেখালেন যে ক্লোরিন বিরঞ্জনের (bleaching) কাজে লাগে। অতঃপর জামাতা ওয়াটের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ম্যাক্‌গ্রেগর প্রথম ব্যাপক আকারে ক্লোরিন ব্যবহার করলেন গ্ল্যাসগো'র উঠতি বস্ত্রশিল্পে। অন্যান্য প্রধান প্রধান শিল্প-রসায়নিক উন্নতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: রোবাক-এর সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতপ্রণালী (1746) এবং 1769-এ কেয়ার (Keir, 1735-1820)-এর ও 1790-এ লব্লাঁ-র (Leblanc, 1742-1806) পদ্ধতি অনুযায়ী লবণ থেকে সোডা উৎপাদন। লব্লাঁ নিজে দারিদ্র্যের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, অথচ স্বয়ং নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত আদেশে তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতির উন্নতি ঘটানো হয়। তারই ফলে, ইংলন্ড-নিয়ন্ত্রিত দেশগুলি থেকে সোডার সরবরাহের ওপর ফ্রান্সকে নির্ভর করতে হয়নি। এই সব প্রক্রিয়াই ছিল মূলত বস্ত্রশিল্পের বিপুল বিস্তারের ফসল। বস্ত্রশিল্পের এই প্রচণ্ড বিস্তারই ছিল শিল্পবিপ্লবের মূল বনেদ। উদ্ভিজ্জ পণ্যসমূহকে তা দ্রুত হারিয়ে দিচ্ছিল।

ভোজন ও শ্বসনের রসায়ন

জীবনপ্রক্রিয়ার রসায়নিক চরিত্র সম্পর্কে প্রিস্ট্লী যে ছবি এঁকেছিলেন তা ছিল গুণাত্মক। এবার লাভোয়াসিএ সেই গুণাত্মক ছবিটিকে পরিমাণাত্মক ক'রে তুললেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি তাঁর আরেক অবদান। তিনি ছিলেন পরিমাণাত্মক শারীরতত্ত্বের জনক। চমৎকারভাবে পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত কতকগুলি পরীক্ষা থেকে তিনি প্রমাণ করতে সমর্থ হলেন যে জীবিত দেহ ঠিক আগুনের মতোই আচরণ করে : তা খাদ্যবস্তুকে পোড়ায় এবং সেই দহনজাত শক্তিকে তাপরূপে ত্যাগ করে। এই প্রথম প্রাণীসমূহের রসায়নিক জমাখরচের 'হিসেব' মেলানো গেল। শ্বসন ও রক্ত চলাচলের (যা হার্ভে 200 বছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন) প্রক্রিয়ার আসল তাৎপর্যও এই প্রথম বোঝা গেল।

ড্যাল্টন : পরমাণু-তত্ত্ব

এর পরের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন ড্যাল্টন—ম্যান্চেস্টারের এক তাঁতি ও ইস্কুলমাষ্টার। প্রিস্ট্লী বা লাভোয়াসিএর মতো তিনিও মূলত রসায়নবিদ ছিলেন না, ছিলেন পদার্থবিদ ও আবহবিদ। গ্যাসকে স্থিতিস্থাপক প্রবাহী হিসেবে কল্পনা ক'রে তিনি তার ধর্মগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন নিউটনীয় সূত্র দ্বারা—পরমাণুদের পারস্পরিক *বিকর্ষণ* দ্বারা। এই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন গ্যাসের পরমাণুগুলির সম্ভাব্য অনুপাত কী হতে পারে, তাই নিয়ে ভাবিত হলেন। ততদিনে নতুন নতুন গ্যাস যথা নাইট্রাস অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড, নাইট্রোজেন পারঅক্সাইড (যাদের আমরা ড্যাল্টনেরই দেখানো পথে যথাক্রমে N_2O, NO এবং NO_2 রূপে লিখি) প্রভৃতিকে বিশ্লেষণ করার ফলে ক্রমশ বোঝা যাচ্ছিল যে মৌলিক পদার্থসমূহ নির্দিষ্ট ওজনের গুণিতকের হিসেবে সম্মিলিত হয়। এই সম্মিলনের নিয়মটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তা নিয়েও ভাবিত হলেন ড্যাল্টন। তিনি ধরে নিলেন যে প্রত্যেকটি রসায়নিক যৌগই একটার পর একটা পরমাণু সাজিয়ে তৈরি—বিভিন্ন ধরনের পরমাণু দুই, তিন বা চারের জোট বেঁধে নিজেদের সাজিয়ে নেয়। এর থেকেই এল গ্যাসকে N_2O, NO বা NO_2 রূপে লেখার ধারণা।

কেলাসবিদ্যা : আউয়ি

প্রকৃতির অন্যান্য সুশৃঙ্খল সুসমতাও—কেলাসসমূহের মধ্যে যেমন দেখা যায়—পরমাণুঘটিত ব্যাখ্যার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছিল। সতেরো শতকে স্টেনো দেখিয়েছিলেন যে কেলাসের বিভিন্ন পার্শ্বের মধ্যেকার *কোণগুলি* সর্বদাই অপবিবর্তিত থাকে। হাইগেন্স বুঝতে পেরেছিলেন যে এর অর্থ হলো, কেলাসগুলো একই রকমের অণু জড়ো করে তৈরি—নিউটনের ভাষায়,'সার বেঁধে লাইন ক'রে দাঁড়ানো'। শেষ পর্যন্ত এইসব পর্যবেক্ষণ থেকে 1800 সালে যিনি একটি সাধারণ সূত্র বার করলেন তিনি হলেন এক লাজুক ফরাসি যাজক—নাম আউয়ি (Haüy)। তিনি দেখালেন; বিভিন্ন ধরনের কেলাসে অণুগুলি কতরকমভাবে সম্মিলিত হতে পারে। পরে মিচর্লিখ (Mitscherlich, 1794-1863) দেখান যে একই ধরনের যৌগের কেলাসগুলিও প্রায় একই রকমের হয়। এর ফলে নবজাত কেলাসবিদ্যা (crystallography) রসায়নের এক কার্যকর উপবিভাগ রূপে গড়ে ওঠে।

ইলেকট্রোলিসিস : ডেভি ও ফ্যারাডে

এই রকমের আরেকটি উপবিভাগ গড়ে উঠল তড়িতের ক্ষেত্র থেকে। দেখা গেল, তড়িৎপ্রবাহের ফলে কেবল জল নয়, লবণসমূহও বিয়োজিত হয়। আগে যেসব ক্ষার ও 'earth'-কে বিয়োজিত করা যায়নি, তাদের থেকেই ডেভি 1807 সালে তৈরি করলেন

সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম—এই তিনটি নতুন ধাতু। এইভাবে তিনি সম্পূর্ণ করলেন লাভোয়াসিএর ছক—যাবতীয় মৌলিক পদার্থকে ধাতু ও অধাতু, এই দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। দেখা গেল, ধাতুর পরমাণুগুলি ধনাত্মকভাবে, এবং অধাতুর পরমাণুগুলি ঋণাত্মকভাবে আহিত (charged)। ফ্যারাডে প্রমাণ ক'রে দিলেন যে দ্রবণের মধ্যে পরমাণুদের পরিবহনের হার তাদের সম্মিলনী-ওজনের সমানুপাতিক। স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গতভাবেই এর থেকে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল তড়িতের এক সর্বজনীন কণার ধারণা—যাকে আমরা বলি ইলেকট্রন। অথচ এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে আসবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরো সত্তর বছর—কারণ তরলেরও যে পরমাণু-প্রকৃতি থাকতে পারে, এই ধারণার বিরুদ্ধে অন্ধ সংস্কার ছিল খুবই প্রবল।

অজৈব ও আকরিক রসায়ন: বার্জেলিয়াস

ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানের পারস্পরিক প্রশমনের (neutralization) মাধ্যমে কীভাবে লবণগুলি গঠিত হয়, উপরোক্ত বৈদ্যুতিক তত্ত্ব তার এক সরল ব্যাখ্যা উপস্থিত করল। এর ফলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অধিকাংশ অজৈব যৌগ ও আকরিকের গঠন নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। এ ব্যাপারে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন বার্জেলিয়াস (1779-1884)—সুইডেনের বিখ্যাত রসায়নবিদ।

নতুন ধরনের (অর্থাৎ যা চিরাচরিত নয়) যে রসায়ন-শিল্প আঠারো শতকে গড়ে উঠেছিল তা এই সময় অতি দ্রুত বিকশিত হতে থাকে। একদিকে নবলব্ধ জ্ঞান, অপরদিকে অন্যান্য শিল্পের (বিশেষত বস্ত্রশিল্পের) বহুগুণিত চাহিদার ফলেই এই বিকাশ ঘটল। সে বিকাশ ঘটছিল এমন ধরনের প্রতিষ্ঠানে যা তখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানী ও উৎপাদকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ কাজের সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে অনুকূল ছিল—অর্থাৎ তখনো সেসব প্রতিষ্ঠান দানবাকৃতি হয়ে ওঠেনি। আকরিকের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ রসায়নবিদদের আগ্রহ ছিল মূলত আকরিকের বিশ্লেষণের দিকে; আর ঔষধের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ রসায়নবিদদের আগ্রহ ছিল মূলত উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ পদার্থের প্রতি। এই দু ধরনের রসায়নবিদের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করল নবীন রসায়নশিল্প।

জৈব রসায়ন: দুমা ও ফন লীবিখ

এই প্রথম রসায়ন একটা দৃঢ় ও স্থায়ী অর্থনৈতিক ভিত্তি খুঁজে পেল। এই ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে এবার তা জৈব রসায়নের জটিলতর ক্ষেত্রে পা বাড়াল। এই ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করতে এগিয়ে এলেন তাঁদের প্রতিভা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও, জৈবরসায়নের অগ্রগতি ঘটল অত্যন্ত শ্লথগতিতে। তৈল, শর্করা, উদ্ভিজ্জ অম্ল ইত্যাদি সরল জৈব পদার্থের নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধিকরণে খুব বেশি অসুবিধা হয়নি, তাদের মধ্যে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন—এই নবজ্ঞাত মৌলিক পদার্থগুলির কোনটি কতটুকু আছে, সে বিশ্লেষণ করতেও খুব একটা অসুবিধা হয়নি। অসুবিধাটা হলো এই যে এই সব তথ্য জেনেও বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছিল না—তার জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন ধরনের কোনো ব্যাখ্যা।

সেই নতুন ব্যাখ্যা দিলেন নতুন রসায়নবিদেরা—প্রথমে ফ্রান্সের গে লুসাক (1778-1850), লোরাঁ (Laurent, 1808-53), গেরহার্ট (Gerhardt, 1816-56) ও *দুমা* (1800-84) এবং পরে জার্মানির ফন্ লীবিখ্ ও য়োলার (Wohler, 1800-82)। সত্তর বছরের একটানা ফরাসি আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে রসায়নের ক্ষেত্রে জার্মানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় লীবিখের অবদানই সবার চেয়ে বেশি। গীসেন (Giessen)-এ তাঁর পরীক্ষাগারটি আধুনিক রসায়ন-শিক্ষা ও গবেষণাগারের এক আদর্শ হয়ে উঠেছিল। স্নেহপদার্থ, স্নেহপদার্থঘটিত অম্ল, অ্যালকোহল প্রমুখ অপেক্ষাকৃত সরল জৈব পদার্থের চর্চা থেকে ক্রমশ গঠন-বিষয়ক নানারকম ধারণার উদ্ভব হতে থাকে। এক বল্ নাচের আসরে ক্লোরিন-বিরঞ্জিত নতুন ধরনের মোমবাতি ব্যবহার করতে

গিয়ে কেলেংকারি কাণ্ড ঘটে যায়—দুর্গন্ধে ভরে যায় ঘর। দুমাকে এ-ব্যাপারটা তদন্ত করতে বলা হয়। সে কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে হাইড্রোজেনের জায়গায় ক্লোরিনকে *প্রতিস্থাপন* (substitute) করা যায়। এ থেকে জন্ম নিল প্রতিস্থাপনের সর্বজনীন তত্ত্ব। সেখান থেকে এল বিশেষ *ধরনের* অণুর তত্ত্ব—যেমন অ্যালকোহল-সম্প্রদায়ের অণু, যার প্রত্যেকটির মধ্যে একটি বিশেষ অংশ অভিন্ন থেকে যায়। তারপর এল মূলক বা *radicles*-এর তত্ত্ব; বিচ্ছিন্ন এই অংশগুলি (যথা মিথাইল, বেনজোইল প্রভৃতি) হয়তো পরমাণুর ভূমিকা পালন করে।

1823 সালেই ফন লীবিখ *isomerism*-এর একটি ঘটনা লক্ষ্য করেছিলেন—অর্থাৎ উপাদান একই হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন রসায়নিক ধর্ম-সমন্বিত দুটি পদার্থ। স্পষ্টতই, অণুর ভিতরকার বিন্যাসে কিছু পার্থক্য থাকার জন্য এটি ঘটে। কিন্তু এই ধারণা প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হলো—প্রধানত আধিদৈবিক ও দার্শনিক বিরোধিতা। বহু বিজ্ঞানীই পরমাণুর প্রকল্পটিকে (hypothesis) মেনে নিতে পারছিলেন না। অনেকের মনে হচ্ছিল, অভিজ্ঞতা যা বলে তা থেকে বড়ো বেশি দূরে সরে যাচ্ছে এ-তত্ত্ব; অনেকে আবার এর মধ্যে বিপ্লবী যুক্তিসঞ্জাত ঈশ্বরবাদের (deism) গন্ধ পেলেন। তাছাড়া, জীবিত প্রাণী যেসব পদার্থ উৎপন্ন করে সেগুলিকে যে গবেষণাগারেও তৈরি করা যেতে পারে, এই ধারণাটি সম্পর্কেও প্রবল অনীহা ছিল।

আভোগাদ্রো'র সূত্র

জৈবরসায়ন হয়তো কেবল বিশাল বিশাল ফরমূলা-যুক্ত নানান পদার্থের, কিংবা এক ধরনের পদার্থকে আরেক ধরনের পদার্থে রূপান্তরিত করার বিক্রিয়াসমূহের এক শ্রেণীবদ্ধ তালিকাই হয়ে থাকত—যদি না ভৌত বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে দুটি সুনির্দিষ্ট ধাক্কা আসত। প্রথমটি হলো আভোগাদ্রো'র (1776-1856) সূত্র। 1811 সালেই আভোগাদ্রো এ সূত্র প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু সেটিকে তখন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি; পরে কানিজারো (1826-1910) যখন 1860 সালে সেই সূত্র নতুন করে বললেন তখন তা স্বীকৃত হলো। এই সূত্র অনুযায়ী, একই পরিস্থিতিতে সম-আয়তনের সব গ্যাসেই সমান সংখ্যক অণু থাকে। এর ফলে অণুর মধ্যে প্রত্যেক ধরনের পরমাণুর সঠিক সংখ্যাটা বার করা সম্ভব হয়ে উঠল।

অপ্রতিসম অণু: পাস্তুর

দ্বিতীয় আবিষ্কারটি হলো, র‍্যাসিমিক অ্যাসিডকে দুটি অংশে বিচ্ছিন্ন করা· একটি অংশ সাধারণ টার্টারিক অ্যাসিড, আর অন্য অংশটি রসায়নিক ভাবে অভিন্ন হলেও ভৌত ধর্মের দিক থেকে ভিন্ন। উনিশ শতকের বিজ্ঞানে এই আবিষ্কারটি ছিল কেন্দ্রীয় গুরুত্বসম্পন্ন। 1848 সালে এ আবিষ্কারটি করেন পঁচিশ বছরের তরুণ লুই পাস্তুর। তিনি দেখান যে লেবরেটরিতে প্রস্তুত পদার্থের অণুসমূহ সমবর্তিত (polarized) আলোর তলকে ঘোরাতে পারে না; অথচ প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ঐ একই পদার্থের অণু তাকে ঘুরিয়ে দেয়। লেবরেটরিতে প্রস্তুত পদার্থে দক্ষিণমুখী ও বামমুখী, এই দুধরনের গঠনসম্পন্ন সমসংখ্যক অণু থাকে; কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন অণু কেবল এক ধরনেরই হয়।

এই আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ থেকে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলো। প্রথমটি এই যে অণুগুলির *ত্রিমাত্রিক* আকার আছে, অর্থাৎ এদের কঠিন বস্তু-নির্মিত মডেল হিসেবে ভাবা যেতে পারে। দ্বিতীয়টি এই যে সমসাময়িক রসায়নবিদরা যেভাবে অণু প্রস্তুত করছিলেন, প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতি তার থেকে আলাদা; শুধু তাই নয়, প্রাণীসমূহের মধ্যে নিশ্চয় এমন সুনির্দিষ্ট রসায়নিক গঠনের অস্তিত্ব আছে, যা (ধরে নেওয়া যাক) কেবল দক্ষিণমুখী, বামমুখী

নয়। পাস্তুর নিজে এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি অনুসরণ করেন, এবং তারই ফলে প্রথমে আধুনিক প্রাণ-রসায়নের (bio-chemistry) ও পরে জীবাণুবিদ্যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে তাঁর স্থান পাকা হয়ে যায়।

কেকুলে: বেনজিন বন্ধনী

অপব সিদ্ধান্তটি গ্রহণ ক'রে বিকাশ লাভ করে জৈবরসায়ন, অবশ্য খুবই ধীরগতিতে। 1865-তে একদিন লন্ডনের এক বাসে চেপে যেতে যেতে জার্মান রসায়নবিদ কেকুলে'র (1829-96) মাথায় এই ভাবনাটা আসে যে অণুগুলিকে শূন্যে (space) অবস্থিত পরমাণুসমূহের নকশা হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে: এবং বেনজিন অণু C_6H_6-এর মধ্যে আছে ছটি কার্বন পরমাণুর এইরকম এক বন্ধনী:

```
    C
  C   C
  |   |
  C   C
    C
```

সেই সময় থেকে কোনো পদার্থের অণুর ভিতরে কতগুলো পরমাণু আছে, কেবল সেই হিসেবটুকুই আর যথেষ্ট রইল না; তাদের বিন্যাসটি কেমন, কী ধরনের গঠন-সূত্রে তারা বিন্যস্ত, তার ইঙ্গিত দেওয়াও হয়ে উঠল অপরিহার্য। আগে ছিল কেবল হিসাবরক্ষকের হিসাব; এখন এল স্থপতির পরিকল্পনা। যে ধারণাটা অস্পষ্টভাবে ক্রমশ জন্ম নিচ্ছিল, কেকুলে তার নিশ্চিত প্রমাণ দিলেন: তিনি দেখালেন যে অন্য পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মতো যোগসূত্রের সংখ্যা একেক ধরনের পরমাণুর ক্ষেত্রে একেক রকম: হাইড্রোজেনের আছে একটি যোগসূত্র, অক্সিজেনের দুটি, কার্বনের চারটি। এই যোগসূত্রগুলির নাম দেওয়া হলো *যোজ্যতা (valency)*।

এব আরো বারো বছর পর ভান্ট্ হফ (1852-1911) ও ল বেল (1847-1930) যুগপৎ উপলব্ধি করলেন, কার্বনের যে-চারটি যোজ্যতা রয়েছে তা কখনো একই তলে থাকতে পারে না, সেগুলো নিশ্চয়ই শূন্যে বিভিন্ন তলে খোঁচার মতন বেরিয়ে থাকে। কেন অণুর দুধরনের গঠন হয়, কেন কতকগুলো হয় দক্ষিণমুখী আর কতকগুলো হয় বামমুখী—যে ঘটনাটা পাস্তুর পঁচিশ বছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন—তার ব্যাখ্যা এতদিনে পাওয়া গেল। এই সময় থেকে ত্রি-মাত্রিক গঠনগত জৈবরসায়ন হয়ে ওঠে ফলিত জ্যামিতির এক শাখা, এবং জটিল যৌগসমূহের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ দুটোই সম্ভব হয়ে ওঠে।

কৃত্রিম রঞ্জক ও জার্মান রসায়ন-শিল্প

এর আগেই অবশ্য ব্যবহারিক দিক থেকে জৈব-রসায়ন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। কুইনিনেব বিকল্প আবিষ্কার করতে গিয়ে প্রায় ঘটনাচক্রেই পার্কিন (1838-1907) 1856 সালে আবিষ্কার করেন ম্যাজেন্টা—যা কিনা প্রথম কৃত্রিম অ্যানিলিন-রঞ্জক। একই সঙ্গে তিনি গ্যাস-শিল্প থেকে প্রাপ্ত আলকাৎরা-জাত পদার্থসমূহকে কাজে লাগানোর একটা রাস্তা খুলে দিলেন। কিন্তু ইংলন্ডে তখনো রসায়নচর্চা দু-চারজন শৌখীন উৎসাহীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সারস্বত মহলে রসায়নচর্চায় উৎসাহীর সংখ্যা ছিল আরো কম। অপরদিকে রসায়ন-শিল্প তখন নিজেকে 'কেজো' আখ্যা দিয়ে গর্ববোধ করত। কাজেই পার্কিনের আবিষ্কার ব্রিটেনে পাত্তা পেল না। কিন্তু নবীন জার্মান শিল্পের অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞান-মনস্ক পরিচালকরা তৎক্ষণাৎ সে-আবিষ্কারকে কাজে লাগালেন। কৃত্রিম রঞ্জক থেকে যে বিপুল পরিমাণ মুনাফা পাওয়া গেল তার সাহায্যে গড়ে উঠল প্রকাণ্ড জার্মান রসায়নশিল্পের বনেদ। প্রথমে এই শিল্প ছিল বস্ত্রশিল্পের অঙ্গ। কিন্তু নতুন নতুন বিস্ফোরক তৈরির জন্য নাইট্রিক অ্যাসিডও এর মাধ্যমে পাওয়া যেতে লাগল। দুই বিশ্বযুদ্ধের মূলেই এই ঘটনাটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

রসায়নবিদরা—বিশেষত উনিশ শতকের শেষার্ধের রসায়নবিদরা—কার্যত এক নতুন ধরনের বিজ্ঞানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তার আগে কখনো ভৌত বিজ্ঞানীরা শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হননি। এর ফলে বিজ্ঞানকে শিল্প-স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করে দেখার প্রবণতা দেখা দিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে বৈজ্ঞানিক তর্কবিতর্ক, বিশেষ করে আপসহীন বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি যে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল, এটাই তার অন্যতম প্রধান কারণ।

তবে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দিক থেকে দেখলে, একথা অনস্বীকার্য যে জৈব-রসায়নিক পদ্ধতিতে পদার্থের আণবিক গঠন নির্ধারণ করাটা মানবমনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তিগুলির একটি। এ সম্পর্কে চূড়ান্ত পদক্ষেপগুলি নিয়েছিলেন অল্প কয়েকজন মানুষ; কিন্তু বহুসংখ্যক রসায়নবিদ তাঁদের পথ অনুসরণ করেছিলেন। রসায়নিক রূপান্তরণের যুক্তির সাহায্যে তাঁরা শূন্যে অবস্থিত জটিলতম ছাঁদের পারমাণবিক সংস্থিতিও কল্পনা করে নিতে পেরেছিলেন। শুধু কল্পনা করাই নয়, তাঁরা ঐসব পারমাণবিক সংস্থিতি-সম্পন্ন পদার্থ বাস্তবে তৈরি করতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ ইতিপূর্বে *বিশ্লেষণের* সাহায্যে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাকে *সংশ্লেষণের* সাহায্যে তাঁরা প্রমাণিত করেন। এইভাবে গড়ে উঠল জৈব-রসায়নের স্বতন্ত্র ধারা, যা প্রায় কোনোভাবেই পদার্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল নয় এবং যার নিজস্ব নিয়মাবলী ও কর্মধারা রয়েছে।

ভৌত রসায়ন

তবে রসায়নের সমগ্র ক্ষেত্র সম্পর্কে, বিশেষত অজৈব রসায়ন সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য নয়। অজৈব রসায়নের ক্ষেত্রে, কেবল পদার্থের উপাদান নির্ণয় করার বদলে আগ্রহটা ক্রমশ তাদের পারস্পরিক বিক্রিয়া-পদ্ধতি নির্ণয় করার দিকে সরে গেল। তাপের প্রভাব, দ্রবণ, কেলাসন ও তড়িৎবিশ্লেষণ নিয়ে আগ্রহ জাগল। এইসব আগ্রহ থেকে জন্ম নিল রসায়নের এক নতুন শাখা, যা অবশেষে নতুন এক বিষয়রূপে পরিগণিত হলো—*ভৌত রসায়ন।* এটাই ছিল প্রথম দো-আঁশলা বিজ্ঞান। পরে বিংশ শতাব্দীতে একের পর এক যেসব 'সেতু'-বিজ্ঞান গড়ে উঠে বিজ্ঞানকে এক সামগ্রিক কার্যকর ঐক্যে সংহত করবে, তার প্রথম আভাস পাওয়া গিয়েছিল ভৌত রসায়নে। ভৌত রসায়নের গুরুত্ব বিশেষভাবে বোঝা গেল যখন আকরিক লবণসমূহের অবক্ষেপকে—বিশেষ করে স্টাসফুর্ট্ অঞ্চলের অবক্ষেপকে—শিল্পে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হলো। ভৌত রসায়নিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ ছাড়া ঐসব অবক্ষেপকে লাভজনকভাবে তাদের উপাদানসমূহে বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব ছিল না। একেবারে নতুন সব রসায়ন-শিল্পও গড়ে উঠল এর ভিত্তিতে, যথা সল্‌ভে অ্যামোনিয়া সোডা পদ্ধতি যা সোডা উৎপাদনের লব্লাঁ-পদ্ধতির বদলে চালু হলো; কিংবা নানাবিধ অনুঘটন-প্রক্রিয়া (catalytic process) যা সালফিউরিক অ্যাসিড বা অ্যামোনিয়া উৎপাদনের ভিত্তি। পরে ব্রিটিশ রসায়ন-শিল্পের বৃহত্তম একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানটি মূলত এইসব প্রক্রিয়াগুলির ভিত্তিতেই বিকাশ লাভ করেছিল।

প্রাণরসায়নের আদিপর্ব

বিজ্ঞানের ইতিহাসে নবীন জৈব-রসায়ন আরো একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করেছিল। তা হলো, প্রাণীদেহ-সংক্রান্ত নানাবিধ প্রক্রিয়াকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার পথ প্রশস্ত করা। বস্তুত, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এ ব্যাপারে যতটুকু জানা গিয়েছিল, তার থেকে সামান্য গভীরভাবে জানতে গেলেও সবার আগে প্রয়োজন ছিল প্রাণীদেহ-সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলিতে কার্যত যে ধরনের গঠন-সম্পন্ন পদার্থ সক্রিয় থাকে তাদের সম্মিলন-সূত্র ও চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানলাভ। উনিশ শতকে জৈব রসায়নের বিকাশ ছাড়া জীববিদ্যার বনেদ তৈরি করা সম্ভব ছিল না।

প্রাণীদেহের ও উদ্ভিদের বিপাকক্রিয়ায় (metabolism) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন-ঘটিত প্রক্রিয়াগুলি আঠারো শতকেই জানা হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ, প্রাণীদেহকে

একটি তাপ-এনজিন হিসেবে বিবেচনা করে যতদূর বোঝা যায়, তা বোঝা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রাণীদেহে নাইট্রোজেনের সমান-গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি বুঝতে বুঝতে উনিশ শতকের বেশ কিছু দিন কেটে গেল। অবশেষে ফন লীবিখ দেখালেন, উদ্ভিদরা মাটি থেকে কী ধরনের খাদ্য টেনে নেয়—নাইট্রোজেন, ফসফেট ও লবণ। আবিষ্কৃত হলো বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের বিরাট রূপান্তর-*চক্রগুলি*—যেমন প্রাণীদেহের মাধ্যমে উদ্ভিদের নাইট্রোজেনের মাটিতে ফিরে-আসার চক্র। এমনকি নাইট্রোজেন-সংবন্ধনকারী জীবের সাহায্যে বাতাসেও সে প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান চলল। জীবদেহে এইসব অজৈব পদার্থের ভূমিকা কী, সে ব্যাপারে অবশ্য তখনো তেমন কিছু বোঝা যায় নি। কারণ একদা-জীবিত উৎস থেকে সংগৃহীত পদার্থের ধর্ম—বিশেষত শিল্পের পক্ষে উপযোগী ধর্মসমূহ—নিয়ে গবেষণা করা এক জিনিস, আর বিপাকীয়-ক্রিয়া চলাকালীন তাদের কী রূপান্তর ঘটে তা অনুসন্ধান করা সম্পূর্ণ আরেক জিনিস। সেই কারণেই জৈব-রসায়ন *প্রাণ-রসায়নে* রূপান্তরিত হতে এত সময় লাগল। শতাব্দীর শেষ যত ঘনিয়ে এল, রসায়নবিদদের আগ্রহ ততই বদলাতে লাগল। কৃত্রিম রঞ্জক-শিল্পে মুনাফা মিলত হাতে হাতে। কিন্তু কৃত্রিম রঞ্জকের রসায়নচর্চা ছেড়ে রসায়নবিদরা এবার ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠলেন প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন জৈব পদার্থের গঠনকে আরো ভালোভাবে বুঝতে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন এমিল ফিশার (1852-1919)। শর্করা এবং 'প্রাণবস্তু' নিয়ে তিনি কাজ করেন। তিনি দেখান, ঐ 'প্রাণবস্তু হচ্ছে প্রোটীন, এবং প্রোটীন অপেক্ষাকৃত সরল অ্যামিনো অ্যাসিড-শৃঙ্খলের সমন্বয়ে তৈরি। এছাড়া রঞ্জক পদার্থ-সংশ্লিষ্ট রসায়নচর্চা থেকেই উপজাত হলো কিছু কিছু অসুখের উপশমকারী ওষুধ—যথা সিফিলিসের জন্য এর্লিখ (1854-1915) আবিষ্কৃত স্যালভার্স্যান, এবং ঝিমিয়ে-পড়া রোগের জন্য বায়ার-206। এগুলি ছিল আগামী শতকের রসায়নিক ওষুধ বা কেমোথেরাপির জয়যাত্রারই পূর্বাভাস। এরই মধ্যে দিয়ে নতুন এক রসায়নিক ভেষজশাস্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো।

5. জীববিজ্ঞান

গোটা আঠারো ও উনিশ শতক জুড়ে ভৌত বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল জীবিত বস্তু সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার নতুন এক মনোভঙ্গি। এর মূল অবশ্য নিহিত বহুযুগ আগে—অ্যারিস্টটলের প্রাকৃতিক ইতিহাস ও গ্যালেন-এর শারীরতত্ত্ববিদ্যার মধ্যে। পরবর্তীকালে প্রকৃতি সম্পর্কে নেহাৎ বাহ্য আকারগত ও নৈতিক আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠায় এই অনুসন্ধিৎসায় ছেদ পড়েছিল। দীর্ঘ এই বিরতির পর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আবার জাগ্রত হয়ে ওঠে মধ্যযুগের শেষে এবং রেনেসাঁসের যুগে। আমেরিকা থেকে প্রত্যাশিত ও প্রাপ্ত সম্পদ বিপুল বিস্ময় জাগিয়ে তুলছিল। তাই তখন দৃশ্যগত প্রকৃতিবাদের দিকে ঝোঁক বাড়তে থাকে। ষোলো এবং সতেরো শতকে শারীরস্থানবিদ্যা ও শারীরতত্ত্ববিদ্যায় বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। প্রথম যুগের অণুবীক্ষণকুশলীদের হাতে খুলে গিয়েছিল অতিক্ষুদ্রের জগতের দুয়ার।

যেমন পদার্থবিদ্যায় তেমনি জীববিদ্যার ক্ষেত্রেও দেখা গেল, সতেরো শতকের পথপ্রদর্শকরা যে সজীব আগ্রহ নিয়ে চর্চা করতেন, শতকের শেষের দিকে তা আর রইল না। একদিকে তা প্রাকৃতিক ইতিহাস-সংক্রান্ত শৌখীন কৌতূহল-নিবৃত্তির মজাদার খেলায় রূপান্তরিত হলো; অন্যদিকে তা পণ্ডিতম্মন্য ভেষজ-চর্চার সেবায় নিয়োজিত হলো। উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা ঐ ভেষজ-চর্চার অঙ্গ ছিল ঠিকই, তবে মূলত ওষুধের উৎস হিসেবেই তাদের নিয়ে চর্চা করা হতো। তবে একথা ঠিক যে আলোচনামূলক পর্যবেক্ষণের এই প্রাথমিক পর্বটি ছিল জীববিজ্ঞানের বিকাশের এক অপরিহার্য পূর্বশর্ত। পদার্থবিদ্যার, এমনকি রসায়নের, চাইতেও

জীববিজ্ঞানের খুঁটিনাটি অনেক বেশি। অজস্র তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষা ও সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হলে পর তবেই তা থেকে আদৌ কোনো উপলব্ধিতে পৌঁছানো সম্ভব। এর জন্য সময় লেগেছিল 200 বছরেরও বেশি।

মূলত যে যে তাড়নার বশে আঠারো ও উনিশ শতকে জীববিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ দিকের প্রতি আগ্রহ জন্মাল এবং অগ্রগতি ঘটল, সেগুলি হলো: (এক) প্রধানত নতুন নতুন প্রাকৃতিক পদার্থের সন্ধান পাওয়ার ও সেগুলিকে কাজে লাগানোর আশায় ভৌগোলিক অনুসন্ধান। (দুই) বিকাশমান চিকিৎসাশাস্ত্র, যা শারীরতত্ত্ব ও শারীরস্থানের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিল, তার প্রয়োজন মেটানো। (তিন) জীবনধারণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আগেকার প্রচলিত কৃষির বদলে বাজাবের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে বাণিজ্যমুখী কৃষির প্রবর্তনের ফলে কৃষিক্ষেত্রে যে-বিপ্লব ঘটে তার চাহিদা পূরণ ও সমস্যা-সমাধান। (চার) বস্ত্র, খাদ্য ও পানীয়সমেত অন্যান্য শিল্পের বিপুল বিস্তৃতি। এগুলি প্রধানত প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। প্রচলিত পদ্ধতির ওপর এইসব শিল্প আর নির্ভর করতে পারছিল না। এদের প্রয়োজন মেটানো ছিল জীববিজ্ঞানের অগ্রগতির অন্যতম তাড়না। উপরিউক্ত কারণগুলির প্রত্যেকটিই আবার একে অপরের ওপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল। প্রথম দুটি তাড়না আগাগোড়াই সক্রিয় ছিল, যদিও ক্রমশ ভৌগোলিক অনুসন্ধান অপেক্ষা চিকিৎসাশাস্ত্রের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। শেষ-আঠারো শতকের আগে বিজ্ঞাননির্ভর কৃষি, এবং মধ্য-উনিশ শতকের আগে শিল্প-সংশ্লিষ্ট জীববিজ্ঞানের প্রচলন হয় নি।

ভৌত এবং রসায়নিক বিজ্ঞানে সমস্যার সংখ্যা ছিল সীমিত, এবং সে-সমস্যাগুলি নির্ধারিত হয়েছিল শিল্পের অগ্রগতির দ্বারা। সে-তুলনায় জীববিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং খানিকটা আলগা ভাবে। ব্যবহারিক উপযোগিতার মাপকাঠিতে জীববিজ্ঞানের অগ্রগতি যেহেতু সর্বদা প্রমাণ করা যেত না, তাই স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞান-বহির্ভূত ভাবনার দ্বারা তা অনেক সহজে প্রভাবিত হতো; বিশেষ করে, সেই গোটা পর্ব জুড়ে নানান রূপে ধর্মীয় এবং ধর্মদ্রোহী যেসব বিরাট বিরাট সংগ্রাম চলেছিল, যা ফরাসি বিপ্লবের আগে ও পরে আঠারো ও উনিশ শতককে কাঁপিয়ে তুলেছিল, তাদের দ্বারা।

ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের যে-তত্ত্ব জ্যোতিষ্কলোকের ক্ষেত্রে খারিজ হয়ে গিয়েছিল, ধর্মধ্বজীরা সেই তত্ত্বের যৌক্তিকতা নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন প্রাণী জগতের মধ্যে। অপরদিকে, যুক্তিবাদীরা চাইলেন জীবন-ব্যাপারের মধ্যে জড়ের যান্ত্রিক ভূমিকার নিদর্শন দেখিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে সকল আধিদৈবিকতাকে উৎখাত করতে; ওল্ড টেস্টামেন্ট-বর্ণিত ছেলেমানুষি সৃজন-উপাখ্যান-গল্পের ফানুসটিকে চিরকালের মতো ফাটিয়ে দিতে। দু পক্ষই মনে করতেন যে তাঁরাই অভ্রান্ত। এবং নিজ নিজ মতের অভ্রান্ততা প্রমাণের জন্য দুপক্ষের প্রকৃতিবিদরাই বিপুল উদ্যমে প্রকৃতিকে আঁতিপাঁতি করে অনুসন্ধান করে আরো অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে লাগলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে আর ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা তখন ধর্মীয় ধ্যানধারণার ছিল না। কিন্তু তখনো, অন্তত ডারউইন-তত্ত্ব বিজয়ী হওয়ার আগে পর্যন্ত, গবেষণা থেকে স্পষ্টতই যা বোঝা যাচ্ছে তাকেও স্বীকার করার পথে ধর্ম বাধা হয়েছিল। জীবজগৎ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার পথের প্রতিটি ইঞ্চির জন্য লড়াই করতে হয়েছে। এর ফলে ঐ ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত হতে সময় বেশি লাগলেও, সান্ত্বনা এই যে তাকে আরো ভালো করে বোঝা সম্ভব হয়েছে ঐ কারণেই।

যা অতি সাধারণ, এবং যা চমকপ্রদ, উভয়কেই—প্রায়শ একই সঙ্গে—বুদ্ধিহীনভাবে বরণ করে নেওয়ার ঘটনা জীববিজ্ঞানে যত বেশি ঘটেছে, তেমন পদার্থবিদ্যাতে ঘটেনি (অবশ্য

সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ ঘটনা আরো বেশি ঘটেছে)। একদিকে যা কিছু প্রকৃতিতে রয়েছে তা স্পষ্টতই স্বাভাবিক: কেন ঘাস গজায় কিংবা সিংহ গর্জন করে, তার কোনো ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন: কারণ ওটাই তাদের প্রকৃতি, তারা বরাবরই তাই করে এসেছে, বরাবরই করবে। অপরদিকে, জীবাশ্মের সাক্ষ্য কিংবা সৃজনের ঐতিহ্য থেকে যদি একথা মেনে নিতেই হয় যে এই বিশ্ব একদা অন্যরকম ছিল, তাহলে একথা বিশ্বাস করাই ভালো যে হঠাৎই একদিন বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, 'দুম্' করে, বড়োজোর সাতদিনে, শূন্য থেকে। আসলে বিশ্বের যে-রূপ আমরা দেখছি, তার থেকে আলাদা, কিন্তু তার সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীন নয় এমন একটা অন্য রূপ থেকে ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে কীভাবে এই বিশ্বের উদ্ভব হয়েছে, তার অনুসন্ধানে ব্রতী হওয়াটা অনেক কঠিন কাজ। একেবারে 1859 সাল পর্যন্ত অত্যন্ত ব্যবহারিক বোধসম্পন্ন ও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন প্রকৃতিবিদ ও ভূবিদরাও বিনা দ্বিধায় এমন অদ্ভুত সব ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কথা মেনে নিতে রাজি ছিলেন যার তুলনায় ওল্ড টেস্টামেন্ট-বর্ণিত নোআ'র মহাপ্লাবন নেহাৎ ছেলেখেলা।

জীবদেহের প্রক্রিয়াগুলি এতই জটিল যে তাদের নিয়ে কোনো সর্বজনীন ধারণায় উপনীত হবার আগে প্রয়োজন জীবিত বস্তুসমূহ সম্পর্কে ব্যাপকতম ও গভীরতম অনুসন্ধান। প্রাকৃতিক ইতিহাসবিদদের প্রাথমিক কাজ ছিল সেইটাই। আগামী অধ্যায়গুলিতে আমরা প্রথমে প্রাকৃতিক ইতিহাসের এবং তার সহযোগী বিষয় ভূবিদ্যার বিকাশ নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখব কীভাবে তার পরিণতি ঘটল জৈবিক বিবর্তনের তত্ত্বে। মানবভাবনার ইতিহাসে এই তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম; কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে এই মহান তত্ত্বের ভিত্তি ছিল কেবল জীব এবং জীবাশ্মের বাহ্য আকৃতি ও স্থূল শারীরসংস্থান; এর ব্যবহারিক প্রয়োগও ছিল সামান্য। সে তুলনায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জীবদেহের অভ্যন্তরীণ গঠনতন্ত্রের পর্যালোচনার অন্য যে ধারাটি শুরু হয়েছিল অণুবীক্ষণযন্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে, এবং যে-ধারা রসায়নিক পদ্ধতিতে অনুসৃত হয়েছিল, তা ছিল অনেক বেশী সন্ধানী। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে এর ব্যবহারিক উপযোগিতারও আভাস পাওয়া যাচ্ছিল—অসুখ সারানোয় ও শস্যের পুষ্টিসাধনে।

প্রাকৃতিক ইতিহাস ও বর্গীকরণ

আঠারো শতক ছিল পর্যটক, সংগ্রাহক ও বর্গীকারকদের (classifier) এক অসামান্য শতক। কীভাবে উদ্ভিদ-বাগানে উদ্ভিদ বা আলমারিতে সংগৃহীত জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা হবে, বিশেষ করে কীভাবে তালিকা প্রস্তুত ও মুদ্রণ করা হবে—এইসবের তাগিদেই বর্গীকরণের ভাবনার উৎপত্তি। স্বভাবতই, কীভাবে সাজাতে হবে সে সম্পর্কে এক-একজন সংগ্রাহকের বা তালিকা-রচয়িতার ভাবনা ছিল এক-একরকম; ফলে হরেকরকম নাম ও বিন্যাস নিয়ে একটা এলোমেলো অবস্থার সৃষ্টি হয়।

অবশেষে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে সুইডেনের কার্ল লীনেয়স (1707-78) নামক এক দরিদ্র, প্রায় স্ব-শিক্ষিত, উদ্যমী ও সুশৃঙ্খল মানসিকতা-সম্পন্ন যাজক-পুত্র এগিয়ে এলেন। প্রায় একা হাতেই তিনি পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী, আকরিক এবং বিশেষ করে উদ্ভিদের বর্গীকরণের কাজ শুরু করলেন। তাঁর প্রধান অবদান ছিল উদ্ভিদ-বিদ্যার ক্ষেত্রে। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ক্যামেরারিয়াস-এর (1665-1721) মহান আবিষ্কারটিই হচ্ছে উদ্ভিদদের বর্গীকরণের চাবিকাঠি—অর্থাৎ ফুল হচ্ছে উদ্ভিদের যৌনাঙ্গ। এ যাবৎ অবহেলিত পুংকেশর ও গর্ভকেশরের সংখ্যার ওপর নির্ভর ক'রে লীনেয়স উদ্ভিদদের বিভক্ত করলেন বর্গ (class) ও ক্রমে (order)। গণ (genera) ও প্রজাতি (species) প্রভৃতির

সূক্ষ্মতর বিভাগগুলির জন্য তিনি চালু করলেন দুই-নামবিশিষ্ট নামকরণ পদ্ধতি, যথা *Linnea borealis L**; এই পদ্ধতিতে একটি নামে যতগুলি শব্দ ব্যবহার করা হয়, তা জীবিত বস্তুকে চিহ্নিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

জ্ঞানসম্ভারকে এইভাবে গুছিয়ে নেওয়ার খুবই প্রয়োজন ছিল তখন—খানিকটা অসংগঠিতভাবে হলেও। লীনেয়স ভ্রমণ করতেন খুব, সংগ্রহ করতেন প্রচুর। উপ্‌সালা শহরে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত এক উদ্ভিদ-বাগান রচনা করেছিলেন তিনি। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর একদল নিবেদিতপ্রাণ শিষ্য তৈরি হয়ে গেল। তাঁরা সারা পৃথিবী ঘুরে বর্গীকরণের কাজ শেষ করতে লাগলেন। সর্বত্রই তাঁদের গুণগ্রাহী ও অনুকারকদের দল তৈরি হয়ে যায়। 'দ লীনিয়ান সোসাইটি অব লন্ডন' প্রতিষ্ঠিত হয় 1788 সালে। পদ্ধতির সরলতা এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর তাঁর প্রশ্নাতীত দখলের কল্যাণে গোটা শিক্ষিত দুনিয়া তাঁর বর্গীকরণ স্বীকার করে নিল। পরবর্তীকালে এর কিছু পরিবর্তন করা হলেও, আজও পর্যন্ত উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যায় এই পদ্ধতিই স্বীকৃত। কিন্তু আকরিকের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতির ভিত্তি ছিল অবৈজ্ঞানিক—সে সময়ে সেটা ছিল অবধারিত। এই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শীঘ্রই বাতিল হয়ে যায় এবং রসায়ন ও কেলাসবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল অপেক্ষাকৃত যুক্তিশাসিত এক পদ্ধতি চালু হয়।

সম্মত পদ্ধতি : বুফঁ

এই পদ্ধতির বলে বলীয়ান হয়ে প্রকৃতিবিদরা—তাঁরা পৃথিবীর যে-অঞ্চলেই থাকুন না কেন—সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে সক্ষম হলেন। কেননা, পৃথিবীর যে-অঞ্চলের জীবই হোক, তার সঠিক নামটি যদি একবার বলা যায় তাহলে তার পরিচয় নিয়ে এবার আর কোনো সংশয় থাকল না। ফলে জীবজগতের বিশ্বজোড়া একটি সর্বজনীন তালিকা বানানোর কাজে তাঁরা এগিয়ে যেতে পারলেন। এই কাজ আজও অব্যাহত রয়েছে। গোড়াতে লীনিয়ান পদ্ধতিতে একটু বেশি কড়াকড়ি ছিল; পরে ক্রমে ক্রমে খানিকটা পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে আরো প্রকৃতিসম্মত একটি পদ্ধতিতে রূপ দেওয়া হয়। লীনিয়ান পদ্ধতির মূলগত কোনো পরিবর্তন অবশ্য ঘটানো হয়নি। যেসব প্রজাতির পরস্পরের সঙ্গে সাদৃশ্য অন্য কোনো প্রজাতির তুলনায় বেশি, তাদের একই গণ (genus)-এর অন্তর্গত করা হলো; আর বৃহত্তর গোষ্ঠীগুলিকে, গণসমূহ ও জাতিসমূহকে (families) পরস্পরের থেকে আলাদা করা হলো আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদের সূত্র ধরে।

বর্গীকারকদের এই কাজের সাক্ষাৎ ও স্থায়ী ব্যবহারিক মূল্য তো ছিলই। কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক ফলাফল ছিল অনেক সুদূরপ্রসারী। এই সময় থেকে জীবিত প্রাণীসমূহের বর্গীকরণের প্রশ্ন উঠলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথাটা স্মরণ করা আবশ্যিক হয়ে উঠল। বস্তুত, নামগুলির মধ্যেই নিহিত থাকত তার কথা—গণসমূহ বা উপজাতি ও জাতির নামের মধ্যে। এই ব্যাপারটা যাঁরা প্রথম উপলব্ধি করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জর্জ লুই দ বুফঁ (Buffon, 1797-88)। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অমায়িক স্বভাবের গুণে প্রাকৃতিক ইতিহাসকে ফরাসি রাজসভা ও ফরাসি উঠতি বুর্জোয়াশ্রেণী, উভয়ের মধ্যেই জনপ্রিয় করে তোলার কাজে তিনি ছিলেন প্রকৃতই অগ্রগণ্য। তিনি স্বয়ং ছিলেন ফ্রান্সের উঠতি বুর্জোয়াশ্রেণীর এক সম্মানিত সদস্য। 1739 সালে তাঁকে

* এই ফুলটি তাঁর এত প্রিয় ছিল যে যখন তাঁকে জায়গীর দিয়ে সম্মানিত করা হয় (তখন তাঁর নাম হয় Carl von Linné) তখন জায়গীরদারির নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক পোশাকের এক অঙ্গ হিসেবে তিনি ঐ ফুলটিকে চিহ্নিত করেন। যত ছবিতে লীনেয়সের হাত দেখা যায়, তার প্রত্যেকটিতেই এই ফুল রয়েছে।

—জে·ডি·বি·

রাজোদ্যানের বা Jardin du Roi (পরে Jardin des Plantes)-এর রক্ষক পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনিই এ-কে পরিণত করেন এক বিরাট গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে। ফ্রান্সের বহু জীববিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ এখান থেকে প্রেরণা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন। প্রাকৃতিক ইতিহাস ছাড়া লীনেয়সের আর কোনো বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ছিল না; কিন্তু বুফঁ-র সুবিধা ছিল এই যে তিনি ছিলেন মূলত এক পদার্থবিজ্ঞানী। জীববিদ্যার ক্ষেত্রে নিউটনীয় সংশ্লেষণের যুক্তিশাসিত ধ্যানধারণার প্রয়োগ ঘটালেন তিনি। কিন্তু, সম্ভবত ঐ একই কারণে, তিনি আদৌ লীনেয়সের মতো ধৈর্যশীল পর্যবেক্ষক ও পরিশ্রমী বর্গীকারক ছিলেন না। বিজ্ঞানকে সাহিত্যিক কায়দায় উপস্থাপন করার রীতির প্রবর্তকও তিনিই। পৃথিবী, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং খোদ মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর অসমসাহসিক ভাবনাচিন্তার দৌলতে প্রকৃতিবাদী দার্শনিক ও ফরাসি বিপ্লবের সংগঠকদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন প্রিয়পাত্র।

তাঁর মহাকাব্য *Systeme de la Nature*-এ বুফঁ দাবি করেন, প্রাণী ও উদ্ভিদের বর্গীকরণের মধ্যে যে-সম্পর্কের কথা নিহিত আছে, সেরকম সম্পর্ক বস্তুতই প্রকৃতিতে রয়েছে। এ ব্যাপারে বুফঁ যাঁর সমর্থন লাভ করেন তিনি হলেন ইর‍্যাস্‌মাস ডারউইন (1731-1802)—'চান্দ্র সভার' (Lunar Society) অগ্রণী সদস্য। লিচফীল্ডের নামকরা ডাক্তার ইর‍্যাসমাস ডারউইন ছিলেন একাধারে কবি, জনবোধ্য বিজ্ঞান-রচয়িতা এবং জীববিজ্ঞানের দূরকল্পনাশ্রয়ী ভাবুক ও অসমসাহসী তত্ত্বপ্রণেতা। *Zoonomia* গ্রন্থে তিনি দেখাতে চান যে আদিম একটি পুংদণ্ড (filament) থেকেই প্রাণের উৎপত্তি। বহুবিচিত্র বাহ্যিক প্রভাবের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ায় ঐ পুংদণ্ডটি থেকেই উদ্ভূত হয় জীবনের নানা রূপ, যা আমরা দেখতে পাই। জীবিত পদার্থের অতিসূক্ষ্ম গঠন অথবা তার বিক্রিয়াসমূহের ধরন সম্পর্কে তাঁর পক্ষে কিছুই তখন জানা সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই তাঁর ভাবনাচিন্তা ছিল দূরকল্পিত, অনুমাননির্ভর। ফলে নতুন কোনো পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার দিকে এগিয়ে না দিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা অচিরেই মদত দিল জার্মানির *Naturphilosophie*-র রোম্যান্টিক ঘরানাকে। তবু সাহস করে তিনি সেদিন যা ভাবতে পেরেছিলেন, পরে অনেক বেশি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অন্যেরা তা পারেন নি।

ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে তীব্র ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া যদি মাথা চাড়া না দিত তাহলে উনিশ শতকের গোড়াতেই এ ধারণাটা খুব সহজে স্বীকৃত হয়ে যেত যে সকল প্রজাতিরই উদ্ভব এক সাধারণ উৎস থেকে। কিন্তু তা হয়নি; বরং সতেরো শতকের বা Counter-Reformation* -এর দিনগুলির চেয়েও প্রবল উদ্যমে নির্দিষ্ট দিনে বাইবেল-বর্ণিত প্রজাতির, প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্ম-কাহিনীকে আক্ষরিকভাবে সত্য বলে প্রচার করাটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল উনিশ শতকের গোড়ায়। কাজেই পঞ্চাশ বছর ধরে অধিকাংশ প্রকৃতিবিদ অণুবীক্ষণে যে-চোখ লাগালেন, কার্যত তা ছিল অন্ধ; তাঁরা প্রকৃতির তাৎপর্য নিয়ে ভাবতে রাজি হলেন না।

আদি বিবর্তনবাদ : লামার্ক

তা সত্ত্বেও কেউ কেউ দূরকল্পনাভিত্তিক ভাবনায় ক্ষান্ত হননি। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক ভাবনা ছিল লামার্ক-এর (1744-1829)। রাজোদ্যানের এই উদ্ভিদবিদ 1809 সালে সাহসের সঙ্গে এই তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন যে পরিবেশের সঙ্গে আরো সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম নেয় যোগ্য হয়ে ওঠার এক প্রক্রিয়া, এবং সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই

* *Counter-Reformation* বা *Catholic Reformation*—প্রোটেস্টান্ট রিফর্মেশনের প্রতিক্রিয়ায় ষোড়শ শতকে রোমান ক্যাথলিকদের রক্ষণশীল আন্দোলন। এর লক্ষ্য ছিল রেনেসাঁসের উদারপন্থী ভাবধারার বিরোধিতা করে চার্চের পুরোনো ঐতিহ্যকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করা।—অনুবাদক

পূর্ববর্তীকালের প্রজাতি থেকে ক্রমে আজকের প্রজাতির উদ্ভব। উঁচু গাছের পাতা খাবার আকাঙ্ক্ষায় জিরাফ একদা তার গলা বাড়িয়েছিল; সেই গলা-বাড়ানোর উত্তরাধিকার বর্তায় তার পরবর্তী প্রজন্মের ওপর। এই ভাবনাকে তখন মনে হয়েছিল দূরকল্পিত, সমর্থনের অযোগ্য। কিন্তু ইতিমধ্যে জমতে শুরু করেছিল সাক্ষ্যপ্রমাণ—কেবল জীবিত প্রাণী-সম্পর্কিত চর্চার ফলেই নয়, আরো বেশি করে জীবাশ্ম-সম্পর্কিত চর্চার ফলে।

দূরকল্পনাশ্রয়ী ভূ-বিদ্যা ও সৃজনতত্ত্ব

ভূ-বিদ্যা (geology) বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে দেরিতে। মূলত এ ছিল বহিরঙ্গন বিজ্ঞান। ঘরের মধ্যে আলমারিতে সংগৃহীত পৃথিবীর এই বিচিত্র ফসলগুলির দিকে চেয়ে বিস্মিত হওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার ছিল না সংগ্রাহকের। পক্ষান্তরে, যিনি খনি-কর্মী তিনি আকরিক নিয়ে এবং অন্যান্য শিলায় তার উপস্থিতির লক্ষণ নিয়ে তখন এতই ব্যস্ত যে পৃথিবীর গঠন ও ইতিহাস সম্পর্কে কোনো সর্বজনীন তত্ত্ব প্রণয়নের ব্যাপারে সাধারণত তাঁর না থাকত ঝোঁক, না থাকত শিক্ষা। তবুও, আঠারো শতকে প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণভাবে আগ্রহ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর এবং তার জীবাশ্ম নিয়ে অনুমানও বাড়তে থাকে। বস্তুত, তার অনেক আগে থেকেই এ-ধারণা প্রচলিত ছিল যে পাহাড়ে যে সব খোলক (shell) পাওয়া যায় তা সমুদ্রের উপস্থিতির পরিচায়ক, এবং তার থেকে প্রাণের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে অনুমান করা হতো। তবে তখন সব সমস্যাই ধামা চাপা দেওয়া হতো 'নোআর প্লাবনে'র দোহাই দিয়ে। এদিকে সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন দেশের আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের আশ্চর্যজনক বর্ণনা থেকে অন্য একটা দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিয়েছিল: পৃথিবী নিরন্তর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মথিত হচ্ছে এবং তারই ফলে তার উপরিস্তর ভিতরকার আগুনের তাপে ফেটে যাচ্ছে। নেপচুন-বাদী অর্থাৎ বন্যা-পন্থী, এবং প্লুটো-বাদী অর্থাৎ ভূকম্প-পন্থী, এই দু-দলের মধ্যে নিষ্ফল বিতর্ক চলে আঠারো শতকের শেষার্ধ জুড়ে।

অনুমাননির্ভর এই ভূ-বিদ্যার সঙ্গে প্রথম আমূল বিচ্ছেদ ঘটালেন হাটন। এডিনবরার এই ডাক্তার ছিলেন ব্ল্যাক-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। *Theory of the Earth* (1795) গ্রন্থে তিনি যে বক্তব্য রাখলেন তা ছিল সহজবুদ্ধির প্রয়োগের মাপকাঠিতে বৈপ্লবিক। তিনি বললেন, ভূ-তাত্ত্বিক ব্যাপারসমূহ সেইসব শক্তিরই ক্রিয়ার ফসল যেগুলিকে আমরা আজও আমাদের চারপাশে দেখতে পাচ্ছি। গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ এবং হাতেকলমে কৃষিকাজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে নদীগুলিই উপত্যকা কেটেছে এবং সেই প্রক্রিয়ায় আনীত কাদামাটি জমে জমে তৈরি হয়েছে সমতলভূমি, আর ঐ কাদামাটিই কঠিন হয়ে তৈরি হয়েছে শিলা। তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে 'Arthur's Seat'-এর অ-স্তরীভূত কঠিন শিলা কখনোই জলের অবক্ষেপ থেকে গড়ে উঠতে পারে না। কট্টর 'নেপচুন-বাদী' ওয়ার্নারের (1749-1871) তা-ই বিশ্বাস ছিল। হাটন বললেন, প্রাচীন আগ্নেয়গিরির লাভা জমাট হয়েই ঐ শিলার সৃষ্টি। তখনকার ফরাসি বিপ্লববিরোধী আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব ধ্যানধারণা ছিল বড়ো বেশি যুক্তিশাসিত, তাই এগুলিকে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ফরাসি বিপ্লববিরোধী প্রতিক্রিয়ার তাড়নায় ভূবিদদের একটা ঘরানা তৈরি হলো (প্রায়শই চার্চ-পোষিত) যা সর্বত্রই ওল্ড টেস্টামেন্ট-বর্ণিত সৃজন-কাহিনীর প্রমাণ খুঁজে বেড়াতে লাগল। তা সত্ত্বেও কিন্তু হাটনীয় ভাবনাচিন্তা কখনোই একেবারে নির্মূল হয়ে যায়নি।

খনি-কর্মীদের অভিজ্ঞতা ছিল নিবিড়, কিন্তু অতিমাত্রায় স্থানীয়। ক্ষেত্রনির্ভর ভূ-বিদ্যার সাফল্য খনি-কর্মীদের কুশলতার ফসল নয়, খাল খননের অভিজ্ঞতার ফসল। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন সার্ভেয়র ও খাল-খনক উইলিয়ম স্মিথ (1769-1839) তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি

করেন যে গোটা দক্ষিণ ইংলন্ড জুড়ে মাটির স্তরগুলি একে অপরের ওপর সাজানো রয়েছে একটাই অপরিবর্তিত ক্রমে। জীবনের বেশির ভাগ সময় জুড়ে তিনি সেগুলির বহিরুস্তবের চিহ্ন আঁকলেন পৃথিবীর প্রথম ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রে।

লায়েল-এর 'সূত্রাবলী'

কীভাবে এই স্তরগুলির উদ্ভব হলো, সে-সম্পর্কে 'বিপর্যয়'-তত্ত্বের ব্যাখ্যা ক্রমশই অচল হয়ে উঠছিল। *Principles of Geology* গ্রন্থে লায়েল কোনো ভণিতা না করেই এ তত্ত্বকে বর্জন করলেন; ফিরিয়ে আনলেন প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া-সম্পর্কিত হাটনীয় মতবাদ, এবং অনেক ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর *সমতাবাদী* তত্ত্ব। কিন্তু এক-একটি স্তর যদি এক-একটি যুগের অবক্ষেপের নিদর্শন হয়, তাহলে ঐ নির্দিষ্ট স্তরে যে-সব জীবাশ্ম পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোও নিশ্চয়ই ঐ বিশেষ যুগে বিদ্যমান প্রাণীদেরই জীবাশ্ম। এবং এইসব জীবাশ্ম জীবনের নানাবিধ রূপের সঙ্গে সম্পর্কিত, এমনকি এদের মধ্যে একটা স্পষ্ট অগ্রগতিও লক্ষ করা যায়। যেমন, মাধ্যমিক বা অনুসম্ভূত (secondary) স্তরের আগে সরীসৃপের চিহ্ন মেলেনি, গঠনক্রমের তৃতীয় (tertiary) স্তরের আগে চিহ্ন মেলেনি স্তন্যপায়ীদের। অতএব লায়েল্‌কে যুক্তির দিক থেকে প্রজাতিসমূহের নির্দিষ্টতার ব্যাপারটা মানতেই হলো। এবং এ থেকে অবধারিতভাবেই তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে প্রতিটি ভূতাত্ত্বিক যুগেই একপ্রস্থ করে নতুন প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে এবং পরে তা বিলীন হয়ে গেছে। স্পষ্টতই এসব ঘটনা ঘটতে অতি দীর্ঘ সময় লেগেছে। সুতরাং বাইবেল-বর্ণিত সৃজন-উপাখ্যানকে মেনে নেওয়া ক্রমশই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। অথচ, উনিশ শতকের গোড়ার দিকের আবহাওয়ায় প্রতিক্রিয়ার এমনই দাপট যে বাইবেলের অভ্রান্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল।

চার্লস ডারউইন ও জৈব বিবর্তন

বস্তুত যতদিন না সংগৃহীত সাক্ষ্যপ্রমাণের চাপ একেবারে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল, এবং একটি থেকে আরেকটি প্রাণীর উদ্ভব কীভাবে ঘটেছে তার একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা উপস্থিত করা গেল, ততদিন প্রাচীন ধর্মের মোহজাল ছিন্ন করা যায় নি। সেই ব্যাখ্যাটিই দিলেন ইর‍্যাসম্যাস ডারউইনের পৌত্র চার্ল্‌স ডারউইন—তাঁর 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে'র তত্ত্বে। চার্ল্‌স ছিলেন সব দিক থেকেই মধ্য-ভিক্টোরিয় পুঁজিতন্ত্রের উপজাত। তাঁর জীবিকা ছিল স্বনির্ভর। 'বীগ্‌ল' জাহাজে করে শিক্ষামূলক পৃথিবীভ্রমণ সেরে আসার পর তিনি ডাউন হাউসে তাঁর নিজস্ব পঠনশালা ও বাগানে স্থিত হয়ে বসেন। সপ্রাণ প্রকৃতির সেইসব দিক নিয়ে সতর্কভাবে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন ডারউইন, যেগুলির সঙ্গে প্রজাতির উৎসের সমস্যার সম্পর্ক আছে।

গল্যাপগস্‌-এর মতো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বিরল প্রজাতির বিস্তারণ (distribution) সম্পর্কিত প্রশ্নে তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ঐসব প্রজাতি একদা মূল ভূ-খণ্ডের পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকেই এসেছিল এবং পরে কোনো কারণে অন্যরকম হয়ে উঠেছে—এরকম ভাবনাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন, কেমন করে, এবং কেন? এমন কি হতে পারে যে জীবনযাত্রার পরিস্থিতির সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে—যা হয়তো নির্দিষ্ট কতকগুলি বৈশিষ্ট্যেরই অনুকূল, অন্যগুলির নয়? তিনি ভাবতে লাগলেন, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিযোগিতার যে পরিস্থিতি বিদ্যমান, তা হয়তো এক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল। আর পুঁজিতান্ত্রিক শোষণকে ন্যায্য প্রমাণ করার জন্য একটি সুবিস্তৃত তত্ত্ব তো হাতের সামনেই ছিল। যাজক ম্যাল্‌থস-এর মতে জীবন একটা যুদ্ধ, যে-যুদ্ধে কেবল যোগ্যতমরাই জেতে; এ যুদ্ধে নৈতিক উৎকর্ষের পুরস্কার হিসেবে জোটে সম্পদ ও সম্মান। খাদ্যের যোগানকে জনসংখ্যার চাপ যাতে ছাপিয়ে না ওঠে, তারই

জন্য আছে রোগ ও যুদ্ধ। ডারউইন ভাবতে লাগলেন, প্রাণীসমাজেও যদি তা-ই ঘটে? তা যদি হয় তাহলে পরিবেশের পক্ষে আরো উপযোগী হয়ে ওঠার পথে যারা নিজেদের এতটুকুও বদলে নিতে পারল, তারা সেই সুবিধাটুকু তাদের উত্তরপুরুষের মধ্যে সঞ্চার করে দেবে, এবং এইভাবে ধীরে ধীরে প্রজাতির বর্তমান চেহারার উদ্ভব হবে। 1840-এর সেই বুভুক্ষু দশক ছিল এরকম একটা পর্যবেক্ষণের পক্ষে একান্তই উপযোগী সময়।

প্রাকৃতিক নির্বাচন

হুঁশিয়ার ডারউইন কিন্তু এই ভাবনা তখনই প্রকাশ করলেন না। তার বদলে প্রায় কুড়ি বছর ধরে তিনি প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে চললেন। প্রাকৃতিক ইতিহাসের যাবতীয় ক্ষেত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করলেন তিনি। শিলার মধ্যে সঞ্চিত স্মারক থেকে তিনি বিগত বিভিন্ন যুগে রূপের ক্রমবিস্তৃতি দেখালেন; দেখালেন বিশ্ব জুড়ে প্রাণী ও উদ্ভিদের বিস্তারণ। উনিশ শতকে প্রাণী-প্রজনন নিয়ে যেসব বিরাট বিরাট পরীক্ষা চলছিল তার থেকেও তিনি পরিবর্তনের এমন অদ্ভুত সব উদাহরণ সংগ্রহ করলেন যা অনায়াসেই প্রাকৃতিক বিবর্তন-জাত পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনীয়। তবু এতসব সত্ত্বেও হয়তো ডারউইন তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করতেন না—যদি না বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক ছোটো আরেকজন পর্যটক স্বাধীনভাবে প্রজাতির বিবর্তনের ধারণায় উপনীত হতেন। তাঁর নাম অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (1823-1913)। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রাণীদের বিস্তারণ নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ওয়ালেস ঐ ধারণায় উপনীত হন।

Origin of Species প্রকাশের পরে যে বিস্ফোরণ ঘটে তা থেকেই বোঝা যায়, তাঁর ভাবনাচিন্তা এতদিন প্রকাশ না করে মুখচোরা ডারউইন কত বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন। ষাটের দশকে পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে খানিকটা অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ধ্যানধারণা এক তুমুল দীর্ঘস্থায়ী বিবাদের জন্ম দিল। এ বিবাদ অবশ্য মূলত ধর্মতাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক প্রশ্নকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল, বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রশ্নকে ঘিরে নয়। জীববিদ্যা-সংক্রান্ত বিজ্ঞানে এ তত্ত্ব মুক্তির হিল্লোল এনে দিল, গোটা জীবজগৎকে এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করল।

তবে বিজ্ঞানে ডারউইনবাদের প্রভাব যে সর্বতোভাবেই সুখকর হয়েছিল তা নয়। একথা ঠিকই যে এর ফলে জীববিজ্ঞানের প্রতি প্রবল আগ্রহ জেগে ওঠে এবং বহু লোক এর চর্চায় মনোযোগী হন। কিন্তু ডারউইন-তত্ত্বে বিভিন্ন জীবের বিবর্তনমূলক সম্পর্ক বিষয়ে সরল অনুসন্ধানের ওপর, এবং সুবিস্তৃত বংশলতিকা রচনার ওপর যে-গুরুত্ব আরোপ করা হয় তার ফলে প্রকৃতিবিদদের মনোযোগ বাস্তব জীবনের, ও প্রাণী এবং উদ্ভিদের শরীরের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াদির অনুসন্ধান থেকে সরে আসে। এর দোষ অবশ্য কোনোভাবেই ডারউইনের ওপর বর্তায় না। বরং কেঁচো, মাংসাশী উদ্ভিদ ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত গবেষণাকর্ম থেকে, এবং তাঁর আবেগমথিত উক্তি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে তিনি ছিলেন পরীক্ষামূলক জীববিদ্যার অন্যতম পথিকৃৎ।

'নাটুর্‌ফিলসফি'

প্রজাতি-বিতর্কের ধারা অনুসরণ করে আমরা একেবারে উনিশ শতকের অন্তে এসে পৌঁছেছি। এখন আবার ফিরে যাওয়া প্রয়োজন শতাব্দীর গোড়াতে। জীবিত বস্তুর গঠন সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জীবিত বস্তুকে উপলব্ধি করার যে বিকল্প পথটি সক্রিয় ছিল, সেটি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রেও প্রারম্ভিক তাড়না এসেছিল প্রাকৃতিক ইতিহাস থেকে, তবে শারীরস্থানবিদ্যা ও শারীরতত্ত্বের দিক থেকেই বেশি।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রহস্যবাদী ধারা শেষবারের মতো গুরুতরভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে জীববিদ্যাতে। উনিশ শতকের গোড়ায় জার্মানির নাটুর্‌ফিলসফি *(Naturphilosophie)*

ঘরানা ছিল এর প্রতিভূ। হের্ডর ও শেলিং-এর মতো দার্শনিক এবং গয়টে'র মতো কবির প্রেরণায় এঁরা প্রকৃতির পরম ভাব বা ঐশ্বরিক পরিকল্পনার খোঁজে মগ্ন ছিলেন। এই সন্ধানের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল জার্মান জনগণের পুনর্জাগরণ ও 'ঘৃণিত' ফরাসি গাণিতিক জড়বাদকে নির্মূল করার প্রয়াস। সে যাই হোক, আদিপ্রতিমার এই সন্ধানের অঙ্গ ছিল প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠন বা *morphology*-র (এই শব্দটি চয়ন করেছিলেন গয়টে) তুলনামূলক পর্যালোচনা। যেসব ধ্যানধারণার বশে একাজে তাঁরা হাত দিয়েছিলেন, সেসব ধ্যানধারণা সম্পূর্ণ উবে যাওয়ার বহু পরেও অব্যাহত থাকে সেই পর্যালোচনার কাজ। লরেন্জ ওকেন-এর নাম আমরা ইতিপূর্বেই করেছি জার্মান বিজ্ঞানের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা রূপে। ওকেন ছিলেন এই ঘরানার শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধিদের অন্যতম। জীবিত এবং লুপ্ত প্রধান প্রধান জীবগোষ্ঠীর সাধারণ গঠনগত বৈশিষ্ট্যকে—যাকে বলা হয় phyla—স্বীকৃতিদানের মূলে ছিলেন ওকেন।

অণুবীক্ষণ: কলা ও কোষ

প্রকৃতিবাদী এই দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিয়েছিল চিকিৎসাবিদ্যার দিক থেকে। চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্যালেনীয় তত্ত্ব ও তার আরবীয় টীকার এক সংমিশ্রণ তখনো প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল। কিন্তু দেহরস-তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা চিকিৎসাশাস্ত্রের এইসব পুরোনো তত্ত্ব রসায়ন ও জীববিদ্যার অগ্রগতির সামনে আর দাঁড়াতে পারল না। তা সত্ত্বেও কিন্তু উনিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এমন কোনো নতুন তত্ত্বের উদ্ভব হয়নি যা এসবের জায়গা নিতে পারে। ফলে এলোমেলো অনুমান এবং নানারকম মত জন্ম নিল এ-যুগে। উদ্যমী হাতুড়েরা হয়ে উঠলেন জনপ্রিয়। মেস্‌মার প্রচার করলেন তাঁর প্রাণী-চুম্বকত্বের তত্ত্ব, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন শারীরস্থানবিদেরা, গল এলেন তাঁর করোটিমিতির (phrenology) তত্ত্ব নিয়ে।

কিন্তু এরই পাশাপাশি, শারীরস্থানবিদ্যা ও শারীরতত্ত্ব নিয়ে নতুন করে যে আগ্রহ জাগল তার ফলে সুস্থতা ও অসুস্থতা সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি অনেক দূর এগিয়ে গেল। রেনেসাঁসের পর এতটা অগ্রগতি আগে আর কখনো হয়নি। বিশা (Bichat, 1771-1802) তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনে বলতে গেলে ঢেলে সাজালেন বিকারতত্ত্বকে (pathology)। বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে সযত্ন পর্যালোচনা করে তিনি তাদের মধ্যেকার বহুলাংশে অভিন্ন কলাগুলিকে (tissues) নির্দিষ্ট করলেন। স্নায়ু, ধমনী, শিরা, পেশি, তন্তু, ত্বক প্রভৃতির কলাকে তিনি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেন। তাঁর পরে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান আরো অনেকে। আমিচি (Amici)-উদ্ভাবিত (1827) নতুন অবার্ণ (achromatic) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কল্যাণে কলাসমূহের সূক্ষ্ম গঠনের অনেক গভীরে দৃষ্টিক্ষেপ করা সম্ভব হলো; সতেরো শতকের পথিকৃৎদের পক্ষে এতটা দেখা সম্ভব হয়নি। তারই ফলে জানা গেল, কলাগুলি তৈরি হয়েছে কোষ দিয়ে: যকৃৎ-এর কোষ চৌকো আকৃতির, পেশির কোষ লম্বা আকৃতির, স্নায়ুর কোষ অতিমাত্রায় দীর্ঘায়িত।

কোষ-তত্ত্ব

শ্লীডন (Schleiden, 1804-81) ও শ্‌ভান (Schwann, 1810-1882) 1839 সালে দেখান যে সারা দেহকেই কোষসমূহের একটা উপনিবেশ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, এই সমস্ত কোষের উদ্ভব হয়েছে একটিমাত্র—কিংবা দুটি মাত্র—কোষ থেকে : ডিম্বকোষ ও শুক্রকোষ। নিষিক্ত ডিম্বকোষ থেকে জীবের বিকাশ কার্যত কীভাবে সংঘটিত হয় তার প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করেন ফন বেয়ার (von Baer, 1792-1876)—প্রায় একই সময়ে। বলতে গেলে ভ্রূণতত্ত্ববিদ্যার জন্মই তাঁর হাতে। ভ্রূণতত্ত্ববিদ্যার চর্চা থেকে এক-একটি বড়ো বড়ো গোষ্ঠী বা

phylum-এর অন্তর্গত (যথা মেরুদণ্ডী) প্রাণীদের পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্কটিও প্রতিষ্ঠিত হলো। ব্যক্তির স্বতন্ত্র বিকাশ কীভাবে হয় তা বোঝা গেল কোষ-তত্ত্বের সাহায্যে, ঠিক যেমন প্রজাতির বিকাশ কীভাবে হয় তা বোঝা গেল প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্বের সাহায্যে। এই দুটি তত্ত্ব যেন বিবর্তনের পথেরই সমান্তরাল। জীববিদ্যার প্রতিটি ক্ষেত্রে অণুবীক্ষণের ব্যবহার হওয়ায় অপ্রত্যাশিত সব জটিলতার সন্ধান পাওয়া যেতে লাগল। গোড়ার দিকে অবশ্য কার্যক্ষেত্রে সেসব আবিষ্কারের বিশেষ কোনো প্রভাব পড়েনি। অবশেষে যখন প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে যা সরলতম সেই ছত্রাক নিয়ে, এবং সরলতর এক-কোষী প্রোটোজোআ ও ব্যাকটিরিয়া নিয়ে চর্চা শুরু হলো, তখনই কোষের জীবন ও ক্রিয়া সম্পর্কে কিছু কিছু বুঝতে পারা গেল। এবং তখনই দেখা দিল জীবিত জীবসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনা।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে বারেবারেই যা ঘটেছে এক্ষেত্রেও তাই ঘটল: জীববিদ্যার এই সাফল্য এল জীববিদ্যা-বহির্ভূত ক্ষেত্র থেকে—ফসলনাশক কীট ও শিল্প-রসায়নের চর্চা থেকে। সন্ধান (fermentation) ও পচন—এই দুটি প্রক্রিয়াকে মানুষ সভ্যতার উন্মেষকালের আগে থেকেই কাজে লাগিয়ে আসছে। যে-প্রক্রিয়ার পরিণাম হতো সুখকর, তাকে বলা হতো সন্ধান বা গাঁজানো; যার পরিণাম সুখকর নয়, তাকে বলা হতো পচন। সতর্কভাবে অনুশীলন ক'রে ও নির্দিষ্ট ধাপগুলি নিখুঁতভাবে অনুসরণ ক'রে মানুষ এইরকম কয়েকটি প্রক্রিয়ার ওপর তার নিয়ন্ত্রণও প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। সে-নিয়ন্ত্রণ ছিল সুনির্দিষ্ট এবং বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর উপযোগী। যেমন বীয়র চোলাই করা, পনীর বানানো, চামড়া পাকা করা ইত্যাদি। তবে, নিছক প্রকৌশলগত দিক থেকে উদ্ভূত যে-কোনো প্রক্রিয়াতেই যেমন হয়, এসব ক্ষেত্রেও ছকে-বাঁধা পদ্ধতির সামান্য কোনো পরিবর্তনও ছিল্ খুবই কষ্টসাধ্য এবং তার পরিণামও ছিল মারাত্মক। তাই উনিশ শতকের গোড়াতে এ-সব জিনিসের চাহিদা যখন প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল, তখন কেবল যে এগুলির ব্যবহারই বাড়ল তা নয়, পাশাপাশি ঘটতে লাগল একের পর এক বিপর্যয়।

পাস্তুর ও জীবাণুবিদ্যা

1855 সালে ফ্রান্সের উদীয়মান শিল্প-নগরী লিল-এ রসায়নের তরুণ অধ্যাপক লুই পাস্তুর প্রথম জীবন্ত খমিরের (ferment) ক্রিয়াকর্মের সংস্পর্শে আসেন। সচরাচর যে বীয়র বা ভিনিগার দিব্যি থাকত, মাঝে মাঝে কেন যে তা শুধু শুধুই নষ্ট হয়ে যেত তার কোনো রসায়নিক ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে, পাস্তুর তাঁর অণুবীক্ষণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন এগুলিকে। দেখলেন, গাঁজানোর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যখন চলে তখন ঈস্ট-এর গোল, ছোটো ছোটো কোষগুলি উপস্থিত থাকে। কিন্তু গাঁজানোর অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া যখন চলে তখন অন্য ধরনের জীবের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এর আগেই, অপ্রতিসম অণু উৎপাদনের ব্যাপারে জীবন্ত পদার্থের রসায়নিক ক্রিয়া সম্পর্কে পাস্তুর কাজ করেছিলেন। নানারকম ছাতা নিয়ে পরীক্ষা ক'রে তিনি এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে নিষ্প্রাণ রসায়নিক বিক্রিয়া নয়, জীবন্ত জীবেরাই গাঁজানোর প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী। রসায়নবিদ হিসেবে তিনি এইসব অণু-জীবদের কেবল বাইরের চেহারাই নয় তাদের রসায়নিক ক্রিয়াও অনুধাবন করেছিলেন। তারা বায়ুর ভিতরে বা বায়ু ছাড়া বাঁচতে পারে কিনা তা নিয়ে তদন্ত করেছিলেন। এবং তারই ফলে তিনি একাধিক চমকপ্রদ কিন্তু সুসাধ্য পদ্ধতির উদ্ভব ঘটান যাতে ক'রে বীয়র বা ভিনিগারের সুষ্ঠু উৎপাদনের পথে এই জীবাণুরা বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে। পাস্তুরায়নের অতিপরিচিত প্রক্রিয়াটি এর মধ্যে একটি।

গাঁজানোর প্রক্রিয়ায় জীবন্ত জীবেদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই পাস্তুর প্রাণের

স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভবের তত্ত্বকে একেবারে খারিজ ক'রে দেন। এই নিয়েই পুশে-র (Pouchet, 1800-72) সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত বিতর্কের সূত্রপাত। পাস্তুর দেখালেন, বায়ুর অন্তর্গত অদৃশ্য এই *microbes* বা অতিক্ষুদ্র জীবগুলিকে সরিয়ে দিতে পারলে, অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রাণী ও উদ্ভিদজাতীয় পদার্থের পচন রোধ ক'রে তাদের সুরক্ষিত রাখা যায়। এইভাবে পাস্তুর বিদ্বৎসমাজকে এমন একটি ব্যাপার মানতে বাধ্য করলেন যা পাচকপ্রবর আপেয়ার (Appert) 1810 সালেই কাজে লাগিয়েছিলেন। খাদ্যদ্রব্য ফুটিয়ে বন্ধ কাঁচের পাত্রে রেখে দিতেন আপেয়ার। তাঁর এই পদ্ধতি থেকেই পরে গড়ে ওঠে বৃহদাকার খাদ্য-আধারীকরণ (canning) শিল্প। আপেয়ার-পদ্ধতি সম্পর্কে আগে এই বক্তব্য রাখা হয়েছিল যে তাঁর ব্যবহৃত পাত্রগুলিতে অক্সিজেন (যা পচনের কারণ বলে চিহ্নিত হতো) থাকত না বলেই সেগুলি হতো পচন-নিরোধী। পাস্তুরকে প্রমাণ করতে হলো যে জীবাণুমুক্ত বায়ু একই মাত্রায় পচন-নিরোধী।

গাঁজানোর প্রক্রিয়ার জৈব দিকটা নিয়েই মূলত আগ্রহী হওয়ায় পাস্তুর ফন লীবিখ-এর মতের বিরোধী অবস্থানে চলে আসেন। ফন লীবিখ মনে করতেন, বিশেষ এক ধরনের রসায়নিক খমিরই গাঁজানোর জন্য দায়ী। পাস্তুরের সাফল্য এই মতকে চাপা দিয়ে দিল। অনেক দিন পর, 1897 সালে, বুখ্‌নার (Eduard Buchner, 1860-1917) যখন প্রায় ঘটনাচক্রেই অমন এক খমির আবিষ্কার ক'রে ফেলেন, তখন থেকেই শুরু হয় *উৎসেচক (enzyme)* নিয়ে চর্চা। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়, পাস্তুর আর ফন লীবিখ দুজনেই ছিলেন ঠিক। খমির (ferment) সন্ধান ঘটায় ঠিকই, কিন্তু জীবন্ত জীবের সাহায্য ছাড়া ঐ খমিরের পরিমাণকে বাড়িয়ে তোলা যায়না।

গুটিপোকার অসুখ ও রোগজীবাণুর তত্ত্ব

1865 সালে আরো কঠিন এক সমস্যা সমাধানের জন্য ডাক পড়ল পাস্তুরের। ফ্রান্সের নবীন শিল্পগুলি রেশমের যোগানের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করত; অথচ গুটিপোকাদের রহস্যময় এক অসুখে রেশমের যোগান তখন প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। এই সমস্যা সমাধানের ভার পড়ল পাস্তুরের ওপর। সে সময় প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ধারণা এতই কম ছিল যে গুটিপোকা জিনিসটা কী, তা-ই তিনি জানতেন না। তিনি এ-ও জানতেন না যে কদাকার শুঁয়োপোকাই পরিণত হয় অপরূপ প্রজাপতিতে। যাহোক, এক ঋতু-ব্যাপী গভীর গবেষণার পর তিনি দেখলেন, ঐ রোগের কারণ হচ্ছে এক ধরনের জীব যা শুঁয়োপোকার শরীরের ভিতরেই বাস করে ও বেড়ে ওঠে। এই সূত্র অবলম্বন ক'রে অতঃপর সে রোগ নির্মূল করা গেল।

তারপর থেকে পাস্তুর কেবলই ভাবতে লাগলেন, বড়ো বড়ো প্রাণী এবং মানুষের রোগও ঐ একই কারণে হয় কিনা, অর্থাৎ অতিক্ষুদ্র রোগজীবাণুই রোগের জন্য দায়ী কিনা। ভাবনাটা একেবারে নতুন নয়। বস্তুত, রোগ যত দিনের, এ ভাবনাও তত দিনের। সংক্রমণ ও মহামারীর ঘটনা তো তারই সাক্ষী। বহু আগেই জেনার (1749-1823) জলবসন্ত (small pox) রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকাদানের *(vaccination)* ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত কড়া *inoculation* ব্যবস্থায় খোদ জলবসন্ত দিয়েই টিকা দেওয়া হতো; কিন্তু জেনারের ব্যবস্থায় রোগের সক্রিয়-কিন্তু-মৃদু ভাইরাসের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। তবে এই রোগজীবাণুগুলিকে কখনোই চিহ্নিত করা যায় নি। আর সে যুগের চিকিৎসকরা এদের অস্তিত্বকেই উড়িয়ে দিতেন, যেহেতু অ্যারিস্টটল বা হিপক্রেটিস এর মতবাদের সঙ্গে এগুলি মোটেই খাপ খেতো না। অথচ অনেককাল আগেই লেভনহুক তাঁর সরল কিন্তু আসামান্য অণুবীক্ষণগুলির সাহায্যে এদের দেখতে পেয়েছিলেন। তবে এই ক্ষুদ্র জীবগুলির সঙ্গে মানুষ ও প্রাণীর অসুখের যে কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা তাঁর মনে হয় নি।

দুশো বছর ধরে উভয়দিক থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ জমতে থাকায় রোগের ব্যাপারে ব্যাকটিরিয়ার ভূমিকা আবিষ্কারের সময় হয়েই গিয়েছিল। এই রকম ক্ষেত্রে যা হয়, পাস্তুরই প্রথম বা একাই যে এ-আবিষ্কার করলেন তা নয়। জার্মানির এক গ্রামের ডাক্তার কখ্ (Koch, 1843-1910) অ্যান্থ্রাক্স ব্যাসিলাসের বংশবৃদ্ধি সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে জিলেটিন-এর উপর জীবাণুর বৃদ্ধি ঘটানোর পদ্ধতি বার করেন। এর সাহায্যে জীবাণুর বিশেষ বিশুদ্ধ প্রজন (strains) সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। পরে এই পদ্ধতির সাহায্যেই তিনি যক্ষ্মা ও কলেরার জীবাণু স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করেন। স্কটল্যাণ্ডে লিস্টার (1827-1912) বার করলেন বীজদূষণ-রোধের (anti-sepsis) এক সুসাধ্য কৌশল, যার ফলে হাসপাতালের বীভৎস মৃত্যু-হার কমতে আরম্ভ করল। তবে একথা ঠিক যে জীবাণুদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে পাস্তুরই ছিলেন সেনাপতি।

রোগ সম্পর্কে এই সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুখে দাঁড়ালেন চিকিৎসকরা। প্রায় সমস্ত চিকিৎসকই ছিলেন এর বিরুদ্ধে। এই প্রচণ্ড বিরোধিতাকে নিরস্ত করার কাজে উঠে পড়ে লাগলেন পাস্তুর। শীতল বৈজ্ঞানিক যুক্তি অপেক্ষা মানবজাতির মঙ্গলের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং তাঁর অতুলনীয় মর্যাদা ও মনোবলই এ কাজে তাঁকে সাফল্য এনে দিল। রসায়নবিদ হিসেবে তাঁর যত প্রসিদ্ধি, শিল্পক্ষেত্রের উপদেষ্টা হিসেবে ও গুটিপোকার রোগবিজেতা হিসেবে তাঁর যত খ্যাতি, সব জড়ো ক'রে, সেই বিশাল মর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে, তবে তিনি হাসপাতালগুলোর কর্তৃপক্ষের জেদ ভাঙতে পারলেন। অবশেষে বীজদূষণ-রোধের সেইসব ব্যবস্থা অবলম্বিত হলো যেগুলি আজকের দিনে একেবারেই প্রাথমিক বলে গণ্য হয়। তাঁর রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার (immunization) সুফল একবার হাতেকলমে প্রমাণ করে দেবার পর অবশ্য ব্যাপক গণ-উৎসাহের চাপে এমনকি চিকিৎসকরাও তাঁর ধারণা সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

এই যে বিপ্লব এনে দিলেন পাস্তুর, কার্যত এটাই ছিল বিজ্ঞাননির্ভর চিকিৎসাশাস্ত্রের বনেদ। পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলিতে, শরীর সম্পর্কে এবং সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় শরীরের আচরণ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা গিয়েছিল। তবু তা ছিল আধা-বিজ্ঞান। কিছু ভবিষ্যদ্বাণী, কিছু উপসর্গের উপশম-এর মধ্যেই তার ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। কার্যকর রোগ-প্রতিরোধের দ্বারা, কিংবা রোগ সারিয়ে রোগ নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অকাট্য প্রমাণ তার করায়ত্ত ছিল না। রোগীকে আলাদা করে রাখা, কিংবা টিকা দেওয়া—এই রকম দু একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা; অথবা পারদ ব্যবহার ক'রে সিফিলিস কিংবা কুইনিন ব্যবহার ক'রে ম্যালেরিয়া সারানোর মতো দু একটি চিকিৎসা অবশ্য চালু ছিল। তবে এগুলি ছিল হঠাৎ-আবিষ্কারের বা উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত টোটকার বুদ্ধিমান প্রয়োগ বই আর কিছু নয়। পিছনে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব না থাকায় এগুলির সাধারণীকরণ ঘটিয়ে তার সাহায্যে অন্য রোগ সারানো তখন সম্ভব হয়নি। প্রবল সংক্রামক রোগ হলে প্রকৃত অর্থে কী ঘটে রোগজীবাণু-তত্ত্ব ব্যাতিরেকে তা কিছুতেই বোঝা সম্ভব ছিল না। বাধ্য হয়ে চিকিৎসকরা রোগের নিজস্ব গতির ওপর হাল ছেড়ে দিতেন, এমনকি অজান্তে রোগ ছড়ানোতেও সাহায্য করতেন।

মহামারী-প্রতিরোধ ও জীবাণুবিদ্যা

রোগজীবাণুর তত্ত্ব একবার পরিষ্কার ক'রে বুঝে নেওয়ার পর এবং প্রয়োজনীয় প্রয়োগকৌশল ভালো ক'রে রপ্ত ক'রে নেবার পর, বহু নিষ্ঠাবান ব্যক্তির পক্ষে কার্যক্ষেত্রে ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব হলো। দায়ী জীবাণুটিকে চিহ্নিত ক'রে অনেক সময়েই তাঁরা রোগ-প্রতিরোধের বা রোগ সারাবার সিরাম তৈরি করতে সক্ষম হলেন। যেসব ক্ষেত্রে কোনো সিরাম তৈরি করা সম্ভব হলো না, সেসব ক্ষেত্রেও মহামারী থামানোর জন্য কী কী সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে তা জানানো সম্ভব হলো। উন্নত *স্বাস্থ্যবিধান* (sanitation)-ব্যবস্থার

কল্যাণে টাইফয়েড প্রমুখ জলবাহিত রোগ ইউরোপ থেকে দূর হতে লাগল, শিশুহন্তা ডিপথিরিয়া রোগের প্রকোপও কমতে লাগল। ক্রমে ক্রমে কলেরা, ম্যালেরিয়া, প্লেগ প্রভৃতি মারাত্মক রোগও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে এল। এগুলো টিকে রইল কেবল সেইসব জায়গাতেই যেখানে দারিদ্র্য-হেতু নতুন ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ করা গেল না।

বিজ্ঞানের বিকাশে পাস্তুর ও তাঁর শিষ্যবর্গের, এবং জীবাণুবিদ্যা নিয়ে চর্চারত অন্যান্য বিজ্ঞানীগোষ্ঠীর কাজের গুরুত্ব কেবল তাৎক্ষণিক চিকিৎসাগত উন্নতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না—যদিও সভ্যতার ইতিহাসে সে উন্নতির গুরুত্ব খুবই বেশি। তাঁর প্রথম দিককার কাজের দ্বারা পাস্তুর আগেই দেখিয়েছিলেন যে এমনকি সরলতম প্রাণীরাও নতুন ক'রে সৃষ্ট হয় না, পৃথিবীতে নতুন জীব এখন আর সৃষ্ট হয় না। অতিক্ষুদ্র এই জীবাণুগুলি যে প্রাণবিশিষ্ট সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন তাদের নড়াচড়া ও প্রজনন দেখে। কিন্তু এটাও তাঁর মনে হয়েছিল যে উন্নততর জীবেদের থেকে এদের জীবন খুবই অন্যরকম। সে-জীবন মূলগতভাবে রসায়নিক—যান্ত্রিক নয়। অস্থিময় স্থাপত্যের বদলে আণবিক স্থাপত্যের ওপরেই তা নির্ভরশীল। অর্থাৎ, বিশ শতকের প্রাণরসায়নিক বিপ্লবের অন্যতম পূর্বসূরী ছিলেন পাস্তুর।

ক্লোদ বের্নার : শারীরতত্ত্বীয় রসায়ন

এর আরেক পূর্বসূরী ছিলেন ক্লোদ বের্নার (Claude Bernard, 1813-78)—তিনিও ফরাসি। জীবন্ত মানুষ ও প্রাণীর শারীরতত্ত্ব নিয়ে চর্চা করে বের্নার দেখান যে শরীরের ভিতরকার গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকর্মগুলি সংঘটিত হয় রসায়নিক বিক্রিয়াসমূহের এক জটিল ভারসাম্যের মাধ্যমে। এইসব রসায়নিক বিক্রিয়ার অনেকগুলি তিনি আবিষ্কার করেন। তিনি দেখান যে এই ভারসাম্য রক্ষা করাটা হচ্ছে জীবনের অস্তিত্বেরই এক অপরিহার্য শর্ত। জীব যত বেশি উন্নত হয় ততই সে প্রয়াসী হয় শরীরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে অপরিবর্তিত ও বাইরের পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে। সেইজন্যই সরলতর জীবেরা ঠাণ্ডায় জমে নিশ্চল হয়ে যায়, বা রন্ধন প্রক্রিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু উন্নততর জীবেরা পরিস্থিতি অনুযায়ী সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াটি কী তা নিয়ে প্রায় দু হাজার বছর আগে গ্যালেন কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তারপর ব্যাপারটা থেমে যায়। উনিশ শতকে ফের এ নিয়ে চর্চা শুরু হলো। পেশিতে সংবাদ পাঠানো, এবং বহিরিন্দ্রিয় থেকে পাঠানো সংবাদ গ্রহণ করা—স্নায়ুর এই দ্বিমুখী ক্রিয়ার ব্যাপারটুকু বুঝতে পারা গেল বেল (1774-1842) ও মাঁঝ'দি (1785-1855)-র দৌলতে। তাদের সংযোগসূত্রগুলিও স্নায়ুতন্ত্রের প্রকাণ্ড জটিলতার মধ্যে থেকে খুঁজে বার করা গেল। এই প্রথম খানিকটা আলো এসে পড়ল দেহের সবচেয়ে জটিল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী অঙ্গের ক্রিয়ার ওপর—যার নাম মস্তিষ্ক। সেই উনিশ শতকেও বস্তুবাদী জীববিজ্ঞানীরা বিশুদ্ধ মানসিক ব্যাপারসমূহের অন্যনিরপেক্ষ (absolute) চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। সরলতম প্রাণীদের দেহগঠনও যে দার্শনিকদের সুদূরতম কল্পনার চেয়ে অনন্ত গুণে জটিল, সে ব্যাপারটা শারীরতত্ত্বের কল্যাণে আস্তে আস্তে বোঝা যাচ্ছিল।

বিজ্ঞাননির্ভর কৃষি

জীববৈজ্ঞানিক অথবা যন্ত্রগত দিক অপেক্ষা রসায়নিক দিক থেকেই বিজ্ঞান ও কৃষির মধ্যে যোগাযোগটা হয়েছিল সবচেয়ে ফলপ্রসূ। রসায়নে গ্যাস-বলবিজ্ঞানে যে বিপ্লব ঘটে, যার শুরুতে আছেন প্রিস্ট্‌লী এবং যার চূড়ান্ত রূপ দেন লাভোয়াসিএ, তার ফলে ধারণা জন্মায় যে প্রাণীদেহ যেন এক ধরনের তাপীয় এনজিন, যাতে জ্বালানির বদলে পোড়ানো হয় খাদ্য;

অন্যদিকে উদ্ভিদ হচ্ছে বিপরীতধর্মী—পরিত্যক্ত গ্যাস থেকে সূর্যালোকের সাহায্যে তা জীবন্ত কলা তৈরি করে নেয় এবং অক্সিজেনকে ফিরিয়ে দেয় বায়ুমণ্ডলে। মলেশ্‌কট (Moleschott, 1822-93)-এর* বিখ্যাত উক্তি অনুযায়ী 'আলোক বাতাস বুনে তৈরি করেছে প্রাণ।' কিন্তু যতক্ষণ না মৃত্তিকার ভূমিকা সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ এসব জ্ঞানের কোনো ব্যবহারিক সুবিধা ছিল না। হাতেকলমে যাঁরা চাষ করতেন বা উদ্যান পালন করতেন তাঁরা জানতেন যে মাটিই উদ্ভিদকে খাওয়ায়, কিন্তু 1790 থেকে 1840 পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন নি ঠিক কীভাবে মাটি এ কাজ করে। দুশো বছরেরও আগে ভান হেল্‌মন্ট (Van Helmont, 1577-1644) দেখিয়েছিলেন, স্রেফ জলের মধ্যেই উইলো গাছ বেড়ে উঠতে পারে। তখনকার চিন্তাধারা অনুযায়ী এটা ধরে নেওয়া ছিল খুবই যুক্তিসঙ্গত যে জল-মৌলটি মাটি-মৌলে বা কাঠ-মৌলে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু 1790-এর পরে এ-সব কথা নেহাৎ আল্‌কেমীয় আবোলতাবোল বলে প্রমাণিত হয়। অথচ এর জায়গার নতুন কোনো ব্যাখ্যাও দেওয়া গেল না—যতদিন না ফন লীবিখের বিখ্যাত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল বেরোল। ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের অনুরোধে ফন লীবিখ *Chemistry and its Applications to Agriculture and Physiology* (1846) নামে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। তাতে তিনি জীবন্ত কলাসমূহকে এবং তারই খেই করে যাবতীয় খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করেন, যা আজ সর্বজনবিদিত—শর্করা, স্নেহ ও অ্যাল্‌বুমিনয়েড (প্রোটীন)। তিনি দেখান যে এর মধ্যে প্রথম দুটি হচ্ছে মূলত জ্বালানি, যা বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাহায্য নিয়ে উদ্ভিদের মধ্যে তৈরি হয়। তৃতীয়টির মধ্যেই কেবল নাইট্রোজেন থাকে, এবং এটি তৈরি হয় মাটি থেকে নাইট্রেট ও কয়েকটি অপরিহার্য মৌল (যথা ফসফরাস ও পটাসিয়াম) টেনে নিয়ে; প্রাণীশরীরের বর্জিত পদার্থরূপে এগুলি আবার ফিরে আসে মাটিতে—এইভাবেই চলে প্রকৃতির এই বিশেষ মহাচক্রটি।

মাটির রসায়নিক ভূমিকা সম্বন্ধে এই বিস্তৃত জ্ঞানলাভের ফলে এবার ক্ষেতে পশুমল-সারের ক্রিয়া সম্বন্ধে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হলো। এবং সেই সঙ্গে তার বদলে অন্য সার ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখা দিল। সার জন লঅস্ (Sir John Lawes, 1814-1900) নামে এক বিজ্ঞান-মনস্ক ভদ্রলোক তাঁর রথ্যাম্‌স্টেড-এর জমিদারীটিকে পরিণত করেন প্রথম কৃষি-গবেষণাগারে। খামারে পশুমল-সারের বদলে তিনি বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত নাইট্রেট, ফসফেট ও পটাশ নিয়ে পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। এগুলো তৈরির জন্য তিনি কারখানা পর্যন্ত বানালেন। এর ভিত্তিতে এবং বিভিন্ন দেশে অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে, গড়ে ওঠে বৃহদাকার সারশিল্প।

খাদ্য-শিল্প: শীতলীকরণ

যাজক ম্যাল্‌থস লিখেছিলেন, 'অসম্ভব ভবিষ্যৎ-কল্পনার চরম নিদর্শন দেখিয়ে কেউ কেউ বলেছেন (অবশ্য যতটা ঠাট্টা করে, ততটা সত্যি সত্যি নয়) যে ইউরোপের খাদ্যশস্য আমেরিকাতে চাষ করা উচিত; ইউরোপের উচিত কেবল শিল্প উৎপাদন আর বাণিজ্যে নিরত থাকা; কেননা বিশ্বে শ্রম-বিভাজনের সেটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।' ম্যাল্‌থসের এই 'ঠাট্টা' বাস্তবে সত্য

* জেকব মলেশ্‌কট ছিলেন এক স্বাধীনচেতা জার্মান শারীরতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক। জার্মানি থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি প্রথমে জুরিখ ও পরে রোমে চলে যান। রোমে খাদ্য (diet) নিয়ে তাঁর গবেষণা বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করে। রোমেই তাঁর মৃত্যু হয়। —অনু·

হয়ে উঠেছিল। তবে তার আগে দূরে দূরান্তরে দাস, দণ্ডিত অপরাধী কিংবা ক্ষুধিত দেশত্যাগী রূপে প্রচুর মানুষ পাঠানো প্রয়োজন ছিল। এদের দ্বারা উৎপন্ন খাদ্য যাতে ভোজ্য অবস্থায় ইউরোপে নিয়ে আসা যায় তার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করারও প্রয়োজন ছিল। শুকনো ক'রে, নুনে জরিয়ে, ফুটিয়ে, ঠাণ্ডায় জমিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ করার পদ্ধতি প্রস্তরযুগ থেকেই মানুষের জানা ছিল। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে হলে ঐ পদ্ধতিগুলিকে আরো যুক্তিশাসিত ও বিজ্ঞানের দ্বারা শোধিত ক'রে নেওয়াটা ছিল অপরিহার্য।

একদিকে পাস্তুরের জীবনব্যাপী কর্ম দেখিয়ে দিয়েছিল যে রোগজীবাণুকে দূর করতেই হবে; অন্যদিকে নবীন তাপগতিবিদ্যা (thermodynamics) দেখিয়ে দিয়েছিল কীভাবে তাপীয়-এনজিনকে উল্টোমুখে চালিয়ে কৃত্রিম শৈত্য উৎপন্ন করা যায়। খাদ্য আধারীকরণ (canning) ও শীতলীকরণ—এই দুইয়ে মিলে এ-ব্যাপারটা নিশ্চিত করে তুলল যে খাবার কেনবার টাকা যদি থাকে, তাহলে যে-কোনো জায়গাতেই খাবার পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। এর ফলে সারা বিশ্বের যেখানেই গোমাংস ভক্ষণের প্রচলন আছে সেখানেই খাদ্য-আধারীকরণ ও হিমায়নে নিযুক্ত কম্প্যানিগুলোর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। এই প্রক্রিয়াটির একটা দিকেব রোম্যান্টিক পরিচয় পাওয়া যায় কাউবয় আর গাউচো কাহিনীতে; অন্য দিকটির পরিচয় পাওয়া যায় শিকাগো আর সিন্‌সিনাটির খোঁয়াড়গুলোতে—যেখানে প্রথম যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পশু জবাই শুরু হয় এবং তারই আদলে পরে বিংশ শতাব্দীতে ছাঁচে-ঢালা ব্যাপক উৎপাদন পদ্ধতির assembly line-প্রথার সূত্রপাত হয়।

ফলিত জীববিজ্ঞান: চিকিৎসাবিদ্যা ও কৃষি

উনিশ শতকের শেষের দিকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন প্রমুখ দুই অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বিজ্ঞানের পাশাপাশি জীববিজ্ঞানও ঠাঁই করে নিল। তবে জাদুবিশ্বাস বা পৌরাণিক বিশ্বাসের কিছু কিছু পুরোনো গন্ধ তার গায়ে তখনো লেগে রইল। তাছাড়া, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন নিজ নিজ বিষয়ের ওপর ইতিমধ্যেই যে ব্যুৎপত্তি ও নিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত করে ফেলেছিল, তার কিছুই তখনো জীববিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু জীববিজ্ঞানের ব্যবহারিক উপযোগিতার প্রমাণ এরই মধ্যে পাওয়া যাচ্ছিল। বস্তুত, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে বিরাট অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছিল তা সম্ভবই হতো না ফলিত জীববিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া।

সত্যি কথা বলতে, 'এমন কাজের ভার মানবজাতি কখনো নিজের কাঁধে চাপায় না, যার সমাধান তার সাধ্যের বাইরে'—এই মার্ক্সীয় বচনের সত্যতার এক অতি চমৎকার নিদর্শন ঐ ঘটনা।

উনিশ শতকের শিল্প-নগরীগুলিতে যে বিপুলসংখ্যক মানুষ ভিড় করতে থাকে, উন্নততর স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা ছাড়া তাদের পক্ষে বসবাস করাই সম্ভব হতো না। অসুখের জীবাণুতত্ত্বের গুরুত্ব ক্রমশ বুঝতে পারার ফলেই ঐ সব নতুন ব্যবস্থা চালু হয়। শুধু তাই নয়, উদ্ভিদের পুষ্টি-সম্পর্কিত নবলব্ধ রসায়নিক জ্ঞানের প্রয়োগ ছাড়া এই বিপুল জনসমষ্টির খাদ্যসংস্থান করাও সম্ভব হতো না। জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পিছনে প্রধান কারণ ছিল নাইট্রোজেন-ঘটিত ও ফসফেট সারের ব্যবহার। কর্ষণযোগ্য জমির অভাবিতপূর্ব প্রসারণের পিছনেও ওটিই ছিল প্রধান কারণ। এবং প্রাচ্য থেকে আহরিত রবার বা তেল প্রমুখ পণ্য, যা ছিল শিল্পের বিকাশের পক্ষে নিতান্তই অপরিহার্য, তা যথোপযুক্ত পরিমাণে পাওয়ার পিছনেও চিকিৎসাবিদ্যার অবদান ছিল; কারণ মারাত্মক প্রাচ্যদেশীয় রোগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ওগুলি পাওয়া সম্ভব হতো না।

6. পর্যালোচনা

আঠারো ও উনিশ শতকে বিজ্ঞানের মূল কয়েকটি ধারার বিকাশ কীভাবে ঘটেছে তার একটা রূপরেখা আমরা পেলাম। এই সময়কালের মধ্যেই পুঁজিতন্ত্র সাবালক হয়ে উঠেছে, উচ্ছ্বসিতভাবে বেড়ে উঠেছে; আবার এই পর্বেই তার অবক্ষয়ের প্রথম লক্ষণগুলো চোখে পড়ে। বিজ্ঞানও এই পর্বে বিকাশ লাভ করে দ্রুতবেগে, প্রায় একটানা। তবে অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতির তুলনায় বিজ্ঞানের বিকাশ অনেক দ্রুতহারে হয়েছিল। কারণ ঐ সময়কালের শুরুতে বিজ্ঞানের ভূমিকা যা ছিল, অন্তে ছিল তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আঠারো শতকের গোড়ায় বাষ্পীয় এনজিনের মধ্যে দিয়ে শিল্পের চালিকাশক্তির যোগান দিয়েছিল বিজ্ঞান। শিল্প তখনো প্রধানত প্রথাসম্মত করণকৌশলের ওপরেই নির্ভরশীল, বিজ্ঞান অপেক্ষা অভিনবত্বের ওপরেই তার ভরসা ছিল বেশি। আর উনিশ শতকের শেষের দিকে গুরুত্বপূর্ণ এমন সব নতুন শিল্প গড়ে উঠল যা পুরোপুরি বিজ্ঞাননির্ভর। শুধু তাই নয়, পুরোনো কৌশল-নির্ভর শিল্পেও, এমনকি খোদ কৃষিতেও, বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটল। গোড়াতে শিল্পকে বিজ্ঞানের যত না দেবার ছিল, তার চেয়ে শিল্পের কাছ থেকে শেখবার ছিল বেশি; আর শেষে শিল্পের অস্তিত্বই ওতপ্রোত হয়ে উঠল বিজ্ঞানের সঙ্গে। শিল্পের প্রযুক্তিগত রূপান্তর এনে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান পুঁজিতন্ত্রের বিকাশকে প্রভাবিত করছিল। অবাধ প্রতিযোগিতামূলক, ব্যক্তিনির্ভর, ছোটো মাপের শিল্পকে সচেতনভাবে-পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে চালিত প্রকাণ্ড একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে সাহায্য করল বিজ্ঞান।

ষোলো ও সতেরো শতকের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সঙ্গে আঠারো ও উনিশ শতকের শিল্পবিপ্লবের তুলনা করলে বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক জীবনের পরস্পর-সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাবে। ষোলো-সতেরো শতকে খুব সীমিত কয়েকটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল বা পাওয়া গিয়েছিল। তা মোটামুটি সীমাবদ্ধ ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নৌ-চালনার ক্ষেত্রেই। আঠারো-উনিশ শতকে কিন্তু বিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হয় গোটা শিল্পক্ষেত্র জুড়ে : যন্ত্রকৌশল, পাওয়ার, পরিবহন, রসায়নিক পদার্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র। তাই দেখা যায়, ষোলো-সতেরো শতকে বিজ্ঞান মূলত ব্যাপৃত ছিল প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের যন্ত্রপাতি নিয়ে (যথা দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, তাপমানযন্ত্র, চাপমানযন্ত্র) এবং সেই সমস্ত গাণিতিক পদ্ধতি নিয়ে, যেগুলি ছাড়া ঐসব যন্ত্র তৈরি করা যায় না, বা সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা যায় না। শিল্পবিপ্লবের কালেও যন্ত্রপাতির বিকাশ ও বিস্তৃতি অব্যাহত থাকে, কিন্তু তখন তা হয়ে ওঠে বিজ্ঞানের কার্যকর উৎপাদনসমূহের একটা অংশমাত্র। বাষ্পীয় এনজিন, টার্বাইন, ডাইনামো, বৈদ্যুতিক মোটর, রসায়নিক কারখানা— এসব কেবল প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য তৈরি হয় নি, তৈরি হয়েছিল প্রকৃতিকে বদলে দেবার জন্য। এগুলোই ছিল আঠারো-উনিশ শতকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক উৎপাদন।

উল্লিখিত দুই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান বস্তুতপক্ষে উত্তীর্ণ হয়েছিল নিষ্ক্রিয় থেকে সক্রিয় ভূমিকায়। আগে তার ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল প্রকৃতির অনুসন্ধানে; এবার তা 'সম্ভাব্য সকল কিছুকে প্রভাবিত' করতে প্রয়াসী হলো। করণকৌশলের দিক থেকে যন্ত্রাদির বিকাশ, এবং অর্থনীতির দিক থেকে পুঁজির ক্রমবর্ধমান প্রাপ্যতা—এই দুটি ঘটনা ঐ উত্তরণকে সম্ভব করে তুলেছিল। শ্রমিক ও বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রয়াসেই ঘটে যন্ত্রাদির বিকাশ। আর উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায় যে পুঁজি পাওয়া যেতে লাগল তার কারণ, ইতিপূর্বে-বিনিয়োজিত পুঁজির মুনাফা তখন জমে উঠছিল। করণকৌশলগত ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পিছনে নির্ভেজাল পুঁজিতান্ত্রিক

পদ্ধতিতে অর্থ লগ্নী করার ফলেই দেখা দিয়েছিল শেষ-আঠারো ও মধ্য-উনিশ শতকের বিপুল কর্মোচ্ছ্বাস।

শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজতন্ত্র

পুঁজিপতিরা মুনাফা বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে সদা উৎসুক হলেও সাধারণের প্রয়োজনে—যথা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য—বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে বিশেষ আগ্রহী বা তৎপর ছিল না। এবং যে পুঁজিতন্ত্র তাদের সম্পদের উৎস, সেই ব্যবস্থাকে খতিয়ে দেখার, এবং সম্ভব হলে বদলে নেওয়ার কাজে বিজ্ঞানকে ব্যবহৃত হতে দিতে তাদের ছিল ঘোর অনীহা। তবে তারা না করলেও, সে কাজ করবার অন্য লোক ছিল। বিজ্ঞানকে মুনাফা যোগানোর কাজে লাগাতে গিয়ে পুঁজিপতিরাই বৃহদাকার, সামাজিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার পথ দেখিয়ে দিয়েছিল—যে প্রক্রিয়া হয়তো একদিন মুনাফার তাড়নাকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে। পাশাপাশি তারা শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল, যার কাছে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থ হলো খাটুনী, নিরাপত্তাহীনতা আর অনটন।

আলোচ্য পর্বের শুরুতে উদীয়মান, নবীন পুঁজিতন্ত্র সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার অন্তিম অবশেষটুকু মুছে ফেলছিল, এগিয়ে চলছিল প্রগতিশীল সম্প্রসারণের পথে। আর পর্বের শেষে, বিপুলভাবে বিকশিত পুঁজিতন্ত্র দুনিয়া জুড়ে তার আধিপত্য যেমন বিস্তার করে ফেলেছিল, তেমনি নবজাগ্রত শ্রমিকশ্রেণীর মোকাবিলায় তা হয়ে উঠেছিল রক্ষণাত্মক। নতুন এবং অপেক্ষাকৃত সুসংহত সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার স্তরে উত্তীর্ণ হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন শ্রমিকশ্রেণী। বিজ্ঞানের সুফলকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর ক্ষমতা তার ছিল।

সুতরাং, আঠারো-উনিশ শতকে জীবন ও চিন্তাভাবনার ওপর বিজ্ঞানের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এই উত্তরণের রূপরেখাটি মনে রাখতে হবে। প্রথমে তা এনে দিয়েছিল মুক্তি। তখন তা যাবতীয় প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। পরে তার ভূমিকা হয়ে দাঁড়াল দ্ব্যর্থব্যঞ্জক, অনিশ্চিত। প্রগতি তখন আর অবধারিত বলে মনে হচ্ছিল না, মনের দিগন্তে যুদ্ধ ও সমাজ-বিপ্লব উঁকি মারছিল। এই উত্তরণের পথে বিভাজনরেখাটি টানা যায় ফরাসি বিপ্লব ও তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার সময় থেকে। প্রথম দিকে তারা যতই পোষকতা করুক, ফ্রান্সের 'পুরানা জমানা' এবং ব্রিটেনের চার্চ ও রাজার দলের পক্ষে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে উপায় ছিল না, যেহেতু ভূসম্পত্তিই ছিল তাদের সামাজিক ভিত্তি। কাজেই শেষ-আঠারো শতকে উঠতি শিল্প, রাজনৈতিক সংস্কারকার্য ও উদারপন্থী ধর্মতন্ত্রের সঙ্গেই বিজ্ঞানের অগ্রগতির গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেল, কারণ তখন প্রয়োজন ছিল আশাবাদী ও প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির।

1815-এর পরে কিন্তু পরিস্থিতিটা আর এত সরল রইল না। বিজ্ঞান নিজেই গভীরভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ল আপসপন্থী ও উদারপন্থী দলে। যার অন্যতম উদাহরণ হলো, ভূবিদ্যার ইতিহাস-সংক্রান্ত কিংবা বিবর্তন-সংক্রান্ত বিতর্ক। বিজ্ঞানের পুরোনো ঐতিহ্য ও তার আবিষ্কারগুলির ব্যবহারিক সুফলের দরুন বিজ্ঞান পুঁজিতন্ত্রের উনিশ-শতকী বিপুল সম্প্রসারণেরই অঙ্গীভূত হতে চাইল, কিন্তু সে-চাওয়া আর আগের মতো আন্তরিক ও সোল্লাস ছিল না। শিল্পাঞ্চলগুলির শ্বাসরোধকারী কুৎসিত পরিবেশ তখন স্পষ্টভাবেই বিজ্ঞানের প্রয়োগের পরিণাম হিসাবে গণ্য হচ্ছিল। তার সঙ্গে ছিল জনতা—সর্বহারাশ্রেণী—সম্পর্কে সচেতনতা। সে-সচেতনতা কখনো বৈরিতামূলক, কখনো বা বিবেকদংশনকারী। কমিউনিজম্, যার সক্রিয় পরিচয় তখনো কিছুই পাওয়া যায়নি, তার ভূত তারা করে বেড়াতে লাগল—কী মননগত, কী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। 1870-এর পর সোল্লাস মনোভাবের অনেকটাই গেল উবে; বদলে দেখা দিল 'শেষের সেদিন ভয়ংকর'-জাতীয় চিন্তা।

চিন্তাজগতে বিজ্ঞান

এই যুগের প্রধান প্রধান ভাবধারার ওপর বিজ্ঞানের সরাসরি প্রভাবের গুরুত্ব শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে প্রযুক্ত পরোক্ষ প্রভাবের চেয়ে অনেক কম হলেও একেবারে নগণ্য নয়। আঠারো-উনিশ শতকে ভৌত বিজ্ঞান চিন্তাজগতে যে বিপ্লব ঘটায় তা ষোলো-সতেরো শতকের বিপ্লবের মতো চরম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এমনও বলা যেতে পারে যে প্রকৃত অর্থে কোনো বিপ্লব ঘটে নি; যা ঘটেছিল তা হচ্ছে পূর্বতন বিপ্লবের ফসলগুলির অতি দ্রুত সম্প্রসারণ। পূর্বতন বিপ্লবের সুসংহত রূপ নিউটনীয় সংশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। সেই সুসংহত রূপ এবার ছড়িয়ে পড়ল—প্রথমে বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে (যথা তাপ, তড়িৎ ও রসায়নে), এবং তারপর অর্থনীতি ও রাজনীতিতে। তবে এই ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটাই ছিল এক অর্থে আমূল পরিবর্তনসূচক। কার্যক্ষেত্রে, এরই কল্যাণে বিজ্ঞান প্রথম ফলপ্রদ হয়ে ওঠে শিল্পে, এরই কল্যাণে বস্তুর রূপান্তরণকে সচেতনভাবে পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো গেল (যা ইতিপূর্বে ছিল প্রথানুসারী)। ভৌত বিজ্ঞান ভাবনাচিন্তার জগতে পুরোনো কালের সঙ্গে তেমন মৌলিক কোনো বিচ্ছেদ না ঘটালেও, নতুন নতুন ক্ষেত্রে তা ছড়িয়ে পড়ার ফলে প্রকৃতির নানা অভাবিতপূর্ব দিক সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়, যেমন চৌম্বকশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বা রসায়নিক বিক্রিয়ার চরিত্র। এবং এরই ফলে কয়েকটি অসামান্য সাধারণীকরণ সম্ভব হয়ে ওঠে, যথা ভর ও শক্তির নিত্যতা-তত্ত্ব বা আলোকের তড়িৎচুম্বক তত্ত্ব।

বিবর্তনতত্ত্বের সামাজিক ভূমিকা

সত্যিকারের আমূল পরিবর্তনসূচক প্রবর্তনগুলি আসে বিজ্ঞানের বর্ণনাত্মক শাখাসমূহ থেকে। এর চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায় ডারউইনের তত্ত্বে—প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের ধারণায়। বহু বছর ধরে ভূবিদ্যায় ও জীববিজ্ঞানে যেসব পর্যবেক্ষণ জমা হচ্ছিল তারই অপ্রতিরোধ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রূপে আসে ডারউইনের অবদান। পাদ্রীদের ও ভূসম্পত্তি-মালিকদের বাধা না থাকলে অনেক আগেই এ-তত্ত্ব স্বীকৃত হয়ে যেত। এঁরা মনে মনে ঠিকই বুঝেছিলেন যে একবার এ-তত্ত্ব স্বীকার করে নিলে বিশ্বের ঐশ্বরিক সৃজন-তত্ত্বের আর কোনোরকম যৌক্তিকতাই থাকবে না। মহাবিশ্বের যে নতুন ছবি এঁকে দিয়েছিলেন নিউটন তাতে পূর্ব-পরিকল্পনার (design) প্রতি বিশ্বাস নতুন করে স্থাপিত হয়েছিল—যে বিশ্বাস প্রচণ্ডভাবে নাড়া খেয়েছিল গ্যালিলিও ও কোপার্নিকাসের হাতে। ডারউইন আঘাত হানলেন একেবারে ঘরের কাছে—মানুষের এই পৃথিবীতে। প্রবর্তক হিসেবে ডারউইনকে সংগতভাবেই তুলনা করা হয় কোপার্নিকাসের সঙ্গে। প্রাচীন প্রাচ্যের জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে আহরিত বিশ্বছবিটি ভেঙে-যাওয়ার আঘাত ধর্মজগৎ সামলে নিয়েছিল, বলতে গেলে সে-আঘাতের কথা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু বাইবেলের 'Genesis'এ বর্ণিত সৃজন-তত্ত্বটি তখনো পর্যন্ত ছিল অটুট। বিশেষ ক'রে ঈশ্বর যে নিজের আদলেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এই ভাবনায় তখনো কোনো দাগ পড়েনি। ডারউইনের আবির্ভাবের পরে বাইবেলের সৃষ্টি-তত্ত্বের আক্ষরিক ইতিহাস-মূল্য আর কিছুই রইল না। মুখ বাঁচাবার মতো সূত্র আবিষ্কার হতে হতে বেশ কিছু সময় কেটে গেল। অবশেষে বলা হলো, ধর্মীয় সত্যের ক্ষেত্রটাই আলাদা, তুচ্ছ পার্থিব তথ্যের সঙ্গে অমিল হলে সে সত্যের কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। এডমণ্ড গস-এর পিতা ফিলিপ হেনরি গস* আন্তরিকভাবেই এরকম কথা

* *সার এডমন্ড উইলিয়ম গস* (1849-1928)—ইংরেজ জীবনীকার ও সমালোচক। পিতা ফিলিপ হেনরি গস (1810-38) ছিলেন প্রকৃতিবিজ্ঞানী এবং প্রাণিবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থপ্রণেতা। সার এডমন্ডের লিখিত পিতৃজীবনী *Father and Son* (1907) সমধিক প্রসিদ্ধ।—অনু

বলেছিলেন যে বিচক্ষণ ঈশ্বর স্বয়ং ইচ্ছে করেই শিলার মধ্যে জীবাশ্ম ভরে দিয়েছেন—যাতে মুক্তপন্থী ভূবিদরা ঐ প্রলোভনের শিকার হয়ে উচ্ছন্নে যান! এই ব্যাখ্যাকে অবশ্য বাড়াবাড়ির চরম বলে মনে করা হয়েছিল, এবং এর দ্বারা যে পালাবার পথ পাওয়া যাবে না সেটাও বোঝা গিয়েছিল।

Origin of Species উপযুক্ত সময়েই আবির্ভূত হয়েছিল।তার বার্তাকে সাগ্রহে গ্রহণ করেন অর্থনীতি ও রাজনীতি-ক্ষেত্রের চার্চ-বিরোধী আমূল-সংস্কারপন্থী ব্যক্তিরা। সেটা স্বাভাবিক; কারণ ঐ বার্তা বহুলাংশে তাঁদের অর্থনীতি ও রাজনীতির অবাধ বাণিজ্য ও আত্ম-সহায়তার তত্ত্বের আদলেই তৈরি। পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে সবকিছুকেই ন্যায্য প্রমাণ করা সম্ভব হলো এর ফলে—মানুষকে মানুষের নির্মম শোষণ, উন্নততর জাতি কর্তৃক অনুন্নত জাতিকে পদানত করা, সবই। এমনকি প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করে যুদ্ধকেও ন্যায্য প্রমাণ করা গেল, কেননা প্রকৃতি তো 'নখে দন্তে রক্তরাঙা'। আগে অজুহাত দেওয়া হতো, শাসক জাতি বা শ্রেণী ঈশ্বর-কর্তৃক নির্বাচিত, ঈশ্বরেরই সন্তান; সে দোহাই আর খাটল না। যুক্তিশাসিত বিজ্ঞানের যুগে প্রয়োজন হলো নতুন অজুহাতের। ডারউইনবাদ সেই অজুহাতগুলি যোগাল—যদিও ডারউইন নিজে কোনোমতেই তা চাননি।

বিবর্তন-তত্ত্বের মৌলিক গুরুত্বটি এইখানে যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকতার ধারণা প্রবর্তন ক'রে তা গ্রীক ঐতিহ্যের কট্টর ধারার সঙ্গে একটা পাকাপাকি বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিল—প্লেটো-আরিস্টটলের শাশ্বত সত্য, অপরিবর্তনীয় প্রজাতির মতবাদ আর খাটল না। তার বদলে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটল প্রাচীনতর আয়োনীয় দার্শনিকদের বিদ্রোহী অংশের, এবং ডিমক্রিটাসের চিন্তাধারার। এঁরা জোর দিতেন যুক্তিগ্রাহ্য বিকাশ ও পরিবর্তনের ওপর। বিজ্ঞানে ঐতিহাসিকতার প্রবর্তন ক'রে ডারউইনের বিবর্তনবাদই হয়তো প্রাকৃতিক ও মানবিক বিদ্যাচর্চার মধ্যে সেতুর কাজ করতে পারত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি, কারণ এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের অধিকাংশই তত্ত্বটিকে পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে অনাগ্রহী ছিলেন। বস্তুত, মানুষের সঙ্গে পশুর আত্মীয়তার ব্যাপারটিতে জোর দিতে গিয়ে মানুষের সামাজিক বিবর্তনের দিকটিকে অস্পষ্ট করে তোলা হয়, নিছক জৈবিক বিবর্তনের দিকটিই গুরুত্ব পায়। বিশুদ্ধ জৈবিক বিবর্তনের এই তত্ত্বই পরে নীৎশে-র* অতিমানবের উদ্ভট ধারণার জন্ম দেয় এবং যুক্তিসংগত প্রমাণ করতে চায় জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে ও সাম্রাজ্যবাদকে।

বিজ্ঞানীর সামাজিক অবস্থান

আঠারো শতকের গোড়াতে বিজ্ঞান ছিল এক মুক্তিপ্রদায়ী চিন্তাধারা, যা কিনা বিশেষ কয়েকজন উন্নতমনা ব্যক্তির অধিগম্য। উনিশ শতকের শেষে এসে দেখা গেল, বিজ্ঞান এক বাস্তব শক্তি, যা মানুষের জীবনেব ধরন বদলে দিতে পারে। আমরা আগেই বলেছি, এই উত্তরণটা সোজা পথে ঘটেনি। বহু ওঠা-নামার পর্ব, বহু দ্রুত অগ্রগতির কিংবা থমকে-দাঁড়ানোর পর্বের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে ঘটেছে এ-উত্তরণ।

এই সংগ্রামে, ব্যক্তি-বিজ্ঞানীর পক্ষে প্রকৃতির শাশ্বত শৃঙ্খলা ছাড়াও যে জিনিসটা অনুধাবন

* *ফ্রিড়রিখ ভিল্‌হেল্‌ম্ নীৎশে* (1844-1900)—এই জার্মান দার্শনিক পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সভ্যতা ও খ্রিস্টীয় নৈতিকতাকে প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান ক'রে 'অতিমানব' তত্ত্বের কথা বলেন : অতিমানব শুভঅশুভের প্রচলিত মাপকাঠির উর্ধ্বে থাকবেন এবং শ্রেষ্ঠতম সৃজনশীলতা ও আবেগময়তার স্তরে বিরাজ করবেন। জার্মানিতে তাঁর চিন্তাধারা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। গণতন্ত্র, সমতা প্রভৃতি ধারণার বিরুদ্ধে এবং জাতিগত ও দেশগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার সপক্ষে তাঁর মত ফ্যাসিবাদের দার্শনিক যৌক্তিকতা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।—অনু

না করে উপায় ছিল না সেটা হলো : নবীন প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায় সার্থকভাবে হস্তক্ষেপের ফলাফল। পরস্পর-বিরোধী তাড়নায় তাঁরা ক্ষতবিক্ষত হতেন। এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত, কাজেই পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের প্রবল গতির সঙ্গে তাঁরা যুক্ত ছিলেন। অথচ বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁরা স্পষ্টই দেখতে পেতেন যে তাঁদের প্রয়াসের ফসল অন্যের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলছে, সাধারণ মানুষের উন্নতির কাজে লাগছে না। এই ব্যাপারটাকে যাঁরা ধিক্কার জানিয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। এঁদের মধ্যে আছেন ব্রিটেনের এ· আর· ওয়ালেস (1823-1913) ও এইচ· জি· ওয়েল্‌স (1866-1946), জার্মানির হেক্‌ল এবং 1894-এ ফ্রান্সে যে বুদ্ধিজীবীকুল ড্রেইফু-র* পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঃ মহাজাগতিক নৈরাশ্যবাদ

বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই এই অস্বস্তিকর দোটানা থেকে মুখ ফিরিয়ে আশ্রয় নেন বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক সত্য সম্পর্কে ভাবনায়। তাঁরা মনে করতেন, যদি তাঁরা নিজেরা তাঁদের আবিষ্কার ভাঙিয়ে টাকা না করেন তাহলে ঐ আবিষ্কার ভাঙিয়ে ব্যক্তিগত মুনাফা করার ব্যাপারে যুক্ত থাকার দোষ তাঁদের ওপর অর্শায় না।

এই মনোভঙ্গির প্রভাব এমনকি তাঁদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপরেও পড়েছিল। সুদূর নীহারিকা থেকে শুরু করে মানব-মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহু ব্যাপারের রহস্যসন্ধানে বিজ্ঞান বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল; বিবর্তনতত্ত্ব ক্রমাগত প্রগতির এক জমকালো ছবিও এঁকে দিয়েছিল। তথাপি, বিজ্ঞানের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি উনিশ শতকের শেষের দিকে মূলত নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়ল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে ছবিটি ফুটে উঠল তার মধ্যে এরকম কোনো আলোকিত ভাবনার ঠাঁই ছিল না যে মানবজাতি নিজের ও আগামী প্রজন্মগুলির মঙ্গলের জন্য প্রকৃতিকে আয়ত্ত করে নেবার উদ্দেশ্যে নিজেকে সচেতনভাবে নিয়োগ করবে। অতএব তার প্রবণতা দেখা দিল অন্ধ অদৃষ্টবাদী হয়ে ওঠার দিকে—লৌহকঠিন নিয়মের মধ্যে দিয়ে অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার দিকে।

বিজ্ঞানের সসীমতা

বিজ্ঞান সসীম বলে প্রতিভাত হলো। উনিশ শতক জুড়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতি থেকে ক্রমশ একটি সুসংহত এবং ঐকিক ছবি বেরিয়ে আসছিল। বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন যে বিজ্ঞান তার চূড়ান্ত বিকাশের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। পদার্থবিদ্যায় যে শক্তিগুলিকে আগে আলাদা বলে মনে হতো, যথা আলোক, বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব এবং তাপ, সেগুলি সবই অসামান্য সেই তড়িৎচুম্বক তত্ত্বে সম্মিলিত হয়। মহাকর্ষ ব্যাপারটা যদিও বোঝা যায়নি, তবু তার ক্রিয়া সম্পর্কে নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হচ্ছিল। রসায়নে প্রায় সব মৌলই আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল এবং মেন্ডেলীয়েভ-এর চমকপ্রদ সাধারণীকরণ থেকে জানা হয়ে গিয়েছিল মোট ক'টা মৌল আছে ও আর ক'টা আবিষ্কার করা বাকী। আর জীববিদ্যার ক্ষেত্রে ডারউইন-তত্ত্বই তো দেখিয়ে দিয়েছিল যে খোদ বিবর্তন ব্যাপারটা যেন আকস্মিকতা ও সংগ্রামের এক নিয়তি-নির্দেশিত অগ্রগতিতে পরিণত হয়েছে।

* *ক্যাপ্টেন আলফ্রেদ ড্রেইফু (1859-1935)* মিথ্যা মামলায় 1894 সালে সাজা পান। এই ঘটনায় ফ্রান্স উত্তাল হয়ে ওঠে। এমিল জোলা, আনাতোল্ ফ্রাঁস প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। 1908 সালে মুক্তি পান তিনি। এই ঘটনা ফ্রান্সে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং তীব্র চার্চ-বিরোধিতার জন্ম দেয়। 1905 সালে ফ্রান্সে রাষ্ট্রের সঙ্গে চার্চের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। —অনু·

একথা ঠিকই যে বিজ্ঞানের অনেক কিছুই তখনো করণীয় ছিল; প্রতিটি বিজ্ঞানী তাঁর নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসংখ্য বিস্তৃত আবিষ্কারের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিলেন। কারণ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে তত্ত্বগত সাধারণীকরণের প্রচণ্ড অগ্রগতি সত্ত্বেও বিজ্ঞান উনিশ শতকের শেষ দিকে যেভাবে বিশেষীভূত হয়ে উঠেছিল এমনটা আগে আর কখনো হয়নি। বস্তুত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে সামগ্রিক একটা ধারণার ভার এতই দুর্বহ যে তার থেকে পালাবার একটা রাস্তা ছিল ঐ বিশেষীকরণ। এই মহাজাগতিক নৈরাশ্যের অন্য মেরুতে ছিল তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে এবং বিজ্ঞান ও সমাজের অব্যবহিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আত্মসন্তুষ্টির না হোক, নিশ্চয়তার বোধ।

নিজ নিজ ক্ষেত্র সম্পর্কে তাঁদের ধারণা যাই হোক, উনিশ শতকের বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মূল কাঠামোটা সুরক্ষিত আছে, নিউটনের উত্তরাধিকারকে ভালোভাবেই কাজে লাগানো হয়েছে। যেসব অদ্ভুত ব্যাপার এই স্বীকৃত ছবির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না সেগুলোও যথাকালে অবশ্যই ব্যাখ্যা করা যাবে—কেবল উপযুক্ত প্রতিভাসম্পন্ন একজন বিজ্ঞানীর অপেক্ষা। ঠিক একইভাবে তাঁরা মেনে নিতেন তাঁদের নিজস্ব পরিমণ্ডলের লোকদের কথা। আদর্শ সমাজ এখনো হয়তো বাস্তবায়িত হয়নি, তবে অচিরেই হবে; অপ্রতিহত মননগত ও বস্তুগত উন্নতির যুগ আসন্ন। দিগন্তে অবশ্য মেঘের আনাগোনা দেখা যাচ্ছিল: শ্রমিক অশান্তি, অস্ত্রসম্ভারের অস্বস্তিকর বৃদ্ধি। তা হোক; সদিচ্ছা থাকলে, আর, শান্তিপূর্ণ পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি বজায় রাখলে যে সকলেরই লাভ, এই কথাটা উপলব্ধি করলেই মেঘ কেটে যাবে—এই ছিল তাঁদের ধারণা। তাঁদের ধারণা ছিল, ভবিষ্যৎটা হবে অতীতেরই এক বিবর্ধিত কিন্তু নীরস সম্প্রসারণ। কী বিজ্ঞানে, কী সমাজে এঁদের এই প্রত্যাশা যে কীভাবে মার খেয়েছে তা আমরা ভালো করেই জানি। কেননা বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও সমাজের নব নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়সমূহের আলোচ্য সেটিই।

পরিশিষ্ট এক

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিভাষার তালিকা

দু-একটি বাদে এই পারিভাষিক শব্দগুলি ইতিমধ্যেই বাংলায় কমবেশি পরিচিত ও প্রচলিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রন্থের মূল অবয়বের মধ্যে বাংলা পরিভাষার পাশে ইংরেজি শব্দটি বন্ধনীর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু, পাঠকের কাজে লাগতে পারে ভেবে পারিভাষিক শব্দগুলি একত্রে বিন্যাস করা যুক্তিযুক্ত মনে হলো। —আ· লা·

অ-ক্রীতদাস নাগরিক—freeman
অক্ষিপট—retina
অগ্নিসংযোগ—ignition
অ-চিরপ্রযোজ্যতা—provisionalism
অজ্ঞেয়বাদ—agnosticism
অণুবিশ্ব—microcosm
অণুযোজন—polymerization
অতি-পরিবাহিতা—superconduction
অতিমন্দা—the great depression
অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ—mysticism
অত্যাধান—hypercharge
অধঃক্ষেপ—precipitate
অধিবিদ্যা—metaphysics
অধিশাস্তা—super ego
অধিসত্তা—spirit
অনতিক্রম্য—limiting
অনস্তগ—circumpolar
অনাল—ductless
অনির্ণেয়তা—indeterminacy
অনুঘটক—catalyst
অনুকম্পন, অনুনাদ—resonance
অনুপূরকতা—complementarity
অনুষঙ্গভিত্তিক—sympathetic
অনুসন্ধান-উপকরণ—research tool
অনুসম্ভূত—secondary
অন্তঃক্ষরা—endocrine
অন্তরণ—insulation
অন্তরিত—insulated
অন্তর্দহন—internal combustion
অন্যনিরপেক্ষ—absolute
অন্যোন্যজীবিতা—symbiosis
অপচিতি—catabolism

অপনিয়ন্ত্রণ—maladjustment
অপরসায়ন—alchemy
অপসরণ—shift
অপসূর—parhelia
অপেক্ষক—function
অপ্রতিসমতা—asymmetry
অবক্ষয়—erosion
অবক্ষেপ—deposit
অবধারণ—perception
অব-পরমাণু—sub-atomic
অববর্তন—diffraction
অবরোহী—deductive
অবার্ণ—achromatic
অভিকর্ষ—gravity
অভিক্ষিপ্ত বস্তু—projectile
অভিঘাত—impulse
অভিজাততন্ত্র—aristocracy
অভিজ্ঞতাসিদ্ধ—empiric
অভিবাসী—immigrant
অভিযোজন—adaptation, conditioning
অভ্যস্তকরণ—conditioning
অর—spoke
অস্তিবাদ—existentialism
অস্থিত—unstable
অস্থিতিস্থাপক—rigid
অহম—ego

আকরখনন—mining
আকস্মিকতা—chance
আকারবাদ—formalism
আকারবাদী—formal

আচারবিধি—ritual.
আচ্ছন্নতাবাদ—obscurantism
আততি—tension
আত্মগত—subjective
আত্মপ্রতিরূপ নির্মাণ—duplication
আত্মিক দায়বদ্ধতা—*engagement*
আদর্শ ভাব—ideal
আদর্শলিপি—master copy
আদিবীজ—germ plasm
আদিম মন্ড—primitive soup
আধান—charge
আনতি—dip
আন্তর্মহাদেশ ক্ষেপণাস্ত্র—ICBM
আপেক্ষিকতা—relativity
আবর্ত-যুক্তি—circular argument
আবশ্যিকতা—necessity
আবহবিদ্যা—meteorology
আবহব্যাঘাত—atmospherics
আমূলপন্থী—radical
আয়নমন্ডল—ionosphere
আরোহী—inductive

আলোক রসায়ন—photo chemistry
আলো-কণা—photon
আলোকপ্রভা—fluorescence
আলোকবিদ্যা—optics
আঁশযুক্ত—fibrous
আসক্তি—affinity
আসন্নায়ন—approximation

উৎপাদ—output
উৎপাদন-উপকরণ—means of production
উৎপাদন-শিল্প—industry
উৎপাদিকা শক্তি—productive forces
উৎসেচক—enzyme
উদারনীতিবাদ—liberalism
উদাসীন—neutral
উদ্দীপনা—stimulus
উদ্বর্তন—survival
উদ্যানবিদ্যা—horticulture

উপচিতি—anabolism
উপজাতক—byproduct
উপজাতি—tribe
উপপাদ্য—theorem
উপবৃত্ত—ellipse
উপযোগ—utility
উপরিশোষণ—adsorption
উপাদান-কারণ—material cause
উর্বরীকরণ—reclaiming
উষ্ণমন্ডলীয়—tropical

এককীভবন —digitalisation

ঐকিক—unitary
ঐকিক ক্রিয়া—single action
ঐশ্বরিক কৃপা—grace
ঐহিক—temporal

ঔপপত্তিক—theoretical

কণামাত্রিক—trace
কণিকাবাদ—atomism
কপাটিকা—valve
কম্বোজ—mollusc
করণকৌশল—technology
করোটিমিতি—phrenology
কর্মকৌশল—tactics
কর্মনির্বাহী—executive
কর্মপরিকল্পনা—strategy
কলা—tissue
কল্পকথা—myth
কল্পস্বর্গ—utopia
কল্যাণরাষ্ট্র—The Welfare State
কামেচ্ছা—libido
কারক উপাদান—factor
কার্য—work
কার্যকারিতাবাদ—pragmatism

কার্যকুশলতা, কার্যদক্ষতা—efficiency
কূর্চ-স্ফুরণ—brush discharge
কীলকাকার—cuneiform
কূটাভাস—paradox
কেন্দ্রক—nucleus
কেন্দ্রকণা—nucleon
কেন্দ্রকীয়—nucleic
কেন্দ্রস্থলী—nucleolus
কেন্দ্রাতিগ—centrifugal
কেন্দ্রাভিগ—centripetal
কেলাসবিদ্যা—crystallography
কেলাসিক—crystalline
কৈশিক—capillary
কোটর—cavity; socket
কোম—tribe
কোমলাস্থি—cartilage
কোষ—cell
কোষতত্ত্ব—cytology
কোষাঙ্গ—organelle
কৌম—tribal
ক্রমসঞ্চিত; ক্রমসঞ্চীয়মান—cumulative
ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত—hierarchical
ক্রান্তিক—critical
ক্রান্তিবৃত্তীয়—ecliptic
ক্রিয়াকারণ—effective cause
ক্রিয়া-পদ্ধতি গবেষণা—operational research
ক্রিয়া-সুনির্দিষ্টতা—specificity

ক্ষমতা—power
ক্ষয়, ক্ষয়ীভবন—decay
ক্ষারকীয়—basic
ক্ষেত্র—field
ক্ষেপণবিদ্যা—ballistics

খনিজ—mineral
খমির—ferment
খর্পর—cupel
খাদ্য-আধারীকরণ—canning
খাদ্যবিজ্ঞান—dietetics
খাসক্ষমতা—prerogative
খোলক—shell

গঠন —morphology; structure
গণ-genus, (pl.) genera
গুণাত্মক—qualitative
গুনিন—shaman
গূঢ়ৈষা—complex
গোছা—wisp
গোলক-আকার— globular
গ্যাস-বলবিজ্ঞান—pneumatics
গ্রন্থি—gland
গ্রহাণুপুঞ্জ—asteroids
গ্রাহী—receptor

ঘনক—cube
ঘনমূল—cube root
ঘনীকরণ—concentration
ঘর্ষণবল—friction
ঘাত—power

চক্রণ—spin
চতুর্ঘাত—four-stroke
চলরাশি—variable
চাপযন্ত্র—press
চারণভিত্তিক—pastoral
চিকিৎসাশাস্ত্র—medicine
চিত্ত—psyche
চুল্লি—pile
চেতন আত্মা—rational soul
চেতনাপীঠ—sensorium
চেষ্টীয়—motor
চোষক পাম্প—suction pump
চোলাই করা—to distil
চৌম্বক বিরূপণ—magnetostriction

ছত্রাক—fungus
ছাঁচে-ঢালা ব্যাপক উৎপাদন—mass production

ছেদ—discontinuity
ছেদহীনতা—continuity

জঙ্গম পুঁজি—fluid capital
জল-কপাট—sluice
জলগতিবিজ্ঞান—hydrodynamics
জলবিজ্ঞান—hydraulics
জলস্থিতিবিদ্যা—hydrostatics
জন-প্রব্রজন—folk migration
জনবোধ্য—popular
জনসমাজ—community
জনসম্পৃক্ত—popular
জাড্য—inertia
জাতি—family
জাতিরাষ্ট্র—nation state
জাফ্‌রি—lattice
জীনঘটিত—genetic
জীনবাহিত—genetic
জীনতত্ত্ব—genetics
জীবনচর্যা—culture
জীবনধারণ অর্থনীতি—subsistence economy
জীবনধারা—culture
জীব-পদার্থবিদ্যা—biophysics
জীবাশ্ম—fossil
জৈব—organic
জৈবমিতি—biometrics
জৈবাণুবিজ্ঞান—molecular biology
জোড়কলম—grafting
জ্ঞাতি-প্রজনন—inbreeding
জ্ঞাতিসমাজ—clan
জ্ঞান—cognition
জ্যোতির্বিজ্ঞান—astronomy
জ্যোতিষশাস্ত্র—astrology
জ্যোতিঃ পদার্থবিদ্যা—astrophysics

টান—tension

তত্ত্ব—theory
তত্ত্বকল্পিত—hypothetical
তত্ত্বপ্রকল্প—hypothesis
তন্তু—fibre
তাত্ত্বিক—theoretical
তাপগতিবিদ্যা—thermodynamics
তাপসংদীপ্ত—luminiscent
তামস যুগ—The Dark Ages
তেজশ্চিকিৎসা—radiotherapy
তেজস্ক্রিয়—radioactive
ত্বরণ—acceleration
ত্রিদ্বার—triode
ত্রিশিরা কাচ—prism

দমনাতীত—compulsive
দম্বল—rennet
দহন—combustion
দার্ঢ্য—strength
দিক-নির্দেশনা—direction
দিশাত্মক—directional
দূরসংযোগ—telecommunication
দেশ—space
দোলন—oscillation
দোলনলিপিচিত্র—oscillograph

ধনিকশাসন—plutocracy
ধনুর্বেধযন্ত্র—bowdrill
ধর্ম—(i) religion; (ii) property
ধর্মশাস্ত্রীয়—scholastic
ধাতুকর্ম—metallurgy
ধারকমাধ্যম—substrate
ধারণা—concept
ধারাবাহিকতা—continuity
ধ্বনিগ্রাহক—microphone
ধ্রুপদী—classical
ধ্রুবক—constant

নবোপলীয়, নব্য প্রস্তরযুগীয়—neolithic
নমনীয়তা গুণ—plasticity
নয়া বন্দোবস্ত—New Deal
নরগোষ্ঠী—race
নরগোষ্ঠী বৈষম্যের তত্ত্ব—race theory

নশ্বর—mortal
নিগম—corporation
নিউক্লীয়—nuclear
নিত্য—constant
নিয়মহারা—random
নিয়মানুগতা—regularity
নির্দেশাত্মক—indicative
নির্দিষ্টমুখী—guided
নির্ণেয়তা—determinacy
নির্বস্তুক—immaterial
নির্বাত শূন্যতা—vacuum
নির্মাণ-ছাঁচ—template
নির্মাণযন্ত্র—tool
নিশাপ্রভ—noctilucent
নিষেধরীতি—taboo
নীতিবোধ-নিরপেক্ষ—amoral
নীতিবোধমুক্ত—amoral
নীতিশাস্ত্র—ethics
নৈরাজ্যপন্থা, নৈরাজ্যবাদ—anarchism
নৈর্ব্যক্তিক—objective
ন্যায়—syllogism

পচন—putrefaction
পণ্যপূজা—commodity fetishism
পণ্যভোগ—consumption
পতঙ্গবিদ্যা—entomology
পরজীবিতা—parasitism
পরজীবী—parasite
পরম কারণ—final cause
পরমোদ্দেশ্যবাদ—teleology
পরম্পরা—continuity
পরম্পরাহীনতা—discontinuity
পরস্পর-বন্ধ —non-interbreeding
পরাবর্ত—reflex
পরাসমবেদী—parasympathetic
পরিচালন—convection
পরিচালনবিজ্ঞান—science of management
পরিচায়ক—marker
পরিণামবাদ—determinism
পরিপ্রবেশ—transfusion
পরিবৃত্তি—(i) variation; (ii) transfer
পরিবেশবিজ্ঞান—ecology
পরিব্যক্তি—mutation
পরিমাণাত্মক—quantitative
পরিমাপসাধ্য—exact
পরিসংখ্যান—statistics
পরিসেবা—services
পর্যায়কাল—period
পশুমলসার—manure
পাক—twist
পাতন করা—to distil
পান খাওয়ানো—to anneal
পাল্লা-স্থিরীকরণ—range-finding
পাস্তুরায়ন—pasteurization
পীড়নমাত্রা—tensile strength
পুত্তলি—pupa
পুনর্জনন, পুনরুৎপাদন—regeneration
পুনর্নিবেশ—feedback
পুনর্নিয়োজন—recycling
পুরাচুম্বকত্ব—paleomagnetism
পুরাজীববিদ্যা—palaentology
পুরাণকথাশ্রয়ী—mythical
পুরাবশেষ—relic
পুংদন্ড—filament
পূপকার—baker
পূর্ণ কর্মনিয়োগ—full employment
পূর্বধারণা-লব্ধ—a priori
পূর্ব-সঙ্কাপিত—pre-compressed
পৃষ্ঠ—front
পেটাই করা—to forge
পেশাকর্ম—profession, trade
পেষণযন্ত্র—mill
পোক্ত—stable
প্রকট—dominant
প্রকরণ—technique
প্রকরণগত—technical

প্রকুশলী—technician
প্রকৃতি-পর্যবেক্ষক—naturalist
প্রকৃতিবিষয়ক বিজ্ঞান—natural science
প্রকোষ্ঠবদ্ধ—compartmentalized
প্রকৌশল—technique
প্রকৌশলগত—technical
প্রগামী—progressive
প্রচলসম্মত—conformist
প্রচালন—transfusion
প্রচ্ছন্ন—recessive
প্রজন—strain; breed
প্রজনন—reproduction
প্রতিজ্ঞা—proposition
প্রতিযোগ তত্ত্ব—game theory
প্রতিরূপ—replica
প্রতিসমতা, প্রতিসাম্য—symmetry
প্রতিসরণ—refraction
প্রতীপগামী—reversible
প্রত্যক্ষবাদ—positivism
প্রবাহী—fluid
প্রভমান—fluorescent
প্রভমানতা—fluorescence
প্রমাণ—standard
প্রমিতকরণ—standardization
প্রমাণ সমাহার—standard collection
প্রযুক্তি—technology
প্রয়োগযন্ত্র—implement
প্রশমিত—neutralized
প্রশ্নমালাপত্র—questionnaire
প্রস্ফুরণ—scintillation
প্রাক্‌নির্মিতি—prefabrication
প্রাক-পীড়িত—prestressed
প্রাণপঙ্ক —protoplasm
প্রাণরসায়ন—bio-chemistry
প্রাণসত্তাবাদ—vitalism
প্রান্তীয়—marginal

ফলিত—applied
ফুৎ-ক্ষেপণাস্ত্র—blow-gun

বংশানুবৃত্তি—inheritance
বনেদী—classical
বন্ধুর অববাহিকা—relief basin
বর্গ—order
বর্গীকরণ—classification
বর্গীকারক—classifier
বর্ণালীবিজ্ঞান—spectroscopy
বর্তনী—circuit
বর্তনীসজ্জা—circuitry
বলবিজ্ঞান—mechanics
বস্তু-অবচ্ছিন্ন—abstract
বস্তুগঠিত—material
বস্তুগত—material
বস্তুবত্তা—substance
বস্তুবিনিময়—barter
বস্তুসংগত—objective
বহিরঙ্গন-গবেষণা—field research
বহিরবয়বগত—formal
বহুক্রিয়া—multiple action
বাচিক—verbal
বায়ুচাপ-চালিত—pneumatic
বার্তাবহ—messenger
বার্তাবিনিময়—communication
বাস্তব—real
বিকারক—reagent
বিকারতত্ত্ব—pathology
বিকিরণ—radiation
বিক্রয়কুশলতা—salesmanship
বিক্রিয়া—reaction
বিক্রিয়ামালা—chain reaction
বিক্ষেপণ—scattering
বিক্ষেপণ, বিচলন —deflection
বিক্ষোভ—turbulence
বিগলন—smelting
বিচ্ছুরণ—diffraction
বিত্ত—finance
বিদারণ—fission
বিদেহী সত্তা—entelechy
বিনষ্টি—annihilation

বিন্যাস—set
বিপণন গবেষণা—market research
বিপাকক্রিয়া—metabolism
বিবর্তন—evolution
বিবর্ধন—amplification
বিভব—protential
বিমূর্তকরণ—abstraction
বিযুক্ত—dissociatod
বিরঞ্জন—bleaching
বি-লৌহচুম্বকত্ব—antiferro-magnetism
বিশৃঙ্খল—chaotic
বিশেষাধিকার—privilege
বিশেষীভবন—specialization
বিশেষীভূত—specialized
বিশোষক—absorptive
বিশ্বতত্ত্ব—cosmology
বিষমযোজন—maladjustment
বিষয়গত—objective
বিষয়ীগত—subjective
বিস্তারণ—distribution
বীজকোষ—core
বীজদূষণ—sepsis
বুদ্ধি-যাচাই—intellegence test
বৃত্তিকা—epicycle
বেড়া—barrier
বৈকল্যসাধন—breakdown
ব্যতিচার—interference
ব্যবসায়-গোষ্ঠী—trust
ব্যবহারিক—practical
ব্যস্ত—inverse

ভবিষ্যনির্দেশক, ভবিষ্যসূচক—predictor
ভর—mass
ভরবেগ—momentum
ভাঁজ খাওয়া—folding
ভূত্বক—crust
ভূপদার্থবিদ্যা—geophysics
ভূরাজনীতি—geopolitik
ভেদন—penetration
ভেষজশাস্ত্র—pharmacology
ভৌম—terrestrial
ভ্রূণতত্ত্ববিদ্যা—embryology

মঙ্গলরাষ্ট্র—The Welfare State
মজ্জা—core
মণিক—mineral
মতসমীক্ষা—opinion poll
মধ্যচ্ছদা—diaphragm
মধ্যচ্ছেদ—interception
মনোবিকলন—psychoanalysis
মনোরোগ চিকিৎসা—psychiatry
মণ্ডল-গলন—zone melting
মন্দন—retardation
মন্দা—slump
মরণেচ্ছা—death wish
মস্তিষ্কতরঙ্গলেখ—EEG
মহাকর্ষ—gravitation
মহাজাগতিক সৃষ্টিক্রম—cosmogony
মহাসংকট—the great depresion
মাতৃকুলভিত্তিক,
মাতৃধারানুসারী—matrilinear
মাতৃশাসিত—matriarchal
মাধ্যমিক স্তরের/ পর্যায়ের—secondary
মান-নির্ণায়ক—normative
মানসপ্রকল্প—mental construct
মানসপ্রহরী—censor
মাপনী—gauge
মার্গ—mode
মারণ-মাত্রা—lethal concentration
মুখ্য ব্যয়—capital expenditure
মুচি—crucible
মূলধনী সরঞ্জাম—capital equipment
মূল্যবোধ—values
মৃত্তিকাবিজ্ঞান—pedology
মেরুভবন—polarization
মোক্ষণ—discharge

মোচড়—twist
মোহবিভ্রম—illusion
মৌলিক—fundamental

যকৃৎ—liver
যথাতাপন—vernalization
যথাযথ—precise
যদৃচ্ছ—arbitrary
যন্ত্রগণক—computer
যাচাইকরণ—assaying
যুক্তিগত নিশ্ছিদ্রতা—rigour
যুক্তিশাসিত—rational
যুক্তিসঞ্জাত ঈশ্বরবাদ—deism
যোগাযোগ—communications
যোজ্যতা—valency

রক্তমস্তু—serum
রঞ্জক—pigment
রমরমা—boom
রস—humour
রাশিবিজ্ঞান—statistics
রূপবিকার—rheology
রূপভেদ—variation
রূপান্তরণ—transmutation
রেচন—excretion
রৈখিক—linear
রোঁয়া—bar
রোগনির্ণয়— diagnosis
রোগপ্রতিরোধতন্ত্র—immunology
রোগপ্রতিরোধব্যবস্থা—immunization
রোগের গতিপ্রকৃতি—prognosis

লগ্নীকার—financier
লাজাবর্দ—lapis
লোককথা; লোকবিশ্বাস—lore

শক্তি—energy
শক্তিমাত্রা—energy level

শঙ্খকুণ্ডলী—helix
শণাক্তকৌশল—detection device
শব্দোত্তর—supersonic
শর্তহীন—unconditioned
শর্তাধীন—conditioned
শান্তরেখ—streamlined
শারীরতত্ত্ব; শারীরবৃত্ত—physiology
শারীরস্থান (বিদ্যা)—anatomy
শিলা—rock
শিলাক্ষেপণাস্ত্র—catapult
শিল্প-মনস্তত্ত্ব—industrial psychology
শিল্পোৎপাদনমন্যতা—industrialism
শীতলীকরণ—refrigeration
শুক্রাণু—spermatozoa
শুভনাস্তিক্য—cynicism
শূন্যাবস্থা—vacuum
শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি—mucosa
শোধন—refining

ষষ্টিক—sexagesimal

সংকেতবদ্ধ করা—to code
সংকেতসূত্র—code
সংপরিবর্তন—modification
সংবদ্ধ পুঁজি—fixed capital
সংযোজন—fusion
সংরক্ষণবাদী—protectionist
সংশ্লেষণ—synthesis
সংস্থান—structure
সনিষ্ঠ—serious
সন্ততি—continuum
সন্ধান—fermentation
সন্ধায়ক—tracer
সন্ধি—bond
সপ্রাণ—animate
সমতাবাদী—uniformitarian
সমবেদী—sympathetic
সমমেরু—homopolar

সমলয়—synchronous
সমসত্ত্ব—homogeneous
সমাজতত্ত্ব—sociology
সমাজমিতি—sociometrics
সমাজমুখী চিকিৎসাবিজ্ঞান—social medicine
সমুদ্রবিদ্যা—oceanography
সম্পর্কসূত্র—relationship
সম্প্রেরণ করা—to transmit
সম্মতকরণ—persuasion
সরণ—shift
সর্বগ্রাসিতা—totalitarianism
সহোৎসেচক—coenzyme
সাংশু—fibrous
সাড়া—response
সান্দ্রতা—viscosity
সাধারণীকরণ,
সামান্যীকরণ—generalization
সারবত্তা—essence
সারস্বত—academic
সালোকসংশ্লেষ—photosynthesis
সাশ্রয়কর—economical
সীরা—malt
সুপ্রকট—dominant
সুবিন্যস্ত—coherent
সুরাকরণ—brewing
সুসংবদ্ধ, সুসংহত—coherent
সুস্থিত—stable
সূচক-মান—index
সূত্রকারক—coder
সূত্রবিশ্লেষক—decoder
সৌজাত্যবিদ্যা—Eugenics
সৌসাম্য—harmony
সেবা-উপযোগ—services
স্তরীভূত—stratified
স্থাণু—static
স্থানচ্যুতি—dislocation
স্থিতিস্থাপকতা—elasticity
স্থির—stationary
স্থিরবৈদ্যুৎ—electrostatic
স্নায়ব তথ্য—sensory data
স্নায়ুসন্ধি—synapse
স্নেহজাতীয়—lipoid
স্পন্দ—pulse
স্বজ্ঞা—intuition
স্বতন্ত্র বস্তুসত্তা—entity
স্বতঃপ্রতীয়মান—self-evident
স্বতোজনন—spontaneous generation
স্বয়ম্প্রভ—radiant
স্বয়ংপোষণ—autotropism
স্বয়ংপোষিত—autotropic, autotrophic
স্বয়ংসিদ্ধ—self-evident
স্বাস্থ্যবিধান—sanitation
স্বীকার্য ধারণা—postulate
স্মৃতিভাণ্ডার—memory

হনু-নিম্নবর্তী—sub-maxillary
হাতিয়ার—implement
হিমায়ন—refrigeration
হেতুবাক্য—premise

পরিশিষ্ট দুই
নাম-নির্ঘন্ট

পরিশিষ্ট তিন

বিষয়-নির্ঘণ্ট